নমি নমি চরণে

শ্রী সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

প্রেম মন্দির আশ্রম
রিষড়া, হুগলী

প্রকাশক ঃ
শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত
প্রেম প্রবাহ প্রকাশন, প্রেম মন্দির,
রিষড়া - ৭১২ ২৪৮

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহাসপ্তমী, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

মূদ্রক ঃ
'লিঙ্ক', ৩৪/ডি, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

উৎসর্গ

শ্রীগুরু শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

'নমি চিতকমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।'

ভূমিকা

নানা বর্ণের ও গন্ধের ফুল দিয়ে গাঁথা মালাকে বলে বৈজয়ন্তী মালা। শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এই মালা। এখানে নানা ভাবের নানা রসের প্রবন্ধাদি দিয়ে তেমনই একখানি সুন্দর মালা গাঁথা হয়েছে, নাম তার 'নমি নমি চরণে'। পুষ্পগুলি চয়ন করে মালাটি গেঁথেছেন নিপুণ শিল্পী শ্রী সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়। আর মালাটিকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে নমস্কার করেছেন আর এক রসিকজন শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত।

সার্থক নাম 'নমি নমি চরণে'। কারণ, প্রবন্ধগুলির বেশীরভাগই ধর্ম, সংস্কৃতি, ভগবান ও ভক্তদের নিয়ে রচিত। তাই সেগুলি শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত হওয়ারই যোগ্য। গ্রন্থের লেখাগুলি পূর্বে প্রেম মন্দির আশ্রমের পত্রিকা 'প্রেম প্রবাহ'তে এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত। কিছু অপ্রকাশিত লেখাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি সরস, সাবলীল, তথ্যপূর্ণ এবং গবেষণামূলক। রসগ্রাহী পাঠকের কাছে এক অমূল্য সম্পদ এই গ্রন্থখানি।

শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় একটি সুপরিচিত নাম চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক এবং রসিক নাট্যকার হিসেবে। আবার কবিতার ছন্দময় আঙ্গিনায়ও রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ পাদচারণা। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন দরদী শিক্ষক, আর সাহিত্য রচনা তাঁর সাধনা। সাহিত্যের প্রতিটি অলিন্দে রয়েছে তাঁর

সহজ আনাগোনা। গুরুদেব শ্রীশ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের গভীর স্নেহ ও একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য এবং প্রেম মন্দির আশ্রমের শিষ্য সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থের একজন মর্মজ্ঞ পাঠক এবং সাধু সঙ্গলাভে বিশেষ আগ্রহী। গ্রন্থের প্রতিটি লেখার মধ্যে এই মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে।

শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত বাণিজ্য বিভাগের প্রবীন শিক্ষক হলেও বর্ত্তমানে একজন দক্ষ ধর্মবক্তা এবং প্রেম প্রবাহ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তিনি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের একজন গুণগ্রাহী সহকর্মী। গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি একজন প্রকৃত সুহৃদের কাজই করেছেন।

লেখক ও প্রকাশকের ওপর শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা জানাই। আশা করি, 'নমি নমি চরণে' গ্রন্থটি সুধী সমাজে সমাদৃত হবে এবং লেখকের শ্রম হবে সার্থক।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মধুর তোমার শেষ যে না পাই

'শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।।
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী।।

---- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকালে, তাঁর সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে নিঃশব্দে ভেঙে পড়তে চায় 'এ আমির আবরণ', নত হয়ে আসে উদ্ধত মস্তক, শিউরে উঠতে হয় নিজের সর্ব অঙ্গ মাখা মলিনতা দেখে। এখনও তাঁর এক একটি বাণী ও উপদেশ নাস্তিককেও ভাবায়, রুক্ষ শুষ্ক মরুজীবনে অমৃতবারি সিঞ্চন করে, অন্ধকারে পথ হাতড়ানো হতাশ মানুষকে দেয় অমল আলোর দীপ্তি। এখনও তিনি নিত্য স্মরণীয়, নিত্য পূজ্য।

ভারী সুন্দর বলতেন তিনি -- 'চাঁদ মামা সকলের মামা'। তিনিও তাই। তিনি সকলের। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের অভ্রান্ত পথ পরিচায়ক, আবার সংসারী মানুষের পথ প্রদর্শক। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অখ্যাত পল্লীগ্রামের এই প্রায় নিরক্ষর মানুষটিকে অবতারকল্প মহাপুরুষ হিসাবে শ্রদ্ধা জানায়। কত অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তিনি। ভক্তদের বলতেন, 'আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টানরাও পাবে। ..... আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের মিথ্যা -- এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।' ধর্ম নিয়ে এখনও রক্ত ঝরে, সাম্প্রদায়িকতা আজও আমাদের দেশে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জাঁকিয়ে বসে আছে। জাতিভেদও আমাদের দেশের কলঙ্ক। 'জাতিভেদ?' ঠাকুর বলছেন, 'কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নেই। চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না।' ধর্ম নিয়ে হানাহানি আর রক্তপাত সহজেই বন্ধ হয়, যদি আমরা

শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুধাবন করি, তাঁর পবিত্র চরণ ছুঁয়ে দাঁড়াই, তাঁর মত ও পথের পথিক হই।

তীর্থে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। ভক্তজন উজাড় করে দেয় তাদের ভক্তির অর্ঘ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সচল তীর্থ। তাঁর চরণতলে, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে দু'দণ্ড শান্তির প্রত্যাশায় প্রতিদিন নানা ধরণের মানুষ আসত। এদের অধিকাংশই সংসারী। সংসার করছে বলে কি তারা অপরাধী? ঠাকুর বলতেন -- 'তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে।' বার বার তিনি বলতেন যে সংসারী মানুষের ভূমিকা হবে ধনী বাড়ির দাসীর মতো। দাসী বাবুর বাড়ীকে বলে 'আমার বাড়ি', বাবুর ছেলেমেয়েদের বলে 'আমার ছেলেমেয়ে'। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দেশে, তার নিজের বাড়ি, নিজের ছেলেমেয়ের দিকে। তিনি বলতেন যে সংসারে অনাসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। ঈশ্বরানুরাগের অঞ্জনটুকু যেন নয়নে লেগে থাকে। 'কাকে সবচেয়ে ভালবাসো গো?' ঠাকুরের সহাস্য প্রশ্নে এক মহিলার উত্তর, 'আমার এক ছোট্ট ভাইপোকে।' ঠাকুর বললেন, 'গোপাল জ্ঞানে তার সেবা কর।' কি চমৎকার পথ নির্দেশ। পিতামাতাকেও ঈশ্বর ঈশ্বরী রূপে দেখতে বলতেন তিনি।

সংসারী মানুষকে ঠাকুর মাঝে মাঝে নির্জনবাস করে সাধনা করতে বলতেন। অপূর্ব উপমা দিয়ে বোঝাতেন -- 'দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তোলা হলো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না -- সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।' হয় নির্জন বাস, নয় সাধুসঙ্গ। দুটির একটিকে বেছে নেবে সাধারণ সংসারী মানুষ।

সংসারী মানুষের কি কর্তব্য? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ -- গৃহকর্তা সন্তানাদি মানুষ করবে। স্ত্রীকে ধর্মোপদেশ দেবে, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের ভার নেবে। এমন কি ভবিষ্যতের সংস্থানও গৃহীকে করে যেতে হবে। তিনি বলতেন, 'তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়।' একবার নাট্যকার অভিনেতা গিরিশ ঘোষ এসে খবর দিলেন যে দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন। শুনে তো ঠাকুর অবাক! 'সে কি! পরিবারের খাওয়া দাওয়া কিভাবে হবে? কি করে তাদের চলবে?' একবার গেছেন কেশব সেনের বাড়ি। অনেক লোক এসেছে। মেয়েরা বসেছে চিকের ভেতর। উদাত্ত কণ্ঠে কেশব সেন প্রার্থনা করছেন -- 'হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমরা ভক্তি সাগরে ডুবে যাই।' রসিক প্রবর শ্রীরামকৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন -- 'ভক্তি সাগরে যদি ডুবে যাবে তবে চিকের

ভেতর যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের দশা কি হবে?' ঠাকুরের রসবোধে আমরা না হেসে পারি না। তিনি কিন্তু এই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যাদের দেখাশোনা করা গৃহীর প্রাথমিক কর্তব্য। তাদের পথে বসিয়ে, সংসার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলে ধার্মিক হওয়া যায় না। সংসারে থেকেই ধর্মজীবন যাপন করতে হবে। তবে, সংসার করতে হবে অনাসক্তভাবে। 'সংসার কর্মভূমি,' ঠাকুরের মন্তব্য, 'এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সেই গল্পের কথা মনে পড়ে? তোতাপুরীর মুখে শোনা ঐ গল্পটি প্রায়ই তিনি ভক্তদের শোনাতেন। শিশু বাঘের জন্ম দিয়ে বাঘিনী মারা যেতে শিশু বাঘ ছাগলের পালে বড় হতে লাগল। ছাগলের মতোই সে ঘাস খায় আর ব্যা ব্যা করে ডাকে। এসব ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেল অরণ্যের বাঘ। সে ভাবল তারই এক স্বজাতি ঘাস খায় আর ব্যা ব্যা করে ডাকে! ছাগলের পালে বড় হওয়া বাঘকে সে নিয়ে গেল এক জলাশয়ের ধারে। জলের মধ্যে দেখালো তার প্রতিবিম্ব, খেতে দিল মাংসের টুকরো, নিয়ে গেল তার স্বস্থান অরণ্যের গভীরে, চিনিয়ে দিল তার স্বরূপকে। ছোট্ট একটি গল্পের বিন্দুতে ঠাকুর এনে দেন মহাসিন্ধুর ব্যাপ্তি। অমৃতের পুত্র হয়েও আমরা অনেকেই পশুর মতো জীবনযাপন করছি। গুরুই চিনিয়ে দেন স্বরূপ, নিয়ে যান বাঞ্ছিত স্থানে। পথভ্রষ্ট, নিশানা হারানো মানুষকে এভাবেই ঠাকুর পথ সন্ধান দিয়েছেন। দুরূহ শাস্ত্রকথা, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজ সরল ভাষায় আর কার শ্রীমুখ থেকে এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছে?'

ঈশ্বর দর্শন কি সম্ভব? এই জটিল প্রশ্নের কী সরল সমাধান! 'ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদে?' চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে হবে মনের ময়লা। তবে 'ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ ছুঁচকে' টেনে নেবে। কিন্তু যাঁর মনে বিষয়বুদ্ধি রয়েছে, তাঁর পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব নয়। বিষয়াসক্ত মনকে তিনি বলেছেন 'ভিজে দেশলাই কাঠি, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না।' সুগভীর জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য থাকলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর -- 'হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক-বৈরাগ্য নেই -- তার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।' কিন্তু ঈশ্বর যদি স্বয়ং কৃপা করেন? তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের ওপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের দিকে ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

ভক্তকেও অহংমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল প্রাথনা করতে হয়। 'ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।'

এতবড় একজন অবতারকল্প মহাপুরুষ, অথচ ভক্তসঙ্গে কত না রস রসিকতা করতেন! নিজেই বলতেন যে তিনি শুকনো সন্ন্যাসী হতে চাননা, রসে বশে থাকতে চান। তাই তাঁর শাস্ত্র-উপদেশও হয়ে উঠত রসাল। ঈশ্বর দর্শনের জন্যে ব্যাকুলতা চাই, কিন্তু সময় না হলে কিছু হবে না -- একথা বোঝাতে সুরসিক ঠাকুর বলছেন -- 'একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল -- মা, আমার যখন হাগা পাবে আমাকে উঠিয়ে দিও। মা বললেন, বাবা, হাগাই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।' গ্রাম্য ভাষায় সরস ভঙ্গীতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে তাঁর জুড়ি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ দীনদয়াল। গিরিশ ঘোষকে একদিন বললেন -- 'আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। তারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে। ওদের ধন যেন রক্তপূঁজ।' এ সর্বত্যাগী এক মহাসাধকের কথা? না কোনও সমাজতন্ত্রীর অকাট্য মন্তব্য?

আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। ঠাকুরের অতিথি সেবা অতুলনীয়। ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ঠাকুর তখন গুরুতর অসুস্থ, দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। বৈশাখ মাস, অসহ্য গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ এসেছেন। তাঁকে জলখাবার দেবার জন্য ঠাকুরের সে কি ব্যাকুলতা! গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টান্ন আনা হল। মাতৃস্নেহে সেই খাবার সাজিয়ে গিরিশের হাতে দিলেন তিনি, বললেন, 'খেয়ে নাও।' তারপর ঐ অসুস্থ শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামলেন। খসে পড়ল পরনের বস্ত্র, হুঁশ নেই। একটু দূরে রয়েছে কুঁজো। ঐ কুঁজোর জল ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মের ঝলসানো সন্ধ্যায় ভক্ত অতিথিকে তিনি নিজের হাতে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবেন। কুঁজো থেকে জল নিয়ে মন্থর গতিতে তিনি গিরিশের দিকে গিয়ে গেলেন, তাঁর হাতে তুলে দিলেন জলের গেলাস।

কুঁজোর জল সেদিন ঠাণ্ডা ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের যত্নে, আন্তরিকতায়, ভালোবাসায় ঐ জল সেদিন অমৃত হয়ে উঠেছিল। কে বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কেবল বালক ভাব? কখনও তিনি অবোধ বালক, কখনও পরম প্রাজ্ঞ শাস্ত্রবেত্তা, কখনও রসরাজ। কখনও বা স্নেহময়ী মা -- যে মা সন্তানের দুঃখ ও অদর্শনে কাঁদেন, অভুক্ত অতিথিদের সেবার জন্যে ব্যাকুল হন।

আর সকলের ভালোবাসায় ফাঁক আর ফাঁকি থাকে। নিঃস্বার্থ এবং অহৈতুকী ভালোবাসা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের। গাজীপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন -- 'রামকৃষ্ণের জুড়ি নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহৈতুকী দয়া, সে ইনটেন্স সিমপ্যাথী বদ্ধ জীবনের জন্য -- এ জগতে আর নাই। এত ভালবাসা আমার পিতামাতায়

কখনও বাসে নাই।' ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেলেন তিরিশ বছরের অধর। ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন তাঁকে। মৃত্যু সংবাদ শুনে মায়ের মন্দিরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে লাগলেন -- 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা! আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে!'

দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজ। হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা আর স্বার্থপরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। কে আমাদের অঙ্গারশয্যায় বিছিয়ে দেবে শীতল পদ্মপাতা? রোগে-শোকে-ব্যর্থতায়-অপমানে কে দেবেন দু'দণ্ড শান্তি? অন্ধকার পিচ্ছিল পথে পড়ে যাওয়া অসহায় মানুষ আর কার উদ্দেশে বাড়িয়ে দেবে দুটি বাহু? উত্তর একটাই -- শ্রীরামকৃষ্ণ। 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পবিত্র করুণাধারা — পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী।

শ্রীচরণেষু মাস্টারমশাই

শ্রীচরণেষু মাস্টারমশাই,

পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় আপনি আমাকে আপনার অমরকন্টক যাত্রার সঙ্গী হতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে চিকিৎসকের নির্দেশে আমি এখন শয্যাবন্দী। কি করে আপনার ভ্রমণসঙ্গী হই?

মাস্টারমশাই, বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমার মন কিন্তু আপনাকে অনুসরণ করবে। মুম্বাই মেলে অদৃশ্য ভাবে আমি আপনার পাশটিতে থাকব। বিলাসপুরে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে আপনার সঙ্গে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে পেনড্রা রোড যাব। হোটেলে রাত কাটিয়ে বাসে আপনার পাশে বসে অতিক্রম করব বেয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ। প্রথমে সমতলভূমির ওপর দিয়ে বাসের স্মার্টলি ছুটে চলা, তারপর সাবধানী ভঙ্গীতে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ভাঙতে ভাঙতে বাসের ক্রম উত্তরণ – আপনাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করবে। আবহাওয়ার চরিত্র হঠাৎ বদলে যাবে। আমি ফিসফিস করে আপনাকে বলব – 'মাস্টারমশাই, শালটা জড়িয়ে নিন।' আপনার হাতের কাছেই ব্যাগ। আপনি শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নেবেন। আপনি প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখে অভিভূত হবেন, আর অতলস্পর্শী খাদ দেখে শিউরে উঠবেন। একসময় বাসযাত্রীদের কথাবার্তা থেমে যাবে। সুন্দরের রাজ্যে সবাই অভিসার করছে, বৃথা বাক্যব্যয় এখানে অশোভন।

বাস্ থামবে বিস্তৃত সমতলভূমিতে। মন্থর পদক্ষেপে আপনি এগিয়ে যাবেন। নর্মদা মন্দির এখান থেকে প্রায় দেড় কি মি দূরে। আপনি মন্দিরের কাছেই এক ধর্মশালায় আশ্রয় নেবেন। মনে করবেন আপনার সঙ্গে আমিও আছি।

মাস্টারমশাই, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নর্মদা মন্দিরের সুদৃশ্য প্রবেশদ্বারের সামনে। আপনি সবকিছু খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন। প্রাচীরবেষ্টিত পবিত্র মন্দিরটিকে আপনার মনে হবে ঘনীভূত ভক্তি ও পবিত্রতা। আপনি প্রবেশদ্বার ও ভেতরের চত্বর দেখে পুলকিত হবেন। কি সুন্দর পরিবেশ! আপনার চোখে পড়বে বাঁধানো দুটি পবিত্র

কুণ্ড আর বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট ছোট মন্দির। বড় কুণ্ডটির নাম মার্কণ্ডেয় কুণ্ড আর অন্যটি? যে পবিত্র নদীর উৎস দেখতে আপনার আগমন, সেই নর্মদা কুণ্ড। আপনি এবার তাকাবেন কুণ্ড সংলগ্ন জোড়া মন্দিরের দিকে — একটি মন্দির নর্মদা মাতার, অন্যটি নর্মদেশ্বর মহাদেবের। মন্দিরের সামনে একটি অভিনব মূর্তি দেখে আপনি ভাববেন এটা আবার কি। মূর্তিটি হল — পাথরের ছোট হাতীর ওপর উপবিষ্ট মুণ্ডহীন আরোহীর। ঐ মূর্তি দেখে কিন্তু আপনি বিস্মিত হবেন না। আপনার বিস্ময় জাগবে অন্য দৃশ্য দেখে। আপনি দেখবেন বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা মাটিতে শুয়ে হাতীর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাবার বিচিত্র প্রয়াসে ব্যস্ত। ব্যাপার আর কিছুই নয়। প্রচলিত বিশ্বাস — পাপীরা নয়, পুণ্যবাণরাই এর মধ্যে দিয়ে গলে যেতে পারে। মাস্টারমশাই, আপনি কি ঐ পাপপুণ্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন?

মাস্টারমশাই, আপনি এবার আপনার কাঙ্ক্ষিত নর্মদা কুণ্ডটা চাক্ষুষ করবেন। ঐ কুণ্ড থেকেই নর্মদা নদীর সুদীর্ঘ যাত্রাপথ শুরু। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, নর্মদার প্রকৃত উদ্গম অমরকন্টক থেকে দু কিমি দুরে — মায়ী কী বাগিয়া বা মায়ের বাগান। যা হোক, বড় পবিত্র, বড় ঐতিহ্যমণ্ডিত, বড় হৃদয়স্পর্শী ঐ কুন্ড। আপনি নতমস্তকে করজোড়ে ফিসফিস করে বলবেন — 'নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।/তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ।।' অর্থাৎ নদীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেন নর্মদা যাঁর সৃষ্টি রুদ্রের তেজ থেকে। স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই তিনি ত্রাণ করেন। মাস্টারমশাই, আপনার কি সেই প্রচলিত লোককথাটি মনে পড়বে? 'নর্মদা শিবের কন্যা। শোন -এর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিকঠাক। নর্মদার সাজসজ্জার ভার যার ওপরে, সেই নাপিতকন্যা মুগ্ধ হল শোনের পৌরুষে। নর্মদার রূপ ধরে সে হাজির হল বিয়ের মণ্ডপে। খবর এলো নর্মদার কাছে। মানিনী নর্মদা ঘুরে রইল পশ্চিমে। কপিলমুনি আটকাতে চাইলেন। নর্মদা বাধা মানল না। পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে গেল ভারতের পশ্চিম তটে। যেখানে কপিল বাধা দিলেন, সেখানে কপিলধারা প্রপাত। নর্মদার আছড়ে পড়া আজও বাধাহীন। সে আজও চিরকুমারী। বিয়ে ভেঙে গেল। শোন রইল চিরকুমার, বয়ে গেল উত্তরের পথে (পকেট ভ্রমণ - স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী)।

মাস্টারমশাই, প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীও আপনার অজানা নয়। পুরাণের ধূসর অতীত আপনার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আপনি কবি মানুষ। আপনি কল্পনানেত্রে দেখবেন — দেবাদিদেব মহাদেব অমরকন্টকের চূড়ায় ধ্যানস্থ। অকস্মাৎ তাঁর নীলকণ্ঠ থেকে আবির্ভূতা হলেন এক নারী। আবির্ভূতা হয়েই তিনি মহাদেবের দক্ষিণ চরণের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরই তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইলেন। এইভাবে অতিবাহিত হল অনন্তকাল। একসময় শিবের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি ঐ অনিন্দ্যকান্তি কন্যার রূপলাবন্য দেখে মুগ্ধ হলেন। জটাধারিণী ঐ নারীর ডান হাতের আঙুলে অক্ষমালা, বাঁ হাতে

কমণ্ডলু, যেন জ্যোতির্ময়ী যোগিনী মূর্তি। শিব তাঁকে বর দিতে চাইলে তপস্বিনী বলেন যে তিনি মহাদেবের সঙ্গে শাশ্বতকাল নিত্যযুক্তা হয়ে থাকতে চান। দেবাদিদেব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললেন -- তুমি হবে ' মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কাং'।

অমরকন্টক পর্বতে আবার তপস্যায় ব্রতী হলেন ঐ নারী। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে দেখতে এলেন। এলেন, দেখলেন এবং মোহিত হলেন। কিন্তু জয় করতে পারলেন না। তাঁরা ঐ নারীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। তবু ধরা দিলেন না তেজস্বিনী যোগিনী। ব্যর্থ হয়ে দেবতাদের জেদ বেড়ে গেল। তাঁরা শক্তির সাহায্যে ঐ নারীকে লাভ করতে চাইলেন। তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তাপসী নদী রূপ ধারণ করলেন। দেবতাদের কাছে তিনি অপ্রাপনীয়া হয়ে রইলেন।

সর্বজ্ঞ শিব ধ্যানযোগে সবকিছু জেনেছিলেন। তিনি ঐ তাপসীর কাছে এসে বললেন -- তুমি হও আমার আনন্দ বিলাসের ক্ষেত্র। আজ থেকে তোমার নাম হল নর্মদা। তুমি 'জলময়ী শিবা', আমি তোমার জলে শিবলিঙ্গরূপে চিরকাল ভেসে বেড়াব।

মাস্টারমশাই, ধূসর পুরাণের রাজ্য থেকে আপনি এবার নেমে আসবেন বর্তমানের অমরকন্টকে। আপনি এবার দেখবেন গোমুখ নালা। যার মধ্যে দিয়ে নর্মদা এসে পড়েছে কোটিতীর্থে। কোটিতীর্থের ধর্মীয় তাৎপর্য অপরিসীম। যাঁরা দুরূহ নর্মদা পরিক্রমা করবেন, তাঁদের আসতেই হবে এই তীর্থে। এর জলেই তাঁদের সংকল্প করতে হবে। পরম পবিত্র এই জল। আপনি হয়ত মনে মনে 'জয় মা নর্মদে' বলে ঐ জল স্পর্শ করবেন। আপনি সাবিত্রী কুণ্ডু ও গায়ত্রী কুণ্ড দুটি দেখতে ভুলবেন না যেন।

মাস্টারমশাই, নর্মদা মন্দির চত্বর এবার আপনি পেরিয়ে গিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন পাতালেশ্বর শিবমন্দির দেখবেন। সিঁড়ি দিয়ে আপনি ধীর পদক্ষেপে কিছুটা নীচে নামবেন। দেখবেন এক গহ্বরের মধ্যে মহাদেবের মূর্তি স্বমহিমায় বিরাজমান। নর্মদা কুণ্ডের সঙ্গে এই গহ্বরের যোগাযোগ থাকায় স্থানটি প্রায়ই জলময় হয়ে যায়। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি চোখ বুজে নিঃশব্দে শিব বন্দনা করছেন।

মাস্টারমশাই, এবার আপনাকে একটা অটো বা টাঙা ভাড়া করে ঘুরতে হবে। আপনি একে একে দেখবেন মায়ী কী বাগিয়া বা মায়ের বাগান, শোন মুড়া, কবীর চবুতরা, কপিলধারা, দুগ্ধধারা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। শোন নদীর উদ্‌গম কেন্দ্র শোনমুড়া যেন প্রাণচঞ্চল হনুমানের অবাধ বিচরণভূমি। মাস্টারমশাই, ভয় পাবেন না। ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আপনি দেখবেন কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে ঝরে যাচ্ছে ক্ষীণ জলধারা যা জমা হচ্ছে এক বাঁধানো চৌবাচ্ছায়। এটাই হল শোন নদীর উৎস। এরপর 'মায়ী কী বাগিয়া'। এখানকার কোনো সাধুর সঙ্গে হয়তো আপনি গল্পগুজব করবেন। তিনি স্থান মাহাত্ম্য সম্পর্কে হয়তো অনেক কথা আপনাকে

জানাবেন। আপনি গুলবকাওলী ফুলের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন, কেননা ঐ ফুল থেকে চোখের রোগের ওযুধ তৈরী হয়।

মাস্টারমশাই, এবারে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে প্রায় সাত কিমি পথ। আপনার গন্তব্যস্থল কপিলধারা। এটি একটি অপূর্ব জলপ্রপাত। আপনি কথা খুঁজে পাবেন না, নীরবে দাঁড়িয়ে আপনি শুনে যাবেন প্রপাতের অবিশ্রাম গর্জন। পাশেই রয়েছে কপিল মুনির নামাঙ্কিত আশ্রম। এরপর এক কিমি বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে আপনাকে দর্শন করতে হবে পাহাড় অরণ্য জলপ্রপাত পরিবেষ্টিত একটি অপূর্ব স্থান -- দুগ্ধধারা। বড় বড় পাথরের নিষেধ অগ্রাহ্য করতে করতে নর্মদার দুধের মতো সাদা জল ছুটে চলেছে। এখানে একটি গুহা আছে। শোনা যায় মহর্ষি দুর্বাসা ওখানে তপস্যা করেছিলেন।

মাস্টারমশাই, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ঘুরলাম। এবার আপনাকে রেখে আমি বিদায় নেব। আপনার কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আপনি দারুণ খুশী। ওঁরা আপনাকে যেতে দেবেন না। আপনি এখন ওঁদের বাহুপাশে বন্দী। মানস পরিভ্রমণ শেষে আমিও ফিরে এসেছি আমার ঘরে।

আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি।

আলোর পানে প্রাণের চলা

আজকে নয়, সে আজকে নয়। সে ডাক যে অনেক দিনের। সে ডাক শুনেছি সোনা রোদঝরা প্রভাতে। কিন্তু অধীর হইনি। যৌবনে হাসি-গান-আনন্দে যখন মত্ত, শুনেছি তখনও। কিন্তু প্রবেশ করেনি মরমে। দুঃখ বিরহ নিরানন্দে যখন কাতর, শুনেছি সে সময়েও।কিন্তু উৎকর্ণ হয়নি। জীবন থেকে সোনার আলো আজ অপহৃত, ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে অপরাহ্ণের ম্লানিমা। আজও আমি শুনে যাচ্ছি সেই বংশীধ্বনি, সেই আশ্চর্য অমোঘ মন্ত্র 'চরৈবেতি চরৈবেতি'। আমার তনু মন প্রাণ এখন মৌসুমী সমুদ্র। আমি যাবো, এবার যেতেই হবে আমাকে। যাবার বেলায় স্মৃতি যেন পিছু না ডাকে। নদী যেন আমার ক্লান্ত চরণে পরিয়ে না দেয় তার অকারণ অবারণ চলার নূপুর।

'যাবার সময় হল বিহঙ্গের'। বাঁশী বেজেই চলেছে -- সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের সুর লহরী। যাবার সময় পাথেয় নেব না কিছুই। অনেক দিনের সযত্ন সঞ্চিত তুচ্ছ বস্তু রুদ্ধ ঘরের অন্ধকার কোনে পড়ে থাকবে -- কয়েকটি কড়ি, কিছু কামনা বাসনা কীট, কিছু সাধ আর স্বপ্ন। সঞ্চয় নয়, আবর্জনা। সার নয়, অসার।

গৃহবন্দি ছিলাম বহুদিন, তাই বুঝিনি চলার মাধুর্য। অচলায়তনে বদ্ধ ছিলাম দীর্ঘকাল, তাই খুঁজিনি আলোর ঠিকানা, অসীম নীল আকাশের হাতছানি। সঞ্চয়ী ছিলাম বহুযুগ, তাই উপলব্ধি করিনি রিক্ততার আনন্দ, ত্যাগের মাধুর্য। জীবন বাসরের বাসি ফুলের মালা দুপায়ে দলিত মথিত করে আমি যাত্রা করবো। ফাল্গুনের গানে, যৌবনের মধুবনে আর ফিরে যেতে চাইবে না আমার ক্লান্ত প্রাণ। বাসনার অরণ্যে আর নীড় খুঁজে নেবে না আমার অতৃপ্ত মন। রিক্ত হাতে, শূন্য হৃদয়ে পরাণ সখার অন্বেষণে আমার এই নীরব অভিসার।

সবারই শেষ আছে -- অশেষ কেবল আলোর পানে প্রাণের চলা। ফিকে হতে হতে বিবর্ণ হয়ে যায় ভালোলাগা - রামধনু। রূপ-রঙ-রস অটুট থাকে কেবল নিবাত নিষ্কম্প প্রত্যয় শিখার -- 'অন্ধকার থেকে আমায় নিয়ে চলো আলোয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে -- এক আনন্দময় রূপান্তরের দিকে।

কিন্তু চলতে চলতে এক সময়ে আমাকে থামতেই হবে। রাতের আকাশে জ্বলবে হাজার তারার জোনাকি। আমি শুধু খুঁজে নেব একটিকে। তার নাম স্বাতী নক্ষত্র। আকাশের কোলে খেলবে হাজার মেঘের শিশু। আমি শুধু বেছে নেব একটিকে। তার নাম জলদ মেঘ। কুলহীন সমুদ্র থেকে ভেসে উঠবে শুক্তি, অন্তরে তার নীরব আর্তি -- শুধু দাও একবিন্দু বৃষ্টির জল। জলের ওপর ভাসমান, তবু চাই একটি স্বচ্ছ নিটোল বৃষ্টিবিন্দু যা গ্রহণ করে শুক্তি তলিয়ে যাবে সমুদ্রের স্তব্ধ অতল নিস্তরঙ্গ গর্ভে। মুক্তো তৈরীর কঠোর সাধনায় হবে একাগ্রচিত্ত।

স্বাতী নক্ষত্র – অমোঘ নির্দেশ। বৃষ্টিবিন্দু পরমতমের অমৃতবাণী। সমুদ্র -- কোলাহলের হলাহলের পৃথিবী। শুক্তি -- আমার ব্যাকুল মন, তৃষিত হৃদয়। মুক্তো -- সব পেয়েছির দেশের চাবিকাঠি।

কিন্তু কোথায় স্বাতী নক্ষত্র? বৃষ্টিগর্ভ সজল কালো জলদ মেঘ? উত্তর শুনি প্রাণের গভীরে, মনের গহনে -- এগিয়ে চলো, চলো। .... যে চলে দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে, তার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্তপথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে। .... অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

অকাজের বোঝা নামিয়ে রেখে এবার আমায় এগিয়ে যেতে হবে। যে বাঁশীর সুর শুনেছি, অন্তর থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা আমার অচলায়তনকে ভেঙে দিচ্ছে। এবার তাই আলোর পানে শুরু হোক প্রাণের চলা।

মহাশিল্পীর তুলিতে পৌরাণিক জগৎ

মহা শিল্পী নন্দলাল বসুকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন –

'চিরসুন্দরে কর গো তোমার
রেখা বন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী!'

রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন তাই-ই হয়েছিলেন নন্দলাল। তাঁর তুলিতে চিরসুন্দরেরই অপরূপ রূপ উদ্‌ঘাটিত। মহাদেবের জটার মতোই তাঁর তুলি হয়েছিল চিররস-নিষ্যন্দী। বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পজগতে আচার্য নন্দলাল বসু অনন্য স্বকীয়তায় ভাস্বর। ১৮৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর খড়গপুরে যে শিশুটি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন, পরবর্তীকালে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি সর্বত্র বন্দিত হন। ছাত্র জীবনেই এই শিল্প প্রতিভার উন্মেষ, পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং বনস্পতি প্রতিম কবিগুরুর স্নেহছায়ায় শান্তিনিকেতনে এই প্রতিভার সার্বিক বিকাশ। বীজের মহীরুহে রূপান্তর। আর এই রং তুলির 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্র ধনুচ্ছটা'র অন্যতম প্রধান নেপথ্য শক্তি ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব।

ভারতের সনাতন ধর্মগ্রন্থগুলি শিল্পসাহিত্যের এক মহাসমুদ্র। ধর্ম সাধকরা এই চিরকালের গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন অভ্রান্ত পথনির্দেশ, কবিশিল্পীরা এই পবিত্র সাগরে অবগাহন করে লাভ করেছেন বিস্ময়কর রস সম্পদ। নন্দলালের যখন যৌবনোন্মেষ, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃতলোকে। কিন্তু ঐ অবতারকল্প মহাপুরুষের চিন্তাধারা সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখনও মহান কর্মযোগে আর মানুষ গড়ার অঙ্গীকারে নিবেদিতপ্রাণ। ১৯০২ সালে স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পর ঐ বীর সন্ন্যাসীর পথনির্দেশ ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মধারা 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' ভারতীয় জনগণকে আত্মানুসন্ধানের পথ দেখাল। তরুণ নন্দলাল এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় শাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ নয়, স্বদেশের মধ্যেই রয়েছে শিল্প সৃষ্টির অজস্র উপকরণ। দেশের সহজ-সরল সাধারণ

মানুষ, নিসর্গ প্রকৃতি আর পুরাণের দেবদেবী ও ঘটনাবলী পরাধীন দেশের আত্মবিস্মৃত মানুষের কাছে রং তুলির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করারই আর এক নাম দেশপ্রেম। শিল্পীকে এই কাজে যাঁরা সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ আর লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার কাছে ভারত ছিল 'দ্বিতীয় স্বদেশ'। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মতো শিল্পবোদ্ধা বিরল। নন্দলাল যখন সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র, তখন একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতা এলেন স্কুল দেখতে। নন্দলাল তখন দুটি ছবি আঁকছিলেন। একটি মা কালীর, অন্যটি সত্যভামার মানভঞ্জন। নন্দলাল লেখেন -- "নিবেদিতা কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।" নিবেদিতার অনুরোধে নন্দলাল স্বামীজিরও ছবি আঁকেন (সে ছবি কোথায়?)। নিবেদিতা প্রশংসা করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভুললেন না -- 'ছবিতে কাপড় চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।' আর একবার তিনি নন্দলালের একটি পৌরাণিক চিত্রের ভুল ধরে শিল্পীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছিলেন নন্দলাল। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করলেন, -- 'কার ছবি আঁকছো?' নন্দলালের উত্তর -- 'কেন রাধাকৃষ্ণের!' নিবেদিতা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন ঐ চিত্রে ঢলঢল যৌবনরস টলমল করছে -- যেন পার্থিব কোনো নায়ক-নায়িকার ছবি। ঐ ছবিতে কোথায় সেই স্বর্গীয় সুষমা, অপার্থিব মহিমা আর দিব্য আভা? একটু হেসে বললেন -- 'পঞ্চাশ না পেরিয়ে আর রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকবেন না।' যৌবনের রক্তরাগ যখন ফিকে হয়ে যাবে, থিতিয়ে যাবে বাসনা কামনার ঘোলা জল -- তখনই রাধাকৃষ্ণের চিত্রাংকণে আসবে অপার্থিব জ্যোতি -- অধরা সৌন্দর্য্য -- অনুপম কান্তি। নন্দলাল নিবেদিতার উপদেশ উপেক্ষা করেন নি।

নন্দলালের যে সমস্ত পৌরাণিক চিত্র অমরতা লাভ করেছে, সেগুলি হল -- কৈকেয়ী ও মন্থরা, অহল্যার পাষাণমুক্তি, শিবের ধ্বংসনৃত্য, শিবের বিষপান, পার্বতীর শোক, বর্ষফল কখন, মদনভস্মের চিত্র, উমা-মহেশ্বর, জতুগৃহ দাহ, শিবসতীর অংশ, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান, পাণ্ডব বিষাদ, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন, কৃষ্ণ সুদামা, কৈকেয়ী, সাবিত্রী-যম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গান্ধারী, যম-নচিকেতা, বাউল, একলব্যের গুরুদক্ষিণা, অন্নপূর্ণা, কাশীর ঘাট প্রভৃতি। কোনো কোনো কলা-সমালোচকের মতে শিবলীলার চিত্রায়ণই নন্দলালের সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টি। অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন -- "শৈবপুরাণের চিত্রায়ণে নন্দলাল যে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।.... তাঁহার শিব চরিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য -- 'শিবের ধ্বংস নৃত্য,' 'পার্বতীর শোক'। পার্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া শিবের যুগযুগ ব্যাপী

ধ্যানে মগ্ন শোকের চিত্র -- শিবের এই মুখের কল্পনা নন্দলালের উচ্চ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পথ। শিবচিত্রে এইরূপ মহান কল্পনা ইতিপূর্বে কোনো শিল্পী সার্থক করিতে পারেন নাই।" শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীর আর একটি চিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ সমালোচনা করেছেন। তা হল 'কুমার সম্ভবে' বর্ণিত মদনভস্মের উপাখ্যান। মদনভস্ম ক'রে পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান করে শিব প্রস্থান করেছেন। "শিল্পী শিবের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার দ্রুত গমনের সময় তাঁর রুদ্রাক্ষ মালার হাত হইতে পতনে।... লজ্জায় ক্ষোভে অভিমানে পার্বতী পিষ্ট পল্লবের মতো ভাঙিয়া পড়িলেন সখীর হাতের উপর। এইরূপ মর্মভেদী করুণ চিত্র বাংলার আর কোনো শিল্পী এইরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।"

শিব চিত্রাংকনে নন্দলাল আর একটি কারণে স্মরণীয়। বাংলার পটশিল্পে এবং অন্যত্র ইতিপূর্বে যে শিবমূর্তি আমরা দেখেছি তা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। তা যেন দেবাদিদেবের ব্যঙ্গচিত্র। নন্দলাল "সেই দুষ্ট পন্থা বর্জন করিয়া এক কমনীয় কান্তি, শ্মশ্রুহীন, চিরকুমার, অনন্তযৌবন অতিমানুষের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা মধ্যযুগের শিবমুর্তির কল্পনাকে নূতন মর্যাদা ও পরিণতি দান করিয়াছে" (অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

মহান শিল্পী আর মহান সাধক বোধহয় সম গোত্রীয়। ধ্যানতন্ময়তা ছাড়া কি পুরাণের ধূসর চরিত্র পূর্ণ গরিমায় শিল্পীর তুলিতে নবজীবন প্রাপ্ত হয়? উদ্‌ঘাটন করা যায় পাণ্ডবদের বিষাদ খিন্ন রূপ কিংবা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের গভীর অর্থবহ রূপরেখা? শিবসতীর অংশ চিত্রে যে অনাবশ্যক বর্ণবহুল ও আলোছায়ার লীলামাধুরী, স্বর্গীয় মহিমা ও বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা - আত্ম সমাহিত না হলে, মনের গভীরে ভক্তির প্রসন্ন শিখাটি জ্বলে না উঠলে তা কি কোনো শিল্পীর পক্ষে আঁকা সম্ভব হতো? রূপসাগরে ডুব না দিয়ে কেউ কখনো কি পেয়েছেন অরূপ রতন?

নন্দলালের প্রতিটি পৌরাণিক চিত্র যে চিরকালের চিত্র হয়ে উঠেছে, তার মূলে কেবল ঐ মহাশিল্পীর অংকণ-নৈপুণ্য নেই -- আছে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তরিক সহমর্মিতা, অথচ গভীর সাধনা আর ধ্যান নিবিষ্টতা।

(মহান শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে লিখিত)

সুখের উৎস সন্ধানে

দীর্ঘজীবী দুঃখের একটি গর্বিত যাযাবর ভাই আছে। তার নাম সুখ। এই যাযাবর ভাইটির চাহিদা প্রচণ্ড। অনাদিকাল থেকে সকলেই তাকে চাইছে। কিন্তু সে যেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মতো সোনার রঙের দিগন্তরেখা -- ধরা দিয়েই আছে, তবু ধরা দিতে চায়না। ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সুখের দাদা দুঃখের অনাহূত উপস্থিতি এবং সুদীর্ঘকাল স্থিতি। কিন্তু সুখের বড় দেমাক, বড় অহংকারী সে। ডাকলে আসে না। কাঁদো, প্রার্থনা করো, চিৎকার করো, মিনতি করো -- সুখের হৃদয় গলবে না। কখনো কখনো অবশ্য সে আসে। কিন্তু এলেও থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। সর্বদাই তার পালাই পালাই ভাব। সংসারে তার আগমন যেন হরিণের শিঙে মাছি বসার মতোই ক্ষণস্থায়ী। কোথাও নেই তার স্থায়ী ঠিকানা। সে যাযাবর, চঞ্চল, অস্থির, ক্ষণিকের অতিথি।

কান্নার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব। সুখ আর আনন্দে ভরে ওঠে সংসার। কিন্তু এই সুখ বারবার হয়ে ওঠে বিপন্ন -- কখনো রোগ-শোক-যন্ত্রণায়, কখনো দারিদ্র্যে, কখনো বা প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ায় বা স্বপ্নভঙ্গে। মানব মন হতাশায় বলে ওঠে -- 'ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আসে না (রবীন্দ্রনাথ) অথবা 'সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান' (ঐ)।

সংসারে নরনারীর প্রেম-ভালোবাসা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু প্রেমের সুখ ক্ষণস্থায়ী। কবি গেয়েছেন -- 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন /তবে কেন মিছে ভালোবাসা।' কিন্তু প্রেম কি কেবল ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে? কবির সুরে বলা যায় 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না/শুধু সুখ চলে যায়।' মায়ার ছলনা বুঝি এরকমই! কবি-দার্শনিক হয়তো পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করবেন -- 'শিখাও প্রেমের শিক্ষা' কিন্তু কোন্ প্রেম? মহাকবির মহামন্ত্র --'যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন হয়না প্রভু/ যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার'। কিন্তু এমন মানসিকতা আর ক'জনের? সাধারণ মানুষ সুখের জন্যে ভালোবাসে, ভালোবেসে সুখ চায়। কিন্তু পায় ক'জন? কবির ভাষায়, 'জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা।' কবি জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা

তাই আক্ষেপ ক'রে বলেছেন -- 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিতায় নিঃসঙ্গ সুখকে প্রশ্ন করেছিলেন --'সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?/সুখ কার করিস রে আশা?' সুখ কেঁদে কেঁদে উত্তর দিয়েছিল 'ভালোবাসা, ভালোবাসা'। যেখানে সুখ, সেখানে ভালোবাসা বিরল। যেখানে ভালোবাসা, সেখানে সুখ দুর্লক্ষ্য।

প্রশ্ন হতে পারে -- তাহলে কি মিলনেও সুখ নেই? আছে। কিন্তু তা বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা দানের মতোই। তা যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠা রংমশাল, সৈকতভূমিতে হঠাৎ আছড়ে পড়া ফেনশীর্ষ তরঙ্গ! মিলনজনিত সুখ মানুষকে কখনো কখনো ক্লান্ত করে, পীড়া দেয়। সুখশ্রান্ত প্রেমিক আক্ষেপ করে -- 'ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে / কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়/পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে' (রবীন্দ্রনাথ)।

প্রেমের মতো ধর্মও মানবজীবনে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো সহজাত। কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবনে সুখের কোনো স্থান নেই। যাঁরা যোগী বা সাধক তাঁদের তো 'সকল সুখে আগুন' জ্বালাতেই হবে। না হলে মিলবে না প্রার্থিত ও বাঞ্ছিত সিদ্ধি, মিলবে না ঊর্ধ্বের আলোকবর্ষণ। সুখের মাঝে হয়তো দৈবাৎ পরম দেবতার দেখা মেলে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাঁকে সমস্ত অন্তর জুড়ে পাওয়া যায় না। তাই বুঝি সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন -- 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি/ দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।' সাধক চান বিশুদ্ধ আনন্দ, সুখ নয়। আনন্দের সঙ্গে আবার সুখের বনিবনা হয় না, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায়, 'সুখেতে আসক্তি যার/ আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।' তাই সুখ নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ; আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়, পরম পিতার স্নেহভরা কোলই সাধকের অভীষ্ট -- 'সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে/যাক না গো সুখ জ্বলে' (রবীন্দ্রনাথ)। মানুষ যখন জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত হয় না, তখন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সুখকে আনন্দ ভেবে তার নেশায় মেতে থাকে। অবশেষে একদিন যখন সে অবিদ্যামুক্ত হয়, তার হৃদয় নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটে, তখন কবির সুরে সে সত্যোচ্চারণ করে -- 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ/সুখের খেলায় বেলা গেছে/পাইনি তো আনন্দ।'

সাধারণ মানুষ সুখ-ভিক্ষু। অশান্ত, অতৃপ্ত, বিভ্রান্ত কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে সুখের ঠিকানা। কিন্তু সুখ প্রতিবন্ধী, বধির। তাই কারুর ডাক তার কানে পৌঁছয় না।

তাহলে সত্যিই কি সুখ অপ্রাপ্য? উত্তর দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি -- 'ভূমৈব সুখমস্তি।' আর কিছুতে নয়, একমাত্র ভূমাতেই সুখ। ভূমানন্দ লাভই তাই মানুষের স্থায়ী সুখের একমাত্র লক্ষ্য।

মহাভাগবত বিদুর

মহাভারত যেন এক বিশাল জনসমুদ্র! কত বিচিত্র চরিত্রের এখানে সমাবেশ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালার এক অবিস্মরণীয় চরিত্র মহাভাগবত বিদুর।

মহাভারতের কৃষ্ণ আমাদের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত। তাঁর কত রূপ, কত লীলাবৈচিত্র্য। তিনি অর্জুনের সখা হলেও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু বিদুরকে আমাদের কাছের মানুষ, মনের মানুষ বলে চিনে নিতে ভুল হয় না।

জন্ম মুহূর্ত থেকেই মহামতি বিদুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেননা রাজসিক আভিজাত্যের শিরোপা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হননি। তিনি শূদ্রাণী দাসীর গর্ভজাত, তাই সিংহাসন লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। ধৃতরাষ্ট্রও সিংহাসন পান নি, কিন্তু তার কারণ তাঁর জন্মান্ধতা। রাজা হলেন পাণ্ডু।

বিদুর রাজা হননি, কিন্তু তিনি ছিলেন মুর্তিমান ধর্ম। মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বিদুররূপে আবির্ভূত হন — 'ধর্ম্মো বিদুররূপেন শূদ্রযোনাবজায়ত।' তাঁর পিতা মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের জন্মক্ষণে বিদুরের মাকে বলেছিলেন যে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিদুর অবতীর্ণ হচ্ছেন। 'ধর্ম্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ' — ধর্মাত্মা এবং বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ হিসাবে পৃথিবীতে তিনি বন্দিত হবেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেন — 'প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা — স্বয়ং শুক্রাচার্যের মতোই তোমার প্রজ্ঞা শুদ্ধা। কৃষ্ণের সামনে কুন্তী তাঁর সম্বন্ধে ভারী সুন্দর মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন যে যদিও বিদুর দাসী পুত্র, তবু তিনি ভারত বংশের একমাত্র পূজ্য ব্যক্তি।

বিদুর শব্দের উৎপত্তি 'বিদ্' ধাতু থেকে। 'বিদ্' অর্থ জানা। বিদুর ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী। 'সর্ব্বত্র বিহিতো ধর্মঃ' — এই মন্ত্র যাঁর সহজ সরল জীবনে মূর্ত, তাঁকে জ্ঞানী ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? এহেন জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মার শূদ্র জন্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী বলেন — 'ঋষি কবি দেখাতে চেয়েছেন যে স্বয়ং ধর্ম লোকশিক্ষার জন্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে মানুষ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও ধর্ম্মাচরণ করতে পারে।'

শুধু ধর্মাচরণ করা নয়, ধর্ম্মের বাণী শোনানোও নয় — ধর্ম্মকে চোখের মণির মতো রক্ষা করাই ছিল তাঁর অভিষ্ট। তাই বার বার তিনি দুর্যোধনকে ধিক্কার দিয়েছেন, সদুপদেশ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঘুমন্ত বিবেক জাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ, দোদুল্যমান চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের কোনো উপদেশই গ্রহণ করেননি। বিদুরের উপদেশ মতো ধৃতরাষ্ট্র যদি দুর্যোধনকে ত্যাগ করতেন, স্নেহ এবং ন্যায়বিচার দিয়ে পাণ্ডবদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন, বন্ধ করতেন কপট দ্যূতক্রীড়া, ব্যর্থ করে দিতেন জতুগৃহদাহের হীন প্রচেষ্টা — তাহলে হয়তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই হত না, আর অন্যভাবে রচিত হত মহাভারত!

ধর্মের সার তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হয়েছে বিদুরের মুখে। কুলরক্ষার জন্য একজনকে পরিত্যাগ করবে। গ্রাম রক্ষার জন্য কুল পরিত্যাগ করবে। জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করবে এবং আত্মরক্ষার জন্য পরিত্যাগ করবে, সমস্ত পৃথিবী। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এই উপদেশ তো প্রবাদবাক্যে পরিণত! বিদুরের ধর্ম্মোপদেশে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান বা যাগ যজ্ঞের কথা নেই, তাই সহজেই সর্ব্বতোভাবে আচরণীয়। 'উদ্যোগ পর্বে' তাঁর অপূর্ব উপদেশামৃত মহাভারতের এক অমূল্য সম্পদ। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বিদুর প্রসঙ্গ। মহামুনি মৈত্রেয়-বিদুর কথোপকথন ভাগবতের এক শাশ্বত সম্পদ। মৈত্রেয়-মুখে ঐ ভাগবত আলোচনা শুনে অভিভূত বিদুর বলেন — করুণাত্মা, আপনি আজ আমাকে অজ্ঞানের পরপার ও অকিঞ্চন ভক্তজনের দর্শনীয় জনার্দন হরিকে দর্শন করালেন।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন জেনে ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবকে 'ঘুষ' দিতে চাইলেন। বিদুরকে বললেন — বিদুর, কৃষ্ণ আসছেন। তাঁকে যদি আমি প্রচুর ধনরত্ন, দাসদাসী দিই আর তাঁর আতিথ্যের দারুন ব্যবস্থা করি, তাহলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের কথা শুনবেন, নয় কি? স্থিতপ্রজ্ঞ বিদুর হেসে বললেন — 'উপকরণ দিয়ে আপনি কৃষ্ণকে বশীভূত করতে চান? কৃষ্ণ মঙ্গল-কলস, পাদ্য ও কুশল প্রশ্ন ছাড়া আপনাদের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করেন না।' তাই দেখা যায় দুর্যোধনের রাজোচিত নিমন্ত্রণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ মহাজনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণ বিদুরের বাড়িতে গিয়ে পরমানন্দে অন্নগ্রহণ করলেন। কেননা বিদুর শুদ্ধাচারী, নিষ্কাম, ধর্ম্মাত্মা। তাঁর প্রদত্ত অন্ন আন্তরিক, পবিত্র ও শুচিস্নিগ্ধ।

যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও ধ্বংস যে অনিবার্য — দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিসত্তম বিদুর তা বুঝতে পেরেছিলেন। কেউ তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন নি। দোদুল্যচিত্ত পুত্রান্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর মূঢ়মতি দুর্যোধন মহাসর্বনাশ ডেকে আনলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হচ্ছে আঠার দিন ধরে, অথচ ঐ সময়ে বিদুর অনুপস্থিত। কোনো মধুর বাক্য, কোনো

ধর্ম্মোপদেশ, কোনো সঠিক পথনির্দেশের কথা তিনি বলেন নি। ধর্ম্ম যেখানে পরাভূত সেখানে বিদুর নেই। ন্যায়-নীতি-বিবেক যেখানে বিসর্জিত সেখানে বিদুর-মূর্ত্তি অন্তর্হিত। কে শুনবে সত্য-প্রেম-কল্যাণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি? ধৃতরাষ্ট্র? দুর্যোধন? দুঃশাসন?

যুদ্ধ শেষ হলো। আবার দেখা গেল বিদুরকে। সেই সৌম্য সহাস মূর্তি, মুখে ধর্ম্মোপদেশ। ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে পনের বছর রাজ্য পরিচালনা করেন পাণ্ডবরা। ঐ সময় বিদুর গ্রহণ করেছিলেন এক অসাধারণ ভূমিকা। রাজকার্য পরিচালনায় ধর্ম্মাত্মার উপদেশ নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ সকলেই অনুমোদন করতেন। কিন্তু বিদুরকে চলে যেতে হল ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনবাসে। সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মেছে ধৃতরাষ্ট্রের। দুর্বিষহ শোক তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ভীমের বাক্যবাণ যে অসহ্য!

বনবাসে বিদুর মহাতপস্বী -- নির্ব্বাক, মগ্নমৌন, সংযত, সত্যে স্থিত। যুধিষ্ঠির দেখা করতে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশ্ন করলেন -- 'মহাত্মা বিদুর কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন -- 'বৎস, তোমাদের পিতৃব্য অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্মাবশিষ্ট হয়ে ঘোরতর তপস্যা করছেন'। যিনি মূর্তিমান ধর্ম, শুদ্ধাচারী, অপাপবিদ্ধ, শ্রেয় লাভের জন্য তাঁকেও কঠোর সাধনা, বিরল কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল -- মহাকাব্যের ঋষি-কবি লোকশিক্ষার জন্য এটাই দেখাতে চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির বিদুরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। গভীর বনে তাঁর সাক্ষাৎও পেলেন। ব্যাকুল যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন -- 'আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আমাকে চিনতে পারছেন?' বিদুর স্থির! যেন এক নিবাত নিষ্কম্প প্রসন্ন দীপশিখা।! বৃক্ষ অবলম্বন করে তিনি দণ্ডায়মান, শরীর নিশ্চেতন। তাঁর আত্মা প্রবেশ করেছে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। যেন এই ক্ষণটুকুর জন্যই মহাতপস্বী বিদুর প্রতীক্ষা করছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পরে বলেন -- 'বিদুর সত্য, শান্তি, অহিংসা, দান ও দমদ্বারা বিখ্যাত হয়েছেন। ঐ অসাধারণ ধী-সম্পন্ন মহাত্মা ধর্ম যোগবলে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেছেন। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, পৃথিবীর মতো ধর্মও ইহলোক-পরলোকে বিদ্যমান। তিনি এই চরাচর বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত। যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর এবং যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।'

ধর্মের মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না। তিনি অজর, অমর, শাশ্বত। শোকার্ত যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তাই শোনা গেল দৈববাণী -- 'মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম লাভ করেছেন। আপনি তাঁর দেহ দগ্ধ করবেন না। তিনি সান্তানিক নামক লোক সমুদয় লাভ করেছেন। তাঁর জন্য শোক করা অনুচিত।'

বিদুর দাসীপুত্র, কিন্তু অনেক মহারাজপুত্র তাঁর পাদনখকণার যোগ্য নন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন মহাভাগবত।

অথ রাম সীতা কথন

ত্রিলোকদর্শী নারদের ভাষায় -- গাম্ভীর্যে যিনি সাগরপ্রতিম, ধৈর্যে হিমাচল, বলবীর্যে বিষ্ণু, সৌন্দর্যে চন্দ্র, ক্ষমায় ধরিত্রী এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম -- তিনি রামায়ণের অবিস্মরণীয় নায়ক রামচন্দ্র। আর তাঁর সীতা? যাঁর সম্বন্ধে অত্রি মুনির সহধর্মিনী অনসূয়া বলেছিলেন -- 'হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়'(কৃত্তিবাস)। অশেষ গুণবতী ছিলেন ঐ মহীয়সী নারী। অনেকের ধারণা নারী সমাজের আদর্শ ঐ সীতার জীবন "ঘনীভূত অশ্রুর মুক্তমালা।' তিনি 'জনম দুঃখিনী' ছিলেন, এ রকম ধারণাও বহু ব্যক্তির। কিন্তু বর্তমান লেখক মনে করেন সীতার চেয়ে রামের দুঃখই ছিল বেশী।

'কর্মভূমিম্ ইমাম্ প্রাপ্য কর্তব্যম্ কর্ম যৎ শুভম্' অর্থাৎ 'এই কর্মভূমি আমি পেয়েছি, এখানে শুভ কর্ম করাই আমাদের কর্তব্য' -- রামচন্দ্র শুভ কর্মের মাধ্যমে তাঁর এই উক্তিকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু এহেন মহাপুরুষের জীবনের বহু বছর কেটেছিল দুঃসহ দুঃখের মধ্যে। তাঁর শোক, বেদনা ও যন্ত্রণা ছিল সীতার চেয়ে অনেক বেশী।

বনবাসের কষ্ট সীতাকে সহ্য করতে হয়েছে। রাবণ তাঁকে হরণ করেছে। তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে অগ্নি পরীক্ষায়। রাম তাঁকে পাঠিয়েছেন বাল্মীকি আশ্রমে, তারপর তিনি প্রবেশ করেছেন পাতালে। এসব ঘটনা সত্যিই বড় মর্মস্পর্শী। কিন্তু সীতার জীবনের আর একটি অধ্যায় আছে যা সুন্দর ও মধুর। সে অধ্যায় সতীনারীর অশ্রুজলে সিক্ত হয়নি। বিবাহের আগে জনক রাজার গৃহে সীতা সুখেই ছিলেন। বিবাহ হলো পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামের সঙ্গে। রামের মতো স্বামী পেলেন। তাঁর আর দুঃখ কিসে? আদর্শ স্বামী পাওয়া না গেলে যে কোন সতী নারীর জীবনই ব্যর্থ হয়ে যায়। সীতার স্বামীভাগ্য ঈর্ষনীয়। বিবাহের পর বারো বছর রাম ও সীতা পরম সুখে কাটান। রাম ছিলেন সীতাগতপ্রাণ এবং সীতাও 'একক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয়ে হইতে বহিষ্কৃত

করিতেন না।' তাহলে সীতা যে 'জনম দুখিনী' ছিলেন না তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিবাহের বারো বছর পর্যন্ত রাম সীতা দুজনের জীবনই ছিল আনন্দে পূর্ণ।

তারপরই আসে বনবাসের পালা। রামের সঙ্গে সীতা যদি বনবাসে না যেতেন, তাহলে সীতার জীবন রাম-বিরহে বিবর্ণ হয়ে উঠতো। দীর্ঘকাল তাঁকে অতিবাহিত করতে হত প্রিয়সঙ্গহীন নিঃসঙ্গ জীবন। কিন্তু তা হয়নি। সীতা স্বেচ্ছায় বনবাসে যেতে চেয়েছেন। বনবাসের জীবনে রাজসুখ ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল।

সীতার জীবনের প্রথম দুঃখ -- রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ। অশোক-কাননে তাঁর বন্দিনী মূর্তি দেখে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও একদিক দিয়ে তিনি সুখী ছিলেন। পরগৃহে বাস করেও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেহ মনের শুচিতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ! তাছাড়া এই ঘটনা কি অপ্রত্যাশিত ছিল? সীতা হনুমানকে জানান, 'আমি আগেই জানতাম যে দশা বিপাকে আমায় এ রকম সহ্য করতে হবে।' ভবিতব্য সম্বন্ধে যিনি সজাগ ছিলেন তিনি মানসিকভাবে ঐ ঘটনার জন্য নিশ্চয়ই তৈরী ছিলেন। ঐ ঘটনা যদি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যেত, তাহলে রাম জায়ার বেদনা কি গভীরতর হত না?

রাবণ সীতা হরণ করলেন। কিন্তু সীতা বিরহে রামের দুঃখ, রাম বিহনে সীতার দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী। বিরহ সীতাকে উন্মাদিনী করেনি, কিন্তু রামকে করেছে পাগলপারা। সীতা রামের কথা ভেবে লঙ্কার মাটি ভিজিয়ে ফেলেছেন চোখের জলে। আর মহাবল পরাক্রান্ত রাম? নিঃসঙ্গ বিরহী রাম প্রশ্ন করছেন অচেতন পদার্থকে কিংবা ইতর প্রাণীকে --'বলো, কোথায় আমার জানকী?' জিজ্ঞেস করেছেন সূর্য-বায়ু নদীকে, অরণ্য পর্বত মৃগকে 'তোমরা জান কোথায় আমার প্রেয়সী?' রামের ব্যক্তিগত দুঃখ সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অসীমে। তাই এই বেদনার গভীরতা অতলস্পর্শী। রামায়ণের এই অংশ পড়লে মনে হয়, ঐ মহাকাব্যের সবচেয়ে ট্র্যাজিক চরিত্র আর কেউ নন, স্বয়ং রাম।

অবশেষে রাম সীতা উদ্ধার করলেন। ফিরে গিয়ে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসলেন, আর রাণী হলেন সীতা। অগ্নিশুদ্ধা সীতা স্বামীর সঙ্গে, বাল্মীকির ভাষায় 'ভোগসুখে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করলেন।' কাজেই দেখা যাচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন বেদনায় রাম বা সীতা কাউকেই কষ্ট পেতে হয়নি।

গর্ভবতী সীতার চারিত্রিক শুচিতা নিয়ে প্রজারা সন্দেহ প্রকাশ করায় রাম নিরুপায় হয়ে সীতাকে পাঠিয়ে দিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। সীতার জীবনের এটি একটি করুণতম ঘটনা। কিন্তু স্বামীসঙ্গবিচ্যুতা সীতা আশ্রমের মনোরম পরিবেশে, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে, মুনি ঋষিদের স্নেহচ্ছায়ায় ভালোই ছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ছিল তাঁর যমজ সন্তান লব-কুশ। বেদনা ছিল একটিই -- রাম তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এই বেদনা সত্যিই দুঃসহ।

কিন্তু সীতাকে পরিত্যাগ করে রামের অন্তর কি বেদনায় আলোড়িত হয়নি? অপবাদের ভয়ে নিষ্কলঙ্কা সতী স্ত্রীকে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর কোমল হৃদয় কি শতধাদীর্ণ হয়নি? বাল্মীকি লিখেছেন, রাম উৎকৃষ্ট আসনে বসে রয়েছেন এবং তিনি 'দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন।'

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সীতা অযোধ্যায় এসেছিলেন। রাম তাঁকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। অভিমানিনী সীতা পাতাল প্রবেশ করলেন। চলে গিয়ে 'বেঁচে' গেলেন সীতা। কিন্তু তাঁর বিরহে রাম যে শোক পেলেন তার তুলনা কোথায়? পৃথিবী তাঁর কাছে শূন্যময় ও নিরানন্দ হয়ে গেল। তারপর আরো বহু বছর রাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে জীবন ছিল বিবর্ণ, বিষাদক্লিষ্ট ও নিরানন্দ। পাতাল প্রবেশ করে সীতা তো প্রায় 'শহীদের' মর্যাদা পেলেন। কিন্তু বেঁচে থেকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিলে তিলে দগ্ধ হলেন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ রামচন্দ্র! সীতার দুঃখবেদনার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত কাব্য-কাহিনী। কিন্তু রামচন্দ্রের যন্ত্রণা ও বেদনা অনেকাংশে থেকে গিয়েছে অকথিত।

চলমান তীর্থের তীর্থ-পরিক্রমা

যোগসিদ্ধ সাধু মহাত্মারাই 'চলমান তীর্থ'। তবু তাঁরাও মাঝে তীর্থ পরিক্রমা করেন — কখনও ভক্ত সঙ্গে, কখনও একা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদেরই অন্যতম। সব তীর্থের ঘনীভূত নির্যাস তিনি। ভক্তির শিখাটি অকম্পিত রেখে তিনিও সাধ্যমত ঘুরে বেড়িয়েছেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে।

কেন তীর্থে যায় মানুষ? ঠাকুর বলতেন — যেখানে বহুদিন ধরে বহু ভক্ত জপ-তপ, পূজা উপাসনা ক'রে আসছে, সেখানে ঈশ্বরীয় ভাব জমাট বেঁধে থাকে। সহজেই সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর সর্বত্র, কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রকাশ তীর্থে। তাই যুগযুগান্তর থেকে তীর্থ পরিক্রমা করে আসছেন অগণিত সাধু-মহাত্মা এবং ভক্তমণ্ডলী।

১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। ঠাকুর চললেন তীর্থে। সঙ্গে মথুরবাবু আর ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ? ভাবা যায়? তাঁর পূজা পদ্ধতি, ভাবানুভূতি আচার আচরণ কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনীয়?

বৈদ্যনাথধামে যাবার পথে সকলে প্রবেশ করলেন এক গ্রামে। কিন্তু এ কি গ্রাম! চমকে গেলেন ঠাকুর। চারিদিকে দীন-দরিদ্র মানুষ! রুক্ষ তেলবিহীন চুল, জীর্ণ-চীর বসন, ক্লান্ত অভুক্ত কঙ্কালসার মূর্তি!

পরম ভাগবত শ্রীরামকৃষ্ণ বিচলিত হলেন। আর্তের সেবাই তো ঈশ্বর সেবা -

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।'

বিগলিত হল দীনদয়াল ঠাকুরের হৃদয়। মথুরকে বললেন -- এদের পেট ভরে খেতে দাও, কাপড় দাও, মাথায় মাখবার তেল দাও।

ব্যয়কুণ্ঠ মথুর দ্বিধাগ্রস্ত। উত্তেজিত হলেন ঠাকুর, বললেন -- 'দূর শালা!" তোর কাশী আমি যাবো না। আমি এখানেই ওদের সঙ্গেই থাকবো।

ঠাকুর মিশে গেলেন দীন দুঃখীদের ভীড়ে। অবশেষে রাজী হলেন মথুর। পূর্ণ হল ঠাকুরের দাবী।

ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস দেয়।

ঠাকুর এবার এলেন সর্বতীর্থসার কাশীতে। তাঁর চোখে কাশী ইট কাঠ পাথরের নয়, তা সুবর্ণময়ী। এখানে এসে তাঁর মনে এমন ভাব জেগেছিল যে তিনি সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হতেন। বেশ কিছুদিন তিনি পালকি ক'রে বেনারসের বাইরে গিয়ে ঐ কর্ম সম্পাদন করে আসতেন।

দিব্যভাবে আবিষ্ট ঠাকুর রোজ পানসি চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতেন। একদিন হল এক অদ্ভুত দর্শন! মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশানে শবদাহ হচ্ছে দেখেই তিনি সমাধিস্থ! ভাবনেত্রে দেখলেন, চিতার পাশে এসে স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহীকে তুলে নিচ্ছেন আর তার কানে শোনাচ্ছেন তারক ব্রহ্ম নাম। ঠাকুর ভাবাবেগে মহাকালীকেও দেখলেন -- চিতার ওপর বসে তিনি জীবের সংস্কার বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন অখণ্ডের ঘরে।

ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখন কাশী আলো করে রয়েছেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 'দেখলুম ত্রৈলঙ্গ স্বামী', ভক্ত সঙ্গে প্রায়ই বলতেন তিনি, 'যেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ শরীর আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।' দুই ক্ষণজন্মা মহাযোগীর মধ্যে ইশারায় হয়েছিল ভাবের আদান প্রদান।

কাশীর পর প্রয়াগ। সেখানে অতিবাহিত করলেন তিন রাত। তারপর এলেন আর এক মহাতীর্থে -- বৃন্দাবনে। ব্যাকুল চিত্তে দর্শন করলেন নিধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন। ভাবতন্ময় অবস্থায় আলিঙ্গন করতে গেলেন বাঁকাবিহারীর মূর্তি। দিব্য আবেগে উঠে গেলেন গিরিগোবর্ধন চূড়ায়। কিছুতেই নামতে চান না। শেষে লোক পাঠিয়ে নামানো হল। অপরাহ্নে যমুনার চড়ার ওপর দিয়ে রাখাল গরু চরিয়ে ফিরছে, ব্যাকুলভাবে উন্মাদের মতো 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে সেদিকে ছুটে গেলেন। দেখলেন কালীয়দমন ঘাট। আবার সেই অভূতপূর্ব উদ্দীপন! আবার সেই অপার্থিব মহাভাব।

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা গঙ্গাময়ী থাকতেন বৃন্দাবনে। তাঁকে দেখে ঠাকুর অভিভূত! এতদিনে পেয়েছেন মনের মতো এক মহাসাধিকাকে। গঙ্গাময়ীও ঠাকুরকে দেখে যেন

হাতে স্বর্গ পেলেন। তাঁর কাছে ঠাকুর 'দুলালী'। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে যে রাধিকার মহাভাব মূর্ত। পরিতৃপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবলেন, এখানেই থেকে যাবেন। আর ফিরবেন না। কিন্তু অবতারকল্প মহাসাধকেরও পিছুটান থাকে। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবীর জন্যে। মা রয়েছেন একলা। কে তাঁকে দেখবেন? কে করবেন সেবা শুশ্রূষা? কে বসবেন তাঁর পবিত্র কোলটি আলো করে?

অগত্যা 'যাবার সময় হল বিহঙ্গে'র। ফেরার সময় আর একবার কাশী ঘুরে গেলেন।

মথুরবাবুর ইচ্ছে ছিল গয়া যাবার। কিন্তু ঠাকুর নারাজ। গয়াধামে স্বয়ং গদাধর ঠাকুরের পিতাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। গয়ায় গেলে ঠাকুরের শরীর থাকবে না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

অতএব এবারের মতো যাত্রা হল শেষ। 'সচল তীর্থ' 'অচল' হলেন দক্ষিণেশ্বরে।

মথুরবাবুর সঙ্গে এরপর ঠাকুর একবার নবদ্বীপ ও কালনা পরিভ্রমণ করেন। উৎসাহী পাঠক স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

তীর্থে যাবো অথচ তার মাহাত্ম্য কীর্তন করব না? কি দেখলাম, কি পেলাম, সেই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব না? অর্থ, সংসার আর বিষয়-বিষে অন্তর ভারাক্রান্ত করব? উপদেশ দিয়েছেন ঠাকুর -- তীর্থ দেখে এসে 'জাবর কাটবে'। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মহিমা নিয়ে রোমন্থন করবে, যাতে তীর্থস্থানে জেগে ওঠা ভাব বহুদিন বুকের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

ঠাকুর! তীর্থ পরিভ্রমণ শেষে আমরাও জাবর কাটি। কাজকর্মের অবসরে, নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমরাও মনে মনে তীর্থ ভ্রমণের স্মৃতিচারণা করি এবং They flash upon the inward eye which is the bliss of solitude.

বোধন ও বিসর্জন

দুঃখ করে গেয়েছেন রামপ্রসাদ — এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা।' বাস্তবিক সৌভাগ্যক্রমে আমরা লাভ করেছি দুর্লভ মানব জীবন। এই জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলাই তো আমাদের অভিষ্ট। কিন্তু উপযুক্ত আবাদের অভাবে আমাদের মতো অনেকের জীবন আগাছায় ভরে গেছে। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হয়ে আবাদ করি তাহলে সার্থক হবে আমাদের জীবন।

কিন্তু কিভাবে মন কৃষিকার্য করবে? কিভাবে পাতত জমিতে সোনা ফলবে? এরজন্যে প্রয়োজন 'বোধন' ও 'বিসর্জন'। যা কিছু মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে, সীমা থেকে নিয়ে যায় অসীমে, অন্ধ তমসা থেকে আলোয় উত্তরণের নির্দেশ দেয় সেগুলি গ্রহণ করাই হল বোধন। আর যা কিছু মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, শ্রেয় থেকে বিযুক্ত করে, বাসনা-কামনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগায় — তা পরিত্যাগ করাই হল বিসর্জন। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, এখনই শুরু করতে পারি এই বোধন ও বিসর্জনের পালা। ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয় — নীরবে, নিভৃতে, সবার অগোচরে।

বোধনের কাজটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম কাজটি হল বিশ্বাস। যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন —'যদি তোমাদের সরষে প্রমাণ বিশ্বাস থাকে ও এই পাহাড়টাকে বল — এখান থেকে সরে ওখানে যা, তাহলে তা নিশ্চয়ই যাবে।' মনের গহন অন্ধকারে বিশ্বাসের অকম্পিত দীপশিখাটিকে যেন জ্বালিয়ে রাখতে পারি। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ঝোড়ো হাওয়ায় তা যেন কখনই নিভে না যায়। একদিন হয়তো তারই অমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চিরসুন্দরের অপরূপ মুখচ্ছবি।

'বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ?' কেদারকে বোঝাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। আর তার সেতুর দরকার হয়নি।'

যতবার, নিই ছাড়ি, প্রশ্বাস নিঃশ্বাস
ততবার বলি 'প্রভু
না হয় শিথিল কভু
তোমা প্রতি মোর প্রেম অটল বিশ্বাস।

বিশ্বাসের সঙ্গে চাই সাধন ভজন, সৎসঙ্গ আর ব্যাকুলতা, ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের তীব্র আস্পৃহা, সব অপূর্ণতা যাতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার জন্য সুতীব্র অভীপ্সা। পণ্ডিচেরীর শ্রীমা বলেছেন -- 'সবার আগে চাই -- অন্তরের এই অগ্নিশিখাটি, এই তীব্র আকুতি, জ্যোতির জন্যে এই একান্ত প্রয়োজনবোধ। এ হল একরকমের এক জ্বলন্ত উদ্দীপনা, যা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলবে। এ হল নিজেকে একেবারে গলিয়ে মিলিয়ে ভগবানের সঙ্গে এক করে দেওয়ার পরিপূর্ণ আত্মদানের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে সময় তোমাকে হতে হবে অকপট, অখণ্ড ঐকান্তিকতায় পূর্ণ এবং যতদুর সম্ভব সর্বাঙ্গীনভাবে সমর্পিত।

নদী যেমন ব্যাকুলভাবে সাগরপানে যায়
এ মন কভু তেমন করে তোমার পানে ধায়।

বিশ্বাস আর এই ব্যাকুলতা হয়তো আমাদের এনে দেবে সাত রাজার ধন এক মানিক -- দৈবী কৃপা।

বোধনের তৃতীয় কাজটি হল সমর্পণ -- সানন্দ, নিঃস্বার্থ এবং দ্বিধাহীন সমর্পণ। কৃষ্ণের কাছে এভাবেই সমর্পণ করেছিলেন শ্রীরাধা --

'বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ
দেহমন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।'

নিজেকে, নিজের সমস্ত সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার চেয়ে ভালো কাজ আর কি হতে পারে?

তোমার পায়ে উজাড় করে
' দিলাম আমার যা কিছু সব
নিঃস্ব আমি তবু আমার
প্রাণে খুশির মহোৎসব।

বোধনের পরে বিসর্জনের পালা। এটি সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলাম, তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলাম, দেখা গেল এত সব করেও বিশেষ কিছু হল না। না হবার কারণ, বিসর্জনের পালা শুরু হয়নি।

আমরা ভগবানকে আহ্বান করছি। তর্কের খাতিরে ধরা যাক তিনি এলেন। কিন্তু কোথায় বসবেন তিনি? নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে? হৃদয়ের মধ্যে যে সিংহাসনটি রয়েছে, সেটিও যে খালি নেই। সেখানে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন অটল অনড় 'আমি রাজা'। আর তাঁর চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন সন্দেহ, অবিশ্বাস, নীচতা, স্বার্থপরতা, প্রমুখ বড় বড় মন্ত্রী। রাহুর মতো 'আমি রাজারও' তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি। জগতের সমস্ত প্রেয় বস্তুগুলির প্রতি তাঁর দুর্নিবার লোভ।

যেখানে 'আমি' সেখানে 'তিনি' নেই ---
ইচ্ছা যে হয়, হৃদয়-রাজ্য করব জীবন-স্বামীময়
কিন্তু সেখায় 'আমি রাজা, রাজ্যটি তাঁর আমি ময়।
আমি নামের কেল্লা থেকে যতই ডাকো 'প্রভু-প্রভু'
পাবে নাকো দেখাটি তাঁর এই জনমে তুমি কভু।

তাই সর্বাগ্রে আমি-রাজার কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, তাঁকে পাঠাতে হবে দূর নির্বাসনে, বধ করতে হবে তাঁর মন্ত্রীদের। অতি দুরূহ এই কাজ, ছোটোখাটো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বলা যেতে পারে। হয়তো এক জীবনে তা সম্ভবও নয়। তবু সংগ্রাম করতে হবে, গুরু প্রদর্শিত পথে সাধন ভজনের মাধ্যমে বিসর্জনের এই পালাটি সম্পন্ন করতে হবে। অবশ্য যদি ঈশ্বরের কৃপাকণা বর্ষিত হয়, উর্দ্ধলোক থেকে নেমে আসে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', তখন কাজটি সহজতর হবে। ঠাকুর বলতেন -- 'তুমি এক পা বাড়ালে ভগবান দশ পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসবেন'। তাই শুরু হোক পথ চলা। বাড়িয়েই দেখি না এক পা।

বোধন ও বিসর্জনের ব্যাপারটি সম্পন্ন করা গেল। ব্যস, এতেই কার্যোদ্ধার হবে, তাই না? একেবারেই নয়। কেবল ক্ষেত্র তৈরী হল, বপন করা হল ঈশ্বরানুগের বীজ। বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই কি ফল পাওয়া যায়? সার দিতে হবে না? জল বাতাস আলোয় ভরিয়ে দিতে হবে না ক্ষেত্রটিকে? বীজটিকে রক্ষার জন্য নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হবে না? মনে রাখতে হবে শবরীর প্রতীক্ষার কথা। শ্রীরামের স্পর্শ কি এত সহজে পাওয়া যায়?

এভাবে বোধন ও বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত সাধন-ভজনের সাহায্যে নিঃশব্দে আমরা যদি একটু এগিয়ে যাই, তাহলে সুন্দরতর হয়ে উঠবে আমাদের জীবন, 'সকল কাঁটা ধন্য করে' একদিন না একদিন ফুল ফুটবেই ফুটবে।

কিন্তু পরিশেষে আমরা জানি যে যিনি আমাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি শুভবোধ এবং দুর্লভ মোক্ষ প্রদানকারী, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর শরণাগতি ভিন্ন কোন প্রাপ্তিই সম্ভব নয়। তাই জগদগুরু শঙ্করাচার্যের ভাষায় তাঁকে প্রণাম জানাই --

কামাদি সর্প ব্রজগারুরাভ্যাম্।
বিবেক বৈরাগ্য নিধি প্রদাভ্যাম্।
বোধ প্রদাভ্যাম্ দ্রুত মোক্ষদাভ্যাম্।
নমঃ নমঃ শ্রীগুরু পাদুকাভ্যাম।।

রাজচ্ছত্রছায়ায় সারস্বত সাধনা

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে শুধু এক হাজার গরু দান করেই বিদেহসম্রাট জনক ক্ষান্ত হননি, সবিনয়ে তাঁকে জানিয়ে ছিলেন -- 'আমি আপনাকে এই বিদেহ রাজ্য এবং তার সঙ্গে আমাকেও দান করছি আপনার দাসকর্মের জন্য।' গুণীর প্রতি সম্রাটের এই শ্রদ্ধা আমাদের অভিভূত করে। সেকালের বহু জ্ঞানীগুণী রাজা বা জমিদার কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছেন। বিশেষ ক'রে যাঁরা কবি তাঁদের প্রতি অনেক রাজামহারাজারই ছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। অনেক রাজা কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং রাজচ্ছত্রছায়ায় বহু কবিই করে গিয়েছেন নিরলস সারস্বত-সাধনা।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর সেরা সম্পদ তাঁর রাজসভা আলো করা নবরত্ন - যার মধ্যমণি মহাকবি কালিদাস ছিলেন বলে কথিত। কালিদাস-পূর্ব যুগের খ্যাতিমান 'উত্তররামচরিতের'র অমর স্রষ্টা ভবভূতি কান্যকুব্জ রাজ যশোবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিও পান। হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভা অলংকৃত করেন ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর প্রভৃতি কবি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বাণভট্ট। হরিকেলরাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্রের সভাকবি তাঁর 'চন্দ্রচূড়চরিত' রচনার জন্য রাজার কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে প্রচুর ধন সম্পত্তি পান।

কাব্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজা লক্ষ্মণ সেন বোধ হয় সবচেয়ে স্মরণীয়। তাঁর রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন অবিস্মরণীয় কবি-পঞ্চক -- ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ এবং জয়দেব। 'পবনদূত' কাব্যের স্রষ্টা ধোয়ীর সম্বর্ধনা অভূতপূর্ব। ভক্তরা ঘিরে রয়েছে। চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুসজ্জিত হাতি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন গুণমুগ্ধ রাজা -- হাতে তাঁর জলভরা সোনার ঘড়া। কবিকে তিনি 'কনকস্নান' করিয়ে দিলেন। তারপর এলো দানের পালা। রাজা কবিকে উপহার দিলেন সেকালের রীতি অনুযায়ী হাতি, ঘোড়া, সোনা মোড়া ছাতা, সোনার চামর ও নানারকম অলংকার। কবিরাজ চক্রবর্ত্তীরূপে রাজা লক্ষ্মণ সেন এইভাবেই সম্বর্দ্ধিত করেন ধোয়ীকে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রও অনেকটা এইভাবেই কবি গোদাবর মিশ্রকে অভিনন্দিত করেন।

গৌড়েশ্বরের রাজসভায় ফুলিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক পড়ায় রাজা তাঁকে খুশি হয়ে উপহার দেন ফুলের মালা আর পাটের পাছড়া। সভাসদ কেদার খাঁ

তাঁর মাথায় চন্দন জল ছিটিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানান। কবির সেদিন অলভ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু কৃত্তিবাস সবিনয়ে জানান — 'কার কিছু নাঞিও লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার।'

তুর্কী আক্রমণের পর বহুকাল বাঙ্গালীর সারস্বত চর্চায় ভাঁটা পড়েছিল। রাজসভা গুলিও হয়ে পড়েছিল চাকচিক্যহীন। সুলতান হুসেন শাহের সময় থেকে আবার শুরু হল বাণীর আরাধনা। ভাবলে অবাক লাগে মক্কার আরব সন্তান হুসেন শাহ এবং তাঁর ছেলে নুসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যকে রীতিমত ভালোবেসেছিলেন! এমনকি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও ছিলেন কাব্যোৎসাহী। তাঁর নির্দেশেই পরমেশ্বর দাস প্রথম বাংলায় মহাভারত রচনা করেন। পরাগলের ছেলে ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী লেখেন অশ্বমেধপর্ব।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের প্রখ্যাত কবি মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধি পান — 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান'।

মহাকবি বিদ্যাপতির নাম মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত। তিনি কামেশ্বর বংশের কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, বীরসিংহ, ভৈরব সিংহ প্রভৃতি রাজা ও রাণী বিশ্বাসদেবীর সহায়তা পান। রাজারা এই শ্রদ্ধেয় কবিকে বিসাপী গ্রাম উপহার দেন এবং তিনি 'অভিনব জয়দেব' সম্মানে ভূষিত হন।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কুচবিহার রাজসভার ভূমিকা শ্রদ্ধার সহেগ স্মরণীয়। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং কবি ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে রামায়ণ লেখা শুরু হয়। গোবিন্দ কবিশেখরের মহাভারতের 'কিরাতপর্ব' এবং দ্বিজ শ্রীনাথের 'মহাভারত' লেখা কি আদৌ সম্ভব হত যদি রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণ ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ না করতেন?

কামতা-কামরূপের রাজা বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণ, সমর সিংহ, শুক্লধ্বজ প্রভৃতি তাঁর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন কাব্যোৎসাহী। পুরাণকথার বঙ্গানুবাদ প্রসারে ঐ রাজসভার ভূমিকা ছিল অসামান্য। সমর সিংহের নির্দেশে কবি পীতাম্বর বাংলায় লেখেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী। 'রাম সরস্বতী' উপাধিধারী অনিরুদ্ধকে শুক্লধ্বজ শুধু 'ভারত পয়ার' লিখতে অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হননি, কবিকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে যত মহাভারতের পুঁথি ছিল, সব পাঠিয়েছিলেন এবং সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ভরণপোষণের সমস্ত ভার।

নিঃস্ব কবি মুকুন্দরামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুকুন্দরামের ছাত্র রঘুনাথ রাজা হন। তাঁরই উৎসাহে মুকুন্দরাম রচনা করেন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।

তিনি 'কবিকঙ্কন' উপাধি পান এবং সম্বর্দ্ধিত হন।

সাঁতোলির রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন কাব্যরসিক। তাঁর সভাকবি ছিলেন রামায়ণ রচয়িতা নিত্যানন্দ অদ্ভুদাচার্য। গোপভূমের রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত কবি রূপরাম লেখেন তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ এবং তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের ঐকান্তিক ইচ্ছায় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী সৃষ্টি করে তাঁর প্রখ্যাত কাব্য 'শিব সংকীর্তন'।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রোসাঙ্ রাজসভার দান অবিস্মরণীয়। দৌলত কাজী এবং আলাওলের মতো দুই শক্তিমান মুসলমান কবির নাম এই রাজবংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রানী' রচিত হয় রাজা শ্রীসুধর্মার সেনাপতি আশ্রফ খানের অনুরোধে। কবিকে তিনি বাংলায় পাঞ্চালীর ছন্দে সকলের বোধগম্য ক'রে ঐ কাব্যটি লিখতে অনুরোধ করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাকবি আলাওল রোসাঙের রাজসভায় পণ্ডিত মগন ঠাকুরের স্নেহছায়া লাভ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে সৃষ্টি হয় কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী'। 'সয়ফুলমুলক বদি উজ্জমাল'-ও মগন ঠাকুরের অনুরোধ কবি লিখতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মগন ঠাকুরের মৃত্যু হয় এবং কাব্যটি অসমাপ্ত থাকে। অনেকদিন পরে শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সৈয়দ মুসার অনুরোধে আলাওল অসমাপ্ত কাব্যটি শেষ করেন। যাঁর সভায় 'গুণিগণ অবিরত। জ্ঞান ভক্তি রস কথা সুনন্ত সতত' -- তিনি হলেন মন্ত্রী সোলেমান। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় আলাওল দৌলত কাজীর এক অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন। তাঁর 'হপ্তপয়কর' এবং সিকান্দারনামা' কাব্য দুটি লেখা হয় সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ এবং রাজা চন্দ্র সুধর্মার অনুরোধে।

কবি-প্রতিপালক রাজা হিসাবে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন বিখ্যাত। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার প্রমুখ বিখ্যাত কবি তাঁর সভা অলংকৃত করেন। রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র লেখেন তাঁর কালজয়ী কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'। রাজা তাঁকে মাসিক বৃত্তি ও জমি দান করেন। তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধিও পান রাজার কাছ থেকে। সাধক-কবি রামপ্রসাদও রাজার কাছ থেকে একশো বিঘে জমি ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার এক প্রধান সভাসদ ছিলেন। সভায় যখনই তিনি প্রবেশ করতেন, তখনই রাজা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখাতেন। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাণেশ্বরকে কলকাতায় একটি বাড়ি উপহার দিয়ে স্বয়ং বাধিত হন। বলা বাহুল্য, রাজচ্ছত্রছায়ায় লালিত অনেক কবিই রাজাদের স্তুতি করে তাঁদের মনোরঞ্জন করেছেন। অনেকের কাব্যে 'রাজসভার দোষ'ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টি করেছেন এমন কবির সংখ্যাও অল্প নয়। তাই রাজচ্ছত্রছায়ায় বাঙালী কবিদের সারস্বত সাধনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন

পৃথিবীর অনেক নাম -- বসুমতী, বসুন্ধরা, ভূলোক, ধরিত্রী, মেদিনী, ভুবন -- আরো কত কি! আরো একটি নামে পৃথিবীকে এখন অভিহিত করা চলে। নামটি হল 'যুদ্ধ শিবির'। বলাই বাহুল্য যে আজকের এই পৃথিবী সত্যিই বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি ভয়ংকর যুদ্ধ শিবির। অর্থ, অস্ত্র আর ক্ষমতার দম্ভে স্ফীত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বিশ্বকে ধ্বংস করবার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ, সংঘর্ষ আর পারস্পরিক উত্তেজনার খবর ছাড়া আজ যেন সংবাদপত্র অচল। আতঙ্কগ্রস্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ ভাবছে, এই বুঝি শুরু হলো রক্তক্ষয়ী মহাসমর!

'ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। যুদ্ধের হুমকি, সাম্রাজ্যলোভী শক্তির জান্তব লোভ, দাঙ্গা, হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মস্থানকে খুনের আখড়ায় পরিণত করা, বিচ্ছিন্নতাবাদ -- দেশে দেশে -- বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথা চাড়া দিচ্ছে। অশুভ শক্তির চক্রান্তে শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী! অহিংসা, প্রেম ক্ষমা -- সত্য, শিব, সুন্দর এই সুন্দর শব্দগুলি আজ যেন কেবল বাংলা অভিধানেই পাওয়া যায়! কবি জীবনানন্দ দাশের কণ্ঠে যথার্থই উচ্চারিত হয়েছে মন্ত্রের মতো অমোঘ একটি অবিস্মরণীয় পংক্তি -- 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।'

'দয়াহীন সংসারে' 'যুগে যুগে দূত' পাঠিয়েছেন ভগবান। তাঁরা সকলেই মানব

সমাজকে শুনিয়েছেন ক্ষমা, প্রেম ও অহিংসার বাণী। হিংসায় উন্মত্ত মানুষকেও তাঁরা ভালোবেসে উপদেশ দিয়েছেন -- 'অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' প্রাচীনযুগের ঋষি দেখিয়েছেন পথের ঠিকানা -- 'অসতো মাসদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' অর্থাৎ 'অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে নিয়ে যাও আলোয়। মৃত্যু থেকে আমাকে নিয়ে যাও অমৃতে।' রামায়ণের রামচন্দ্র বলেছেন, 'সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম'। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণের বজ্র নিনাদ -- 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ' -- আমাদের জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে যাক সবরকম দুর্বলতা। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব উচ্চারণ করেছিলেন, সকল প্রাণী যেন সুখী ও শত্রুহীন হয়, চিরদিন যেন অন্তর মাঝে অহিংসা জাগ্রত থাকে। মানবসত্যের বেদীমূলে প্রাণ উৎসর্গ করার আগেও যীশু বলে গিয়েছিলেন -- 'শত্রুকেও ভালোবাসবে। প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে নিজের মতো ভেবে।' হজরত মোহাম্মদ শিক্ষা দিয়েছেন -- 'মানুষের সেবাই আল্লার সেবা।' সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য শংকর বলেছিলেন -- 'সর্বদা জীবগণের হিতসাধন।' গুরু নানককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? উত্তর দিয়েছিলেন মহান শিখ গুরু -- 'আমি সেই এক ঈশ্বরের পূজারী। তাঁকে আমি দেখি মর্ত্যের ধূলিতে, ঊর্ধ আকাশে ও সকল দিকে।' আর শ্রীরামকৃষ্ণের বীর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জনগণকে আশীর্বাদ করেছিলেন -- 'শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর।'

এইসব উপদেশ মানুষ শুনেছে। মানুষ এই মহাপুরুষদের উদ্দেশে অর্পণ করেছে শ্রদ্ধার্ঘ্য। কিন্তু তবু জগৎ থেকে নির্মূল হয়নি হিংসা। মহান রুশ লেখক আন্তন চেখভের সেই স্বপ্ন, 'সমস্ত পৃথিবী একদিন সাজানো ফুলের বাগান হয়ে উঠবে' -- স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ সারছে না। বহুদিন ধরে সে ভুগছে। কে সারাবে? কোথায় সেই 'বৈদ্য'?

'সূর্যের' ভূমিকা আমরা পালন করতে না পারি, কিন্তু আমরা কি হতে পারি না সেই 'মাটির প্রদীপ', অস্তগামী সূর্যকে যে বলেছিল 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি?' রামচন্দ্রের মতো আমরা সেতুবন্ধন করতে না পারি, কিন্তু আমরা কি পারিনা সেই 'কাঠবিড়ালী' হতে? একদা সর্ব ব্যাপারে অগ্রণী ভারত কি পারবে না অসুস্থ পৃথিবীর রোগ নির্ণয় করতে?

পৃথিবীর এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের দূর করতেই হবে। অর্থ দিয়ে নয়, অস্ত্র দিয়েও নয় -- দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষী ও ধর্মগুরুদের অজর অমর শিক্ষা এবং ভারতের সনাতন ধর্মের সুমহান আদর্শ হয়তো পারে রোগাক্রান্ত ধরণীকে সুস্থ সবল ক'রে তুলতে।

মানব সভ্যতার সেই প্রভাতে যখন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মের নামে রক্ত ঝরাচ্ছে, তখন ভারতের শান্ত তপোবন থেকে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অপূর্ব পথনির্দেশ --'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। 'মা হিংসী', হিংসা কোরো না। কেনা জানে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তির মূল উৎস লোভ ও হিংসা। অসুস্থ পৃথিবীর রোগ নিরাময়ের এটি একটি মোক্ষম দাওয়াই, সন্দেহ নেই।

সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বভূতে প্রীতি ও সর্বভূতে সেবার যে মহান আদর্শ আমাদের সত্যানুসন্ধানী ঋষিরা প্রচার করেছিলেন, বিশ্ববাসী যদি এই অবক্ষয়ের যুগে তা গ্রহণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আমাদের ঋষিরাই প্রথম প্রচার করেছিলেন বিশ্বমৈত্রীর বাণী -- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ 'সারা বিশ্বই আত্মীয়'। বিশ্বশান্তির পক্ষে আমরা কি ঐ মহাবাণী কাজে লাগাতে পারি না? আজ যদি আনবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং গর্বোদ্ধত কোনো রাষ্ট্র ভারত থেকে ঋণ নিয়ে উচ্চারণ করে এবং একান্তভাবে চায় ঋষি উচ্চারিত সেই অবিস্মরণীয় বাণী 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' --'সকলে সুখী হোক', তাহলে সেই রাষ্ট্র কি পারবে দুর্বল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে? এই একটি মন্ত্রোচ্চারণই কি পৃথিবীর গভীরতর অসুখ সারাতে পারে না? বালক ধ্রুবকে ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে, ধ্রুব যা বলেছিলেন, তা যদি বিশ্বের সকলেই মনেপ্রাণে চায়, তাহলেও রোগার্ত ধরিত্রী নিঃসন্দেহে রোগমুক্ত হতে পারবে। ধ্রুব বলেছিলেন -- 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য' অর্থাৎ বিশ্বের স্বস্তি হোক।

বিশ্বের দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির যাবতীয় ওষুধই আছে ভারতবর্ষে। কিন্তু 'বৈদ্য'র ভূমিকা পালন করবেন কে? এর দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। হতাশ হলে চলবে না, মনে রাখতে হবে বিশ্বশান্তির মহান দূত রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী --

'শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।'

বুকের মধ্যে ক্ষত, হাতে রক্ত গোলাপ, মুখে হাসি।

স্বপ্ন দেখছেন সেই ফরাসী মহিলা।

এক আশ্চর্য স্বপ্ন, এক অভূতপূর্ব দিব্যদর্শন! মহিলাটি রোগ যন্ত্রণায় কাতর। কী দুঃসহ সেই রাত! কিন্তু একি! কে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে? কে ঐ স্মিতানন, জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ?

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বুঝতে পারেন ঐ বিদেশিনী -- আবির্ভূত পুরুষসিংহটি প্রাচ্যের সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর হাতে রক্তপদ্ম, তিনি হাসছেন আর সেই হাসিতে যেন ঝলসে যাচ্ছেন যন্ত্রণাকাতর মহিলাটি। 'আমার এত কষ্ট আর আপনি হাসছেন?' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখতে পেলেন স্বামীজীর বুকের মাঝখানে এক ক্ষতচিহ্ন, আর সেইখান থেকে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্তস্রোত! তবু তিনি হাসছেন হাতে রক্তপদ্ম নিয়ে। আশ্চর্য জ্যোতি আর প্রশান্তি সারা মুখে, বলছেন – দ্যাখো, জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে, তবু আমাদের হাসতে হবে, বাঁচতে হবে।

ফরাসী মহিলার স্বপ্নে দেখা বিবেকানন্দ যন্ত্রণাদীর্ণ মহিলাকে শোনাননি বৈরাগ্যের মন্ত্র, সান্ত্বনা বাণী কিংবা শাস্ত্রবচন। তাঁর কণ্ঠে দুঃখজয়ের আহ্বান, আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনীমন্ত্র। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন – 'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

অনেক কষ্ট পেয়েছেন স্বামীজী। মানুষের দুঃখ, দেশের দুর্দশা এই মানবতাবাদী মহাপ্রাণকে বিচলিত করত যা হয়তো 'শাস্ত্র সম্মত' নয়। কেননা সাধুরা নাকি সুখে দুঃখে উদাসীন থাকেন। আমাদের সৌভাগ্য বিবেকানন্দ অন্ততঃ ঐ অনুশাসনটি অগ্রাহ্য করেছেন।

একবার স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ হবার পর শরীর সারাতে দার্জিলিং গিয়েছেন। হঠাৎ খবর এল – কলকাতা মহানগরী প্লেগে আক্রান্ত! বিচলিত মহামানব সঙ্গে সঙ্গে

ফিরে এলেন কলকাতায়। আর্তের সেবা করতে হবে, দাঁড়াতে হবে বিপন্ন মানুষের পাশে। কিন্তু অর্থ কোথায়? কোথা থেকে জুটবে ওষুধ আর পথ্যের খরচ? গুরুভাইদের বললেন — 'মঠের জন্যে যে জমি কেনা হয়েছে, সেটা বিক্রি করেও যদি হাজার হাজার রোগার্তের প্রাণ বাচাতে পারি, তবে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।'

আমেরিকায় এক ধনকুবেরের প্রাসাদে একবার স্বামীজী আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরাম বিলাসের সে কি উপকরণ! স্বামীজী শুয়ে আছেন দুধসাদা আরাম শয্যায়। বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছে, আর ঘরে কি মধুর উষ্ণতা! কিন্তু হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠলেন স্বামীজী। তাঁর মনে পড়ল, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই, ক্ষুধার আগুনে তাদের পেট জ্বলছে আর তিনি শুয়ে রয়েছেন এই সুখস্বর্গে! বিছানা ত্যাগ করে ভূমি শয্যায় শয়ন করলেন তিনি। দু'চোখে অবিরাম অশ্রুধারা, কণ্ঠে কেবল এক প্রেমঘন উচ্চারণ — 'আমার দেশ! আমার দেশ!'

রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন — 'বিশ্বমানবের সকল দুঃখ যন্ত্রণার আঘাত এসে শিশুর মতো তাঁর কোমল ত্বকে অবিরাম অজস্র ক্ষত সৃষ্টি করত। ... বিশ্বের সকল মানুষের দুঃখ বেদনা নিজের বিশাল হৃদয়ে অনুভব করতেন।'

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কম দুঃখ পাননি। পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থাতেও তিনি 'অনাহারে, ছিন্নবস্ত্রে নগ্নপদে চাকরীর আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।' স্বামীজী নিজেই বলছেন ঐ সময়ের অবস্থা, 'এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম।' দু'একজন বন্ধু সঙ্গে ছিল বা ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের একজন স্বামীজীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একটা গান গেয়েছিল — 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে।' স্বামীজী গায়ক বন্ধুকে গান থামাতে বলে গর্জন করে উঠলেন — 'ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানা পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে ..... কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

বাড়িতে যেদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত না সেদিন ভুবনেশ্বরীদেবীকে 'নেমন্তন্ন আছে' বলে বেরিয়ে যেতেন স্বামীজী এবং সামান্য কিছু খেয়ে বা অনশনে সারা দিন কাটিয়ে দিতেন। বন্ধুদের অনুরোধে গান গেয়ে তাদের মনোরঞ্জন করতে হত। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও স্বামীজী অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে অশেষ কষ্ট করেছেন, অন্নের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন। খ্রীষ্টান সমাজ তাঁকে কম আক্রমণ

করেনি। নানাভাবে তাঁর নামে তারা কুৎসা রটনা করেছে। স্বদেশেও তাঁকে অনেক নিন্দা ও কুৎসিত সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল।

অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা বিবেকানন্দ পেয়েছেন, তবু তিনি, 'বুকের মধ্যে ক্ষত'কে উপেক্ষা করে রক্তপদ্মের সৌরভ ছড়িয়েছেন আর হেসেছেন, রঙ্গ-তামাশা করেছেন। অসামান্য ছিল তাঁর মার্জিত রসবোধ। হেল ভগিনীদের লেখা এক পত্রে তিনি লিখছেন -- 'আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন দেখি তোমরা চারজন গরমে ভাজা, পোড়া, সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণে বেড়ে যায়।' অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁর চুল পাকতে শুরু করেছিল। সে প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন -- 'তোমার সঙ্গে পরবর্ত্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মতো হবে।'

'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন -- 'কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্প গুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম।' স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত 'স্বামি শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে তাঁর কৌতুক প্রিয়তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিবেকানন্দ ছিলেন যথার্থই রসরাজ। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে তিনি একদিন অপূর্ব এক কাহিনী শোনান। গঙ্গাহীন দেশে কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়। তাঁর খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল সব হাজির। শাশুড়ী জামাইকে বললেন, আগে একটু দুধ খাও। যেই বাটিতে সে চুমুক দিল অমনি চারদিক থেকে ঢাকঢোল বেজে উঠল। শাশুড়ী আনন্দে কাঁদো কাঁদো হয়ে জামাই -এর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, 'বাবা, তুমি আজ ছেলের কাজ করলে। তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের হাড়গুঁড়ো। শ্বশুর গঙ্গা লাভ করলেন।' একবার গোরক্ষিণী সভার এক প্রচারক স্বামীজীকে বললেন, গরু আমাদের মা। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর রঙ্গ ও বিদ্রূপ -- গরু যে মা তা আমি বুঝেছি। তা না হলে এমন কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবে!

ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিচারণায় এবং তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার অজস্র নিদর্শন।

দুঃখ কষ্ট অপমান জ্বালা সহ্য করেও মানুষকে আনন্দ দিয়ে গেছেন তিনি। আজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই জটিলতা বাড়ছে। প্রায় প্রতিটি মানুষ নানা সমস্যায় ক্রুসবিদ্ধ। মানুষের সর্বাঙ্গ আজ যেন রক্তাক্ত। তবু হাতে তুলে নিতে হবে রক্তপদ্ম, বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে। নিজে বাঁচবো, অপরকেও বাঁচাবো। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে সেই কল্যাণী ইচ্ছা -- 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু', 'সর্ব সর্বত্র নন্দতু।'

হৃদয়ারবিন্দ শ্রীঅরবিন্দ

'হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
উদার মৃত্যুর।' —— রবীন্দ্রনাথ

ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, হলেন শ্রীঅরবিন্দ। ছিলেন দেশের বিপ্লব আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম মহানায়ক, হলেন যোগবরিষ্ঠ মহাযোগী। ছিলেন নমস্য, হলেন প্রণম্য।

ভগবদ্দর্শনের প্রেরণা তাঁর মধ্যে কমবেশি বরাবরই ছিল। স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে এক পত্রে তাঁর যে তিনটি 'পাগলামি'র কথা তিনি লিখেছিলেন, তার একটি ঈশ্বরলাভের তীব্র আস্পৃহা -- 'যে কোন মতে ভগবানের দর্শনলাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি।' বরোদায় থাকাকালীন তিনি দিনে পাঁচ ছ' ঘন্টা করে প্রাণায়াম করতেন। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ নর্মদার তীরে থাকতেন। অরবিন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বরোদাতে বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামে মারাঠী যোগীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকেই অরবিন্দ যোগাভ্যাসের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ দিলীপকুমার রায়কে বলেন -- 'মনকে শান্ত করো', লেলে তাঁকে বলেছিলেন, 'চিন্তার দিকে একদম ঝুঁকো না; তাহলে ক্রমশঃ দেখতে পাবে যে সব চিন্তাকে তুমি তোমার নিজের বলে মনে করে এসেছ, সে সব আসে বাইরে থেকে। যেই তাদের আসতে দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়াতে হবে। এইভাবে কিছুকাল অভ্যাস করলেই মনের মধ্যে নেমে আসবে স্থিরতা ও প্রশান্তি।' অরবিন্দ তাঁর উপদেশ মেনে ছিলেন। লেলের শিক্ষায় ঠিক তিন দিনে তিনি সবরকম চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ সাধনার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে গেল কারাগারের অন্ধকূপে।

অরবিন্দ তখন দেশের মুক্তি আন্দোলনের 'জনগণ-মন-অধিনায়ক', প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বঙ্গদেশ তখন উত্তাল। অরবিন্দ জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। গুপ্ত সমিতি গঠন করে সর্বত্যাগী যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। লিখে চললেন অসাধারণ উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ। অকুতোভয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপে কেঁপে উঠল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ইমারত। পুলিশ বোমা তৈরীর প্রধান কেন্দ্র মানিক তলায় মুরারিপুকুর বাগানের সন্ধান পেল। গ্রেপ্তার বরণ করলেন বহু বিপ্লবী। গোয়েন্দা পুলিশ অরবিন্দের বাড়ীতে হানা দিয়ে খানাতল্লাসী চালাতে লাগল। একটা ছোট বাক্সের মধ্যে ছিল দক্ষিণেশ্বরের মাটি। অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে লেখেন — 'ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ।' এরপরেই অরবিন্দের ব্যঞ্জনাগর্ভ মন্তব্য স্মরণীয় — 'এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।' পরে অবশ্য সাহেব বুঝতে পারেন ঐ বস্তুটি নিছক মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হল, আটকে রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেলের ছোট্ট একটি ঘরে। ঘরটি ছিল ন ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট চওড়া। জানলা বিহীন ঐ ঘরটির সামনে ছিল বিশাল লোহার গরাদ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি পরবর্ত্তীকালে মহাতীর্থ হয়ে ওঠে। এখানেই তিনি বাসুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কারাগারের অন্ধকূপে, নির্জনতার মধ্যে তিনি গুরু ও সখারূপে বাসুদেবকে পেলেন। তিনি লেখেন — 'বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কোপ দৃষ্টির একমাত্র ফল আমি বাসুদেবকে পাইলাম।'

আলিপুর আদালতে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন দেশবরেণ্য ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বিচারপতিকে সম্বোধন করে তিনি সেদিন অরবিন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, 'Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands.' সংক্ষেপে এর অর্থ হল — এই বিতর্ক, আন্দোলন স্তব্ধ হবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে মানুষ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, মানবপ্রেমিক এবং জাতীয়তার নবী বলে শ্রদ্ধা করবে, তাঁর বাণী সাগর পারের দূর দূরান্তে ধ্বনিত হবে।

পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, দেশবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী কত অভ্রান্ত!

প্রেসিডেন্সী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের অন্যতম ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁরা কেউ মাথায় মাখবার তেল পাচ্ছেন না অথচ অরবিন্দের চুল কিভাবে তেল চকচকে থাকে? এই প্রশ্ন নিয়ে একদিন তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। অরবিন্দ বললেন — 'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল ফ্যাট টেনে নেয়।' উপেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, 'অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে। তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেখমাত্র নাই। .... এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দবাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান।'

এইসব যাবতীয় জড় পদার্থ তাঁর কাছে চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। বিচারক, উকিল, বন্দী আসামী সকলের মধ্যে তিনি বাসুদেবকে দেখতে পেতেন। 'তারপর তিনি (বাসুদেব) আমার হাতে গীতা দিলেন,' উত্তরপাড়া অভিভাষণে তাঁর স্বীকারোক্তি, 'তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।' তাঁকে যখন তাঁর ছোট্ট ঘর থেকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হল, তখন তিনি দেখলেন তিনি আর উঁচু দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।

সাক্ষাৎ বাসুদেব দর্শন হবার পরেও, বিশ্বজনের কল্যাণের জন্য শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘকাল কঠোর যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থেকে সিদ্ধিলাভ করে জ্যোতির্ময় দিব্য মানবে পরিণত হন। ১৯২৮ সালে তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন — 'আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। .... অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। ..... মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন ঃ 'যুক্তাত্মান ঃ সর্বমেবাবিশন্তি। ... আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে ঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে।'

শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ। তাঁর 'বেদরহস্য', 'উপনিষদষ্টক', 'দিব্যজীবন', 'যোগসমন্বয়', 'মানব বর্তনি', 'বিশ্ব এক নীড়' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'সাবিত্রী' মহাকাব্য কালজয়ী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগের নাম দিয়েছেন 'পূর্ণযোগ'। আমাদের সমগ্র সত্তায় ঈশ্বরের আনন্দময় রূপের প্রতিষ্ঠাই এই যোগের অভিষ্ট। তাঁর ধারণায় মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, মানব স্বরূপকে দিব্যজ্ঞানে এবং মানব

আনন্দকে দিব্যানন্দে উন্নীত করা, ঈশ্বরের দিব্যরাজ্যকে এই ধূলার ধরণীতে নামিয়ে আনা। এ প্রসঙ্গে হিমাংশু নিয়োগী বলেছেন -- 'শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যোগ সাধনা এক শক্তিসঞ্চারী বেগ নিয়ে মানুষের অন্তশ্চেতনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি যা দেখতে পায়না সেই আধ্যাত্মিক নেপথ্যলোকে ঘটে গেছে এক বিরাট বিপ্লব। জগতের উপর পরমাশক্তির -- অতিমানসের জ্যোতির আবির্ভাব হল তার তারণ স্পর্শ নিয়ে।'

দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে শ্রীঅরবিন্দ জানান যে অতিমানস শক্তিকে তিনি নামিয়ে আনতে চাইছেন স্বমহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে নয়। 'আমি চাই এক আন্তর সত্য, আলো, সুষমা ও শান্তির নীতিকে পার্থিব চেতনার রাজ্যে আবাহন করতে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি উপরে .... আমার চেতনার উর্দ্ধ হতে তার জ্যোতিঃপ্রপাত হচ্ছে আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমি চাই যাতে করে আমাদের সমগ্র সত্তাকে সে তুলে নিতে পারে তার স্বকীয় শক্তিস্বরূপের মধ্যে, অন্যথা মানুষের স্বভাব চলতে থাকবে আধ-আলো-আধ-ছায়ার সনাতন ভূমিকায়। আমি এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি যে এই সত্যের অবতরণ হলে জগতে খুলে যাবে এক দিব্য চেতনার বিকাশের পথ আর পার্থিব বিবর্তনের, সেই হবে পরম নিহিতার্থ।'

শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সালে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন পরেও তাঁর দিব্য দেহের কোনো বিকৃতি হয়নি। এতটুকু কমেনি তাঁর দেহের দিব্য আভা, অপার্থিব দিব্য জ্যোতি। এমনটি বোধহয় আর কখনও দেখা যায়নি।

এই দিব্য মানব সম্পর্কে শ্রীমায়ের (মাদার) স্মরণসুন্দর বিশ্লেষণ -- 'শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর কাছে এতখানি উদার হস্তে এনে দিয়েছেন যত আলো আর জ্ঞান আর শক্তি, তারজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর শিক্ষা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা আর তা কার্যে পরিণত করা।

'তাঁর শিক্ষা আমাদের যেন অন্ধকার দূর করে পথ দেখিয়ে চলে।'

সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি

কত দেশের কত সংস্কৃতি আজ ধূলায় বিলীন, ইতিহাসের ধূসর স্মৃতি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে মৃত্যুহীন মহিমায় ভারতীয় সংস্কৃতি আজও অম্লান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগসর্বস্বতা, অর্থ ও শক্তির দম্ভ এবং পরমত অসহিষ্ণুতা বিশ্ববাসীকে শান্তির পথ দেখাতে এবং মানুষে মানুষে প্রেম ও মৈত্রীর রাখী পরাতে পারেনি। অথচ কত শত অত্যাচার সহ্য করেও এই সংস্কৃতি যে আজও তার বর্ণবৈভব ও মহিমা হারায়নি, তার কারণ সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছে মানবতার জয়গান, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর উদাত্ত বাণী। মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ যখন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও দেবদেবীদের প্রকৃতি নিয়ে বিবদমান, তখন ভারতের তপোবন থেকে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, ঋষিরা নানাভাবে বলে থাকেন। পাশ্চাত্য জগৎ যখন অস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছে, তখনও মুনি ঋষিরা উচ্চারণ করেছেন ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির সুমহান আদর্শ -'মা হিংসী, মা গৃধঃ' অর্থাৎ হিংসা কোরো না, লোভ কোরো না। তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন সনাতন ধর্মের অবিনাশী মন্ত্র — 'সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্' অর্থাৎ সকল স্থানে সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বর্তমান। পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, সবার মধ্যে জাগিয়েছে এক অখণ্ডবোধের চেতনা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' — এই ঋষি বাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বপ্রেমের সর্বোত্তম বাণী।

জার্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন -- 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে পৃথিবীর কোন দেশের আকাশের নিচে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবগুলি সঞ্চয় করেছে -- তাহলে আমি ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দেব। যদি আমরা পূর্ণতর মানবজীবন পেতে চাই - কেবলমাত্র ইহকালের জন্য নয়, অনন্ত জীবনের জন্য, তাহলে আমি আবার ঐ ভারতবর্ষের দিকে

দৃষ্টি ফেরাব।' পাশ্চাত্য ভারতবিদের এই সপ্রশংস মন্তব্যের জন্য আমরা সঙ্গত কারণেই গর্ব অনুভব করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জার্মান ভারতবন্ধু পৃথিবীর এত দেশ থাকতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষের ভীড়ে পর্যুদস্ত পরাধীন ভারতবর্ষের নাম করলেন কেন? কেনইবা এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের প্রতি ম্যাক্সমুলার সাহেবের এত গভীর শ্রদ্ধা?

এর কারণ ম্যাক্সমুলার ভারতবর্ষের গতিশীল সনাতন ধর্ম আর সংস্কৃতির মধ্যেই ভারতাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। বাস্তবিক, পৃথিবীর আর কোন দেশ এত উচ্চ কণ্ঠে মানবতা আর মহামিলনের মহাসঙ্গীত গেয়েছে? কোন্ দেশ ভারতবর্ষের মতো সত্য-শিব-সুন্দর আর শান্তম - শিবম - অদ্বৈতমের পূজারী হিসাবে দেশে দেশে নন্দিত হয়েছে? ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ দেশ সেই প্রাচীনকালেই দুন্দুভিনাদের মতো শুনিয়েছে বিশ্ব মানসের মর্মকথা — 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু'?

কোনও দেশই নয়। তাই দরিদ্র ভারতবর্ষের আত্মিক ঐশ্বর্য যুগে যুগে দূরের মানুষকে কাছে টেনেছে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সমবেত হয়েছেন নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষ। সব দেশের সব মানুষকেই এই দেশ আপন বলে বরণ করে আসছে। বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম আর উদার মানবতাবাদ ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে ঋণ নেয়নি। এইসব গুণাবলীর উৎস ভারতবর্ষ। পুরাণে আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা বালক ধ্রুবকে বর দিতে চাইলে তিনি বর না চেয়ে শুনিয়ে ছিলেন বিশ্বমানবতার অবিস্মরণীয় বাণী — 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য' — বিশ্বের স্বস্তি হোক। শিবি রাজা স্বর্গরাজ্য, পুনর্জন্ম কিছু চাননি, চেয়েছিলেন আর্ত মানুষের দুঃখমুক্তি — 'কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তি নাশনম্' — অর্থাৎ দুঃখতপ্ত প্রাণীদের যন্ত্রণার অবসান হোক। মহামুনি বাল্মীকি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়গান — 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' — মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। ঐ একই বাণী পরবর্তীকালে ধ্বনিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে — 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই।'

বৈদিক যুগের প্রার্থনা হল — 'আমরা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় অটুট রেখে শতাধিক বছর ভালোভাবে বেঁচে থাকি।' তৈত্তিরিয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশ স্মর্তব্য — 'সন্তান-সন্ততি প্রজননে অবহেলা কোরো না, সম্পদ অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ো না।' শুক্ল যজুর্বেদে প্রার্থনা করা হয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের — 'দেশে যেন শক্তিশালী মানুষ, সাহসী যোদ্ধা, দুগ্ধবতী গাভী, দেবীতুল্য নারী, রুচিবান যুবক জন্মগ্রহণ করে।' অন্নের দ্বারা মনকে পোষণ করতে নিষেধ করেছেন শম্বর মুনি — 'নৈনমন্নেন বীভবঃ'। ব্রহ্মপুরাণে তাকেই প্রকৃত সাধক বলা হয়েছে যিনি পরোপকারী, 'পরার্থোদ্যতঃ সদা'। অনিমাদি অষ্ট — সিদ্ধি বা মুক্তি না চেয়ে মহাত্মা রন্তিদেব প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন সকল দেহীর দুঃখ দূর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ঋষি-কণ্ঠে বিশ্ব শুনেছে সেই আশ্চর্য বাণী -- 'আনন্দ হতেই জীবসমূহ জাত। জীবগণ আনন্দ দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং অন্তিমকালে আনন্দেই প্রয়াণ করে।' দুঃখ ও বিষাদের জয়গান তাঁরা করেননি। 'দ দ দ - দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম' -- দান, দয়া এবং সংযমের যে উদাত্ত ধ্বনি ভারতের তপোভূমি থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, বিখ্যাত কবি টি এস এলিয়টের জন্য সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কেবল ধর্মকেই বোঝায় না। সাহিত্য - শিল্প সঙ্গীত, জ্ঞান-বিজ্ঞান -- সবকিছু নিয়েই এই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি অত্যন্ত উন্নত যা অনাদিকাল থেকে মানুষকে দিয়েছে উদার মানবিকতার আলো, মিটিয়েছে মনের ক্ষুধা। যেহেতু ধর্মই ভারতবর্ষের সবকিছু তাই এদেশের সংস্কৃতিও সৃষ্টি হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে ধর্মের সার তত্ত্ব। কাব্য হিসাবেও এগুলি অতুলনীয়। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় তথা বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কাব্য সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

ভারতীয় স্থাপত্য, শিল্প, ভাস্কর্য অতুলনীয়। এগুলি প্রায় ছ'হাজার বছরের পুরানো। স্বামী চেতনানন্দ একটি প্রবন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছেন -- 'প্রাচীন মিশরীয় শিল্প ঝোঁক দিয়েছে স্থায়িত্বের দিকে, যেমন পিরামিড। রোমক শিল্পে শরীর বিজ্ঞান ও বাহ্য সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ পেয়েছে। আসিরীয় শিল্প রূপায়িত করেছে দৈহিক শক্তিকে জাপান ও চৈনিক শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। আর ভারতীয় শিল্প অরূপকে অপরূপ করে দিয়েছে, ভারতীয় শিল্প বিশ্ব সভ্যতার কালোত্তীর্ণ সম্পদ।

ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাব সম্পদ সুরবৈচিত্র, যন্ত্র সঙ্গীতের অপূর্ব প্রয়োগ, ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের অসামান্য ছন্দোময় রূপ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর আগেও যে এদেশে শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা হত তার প্রমান মহেনজোদারো-হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে পাওয়া যায়। ঐ দুই নগরীর প্রাসাদ, স্নানাগার, রাস্তার যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বহু মানুষের ধারণা -- ভারতবর্ষে ধর্মের দেশ, এখানে বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলি বিজ্ঞান চর্চায় অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। কিন্তু আমাদের দেশেও যে প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল, সে খবর হয়ত অনেকের অজানা। মহাবিজ্ঞানী নিউটন, গ্যালিলিও প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের বৈদিক ঋষিরা বহু বৈজ্ঞানিক সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনের কথা ঋক্‌বেদে আছে। শূন্যের আবিষ্কারের কৃতিত্ব

ভারতীয় ঋষিদের। জ্যামিতির যথেষ্ট প্রয়োগও বৈদিক যুগে দুর্লক্ষ্য নয়। সুশ্রুত, চরক, ধন্বন্তরী প্রমুখ ক্ষণজন্মা চিকিৎসাবিদ্যার জনক। ৩৬৫ দিনে এক বছর, সূর্যের সাতটি রঙ, পৃথিবী গোল -- এসব তথ্য প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন ভারতীয় মুনিঋষিরাই।

ভারতবাসী হিসাবে সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানা আমাদের কর্তব্য। আজকের এই অবিশ্বাস, অবক্ষয় ও সংশয়ের যুগে একমাত্র সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদার বাণীই পারে হতাশ অশান্ত ও দিশাহারা মানুষকে সঠিক পথনির্দেশ দিতে। 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মামৃতং গময়' -- আমাদের অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও' -- এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞানগুরু অনির্বাণ

কয়েক বছর আগে হঠাৎ একটি বই হাতে আসে। বইটি শ্রীঅরবিন্দের 'Life Divine' -এর বঙ্গানুবাদ 'দিব্য জীবন'। অনুবাদক অনির্বাণ। পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম, কারণ ঠিক এই ধরণের অননুকরণীয় বাংলা গদ্য খুব বেশী পড়িনি। বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাসনে বসাতে দ্বিধা করিনি। পরে জেনেছি, অনির্বাণ বেদ-উপনিষদ-গীতার মহাভাষ্যকার, সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, আধ্যাত্ম জগতের এক জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র এবং পরম ভাগবত। আত্মপ্রচার বিমুখ এই সত্তম পুরুষ নিজের সম্বন্ধে জানিয়েছেন -- 'স্বরূপত আমি অনির্বাণ -- 'পরিব্রাজকার্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী' নই। গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর সারস্বত মঠের মোহন্ত হিসাবে এইসব উপাধি আমার প্রাপ্য ছিল -- কিন্তু আমার এটা সইল না।'

মহাযোগী অনির্বাণের জন্ম মৈমনসিংহে ১৩০৩ সনের ২৪শে আষাঢ় (১৮৯৬ খ্রীঃ)। পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। আশৈশব অসাধারণ ধী শক্তির অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থানাধিকারী। ধর্মপ্রাণ পিতা রাজচন্দ্র ধর ও ধর্মপ্রাণা মাতা সুশীলা দেবীর এই মেধাবী সন্তান রত্নটি কিভাবে ধাপে ধাপে পিতৃগুরু শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের কাছে প্রথমে ব্রহ্মচর্য ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বরদাচরণ ব্রহ্মচারী, নির্বানানন্দ সরস্বতী এবং অনির্বাণে বিকশিত ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন, সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। সে ইতিহাস সুতীব্র সাধনা, গভীর ধ্যান ও মহান সিদ্ধির দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। আসামের কোকিলামুখস্থিত আসাম বঙ্গীয় সারস্বতমঠে তিনি বারো বছর পরিচালক ছিলেন। ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত 'আর্যদর্পন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু অনির্বাণ রুক্ষ তপস্বী, নিছক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার এবং শুকনো জ্ঞান তাপস ছিলেন না, ছিলেন সহজিয়া বাউল। গৌরী ধর্মপাল বলেছেন -- 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প'।

নিতান্ত বালক বয়সেই অনির্বাণ তাঁর সারাজীবনব্যাপী সাধন প্রতিমার সাক্ষাৎ লাভ করেন গ্রামের ধূলিমলিন মেঠো পথে চলতে চলতে। একটি কিশোরী রূপের ডালি মেলে দিয়ে বালকের আগে চলেছেন আর মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে বালককে দেখছেন, মুখে রহস্যময় হাসি। তারপর এক সময় হঠাৎ তিনি মিলিয়ে যান। মিলিয়ে গেলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করে গেলেন বালককে। পরবর্তীকালে অনির্বাণ লেখেন -- 'যাঁকে খুঁজছিলাম তাঁকে পেয়েছি, কিন্তু এক অনির্বচনীয় রহস্যরূপে। ... স্পর্শজ্যা যেমন একটা বৃত্তকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে অনন্তে উধাও হয়ে যায়, তেমনি একেকটি মানুষকে ছুঁয়ে সে যেন অনন্তে মিলিয়ে যায়। হোমশিখারূপে আজও একে হৃদয়ে বহন করে চলেছি -- অনন্ত কাল ধরে চলব।' কিংবা 'ও যদি অমন করে ধরা না দিত, বেদের রহস্য বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হয় যে দৃষ্টিতে, ঋষির সেই দৃষ্টিতে কোন্ সুদূর অতীতে একদিন স্খলিত হয়েছিল বিবসনা বাণীর রূপ। সেই রূপ আমি দেখেছি ... আর প্রাণের ছন্দে তাকে হিল্লোলিত করে চলেছি। চম্পার আলোল কুন্তলের একটি গুচ্ছ কখনো এসে আলগোছে ছুঁয়ে যায় একবার, আর বুকের মধ্যে ফোয়ারা জেগে ওঠে।'

কে ঐ হঠাৎ আবির্ভূতা নারী? কে ঐ রহস্যময়ী অপরূপা? প্রখ্যাত লেখক-সাধক-সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা -- 'ইনি হলেন বৈদিক ঋষির 'অ-বসনা অনগ্না' বাণী, দেখা না দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতা বাক, যিনি -- বেদ বলছেন -- স্বয়ংবরা হয়ে বরণ করেন কোন কোন ভাগ্যবানকে, তাকে করেন সুমেধা, ঋষি, মহাতেজস্বী, সৃষ্টিধর।' অনির্বাণ ছিলেন বেদের অনবদ্য ভাষ্যকার। তিনি যখন দিলীপকুমারদের বেদ পড়াতেন, 'তখন ক্ষণে ক্ষণে এই আবৃতা-অনাবৃতা-বেদবাণীকে মূর্তি নিতে দেখেছি তাঁর প্রবচনে, এক একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত শব্দের অন্তঃপুর, মনে হত যেন অনাহত আঘাতে খুলে যাচ্ছে 'দেবীর দ্বারঃ', দ্যুলোকের জ্যোতির্দুয়ারগুলি, আর বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ ভাষা যেন গরুড় হয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই দ্যুলোক থেকে আলোকসুধা আহরণের জন্য'। রহস্যময়ী ঐ নারীকে অনির্বাণ নাম দিয়েছেন 'হৈমবতী', 'চম্পা', 'হ্রীঙ্কারবীজাক্ষরী পার্বতী' প্রভৃতি।

অনির্বাণের লেখা গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এগুলি হল ঃ-

১) দিব্য জীবন ঃ শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' -এর বঙ্গানুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের মতে গ্রন্থটি 'A living translation'.

২) দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ ঃ গ্রন্থটি দিব্যজীবন বইটির প্রবেশক হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩) যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ ঃ শ্রীঅরবিন্দের 'সিনথিসিস অফ যোগ' গ্রন্থের প্রবেশক।

৪) বেদ-মীমাংসা : বৈদিক সাহিত্য ভাবনা ও সাধনা সম্পর্কিত বহু তত্ত্ব এবং তথ্যে সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত।

৫) উপনিষৎ প্রসঙ্গ : ঈশ, ঐতরেয় ও কেন উপনিষদের ভাষ্য।

৬) গীতানুবচন : গীতারহস্য সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরমালা।

৭) বেদান্ত জিজ্ঞাসা : বেদান্তের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সরল আলোচনা।

৮) প্রবচন (১ম - ৪র্থ খণ্ড) : আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় নানা প্রসঙ্গ।

৯) পত্রলেখা (১,২,৩) : ধর্ম, দর্শন, যোগ, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ।

১০) পথের সাথী (১,২) :ধর্ম, দর্শন, যোগ, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ।

১১) কাবেরী কবিতাবলী

১২) স্নেহাশিস্ অধ্যাত্ম বিষয়ক পত্র সংকলন।

১৩) প্রশ্নোত্তরী অধ্যাত্ম বিষয়ক পত্র সংকলন।

১৪) দক্ষিণামূর্তি শঙ্করাচার্য রচিত স্তোত্রের ব্যাখ্যা।

১৫) শিক্ষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা।

১৬) সাহিত্য প্রসঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা।

১৭) পত্রং পুষ্পম্ পত্রাবলী।

১৮) অন্তর্যোগ প্রভৃতি।

অনুরাগী ও ভক্তদের নিয়মিত পত্র লিখতেন অনির্বাণ। প্রসাদ দাক্ষিণ্যে তিনি মুক্তহস্ত, অকৃপণ। বিমুখ করেননি কাউকেই। বহু জটিল কুটিল প্রশ্নের সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব মৌখিক ব্যাখ্যা তাঁর প্রবন্ধাবলী এবং পত্ররত্ন ভাণ্ডারে থরে থরে সাজানো রয়েছে। পত্রগুলি কেবল পত্র নয় — অননুকরণীয় গদ্যে লেখা অব্যর্থ পথনির্দেশ। 'ভাই, যত পারো — যতক্ষণ পারো ধ্যান করো' অনির্বাণ লিখছেন ভক্তকে, 'ঈর্ষা বিদ্বেষ সংকীর্ণতা ভুলে যাও — উদার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখ — বিরাটের অভিযান। ভাই, এই কি চিত্ত আঁধার করে রাখবার সময়? সম্মুখে দীপালি! লক্ষ প্রাণের দীপালি। লক্ষ প্রাণের বর্তিকা জ্বালিয়ে তোলো। তোমার প্রাণপ্রদীপের শিখা জ্বলে উঠুক — অমনি দেখবে অমন লক্ষ প্রদীপে মা'র আরতি হচ্ছে।' কয়েকটি উদ্ধৃতি উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যন্ত্রণায় আর্ত এক ভক্তকে অনির্বাণ লিখছেন — 'এই যে অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে চলেছেন — এও তো তাঁর করুণা, তাঁর প্রসাদ। নইলে আপনি হয় তাঁকে ভুলে থাকতেন, নয়তো ঠিক উলটো পথ ধরতেন আর

দশজনের মতন। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, Whoever chooses the Divine has already been chosen by the Divine আমরা তাঁকে যে চাইতে পারছি, এ তিনিই আমাদের চাইছেন বলে। এই কথা ধ্রুব জেনে অনন্ত প্রতীক্ষায় জেগে থাকুন। এই কষ্ট দিচ্ছেন তিনি মনের সমস্ত খাদ পুড়িয়ে আমাদের খাঁটি সোনা করবার জন্যই।' আর একটি রত্ন উদ্ধার -- 'বাস্তবিক, গোপী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভালবাসতে হবে ঠিক মেয়েছেলের মত, ঠিক মীরার মত। পুরুষভাব একেবারে বিসর্জন দিতে হবে। ... আর পুরুষভাব যদি নিতান্তই বিসর্জন দিতে না পারি, তাহলে থাকব তোমার কিশোর সখা হয়ে, তোমার মাঠে তোমার সঙ্গে ধেনু চরাব। এই আমার কাজ। কর্ম তো নয়, গোষ্ঠলীলা। দিনের বেলায় গোষ্ঠ আর রাত্রে কুঞ্জসেবা। তখন আর সখা নই, সখী, আমি তোমার সুবল, তোমার কর্মসখা, নর্মসখা -- গোপন কথাটি যার কাছে তুমি উদ্‌ঘাটিত করেছ, সে একাধারে তোমার সখা ও সখী দুই-ই। ... কিচ্ছু চাইবেন না তাঁর কাছে -- মুক্তি নয়, জ্ঞান নয়, পুনর্জন্ম নিরোধ নয়, সাধনার কৃচ্ছ্রতা বা ঐশ্বর্য বা বিভূতি কিছুই নয়। শুধু 'আমরা তোমায় ভালবাসি'। কখনও বা ব্যক্ত করেছেন নিজের উপলব্ধি অনায়াস সারল্যে। অনির্বাণ তখন সতের বছরের তরুণ। আশ্রমে এসেছেন কলেজের ছুটিতে। সন্ধ্যার পর আসনঘরের সামনে কেউ নেই, রয়েছেন কেবল গুরু ও শিষ্য -- স্বামী নিগমানন্দ ও অনির্বাণ। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। নির্মেঘ ঘন কালো আকাশ। হঠাৎ নিগমানন্দ শিষ্যকে ফিস ফিস করে বললেন -- 'এই যে কালো আকাশ দেখতে পাচ্ছ, এ ও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশ আলোর আকাশ। দিনরাতের পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে। সেখানে দিনরাত নাই। ব্রহ্ম যুগপৎ আলো এবং কালো -- এইটি যেদিন বুঝবে সেইদিন তোমার সম্যক জ্ঞান হবে। বলেই উঠে ভিতরে চলে গেলেন। সেদিন থেকে আমার চেতনায় এই নিয়ে আর কোনো দ্বন্দ্ব রইল না।' এইভাবে স্ফটিক-স্বচ্ছ ভাষায় তিনি জিজ্ঞাসু জনের অন্ধকার দূর করে দিতেন।

এই জ্ঞানতাপস মহাযোগী ছিলেন শীর্ণকায়, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রমী। গুরুগৃহে ছিলেন যখন, তখন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রম করতেন একুশ ঘন্টা। বিরক্ত হতেন না, বরং প্রাণের গভীরে প্রবাহিত হত খুশীর উচ্ছলন। তাঁরই অনুপম ভাষায়, 'মাটি কোপাতে হচ্ছে -- যেন সুন্দর করে কোপাতে পারি। ধান ভান্‌তে হচ্ছে, যেন সুন্দর করে ভান্‌তে পারি। ছাত্রদের বেদান্তের পাঠ দিতে হচ্ছে, যেন সুন্দর করে দিতে পারি। স্ত্রী যেমন করে স্বামীর সেবা করে, তেমনি করে সেবা করা। আর তাইতে বুক ভরে উঠত, চোখে আলো ফুটত, শিরায় শিরায় শক্তি আর আনন্দের স্রোত বইত।'

এই মধুর সমর্পণ, এই অনাসক্তি আর এই পরম ঈশ্বর নির্ভরতাই তাঁকে করে তুলেছে মহান সাধক। আর তার সঙ্গে রয়েছে গভীর সাধনা। 'কর্ম তখনই সুন্দর হতে পারে যখন তার মধ্যে থাকে ভূমার স্পর্শ' -- মন্ত্রের মতো অমোঘ এই বাক্যটি তো

অনির্বাণেরই। এই ভূমা-স্পর্শ, এই ভূমা-স্বাদ, এই ভূমা অনুভব প্রতি মুহূর্তে লাভ করতেন বলে তাঁর সমস্ত কাজই পূজা হয়ে উঠত।

‘ছোটবাবা’ ও শ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী

‘তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ণ আনন্দের অধিকারী শ্রী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় তাঁর মহান গুরু শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীকে। পূর্ণানন্দ ছিলেন বালানন্দজীর প্রথম মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। ‘ছোটবাবা’ নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন তারানন্দজীর সাধনপথের দিশারী, গুরুতুল্য গুরুভাই এবং ‘সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা।’

পূর্ণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম শ্রী পূরণচাঁদ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার জনাই গ্রামে ১৮৭৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী, ঈশ্বরগতপ্রাণ। ধর্মসভায় বৃদ্ধদের মধ্যে বালক পূরণচাঁদকে দেখা যেত — একমনে শুনছেন বেদ-উপনিষদ-গীতার আলোচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সবান্ধব ‘বুদ্ধদেব’ নাটক দেখতে যান। ঐ নাটক এবং বুদ্ধদেবের জীবনী তাঁর মনে গভীর দাগ রেখে যায়। বাবা মা জীবিত থাকতেই পূরণচাঁদ আশ্রয় ও দীক্ষাগ্রহণের জন্য ‘সচল শিব’ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে যান। কিশোর বৈরাগীকে যোগিবর বাবা মায়ের অনুমতি আনতে বলেন। পূরণচাঁদ ব্যর্থ হন। মাতৃবিয়োগের পর বাবা দুর্গাচরণের সম্মতি নিয়ে তিনি আবার যান বালানন্দজীর কাছে। এবার আর বিমুখ করলেন না কৃপাসিন্ধু মহাত্মা। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নাম হল পূর্ণানন্দ। অল্পদিনেই শ্রীগুরুর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র, একনিষ্ঠ সেবক ও বিশ্বস্ত পার্শ্বচর হয়ে সকলের কাছে ‘ছোট বাবা’ রূপে পরিচিত হলেন। শ্রীগুরুর শিক্ষা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁকে ধীরে ধীরে সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিল।

শঙ্করাচার্যের মতো বালানন্দজীরও ইষ্টদেবী শ্রীশ্রী বালেশ্বরী। পূর্ণানন্দজী এই মূর্তি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন এবং বালানন্দজী কর্তৃক করণীবাদ আশ্রমে তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী (জন্ম ১৮৭৫ - মহাপ্রয়াণ ১৯০১) তরুণ বয়সেই বালানন্দজীর আশ্রয় প্রার্থী হবার আশায় গৃহত্যাগ করেন। সাধক সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে তার দাদা পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দেওঘর রামনিবাস আশ্রমে সেই প্রথম দুজনের দেখা এবং কথোপকথন। সাক্ষাৎকারের সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতি তারানন্দজী কখনও বিস্মৃত হননি। সেইসব কথা কোনও ভক্ত জিজ্ঞেস করলে স্বল্পবাক শ্রীমহারাজের যেন মুখের আগল খুলে যেত। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক তরুণের সঙ্গে সেদিন তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন, সহযোগিতার যে উদার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। পূর্ণানন্দজীর নির্দেশেই তরুণ তারকদাস চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে তারানন্দ ব্রহ্মচারী) তপোবনে বালানন্দজীর কাছে যান। বালানন্দজী তাঁকে মায়ের অনুমতি আনতে বলেন। ফিরে যান তারকদাস বিধবা মা শৈলনন্দিনী দেবীর কাছে। মা অসম্মত হলেন। অগত্যা পলায়ন এবং দেওঘর গমন। আবার দেখা করলেন 'ছোট বাবা'র কাছে, জানালেন সব কথা। পূর্ণানন্দজী বললেন 'আবার তপোবনে গুরুজীর কাছে যাও। তাঁকে বলো, মায়েরা যে সহজে মত দিতে চান না, এ তো আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনার যদি ইচ্ছে হয় আমাকে রাখুন, না হলে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো।'

পূর্ণানন্দজীর কথানুযায়ী তারকদাস বালানন্দজীকে সব কথা জানালেন। এবার আর প্রত্যাখ্যাত হলেন না। আশ্রমবাসী হবার নির্দেশ পেলেন। পূর্ণানন্দজী না থাকলে তরুণ, অনভিজ্ঞ তারকদাস কি এত সহজে যোগাবতারের সম্মতি আদায় করতে পারতেন?

পূর্ণানন্দজীর সহায়তায় তারকদাস পেলেন বালানন্দজীর শারীরিক সেবার গুরু দায়িত্ব। দীক্ষাগ্রহণের পর তারকদাসের নামকরণ করা হল তারানন্দ — শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী। তরুণ তারানন্দকে যোগ ও নানাবিধ সাধনক্রিয়ায় সুদক্ষ করে তুললেন ছোট বাবা। তিনিই তারানন্দজীকে দিয়ে ছিলেন করণীবাদ আশ্রমের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজার ভার। তাঁর চেয়ে প্রায় ছাব্বিশ বছরের ছোট তারানন্দজীকে তিনি পাণিনি ব্যাকরণ থেকে শুরু করে যাবতীয় হিন্দু শাস্ত্র অনুধাবন করতে সাহায্য করেন। নিজ গুরু এবং ছোট বাবার কাছ থেকে তারানন্দজী শিখেছিলেন দৈব ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা ব্যাধি নিরাময়ের বিদ্যা। ছোট বাবা তাঁকে নিয়ে তীর্থ পরিক্রমাও করেছেন।

পূর্ণানন্দজীর উপদেশগুলি তারানন্দজীকে খুবই অনুপ্রাণিত করত। ভক্ত-সঙ্গে প্রায়ই তিনি ছোটবাবার উপদেশগুলি বলতেন। একটি উপদেশ এখানে উদ্ধৃত হল —

'লোকে রিষ্টওয়াচ পরে সংসারের কত কাজ করে বেড়ায়, কিন্তু তার হাতের ঘড়ি নিজের নির্দিষ্ট পথে অনবরত টিক টিক করে যায় -- একটুও ব্যতিক্রম হয় না -- তেমনি মনের মধ্যে একটি রিস্টওয়াচ পরে থাকতে হবে। সংসারের সব কাজের মধ্যে মন যেন সেই এক নামে শ্রীভগবানের দিকে, তোমার ইষ্টমন্ত্রে অনুক্ষণ লেগে থাকে -- দাঁতের ফাঁকে সুপারির টুকরা আটকানোর মত।'

গৌরবর্ণ, সুদর্শন তারানন্দ ব্রহ্মচারী যে উচ্চস্তরের সাধক হয়ে উঠছেন পূর্ণানন্দ তা লক্ষ্য করছিলেন। নেপাল পরিভ্রমণকালে তিনি তরুণ ব্রহ্মচারীকে বলেন যে কেউ যদি দীক্ষা নিতে চায় তারানন্দজী যেন অমত না করেন। তাঁর নির্দেশ পাবার পর তারানন্দজী দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

বারো বছর তারানন্দজী ছোটবাবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন (১৯২১-১৯৩৩)। তারপর এলো 'শেষের সে দিন'। বাংলা ১৩৪০ সনের ৭ই ভাদ্র গুরুদেবের কোলে মাথা রেখে আত্মপ্রচার বিমুখ মহাসাধক ছোটবাবা, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মলীন হন। তারানন্দ ব্রহ্মচারীর মতে, তাঁর মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু।

ছোটবাবা সম্বন্ধে তারানন্দ মহারাজ লেখেন -- 'পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন সমাধি সিদ্ধ। এই ভূমিতে আরূঢ় হইয়া তাহার ফল উক্ত সমাধি যোগে প্রত্যক্ষ করিয়া 'সরল যোগ সাধন' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু কঠোর তপস্যা ও আরাধনা দ্বারা বালাত্রিপুরাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। এক কথায় তিনি মাতৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" তারানন্দজী গুরুতুল্য এই সাধকের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন মাতৃসেবার আদর্শ। 'ভাই! এ আশ্রমে যা কিছু দেখছো সবই তোমার, অথচ কিছুই তোমার নয়' -- ছোটবাবার এই 'একটি মাত্র উপদেশ ধ্রুবতারার মত কার্য করিয়া এ জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে ও করিতেছে' -- তারানন্দজী লেখেন। ছোটবাবার মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় দুটি শোকগাথা রচনা করে তাঁর প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেন। বাংলা শোকগাথার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ-

'যে আদর্শ মহান রেখে গেলে তুমি
নিত্য ধ্রুবতারাসম থাকিয়া সম্মুখে।
দেখাইবে পথ সদা অন্ধকার রাতে
এই তব সান্ত্বনা-বারি জীবনের পথে।'

রিষড়া প্রেম মন্দিরে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির পাশে তারানন্দ ব্রহ্মচারী যে দুই সাধকের প্রতিকৃতিকে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী, অন্য জন হলেন তাঁর 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যাণ্ড গাইড' শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। তারানন্দজীর জীবন ও সাধনায় তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

গুরু, সৎগুরু, গুরুভক্তি

কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, মানব-জীবনে তেমনি গুরু ছাড়া গতি নেই। সারা জীবনেই মানুষকে বিভিন্ন গুরুর সংস্পর্শে আসতে হয়, কেননা 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। গুরুই শেখান। তাঁর হাত ধরেই মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করে। জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দিয়ে তিনি অনুগত শিক্ষার্থীর চক্ষু উন্মীলন করে দেন।

শৈশবে পিতা মাতা এবং ছাত্রজীবনে শিক্ষকই গুরু। শুধু গুরু নন, মহাগুরু। শাস্ত্রে এঁদের দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত জগতে গুরুর মর্যাদা ও সম্মান অপরিসীম। এক একজন বড় বড় ওস্তাদ শিষ্যের কাছ থেকে উচ্চস্তরের ধর্মগুরুর মতোই শ্রদ্ধা ও সম্মান পান। ধর্ম বা সম্প্রদায় সে ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। যে কোনো বিষয়ে কিছু শিখতে বা জানতে হলে গুরুর শরণাপন্ন না হলে চলবে না।

ধর্মজগতে প্রবেশের জন্য গুরুকরণ অপরিহার্য। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। উপযুক্ত গুরু ছাড়া ধর্মাচরণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশে চলে আসছে গুরু-শিষ্য পরম্পরা। ভাবতে অবাক লাগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু ছিলেন। পৌরাণিক যুগের বহু বিখ্যাত গুরুর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। রাজ দরবারে গুরু বা আচার্য প্রবেশ করলে স্বয়ং রাজা মশাই সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতেন। এমনই ছিল গুরুর মর্যাদা।

মহাত্মা কবীরের ভাষায়, 'গুরু চন্দন সুবাস' -- অর্থাৎ গুরু হচ্ছেন সুবাসযুক্ত চন্দন, 'গুরু পারশ' – অর্থাৎ গুরু পরশ পাথর, 'গুরু নূর তমাম' – অর্থাৎ গুরু পূর্ণ জ্যোতি স্বরূপ। প্রকৃত সৎগুরুর অপার মহিমার কথা কি বলে শেষ করা যায়? গুরু আর গোবিন্দ একই সঙ্গে উপস্থিত হলে প্রথম প্রণামটি গুরুকেই করতে হয়, কারণ তিনিই তো চিনিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দকে। যে সৎগুরু পায়নি, আকাশে কোটি চন্দ্র-সূর্যের উদয়েও তার চতুর্দিক অন্ধকার। যেখানে সৎগুরু, সেখানে আলো – সেখানে শান্তি -- সেখানে চিরবসন্ত।

বাস্তবিক, প্রকৃত সৎগুরুর দর্শন ও কৃপা লাভ করলে বিলীন হয়ে যায় জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার। প্রথম দর্শনেই চেনা যায় এমন সৎগুরু। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন -- 'প্রকৃত গুরুর দর্শন মাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরো নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইবা মাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায় -- মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান' (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)।

গুরুর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় শ্রীমদভাগবতে বর্ণিত অবধূতের উপাখ্যানের কথা। ধর্মজ্ঞ যদু এক অবধূতকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিভাবে তিনি সংসার সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে এবং সানন্দে পৃথিবী পর্যটন করছেন। উত্তরে অবধূত বললেন যে তিনি চব্বিশ জন গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। এই চব্বিশজন গুরুর নাম -- পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ , মধুমক্ষিকা, হস্তী, ব্যাধ, হরিণ, মীন, গণিকা পিঙ্গলা, কুরুর পক্ষী, বালক, কুমারী, শর নির্মাতা, সাপ, মাকড়সা এবং কাঁচপোকা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইসব গুরুর কাছ থেকে অবধূত কি কি শিক্ষা লাভ করেছেন তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে।

গুরুসেবক শিষ্য কেমন হবে? শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে সে 'নিরহঙ্কার, মাৎসর্যহীন, নিরলস, মমতাশূন্য, গুরুভক্তিপরায়ণ, অব্যগ্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হবে এবং অসূয়া ও বৃথালাপ পরিহার করবে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে আত্মার প্রয়োজন সমান দেখে উদাসীন হয়ে সে শুধু গুরুর উপাসনা করবে।

'আচার্য হলেন নিম্নস্থিত অরণি, শিষ্য উপরিস্থিত অরণি, আচার্য্যের উপদেশ মধ্যস্থিত অরণি, আর এদের সংযোগের সমুৎপন্ন বিদ্যা অগ্নি;এই অগ্নিই অজ্ঞান রাশিকে দগ্ধ করে। নিপুণ শিষ্য অতিবিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা লাভ করে গুণসম্ভূত মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং এই বিশ্বের কারণ স্বরূপ গুণরাশি ভস্মীভূত করে ইন্ধন শূন্য অগ্নির মত নিজেও বিরত হয়।'

আত্মানন্দ ও আত্মজ্ঞান গুরুসেবার দ্বারাই লাভ করা যায় --
'গুরুসেবাপ্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে
অনেন গুরুমার্গেন আত্মজ্ঞানং প্রবর্ততে (গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা)।

আর কেউ নন, এই পৃথিবীতে শিষ্যের ইহকাল পরকালের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন গুরু। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি শিষ্যের সমস্ত পাপের ভার গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ চমৎকার বলেছেন -- 'পাপের ভার গুরুকে

বা ভগবানকে দিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের ভাগও দিতে হয়। খালি দুঃখভোগের অংশটি দিলুম আর সুখভোগের অংশটি নিজের জন্যে রাখলুম তাহলে তোমারও ঠিক ঠিক দেওয়া হয় না, তাঁরও নেওয়া হয় না। ... গুরুর উপর যদি বিন্দু মাত্র ভালবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি থাকে তাহলে নিজের যত ময়লা আবর্জনাগুলো তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করাতে কি প্রাণ চাইবে? গুরু কি ময়লা ফেলার গাড়ি না কি? যাদের সে ভালবাসা ভক্তি নেই, যারা ঘোর বিষয়ী, স্বার্থপর, তাদেরই এইরকম হীনবুদ্ধি হয়। তারা তো শিষ্য বলেই গণ্য হবার উপযুক্ত নয়। আর যাদের গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আছে, তারা সেই ভয়ে আর পাপ কাজ করতে পারবে না, পাছে গুরুকে ভুগতে হয়। হ্যাঁ, এই রকম শিষ্যের পাপের ভার তিনি নেন। বস্তুতঃ ভগবানই গুরুরূপে তার ভার গ্রহণ করেন ও তাকে উদ্ধার করেন।'

স্বামী বিরজানন্দ স্বীকার করেছেন যে শিষ্যের কিছু পাপ গুরুতে আসে। 'কারণ প্রায়ই দেখা যায়, নির্বিচারে অনেককে মন্ত্রদীক্ষা দিলে সদগুরুর নিষ্পাপ শরীরে কঠিন রোগ আশ্রয় করে তাঁর আয়ুক্ষয় করে। স্বার্থশূন্য পরম কারুণিক সদগুরু জেনেশুনে পরের হিতের জন্যে তাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার প্রেরণায় নিজের শরীরের জন্য ভাবেন না, শিষ্যদের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে দান করেন। ... ঠাকুর বলতেন, গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি' (পরমার্থ প্রসঙ্গ)।

সৎগুরুর মতো অসাধারণ গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্যের কথাও আমরা জানি। ভক্তশ্রেষ্ঠ একলব্যের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

একলব্য ছিলেন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গেলে অস্ত্রগুরু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ একলব্য নিষাদপুত্র। বিষণ্ণ একলব্য বনে চলে গেলেন। সেখানে দ্রোণের মূর্তি গড়ে এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে একনিষ্ঠভাবে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন। কালক্রমে এই বিদ্যায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করলেন।

একদিন অর্জুন ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে আচার্য দ্রোণ ঐ বনে মৃগয়া করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল। জটাবল্কলধারী ধ্যানমগ্ন একলব্যকে দেখে সে চিৎকার করতে লাগল। একলব্যের ধ্যান ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে তিনি সাতটি শব্দভেদী বান মেরে কুকুরের মুখের শব্দ বন্ধ করে দিলেন। কুকুর সেই অবস্থায় দ্রোণ ও তাঁর শিষ্যদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা কুকুরের ঐ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং শরনিক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে ধ্যানরত একলব্যের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। একলব্য নিজেকে দ্রোণের শিষ্য বলে পরিচয় দিলেন।

অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে গুরু তাঁদের সর্ববিদ্যায় পারদর্শী

করেননি। তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বীর যে জগতে আছেন এতক্ষণে তিনি তা বুঝতে পারলেন।

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রোণ নিষাদপুত্রের কাছে এসে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। একলব্য আগের মতোই বললেন যে তিনি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। দ্রোণ একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দক্ষিণাস্বরূপ চাইলেন। গুরুভক্ত একলব্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ আঙুলটি কেটে গুরুকে দিলেন। গুরুভক্তির এহেন নিদর্শন দুর্লভ। শঙ্করাচর্যের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য সনন্দনের গুরুভক্তিও অতুলনীয়।

সনন্দন একদিন কোনো কাজে অলকানন্দার ওপারে গিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য সেইসময় তাঁর প্রিয় শিষ্যকে খুঁজছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শিষ্যও ছিলেন। হঠাৎ একজন শিষ্য সনন্দনকে দেখতে পেলেন নদীর ওপারে।

শঙ্করাচার্য ব্যাকুলভাবে তাঁকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। সনন্দন গুরুর আহ্বান শুনতে পেয়ে ভাবলেন, নিশ্চয় তাঁর গুরু কোনও সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন। দ্রুত পৌঁছবার জন্য তিনি তীব্র খরস্রোতা নদীতে নামতেই তাঁর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্ম ফুটে উঠল। আর ঐ পদ্মের ওপর পা ফেলে ফেলে অনায়াসে দ্রুত নদী পেরিয়ে তিনি আচার্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঐ দৃশ্য দেখে শিষ্যরা অভিভূত হলেন। শঙ্করাচার্য সনন্দনকে বললেন, পদ্মের ওপর পা ফেলে তুমি খরস্রোতা নদী পার হয়েছো। তাই আজ থেকে তোমার নাম হল পদ্মপাদ। এই নামেই তুমি বিখ্যাত হবে।

আর একটি ঘটনা।

হত্যার উদ্দেশ্যে এক অমাবস্যার রাতে উগ্রভৈরব শঙ্করাচার্যকে নিয়ে এসেছে গভীর অরণ্যে। ছিন্ন করা হবে তাঁর মস্তক। উগ্রভৈরব তাঁকে বুঝিয়েছে, সে যদি কোন রাজা বা সর্বজ্ঞের ছিন্ন শির দিয়ে রুদ্রের হোম করতে পারে, তবে সে শিবলোকে স্থান পাবে। তাই সে আচার্য শঙ্করের শরণাপন্ন হয়েছে। শঙ্কর রাজীও হয়েছেন তাঁর প্রস্তাবে।

সবকিছু প্রস্তুত। আচার্য একটু সময় চেয়ে নিয়ে যোগাসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন।

এদিকে পদ্মপাদ হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন, এক ভয়ঙ্কর কাপালিক গহন অরণ্যে "তাঁর গুরুদেবের মস্তক ছেদনে উদ্যত হয়েছে। স্বপ্নভঙ্গের পর তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর আরাধ্য নৃসিংহদেবকে স্মরণ করে গুরুদেবের জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহদেব তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। পদ্মপাদ ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে অরণ্যে প্রবেশ করে উগ্রভৈরবের উদ্যত খড়্গ কেড়ে নিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। পদ্মপাদের গুরুভক্তি সতীর্থদের বিস্মিত করল।

‘এই অগাধ ভবজলধি উত্তরণের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুকৃপা। বিশেষ করে আচার্য শঙ্করের মতো ‘মহাপুরুষ সংশ্রয়’ বাস্তবিকই দুর্লভ। এ হেন গুরুকৃপার ফলে মাধকের লাভ হয় চতুবর্গফল, আত্মকামের আত্মদর্শন হয় ‘করামলকবৎ’। অবশ্য গুরু দেহমাত্র নন। দেহের মধ্যে দেহী বাস করেন চিদ্‌রূপে, সেই চিৎ শক্তিই প্রকৃত গুরুশক্তি’ (আচার্য শঙ্কর - স্বামী অপূর্বানন্দ)।

সংসার, কবীরের ভাষায় ‘কাগজকী পুড়িয়া’, ‘কাঁটকী বাড়ী’, ‘ঝাড় ঔ ঝাঁখর’ অর্থাৎ সংসার কাগজের পুরিয়া, কাঁটায় ভরা, কাঁটার ঝাড়। এ থেকে বাঁচবার উপায় কি?

উপায় সৎগুরু সংশ্রয়। তিনিই ঘুচিয়ে দেন চোখের পর্দা -- ‘পরদা দূর করৈ আঁখিনকা’। তিনিই ব্রহ্মদর্শন করান -- ‘ব্রহ্ম-দরস দিখলাবৈ’। তাই তনু-মন-প্রাণ গুরুকে অর্পণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গুরুসেবাই মোক্ষফল -- ‘গুরু কি সেবা মুক্তিফল’।

মূর্তিমতী দিব্যচেতনা ঃ শ্রীমা

'তোমরা যারা অশ্রুপাত করছ, যারা কষ্ট পাচ্ছ, যারা ভয়ার্ত, জান না কতদিন চলবে তোমাদের এই দুর্দৈব, এ দুঃখের কি ফল, তাকিয়ে দেখ ঃ এমন রাত্রি নেই যার শেষে প্রভাত আসে না, অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয় তখনই প্রভাত আসন্ন, ... এমন ঝড় নেই যার শেষে সে এঁকে ধরে না তার বিজয়ের ইন্দ্রধনু।'

আর্ত ও পরাজিত মানুষকে যিনি উজ্জীবিত করেছেন 'মাভৈঃ' মন্ত্রে, গহন রাত্রির শ্বেতশুভ্র আভা থেকে যিনি 'সিদ্ধির গুপ্ত পথ' আর 'আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সব রহস্য' পাবার সন্ধান বলে দিয়েছেন, উচ্চারণ করেছেন সেই অমোঘ বাণী – 'দীনতা হীনতার অন্তরেই লালিত পালিত হয় মহান মহিমা' – তিনি মহাসাধিকা, জগজ্জননী, পণ্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সর্বজনপূজ্যা শ্রীমা।

শ্রীমায়ের জন্ম প্যারিসে, ১৮৭৮ সালের ২২ -এ ফেব্রুয়ারী। নিজের কথা বলতে গিয়ে মা নিজেই জানিয়েছেন, সাত বছর বয়সের আগে শুরুই হয় তাঁর লেখাপড়া। অথচ তাঁর যোগের শুরু মাত্র চার বছর বয়সে। ছোট্ট একটা চেয়ারে বসে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন আর মাথার ওপর একটা তীব্র আলো এসে তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে তোলপাড় করে দিত। ক্রমশ তিনি অনুভব করতে লাগলেন বৃহৎ কোনও ভগবৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি যেন ঈশ্বর-প্রেরিত।

একটু বেশী বয়সে মা স্কুলে ভর্তি হন। তিন বছর পর থেকে প্রতি শ্রেণীতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী। প্যারিসের কাছে এক বিখ্যাত বনে ছেলেবেলায় বেড়াতে গিয়ে কোনো এক বহু প্রাচীন গাছের নীচে তিনি চুপটি করে বসে থাকতেন আর সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় হয়ে যেতেন। ঐসব প্রাচীন গাছগুলির সঙ্গে তিনি তাঁর অন্তরের গভীর সংযোগ অনুভব করতেন। ঐসময় পাখি আর কাঠবিড়ালীরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে ছুটে আসত, তাঁর গায়ে বসত। নানা ধরণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁর হতো ঐ অল্প বয়সেই। ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংশয় রইল না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হওয়াও যে অসম্ভব নয়, সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত হলেন। ঘুমের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুরুদের সান্নিধ্য অনুভব করতেন এবং তাঁর

আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি কিভাবে কার্যকরী করা যায়, সে সম্পর্কে তাঁরা তাঁকে শিক্ষা দিতেন। মা জানিয়েছেন — 'এঁদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল। .... তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করলাম।' মা এ-ও জানতেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে দিব্যকর্ম সাধন করতে হবে।

১৯১৪ সালের ২৯-এ মার্চ স্বামী পল রিশারের সঙ্গে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে আসেন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনিই সে ব্যক্তি যাঁকে তিনি 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতেন। পরে শ্রীমা যখন পণ্ডিচেরী আশ্রমের অতিথিশালায় থাকতেন, তখন শ্রীঅরবিন্দ দেখতেন শ্রীমায়ের হাত ধরে রয়েছেন বালক কৃষ্ণ।

শ্রীঅরবিন্দকে দেখবার পর শ্রীমা ১৯১৪ সালের ৩০এ মার্চ লেখেন — 'আজ আমরা যাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম, তিনি তো এই পৃথিবীতেই এখন বাস্তব হয়ে অবস্থান করছেন, তাঁর এই উপস্থিতিটাই এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে এমন একদিন শীঘ্র আসছে যখন এই নিগূঢ় অন্ধকার উজ্জ্বল আলোকে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তোমার স্বর্গরাজ্য একদিন সত্য সত্যই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

শ্রীঅরবিন্দকে গুরু হিসাবে বরণ করে শ্রীমা তাঁর স্বামীর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে থেকে গেলেন। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তাঁরা প্যারিসে ফিরে গেলেন। কয়েকবছর পরে শ্রীমা একাই চলে এলেন পণ্ডিচেরীতে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

১৯২৬ সালের ২৪ -এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণসিদ্ধি লাভের পর আশ্রমের দায়িত্বভার শ্রীমা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অকল্পনীয় ছিল তাঁর কর্মশক্তি, সাংগঠনিক প্রতিভা ও পরিচালন ক্ষমতা। মূলতঃ তাঁর উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই আশ্রম ধীরে ধীরে অনেক বড়ো হয়ে উঠল। খোলা হল অনেকগুলি বিভাগ — কৃষি, শিল্প, পূর্ত, পোষাক তৈরী, খাদ্য, ডেয়ারী, পোলট্রি, বেকারী, কুটিরশিল্প, ছাপাখানা, জুতো তৈরী, ঔষধালয়, যন্ত্র মেরামতি, কাগজ তৈরী প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত হল শ্রীমার গড়া বিশ্ববিদ্যালয় — শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র, যার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগের সুষম সমন্বয় সাধন শ্রীমা চাইতেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে — শ্রীমা জগন্মাতা, তাঁর চার স্বরূপ — মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষী, মহাসরস্বতী। তিনি আবার দেশমতৃকারূপিনীও। বিশ্বকল্যাণের কাজে তিনি এই শক্তিগুলি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন — 'মা হলেন শাশ্বত দিব্য শক্তি। এখানে তিনি দেহ ধারণ করে এসেছেন এমন কিছু এই বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার জন্য, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।' কি সেই জিনিস? তা হল অতিমানস চেতনা — মর্ত্যমানবের

মহামানবে জ্যোতির্ময় রূপান্তর। এরজন্য করণীয় কী? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন -- The Mother herself is the destination, everything is in her' অর্থাৎ মাই-ইগন্তব্যস্থল, সবই আছে তাঁর মধ্যে। তাই ডাকতে হবে তাঁকে অকপট বিশ্বাসে, শিশুর সারল্যে, ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে। সংশয়, সন্দেহ, হতাশা, অবিশ্বাস মনের জমিতে পুঁতে দিতে পারে জবরদখলের পতাকা, আলেয়ার মতো হাতছানি দিয়ে ডাকতে পারে কামনা বাসনার রামধনু-আলো। কিন্তু যত বাধাই আসুক না কেন, শ্রীমা বলছেন, কেউ যেন হাল ছেড়ে না দেয়। 'যখন গহন রাতের অন্ধকারে নিতান্ত একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ, তখন দেখবে তার মাঝেই জ্বলছে অমূল্য মাণিমানিক্য, সেগুলিকে নিজের মধ্যে সঞ্চয় কর। কেবল নিজের অন্তরকে অকপট রাখো, তাহলে সবচেয়ে মন্দের ভিতর থেকে সবচেয়ে ভালো জিনিস তোমার মিলে যাবে।'

অকপটে সব কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে। তিনি মা। শুধু একজনের কাছেই আত্মসমর্পণে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই। তিনিও মা। চারিদিকে যখন অহং উদ্যত বর্শা, 'কামাদি ছয় কুমীর', তখন মা নামের দুর্গে বাস করাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। মায়ের কণ্ঠে তাই শুনি অভয়মন্ত্র -- 'আমার এই হাত দুটির মধ্যে আশ্রয় নাও -- তা তোমাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবে।'

সব সময়েই মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে মাকে। তারপর একসময়ে অনুভূত হবে তাঁর দিব্য উপস্থিতি। তিনিই অসত্য থেকে সত্যের পথে জীবনকে চালিত করবেন।

শ্রীমায়ের রচনাবলী কালজয়ী সম্পদ। সেগুলি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মূল্যবান আকর স্বরূপ। অনবদ্য তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা বিষয়ক লেখাগুলি। একটি দৃষ্টান্ত --

'নীরবতা নেমে আসে, তারপর আস্পৃহার অনলশিখা জ্বলে ওঠে, তখন দেহ ভরে ওঠে এক কবোষ্ণতায় বিশেষ করে হৃদয় থেকে মস্তিষ্ক অবধি, আর সেই উষ্ণতা হল পরম আনন্দে ভরা রূপান্তরের এক প্রবেগ।

'হে আমার মধুময় অধিরাজ, আমার দয়িত ভগবান, সকল সত্তা আমার এক অদম্য প্রবেগে উচ্চকণ্ঠে জানায় তোমায় ঃ আমি তোমায় ভালবাসি! আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি!'

শ্রীমা ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। অসংখ্য মানুষ তাঁর এই শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, আরোগ্য লাভ করেছেন নানা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে, উদ্ধার পেয়েছেন কত না বিপদ - আপদ থেকে। কল্যাণময়ী মা বিমুখ করেননি কাউকে। তিনি যে চিরন্তনী জননী!

১৯৭৩ সালের ১৭ই নভেম্বর, ছিয়ানব্বুই বছর বয়সে শ্রীমা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস, ব্যাকুলভাবে ডাকলে আজও তিনি সাড়া দেন।

মহাযোগীদের লীলা বিভূতি

যোগসিদ্ধ সাধু মহাত্মাদের এমন অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ও লীলা-বিভূতি থাকে 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।' এইসব মহাসাধকরা অবশ্য একেবারেই তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে চান না। বরং এগুলি তাঁরা অপছন্দ করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাঁদের যোগ-বিভূতি দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

এখানে বিখ্যাত কয়েকজন যোগীর কিছু অলৌকিক ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ হল।

★★★

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর নানা অলৌকিক যোগ-বিভূতির কথা সর্বজনবিদিত। আজ ঘরে ঘরে তাঁর নিত্যপূজা, নিত্য অনুধ্যান।

চন্দ্রকান্ত পাহাড়ে তপস্যামগ্ন বিখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল দাবানল। বন্য প্রাণীদের আর্ত চিৎকারে ধ্যান ভঙ্গ হল তাপসের। এই প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিবলয় থেকে নিস্তার পাবার কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে স্মরণ করতে লাগলেন ইষ্টদেবকে।

হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণের সামনে আবির্ভূত হলেন জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী। বিপন্ন বিজয়কৃষ্ণকে তিনি কোলে তুলে নিয়ে অদাহ্য অবস্থায় ঐ আগুনের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে এলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে যিনি নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

আর একদিন। বিজয়কৃষ্ণ তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন বারদীতে। তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ভক্তভ্রমর শ্যামাচরণ বকসী। তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা — 'আমার গুরুদেবকে বাঁচিয়ে দাও বাবা।'

লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রসন্ন চিত্তে শ্যামচরণকে ঢাকা ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন — 'আমি নিজে যাবো বিজয়ের কাছে।'

কথা রাখলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। যে রুগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব, সেই বিজয়কৃষ্ণ রোগমুক্ত হলেন। যাঁরা তাঁর সেবা করছিলেন, তাঁরা সবাই দেখেছেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণের শিয়রে বসে রয়েছেন। সূক্ষ্ম দেহে যত্রতত্র যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

খুনের মামলার আসামী নিবারণ রায়ের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আসামী এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনরা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। নিবারণ দিনরাত কেবল ডেকে যাচ্ছেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে — 'বাবা! রক্ষা কর! আমাকে বাঁচিয়ে দাও!'

ব্যাকুল প্রার্থনায় সাড়া দিলেন লোকনাথ। বন্ধ কারাগার, বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। হঠাৎ কারাগারে, নিবারণের সামনে দীর্ঘকায়, জ্যোতির্ময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

— 'কে আপনি?' বিস্মিত আসামীর প্রশ্ন।

— 'তোর মামলার রায় লিখিয়ে দিয়ে এলুম।'

— 'মামলার রায়?'

—'হ্যারে। তুই খালাস হয়েছিস।'

বিস্ময়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় নিবারণ কাঁপছেন। জিজ্ঞেস কলেন — 'কিন্তু বাবা, আপনি কে?'

— 'আমাকে চিনতে পারলি না? আমি বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী।'

পরদিনই নিবারণ ডাক মারফৎ জানতে পারলেন যে তিনি খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড রদ হয়েছে।

স্বামী দিব্যানন্দ এই ঘটনার উল্লেখ করে জানাচ্ছেন — 'ব্যাপারটা যখন ঘটে লোকনাথ বাবা কিন্তু তখন আর মরদেহে নেই, কিছুকাল আগে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

★★★

বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের ইচ্ছে যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। গুরুর সন্ধানে তিনি এলেন লালগোলায় সত্যদ্রষ্টা যোগী বরদাচরণ মজুমদারের কাছে। বরদাচরণ ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং সংসারী মানুষ। কিন্তু গৃহী হয়েও তিনি ছিলেন

মহাসাধক। দিলীপকুমার রায়কে তিনি সামনে রেখে ধ্যানে বসলেন এবং ধ্যানভঙ্গের পর বললেন যে দিলীপের গুরু শ্রীঅরবিন্দই।

দিলীপ বললেন যে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এখনও তাঁর দীক্ষা নেবার সময় হয়নি। বরদাচরণ হেসে বললেন -- 'তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) আমাকে এইমাত্র বলে গেলেন -- আপনার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে -- ওকে মানা কর অন্য গুরু বরণ করতে, সময় হলেই আমি ডেকে নেব ওকে।'

বরদাচরণ বললেন -- 'বিশ্বাস হয় না, এই তো? তবে আমি যে সত্যবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি -- এই না?' এই বলে তিনি দিলীপকুমারকে চমকে দিয়ে বললেন --। আপনার ডানদিকের তলপেটে কি হার্নিয়া আছে?'

দিলীপ শুনে থ! জিজ্ঞেস করলেন তিনি একথা যোগবলে জেনেছেন কিনা।

বরদাচরণ বললেন, 'একথা জানলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেই। তিনি বললেন, 'দিলীপ আমাকে লিখেছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করাতে। অপারেশনের পরেই ওকে ডেকে নেব।'

দিলীপ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

★★★

অফিসের ইংরেজ বড়বাবু কিছুদিন ধরেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শ্যামাচরণ এর কারণ জিজ্ঞেস করতে সাহেব জানালেন যে স্বদেশে তাঁর স্ত্রী প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। অনেকদিন ধরে বাড়ি থেকে কোন চিঠিপত্রও আসছে না।

শ্যামাচরণ সাহেবকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি আজই খবর এনে দেব।' এই বলে তিনি অফিসের এক নির্জন ঘরে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যান শেষ হবার পর তিনি বিমর্ষ সাহেবকে বললেন, 'আপনার স্ত্রী ভালো হয়ে গেছেন। এমনকি তিনি আপনাকে চিঠিও লিখছেন।' কি লিখেছেন তা-ও তিনি জানালেন।

কিছুদিন পরেই সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু শ্যামাচরণ যা বলেছিলেন হুবহু তার সঙ্গে মিলে গেল।

তারপর একদিন স্বয়ং মেম সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তো শ্যামাচরণকে দেখে অবাক! সাহেবকে বললেন -- এঁকেই আমি আমার রোগশয্যার পাশে দেখেছি, আর এর কৃপাতেই আমি ভালো হয়ে গেছি।'

এই শ্যামাচরণ আর কেউ নন বিখ্যাত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

★★★

সমুদ্রপথে জাহাজে করে ক্লেম্‌সেল থেকে ফিরছিলেন মীরা রিশার, পরবর্তীকালে যিনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া 'মাদার' বা শ্রীমা হিসাবে বিখ্যাত হন। হঠাৎ সামুদ্রিক ঝড়। উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের প্রচণ্ড দাপটে জাহাজ প্রায় ডুবুডুবু। যাত্রীদের অবস্থা শোচনীয়। ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন মঁসিয়ে তেঁও। তিনি শ্রীমাকে ঐ উত্তাল তরঙ্গ থামিয়ে দিতে বললেন।

শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তারপর নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখলেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে, তারই ফলে এই বিপত্তি। শ্রীমা বলছেন 'আমি নম্রভাবে খুব মিষ্টি করে তাদের বুঝিয়ে বললাম, এইসব ভয়-কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমাদের লাভটা কি হচ্ছে। ও-সব ছেড়ে দাও, এদের নিষ্কৃতি দাও। ... শেষে তারা তুষ্ট হয়ে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হলো, সমুদ্রের জলও তখন শান্ত হয়ে গেল। আমি আবার আমার দেহে ফিরে এলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি, ঝড় থেমে গেছে, যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।'

মহাসাধিকা শ্রীমায়ের এই রকম অসংখ্য যোগ-বিভূতি ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা আজ আর কারও অজানা নেই।

★★★

অলৌকিক ক্ষমতা স্বামী বিবেকানন্দেরও ছিল। কিন্তু যেখানে সেখানে সেইসব ক্ষমতা তিনি দেখাতেন না। তাঁর এই ক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন শান্তিরাম। হঠাৎ তিনি গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। তাঁর জীবন সংশয় দেখা গেল। আত্মীয় স্বজনরা উদ্বিগ্ন। শান্তিরামের মা স্বামীজীকে ধরলেন যাতে তাঁর পুত্র সুস্থ হয়ে ওঠে। স্বামী সারদানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দ একটা বাটি করে গঙ্গাজল আনতে বললেন। গঙ্গাজল নিয়ে আসার পর, তিনি কিছুক্ষণ ঐ জলের দিকে চেয়ে রইলেন। সারদানন্দ জানাচ্ছেন, 'আশ্চর্য! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি বললেন, 'যাও ওকে খাইয়ে দাও একটু একটু করে। বাকি যেটা থাকবে, ঘরে রেখে দিও। বাড়ির কারুর শক্ত ব্যারাম হলে ব্যবহার করবে।"

★★★

পরিব্রাজনে বেরিয়েছেন এক সন্ন্যাসী। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন মধ্যভারতের ভূপালতান সরোবরের কাছে।

সরোবরের ওপারে মুসলমান নবারের দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ। এই সেই রক্তচক্ষু নবাব যিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রাসাদের কাছে কেউ শাঁখ বা ঘন্টা বাজাতে পারবে না। যে এই আদেশ অমান্য করবে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। ফলে ঐ এলাকায় বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু ভক্তদের শাঁখ ও ঘন্টা বাজানো।

সন্ন্যাসী ঐ সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে শাঁখ বাজাতে লাগলেন। কাছাকাছি যেসব হিন্দুরা বাস করত তারা চমকে উঠল। আর ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন স্বয়ং নবাব। প্রহরীদের ডেকে বললেন -- কে শাঁখ বাজাচ্ছে? কার এই দুঃসাহস যে আমার আদেশ অমান্য করে? যাও তোমরা, এখুনি ধরে নিয়ে এসো লোকটাকে।

প্রহরীরা সরোবরের কাছে গিয়ে দেখল এক হিন্দু সন্ন্যাসী শাঁখ বাজাচ্ছেন। তারা ফিরে গিয়ে নবাবকে সে কথা জানাল।

নবাব তো রেগে আগুন! এক সামান্য হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁর আদেশ অমান্য করছেন! তিনি হুকুম দিলেন -- 'তার মাথা কেটে নিয়ে এসো অথবা তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

সাধুকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে আবার তারা ছুটে এলো। এসে দেখল সাধুটি নেই। সেখানে পড়ে রয়েছে তাঁর ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

নবাব সব শুনে খুশি হলেন। যাক! আর শঙ্খধ্বনি শুনতে হবে না! হিন্দু সাধু উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে!

কিন্তু হঠাৎ মিলিয়ে গেল নবাবের হাসি। ঐ তো শোনা যায় শঙ্খধ্বনি। অবিরাম বাজছে। আবার ছুটে এলো প্রহরীরা। এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। এমন কি সেই ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পর্যন্ত নেই।

প্রহরীদের মুখে এই কথা শুনে নবারের কপালে পড়ল চিন্তার রেখা। মনে হচ্ছে ইনি কোন সাধারণ সাধু নন, নিশ্চয় কোনো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাযোগী! তিনি মন্ত্রীদের ডাকলেন এবং সবকিছু জানালেন। সকলে মিলে এলেন সরোবরের কাছে। দেখলেন ভূপালতানের পাড়ে বসে রয়েছেন এক জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী - দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। নবাব সন্ন্যাসীকে যথারীতি অভিবাদন করলেন। সন্ন্যাসী বললেন -- কারও ধর্মে আঘাত করা উচিত নয়। হিন্দুদের ধর্মের অঙ্গ হল শাঁখ আর ঘন্টা বাজানো। এটা আপনি বন্ধ করতে পারেন না। আপনাদের আদেশ আপনি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিন।

নত হল নবাবের রক্তচক্ষু। তিনি নতমস্তকে সন্ন্যাসীর আদেশ মেনে নিলেন।

এই সন্ন্যাসী হলেন মহাশক্তিধর যোগিপুরুষ দেবদাস কাঠিয়াবাবা। রামদাস কাঠিয়াবাবার গুরুদেব।

★★★

বরদার রাণী যমুনাবাঈ -এর আমন্ত্রণে গাড়ি করে যাচ্ছে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সঙ্গে তাঁরই প্রিয় শিষ্য বালানন্দ ব্রহ্মচারী।

বাজারের কাছে আসতেই এক ভক্তের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের দেখা হয়ে গেল। গাড়ি থামিয়ে সে ব্রহ্মানন্দের ঝুলিতে তার ক্ষেতের একগাদা শাকসবজী দিয়ে দিল। গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের দিকে।

রাণী যমুনাবাঈ যথারীতি তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন করলেন, তারপর ব্রহ্মানন্দজীর ঝুলির দিকে চোখ পড়তেই সকৌতুক মন্তব্য করলেন ঃ বাবাজীর ঝুলি যে ভর্তি। আজ আমাদের ভাগ্য ভালো, বাবাজী আমাদের জন্যে অনেক ভালো ভালো জিনিস এনেছেন!

হাসলেন গঙ্গোনাথের অন্নপূর্ণা সিদ্ধ মহাযোগী - বেশ তো, বলো না তোমরা কি খেতে চাও?

রাণী বললেন, আমাদের আঙুর খাওয়ান।

তখন আঙুরের সময় নয়। রাণী বোধহয় ঐজন্যেই আঙুরের কথা বললেন। হয়তো ভেবেছিলেন, বাবাজীর ঝুলি থেকে অসময়ের ফল বেরুনো সম্ভব নয়।

ব্রহ্মানন্দজী তাঁর ঝুলির মধ্যে হাত ঢোকালেন এবং রাণীর হাতে তুলে দিলেন একগোছা আঙুর।

রাণী অসময়ের আরও কিছু ফল চাইলেন। ব্রহ্মানন্দজী ঝুলি থেকে সেগুলি বার করে দিলেন।

বিস্মিত হলেন রাণী, বিস্মিত হলেন. শিষ্য বালানন্দজী। পরে বালানন্দজী জেনেছিলেন যে তাঁর গুরুজীর 'ঝুলিটি ছিল ঋদ্ধি ও সিদ্ধিতে ভরা।'

ভক্তশ্রেষ্ঠ তিরুপ্পান

তামিলনাড়ুর ত্রিচিনাপল্লীতে অবস্থিত 'দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বিশাল ও বিস্তৃত মন্দির শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দির। এর তোরণটি ন'তলা, এটি একশ চৌষট্টি ফুট উচ্চ। মন্দিরের শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ আসলে বিষ্ণুর। এটি শেষ শয্যায় শায়িত দশহাত দীর্ঘ, নীল পাথরে তৈরী বিষ্ণুমূর্তি। .... মন্দিরের প্রাচীরের বেড় দু'মাইল, এত বড় বিস্তৃত দেউল আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরটির আকার ওঁকারবৎ , চূড়ায় চারটি সোনার কলস, চারটি বেদের প্রতীক (ভারত সংস্কৃতির রূপরেখা)।

এই পবিত্র মন্দিরের বিগ্রহকে স্নান করাবেন বলে কাবেরী নদী থেকে কলসী করে জল নিয়ে এসেছেন পূজারী। কিন্তু মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পূজারী বিস্মিত হলেন। রোজই তিনি বিগ্রহকে স্নান করিয়ে দেন, কোনদিন তো মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়নি!

তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন, চিৎকার করে বললেন -- দরজা খোলো। কে ভেতরে আছো? দরজা খুলে দাও।

ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না। উৎসুক ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভীড় বাড়তে থাকে। পূজারীর সঙ্গে তাঁদের অনেকে দরজা খোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তবু রুদ্ধ থাকে মন্দিরের কপাট।

তবে কি রুষ্ট হয়েছেন শ্রীরঙ্গনাথজী? কিন্তু কি এমন কারণ ঘটল যার জন্যে ঈশ্বরের এই রোষ?

পূজারীর চোখে জল, মনে উৎকণ্ঠা। ব্যাকুলভাবে এবার তিনি রঙ্গনাথজীর উদ্দেশ্যে বললেন প্রভু, যদি কোন অন্যায় অপরাধ হয়ে থাকে, তারজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। মন্দিরের দরজা খুলে দিন প্রভু!

অকস্মাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে দৈববাণী হল। শ্রীরঙ্গনাথজী বললেন -- আমার পরম ভক্তকে পূজারী আজ চরম অপমান করেছে। পাথর ছুঁড়ে তার মাথা ফাটিয়ে

দিয়েছে, তার রক্তে সিক্ত হয়েছে ত্রিচিনাপল্লীর মাটি। তাই রুদ্ধ হয়েছে মন্দিরের দ্বার। পূজারীর আনা জল আমি গ্রহণ করব না।

পূজারী অনুতপ্ত হলেন। ব্যথিত কণ্ঠে স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করে তাঁর পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানতে চাইলেন।

আবার শোনা গেল দৈববাণী - আমার ঐ পরম ভক্তের পায়ে পড়ে তার কাছে তুমি ক্ষমা চাও। তাকে এখুনি কাঁধে করে নিয়ে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ কর। তারপর তাকে আমার মূর্তির পাশে বসাও। সেটাই হবে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পূজারী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সেবক তিনি। আর ঐ ভক্ত জাতিতে পৈরেয় -- অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অশুচি বলে উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে।

কাবেরী নদীর জলে শ্রীরঙ্গনাথজীর বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। যে সপ্তনদীকে ভারতবর্ষে সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়, কাবেরী তাদের অন্যতম। অন্য নদীগুলি হল -- গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী, যমুনা ও সরস্বতী --

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু।।'

এহেন পবিত্র নদীর তীরে বসে আছেন ঐ অস্পৃশ্য, পৈরেয় ভক্ত। কী স্পর্দ্ধা! বিশ্বসংসার ভুলে তিনি আবার বীণা বাজিয়ে গান গাইছেন! এটাই তাঁর আনন্দ। সুরে সুরে তিনি ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করতে চান। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বলে মানুষের কাছ থেকে তিনি শুধু ঘৃণা আর অবহেলাই পেয়ে আসছেন। ঠাকুরের সেবা করার অধিকার পর্যন্ত তাঁর নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে দূর থেকে তাঁকে ঠাকুর দর্শন করতে হয়। মনে আশা, একদিন হয়তো করুণাময় ঈশ্বরের করুণাধারা তাঁর ওপর বর্ষিত হবে। মনে প্রাণে রঙ্গনাথজীর এতবড় নিষ্ঠাবান ভক্ত আর নেই।

নদীতীরে একজন পৈরেয়কে বসে থাকতে দেখে মহা ক্রুদ্ধ হলেন পূজারী। উত্তেজিতভাবে তিনি তাঁকে ঐ স্থান থেকে উঠে যেতে বললেন।

কিন্তু পূজারীর কথা তাঁর কানে গেল না। কি করেই বা যাবে? ঈশ্বরের ভাবে, ঈশ্বরের চিন্তায় যিনি নিবিষ্টচিত্ত, তাঁর কর্ণকুহরে কি অন্য কথা প্রবেশ করতে পারে?

চিৎকার করে উঠলেন পূজারী -- পৈরেয়, তুই এখুনি উঠে যা। আমি ঠাকুরের স্নানের জল আনতে যাচ্ছি। এই নদীর তীর তুই অপবিত্র করিস নি।

পূজারী চিৎকার করে ভর্ৎসনা করছেন, তবু হুঁশ নেই ভক্ত গায়কের। নীচ জাতির এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, মন্দিরের পূজারী, আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা! ক্রোধে জ্বলে উঠে ঐ পৈরেয়কে পূজারী পাথরের টুকরো দিয়ে সজোরে মারলেন। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল ভক্তের।

ভাবজগৎ থেকে মুহূর্তের মধ্যে তিনি কঠোর বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। দেখলেন, কলসী হাতে দাঁড়িয়ে আছেন পূজারী। অশুচি ভক্ত বসে আছেন বলে তিনি জল নিতে পারছেন না।

কুণ্ঠিত হয়ে পূজারীর কাছে বার বার তিনি ক্ষমা চাইলেন। না বুঝে তিনি যে অন্যায় করেছেন,. তারজন্যে তিনি সত্যিই অনুতপ্ত।

কিন্তু শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ক্ষমা করলেন না, বরং নানা কটূক্তি করতে লাগলেন তাঁকে। দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন ভক্ত পৈরেয়।

পূজারী নদী থেকে জল নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ।

ভক্তকে আঘাত করে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন পূজারী। তাই রুষ্ট হয়েছেন রঙ্গনাথজী। তাঁর ক্রোধ উপশমের জন্যে অনুতপ্ত পূজারী ছুটলেন পৈরেয় পল্লীতে -- যা অভাবনীয়। পল্লীতে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজারী আজ তাদের পল্লীতে!

পূজারীকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেই ভক্ত বীণাবাদক। পূজারী লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

-- একি করছেন ঠাকুর! আমার যে মহা পাপ হবে! আমি অস্পৃশ্য!

-- আমাকে ক্ষমা করো ভাই।

-- বলেন কি ঠাকুর! ক্ষমা তো আমারই চাওয়া উচিত। অন্যায় তো আমিই করেছি।

- আমি তোমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাকে আঘাত করেছি বলে মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে রঙ্গনাথজী বন্ধ করে দিয়েছেন। তুমি ক্ষমা করলে তবেই আমি পাপমুক্ত হবো। না করলে মন্দিরের দরজা খুলবে না, রঙ্গনাথজীও আমার আনা জল স্পর্শ করবেন না।

ভক্তকে কাঁধে চাপিয়ে পূজারী মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁকে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন।

মন্দিরের দরজার সামনে ভক্ত দাঁড়াতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। উচ্ছ্বসিত জনতা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। ভক্তের নামে তারা জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

মন্দিরে প্রবেশ করলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষটি। জীবনে প্রথম এখানে প্রবেশাধিকার পেলেন। আবেগে, আনন্দে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। পূজারীর অনুরোধে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বিগ্রহের পাশে বসলেন।

ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান রঙ্গনাথজী স্বরূপে তাঁর সামনে আর্বিভূত হলেন। ভগবানের চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু।

রঙ্গনাথজী বললেন -- বলো, কি বর চাও?

-- কিছু চাইনা প্রভু। আপনি যে দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছেন। আর কি কিছু চাইবার থাকতে পারে?

-- শত দুঃখ-কষ্ট-অপমান সহ্য করেও আমার প্রতি তোমার ভক্তি অবিচল থেকেছে। আজ থেকে এই মন্দিরে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে তোমারও ঠাঁই হবে।

রঙ্গনাথজী তাঁর গলা থেকে মালা খুলে ভক্তশ্রেষ্ঠকে পরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বন্ধ কপাট।

বাইরে অগণিত ভক্তের বাঁধভাঙা আনন্দ ও জয়ধ্বনি।

অস্পৃশ্য, নীচ বংশজাত এই অতুলনীয় ভক্ত হলেন তিরুপ্পান।

ঈশ্বর ভজনায় প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। উচ্চবশে না জন্মেও বহু সাধক মানুষকে শুনিয়েছেন চিরন্তন সত্যের বাণী। কবীর ছিলেন জোলা, রবিদাস চর্মকার, সেনা নাপিত, বামদেব দর্জিপুত্র, রজ্জব ও দাদূ মুসলমান, আর তিরুপ্পান অস্পৃশ্য। কিন্তু এঁদের জীবনাদর্শ ও বাণী কালজয়ী, অগণিত মানুষের চিরন্তন প্রেরণা।

গুরু যাদবপ্রকাশ ও আচার্য রামানুজ

কাঞ্চীপুরের স্বনামধন্য অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত হলে কি হবে, আচার্য যাদবপ্রকাশ কিন্তু সদ্‌গুরু ছিলেন না। সদগুরু কেন, আদৌ কি তিনি গুরু হবার যোগ্য ছিলেন?

যাদবপ্রকাশের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন ঈর্ষাকাতর, ক্ষুদ্রমনা, অনুদার। শিষ্যকে খুনের চক্রান্ত করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

যাদবপ্রকাশের অন্যতম শিষ্য রামানুজ ছিলেন গুরুর বিপরীত। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির, নম্র, বিনয়ী, উন্নতমনা এবং নিরহঙ্কার। অসাধারণ মেধাবী এই শিষ্যটির গুরুভক্তিও ছিল প্রশংসনীয়।

যাদবপ্রকাশ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হলেও তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা অনেক সময় রামানুজের পছন্দ হত না। কিন্তু তা নিয়ে গুরুর সঙ্গে কোনদিনই তর্ক বিতর্ক করতেন না। চুপ করে থাকতেন। কিন্তু একদিন তিনি গুরুর শাস্ত্র ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্য প্রতিবাদের ভাষা ছিল সংযত।

রামানুজ একদিন গুরুসেবা করছেন, একটি ছাত্র এসে যাদবপ্রকাশকে বলল — গুরুদেব, ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি পংক্তির মানেটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

— পংক্তিটি কি?

— আজ্ঞে 'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী'। যাদবপ্রকাশ বললেন — সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যায়, এখানে তাঁর চোখদুটির কথা বলা হচ্ছে। ঐ চোখদুটি বানরের পশ্চাদভাগের মতো যে লোহিতাভ পদ্ম তার মতো।

গুরু মুখে শ্লোকটির এই আক্ষরিক ব্যাখ্যা শুনে রামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। যিনি স্বয়ং ত্রিলোকপতি, তাঁর চোখ দুটির সঙ্গে বানরের পশ্চাদভাগের তুলনা! দুঃখে তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

শিষ্যের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে যাদবপ্রকাশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন -- কি হয়েছে রামানুজ?

নম্র কণ্ঠে রামানুজ বললেন -- গুরুদেব, অপরাধ নেবেন না।কপ্যাসং কথার যে ব্যাখ্যা আপনি করলেন, আমার মনেহয় তা সঠিক নয়। এই ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা এবং জগৎপিতার পক্ষে অমর্যাদাকর (শ্রদ্ধেয় স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পংক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে - 'উক্ত পুরুষের চক্ষুর সহিত মর্কটের অধোভাগের তুলনা করিয়া অশ্রদ্ধা দেখানো হইল -- এইরূপ বলা যাইতে পারে না)।

শিষ্যের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন যাদবপ্রকাশ। জিজ্ঞেস করলেন -- বটে! তাহলে সঠিক ব্যাখ্যাটা কি?

-- আজ্ঞে, আমার মনে হয়, ঐ পংক্তিটির অর্থ -- সেই বিরাট পুরুষের নয়নদুটি সূর্য-বিকশিত পদ্মের মতো।

তরুণ শিষ্যের ব্যাখ্যা শুনে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হলেন যাদবপ্রকাশ। তবু 'লোক দেখানো' প্রশংসা করে বললেন -- তুমি অবশ্য পংক্তিটির গৌণ অর্থ করেছো। তা হোক, তোমার ব্যাখ্যার আমি প্রশংসা করছি।

কাঞ্চীর রাজকন্যার ওপর এক প্রেতাত্মা ভর করেছে। রাজা অনেক চিকিৎসক দেখিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে ভালো করতে পারেনি। অগত্যা তিনি যাদবপ্রকাশের শরণাপন্ন হলেন। মনে আশা, এই অদ্বৈতবাদী নিশ্চয়ই তাঁর মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবেন।

রামানুজ ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে যাদবপ্রকাশ রাজকন্যাকে দেখতে গেলেন। রাজকন্যার ওপর ভর করা প্রেত রামানুজকে দেখেই বলে উঠল -- ইনি যদি আমার মাথায় একবার পা রাখেন তাহলেই আমি রাজকন্যাকে ছেড়ে চলে যাবো।

যাদবপ্রকাশ ভাবলেন -- আমি থাকতে রামানুজকে ডাকলো! ঈর্ষাতুর, গুরুদেব তবু শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন -- যাও, রাজকন্যার মাথায় পা রাখো।

রামানুজ রাজকন্যার মাথায় পা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত চলে গেল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন রাজকুমারী। রামানুজের নাম যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শিষ্যের ওপর গুরুর ভালোবাসা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছিল। শিষ্যের নাম যশ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই হিংসায় জ্বলে যাচ্ছেন যাদবপ্রকাশ। শেষে গুরুর চতুষ্পাঠী

থেকে রামানুজকে বহিষ্কার করা হল। রামানুজকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন তাঁর গুরুদেব।

কুচক্রী যাদবপ্রকাশ ঠিক করলেন তিনি শিষ্যদের নিয়ে তীর্থ পরিক্রমা করবেন এবং রামানুজকেও সঙ্গে নেবেন। রামানুজ যেতে রাজী হলেন। সরলপ্রাণ, নিষ্পাপ রামানুজ যাদবপ্রকাশের হীন ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতেই পারলেন না।

সশিষ্য যাদবপ্রকাশ পরিভ্রমণ করতে করতে এক দুর্গম অরণ্যে এসে পৌঁছলেন। শিষ্যদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে তিনি ঠিক করলেন, আর দেরী না করে আজই রামানুজকে হত্যা করা হবে। শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রামানুজের মাসুততো ভাই গোবিন্দ। তিনি চুপি চুপি এক ফাঁকে রামানুজকে তাঁর গুরুদেবের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিলেন। তারপর তাঁকে এখনই এখান থেকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে গেলেন রামানুজ। এদিকে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে সবাই ভাবলেন হয় তাঁকে বাঘে নিয়ে গেছে, নয়তো কোনো জলাশয়ে তিনি ডুবে গেছেন।

পথের কাঁটা সরে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উৎফুল্ল যাদবপ্রকাশ।

এরপর অতিবাহিত হয়েছে কয়েকটা বছর। রামানুজ সন্ন্যাস নিয়েছেন, 'যতিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, নির্বাচিত হয়েছেন কাঞ্চীপুরের মঠাধ্যক্ষরূপে। তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাঁকে দর্শন করবার জন্যে, তাঁর উপদেশামৃত শোনবার জন্য দলে দলে নরনারী আসতে লাগল।

একদিন এলেন যাদবপ্রকাশের মা, সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত পুত্র। রামানুজকে বৃদ্ধা অনুরোধ করলেন -- বাবা, আমার ছেলেকে তোমার শিষ্য করে নাও।

যাদবপ্রকাশের অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই দম্ভ ও অহঙ্কার আর নেই। রামানুজ তাঁর প্রাক্তন গুরুকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কলেন, আর প্রাক্তন শিষ্যের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন যাদবপ্রকাশ!

এ কে নজিরবিহীন ঘটনা।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত

সাধক কবি রামপ্রসাদ আর কবি সাধক কমলাকান্ত । অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দুই প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। দুজনেই তন্ত্রসাধক, মাতৃপ্রেমে উন্মত্ত। দুজনেই অসামান্য গীতিকার-সুরকার-গায়ক। দুজনের মুখেই শ্যামাসঙ্গীত শুনে অভিভূত হয়েছেন রাজামহারাজা থেকে শুরু করে কাঙাল পর্যন্ত সবাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা যেত এঁদের গান। রামপ্রসাদের 'মন রে কৃষি কাজ জান না', 'আয় মন বেড়াতে যাবি', 'ডুব দে রে মন কালী বলে', 'এবার কালী তোমায় খাব', 'আমি সুরা পান করি না', আর কমলাকান্তের 'আপনারে আপনি দেখ', 'সদা আনন্দময়ী কালী', 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' প্রভৃতি গান পরমহংসদেব যখন গাইতেন, তখন এক স্বর্গীয়পরিবেশ সৃষ্টি হত এবং গাইতে গাইতে তিনিও ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন। আজকের এই হিংসা, অবিশ্বাস আর সার্বিক অবক্ষয়ের যুগেও এই দুই মহাসাধকের গান স্বমহিমায় আজও ভাস্বর। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত, হতাশ বাঙালী এঁদের গান শুনে দু'দণ্ড শান্ত পায়।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত দুজনেই গৃহী সাধক। দুজনেই আবাল্য শ্যামা মায়ের পরম ভক্ত, নির্লিপ্ত ও উদাসীন। দুজনেরই কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয় কৈশোরে। গুরুজনদের চাপে দুজনকেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর কমলাকান্তকে আবার বিবাহ করতে হয়। কিন্তু কে কবে মাতৃপাগল বৈরাগীকে সংসারে ধরে রাখতে পেরেছে! দুজনেরই সংসারে আসক্তির পরিবর্তে দেখা গেল তীব্র অনাসক্তি আর বৈরাগ্য। কিন্তু এঁরা তো আর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নন। তাই সংসার চালাবার কথাও এঁদের ভাবতে হয়। রামপ্রসাদের মতো মহাসাধককেও তাই জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় সামান্য একটা চাকরী নিতে হয়। উদাসী রামপ্রসাদের কি আর চাকরী করতে ভালো লাগে? হিসেবের খাতায় একদিন তিনি লিখলেন -- 'আমায় দাও মা তবিলদারী / আমি নিমকহারা নই শঙ্করী।' গুণগ্রাহী ধর্মপ্রাণ জমিদার তাঁকে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করতে বললেন। শুরু হল তাঁর কালী মাতার একনিষ্ঠ সাধনা। শ্যামা মায়ের দর্শন লাভের বাসনায় দুজনেই করেছেন

কঠোর সাধনা, আয়ত্ত করেছেন নানা যৌগিক প্রক্রিয়া ও তন্ত্র সাধনার গূঢ় রহস্য। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন দুজনেই। মহাকালীর দর্শন পেয়ে কমলাকান্ত গাইলেন --

'কালি! জগমনোমোহিনী এলোকেশী
তোমায় সবাই বলে কালো কালি
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।'

আর রামপ্রসাদ গাইলেন --

'তাই কালোরূপ ভালবাসি
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী।'

কমলাকান্ত ছিলেন তাঁরই শিষ্য বর্ধমানরাজ তেজেশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। ভোগবিলাসের আবহাওয়ায় থেকেও তিনি নিভৃতে কঠোর সাধনা করেছেন। রাজসভার ঐশ্বর্য - আড়ম্বর তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি।

দুই কবিই অল্পাধিক তিনশো গান রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ ভাবুক। তিনি তাঁর গান গুলিকে সচেতনভাবে শিল্পরূপ দান করেন নি। কিন্তু কমলাকান্তের গানে রয়েছে পরিশীলিত শিল্পরূপ। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় দুজনের গানকেই বিশিষ্টতা দান করেছে। তাই তাঁদের গানের এত কদর।

তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও রামপ্রসাদ সকল সম্প্রদায়কেই শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে মহাসমন্বয়ের অমৃতবাণী -- 'এই যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম -- সকল আমার এলোকেশী।' ভেদাভেদ নয়, মনকে দুঃখমুক্ত করাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট -- 'ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।'

রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তও শ্যাম-শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন --'কালী কেবল মেয়ে নয় / মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ/ কখন কখন পুরুষ হয়।'

নীরবে ধর্মসাধনার অপূর্ব পথনির্দেশ দিয়েছেন দুজনেই। কমলাকান্ত গেয়েছেন -

'আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে
যা চাইবে ঐখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

মানস পূজার ওপর রামপ্রসাদও গুরুত্ব দিয়েছেন। বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, নিভৃতে হৃদয়ের সিংহাসনে জগজ্জননীকে স্থাপন করে অশুভ রিপু-অসুরকে বলি দেওয়ার

মধ্যেই থাকে মাতৃ-আরাধনার সার্থকতা। সহজ কথায় তিনি মাতৃ পূজার নির্দেশ দিয়েছেন --

'জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে
তুই লুকিয়ে তারে করবি পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে।'

শোনা যায় স্বয়ং মা কালী কবি কন্যার রূপ ধারণ করে তাঁর বাগানের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। কমলাকান্ত সম্বন্ধেও জনশ্রুতি আছে -- দেবী কালিকা বাগ্‌দিনীর বেশে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রাজার মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁকেও লিখতে হয় আদিরসাত্মক 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। কিন্তু রাজসভার পরিমণ্ডলে থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্তের রচনায় বিন্দুমাত্র স্থূলতা দেখা যায়না।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত -- দুজনেই 'আগমনী' ও'বিজয়া'র গান রচনা করেছেন। এগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গিরিরাজ, মেনকা, উমা, শিব প্রভৃতি দেবদেবী এই কবিদ্বয়ের লেখনীতে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। রামপ্রসাদের 'গিরি, এবার আমার উমা এলে/ আর উমা পাঠাব না,' 'আজি শুভনিশি পোহাইল তোমার' এবং কমলাকান্তের 'কে বলে মা দরিদ্র হর', 'হে শিব শঙ্কর, তব অনুমতি হর', 'মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি' প্রভৃতি উমাসঙ্গীতের মানবিক আবেদন চিরন্তন।

শ্যামাসঙ্গীত যেন 'জরাব্যাধি-বিধ্বংসি ভেষজম্'। নির্মম দস্যু ও বিধর্মীর হৃদয়কেও এই সঙ্গীতসুধা ভক্তিরসে আর্দ্র করে। এক সন্ধ্যায় ডাকাতের হাতে পড়েছেন কমলাকান্ত। ডাকাত সর্দার যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন কবি সাধক তার কাছ থেকে জীবনের শেষ গান গাইবার অনুমতি চাইলেন। সর্দার অনুমতি দিতেই কমলাকান্ত হৃদয় নিংড়ে গাইলেন --' আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর/কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা'।

গান শুনে সর্দার আর অন্যান্য ডাকাত অভিভূত! কে এই ব্রাহ্মণ! কেন তাঁর গান শুনে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, জলে ভরে যায় দু'চোখ?

ডাকাতরা সসম্মানে কমলাকান্তকে মুক্তি দিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ একবার নৌকা করে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন আর গেয়ে যাচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত। ঐসময় বজরায় জলবিহার করছিলেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা।

রামপ্রসাদের গান তাঁর কানে গেল। তিনি এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে শ্যামাসঙ্গীত শুনতে চাইলেন। প্রসাদী সঙ্গীত নবাবের মনে গভীর রেখাপাত করল।

রামপ্রসাদ জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর সময়ে সারা দেশেই দেখা দিয়েছিল অরাজকতা, অনৈতিকতা, জমিদার ও পিয়াদাদের শোষণ ও অত্যাচার। কমলাকান্তের রচনায় সমাজ জীবনের এই দিকটি অনুপস্থিত। অন্যদিকে রামপ্রসাদের পদাবলীতে সমকালীন মানুষের ব্যথা বেদনার রূপটি বিশেষভাবে মূর্ত। 'মিঠার লোভে তিত মুখে' যাঁর 'সারা জীবন গেল', সেই রামপ্রসাদ সামাজিক বৈষম্যের অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর পদে --

'জানি গো জানি তারা, কেমন তব করুণা
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে
কারো পেটে ভাত গ্যাঁটে সোনা।।'
কিংবা

'করুণাময়ী, কে বলে তোরে দয়াময়ী?
কারও দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এমনি দশা।
শাকে অন্ন মেলে কই?
কারে দিলে ধন-জন মা, হস্তী-অশ্ব-রথ-চয়
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নই?'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি শ্যামা মায়ের অভয় পদে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দুঃখকে জয় করেছেন। ঐ রাঙা চরণদুটি আশ্রয় করেই 'আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে' বাস করেছেন কবি।

আমার শিক্ষক

আমি প্রাতঃকালীন পাঠ নিই চির নবীন নবোদিত সূর্যের কাছে। তিনি আমার তপন স্যার। তিনি ছাড়া আর কে অন্ধকারের ললাটে ছুঁইয়ে দেন 'অরুণ আলোর সোনার কাঠি?' তিনি ছাড়া আর কি কেউ দেবেন অস্তিত্ব রক্ষার সঞ্জীবনী মন্ত্র? তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে উত্তরণের অভ্রান্ত পথনির্দেশ? বিনম্র ছাত্রের মতো তাই আমি নতজানু হয়ে এই মহান শিক্ষকের উদ্দেশে প্রণাম জানাই --

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

আমার জানলার পিছনে যে ছিমছাম নিমগাছটা ঝড়ের কুটিল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যার পাতায় পাতায় দোলায় দোলায় আনন্দ গান বেজে ওঠে, সে আমার নিমু স্যার। সে আমাকে শেখাবার চেষ্টা করে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ব্যাকরণ, আর মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবা সহজ পাঠ।

ন্যুব্জ দেহ কুব্জ পৃষ্ঠ নিরক্ষর পঞ্চু পোড়েল জুট মিলের পাশে চায়ের দোকান করে আজ স্বাবলম্বী। ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের সে বোঝায় -- 'তোমরা সবাই যদি মিলে মিশে এক হয়ে লড়াই করো, কে তোমাদের হারাবে?' প্রতিবন্ধী পঞ্চু স্যার আমাকে শেখায় রাজনীতির বর্ণপরিচয়।

আমার আর এক শিক্ষক তিন বছরের এক শিশু। সে আমার বড় আদরের খোকা-মাস্টার। আমি তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি বিলুপ্তপ্রায় এক দুরূহ বিষয় -- সরলতা আর পবিত্রতা। শিখতে গিয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠি। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিয়োরী অব রিলেটিভিটি কি এর চেয়েও শক্ত বিষয়?

জীবনের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্তি আসে যখন, মন স্থবির হতে চায়, তখন আমি নির্জন নদীতীরে এসে দাঁড়াই। নদী আমার তটিনী দিদিভাই। তিনি আমায় শেখান, চলিষ্ণুতার স্বরলিপি -- 'চরৈবেতি, চরৈবেতি।'

সূর্যোদয়ের আগে

প্রভাসের আগে মাথুর। মিলনের আগে বিরহ। সিদ্ধির আগে সাধনা। ভূমি থেকে ভূমায় - সীমা থেকে অসীমে - রূপ থেকে অরূপে উত্তরণের জন্য চাই সুপ্তির মতো আকুলতা। মুক্তো তৈরীর আগে সাগরের নিঃসীম জলরাশির ওপর সুপ্তি ভেসে বেড়ায়। ভালো লাগে না সমুদ্রের কল্লোল, রাতের তারা ঝিলমিল আকাশের রাজ সমারোহ। সে শুধু উন্মুখ হয়ে থাকে, কবে কখন কোন এক সুন্দর মুহূর্তে স্বাতী নক্ষত্র থেকে ঝরে পড়বে নিটোল একবিন্দু জলকণা। সেই জলকণা বুকের গভীরে লুকিয়ে রেখে সুপ্তি চলে যায় সমুদ্রের তলদেশে। মুক্তো তৈরীর সাধনায় হয় মগ্ন চেতন। প্রতিটি সাধকের জীবনেই সিদ্ধির আগে আসে একটা তীব্র ব্যাকুলতা, বিযাদ আর বৈরাগ্য। পার্থিব ভোগসুখে বন্দী মন হঠাৎ শুনতে পায় অজানার আহ্বান। কালিন্দী নদীকূলে, গোকুলের গোঠে হঠাৎ বেজে ওঠে বংশীধ্বনি, আর ব্যাকুল হয়ে ওঠে শ্রীরাধার হৃদয়। ছোট্ট একটি শব্দ -- শ্যাম! সেই নাম মরমে প্রবেশ করে মন প্রাণ আকুল করে দেয় রাধিকার। কোনো কাজে মন লাগে না -- 'ঐদিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে।' ভালো লাগে না সং-সাজাই-সার সেই সংসারে থাকতে, যেখানে হৃদয়ের অনন্ত ক্ষুধা মেটে না, মেলে না 'তাপ হারা পিপাসার বারি --হৃদয়ের চির আশ্রয়'। কবে দেখা হবে সেই ব্রজকুল নন্দনের? নিসর্গ প্রকৃতিতে মহামিলনের ঐকতান -- 'কুলিশ শত শত পাত মোদিত, ময়ূর নাচত মাতিয়া।' কিন্তু এমন দিনে যারে বলা যায়, সেই ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কোথায়? কোথায় সেই সর্বতাপহর হৃদয়রঞ্জন? ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় মর্মভেদী হাহাকার -- ঈ ভরা বাদর মাহ বাদর শূন্য মন্দির মোর।' ভাবসম্মিলনের আগে এভাবেই হতাশায়, শূন্যতায়, বেদনায় হৃদয় শতধাদীর্ণ হয়ে ওঠে। সমুদ্রে মিশে যাবার আগে নুনের পুতুলের এটাই ক্রম রূপান্তর। সূর্যোদয়ের আগে নিশ্চিদ্র তমসা।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, বুদ্ধের মতোই সাজানো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মহাবীর, গুরু নানক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং মেওয়ারের বাণী মীরাবাঈ। মাতৃস্নেহ উপেক্ষা করে দুর্গম পথের পথিক হয়েছিলেন আট বছরের বালক -- শিবাবতার শঙ্কর। আচার্য শঙ্করের মতো আর একটি বালকও শুনেছিলেন অন্তরতমের নির্দেশ। মাত্র ন' বছর বয়সে সেই বালক সমস্ত মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বরণ

করেছিলেন কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ। আর তার ফলেই বালক পীতাম্বর পরিণত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী রূপে। 'সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে' 'সকাল বেলার সলতে' পাকানোর ইতিহাস অদম্য ব্যাকুলতা, সুতীব্র বিষাদ-বৈরাগ্য আর কঠোর সাধনার ইতিহাস।

'মা, তুই কোথায়? দেখা দে মা। একটি একটি করে দিন চলে যাচ্ছে -- তবু তুই দেখা দিচ্ছিস না!' মাটিতে মুখ ঘষে দিনের পর দিন কেঁদেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন সূর্যোদয় আর কখনই বা সূর্যাস্ত হত, টেরই পেতেন না। কি অদম্য আস্পৃহা, কি অননুকরণীয় ঐকান্তিকতা! স্ত্রীকে তিনটি পাগলামির কথা লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তার মধ্যে একটি হল -- 'ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে ..... তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার সংকল্প করিয়াছি।' একদিকে কঠোর সংকল্প, অন্যদিকে সুতীব্র অভীপ্সা। আশা নিরাশা দ্বন্দ্ব সংশয়ের কাঁটাপথ মাড়িয়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া -- ঊর্দ্ধের আলোর জন্য কেবল প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা -- অবশেষে 'আমি'র তুমি' হয়ে ওঠা!

হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী। 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।' একটু শান্তির আশায় কত লোক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কোনো শুভক্ষণে কেউ পেয়ে যান সদগুরু। কেউ বা কারো মুখের সামান্য একটি অর্থঘন কথা শুনে ঈশ্বর-অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, আমূল পরিবর্তিত হয় তাঁদের জীবন। বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস এবং লালাবাবুর জীবনে ছোট্ট একটি সরল বাক্য অসামান্য ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছিল। শ্রীশ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনেও, ছোট্ট একটি প্রশ্ন আলোড়ন জাগিয়ে ছিল -- 'আমি কে? কোহহং?' এই প্রশ্নই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যোগসাধনার উচ্চতম মার্গে। তিনি পেয়ে ছিলেন তিনটি দুর্লভ বস্তু - মনুষ্যজন্ম, মুক্তির ইচ্ছা এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়। কিন্তু দুর্লভ 'ত্রিরত্ন' লাভের পরেও চাই জীবনের আমূল রূপান্তরের জন্য দুশ্চর তপস্যা। তা তিনি করেছিলেন এবং উন্নীত হয়েছিলেন ভূমা-পুরুষে।

সাধনার কথা পরে। তার আগে নিজেকে না জানার বেদনায় বুক মোচড় দিয়ে উঠুক। ডুবন্ত মানুষের মতো ব্যাকুল হয়ে উঠুক হৃদয়। দৈনন্দিন কাজকর্মের অবকাশে কত মানুষের শ্রান্ত ক্লান্ত মন হতাশায় ভেঙে পড়ে, ফিস ফিস করে উচ্চারণ করে 'আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি।' তারা আলোক-ভিক্ষু, কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হতে পারছে না সংসারের ভোগ সুখের যক্ষপুরী থেকে। অপেক্ষা করে আছে কখন একগুচ্ছ রক্তকরবী নিয়ে তাদের রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দেবে নন্দিনী, বলবে 'সময় হয়েছে, দরজা খোলো।' হয়তো তখন চৈতন্যের উদয় হবে। বুঝতে পারবে অন্তরের মধ্যেই রয়েছে নন্দনকানন, বৃথাই এতদিন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে পরের বাগানে -- 'বাগো না জায়ে নাজা/তেরে কায়া মে গুলজার' (কবীর)।

নমি নমি চরণে ঃ-

সর্বশ্রী বালানন্দ-তারানন্দ-দেবানন্দ

(১)

উজ্জয়িনীর পীতাম্বর নামে ন বছরের এক বালক ব্রহ্মচারী উপনয়নের সময় দণ্ড আর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দণ্ডীঘর থেকে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গৃহত্যাগ করে। আর কোনদিন সে গৃহে ফিরে আসেনি।

মুণ্ডিত মস্তক, পরণে গৈরিক বেশ হাতে দণ্ড আর কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি -- নিঃসঙ্গ বালক চলেছে নর্মদার দিকে। সেই যে এক সাপুড়ে দম্পতি তাকে বলে দিয়েছিল -- নর্মদার তীরেই তুমি তোমার অভীষ্ঠ গুরুর সন্ধান পাবে, তাই শুরু হয়েছে তার পথ পরিক্রমা।

রাত যায়, দিন আসে। অকুতাভয় অভিযাত্রী অতিক্রম করে যায় মাইলের পর মাইল, পেরিয়ে যায় দুর্ভেদ্য অরণ্য। পথের লোক অবাক হয়ে বালক ব্রহ্মচারীকে দ্যাখে, এগিয়ে এসে তারা প্রণাম করে আর ভাবে - কে এই জ্যোর্তিময় দেবশিশু। ঈশ্বর অন্বেষণে মায়ের কোল ছেড়ে পথে নেমেছে?

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে পীতাম্বর এসে পৌঁছল 'নর্মদা মাতার নাভিস্থান' ঋদ্ধনাথে, যেখান থেকে শুরু হয় নর্মদা পরিক্রমা। শেষও হয় এখানে এসে।

বৈদিক ঋষিরা নর্মদার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বলেছেন --

'নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।

তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ।।'

অর্থাৎ নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হল রুদ্রে তেজ থেকে থেকে উৎপন্না নর্মদা, যিনি স্থাবর জঙ্গম সবকিছুই তিনি ত্রাণ করেন। এই নর্মদা পরিক্রমা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়,

কঠোরভাবে মেনে চলতে হয় এই দুঃসাধ্য পরিক্রমার নিয়মাবলী। ধ্যানানন্দ নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে বালক পীতাম্বর পরিক্রমার জন্য নিজেকে তৈরী করল। তারপর সাধু ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে পরিক্রমায় রত হল। একসময় তারা ভৃগুক্ষেত্রে সিদ্ধযোগী ভুরিয়াবাবার সাধন কুটীরে পৌঁছল। ভুরিয়া বাবা ছোট্ট ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পীতাম্বরকে গঙ্গোনাথে যেতে বললেন -- 'গঙ্গোনাথেই তুমি তোমার গুরুর দর্শন পাবে।'

গঙ্গোনাথে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দর্শন পেল পীতাম্বর। গুরুর বয়স তখন শতাধিক। বালক পীতাম্বরকে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিলেন। বালা ত্রিপুরার ভক্ত এবং নিতান্ত বালক বলে গুরু তার নামকরণ করলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারী। উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২৯ সালে আবির্ভূত বংশীলাল - নর্মদার ঘর পালানো এই ছেলেটি পরবর্ত্তীকালে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ হিসাবে বিখ্যাত হন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আশ্রমে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধসাধক গৌরীশঙ্কর ব্রহ্মচারী যাঁর কাছ থেকে বালানন্দ শিক্ষা করেন নানা ধরণের যোগ এবং লাভ করেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান। নর্মদা পরিক্রমাকালে হঠযোগী মার্কণ্ডেয় মহারাজের কাছ থেকেও তিনি যোগ শিক্ষা করেন। দীর্ঘ বারো বছর পরে তাঁর নর্মদা পরিক্রমা শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি উচ্চস্তরের সাধক হয়ে ওঠেন।

এরপর বহু বছর ধরে তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও ধর্মস্থান পরিভ্রমণ করে বেড়ান। ধীরে ধীরে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং প্রভূত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। লোকে তাঁকে 'সচল শিব' বলে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাত। যোগ সাধনায় তাঁরা অসামান্য দক্ষতার কথা জানিয়েছেন তাঁরই শিষ্য শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী -- 'ষট্‌চক্রের বর্ণনা বা সাধনার কথা বহু গ্রন্থে আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রতিটি চক্রকে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্তি করিয়াছেন, এইরূপ সাধক খুবই বিরল। কিন্তু গুরু মহারাজ নয় বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পক্ষে ঐ কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। যোগমার্গের ব্যায়াম স্বরূপ যে প্রধান চতুরশীতি আসন নিরূপিত আছে তাহা তিনি অক্লেশে করিতেন। .... অনাহত নামক পদ্মে সমাহিত হইয়া তিনি প্রভূত যোগশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।' (যোগজ প্রজ্ঞা – 'শ্রীশ্রী তারানন্দ রচনা সম্ভার)। দেওঘর তপোবন পাহাড়ের সাধনগুহায় থাকাকালীন তাঁর অসাধারণ জ্যোতির্ময় মুর্তি এবং যোগ-বিভূতির কথা দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে করণীবাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর জীবনের শেষ বত্রিশ বছর। ঐ সময়ে অগণিত মানুষ তার কৃপা লাভে ধন্য হয়। ১৯৩৭ সালের ৯ই জুন, একশো আট বছর বয়সে এই মহাযোগী ব্রহ্মলীন হন।

এক তপ্ত দ্বিপ্রহরে 'প্রেম মন্দিরে' প্রবেশ করল নাস্তিক ব্রাহ্মণ যুবক। সহকর্মীর মুখে সে শুনেছিল এখানে একজন বড় সাধু থাকেন। কেমন সাধু তাই সে দেখতে এসেছিল।

আশ্রমের একজন তাকে জানালেন যে মহারাজ তাঁর দোতলার ঘরে এখন বিশ্রাম করছেন। বিকেলের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

যুবকটি একটু হতাশ হল। তবু সে আশ্রমটা ঘুরে ঘুরে দেখল এবং এক সময়ে দোতলায় গিয়ে মহারাজের ঘরের সামনে বসে পড়ল।

মহারাজের বন্ধ দরজা ঐ সময়ে খোলে না। তবু খুলে গেল হঠাৎ। আর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন এক অনিন্দ্যকান্তি জ্যোতির্ময় বৃদ্ধ, মুখে দেব-দুর্লভ হাসি।

যুবক বুঝতে পারল, ইনিই সেই মহারাজ যাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে।

সহাস্য মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন, আর উদ্ধত, অহঙ্কারী, নাস্তিক যুবক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দরজার - ফ্রেমে আঁটা দেবতার মূর্তির দিয়ে চেয়ে আছে। ভাবছে -- কে ইনি? পৌরাণিক যুগের কোনো ঋষি? মানুষের শরীরে এত জ্যোতি? এত দিব্য কান্তি? এত রূপ?

উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে মহারাজকে প্রণাম করল। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে মহারাজ তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস আস্তে আস্তে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

যুবকটির বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। সে বসে রইল চুপ চাপ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। তারপর রাত্রি নামল। তার আর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মহারাজের সঙ্গে, বললেন -- কি গো, রাত হলো বাড়ি যাবে না?

-- হ্যাঁ, এবার যাবো। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে।

মহারাজকে সে প্রণাম করল। মহারাজ তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, -- আবার এসো।

মহারাজের ঋষিতুল্য প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব, তাঁর অপূর্ব হাসি আর তাঁর মধুর ব্যবহার মুহূর্তের মধ্যেই এক অবিশ্বাসীর মনের অন্ধকার দূর করে দিল। সে মনে মনে বলতে লাগল -- 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর'। এরপর সে ঘন ঘন মন্দিরে আসতে লাগল। মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর অবশেষে সে মহারাজেরই শিষ্য, বর্তমান আশ্রম-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল।

কোনো ধর্মোপদেশ না দিয়েও একজন নাস্তিককে এক পলকেই যিনি জন্মান্তর ঘটিয়ে দিলেন, তিনি হলেন প্রেম মন্দির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধকপ্রবর শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রী শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী শৈলনন্দিনী দেবী একটি সুপুত্রের আশায় বাবা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেন। বাবার কৃপাতেই ১৯০১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩০৮ সনের ৬ই আশ্বিন) তারকদাস জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তারকেশ্বরের কৃপায় জন্ম বলে পুত্রের নাম রাখা হয় তারকদাস।

শ্রীরামপুরে তাঁর জন্ম, শ্রীরামপুরে তাঁর শিক্ষা, তাঁর কৈশোরের ক্রীড়াভূমি আর শ্রীরামপুরের অনতিদূরেই ছিল তাঁর বার্ধক্যের বারানসী'। প্রথমে কলকাতায় এবং পরে বোম্বাই -এ কিছুদিন চাকরী করার পর মায়ের অনুমতি ছাড়াই তিনি যোগিরাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তারকদাস রূপান্তরিত হলেন তারানন্দ ব্রহ্মচারীরূপে।

'সচল শিব' শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর দক্ষিণহস্ত ও প্রথম ব্রহ্মচারী শিষ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগল তারানন্দজীর সাধক জীবন। তিনি যোগশিক্ষা ও নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। দেওঘর করণীবাদ আশ্রমে তিনি প্রায় চোদ্দ বছর যোগসাধনা করেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং অসুস্থ মা-কে সেবা শুশ্রূষার জন্য নর্মদা পরিক্রমা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন এবং রিষড়ার গঙ্গাতীরবর্তী এক সুন্দর পরিবেশে প্রেম মন্দির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪০ সনের মাঘ মাসে।

আশ্রমে তারানন্দজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মন্দির নির্মিত হল। মন্দিরে কোন্ মূর্তি তিনি স্থাপন করবেন তার জন্য তিনি অন্তর্দেশ থেকে অন্তরতমের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী মাতার স্বপ্নাদেশ পেলেন -- 'তোর এই শরীরের জনক-জননীকে প্রতিষ্ঠা কর।' একই মূর্তিতে জনক-জননীর সমন্বয় একমাত্র অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিতেই সম্ভব। তাই শ্রীমহারাজ মন্দিরে ঐ মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এই সৌম্য সুন্দর যোগীর কাছে ভক্তরা আসতে আরম্ভ করেন। আপদে-বিপদে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে তাঁর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। তিনিও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁদের দেহমনের ক্লেদ দূর করে দিয়েছেন।

'গুপ্ত যোগী' তারানন্দজী ছিলেন প্রচার বিমুখ, স্বল্পবাক, অন্তর্মুখী এবং নিরহঙ্কার। নিজেকে জাহির করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। গুরু বালানন্দজীর শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সর্বাঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত চেহারা, দিব্যকান্তি এবং

দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবলে তাঁর অনুরাগীদের মনে পড়ে যায় উপনিষদের সেই মহান ঋষিকে, যিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় মন্ত্র ঃ-

'শৃন্বন্তু বিশ্বে, অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।'

অর্থাৎ -- বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রেরা আর যাঁরা দিব্যধামেতে আছেন, শোনো। আমি অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছি, কেবলমাত্র তাঁকে জেনেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়, আর অন্য কোনো পথ নেই।

তারানন্দজী যোগ-বিভূতিরও অধিকারী ছিলেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বহু মানুষকে তিনি দৈব ওষুধ ও যোগ বিভূতির সাহায্যে সুস্থ করে তুলেছেন। তাঁর এক শিষ্য লিখছেন -- 'কোন একটা ব্যাপারে অকস্মাৎ প্রাণনাশের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হই। ... বিপদাশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ আশ্রয় গুরুদেবও তখন সবেমাত্র দুর্গাপুর গেছেন। সেখানে বেশ কয়েকদিনের অবস্থানসূচী রয়েছে।' শিষ্য সবকিছু বিবৃত করে একজনকে দুর্গাপুরে তাঁর কাছে পাঠালেন। গুরুদেব সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করে পরের দিন ফিরে এলেন এবং সোজা তাঁর বাড়িতে শিষ্যের সঙ্গে দেখা করলেন। 'তারপর একান্তে আমাকে কিছু বিশেষ মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ অতিরিক্তভাবে নিয়মিত করে যাবার জন্য এবং আরও একটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ করবার উপদেশ দিয়ে, নিরঙ্কুশ অভয় দান করে আশ্রমে ফিরে গেলেন। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সকালে এসে, অনুষ্ঠান কেমন চলছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে গেলেন। .... তাঁর নির্দেশ পালন করে আমি অত্যাশ্চর্য ফল পেয়েছিলাম' (শ্রদ্ধাঞ্জলি -- প্রেম মন্দির প্রকাশন)। মহারাজের শিষ্য ভক্তরা এই ধরণের বহু ঘটনার সাক্ষী।

তারানন্দজী দিব্য মানব হয়েও মাটির পৃথিবীকে কখনও বিস্মৃত হননি। অভিজাত -অপজাত, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন -- সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। সকলের কাছেই তিনি ছিলেন সর্বদুঃখহর, সর্বতাপহর এক স্থির নিশ্চিত আশ্রয়।

তারানন্দ মহারাজ ছিলেন ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণের বিশ্বকোষ-স্বরূপ। সীমাহীন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। অনেক ধর্মীয় প্রবন্ধ ও কবিতা তিনি রচনা করেছেন যা সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভারে। এগুলির ধর্মীয় ও সাহিত্য মুল্য অপরিসীম।

জগৎমাতা ছিলেন সাধকপ্রবরের আরাধ্য। কিন্তু নিজ গর্ভধারিনীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রেম মন্দিরের

তিনি স্থাপন করেছেন মাতৃমন্দির, যেখানে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তিনি প্রতিদিন মাতৃপূজা করতেন।

১৯৩১ ২৬শে চৈত্র গভীর রাতে (ইং ১০ই এপ্রিল) এই ব্রহ্মবিদ পরমপুরুষ নার্সিং হোমে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। মহারাজের শিষ্য-ভক্তদের বিশ্বাস -- দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটলেও তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। ভক্তদের হৃদয় সিংহাসনে আজও তাঁর অক্ষয় আসন। সেখানেই চলে তাঁর নিত্য পূজা, নিত্য আরতি।

(৩)

রিষড়ার 'প্রেম মন্দির' আশ্রমে শ্রীশ্রী অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা তিথি উপলক্ষে সকালবেলায় অনুষ্ঠিত (১৯.১.৩১) এক ঘরোয়া আলোচনাসভায় তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন -- 'একটি শুদ্ধসত্ত্ব ভালো ছেলে খুঁজছিলুম। গুরুর কৃপায় পেয়েও গেলুম। নাম শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোলানাথ! একেবারে শিব!' মহারাজের মুখে মৃদু হাসি, বললেন, 'দেখলুম তার চেহারা — পাক্কা সাহেব!'

মহারাজের কথায় শ্রোতারা হেসে উঠলেন। কেননা মহারাজের ঐ 'পাক্কা সাহেব' আদৌ গৌরবর্ণ নন।

মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, গায়ের রং কালো, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? হীরের টুকরো ছেলে।' মহারাজ নিজের শরীরকে ইঙ্গিত করে বললেন -- 'এই শরীরটা যদি কোনো তপস্যা করে থাকে, গুরুদেবের আশীর্বাদে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকে -- তার ফলেই এমন শিষ্যকে পেয়েছে।'

শুধু ঘরোয়া আলোচনায় নয়, বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও বৃদ্ধ মহারাজ তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। যেন এক অমূল্য সম্পদ তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর এই আবিষ্কারের আনন্দ তিনি কিছুতেই গোপন করতে পারছেন না। দণ্ডিস্বামী শুদ্ধবোধাশ্রম মহারাজ আশ্রমে এসেছেন। অতিথিপরায়ণ মহারাজ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সহাস্যে বললেন, --'জানো, এক চমৎকার শিষ্য পেয়েছি। কি নাম দিয়েছি শুনবে? দেবানন্দ। সত্যি, দেবতার আনন্দের মতো জিনিস!' শুদ্ধবোধাশ্রম মহারাজ শিষ্যটির সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তারানন্দজীর কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।

কে এই শিষ্য যাঁর সম্বন্ধে এক সিদ্ধযোগীর এত স্নেহ, এত ভালোবাসা, এত প্রশংসা?

শিষ্যটি বর্তমান প্রেম মন্দির আশ্রমের 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা' এবং অধ্যক্ষ, শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর সার্থক উত্তরসূরি শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

হাওড়ার শিবপুরে ১৯৪০ সালের ২৪শে অক্টোবরে (বাংলা ৭ই কার্তিক ১৩৪৪ সন), বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতা শ্রী সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যশস্বী শিক্ষক (পরে অবশ্য তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন)। মাতা শ্রীমতী তারা দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা। তাঁদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন এবং কনিষ্ঠ ভোলানাথ। শ্রী সুবোধকুমারের এক কাকা, অর্থাৎ ভোলানাথের এক দাদু ছিলেন কাশীর কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল দণ্ডিস্বামী বাসুদেব তীর্থ।

ভোলানাথ বি কে পাল ইন্সটিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। অসাধারণ তাঁর মেধা, স্মরণশক্তি ও একাগ্রতা। পরীক্ষা-বৈতরণী, তা সে যতই দুরতিক্রম্য হোক না কেন, হাসতে হাসতে পার হয়ে যেতেন। বিজ্ঞান পড়তে ভালোবাসলেও মহাপুরুষের জীবনী, ইতিহাস এবং ধর্মসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থপাঠেও তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ। আসলে, যাঁরাই সত্যসন্ধানী, শিব-সুন্দরের পূজারী, তাঁদের প্রতিই ছাত্র ভোলানাথের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। আবাল্য তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, পরদুঃখকাতর এবং নিরহঙ্কার। এক কথায়, একজন আদর্শ ছাত্রের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, সেগুলির প্রত্যেকটি ছিল তাঁর মধ্যে। তাই নিজ গুণেই তিনি আদায় করে নিতেন শিক্ষক ও গুরুজনদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা।

ছেলেবেলায় ভোলানাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর বয়সী অনেক ছেলেরই থাকে না। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁর কিরকম একটা ভাবান্তর হত। হাঁ করে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছে বসতেন, হয়তো বা কিছু বাক্যালাপও করতেন। অবসর সময়ে কিংবা ছুটির দিনে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর বা কোনো ধর্মস্থানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন পূজারীর পূজা পদ্ধতি। দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে যেতেন। শুদ্ধাচারী, ভক্তি-বিনম্র তরুণের চোখে মৃন্ময় দেবদেবীরা চিন্ময় হয়ে উঠতেন। যেখানে ধর্মকথা হতো, সেখানে বসে যেতেন চুপটি করে। ভগবৎ প্রসঙ্গ আর শাস্ত্র কথা তাঁর কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে প্রবেশ করত, আর তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। এইভাবে, ছাত্রজীবনেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ সাধক জীবনের ভিত্তিভূমি।

একদিন ভোলানাথের জীবনে এল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। তখন তিনি কলেজের ছাত্র। তাঁর এক প্রতিবেশী এবং শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রী ত্রিদিবানন্দ ব্রহ্মচারী) একদিন তাঁকে বললেন - 'ভোলানাথ, তুমি তো অনেক মঠে মন্দিরে যাও, একদিন রিষড়ায় আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাবে?'

এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন ভোলানাথ। কলেজ কামাই করে একদিন সুব্রতর সঙ্গে চলে গেলেন প্রেম মন্দিরে।

প্রতিটি প্রথম দর্শনার্থীর মতো ভোলানাথও অবাক হয়ে গেলেন, তাঁরই ভাষায়, 'কপালে ভস্ম ত্রিপুন্ড্রক, গলায় ছোট দানার রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে অরুণবর্ণ বসন' জ্যোতির্ময় প্রৌঢ় সাধু শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকে দেখে। তাঁর মনে হল, 'প্রাচীন ভারতের তপোবনের কোন প্রজ্ঞাবান ঋষি, অনুভব করলাম এক স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁর সমগ্র দেবদুর্লভ অবয়বটিকে ঘিরে রয়েছে।' মুখে সেই হৃদয়-জয় করা হাসি। প্রণাম করতে ভুলে গিয়ে ভোলানাথ অপলক দৃষ্টিতে 'মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি, উন্নত দর্শন' মহারাজকে কেবল দেখে যাচ্ছেন।

হঠাৎ সুব্রতকে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটিকে কোথা থেকে নিয়ে এলে হে?' বলেই তিনি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। অতীতচারী হয়ে উঠল তাঁর মন। তারপর মধুর স্বরে বললেন, 'জানো, আমি যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে যাই, সেদিন আমাকে দেখেই তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, 'আয়া?' মানে 'এসেছো?' তারপর ভোলানাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখেই আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল।'

কত দর্শনার্থী তো প্রতিদিন মহারাজের কাছে আসেন। আর কাউকে দেখে কি তাঁর মনে পড়েছে ভাবী গুরু বালানন্দজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা? সর্বজ্ঞ শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী বুঝতে পেরেছিলেন, একদিন এই শুদ্ধসত্ত্ব তরুণই হবেন তাঁর সার্থক উত্তরসাধক।

ভোলানাথ প্রণাম করলেন। সস্নেহে আশীর্বাদ করে মহারাজ বললেন -- 'মাঝে মাঝে এখানে আসবে।'

মাঝে মাঝে! ভোলানাথের মনে হয়েছিল 'জীবন ধন্য হয়ে যাবে যদি অনুক্ষণ এই ক্ষণজন্মা তপোমূর্তির নিত্য সান্নিধ্য পেতাম।' পরবর্ত্তীকালে তিনি লেখেন -- 'সেদিন নীরব সম্মতি জানিয়ে গৃহে ফিরে আসি। কিন্তু সকল কাজের মাঝে তাঁর স্নেহ-মমতা মাখানো আলোকোজ্জ্বল মুখখানি বার বার মনে পড়তে থাকে।' মন যেন গেয়ে ওঠে।

'তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম দাও।
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও।।'

— রবীন্দ্রনাথ

এরপর সুযোগ এবং সময় পেলেই ভোলানাথ চলে যেতেন প্রেম মন্দিরে। দেখতেন ভক্ত-পরিবৃত মহারাজ ধর্মকথা আলোচনা করছেন। ভোলানাথকে দেখেই

মহারাজ ভক্ত সঙ্গ ছেড়ে চলে আসতেন। তাঁকে নিয়ে যেতেন নির্জনে, পাতাল ঘরের ছাদে। ভাবী শিষ্যকে সাধনপথের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। তারপর মিশে যেতেন ভক্তসঙ্গে। ভোলানাথ যখনই আশ্রমে যেতেন, তখনই মহারাজ তাঁকে একান্তে ডেকে নিতেন এবং তাঁর শিক্ষায় ভাবী শিষ্যকে শিক্ষিত করে তুলতেন। ভাবী শিষ্যের কতটা উন্নতি হয়েছে, অবনতি হয়েছে কিনা -- সব খবর মহারাজকে দিতে হত। তখনও ভোলানাথ কলেজের ছাত্র এবং অদীক্ষিত। মহারাজ নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর 'সাধনার কুসুমটিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার' গ্রহণ করেছিলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভোলানাথ বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে (ইটাচুনা কলেজ) অধ্যাপনা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। প্রয়োজনে চাকরী করতে হত বটে কিন্তু মন পড়ে থাকত প্রেম মন্দিরের প্রেমময় ব্রহ্মচারীর দিকে। এই ভাবে ছ'বছর মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার পর ভোলানাথ ১৯৩১ সালে ভীম একাদশী তিথিতে (সাতাশে মাঘ, ১৩৪৭) শক্তিমন্ত্রে (কালী) দীক্ষিত হন এবং ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন। মহারাজ তার নাম দেন - শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

দীক্ষা দেবার অব্যবহিত পরেই ঘটল এক বিচিত্র ব্যাপার। মহারাজ দেবানন্দজীকে বললেন -- 'এখন কোথায় থাকবে?'

শিষ্য বললেন -- 'আপনি যেমন আদেশ করবেন মহারাজ।'

গুরু মহারাজ বললেন -- 'এখান থেকে তবে অন্যত্র চলে যাও।'

যিনি মূর্তিমান প্রেম, যাঁর প্রতিটি বাক্য মধুময়, তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন একটু কড়া বলে মনে হল।

-- 'চলে যাও।' মহারাজের চিত্তে কৃপা, ব্যবহারে কঠোরতা।

তরুণ ব্রহ্মচারীর বিস্ময় -- 'কোথায় যাব?'

--'যেখানে ইচ্ছা।'

প্রস্থান করলেন মহারাজ। বন্ধ হয়ে গেল আশ্রমের দরজা।

চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়ি ফেরার পথও বন্ধ। এখন কোথায় যাবেন তরুণ ব্রহ্মচারী? কি খাবেন? কোথায় থাকবেন?

মহারাজ যে শিষ্যের তিতিক্ষা, সহ্যশক্তি ও বৈরাগ্য পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে চলে যেতে বলেছেন, দেবানন্দজী তখন তা বুঝতে পারেন নি।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন। দিনের পর দিন চললো ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও মাধুকরী। কোনদিন অন্ন জোটে, কোনদিন জোটে না। রাত্রি যাপন করেছেন

পথে-ঘাটে, মঠ-মন্দিরে। ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলায়, বিহারে, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে গঞ্জে।

একদিন ট্রেনে করে যাচ্ছেন। টিকিট না থাকায় চেকার মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত স্টেশন ভূষাওয়ালে দেবানন্দজীকে নামিয়ে দিলেন। নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনও বিকল হয়ে গেল।

যে কামরায় দেবানন্দজী ছিলেন, সেই কামরার লোকজনও স্টেশনে নেমে পড়ল এবং চেকারকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলতে লাগল -- ' এই সাধুবাবাকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছো। তাই ট্রেন চলছে না। এঁকে ট্রেনে তুলে নাও।' স্টেশনের অন্য যাত্রীরাও দেবানন্দজীর পক্ষ নিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু চেকারবাবুটি নিজ সিদ্ধান্তে অটল, অনড়। এদিকে ট্রেনও দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন থেমে থাকলে যাত্রীদের অসুবিধা হতে পারে। দেবানন্দজী তাই 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে হাত নাড়লেন। ট্রেনটা যেন তাঁরই সিদ্ধান্ত ও ইসারার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি হাত নাড়তেই ট্রেন চলতে শুরু করল।

দেবানন্দজী ভূষাওয়ালের এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। অখ্যাত, অজ্ঞাত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি এসে পৌঁছলেন ছোট্ট এক হনুমানজীর মন্দিরে। নির্জন মন্দির, কেবল এক বয়স্ক সাধু মন্দিরের সামনে এক দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তার বিপরীত দিকে আর একটি দাওয়ায় শুয়ে পড়লেন দেবানন্দজী। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

-- 'বাবাজী, বাবাজী --'

ঘুম ভেঙে গেল এক মহিলার কণ্ঠস্বরে। উঠে বসে দেখলেন এক অবাঙালী সধবা মহিলা খাবার নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হিন্দী ভাষায় তিনি যা বললেন তার অর্থ হল -- 'বাবাজী, দু'দিন তো কিচ্ছু খাওনি। একটা কলা খেয়ে আছো নাকি? নাও, এই চাপাটি, হালুয়া আর দুধটুকু খেয়ে নাও।'

দেবানন্দজী তাঁর হাত থেকে খাবার নিলেন। মহিলা তাঁকে খাইয়ে প্রস্থান করলেন।

দেবানন্দজী তৃপ্তি করে খেলেন এবং আবার শুয়ে পড়লেন। পরে দাওয়ায় যে বয়স্ক সাধু ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হতে তিনি ব্যাপারটা জানালেন।

সাধুবাবা শুনে অবাক! অনেকদিন তিনি ঐ মন্দিরে রয়েছেন, কিন্তু কেউ কোনোদিন তাঁকে খাবার দিয়ে যায়নি। তাছাড়া ঐ গ্রামে গরীব মানুষের বাস। কে এখানে সাধুসন্ন্যাসীকে খাওয়াবে?

দেবানন্দজী বুঝতে পারলেন মহিলার রূপ ধরে তাঁর পরম করুণাময়ী ইষ্টদেবী তাঁকে খাবার দিয়ে গেছেন

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো -- মহামায়ার কৃপা তিনি বেশ কয়েকবারই পেয়েছেন। কিন্তু সেসব কথা তিনি বলতে চান না। ২৮.৮.১৯৩১ তারিখে, শিষ্যা শ্রীমতী কাবেরী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন দুটি ঘটনার কথা উদ্‌ঘাটিত করেন যা গুরুদেব শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কাউকে তিনি কখনও জানাননি।

প্রেম মন্দির আশ্রমে থাকাকালীন একবার শ্রী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। গুরুমহারাজ মাতৃস্নেহে তাঁর শুশ্রূষা করতেন। শিষ্যের মাথার শিয়রে তিনি শীতলা মাতার উদ্দেশে একটি ঘট স্থাপন করে নিত্য ধূপ ধূনা দিতেন। শিষ্যের আরোগ্য কামনায় প্রতিদিন তার ওপর বারোটা তুলসী পাতা উৎসর্গ করতেন নারায়ণকে।

একদিন দেবানন্দজীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়ে উঠল। শরীর বড় বড় গুটিতে ভরে গেছে। তার ওপর প্রচণ্ড জ্বর আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। কেউ কেউ ভাবলেন রাত বুঝি আর কাটবে না। অচিরেই তিনি বোধহয় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকগমন করবেন।

গুরু মহারাজ শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে রাত দশটা নাগাদ শুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘোড়া ছুটিয়ে এলে যেমন একটা হাওয়া ওঠে, সেইরকম একটা ঝোড়ো হাওয়া সশব্দে ও প্রবল বেগে দেবাননন্দজীর জানলা দিয়ে ঢুকে তাঁর মাথা পর্যন্ত এসে আবার জানলা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন তাঁর আর কোনো কষ্ট নেই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

পরের দিন গুরু মহারাজকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বললেন, 'মা শীতলা এসেছিলেন। তিনি এসে তোমাকে ভালো করে দিয়ে গেছেন।'

আর একটি ঘটনা।

মহারাজ একদিন কোনো কাজে দেবানন্দজীকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। সারাদিন ঘুরে খুব ক্লান্ত হয়ে রাত্রিবেলা তিনি আশ্রমে ফিরলেন। মাতৃ মন্দিরের কাছে ছোট্ট ঘরে বিছানায় শুয়ে ইষ্টদেবীকে স্মরণ করছেন আর ভাবছেন যদি তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দেন তাহলে তাঁর আর কোনো ক্লান্তি থাকবে না। চোখ বুজে শুয়ে তিনি এসব কথাই ভাবছেন।

হঠাৎ কপালে পেলেন কোমল হাতের অপূর্ব স্নেহস্পর্শ। আঃ! কি অনাবিল শান্তি! কি স্বস্তি! তবে কি সত্যিই মা এসেছেন? দেবানন্দজী ভাবছেন, একবার চোখখুলে দেখলে হয়না!

মাতৃরূপ অবলোকনের জন্য তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক অভাবিত দৃশ্য।

মহাদেবী দ্রুত চলে যাচ্ছেন, আর তাঁর পেছনে গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা!

আনন্দে, বিস্ময়ে প্রথমে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর তীব্র অন্তর্দহনে অস্থির হয়ে গেলেন। হায়! কেন তিনি চোখ খুললেন! চোখ বুজে থাকলে আরও কিছুক্ষণ মা থাকতেন এবং তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতেন! আকুল হয়ে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কান্না শুনে মহারাজ তাঁর ঘর থেকে ছুটে গেলেন।

-- 'কি ব্যাপার দেবানন্দ? কি হয়েছে? এত কাঁদছো কেন?'

মহারাজকে দেখে দেবানন্দজী আত্ম সম্বরণ করে তাঁর অদ্ভুত দর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। স্থিতধী, স্বল্পবাক গুরুমহারাজ চুপ করে শুনলেন শিষ্যের কথা। তারপর শান্ত গলায় বললেন -- ' ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরকম দর্শন ও অনুভূতি অস্বাভাবিক নয়। এখন ঘুমোও।'

এক বছর পরে, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ফিরে এলেন প্রেমমন্দিরে, প্রেমস্নিগ্ধ গুরু মহারাজের স্নেহ নীড়ে। মহারাজ সাগ্রহে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে শিষ্যকে তৈরী করতে লাগলেন।

মহারাজের শিক্ষায় সদা হাস্যময় ব্রহ্মচারী সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন, বুৎপত্তি অর্জন করলেন বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণে, পূজা-পাঠ এবং সাধন ক্রিয়ায়। অল্প দিনের মধ্যেই সুসংগঠক, সুলেখক, সুবক্তা এবং সর্বকর্মনিপুণ ব্রহ্মচারী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

১৯৩১ সালে গুরুদেব শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন দেবানন্দজী। বর্তমানে তিনিই শিষ্য ভক্তদের কাছে মহারাজ। ছোট্ট প্রেমমন্দির তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ভক্তদের আন্তরিক সহায়তায় অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং শিষ্য ভক্তের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী সুলেখক। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'শ্রীশ্রী অর্দ্ধনারীশ্বর -- তত্ত্ব ও তথ্য', 'যোগসাধনা' প্রভৃতি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা তাঁর জ্ঞান ও মনস্বিতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রেম মন্দির প্রকাশন বিভাগ, 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকা, সংস্কৃত শিক্ষণ বিভাগ, দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, যোগ ব্যায়াম শিক্ষণ বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন তাঁরই উপদেশ ও পরিচালনায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে।

সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মধুর ব্যবহার। 'হসিতং মধুরং', 'হৃদয়ং মধুরং, 'বচনং মধুরং, 'চরিতং মধুরং' -- তাঁর হাস্য মধুর, হৃদয় মধুর, বচন মধুর এবং চরিত্র মধুর। তাঁর সবই মধুর। তিনি মধুনিষ্যন্দী।

উদ্দেশ্য বা প্রকৃত তথ্য বুঝে না,—নিজের আভ্যন্তরীণ জীবনের মূল তত্ত্বই বুঝে না; অতএব তাহার আত্মসংযমের সমগ্র প্রণালীই মিথ্যা এবং ব্যর্থ।*

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

শুধু শরীরের কর্ম, এমন কি শুধু মনের কর্মও কিছু নয়,—সে সব বন্ধনও নহে, বন্ধনের প্রথম কারণও নহে। প্রকৃতির মহাশক্তি মন প্রাণ ও শরীররূপ তাহার বিরাট ক্ষেত্রে নিজভাবে ক্রীড়া করিবেই; তাহার মধ্যে বিপদের জিনিস হইতেছে তাহার তিন গুণের মুগ্ধ করিবার শক্তি—এই তিন গুণ বুদ্ধিকে গুলাইয়া দিয়া আত্মাকে ঢাকিয়া ফেলে। আমরা পরে দেখিব যে, ইহা লইয়াই গীতার কর্ম ও মুক্তির সমস্ত কথা। গুণত্রয়ের মুগ্ধকরী ক্রিয়া হইতে মুক্ত হও—তাহার পর কর্ম থাকিতে পারে, থাকিবেই, এমন কি বৃহত্তম, সমৃদ্ধতম, বিষম উপদ্রবময় কর্মও চলিতে পারে; তাহাতে কোন হানি হইবে না, কারণ আত্মা নৈষ্কর্ম লাভ করে, আর কিছুই পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু উপস্থিত গীতা এই বড় কথাটা তুলিতেছে না। মনই যখন যান্ত্রিক কারণ, কর্মহীনতা যখন অসম্ভব, তখন শরীর ও মনের ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়মিত করাই কর্তব্য ও যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবে এবং কর্মেন্দ্রিয়গণকে তাহাদের যাহা প্রকৃত কাজ, কর্ম, তাহাতেই নিযুক্ত করিবে—কিন্তু যোগরূপে এই কর্ম করিতে হইবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩।৭

কিন্তু এই আত্মসংযমের সারতত্ত্ব কি, যোগরূপে কর্ম করা বা কর্মযোগের অর্থ কি? ইহা অনাসক্তি, ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং কর্মের ফলে মনকে লিপ্ত হইতে না দিয়াই কর্ম করিতে হইবে। সম্পূর্ণ কর্মশূন্যত নহো—ইহা ভ্রম, মোহ আত্মপ্রতারণা, ইহা অসম্ভব। সম্যকভাবে, স্বাধীনতার সহিত কর্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপুর বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে, কামশূন্য হইয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে হইবে—এই সবই সিদ্ধিলাভের প্রথম গূঢ় রহস্য। কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপে আত্মসংযমের সহিত কর্ম কর, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্; আমি বলিয়াছি যে, জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা বড়, জ্যায়সি কর্ম্মণঃ বুদ্ধি, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে, কর্ম অপেক্ষা কর্মশূন্যতা বড়, বরং

* "মিথ্যাচার" শব্দের অর্থ কপটাচারী (hypocrite) বলিয়া আমার মনে হয় না। যে মনুষ্য এরূপ সম্পূর্ণ কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কেমন করিয়া কপটাচারী হইতে পারে? সে ভ্রমে পতিত, "বিমূঢ়াত্মা", এবং তাহার "আচার"—তাহার গতানুগতিক আত্মসংযমের প্রণালী মিথ্যা এবং ব্যর্থ—এই মাত্রই যে গীতার অর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিপরীতটাই সত্য, কর্ম জ্যায়ঃ হ্যকর্ম্মণঃ। কারণ, জ্ঞান বলিতে কর্মত্যাগ বুঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং অধ্যাত্মসিদ্ধির শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মানন্দে মন ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে, নিয়তম্ *, জ্ঞান বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্মযোগের দ্বারা বুদ্ধিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তি-দায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদের কেবল বাহ্যিক শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রণালীর সহিত যোগপ্রণালীর মিলন করিয়াছে।

কিন্তু এখনও একটা মূল সমস্যার সমাধান হয় নাই। মানুষ সাধারণত যে কর্ম করে, শুধু কামনার বশেই তাহা করিয়া থাকে; অন্তঃকরণ যদি কামনা হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ত কর্মের কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। শরীর রক্ষার জন্য কতকগুলি কর্ম করিতে আমরা বাধ্য হইতে পারি বটে, কিন্তু ইহাও শরীরের কামনার পরাধীনতা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইহা হইতেও আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা হইলে (আমাদের ভিতরের কিছুর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া) কর্মের কোন বাহ্য বিধি মানিয়া চলা ব্যতীত আর উপায় নাই; বেদের নিত্যকর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নির্দিষ্ট দৈনিক কার্য, সামাজিক কর্তব্য এইরূপে বাহ্য-বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত; যাহারা মুক্তি চায় তাহারা এই সব কর্ম করিতে পারে; এই সকল কর্ম যে তাহাদের কামনানুযায়ী এবং মনোমত সে জন্য নহে, শাস্ত্রে মুক্তিকামীগণকে এই সকল কর্ম করিবার বিধি বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হয়। কিন্তু কর্মের নীতি এরূপ বাহ্য না হইয়া যদি আভ্যন্তরীণ হয়, যদি মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কর্ম তাঁহাদের স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (স্বভাব-নিয়তম্) করিতে

* নিয়তম্ কর্ম সাধারণত যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয় আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। সাধারণ টীকাকারেরা নিয়তং কর্ম বলিতে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বুঝিয়াছেন। পূর্বোক্ত শ্লোকের "নিয়ম্য" শব্দটাকে লইয়াই যে এই শ্লোকে "নিয়তম্" করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ না। প্রথমে কৃষ্ণ একটা তথ্য বর্ণনা করিলেন যে, যে-ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মযোগম্, এবং ইহার পরেই এই তথ্য বর্ণনা হইতে একটা উপদেশ বাহির করিলেন, ইহার সারটুকু লইয়া ইহাকে একটি বিধিতে পরিণত করিলেন—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্—তুমি নিয়ত কর্ম কর। এখানে "নিয়তম্" শব্দে "নিয়ম্য"কে লওয়া হইয়াছে এবং আরভতে কর্ম্মযোগম্ হইতে বিধি করা হইয়াছে, কুরু কর্ম্ম। বাহ্যবিধিদ্বারা নির্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম নহে, মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত কামনাশূন্য কর্মই গীতার শিক্ষা।

হয়—তাহা হইলে কামনা ব্যতীত কর্মের আর কোন আভ্যন্তরীণ নীতিই নাই; এই কামনা উচ্চ বা নীচ হইতে পারে, শরীরের ভোগের কামনা হইতে পারে, কিন্তু এসবই প্রকৃতির গুণের অধীন। অতএব গীতার "নিয়ত কর্ম" বলিতে বেদের "নিত্য-কর্ম," আর্যসমাজের নীতি অনুযায়ী "কর্তব্য কর্ম" বুঝিতে হইবে এবং গীতার যজ্ঞার্থে কর্ম বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনাশূন্য হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞ এবং নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যসমূহেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্মের অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় গীতার অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সংকীর্ণ এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। গীতার শিক্ষা উদার, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীর; ইহা সকল যুগের সকল মনুষ্যেরই উপযোগী, কেবল কোন বিশেষ যুগ বা কোন বিশেষ দেশের জন্য নহে। বিশেষত, ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধিনিষেধের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের, গতানুগতিক ধারণাসমূহের বন্ধন ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের সত্তার প্রধান তত্ত্বগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং প্রয়োগ-উপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধাধরা বিধিনিষেধ বা বিশেষ দার্শনিক মতবাদে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।

সমস্যা হইতেছে এই যে, আমাদের প্রকৃতি যখন এইরূপ এবং কামনাই যখন কর্মের সাধারণ নীতি তখন প্রকৃতভাবে নিষ্কাম কর্ম করা কিরূপে সম্ভব? কারণ সাধারণত যে সকল কর্মকে নিঃস্বার্থ কর্ম বলা যায় সেগুলি প্রকৃত নিষ্কাম নহে; ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য—দেশের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য সেসকল কর্ম করা হয়। এই সব কর্ম নির্ব্যক্তিক মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে নির্ব্যক্তিক (impersonal) নহে। আবার শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন যে, সকল কর্মই আমাদের প্রকৃতির দ্বারা, গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন শাস্ত্রানুসারে কর্ম করি তখনও আমরা নিজেদের প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম করি। সাধারণত যে সকল কর্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অনুকূল—আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, স্বার্থ বা অহঙ্কারের অনুকূল; কিন্তু যদিই অন্যরূপ ধরা যায়, যদি সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের ছোট-বড় কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক নাই—সেগুলিও আমরা আমাদের প্রকৃতির বশেই করিয়া থাকি, কারণ, আমাদের স্বভাব যদি ভিন্নরূপ হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা ঐসকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিতে যাইতাম না—হয় আমরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের সুখের অনুসন্ধানেই কর্ম করিতাম অথবা নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য বাছিয়া লইতাম—নতুবা সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতাম। আমাদের

বাহিরের কোন আইনকানুন মানিয়া আমরা নির্ব্যক্তিক হইতে পারি না, কারণ এইভাবে আমরা নিজেদের বাহিরে যাইতে পারি না, শুধু আমাদের ভিতরেই যে শ্রেষ্ঠ সত্তা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, আমাদের যে মুক্ত আত্মা সর্বভূতেরই এক আত্মা অতএব সকল ব্যক্তিক স্বার্থ হইতে মুক্ত, তাহাতে উঠিতে পারিলে আমরা প্রকৃতভাবে নির্ব্যক্তিক হইতে পারি। বিশ্বের অতীত যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার বিশ্বকর্ম বা ব্যক্তিগত কর্ম কিছু দ্বারাই বন্ধ নহেন, সেইখানে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে—কামনাশূন্যতা ইহার উপায় মাত্র, শুধু কামনাশূন্যতাই জীবনের লক্ষ্য নহে। বুঝিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ভগবান বলিলেন, যজ্ঞকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম করিয়া ইহা হইতে পারে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

—"যজ্ঞার্থে কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিলে লোকে কর্মে বন্ধ হয়। অতএব, হে কৌন্তেয়, আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম অনুষ্ঠান কর।" শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কর্তব্য নহে, সকল কর্মই যজ্ঞার্থে করা যাইতে পারে; প্রত্যেক কর্মই ছোট বা বড় স্বার্থের জন্য করা যাইতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্মই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারাই ইহা রক্ষিত হয়, এবং তাঁহার দিকেই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু যতদিন আমরা অহংভাবের (ego-sense) অধীন, ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না, ততদিন আমরা অহংভাবের বশে স্বার্থের জন্য কর্ম করি, যজ্ঞার্থে নহে। অহঙ্কারই সকল বন্ধনের গ্রন্থি। অহং সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিয়া ভগবানের উদ্দেশে কর্ম করিলে আমরা এই গ্রন্থি শিথিল করিতে এবং শেষকালে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

যাহাই হউক, গীতা প্রথমে যজ্ঞের বেদোক্ত বর্ণনাই ধরিয়াছে এবং তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। গীতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সন্ন্যাস ও কর্মের যে বিরোধ তাহা দুই প্রকারের—প্রথমত, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে-বিরোধ, মূল নীতিতে এই বিরোধের সমাধান ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে-বিরোধ তাহা সমাধান করিতে এখনও বাকী আছে। প্রথমটিতে এই বিরোধ সাধারণভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং কর্ম শব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যের আরম্ভ অক্ষর ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের দিব্যভাব লইয়া—প্রত্যেক জীবই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পুরুষ; সাংখ্যে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার প্রভেদ করিয়াছে—অতএব কর্মত্যাগই সাংখ্যমতে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। যোগের আরম্ভ ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া—

ঈশ্বর প্রকৃতির কার্যাবলীর প্রভু অতএব তাহাদের উপরে; সুতরাং কর্মসন্ন্যাস কর্মের উপর জীবের প্রাধান্যলাভ এবং সকল কর্ম করিতে থাকিলেও মুক্ত থাকা ইহাই যোগের লক্ষ্য। বেদবাদ ও বেদান্ত-বাদের মধ্যে যে-বিরোধ সেখনে কর্ম বলিতে বৈদিক কর্ম, এমন কি কখনও কেবল বৈদিক যজ্ঞ ও আনুষ্ঠানিক কর্মই বুঝায়—অন্য কর্ম মুক্তির সহায় নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণের যে বেদবাদ তদনুসারে এই সকল কর্ম মুক্তির উপায়স্বরূপ সম্পাদন করিতেই হইবে; উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তবাদ অনুসারে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রক্রিয়াভাবেই কর্মের উপযোগিতা, শেষে কর্মকে অতিক্রম করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ ইহা মুক্তির পরিপন্থী। বেদবাদ যজ্ঞের দ্বারা দেবতার পূজা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে, তাঁহারা আমাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন। বেদান্তবাদের মতে দেবতাসকল মানসিক এবং জড়-জগতের শক্তি ও আমাদের মুক্তির পরিপন্থী (উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, মানুষ দেবতাদের গোধনস্বরূপ—তাঁহারা চান না যে মানুষ জ্ঞানলাভ করে বা মুক্ত হয়); এই মতে ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে যজ্ঞ ও পূজা আদি কর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কর্মের দ্বারা শুধু ঐহিক ফল এবং নিম্নতর স্বর্গলাভ করা যায়, অতএব কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে—গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে যে, দেবতারা সকল যোগ, পূজা যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু সেই এক দেবের, ঈশ্বরের, বিভিন্ন রূপ মাত্র; এবং যদি ইহা সত্য হয় যে, দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে ঐহিক সুখ এবং স্বর্গ লাভ করা যায় তাহা ইহালে ইহাও সত্য যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে তাহাদের উপরে যাইয়া পরম মুক্তি লাভ করা যায়। কারণ ঈশ্বর এবং অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন নহেন, উভয়েই এক—উভয়ের মধ্যে যাহাকে হউক লক্ষ্য করিলে একই দিব্য-জীবনের অভিমুখী হওয়া যায়। সকল কর্মেরই পরিণতি ও পূর্ণতা হইতেছে ভগবানের জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্মসকল বাধা নহে, তাহারা চরম জ্ঞানলাভের পথ। এইরূপে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধেরও সামঞ্জস্য করা হইল। বাস্তবিক, এই বিরোধ সাংখ্য ও যোগের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বেদবাদ একরকম সংকীর্ণ বিশেষ রকমের যোগ; বৈদান্তিকদের মূল নীতি সাংখ্যদের সহিত এক, কারণ উভয় মতানুসারেই বুদ্ধিকে প্রকৃতির ভেদাত্মক শক্তিসকল হইতে, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় হইতে, অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং বাহ্য-বিষয় সকল হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই অভিন্ন অক্ষরে লইয়া আসাই মুক্তি-লাভের সাধনা। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই গুরু প্রথমে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম হইতে বরাবরই তাঁহার লক্ষ্য সংকীর্ণ

বেদোক্ত যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহাদের উদার ব্যাপক অর্থের উপরই ছিল। এইরূপে সংকীর্ণ আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৃহৎ সাধারণ সত্যগুলিকে লওয়া সকল সময়েই গীতার বিশিষ্ট প্রণালী।

দ্বাদশ অধ্যায়

যজ্ঞের মর্ম

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে; প্রথমটির ভাষা এরূপ যে শুধু তাহাই ধরিলে যজ্ঞ বলিতে আনুষ্ঠানিক (বৈদিক) যজ্ঞ বুঝায় বলিয়াই মনে হয়; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াই বুঝান হইয়াছে; এবং উহাকে উচ্চ মনস্তত্ত্বমূলক ও অধ্যাত্ম সত্যের স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টবা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়েভ্যো বো ভূঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ,
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামেঃ মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১০-১৬

"সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; এই যজ্ঞই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সম্বর্ধন কর। সেই দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন, এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে-ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোরই। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল

পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয় ; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন; অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে এইরূপে প্রবর্তিত চক্র যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, পাপময় জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে-ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।" এইস্থানে যজ্ঞ বলিতে বেদানুমোদিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝাইতেছে বলিয়া যে মনে হয় ইহার প্রকৃত মর্ম কি তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া কর্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩।১৭, ১৮

"কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই পরিতুষ্ট এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। ইহলোকে তাঁহার কর্ম করিয়া কোন লাভ নাই, কর্ম না করিয়াও কোন লাভ নাই; কোন ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাকে সর্বভূতের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।"

তাহা হইলে এখানে দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ দেখা যাইতেছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কর্মের আদর্শ, যজ্ঞের দ্বারা এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা দ্বারা ইহকালে ভোগ সুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ, অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ—তিনি আত্মসত্তায় স্বাধীন, কর্ম বা ভোগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নরলোক বা দেবলোক লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের স্থির আনন্দে তিনি আনন্দলাভ করেন। পরের কয়েকটি শ্লোকে এই দুইটি বিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের পথ করা হইয়াছে; উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্মসাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্ত পুরুষের কর্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কর্ম করিতে বা কর্ম ত্যাগ করিতে হয় না।

তস্মাদসক্তঃ সততঃ কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়। ৩।২০

"অতএব যে কর্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, লোকসংগ্রহার্থে) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা করা ; কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। কারণ জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" ইহা সত্য যে, কর্ম এবং যজ্ঞ শ্রেয়োলাভের উপায়, শ্রেয়ং পরম-বাপ্স্যর্থ। কিন্তু কর্ম তিন প্রকার—(১) যজ্ঞহীন যে কর্ম শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য করা যায়—ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত, এবং জীবনের মূল নীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ, মোঘং পার্থ স জীবতি। (২) সকাম হইয়াও যে কর্ম যজ্ঞসহিত করা যায়—এই কর্মে যে ভোগ-সুখ লাভ করা যায় তাহা হয় যজ্ঞের ফল স্বরূপ, অতএব ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। (৩) নিষ্কামভাবে কোনরূপ আসক্তি না রাখিয়া যে কর্ম করা যায়। শেষোক্ত প্রকারের কর্মের দ্বারাই পরমগতি লাভ করা যায়, পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

যজ্ঞ, কর্ম, ব্রহ্ম—এই শব্দগুলির আমরা যেরূপ অর্থ করিব তাহার উপরেই এই শিক্ষার সারমর্ম নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞ বলিতে যদি আমরা বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি, যে-কর্ম হইতে ইহার উদ্ভব তাহা যদি বেদোক্ত কর্ম-বিধি হয় এবং যে-ব্রহ্ম হইতে সকল কর্মের উদ্ভব তাহা বলিতে যদি আমরা "শব্দব্রহ্ম" বা বেদ বুঝি—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এখানে গীতা বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মেরই উপদেশ দিয়াছে, ইহার অধিক আর কিছুই নাই। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই পুত্র, ধন, ভোগ-লাভের যথাযথ উপায়, অনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয় এবং তাহা দ্বারা প্রজার সমৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনই মানুষ ও দেবগণের মধ্যে অনবরত আদান-প্রদানের ব্যাপার—এখানে মানুষ দেবগণের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুর দ্বারা দেবগণের সম্বর্ধন করে এবং তাহার ফলে নিজেরা সম্পদশালী হয়, রক্ষিত হয়, সম্বর্ধিত হয়। অতএব সকল কর্মকেই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের সহিত করিতে হইবে; যেসকল কর্ম এইরূপে দেবগণের উদ্দেশে করা না হয় তাহা অভিশপ্ত, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ না করিয়া যে-ভোগ তাহা পাপ। এমন কি পরম শ্রেয়ঃ মুক্তি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। ইহা কখনও পরিত্যাগ করা চলিবে না। এমন কি মুক্তিকামী ব্যক্তিকেও অনাসক্তভাবে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে এইরূপে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়াই জনকাদি মহাত্মাগণ অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

গীতার অর্থ যে এরূপ হইতেই পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ এরূপ অর্থ গীতার বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত। এমন কি গীতার এই স্থানেই যাহা বলা হইয়াছে, (অন্য স্থানের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ধরিলেও) তাহা হইতে যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায়—কারণ, এখানে বলা হইয়াছে "কর্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয়, কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্বগত

(সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" এখানে এই "অতএব" শব্দের ব্যবহার এবং "ব্রহ্ম" শব্দের পুনরুক্তি প্রণিধানযোগ্য; কারণ ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং" (ব্রহ্ম হইতেই কর্মের উৎপত্তি)। এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ইহা হইতেছে সৃজনাত্মক শব্দ (the creative word), ইহা সর্বব্যাপী, সনাতন, সর্বভূতে এবং সর্বকর্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক। ভগবানের শাশ্বতের জ্ঞানই বেদ—পরবর্তী এক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"

"বেদসকলের দ্বারা আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়।" কিন্তু তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে, ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ, বেদে শুধু তাঁহাকে সেই-রূপেই জানা যায়, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ। প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে-ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত; এই অক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত গুণ-ক্রিয়ার উপরে, নিস্ত্রৈগুণ্য। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্মপ্রকাশের স্বরূপ দুই-প্রকার—অক্ষর সত্তা এবং ক্ষর জগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্তা, আত্মা, সর্ব্বভূতানি; ইহা বস্তুসকলের অচল সর্বব্যাপী আত্মা এবং ইহা বস্তুসকলের সকল কর্মধারায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—আত্মসংস্থ পুরুষ এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ; ইহা অক্ষর ও ক্ষর। এই উভয় স্বরূপেই ভগবান "পুরুষোত্তম" বিশ্ব-মাঝে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন; সর্বগুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার শান্তি, আত্মস্থতা, সমতার অবস্থা, "সমম্ ব্রহ্ম", তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে এবং তাহাদের বিশ্বকর্মধারায় তাঁহার প্রকটন চলিয়াছে; প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের * উৎপত্তি, এই কর্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান-প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে-বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্বভূতের মহেশ্বর—ভোক্তারং যজ্ঞপসাম্ সর্ব্বভূত-

---

* এইরূপ ব্যাখ্যাই যে সমীচীন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত বিশ্বতত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে, অক্ষর (ব্রহ্ম), স্বভাব, কর্ম, ক্ষরভাব, পুরুষ, অধিযজ্ঞ। অক্ষর হইতেছে অক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মা (spirit of self); স্বভাব আধ্যাত্ম, ইহা সত্তার মূল প্রকৃতিরূপে, বিবর্তনের নিজস্ব ধারারূপে কর্ম করে এবং ইহা আত্মা হইতে, অক্ষর হইতে উৎপন্ন; সেই স্বভাব হইতে কর্মের উৎপত্তি এবং এই কর্মই সৃষ্টির ধারা, বিসর্গ, ইহার দ্বারা সকল প্রাকৃত সত্তা এবং সত্তার সকল পরিবর্তনশীল আন্তর ও বাহ্য রূপ উদ্ভূত হয়; অতএব এই পরিবর্তনশীল জগৎ সবই কর্মের ফল, স্বভাব হইতে উৎপন্ন ক্ষরভাব; অন্তরাত্মাই পুরুষ—এই ক্ষর জগতে তাহাই ভগবানের অংশ, অধি-দৈবতম, তাঁহার অবস্থান হেতু কর্মসকল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ হইয়া থাকে, এই যে গুপ্ত ভগবান যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ।

মহেশ্বরম্। এই "সর্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ভগবানকে জানাই সত্য জ্ঞান, বৈদিক জ্ঞান।

কিন্তু দেবগণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নিম্নস্তরের ক্রিয়া সেই ক্রিয়াতে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। দেবগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। দেব ও মনুষ্য পরস্পরের সহিত আদান-প্রদানের দ্বারা যে সম্বর্ধিত হইতেছে ইহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য ক্রমশ পরম শ্রেয়োলাভের যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে যে, জগতে ভগবানের এই যে কর্মধারা চলিতেছে, তাহার নিজের জীবন তাহারই অংশ মাত্র—তাহা স্বতন্ত্র কিছু নহে, নিজের জন্য যাপন করিবার জিনিস নহে। সে সংসারে যেসকল ভোগ ও কাম্য লাভ করে তাহা তাহার নিজের চেষ্টায় লব্ধ বলিয়া ভাবে না। সেই সকল যজ্ঞের ফল এবং দেবতাদের দান বলিয়াই সে গ্রহণ করে, অহংভাবে ও স্বার্থপরতার বশে নিজের শক্তিতেই সংসার হইতে সে-সব লইবার পাপ-চেষ্টা সে করে না। এই ভাব তাহার ভিতরে যতই বর্ধিত হয়, ততই সে নিজের কামনাসকলকে দমন করে, যজ্ঞকেই জীবনের ও কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, যজ্ঞের অবশেষ স্বরূপ যাহা থাকে তাহাতেই তৃপ্ত হয়, বাকী সমস্তই নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবন এবং বিশ্বের জীবনের মধ্যে কল্যাণকর মহান আদান-প্রদানে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে। যাহারা কর্মে এই নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই ভোগ ও কর্মের অনুসরণ করে তাহাদের জীবন বৃথা। তাহারা জীবনের এবং আত্মোন্নতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা ধরিতে পারে নাই। যে-পথে পরম শ্রেয়োলাভ করা যাইতে পারে তাহারা সে পথের পথিক নহে। কিন্তু পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে করা হয়, দেবগণ যাঁহার নিম্নতন রূপ ও শক্তি। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্ন প্রকৃতির কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগ নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে তাহার একমাত্র তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ ও বিমল আনন্দ ভোগ করে; তখন কর্ম বা কর্মশূন্যতায় তাহার কোন লাভালাভ থাকে না, তখন সে কোন বস্তুর জন্য দেব বা মনুষ্য কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না, কাহারও নিকট কোন লাভের প্রত্যাশা করে না কারণ আত্মানন্দেই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি, কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপে আসক্তিশূন্য ও কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করে। এইরূপে সে সমতা লাভ করে এবং প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তিলাভ করে, নিস্ত্রৈগুণ্য হয়; তাহার আত্মা প্রকৃতির

অনিশ্চয়তার মধ্যে নহে, কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মের শান্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তখনও প্রকৃতির কর্মধারার মধ্যে তাহার কর্ম চলিতে থাকে। এইরূপে যজ্ঞই হয় তাহার পরম শ্রেয়োলাভের পথ।

গীতায় পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম ইহাই ঠিক। পরে বলা হইয়াছে, 'লোকসংগ্রহই' কর্মের উদ্দেশ্য; একমাত্র প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, ভাগবত পুরুষ সকল কার্যেরই সমান ভর্তা (upholder) এবং সকল কর্ম কার্যকালেই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে (এইরূপে ভিতরে কর্মের অর্পণ এবং বাহিরে কর্মের সম্পাদন, ইহাই যজ্ঞের পরিণতি)। এইরূপে সমতার সহিত বাসনাশূন্য হইয়া যজ্ঞরূপে কর্ম করিলে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪।২২।২৪

"যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, কর্মের সফলতা বা বিফলতায় যাঁহাব সমভাব তিনি কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। যখন কোন আসক্তিহীন মুক্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন তখন তাঁহার সমুদায় কর্ম লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ এবং সমতাপ্রাপ্ত আত্মার উপর সেসকল কর্মের পরিণাম-স্বরূপ বন্ধন রহিয়া যায় না বা কোন দাগ পড়ে না।" পরে আবার আমরা এই সকল শ্লোকের আলোচনা করিব। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে-ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই সকল কথা রূপকভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতায় যে-যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্বত্রই দুই প্রকার অর্থ ছিল—শারীরিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকদের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের মর্ম লোকে বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে গীতাতে বেদান্ত এবং পরবর্তী যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি স্থূল (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি। সংযমই অগ্নি, অথবা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই অগ্নি, অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়মিত প্রাণশক্তিই অগ্নি অথবা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অগ্নি। যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা ভক্ষণ করা হয় তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে—তাহা ভোজন করিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, এখানে প্রাচীন বৈদিক রূপকের কিছু রহিয়াছে—যজ্ঞের দ্বারা যে অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রদায়ী দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, দেবগণকে অর্পণ করা হয়, মানুষও পান করে, সোমরস

ছিল সেই দিব্য আনন্দেরই স্থূল প্রতীক। মানুষ শরীর বা মনেব দ্বারা যে কোন কর্ম দেবতাদের বা ভগবানের উদ্দেশে করে, অথবা নিজের ঊর্ধ্বতম আত্মা অথবা মানবজাতি ও সর্বভূতের আত্মার উদ্দেশে করে তাহাই হইতেছে অর্পণ।

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার আরম্ভ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের ক্রিয়া, যজ্ঞেব সামগ্রী, যজ্ঞের কর্তা, যজ্ঞের গ্রহীতা, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবই সেই এক ব্রহ্ম।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ৪।২৪

'অর্পণ ব্রহ্ম, উৎসর্গের দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত, ব্রহ্মকর্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।' অতএব এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞ-কর্ম করিতে হইবে। 'সোঽহম্ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম', এই সবল মহান বেদান্ত বাক্যে এই জ্ঞানই সূচিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান; একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তাই কর্মের কর্তা, কর্ম এবং কর্মের লক্ষ্যরূপে আবির্ভূত, জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত। যে বিশ্বশক্তিতে কর্ম অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান। অর্পণের ক্রিয়া ভগবান; যাহা অর্পণ করা হয় তাহা ভগবানেরই কোন বিশেষ রূপ; যিনি অর্পণ কবেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নহেন; ক্রিয়া, কর্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে কর্মরূপে ভগবান, যজ্ঞের দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে তাহাও ভগবান। যে মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবনযাপন করে, কর্ম করে—তাহার পক্ষে কর্ম কোন বন্ধনই নহে, তাহার ব্যক্তিগত, অহংভাবে কৃত কোন কর্ম থাকিতে পারে না, শুধু ভাগবত পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা কর্ম করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে সমস্ত অর্পণ করেন। ভগবদ্‌মুখী এই সকল কর্মের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সহিত যুক্ত জীবের ভাগবত জ্ঞানলাভ, ভাগবত জীবন, ভাগবত চেতনা লাভ। ইহা জানা এবং এই ঐক্যসাধনা চৈতন্যে জীবনযাপন করা, কর্ম করাই মুক্ত হওয়া।

কিন্তু যোগিগণের মধ্যেও সকলেই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ৪।২৫

'অন্য যোগিগণ দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; অপর যোগিরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন।' প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভগবানকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন সাধন, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান, শেষোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহারা যে কর্মই করুন সে সব ভগবানে অর্পণ করা, ঐক্যমূলক ভাগবত

চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে তাঁহাদের সকল কর্ম নিক্ষেপ করা—কেবল এই যজ্ঞই হয় তাঁহাদের একমাত্র সাধন, তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম। যজ্ঞের সাধন বিবিধ; অর্পণ নানা প্রকারের। আত্মসংযমরূপ যে মনস্তত্ত্বমূলক যজ্ঞ তাহার দ্বারা উচ্চ আত্মজ্ঞান আত্মজয় লাভ করা যায়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৪।২৬,২৭

"কেহ-কেহ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন, অন্য কেহ-কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে নিক্ষেপ করেন। অপরে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ্ত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্ম হোম করেন।' অর্থাৎ একরকমের সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ গ্রহণ করা হয় অথচ এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায় মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিস্বরূপ হয়। আর একরকম সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করা হয়, যেন মনের ক্রিয়ায় অন্তরাল হইতে শান্ত স্থির আত্মা তাহার বিশুদ্ধতায় আবির্ভূত হয়; আর একরকম সাধনা আছে—যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই সাধনার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম সেই এক স্থির শান্ত আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়। যাঁহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের যজ্ঞ স্থূল দ্রব্য সম্পর্কে হইতে পারে; দ্রব্যযজ্ঞ—ভক্ত যখন নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবতার পূজা করে তখন এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞই করিয়া থাকে অথবা আত্মসংযমের কঠোর সাধনা এবং কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে আত্ম-শক্তি নিয়োগ করাও এক রকম যজ্ঞ হইতে পারে, তপোযজ্ঞ অথবা রাজযোগী এবং হঠযোগীদের প্রাণায়াম বা অন্য কোনরূপ যোগ যজ্ঞ হইতে পারে। এই সমস্তই আত্মশুদ্ধির সহায়ক; সকল যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ পদলাভের পন্থাস্বরূপ।

এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে প্রধান জিনিস যাহা মূল নীতিরূপে সকল-গুলিরই ভিতরে রহিয়াছে তাহা এই—নিম্নস্তরের ক্রিয়াগুলিকে দমন করিতে হইবে, বাসনার আধিপত্য কমাইয়া উচ্চস্তরের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা, নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক উচ্চতর ও বৃহত্তর আদর্শ গ্রহণের দ্বারা যে দিব্যতর আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্

যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। যজ্ঞই সংসারের নীতি। ইহকালে প্রভুত্ব, পরকালে স্বর্গ বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ কিছুই যজ্ঞ ব্যতীত পাওয়া যায় না

নায়ং লোকেঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৪।৩১,৩২

যিনি যজ্ঞ করেন না, তাঁহার পক্ষে ইহলোকই নাই, পরলোক ত দূরের কথা। অতএব, এই সমস্ত যজ্ঞ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার যজ্ঞ 'বিততা ব্রহ্মণো মুখে', ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হয় (Extended in the mouth of the Brahman, the mouth of that Fire which receives all offerings). এ সবই হইতেছে কর্মে প্রবৃত্ত অদ্বিতীয় এক মহান সত্তার বিভিন্ন সাধন, বিভিন্ন রূপ; এই সব সাধনের দ্বারা মানুষের কর্ম সেই পরম সত্তাকে অর্পণ করা যায়, মানুষের বাহ্য জীবন সেই সত্তার অংশ এবং তাহার অন্তরতম সত্তায় তাহার সহিত সে এক। এই সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন; ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্মে আবির্ভূত—এবং সকল বিশ্বকর্মকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত এবং মানুষের পক্ষে ইহার শেষ পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান ও ভাগবত বা ব্রাহ্মী চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। 'এই প্রকার জানিয়া তুমি মুক্তিলাভ করিবে।'

কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিভিন্ন স্তর আছে—দ্রব্যযজ্ঞ সর্বনিম্ন স্তরের, জ্ঞানযজ্ঞ সর্বোচ্চ স্তরের। জ্ঞানেই এই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি—নিম্নস্তরের জ্ঞানে নহে, উচ্চতম জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে। এই জ্ঞান আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিতে পারি যাঁহারা সৃষ্টির মূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর আমরা মনের অজ্ঞানের মোহে পতিত হইব না এবং শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং কামনা ও আবেগের বন্ধনে বদ্ধ হইব না। যে-জ্ঞানে সমস্ত পরিসমাপ্ত হয় সেই জ্ঞানের দ্বারা 'তুমি সমস্ত ভূতকেই আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।' কারণ আত্মা হইতেছে সেই এক, অক্ষর, সর্বব্যাপী, সর্বাধার, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে লুক্কায়িত ব্রহ্ম, আমাদের চেতনা যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; আমরা সকলকেই সেই এক সত্তার মধ্যে বিভিন্ন ভূতরূপে দেখিতে পাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বম্ কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪। ৩৩
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫

কিন্তু এই যে আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাও আমাদের মানসিক চেতনার সম্মুখে

এক শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই আত্ম-অভিব্যক্তি; তিনিই আমাদের অস্তিত্বের মূল এবং যাহা কিছু ক্ষর বা অক্ষর আছে সে সব তাঁহারই অভিব্যক্তি। তিনিই ঈশ্বর, ভগবান, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পণ করি; তাঁহার হস্তেই আমাদের কর্ম সমর্পণ করি; তাঁহারই সত্তায় আমরা জীবনধারণ করি, চলাফেরা করি। আমাদের প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া এবং তাঁহাতে অবস্থিত সর্বভূতের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা তাঁহার সহিত এবং সর্বভূতের সহিত আত্মসত্তায় ও শক্তিতে এক হই; তাঁহার পরমতম সত্তার সহিত আমরা আমাদের আত্মসত্তাকে এক করি, যুক্ত করি। বাসনা বর্জন করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম করিয়া, আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং আত্মা নিজেকে ফিরিয়া পায় ; আত্ম-জ্ঞানের সহিত, ভগবদ্ জ্ঞানের সহিত কর্ম করিয়া আমরা ভগবত সত্তার ঐক্য, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যজ্ঞের অধীশ্বর

আর অগ্রসর হইবার পূর্বে এতদূর পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার মূল তত্ত্বগুলি পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। গীতার সমগ্র কর্মবাদ যজ্ঞ-তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিক, ভগবান জগৎ এবং কর্মের মধ্যে শাশ্বত সম্বন্ধের যে-সত্য, গীতার কর্মবাদের মধ্যে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। মানুষের মন সাধারণতঃ জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমুখী সনাতন সত্যের আংশিক ভাবসকল গ্রহণ করিয়া জীবন, ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে—কখনও একটি লক্ষণ বা উপলব্ধির উপরে, কখনও আর একটির উপরেই বিশেষ ঝোঁক দেয়; কিন্তু যখনই কোন উদার জাগৃতির যুগে ঈশ্বর, জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই সত্যের কতকটা সমগ্র অখণ্ড স্বরূপের দিকে মানুষের ঝোঁক হয়। সংসারে যাহা কিছু আছে সবই সেই এক ব্রহ্ম, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই চক্র—ভগবান হইতে বাহির হইয়া ভগবানেই ফিরিয়া যাওয়া-রূপ ভগবৎ-লীলা—এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতা শিক্ষার ভিত্তি। সমস্তই প্রকৃতির প্রকটন লীলা এবং প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি—প্রকৃতি তাহার কর্মের প্রভু এবং তাহার রূপ-সকলের অধিবাসী ভাগবত পুরুষের ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহারই তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতি নামরূপের লীলায় এবং প্রাণ ও মনের কর্মে অবতীর্ণ হইতেছে, আবার মন ও আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে যে-পুরুষ বাস করিতেছে তাহাকে সজ্ঞানে লাভ করিতে ফিরিয়া যাইতেছে। প্রথমে আত্মা বন্ধ হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃতির লীলার বিকাশ হইতেছে, পরে আত্মা আবার স্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই যে প্রকৃতির চক্র ইহা কখনও সম্ভব হইত না যদি পুরুষ তাঁহার শাশ্বত তিনটি অবস্থায় একই সময়ে থাকিতে না পারিতেন; সমগ্র ক্রিয়াটির জন্য তিনটিই অপরিহার্য। ক্ষর রূপে তাঁহাকে সসীম, বহু, 'সর্ব্বভূতানি' রূপে দেখিতে পাই। সংসারে যে অসংখ্য-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট অসংখ্য জীব রহিয়াছে, তাহাদের সসীম ব্যক্তিত্বরূপে এবং তাহাদের পশ্চাতে জাগতিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদেরও ক্রিয়ার আত্মা ও শক্তিরূপে তিনি প্রকট হন। আবার সকল বস্তু ও রূপের অন্তরে ও পশ্চাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে এক অক্ষর, এক অনন্ত, কালাতীত, নির্ব্যক্তিক সত্তা, জগতের এক অপরিবর্তন-শীল অখণ্ড আত্মা—সেখানে সকল বহু নিজেদিগকে বস্তুতঃ এক বলিয়াই

দেখিতে পায়। অতএব সেইখানে ফিরিয়া জীবের সসীম সক্রিয় সত্তা দেখিতে পায় যে, সে নিজেকে এক বিশ্বব্যাপী নীরবতার মধ্যে, এই অখণ্ড অনন্ত হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা কিছু ইহা দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে সেইসবের সহিত এক অক্ষর ও অনাসক্ত ঐক্যের শান্তি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে, নিজেকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। এমন কি ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্তার লয়ও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্ হইতেছে পুরুষোত্তম। ইনিই শ্রেষ্ঠ দেব ভগবান—তাঁহার ভিতর শান্ত ও অনন্ত দুই-ই রহিয়াছে, তাঁহাতে ব্যক্তিক এবং নির্ব্যক্তিক, এক আত্মা এবং সর্বভূত, জাগতিক ক্রিয়া এবং বিশ্বাতীত শান্তি, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সবই মিলিয়াছে, একত্র হইয়াছে, এক সংগে এবং পরস্পরের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। ভগবানেব মধ্যেই সকল বস্তুর নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই সকলের পূর্ণতম সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কর্মের সত্য সত্তার সত্যের উপরেই নির্ভর করে। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বস্তুত প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উদ্দেশে কর্মযজ্ঞ। জীবনের যজ্ঞবেদিমূলে প্রকৃতি তাহার সকল কর্ম ও কর্মের ফল লইযা আসিতেছে, তাহার মধ্যে চৈতন্য ভগবানের যে-ভাবটিতে উপনীত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে সে সব ধরিয়া দিতেছে, জাগ্রত আত্মা নিজের উপস্থিত কল্যাণ বা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া যে-ফল কামনা করে তাহারই জন্য ঐসব যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়। প্রকৃতিতে আত্মা চৈতন্যের যে-স্তরে উঠিয়াছে তদনুযায়ী দেবতারই সে পূজা করিবে, তদনুযায়ী আনন্দের সন্ধান করিবে এবং তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। আর প্রকৃতিতে ক্ষর পুরুষের যে-লীলা তাহা সমস্তই আদান-প্রদান; কারণ জগৎ এক এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই আদান-প্রদানের নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ নাই প্রকৃতি সেখানে জোর করিয়া তাহা আদায় করে এবং এইরূপে তাহার জাগতিক নীতি রক্ষা করে। পরস্পর দেওয়া এবং লওয়া ইহাই জীবনের নীতি, ইহা ভিন্ন জীবন এক মুহূর্তও টিঁকিতে পারে না; এই সত্যই জগতে ভগবৎ-ইচ্ছার নিদর্শন—যজ্ঞকে চিরসাথী করিয়া ভগবান যে প্রজা-সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাই সে-বিষয়ে প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী এই যে যজ্ঞের নীতি—ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, জগৎ ভগবানেরই এবং সংসার তাঁহারই রাজ্য, তাঁহারই পূজার মন্দির, স্বতন্ত্র অহংয়ের ক্ষেত্র নহে। জীবনের উদ্দেশ্য অহংয়ের তৃপ্তিসাধন নহে, ইহা কেবল স্থূল অজ্ঞান আরম্ভ মাত্র; যজ্ঞকে সর্বদা প্রসারিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান, অনন্তের পূজা ও উপাসনা, পূর্ণতম আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণতম আত্মদান—এই চরম লক্ষ্যের দিকেই জীবনের সকল অভিজ্ঞতা মানুষকে লইয়া যাইতে চায়।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীব অজ্ঞান লইয়াই আরম্ভ করে এবং বহুদিন অজ্ঞানেই থাকে। অহংকারে একান্ত নিবিষ্ট মানুষ মনে করে যে, সংসার অহংয়েরই জন্য, ভগবানের জন্য নহে। সে নিজেকেই সকল কর্মের কর্তা বলিয়া দেখে, সে বুঝে না যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার নিজেরও ভিতর ও বাহিরের সকল কর্মই এক বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে নিজেকে সকল কর্মের ভোক্তা বলিয়া দেখে এবং ভাবে যে, তাহার জন্যই সব, প্রকৃতির কাজ তাহাকেই তৃপ্ত করা, তাহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পালন করা। সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্ত করিতে, তাহার ইচ্ছা পালন করিতে মোটেই ব্যস্ত নহে, পরন্তু এক উচ্চতর বিশ্বগত ইচ্ছার অনুসরণ করে, যে-ভগবান প্রকৃতির এবং প্রকৃতির কার্যের ও সৃষ্টির অতীত সেই ভগবানকেই তৃপ্ত করিতে চায়; ব্যক্তির সসীম সত্তা, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার তৃপ্তি—এ সকল তাহার নিজের নহে, এ সকলই প্রকৃতির; প্রকৃতি এই সকলকে প্রতি মুহূর্তে ভগবানের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পণ করে এবং অলক্ষ্যে এই সবকে ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। জীব এই সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং অহংভাবই এই অজ্ঞানতার চিহ্ন; এই অজ্ঞানের বশে জীব যজ্ঞের নীতি অগ্রাহ্য করে, যতটা পারে নিজেই গ্রহণ করিতে চায়, এবং শুধু ততটুকুই দেয় যতটুকু প্রকৃতি ভিতরে এবং বাহিরে জোর করিয়া আদায় করিয়া লয়। বাস্তবিক প্রকৃতি জীবের প্রাপ্য অংশ, দেবতাদত্ত ভোগ বলিয়া জীবকে যতটুকু লইতে দেয় তাহার অধিক জীব কিছুই লইতে পারে না। এই যজ্ঞের জগতে যে স্বার্থপর ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দেবশক্তি সমূহের শুধু দান গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদানে কিছু ফিরাইয়া দিতে চাহে না সে চোর ডাকাতেরই অনুরূপ। সে জীবনের প্রকৃত মর্মের সন্ধান পায় নাই, কারণ সে যজ্ঞার্থে জীবন-যাপন ও কর্মের দ্বারা আত্মার প্রসার ও উন্নতি সাধন করে না, তাহার জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যেমন নিজের শক্তির এবং নিজের অভাব অভিযোগের হিসাব করে তেমনই যখন অপরের সম্বন্ধেও করিতে আরম্ভ করে, মানুষ যখন তাহার স্বকর্মের পশ্চাতে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে এবং বিশ্ব-দেবসমূহের ভিতর দিয়া সেই এক এবং অনন্তের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে—শুধু তখনই সে অহংভাবের বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভের এবং আত্মার সন্ধানলাভের পথের পথিক হয়। সে তখন তাহার বাসনা ও কামনারও উপরে যে নীতি আছে তাহার সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে এবং উপলব্ধি করে যে, তাহার সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ক্রমশ ঐ নীতির বশ ও অধীন করিতে হইবে। সে সংকীর্ণ স্বার্থপর জীবন ছাড়াইয়া বুদ্ধিমূলক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ করে। সে নিজের ব্যক্তিগত দাবী অপেক্ষা অপরের দাবীর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়; সে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বিরোধ স্বীকার করে এবং তাহার পরার্থপর

বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া তাহার নিজের চৈতন্যের ও সত্তার প্রসারণের পথ পরিষ্কার করে। সে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে পারে যে, ইহারা তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র—ইহাদিগকে মান্য করিতে হইবে, ইহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়মের দ্বারা মানসিক জগৎ এবং জড়জগৎ উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সে শিখে যে, তাহার চিন্তায় এবং বুদ্ধিতে এবং জীবনে সেই শক্তিসমূহের আবির্ভাব ও মহত্ত্ব যত অধিক হইবে কেবল ততখানিই সে নিজে শক্তি, জ্ঞান, যথাযথ কর্ম ও ভোগ সকলে বর্ধিত হইবে। এইরূপে সে জীবনকে শুধু জড়বুদ্ধিতে ও অহংবুদ্ধিতে না দেখিয়া ধর্মভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে দেখে এবং এইরূপে সসীমের ভিতর দিযা অসীমের মধ্যে উঠিতে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তোলে।

কিন্তু ইহা একটি দীর্ঘ মধ্যবর্তী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানেও বাসনাই তাহার কর্মের নীতি, তাহার অহংয়ের প্রয়োজনই কেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রকৃতিই তাহার জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে ; যদিও এখানে বাসনা সংযত নিয়ন্ত্রিত, অহং শুদ্ধ, এখানে প্রকৃতি উচ্চ সত্ত্বভাবাপন্ন। এই সমস্তই এখনও ক্ষর, সসীম, ব্যক্তিক গণ্ডীর মধ্যে—তবে এই গণ্ডী খুবই প্রসারিত। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও ঊর্ধ্বে; কারণ জ্ঞানের সহিত যে-যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই অবস্থা কেবল তখনই আইসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা তাহা একই, এই আত্মা অহং অপেক্ষা বড় জিনিস, ইহা অনন্ত, নির্ব্যক্তিক, বিশ্বব্যাপী সত্তা, ইহার ভিতরেই সর্বভূত বিরাজ করিতেছে; যে সকল বিশ্ব-দেবতাদের উদ্দেশে সে যজ্ঞ করে সে সকল সেই এক অনন্ত ভগবানের বিভিন্নরূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই এক ভগবান সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া উপলব্ধি করে যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ অনির্বচনীয় পরমেশ্বর—তিনি একই সঙ্গে সসীম এবং অসীম, এক এবং বহু, প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রকৃতির মধ্যেই ব্যক্ত, গুণাতীত হইয়াও তিনি অনন্ত গুণের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা বিকাশ করেন। ইনিই পুরুষোত্তম, ইঁহাকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোন অনিত্য ব্যক্তিগত কর্মফলের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, ভগবানের সহিত যোগে ও সামঞ্জস্যে জীবনযাপন করিবার জন্য।

অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রমবর্ধমান নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি ও সিদ্ধির পথ। ইহাই মানুষের প্রাচীন ও নিরন্তর অভিজ্ঞতা যে, নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত সত্তার দিকে,—যাহা সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যেই এক এবং সাধারণ, শুদ্ধ ও সমুচ্চ সত্তা, যাহা প্রকৃতির মধ্যে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত,

জীবনের মধ্যে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার নিজেরই অন্তর্লোকে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার দিকে সে নিজেকে যতই উন্মুক্ত করিয়া ধরে, যতই তাহার অহংয়ের বন্ধন, সীমার বন্ধন কমিয়া যায়, ততই সে বিশালতা, শান্তি ও বিশুদ্ধ সুখের অনুভূতি লাভ করে। শুধু সীমার মধ্যে, 'অহং'-এর মধ্যে যে-আনন্দ যে-তৃপ্তি তাহা ক্ষণিক, ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত। যাহারা সম্পূর্ণভাবে অহংভাবের মধ্যে বাস করে এবং 'অহং'-এর সসীম ধারণা, শক্তি, তৃপ্তি লইয়াই থাকে তাহাদের পক্ষে এই জগৎ সর্বদা অনিত্যম্ অসুখম্—অস্থায়ী এবং দুঃখময়। সসীম জীবনের চিরদুঃখ এই যে, সকল সময়েই একটা নিরর্থকতার ভাব থাকিয়া যায় কারণ সসীম জীবনের সমগ্র বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে। জীবন যতক্ষণ না অসীমের দিকে উন্মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহা সম্পূর্ণভাবে সত্য বা বাস্তব নহে। এই জন্যই গীতা কর্মবাদ ব্যাখা করিবার প্রারম্ভেই ব্রহ্মচৈতন্যের উপর, নির্ব্যক্তিক জীবনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছে এবং এইটিই ছিল প্রাচীনদের সাধনার মহান্ লক্ষ্য। কারণ যে নির্ব্যক্তিক অনন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তায় জগতের সকল স্থায়ী, সচল, বহুমুখী কর্মধারা নিজের ঊর্ধ্বে স্থায়িত্ব, আশ্রয় ও শান্তির ভিত্তি পায়, সেইটিই হইতেছে অচল আত্মা, অক্ষর, ব্রহ্ম। যদি আমরা ইহা বুঝি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের চৈতন্যকে, আমাদের সত্তায় প্রতিষ্ঠাকে, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিকতা হইতে এই অনন্ত নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মের মধ্যে তুলিতে হইবে—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এই এক আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা, এই জ্ঞানই মানুষকে অহংভাবের অজ্ঞান হইতে এবং ইহার কর্ম ও ফল হইতে তুলিয়া লয়; ইহাতে বাস করাই পরম শান্তি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ।

কিরূপে এই মহান্ রূপান্তর সাধিত হয় তাহার দুইটা পথ আছে, জ্ঞানেব পথ এবং কর্মের পথ; গীতা এই দুইয়ের সংহত সমন্বয় করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় বুদ্ধির (intelligent will) যে নিম্নমুখী আসক্তি তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইয়া ঊর্ধ্বমুখী করিতে হইবে—পুরুষের দিকে, ব্রহ্মের দিকে ফিরাইতে হইবে; ইহাই জ্ঞানের পথ। মনের বহুমুখী ধারণাসমূহ এবং বাসনার বহুমুখী প্রেরণাসকল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে এক আত্মার এক ভাবে নিবিষ্ট করাইতে হইবে। শুধু এইটুকু দেখিলে মনে হয় বুঝি সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ, নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তা এবং পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এই পথের লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ ত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি সত্তার যুগল তত্ত্ব—তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যতক্ষণ আমরা প্রকৃতির মধ্যে আছি, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কর্ম চলিতেই থাকিবে—তবে অজ্ঞানীরা যে ভাবে কর্ম করে, জ্ঞানীদের কর্মের রূপ বা অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পাবে। সন্ন্যাস

করিতেই হইবে—তবে কর্ম হইতে পলায়ন করা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে, অহং ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। ইহা কি উপায়ে হইতে পারে? কর্ম করিবার সময়েও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রকৃতিকেই সর্ব-কর্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া জানিতে হইবে, প্রকৃতিকেই তাহার কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, দ্রষ্টা এবং ভর্তারূপে আত্মাতে বাস করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে হইবে, ধরিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হওয়া চলিবে না। তখন সীমাবদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকতা এবং অহং শান্ত হয়, নির্ব্যক্তিক আত্মার চৈতন্যে মগ্ন হয়—এখন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সর্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকৃতির কর্ম চলিতে থাকে—আমরা এই সকলকে দেখি যে ইহারা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হইয়া সেই এক অনন্ত সত্তার মধ্যেই বাস করিতেছে, চলাফেরা করিতেছে, আমাদের সসীম জীবনকেও ইহাদেরই মধ্যে একটি বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে, আমাদেরও সমস্ত কর্ম প্রকৃতিরই—আমাদের প্রকৃত আত্মার নহে; সে-আত্মা হইতেছে নিশ্চল নির্ব্যক্তিক একম্। অহং এই সকলকে নিজের বলিয়া দাবী করিত, আমরা তাই সেগুলিকে আমাদেরই মনে করিতাম; কিন্তু অহং যখন মরিল, তখন আর সেগুলি আমাদেব নহে, প্রকৃতির। অহংকে বধ করিয়া আমরা আমাদের সত্তায় ও চৈতন্যে নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছি; বাসনাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রকৃতির কর্মেও আমরা নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছি। এখন শুধু কর্মশূন্যতার মধ্যেই নহে, কর্মের মধ্যেও আমরা মুক্ত; শারীরিক ও প্রাকৃতিক নিশ্চলতা ও শূন্যতার উপর আমাদের মুক্তি নির্ভর করে না, আর যেই আমরা কর্ম করি অমনিই মুক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি না। এমন কি প্রাকৃতিক কর্মের পূর্ণস্রোতের মধ্যেও নির্ব্যক্তিক আত্মা আমাদের মধ্যে ধীর, স্থির, মুক্ত থাকে।

এই পূর্ণ নির্ব্যক্তিকতা দ্বারা যে-মুক্তিলাভ করা যায় তাহা প্রকৃত, তাহা সম্পূর্ণ, তাহা অপরিহার্য, কিন্তু ইহাই কি সব, ইহাই কি এই বিষয়ে শেষ কথা? আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সমস্ত জীবন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি কর্তৃক পুরুষের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পিত; এই পুরুষই প্রকৃতির মধ্যে অদ্বিতীয় এবং নিগূঢ় আত্মা, ইহারই মধ্যে প্রকৃতির সমগ্র কর্ম চলিতেছে; কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম আমাদের নিকট আচ্ছন্ন রহিয়াছে অহং-এর দ্বারা, কামনার দ্বারা, আমাদের সীমাবদ্ধ, সক্রিয়, বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বারা। আমরা অহংভাব ও কামনা ও সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্য হইতে উঠিয়াছি, এবং ইহার মহান্ প্রতিষেধক নির্ব্যক্তিকতার দ্বারা নির্ব্যক্তিক ভাগবত-সত্তার সন্ধান পাইয়াছি; যে এক আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সর্বভূত রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের একত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। কর্মের যজ্ঞ চলিতেছে, কিন্তু আমরা চালাইতেছি না—আমাদের সত্তার সসীম অংশ মন ইন্দ্রিয় ও শরীরের ভিতর দিয়া প্রকৃতিই এই ক্রিয়া

চালাইতেছে, কিন্তু এই সমস্ত চলিতেছে আমাদেরই অনন্ত সত্তার মধ্যে। তবে কাহাকে কোন উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ অর্পণ করা হইতেছে? নির্ব্যক্তিক সত্তার ত কোন কর্ম নাই, কোন বাসনা নাই, লাভ করিবার কোন বস্তু নাই, কোন কিছুরই জন্য ইহা সংসারের কোন জীবের উপর নির্ভর করে না; নিজের জন্যই ইহা আছে নিজেরই আত্মানন্দে, নিজেরই অক্ষর অনন্ত সত্তায় এই নির্ব্যক্তিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পেঁাছিবার উপায়স্বরূপ আমাদিগকে বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইতে পারে কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্মের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায়; যজ্ঞের আর প্রয়োজন থাকে না। তখনও কর্ম চলিতে পারে কারণ প্রকৃতি থাকে, তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু তখন আর সেই সকল কর্মের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তখন কর্ম না করিলে নয়, সেই জন্যই কর্ম করিতে হয়, মুক্তির পর আমাদের সসীম শরীর ও মনকে বাধ্য করিয়া প্রকৃতি কর্ম করায়। কিন্তু ইহাই যদি সব হয় তাহা হইলে কর্মকে যতদূর সম্ভব কমাইলেই হইল, প্রকৃতি আমাদের শরীরের দ্বারা যতটুকু নিশ্চয় করাইয়া লইবে কেবলমাত্র ততটুকু কর্ম করা হইলেই হইল; দ্বিতীয়ত যদি কর্মকে যতদূর সম্ভব কমান নাই হয়,—কারণ কর্ম করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কর্ম না করাও উদ্দেশ্য নহে—তাহা হইলে কর্ম কি প্রকারের হইবে তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। একবার জ্ঞানলাভ করিবার পর অর্জুন তাঁহার পুরাতন ক্ষত্রিয়স্বভাবের অনুসরণ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পন্ন করিতে পারেন অথবা তাঁহার শান্তির দিকে নূতন ঝোঁকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি তিনি করিবেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; বরং দ্বিতীয়টিই উত্তম, কারণ অতীত সংস্কারের জন্য প্রকৃতির যে সকল প্রবৃত্তি এখনও তাহাকে ধরিয়া আছে সেগুলিকে দমন করিবার ইহাই প্রকৃত উপায়; যখন তাঁহার শরীর পতিত হইবে তখন তিনি নিশ্চিতভাবে সেই অনন্ত ও নির্ব্যক্তিক সত্তায় প্রয়াণ করিতে পারিবেন; অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্—এই অনিত্য দুঃখময় সংসারের দুঃখ ও উন্মত্ততার মধ্যে আর তাঁহাকে ফিরিতে হইবে না।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে গীতার সমস্ত শিক্ষাই অর্থশূন্য হয়; কারণ ইহার যাহা প্রথম ও মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে যে কর্ম কি প্রকারের হইল তাহা প্রয়োজনীয়, এবং কর্ম চালাইবারও স্পষ্ট নির্দেশ গীতাতে আছে; শুধু প্রকৃতির লক্ষ্যহীন তাড়নাতেই যে যন্ত্রবৎ কর্ম করিতে হইবে তাহা নহে। অহং জয় হইবার পরও যজ্ঞের একজন ভোক্তা ঈশ্বর থাকেন—ভোক্তারম্ যজ্ঞ-তপসাম্, এবং তখনও যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে। নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মই একেবারে শেষ কথা নহে, আমাদের সত্তার একেবারে শ্রেষ্ঠ রহস্যও নহে, কারণ নির্ব্যক্তিক, সসীম ও অসীম, একই ভগবানের দুইটি বিপরীত দিক মাত্র,—দুইটি একই সময়ে ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে

এবং ভগবান এই সকল পার্থক্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি একাধারে এই দুইই। ভগবান চির অব্যক্ত অনন্ত—সর্বদা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সান্তের ভিতর নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন; তিনি সেই মহান নির্ব্যক্তিক ব্যক্তি—সকল ব্যক্তি, সকল রূপ যাঁহার আংশিক প্রকাশমাত্র; তিনি সেই ভগবান যিনি মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি মানুষের হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। এক নির্ব্যক্তিক (impersonal) আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখাই জ্ঞানের শিক্ষা, কারণ এই ভাবেই আমরা ভেদাত্মক অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং তাহার পর সেই মুক্তিসাধক নির্ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়া সে-সকলকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে পারি—আত্মনি অথো ময়ি, 'আত্মার মধ্যে, পরে আমার মধ্যে।' ভগবান সকলের মধ্যে রহিয়াছেন এবং সকলেই ভগবানের মধ্যে রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের অহং, আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব আড়াল করিয়া দাঁড়ায় বলিয়া আমরা ভগবানকে চিনিতে পারি না; কারণ আমরা ব্যক্তিক ভাবের বশীভূত বলিয়া বস্তুসমূহের সসীম দৃশ্যের ভিতর দিয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকুই ভগবানের আংশিক ভাবসকল দেখিয়া থাকি। ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদের নিম্নতর ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়া তাহা সম্ভব নহে; আমাদের সত্তার উচ্চ, অসীম নির্ব্যক্তিক অংশের ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য সকলের ভিতর এই যে এক আত্মা (যাহার মধ্যে বিশ্ব-সংসার রহিয়াছে) সেই আত্মার সহিত আমাদিগকে এক হইতে হইবে। এই যে অসীম সত্তা, যাহার ভিতরেই সব সসীম দৃশ্যও রহিয়াছে, এই যে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক সত্তা যাহার ভিতর সকল ব্যক্তি, সকল নামরূপও রহিয়াছে, এই যে অচল সত্তা প্রকৃতির সকল সচল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে-সব হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই, এই নির্মল দর্পণেই ভগবানের সত্তা প্রতিভাত হইবে। অতএব আমাদিগকে প্রথমে নির্ব্যক্তিক সত্তাকেই লাভ করিতে হইবে; কেবল বিশ্বদেবগণের ভিতর দিয়া, কেবল সসীম দিক দিয়া ভগবানের পূর্ণজ্ঞান সমগ্রভাবে লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যপক্ষে নির্ব্যক্তিক আত্মার দ্বারা যাহা কিছু বিধৃত ও ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে-সব হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া পরিকল্পিত এই নির্ব্যক্তিক আত্মার যে নীরব নিশ্চলতা সেইটিও ভগবানের সর্ব-প্রকাশক, সর্বসংশয়-নিরসনকারী সমগ্র সত্য নহে। সেই সত্য দর্শন করিতে হইলে ইহার নীরবতার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিতে হইবে, তিনি তাঁহার দিব্য মহিমায় ক্ষর ও অক্ষর দুইকেই ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি অচলতায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতি, সকল ক্রিয়ার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহারই উদ্দেশে মুক্তির পরেও প্রকৃতির কর্ম যজ্ঞরূপে অর্পিত হইতে থাকে।

ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত জীবন্ত মিলন এবং তাহার দ্বারা আত্মার পূর্ণ বিকাশ—ইহাই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে আত্ম-

নির্বাণ নহে। আমাদের সমস্ত জীবনকে ভগবানের মধ্যে তুলিতে হইবে, তাঁহাতে বাস করিতে হইবে (ময্যেব নিবসিস্যসি); তাঁহার সহিত এক হইতে হইবে, তাঁহার চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য মিলাইতে হইবে, আমাদের আংশিক প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ করিতে হইবে, চিন্তা ও অনুভূতিতে, মনে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, সংকল্পে ও কর্মে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে, নির্দোষভাবে ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমানন্দে বাসনা কামনা ভুলিতে হইবে—ইহাই মানব জীবনের পূর্ণসিদ্ধি। গীতা ইহাকেই উত্তম রহস্য বলিয়াছে। ইহাই মানবের প্রকৃত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা—ইহাই আমাদের ক্রমবিকাশমান কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ সোপান। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনিই থাকেন কর্মের অধীশ্বর এবং যজ্ঞের আত্মস্বরূপ।

চতুর্দশ অধ্যায়

দিব্য কর্মের নীতি

অতএব গীতাবর্ণিত যজ্ঞের ইহাই প্রকৃত মর্ম। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝা দরকার; গীতায় এ পর্যন্ত এ তত্ত্ব বুঝান হয় নাই—গীতার বাকী অধ্যায়সকলের শেষের দিকেই এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে এবং সেই জন্যই গীতার ক্রমশ-প্রকাশমান পদ্ধতির বিরুদ্ধাচার করিয়াও আমাদিগকে এখনই সেই মূল শিক্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। উপস্থিত গুরু কেবল পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সংকেত মাত্র করিয়াছেন এবং নিশ্চল আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-নির্দেশ মাত্র করিয়াছেন; আমাদের প্রথম কাজ, আমাদের জরুরী আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া এই নিশ্চল আত্মায় সম্পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা লাভ করা। এখন পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেন নাই; "আমি", কৃষ্ণ, নারায়ণ, অবতার, কুরুক্ষেত্রে দিব্য সারথিরূপে অবতীর্ণ বিশ্বের অধীশ্বর—এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সূত্র দিয়াছেন, আত্মনি অথো ময়ি, "আত্মার মধ্যে, তাহার পর আমার মধ্যে", ইহার অর্থ এই যে ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাতেই একটি "সম্ভূতি" (becoming) বলিয়া দেখিয়া ব্যক্তিক ভাব অতিক্রম করা হইতেছে সেই মহান্ নিগূঢ় নির্ব্যক্তিক ব্যক্তিতে (পুরুষোত্তমে) উপনীত হইবার পন্থা মাত্র, তিনি নির্ব্যক্তিক সত্তায় নীরব, শান্ত, প্রকৃতির উর্ধ্বে অবস্থিত আবার প্রকৃতিতে এই লক্ষ-লক্ষ ভূতের মধ্যে বর্তমান এবং কর্মশীল। আমাদের নিম্নতন ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে লয় করিয়া শেষকালে আমরা সেই পরম পুরুষের সহিত যুক্ত হইব যিনি স্বতন্ত্র ও ব্যষ্টিগত নহেন, অথচ সকল ব্যষ্টিগত রূপ ধারণ করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিগুণের অতীত নিশ্চল পুরুষে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা অবশেষে অনন্ত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারি, তিনি প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য করিলেও গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হন না। নীরব নিশ্চল পুরুষের ভিতরের নৈষ্কর্ম্য (inner actionlessness) প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রকৃতিকে তাহার কর্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা সেই পরম উচ্চ দিব্য প্রভুত্বের পদ লাভ করিতে পারি যখন সকল কর্ম করিয়াও কোন কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব,

অবতীর্ণ নারায়ণরূপে, কৃষ্ণরূপে, এখানে দৃষ্ট পুরুষোত্তমের তত্ত্বই হইতেছে মূল সূত্র। ইহা ব্যতীত অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে মুক্তপুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং সংসারের কর্মের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু পুরুষোত্তমকে ধরিতে পারিলে ঐরূপ নিবৃত্তিই একটি ধাপ স্বরূপ হয়, তাহার দ্বারা সংসারের কর্ম আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়, দিব্য প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্য মুক্তিতে সম্পাদিত হয়। নিশ্চল নীরব ব্রহ্মকেই যদি লক্ষ্য বলিয়া দেখ, তাহা হইলে সংসার এবং সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে যদি লক্ষ্য বলিয়া দেখ, যদি তাঁহাকে কর্মের উপরে অথচ ইহার আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক কারণ এবং উদ্দেশ্য এবং মূল সংকল্প বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে সংসার এবং সংসারের সকল কর্ম বিজিত হইবে, ভগবানের ন্যায়ই সংসারের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সে-সব পরিচালন করা যাইবে। সংসার কারাগার না হইয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ হইতে পারে; দুর্দান্ত "আমি"র সীমাবদ্ধতাকে ধ্বংস করিয়া, আমাদের বন্ধনের কারণ কামনাসকলকে জয় করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত ভোগ ঐশ্বর্যের কারাগার ভগ্ন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ জয় করিব। মুক্ত বিশ্বভাবাপন্ন জীব তখন স্বরাট, সম্রাট হইবে।

এইরূপে মুক্তি এবং পূর্ণতম অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ যজ্ঞার্থে কর্মের সার্থকতা দেখান হইল। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে অহংভাব এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কামনা-শূন্য হইয়া জয়-পরাজয় লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিয়া যজ্ঞরূপে কর্ম করিয়া জনক প্রভৃতি মহৎ কর্মযোগীগণ পুরাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

এইরূপে এবং এইরূপ কামনাশূন্যভাবেই, মুক্তি এবং সিদ্ধিলাভের পরও কর্ম করা যায় এবং করিতে হইবে—তখন সে-কর্ম করা হইবে ভাগবতভাবে, আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিকতার শান্ত উচ্চ প্রকৃতিতে।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ৩।২০—২২

"লোকসংগ্রহার্থেও কর্মের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, নিম্নতর শ্রেণীর লোকও তাহাই করিয়া থাকে; শ্রেষ্ঠগণ কর্মের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, জনগণ তাহারই অনুসরণ করে। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্তব্য নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আমি

পাই নাই এবং যাহা আমাকে অতঃপর লাভ করিতে হইবে; তথাপি আমি কর্ম করিয়াই থাকি।" বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি—এখানে "এব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, ভগবান কর্ম করিয়াই থাকেন এবং সন্ন্যাসীরা যে মনে করেন তাঁহারা কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, তিনি সেরূপ করেন না। কারণ,

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩।২৩—২৬

"যদি আমি আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পন্থা অনুসরণ করিবে; আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইবে এবং আমি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রষ্টা হইব, এইরূপে আমি প্রজাগণকে নষ্ট করিব। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্তির সহিত যেমন কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোকসংগ্রহার্থে, অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কর্ম করা কর্তব্য। যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্ত, জ্ঞানী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি জ্ঞানের সহিত এবং যোগস্থ হইয়া স্বয়ং সকল কর্ম করিয়া অজ্ঞদিগকে সেই সব কর্ম করাইবেন।" এই সাতটি শ্লোক অপেক্ষা মূল্যবান শ্লোক গীতাতে আর খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের স্পষ্ট বুঝা দরকার যে, এই শ্লোকগুলিকে আধুনিক কর্মপ্রবণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলিবে না; এই নীতি কোন উচ্চ ও দূর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অপেক্ষা বর্তমান জাগতিক কার্যাবলী লইয়াই অত্যধিক ব্যস্ত। সমাজসেবা, দেশসেবা, মানবজাতির কল্যাণসাধন এবং যে শত-শত সমাজিক পরিকল্পনা ও স্বপ্ন আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করিতেছে, এই শ্লোকগুলিকে কেবলমাত্র সেই সকলের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না। এখানে উদার পরোপকারের কোন যুক্তিযুক্ত নিয়মনৈতিক কথিত হয় নাই; ভগবানের সহিত যে-জাগতিক জীবসমূহ ভগবানের মধ্যে বাস করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে ভগবান বাস করিতেছেন তাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক ঐক্যের নীতিই এখানে কথিত হইয়াছে। ব্যক্তিকে সমাজের এবং মানব জাতির অধীন করিবার, সমষ্টিগত মানবের বেদিতে অহংভাবকে বলি দিবার উপদেশ এখানে দেওয়া হয় নাই; ভগবানের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবার, সর্বব্যাপী ভাগবত সত্তার সত্যবেদীতে অহংকে বলি দিবার উপদেশ

দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ভাব ও অভিজ্ঞতা লইয়া আধুনিক মানব ব্যস্ত, গীতার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা উচ্চস্তরের; মানুষ এখন অহংভাবের শৃংখল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, তথাপি তাহার দৃষ্টি ঐহিকতার দিকে, তাহার মতিগতি আধ্যাত্মিক নহে, পরন্তু যৌক্তিক ও নৈতিক। দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজ-সেবা, সমষ্টিবাদ, মানব-ধর্ম,—এই সকল আদর্শ যে আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, জাতিগত আদিম স্বার্থপরতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত নিজের জীবনের ঐক্য উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঐক্য উপলব্ধি হইতেছে বুদ্ধি ও চিত্তাবেগের স্তরে, নৈতিক স্তরে—এখানে এই উপলব্ধি সর্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আমাদের বিকাশমান আত্মচৈতন্যের আরও এক উচ্চতর তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছে, দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল সেই উচ্চতর অবস্থায় উঠিবার আংশিক ধাপ মাত্র।

ভারতবর্ষে সমাজনীতি ব্যক্তিকে সমাজের অধীন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সকল সময়েই ভারতের ধর্মচিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে বড় করা। গীতার ন্যায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র যে ব্যক্তির বিকাশকে প্রথম স্থান দিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী; ব্যক্তির যাহা উচ্চতম প্রয়োজন, তাহা উদারতম অধ্যাত্মমুক্তি, মহত্ত্ব, দীপ্তি, রাজশ্রী আবিষ্কার ও ভোগ করিবার অধিকার। ঋষিত্ব ও রাজশ্রীর যাহা আধ্যাত্মিক অর্থ সেই অর্থে ঋষি ও রাজা হইয়া উঠাকেই জীবনের লক্ষ্য করা,—আদর্শ মানবত্বের এই প্রথম মহান্ সনন্দ প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ব্যক্তিকে তাহার নিজের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ, তবে সঙ্ঘবদ্ধ মানবসমাজের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সকল লক্ষ্য হারাইয়া নহে, পরন্তু নিজেকে বড় করিয়া, উচ্চ করিয়া, বিস্তৃত করিয়া ভাগবত চৈতন্যলাভই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। গীতা এখানে যে অতিমানব, শ্রেষ্ঠমানব, দিব্যভাবাপন্ন মানবের কথা বলিয়াছে, তাহা নীট্শে কথিত অতিমানবের ধারণা হইতে বিভিন্ন। কোন এক বিশেষ গুণের, শক্তির আত্যন্তিক বিকাশ, মানুষের কোন আংশিক ভাবের আতিশয্যলাভই গীতার লক্ষ্য নহে, গীতার অতিমানব অসুর বা দানব নহে। এক সর্বাতীত বিশ্বগত ভাগবত পুরুষের সত্তা প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে সমর্পণ করিয়া ক্ষুদ্র "আমিকে" হারাইয়া বৃহত্তর "আমিকে" পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নীতি বর্ণিত হইয়াছে।

নীচের অপূর্ণ প্রকৃতি হইতে, ত্রিগুণময়ী মায়া হইতে নিজেকে তুলিয়া

* জীবনের ও কর্মের নীতিতে ভগবানের সহিত এক হওয়াই সাধর্ম্য।

ভগবানের সাযুজ্য, সালোক্য এবং সাদৃশ্য (বা সাধর্ম্য)* লাভ করা, মদ্ভাবমাগতাঃ, ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যখন মানব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে আর মিথ্যা অহংভাবের দৃষ্টি লইয়া দেখে না পরন্তু সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখে এবং সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে দেখে, তখনও যে কর্ম থাকে, সে কর্মের স্বরূপ কি এবং সে কর্ম কি বিশ্বগত বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়? অর্জুন এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। "স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপে চলেন?"—ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু অর্জুন যে দিক হইতে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন উত্তরটা ঠিক সেই দিক দিয়া হইল না। মানসিক বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ ও নৈতিকতার স্তরে যে ব্যক্তিগত কামনা বা বাসনা তাহা কখনও এরূপ কর্মের প্রবর্তক হইতে পারে না; কারণ সে বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে—এমন কি নৈতিক প্রেরণাও পরিত্যক্ত হইবে কারণ যিনি মুক্ত ব্যক্তি তিনি পাপ পুণ্যের নিম্নতর ভেদ অতিক্রম করেন এবং শুভ ও অশুভের উপরে দিব্য পবিত্রতার মধ্যে বাস করেন। পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিবার যে আধ্যাত্মিক আহ্বান তাহার বশেও এ অবস্থায় কর্ম হইবে না, কারণ সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে, আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু লোকসংগ্রহের জন্যই এ অবস্থায় কর্ম হইতে পারে, চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। মানব-মণ্ডলী দূর ভাগবত আদর্শের দিকে যে মহান্ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, বুদ্ধির সংশয় ও গোলমাল হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। অজ্ঞান আঁধারের ভিতর দিয়া মানুষকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের আদর্শ, তাহাদের জ্ঞান ও শক্তির সাহায্য না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে তাঁহারা স্বভাবতই মানুষের নেতা, কারণ তাঁহারাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে, কোন্ আদর্শ মানব-জাতিকে অনুসরণ করিতে হইবে, কোন্ পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু ভগবতভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার প্রভাবের, তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তিনি কি দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? তিনি কোন নীতি বা আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিবেন?

তাঁহার বক্তব্য আরও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দিব্য গুরু, অবতার, নিজের দৃষ্টান্ত, নিজের আদর্শ অর্জুনের সম্মুখে ধরিলেন। তিনি যেন বলিলেন—'আমি কর্মপথে রহিয়াছি, এই পথ সকল মনুষ্যই অনুসরণ করে;

তোমাকেও কর্ম করিতে হইবে। আমি যেরূপ কর্ম করি, তোমাকেও সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে। আমি কর্মের আবশ্যকতার ঊর্ধ্বে, কারণ কর্মের দ্বারা আমার লাভ করিবার কিছুই নাই; আমি ভগবান, সংসারের সকল বস্তু, সকল জীবই আমার, আমি নিজে সংসারের অতীতও বটি, সংসারের মধ্যেও বটি, কোন কিছুর জন্য ত্রিভুবনে আমি কাহারও নিকট কোন ভরসা করি না; তথাপি আমি কর্ম করি। এই ভাবেই, এই আদর্শেই তোমাকেও কর্ম করিতে হইবে। আমি ভগবান, আমি বিধি, আমিই আদর্শ; মানুষ যে পথে চলে তাহা আমিই প্রস্তুত করি: অমিই পথ, আমিই লক্ষ্যস্থল। কিন্তু আমি এই সকল বিশাল-ভাবে, সার্বভৌমিকভাবে করি—আংশিকভাবে দৃশ্যত করি, কিন্তু বেশীর ভাগ অদৃশ্য ভাবেই করি; মানুষ আমার কর্মধারা বাস্তবিকই বুঝে না। তুমি যখন সব জানিবে, দেখিবে, তুমি যখন দিব্য মানব হইবে—তখন তুমি ভগবানের ব্যষ্টিগত শক্তি হইবে, মানুষ হইয়াও ভাগবত আদর্শ,—যেমন অবতাররূপে আমি। বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, ভগবৎদ্রষ্টা জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন; কিন্তু তিনি যেন বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মধ্যে সংশয় আনয়ন না করেন, উপরে উঠিয়াছেন বলিয়া সংসারের কর্ম পরিত্যাগ না করেন; তিনি যেন অকালে কর্মসূত্র ছিন্ন করিয়া না দেন, ক্রমোন্নতির আমি যে সকল স্তর ও ধাপ নির্ধারণ করিয়াছি, তিনি যেন তাহা গোলমাল করিয়া না দেন। মানুষ কেমন করিয়া অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারিবে, ভাগবত চৈতন্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার হিসাব করিয়াই আমি সমস্ত মানবীয় কর্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। ভাগবত-জ্ঞানীকে সমস্ত মান-বীয় কর্মের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সমস্ত ব্যক্তিগত কার্য, সামাজিক কার্য, বুদ্ধি, হৃদয়, দেহের সমস্ত কার্যই তাঁহার থাকিবে—তবে, তাহা আর স্বতন্ত্র-ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু যে ভগবান জগতের মধ্যে রহিয়াছেন, সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহারই জন্য—তিনি যেমন কর্মের পথ অনুসরণ করিয়া নিজের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছেন, সেইমত সকলেই যাহাতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সকল কর্ম করিতে হইবে। বাহ্যতঃ তাঁহার কর্মের সহিত অপরের কর্মের হয়ত বিশেষ কোন তফাৎই থাকিবে না; যেমন শিক্ষাদান ও জ্ঞান-চর্চা, তেমনই যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন, মানুষের সহিত মানুষের যত বিচিত্র আদান-প্রদান সবই তাঁহাকে করিতে হইতে পারে; কিন্তু যে মনোভাবের সহিত তিনি এই সকল করিবেন তাহা হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁহার ভিতরের এই ভাবই মানব-গণকে তাঁহার নিজের উচ্চতর স্তরে টানিয়া লইবার মহতী শক্তি হইবে, জনমণ্ডলীকে তাহাদের ঊর্ধ্বমুখী পথে তুলিয়া দিবার মহান উত্তোলন-দণ্ড স্বরূপ হইবে।

ভগবান এখানে মুক্ত পুরুষকে যে নিজের দৃষ্টান্ত দিলেন ইহার অর্থ অতি

গভীর, কারণ ইহার দ্বারা গীতার দিব্য কর্মবাদের সমগ্র ভিত্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নীত করিয়াছেন তিনিই মুক্ত; এতাদৃশ মানবের কর্ম সেই দিব্য প্রকৃতি অনুসারেই হইবে। কিন্তু, দিব্য প্রকৃতি কি? ইহা কেবল অক্ষরের নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্যক্তিক আত্মার প্রকৃতিই নহে; কারণ তাহা হইলে মুক্ত মানবকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, হইতে হইত। ইহা ক্ষর, বহু ব্যক্তিক যে-পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির অধীন করিয়া দিয়াছে স্বরূপতঃ তাহার প্রকৃতিও নহে, কারণ শুধু এইরূপ প্রকৃতি মানুষকে নামরূপের অধীনে, অপরা প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ের অধীনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ইহা পুরুষোত্তমের প্রকৃতি, তিনি দুইটিকেই এক সঙ্গে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার পরম ভাগবতসত্তায় তাহাদের দিব্য সমন্বয় করিয়াছেন, ইহাই হইতেছে তাঁহার সত্তার শ্রেষ্ঠ রহস্য, রহস্যম্ হ্যেতদ্ উত্তমম্। প্রকৃতিতে বদ্ধ আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম করি তিনি সেরূপভাবে কর্ম করেন না; কারণ ভগবান তাঁহার শক্তি, মায়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য করেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহার ঊর্ধ্বেই থাকেন, ইহার দ্বারা বদ্ধ নহেন, ইহার অধীন নহেন; এই প্রকৃতি কর্মের যে নিয়ম, ধারা এবং সংস্কারের সৃষ্টি করে তিনি নিজেকে তাহাদের উপরে তুলিতে অক্ষম নহেন, তাহাদের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ নহেন; আমরা যেরূপ প্রাণ মন দেহের কর্ম হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিতে অক্ষম, তিনি সেরূপ অক্ষম নহেন। তিনি কর্তা হইয়াও কর্ম করেন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তাবম্।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্। ৪।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ৪।১৪

"আমাকে ইহার (চাতুর্ব্বর্ণ্যের) কর্তা বলিয়া অথচ অব্যয় অকর্তা বলিয়াই জানিও। কর্মসকল আমাতে লিপ্ত হয় না; কর্মফলেও আমার স্পৃহা নাই।" কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, অক্ষম সাক্ষী মাত্রও নহেন; কারণ তাঁহাব শক্তির ক্রিয়ায় তিনিই কর্ম করেন। ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জীবজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাঁহারই সত্তায় অনুপ্রাণিত, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁহারই জ্ঞানে গঠিত।

তা ছাড়া তিনি সেই পরমপুরুষ যিনি গুণশূন্য হইয়াও সকল গুণেব অধিকারী, নির্গুণো গুণী।* প্রকৃতির কোন গুণ বা কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, আমাদের ব্যক্তিত্বের মত তিনি প্রকৃতির গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন, দেহ, প্রাণ, মন, হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন, কিন্তু তিনিই সকল গুণ ও কর্মের মূল, যেটিকে যেমনভাবে হউক তাঁহার ইচ্ছামত বিকাশ করিতে তিনি সক্ষম; তিনি অনন্ত সত্তা, উহারা তাঁহার সম্ভূতির বিভিন্ন ধারা; তিনি অপরিমেয়, অনন্ত, অনির্বচনীয় বস্তু,—উহারা তাঁহার সান্ত রূপ,

* উপনিষদ্

বিশ্বের ছন্দে ও সংখ্যায় তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। অথচ তিনি শুধুই একটি নির্ব্যক্তিক অনির্দেশ্য সত্তা নহেন, চৈতন্যময় জীবনের এমন উপাদান মাত্র নহেন যাহা হইতে সকল নাম ও রূপ নিজেদিগকে গড়িয়া তোলে, পরন্তু তিনি পরমপুরুষ, একমাত্র আদি স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যময় সত্তা, তিনি পূর্ণতম ব্যক্তি—সকল সম্বন্ধ, মনুষ্যোচিত স্থূল অন্তরঙ্গ সম্বন্ধও তাঁহাতে সম্ভব; তিনি বন্ধু, সখা, প্রণয়ী, খেলার সাথী, পথ-প্রদর্শক, গুরু, প্রভু, জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, অথচ সকল সম্বন্ধের মধ্যেও মুক্ত, কৈবল্যাত্মক সত্তা। মানুষ ভাগবত প্রকৃতিলাভে যতখানি সক্ষম হয়, ততখানি সেও এইরূপ হয়—ব্যক্তি হইয়াও ব্যক্তিত্বের উপর উঠিতে পারে, মানুষের সহিত নিবিড়তম ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখিয়াও গুণ বা কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, এ ধর্ম বা ও ধর্ম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক কোন ধর্মের দ্বারাই বদ্ধ থাকে না। কর্মপ্রবণ মনুষ্যের কর্মচাঞ্চল্য অথবা শান্ত সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয় জ্ঞান, কর্ম-হীনতা, কর্মীর উদ্যম, ব্যক্তিত্ব অথবা দার্শনিক পণ্ডিতের উদাসীন নির্ব্যক্তিকতা—কোনটাই সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ নহে। সংসারী মানব এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা শান্ত দার্শনিক, এই দুইটি বিরোধী আদর্শ; একজন ক্ষরের কর্মে মগ্ন আর একজন অক্ষরের শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করিবার জন্য যত্নবান; কিন্তু পূর্ণভাগবত আদর্শ আইসে পুরুষোত্তমের প্রকৃতি হইতে, তাহা এই বিরোধের উর্ধ্বে এবং তাহার মধ্যে সকল দিব্য সম্ভাবনারই সমন্বয় হইয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সেই প্রকৃতির তিনগুণের এই খেলা, মন হৃদয় ও দেহের এই মানবীয় ক্রিয়া, এই সকলের উপর যে-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নহে, সাধারণ কর্মশীল মানব সেরূপ আদর্শে তৃপ্তি পায় না। সে বলে যে ঐ ক্রিয়ার চরম পরিণতিতেই আমার মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ; মানুষের দিব্য সম্ভাবনা বলিতে আমি ইহাই বুঝি। মানুষ শুধু সেই আদর্শেই সন্তুষ্ট, যে-আদর্শ আমাদের হৃদয়কে আমাদের নৈতিক বোধকে তৃপ্ত করিতে পারে, আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে কর্মে ব্রতী করিতে পারে; দেহ মন প্রাণের কর্মের মধ্যে যাহা পাওয়া যাইতে পারে মানুষ তাহাই চায়। কারণ তাহাই তাহার প্রকৃতি, তাহার ধর্ম। তাহার প্রকৃতির বাহিরের কিছুতে কেমন করিয়া সে সার্থকতা লাভ করিবে? কারণ প্রত্যেক জীব তাহার প্রকৃতিতে বদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে তাহাকে পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। আমাদের মানবীয় প্রকৃতি যেমন, আমাদের মানবীয় পূর্ণতাও তদনুরূপই হইবে; প্রত্যেক মনুষ্য নিজের ব্যক্তিত্ব অনুসারে, স্ব-ধর্মানুসারেই ইহার জন্য চেষ্টা করিবে—কিন্তু জীবন এবং কর্মের মধ্যে, তাহাদের বাহিরে নহে। গীতা বলে,—হাঁ এই কথার মধ্যেও সত্য রহিয়াছে; মানুষের মধ্যে ভগবানের স্ফুরণ; জীবনের মধ্যে ভাগবত লীলা, ইহা আদর্শ পূর্ণতারই

অংশ। কিন্তু যদি শুধুই বাহিরে, জীবনের মধ্যে, কর্মের নীতির মধ্যে ইহার সন্ধান কর তাহা হইলে ইহাকে কখনই পাইবে না; কারণ তখন তুমি যে নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিবে (এটা পূর্ণতারই নীতি) তাহাই নহে কিন্তু তুমি চিরকাল প্রকৃতির গুণের অধীন, রাগদ্বেষের দ্বন্দের অধীন, বিশেষত কামনাময় ক্রোধশোকসঙ্কুল রাজোগুণের অধীন হইবে (ইহা অপূর্ণতার নীতি)। এই সর্বগ্রাসী চির-অতৃপ্ত কামনা তোমার সাংসারিক কর্মকে ঘিরিয়া ধরিবে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩।৩৭—৩৯

এই কাম জ্ঞানের চিরশত্রু, ইহার দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ধূম যেমন অগ্নিকে এবং মল যেমন দর্পণকে আচ্ছাদিত করে, আর জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে তেমনি কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। যদি তুমি আত্মার শান্ত নির্মল জ্যোতির্ময় সত্যের মধ্যে বাস করিতে চাও তাহা হইলে এই কামকে বধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি হইতেছে সিদ্ধির চির-শত্রু কামের অধিষ্ঠানভূমি, আশ্রয়, অথচ শুধু এই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির মধ্যে, অপরা প্রকৃতির খেলার মধ্যেই সিদ্ধির সন্ধান করিবে? এ চেষ্টা বৃথা। তোমার কর্মপ্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তির সন্ধান করিতে হইবে; এই নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া ত্রিগুণের উপরে যে পরা অধ্যাত্মপ্রকৃতি তাহাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যখন তুমি আত্মার শান্তি লাভ করিবে কেবল তখনই তুমি মুক্ত দিব্য কর্মের অধিকারী হইবে।

অন্যদিকে শান্তিপ্রবণ সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধাবস্থায় সংসার ও কর্মের কোন স্থান দেখিতে পান না। এইগুলিই কি বন্ধন এবং অসিদ্ধির মূল নহে? ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই কি দোষযুক্ত নহে? কর্মের নীতিই কি রাজসিক নহে? এই রজোগুণ হইতেই কামের উদ্ভব, কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, জয়-পরাজয়, সুখ-দঃখ, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বে মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে। সংসারের মধ্যে ভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি সংসারের নহেন, তিনি ত্যাগের ভগবান, আমাদের কর্মের অধীশ্বর বা কারণ নহেন; বাসনা বা কামই আমাদের কর্মের অধীশ্বর এবং অজ্ঞানই আমাদের কর্মের কারণ। ক্ষরকে, জগতকে যদিও একভাবে ভগবানের প্রকাশ বা লীলা বলা যায়, ইহা প্রকৃতির অজ্ঞানের সহিত অপূর্ণ লীলা; ইহা ভগবানকে প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহাকে ঢাকিয়াই রাখে। জগতের স্বরূপের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা

নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইলেও আমরা কি এই শিক্ষাই পাই না ? যতদিন কামনা ও কর্মের প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা ক্ষীণ বা পরিত্যক্ত না হয় ততদিন এই অজ্ঞানচক্র সংসার কি জীবকে পুনঃ-পুনঃ জন্মগ্রহণ করায় না ? শুধু কাম নহে, কর্ম পর্যন্ত বর্জন করিতেই হইবে; তখন জীব নীরব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গতিহীন, কর্মহীন, অবিচল, কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে চলিয়া যাইবে। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত শান্তি-প্রবণ সন্ন্যাসীর এই আপত্তির উত্তর গীতা যেরূপ যত্নের সহিত দিয়াছে, সংসারী কর্মপ্রবণ মানুষের আপত্তির উত্তর দিতে গীতা তত যত্ন করে নাই। কারণ শান্ত সন্ন্যাসীর যে আপত্তি তাহাতে আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী সত্য নিহিত রহিয়াছে অথচ ইহা সম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে—ইহার প্রচারের দ্বারা মানবজাতির লক্ষ্যের দিকে প্রগতিতে যে গোলমাল ও অনিষ্ট হইতে পারে একদেশদর্শী কর্মবাদের ভ্রান্তির দ্বারা তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কোন তীব্র আংশিক সত্যকে যখন সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করা যায়—তখন যেমন তীব্র আলোকের সৃষ্টি হয় তেমনই গভীর গোলমালেরও সৃষ্টি হয়; কারণ ইহার ভিতর যে সত্যটুকু রহিয়াছে—তাহার শক্তি ইহার মিথ্যা বা ভুলের অংশটুকুকে খুব তীব্র করিয়া তুলে। কর্ম-বাদের আদর্শে যে ভুল তাহাতে শুধু অজ্ঞানকে স্থায়ী করিয়া রাখে, এবং যেখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় না সেখানে সিদ্ধির সন্ধান কবায মানবেব উন্নতিতে বাধা পড়িতে পারে; কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষ্কর্মতার আদর্শে যে ভুল তাহাতে সংসার ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যদি এই আদর্শ অনুসারে কর্মত্যাগ করি তাহা হইলে আমি লোকসকলকে নষ্ট কবিব এবং বিষম বিশৃঙখলা আনয়ন করিব; এবং যদি কোন বিশিষ্ট মানব (যদিও তিনি প্রায় ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন) তাঁহার ভুলের দ্বারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করিতে না পারেন তথাপি তাঁহার ভুলের ফলে বিস্তৃতভাবে বিশৃঙখলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা মানবজীবনের মূলনীতির সংহারক হইতে পারে এবং ইহার ক্রমবিকাশের নির্দিষ্ট পন্থাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

অতএব মানুষের মধ্যে কর্মশূন্য শান্তির দিকে যে ঝোঁক রহিয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে যেমন সত্য বহিয়াছে অন্যদিকে কর্মপ্রবণতার মধ্যেও যে তেমনই সত্য সমানভাবে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে,—স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইতেছেন, এবং মানবজাতির সকল কর্মের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। ভগবান শুধু নীরবতার মধ্যেই নাই, তিনি কর্মের মধ্যেও রহিয়াছেন: প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় আত্মার যে শান্ত ভাব এবং প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত আত্মার যে কর্মপ্রবণতায় জগৎ-যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে, সেই দুইটি পরস্পর-বিরোধী সত্য নহে; একটি সত্য অপরটি মিথ্যা এরূপভাবেও তাহাদের মধ্যে

চিরবিরোধ নাই ; একটি উচ্চ অপরটি নীচ তাহাও নহে; একটির দ্বারা অপরটির নাশ হইতে পারে সেরূপ সম্ভাবনাও নাই। এই দুইটি হইতেছে ভাগবত লীলাব দুইটি দিক (double term)। শুধু অক্ষরই তাহাদের সংসিদ্ধির সমগ্র তত্ত্ব নহে, উচ্চতম রহস্য নহে। এখানে কৃষ্ণ যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের মধ্যেই উভয়ের সিদ্ধি ও সমন্বয়ের সন্ধান করিতে হইবে, তিনি একই সঙ্গে পরমতম সত্তা, জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং অবতার। যে ভাগবত-ভাবাপন্ন মানব তাঁহার ভাগবত প্রকৃতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মতই তিনিও কর্ম করিবেন; তিনি নিজেকে নৈষ্কর্মের মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন না। অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে ভগবান কর্ম করিতেছেন, জ্ঞানী মানুষের মধ্যেও তিনি কর্ম করিতেছেন। তাঁহাকে জানাই আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এবং সিদ্ধিলাভের উপায়, কিন্তু তাঁহাকে শুধু বিশ্বের অতীত নীরব শান্তিময় বলিয়া জানিলে ও বুঝিলেই সব হইল না। অজাত অনন্ত ভগবানের রহস্য যেমন জানিতে হইবে, তেমনই তাঁহার দিব্য জন্ম ও কর্মের রহস্যও জানিতে হইবে, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। এই জ্ঞান হইতে যে কর্ম উৎসারিত হয় তাহা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। ভগবান বলিয়াছেন, "এইরূপে যে আমাকে জানে সে কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না।" যদি কর্ম ও বাসনার বাধ্যতা এবং জন্মান্তর চক্র হইতে মুক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে এই জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃত প্রশস্ত উপায় ধরিতে হইবে, কারণ গীতায় বলা হইয়াছে—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥ ৪।৯

"হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।" দিব্যজন্মের জ্ঞান ও দিব্যজন্মের ভিতর দিয়া তিনি সর্বভূতের আত্মা অজ অব্যয় ভগবানকে লাভ করেন। দিব্যকর্মের জ্ঞান ও সাধনের ভিতর দিয়া তিনি সর্বকর্মের সর্বভূতের অধীশ্বরকে লাভ করেন। তিনি অজাত সত্তার মধ্যে বাস করেন; তাঁহার কর্ম হয় সেই বিশ্বের অধীশ্ববের কর্ম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন

যে-যোগে কর্ম ও জ্ঞান এক হয়, জ্ঞানের সহিত কর্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, যে-যোগে সকল কর্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে, জ্ঞান কর্মকে সমর্থন করে, পরিবর্তিত করে, আলোকিত করে এবং জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সেই পরম ভগবান পুরুষোত্তম উদ্দেশে অর্পিত হয়, যিনি আমাদের মধ্যে নারায়ণরূপে আবির্ভূত হন, আমাদের সকল সত্তা ও কর্মের অধীশ্বররূপে আমাদের হৃদয়ে চির-বিরাজিত, যিনি মানবশরীরেও অবতাররূপে আবির্ভূত হন, দিব্যজন্ম আমাদের মানবীয়তাকে অধিকার করে—সেই যোগের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে বলিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪।১

"আমি সূর্যকে এই আদি প্রাচীন যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য মানবপিতা মনুকে এবং মনু সূর্যবংশের আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ কহিয়াছিলেন।"

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৪।২, ৩

"রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে তাহা কালবশে নষ্ট হইয়াছে। তুমি ভক্ত ও সখা, এ জন্য আমি সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে কহিলাম; কারণ ইহাই উত্তম রহস্য।" ইহাকে উত্তম রহস্য বলা হইল, অতএব বলা হইল যে, ইহা অন্যান্য প্রকারের যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য প্রকারের যোগ নির্ব্যক্তিকে ব্রহ্মে বা কোন সাকার দেবতার নিকট লইয়া যায়, হয় কর্মশূন্য জ্ঞানে যে-মুক্তি নতুবা ভক্তিতে মগ্ন থাকায় যে-মুক্তি তাহা লাভ হয়। কিন্তু, এখানে যে-যোগের কথা বলা হইল তাহাতে শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং সমগ্র রহস্য লাভ হয়। ইহার দ্বারা আমরা ভাগবত শান্তি এবং ভাগবত কর্ম লাভ করি, পূর্ণতম মুক্তিতে সম্মিলিত ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত কর্ম, ভাগবত আনন্দের অধিকারী হই; যেমন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তার মধ্যে তাঁহার বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী শক্তি ও তত্ত্বসকলের সমন্বয় হইয়াছে, তেমনি ইহার মধ্যে অন্যান্য সমস্ত যোগের পথই সম্মিলিত

হইয়াছে। অতএব গীতার এই যোগ কেবল কর্মযোগ—তিনটি পথের একটি পথ এবং নিম্নতম পথ এ কথা কেহ-কেহ বলিলেও বাস্তবিকপক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ, ইহা সমগ্র ও পূর্ণ, ইহাতে সকল পন্থার সমন্বয় হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্‌মুখী করা যায়।

ভগবান যে পরের পর যোগ শিক্ষাদানের কথা বলিলেন, অর্জুন ইহার সাধারণ বাহ্যিক অর্থটি-ই ধরিলেন (ইহার অন্যরকম অর্থও করা যাইতে পারে) এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪।৪

"তোমার জন্ম পরবর্তী এবং সূর্যের জন্ম পূর্ববর্তী; অতএব তুমি যে প্রথমে সূর্যকে এই যোগ বলিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?" শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া জবাব দিতে পারিতেন যে, তিনি ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস—তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ ও সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জ্যোতির প্রদাতা সূর্য-দেবকে তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন—ভর্গো সবিতুর্ দেবস্য যো নঃ ধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি এই সুযোগে অর্জুনকে তাঁহাব গুপ্ত ঈশ্বরত্বের কথা বলিলেন: ইহার জন্য তিনি ইতিপূর্বে অর্জুনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন যখন তিনি নিজেকে সকল বন্ধনমুক্ত কর্মীর ভাগবত আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করেন—কিন্তু তখন কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। এখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান. অবতার।

গীতার গুরুর কথা বলিবার সময় আমবা সংক্ষেপে অবতারবাদের কথা বলিয়াছি: বেদান্তশিক্ষার আলোকে অবতারবাদ যেরূপ বুঝা যায় গীতা সেই ভাবে উহা আমাদের নিকট উপস্থিত কবিয়াছে। এখন এই অবতারবাদ আমাদিগকে আব একটু গভীরভাবে দেখিতে হইবে এবং যে-দিব্যজন্মের ইহা বাহ্যিক নিদর্শন তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; কারণ, গীতার পূর্ণ শিক্ষায় ইহা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। প্রথমে, গীতার গুরু নিজে যে-ভাষায় অবতারের স্বরূপ ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন আমরা তাহার উল্লেখ কবিব এবং এই বিষয়ে অন্যান্য স্থানেও যাহা বলা হইযাছে বা সংকেত করা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিব। ভগবান বলিলেন,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৪। ৫--১১

"হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে সমুদয় জানি, কিন্তু, তুমি তাহা জান না, পরন্তপ! আমি জন্মরহিত, নিজ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বব হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াবশত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের বক্ষার জন্য, দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই।- হে অর্জুন, যিনি আমার এই-রূপ জন্ম এবং কর্ম যথার্থ জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য, মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্যায় পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব (পুরুষোত্তমের ভাব) পাইয়াছেন। যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি আমার প্রেমে সেই ভাবেই গ্রহণ করি; হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তন করিয়া থাকে।"

কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কর্মের সিদ্ধি কামনা করিয়া দেবগণের উদ্দেশে, একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্মজ সিদ্ধি, জ্ঞান-বিরহিত কর্মের ফল, খুব শীঘ্রই এবং সহজেই লব্ধ হয়; বাস্তবিক ইহা শুধু এই জগতেরই। কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিয়া মানুষের মধ্যে যে ভাগবত জীবনের বিকাশ তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন; ইহার ফল উচ্চস্তরের এবং তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব, মানুষকে গুণ-কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্বর্ণ্য নীতির অনুসরণ করিতে হয় এবং এই সাংসারিক কর্মের স্তরে তাহারা ভগবানের বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়াই তাঁহার উপাসনা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদিও আমি চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম করি এবং আমি এই চাতুর্বর্ণ্য নীতির সৃষ্টিকর্তা তথাপি আমাকে অকর্তা বলিয়াও, অবিনশ্বর অক্ষর আত্মা বলিয়াও জানিও। কর্মসকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

কারণ, ভগবান নির্ব্যক্তিক সত্তারূপে এই অহংমূলক ব্যক্তিকতার এবং প্রকৃতি-জাত গুণের এই দ্বন্দ্বের অতীত, আবার পুরুষোত্তমরূপে, নির্ব্যক্তিক পুরুষ-রূপে, তিনি কর্মের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতএব দিব্যকর্মের কর্মিগণকে চাতুর্বর্ণ্য নীতি অনুসারে কর্ম করিবার সময়েও ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে তাহা জানিতে হইবে, নির্ব্যক্তিক আত্মাব মধ্যে এবং পবম ভগবানের মধ্যে বাস করিতে হইবে,

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ৪। ১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ৪। ১৫

"এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি তাঁহাব কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। এইরূপ জানিয়া পূর্বতন (জনকাদি) মুমুক্ষুরাও কর্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্বতন সাধুগণের কৃত প্রাচীনতর কর্মই কর।"

গীতার এই যে কথাগুলি এখানে উত্থিত হইল, এগুলি দিব্যকর্মের, ভাগবত কর্মের স্বরূপের পরিচায়ক—পূর্ব প্রবন্ধে ইহার নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কথাগুলির পূর্বেই গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি তুলিয়া আমরা অনুবাদ করিযাছি—তাহাতে দিব্যজন্মের, অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাল করিয়া বলিতে চাই যে, শুধু জগতের ধর্মরক্ষা ধর্মসংস্থাপনই অবতারের, মানবীয়তার মধ্যে ভগবদ্ আবির্ভাবরূপ মহান্ রহস্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; কারণ শুধু ধর্মসংস্থাপনই যথেষ্ট নহে, একজন খৃীস্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারের উচ্চতম সম্ভব লক্ষ্য নহে, উহা এক উচ্চতর দিব্য প্রয়োজন ও মহত্তর লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় একটি বিধান মাত্র। কারণ দিব্যজন্মের দুইটি দিক আছে : একটি হইতেছে, অবতরণ, মানবীয়তার মধ্যে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, চিরন্তন অবতার; অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম, ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের উত্থান, মদ্ভাবমাগতাঃ; ইহা আত্মার নূতন জন্মে পুনর্জন্মলাভ। এই নবজন্ম সাধনের জন্যই অবতার এবং ধর্মসংস্থাপন। গীতার অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবামাত্র সহজে যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়; গীতার গোঁড়া টীকাকারেরাও ইহা ধরিতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্কীর্ণতাতে তাহারা প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া দেখে। অথচ অবতারবাদের সম্যক অর্থ বুঝিবার জন্য দুইটি দিকই প্রয়োজন। নতুবা এই অবতারবাদ শুধু একটা গোঁড়া মত, একটা

লৌকিক কুসংস্কার বা কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে কল্পনার বলে ভগবান বলিয়া বর্ণনা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না; কিন্তু গীতার শিক্ষা এইরূপ নহে, গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্, শ্রেষ্ঠ রহস্যের অন্তর্গত।

এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানবশরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ ধর্ম, ন্যায়, পাপ-পুণ্যের বিধান—এ সকলের প্রতিষ্ঠা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংশোধন করিতে পারেন—মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া, সাধু, রাজা এবং ধর্মোপদেষ্টাদের জীবন ও কর্মের ভিতর দিয়া এই সকল সংসাধিত হইতে পারে, বস্তুত স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না। মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির প্রকাশই অবতার, এইরূপেই হইয়াছে খ্রীস্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের আবির্ভাব—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মানবীয় প্রকৃতি খ্রীস্টত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্বের অনুসরণ করিয়া নিজের নীতি, চিন্তা, ভাব, কর্ম গড়িয়া তুলিবে এবং এইরূপেই তাহা ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবে। অবতার যে-নীতি, যে-ধর্ম সংস্থাপন করেন ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; খ্রীস্ট বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কেন্দ্র-স্থানে দ্বারের মত দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার নিজের ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দেন। এই জন্যই প্রত্যেক অবতার মনুষ্যের সম্মুখে নিজের দৃষ্টান্ত ধরিয়া থাকেন এবং প্রচার করেন যে, তিনিই পথ, তিনিই প্রবেশের দ্বার; আরও তিনি প্রচার করেন তাঁহার মানবীয়তার সহিত ভাগবত সত্তার একত্ব। যীশু বলিয়াছেন, মানবপুত্র তিনি এবং যে স্বর্গীয় পিতা হইতে তিনি অবতীর্ণ, উভয়েই এক; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মানুষশরীরে তিনি, মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্, এবং সর্বভূতের সুহৃদ্ পরম ঈশ্বর উভয়েই এক ভগবান পুরুষোত্তমেরই প্রকাশ, সেখানে নিজ স্বরূপে প্রকাশ, এখানে মানব মূর্তিতে প্রকাশ।

অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতাশিক্ষার সার তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু, শুধু এই অংশটি না ধরিয়া অন্যান্য অংশও যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। বাস্তবিক গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে—কোন বিশেষ শ্লোক বা অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা ঠিক নহে—অন্যান্য শ্লোক বা অংশের সহিত মিলাইয়া, এবং সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা সমীচীন। গীতা যে বলিয়াছে, একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত—আমাদিগকে গীতার সেই শিক্ষা এখানে স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বর

ও তাঁহার সৃষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে হইবে; বিভূতির কথা গীতায় যেরূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে তাহাও মনে করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষায় নিজের নিঃস্বার্থ কর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের ঈশ্বর উভয়েরই পক্ষে সমানভাবে খাটে; নবম অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোকটির মত শ্লোকগুলির মর্মও গ্রহণ করিতে হইলে,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

"ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ **মানুষীদেহধারী** আমাকে অবজ্ঞা কবে কারণ তাহারা সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমাব পবমতত্ত্ব জানে না।" এই সকল তথ্যের আলোকে আমাদিগকে গীতার নিম্নলিখিত ঘোষণাটি বুঝিতে হইবে,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥৪।৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০

"হে অর্জুন, যিনি আমাব এইরূপ জন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি ভয ও ক্রোধশূন্য হইয়া, মদেকচিত্ত হইয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব পাইয়াছেন।" এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা দিব্যজন্মের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব; বুঝিব যে, এই অবতার বা দিব্যজন্ম একটা বিচ্ছিন্ন আলৌকিক ঘটনা নহে—জগতবিকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দিষ্ট স্থান আছে; নতুবা আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়ত আমরা একেবারেই এই অবতার তত্ত্বকে উড়াইয়া দিব অথবা অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই হয়ত বা কুসংস্কারপূর্ণভাবেই ইহাকে মানিয়া লইব, অথবা অবতার সম্বন্ধে আধুনিক মনের সেই সব ক্ষুদ্র ও অগভীর ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িব যাহাদের দ্বারা ইহার সকল নিগূঢ় ও সাহায্যপ্রদ অর্থ নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাচ্য হইতে যে-সকল ভাব মানুষের যৌক্তিক বুদ্ধির সম্মুখে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে এই অবতার তত্ত্ব আধুনিক মনের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। আধুনিক মন অবতারবাদকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয় নতুবা ইহাকে রূপক মাত্র বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাদের মতে যেসকল মনুষ্য বিশেষ শক্তি, প্রতিভা বা কর্ম দেখান তেমন লোককেই সাধারণে অবতার বলিয়া থাকে। জড়বাদীগণ ত অবতার-তত্ত্বকে আমলই দিতে পারে না, কারণ তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; যাঁহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে

দেখেন (Deists) তাঁহারা ভগবান যে মানুষ হন একথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী (Dualists), যাঁহারা মানবীয় প্রকৃতি এবং ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট অবতারবাদ হইতেছে পাষণ্ডীয়। যুক্তিবাদী বলেন—ভগবান যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বের উপরে অথবা বাহিরে আছেন এবং তিনি সংসারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, বাঁধা নিয়মকানুনের বশে জগতের কার্যাবলী যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়,—বস্তুত তিনি একজন দূরবর্তী নিয়মতান্ত্রিক রাজার মত, বড় জোর তিনি প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতে উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, আত্মামাত্র, সাংখ্যের সাক্ষীর মত; তিনি পবিত্র আত্মা, তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব নহে, তিনি অনন্ত, মানুষ যেমন সান্ত তিনি তেমন সান্ত হইতে পারেন না, তিনি চির-অজাত সৃষ্টিকর্তা, তিনি কখনও সৃষ্টজীবরূপে জগতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না; তিনি সর্বশক্তিমান হইলেও এসব তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্ণ দ্বৈতবাদীরা আরও আপত্তি তোলেন যে, ভগবান তাঁহার স্বরূপ, ব্যবহার ও প্রকৃতিতে মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, স্বতন্ত্র; যিনি পূর্ণ, মনুষ্যের অপূর্ণতা গ্রহণ করা তাঁহাতে সম্ভব নহে; অজাত ভাগবত পুরুষ কখনও মানবীয় ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি জগৎসমূহের নিয়ন্তা তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন মানবীয় কর্মের মধ্যে, ধ্বংসশীল মানব শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। এই সকল আপত্তি যে শুনিবামাত্রই বুদ্ধির কাছে খুব বড় বলিয়া মনে হয়, গীতার গুরুর মনেও যে এই আপত্তিগুলি উঠিয়াছিল তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ৪।১৩

"আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর; তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ায় আবির্ভূত হইয়া থাকি। মূঢ়গণ সর্বভূতের মহান ঈশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানায় মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি গুণ ও কর্মের বিভাগে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি; আমাকে তাহার কর্তা বলিয়া জানিও, অব্যয় অকর্তা বলিয়াও জানিও।"—ভাগবত চৈতন্যের ক্রিয়ায় তিনি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্তা এবং সংসারের সকল কর্মের কর্তা, আবার ভাগবত চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে তিনি তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির কর্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা—কারণ তিনি সকল সময়ে নীরবতা ও কর্ম উভয়ের ঊর্ধ্বে,

তিনি পরম পুরুষোত্তম। গীতা এই সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করিতে এবং এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছে, কারণ গীতা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কারণ বেদান্তের মতে এই সকল দারুণ আপত্তি ও বিরোধের কোন ভিত্তিই নাই। বেদান্তের মতে অবতারবাদ অপরিহার্য নহে বটে তথাপি ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ধারণারূপে বেদান্ত মতের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ এখানে সমস্তই ভগবান, আত্মা, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা ছাড়া ইহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ভাগবত চৈতন্যেরই শক্তি এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সকল জীবই ভগবানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শরীররূপ ও আত্মরূপ—ভাগবত চৈতন্যের শক্তি হইতেই তাহারা উৎপন্ন অথবা তাহার মধ্যে অবস্থিত। অনন্তের পক্ষে সান্তভাব গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, সমস্ত বিশ্ব ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমরা যে-ভাবেই দেখি না কেন, যে-জগতে আমরা বাস করি তাহার কোথাও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আত্মার পক্ষে আকার গ্রহণ করা, অথবা দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সীমাবদ্ধ প্রকৃতি বা দেহ গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, পরন্তু এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই জগৎ টিঁকিয়া আছে। এই জগৎ শুধু চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে. জগতের বাহিরে কোন চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই, সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক রূপের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক আত্মা ও মনকে অধিকার করে; সকলেই ভগবানের মধ্যে আছে, সকলেই তাঁহার মধ্যে চলা-ফেরা করে, তাঁহারই মধ্যে জীবনযাপন করে; তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম করেন এবং নিজের সত্তা প্রকট করেন; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ।

অজাত ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগত ভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদি-অন্তহীন সনাতন, তাহাদের গূঢ় সত্তায় সকলেই সেই এক আত্মা যাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহ্যিক আকার পরি-গ্রহ এবং পরিবর্তনের লক্ষণমাত্র। যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্ব-প্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার; কিন্তু যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার রূপ ও কর্মেই অপূর্ণতা-দোষ দৃষ্ট হয়—যিনি এইসব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য যে-আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, যাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা

বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্বত্র নিবিড়ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই তিনি জগৎ পরিচালন করেন; শক্তির যেসব সসীম ক্রিয়া সেসব এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সেসব কোন সীমাবদ্ধ স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় সেইটিকে ধরিয়া রহিয়াছে এক অনন্ত সর্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া। ভগবান কোন দূর দেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালন করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকে পরিচালনা করেন, কিন্তু আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের পরমাত্মারূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন। অতএব আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যেসকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সেসকল ভিত্তিহীন। কারণ আমাদের বুদ্ধি যে (অনন্ত ও সান্তের, পূর্ণ ও অপূর্ণের) মিথ্যা বিভাগ করিয়া থাকে তাহা জগতের সমগ্র ঘটনার, সমগ্র সত্যের বিরোধী।

কিন্তু সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে? বাস্তবিকই কি ভাগবত চৈতন্য আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জড়জগতে, সসীমের মধ্যে অসম্পূর্ণের মধ্যে কার্য করিয়া থাকে? প্রকৃতপক্ষে সসীম আর কিছুই নহে, নিজের চৈতন্যের বিচিত্রতার সম্মুখে অনন্তের আত্মপ্রকাশের এক একটি রূপই হইতেছে সসীম; কার্যত সসীম যেভাবেই প্রতীয়মান হউক, বস্তুত প্রত্যেক সসীমই নিজ স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তায় অসীম অনন্ত। মানুষকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন স্ব-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নহে, কিন্তু বিশেষ শরীর ও মনের ভিতর মানবজাতিরই প্রকাশ; তেমনই মানবজাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তার, বিশ্বেশ্বরেরই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনার বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভিব্যক্তির কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি বিবর্তিত করিতেছেন। আর তিনি বিবর্তিত করিতেছেন, প্রকট করিতেছেন নিজেকেই, আত্মাকেই।

কারণ আত্মা (Spirit) বলিতে আমরা বুঝি স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, তাহার আছে চৈতন্যের অনন্ত শক্তি এবং নিজ সত্তার অনাপেক্ষিক আনন্দ। হয় ইহা এরূপ নতুবা ইহা কিছুই নয়, অন্তত মানুষ ও জগতের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। জড়, শরীর হইতেছে কেবল চৈতন্যময় সত্তার একটা পুঞ্জীভূত গতি, চৈতন্য নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির ভিতর দিয়া বিচিত্র সম্বন্ধ বিকাশের জন্য জড়কে, দেহকে প্রাথমিক উপলক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে; জড়ও প্রকৃতপক্ষে কোথাও চৈতন্যশূন্য নহে, কারণ বর্তমান বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে

বাধ্য হইয়াছে যে, প্রত্যেক অণুতে (atom) প্রত্যেক কোষে (cell) একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা বুদ্ধি ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু সেই শক্তি অন্তর্নিহিত আত্মারই, ভাগবতেরই সংকল্প ও বুদ্ধির শক্তি; কোষে ও অণুতে যে চেতনা-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাহা জড় অণু বা কোষের নিজস্ব, স্বতন্ত্র সংকল্প বা বুদ্ধি নহে। এই যে বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি, সর্বত্র নিহিত রহিয়াছে ইহা বিভিন্ন রূপের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং অন্তত পৃথিবীতে ইহা মানুষের মধ্যেই পূর্ণ ভাগবতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছে এবং প্রথমে সেখানেই বাহ্যচৈতন্যের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে নিজের ভাগবত-সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে, এখানেও অভি-ব্যক্তির সেই অসম্পূর্ণতা আছে যাহার জন্য নিম্নস্তরের আধারে ভগবানের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি হয় না। কারণ প্রত্যেক সসীম সত্তাতেই তাহার বাহিরের কর্মে যেমন অসম্পূর্ণতা আছে তেমনই তাহার বাহিরের চৈতন্যেও অসম্পূর্ণতা আছে এবং ইহা হইতেই জীবের স্বরূপ নিরূপিত হয় ও এই-রূপেই জীবের সহিত বিভিন্নতা হয়। অবশ্য ভগবান পশ্চাৎ হইতে কর্ম করেন এবং এই বাহ্যিক ও অসম্পূর্ণ চেতনা ও সংকল্পের ভিতর দিয়া নিজের অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন, কিন্তু তিনি নিজে গুহায়াম্ (বেদ), গুহার ভিতর লুক্কায়িত; অথবা গীতায় যেমন বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

"ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিভ্রমণ করাইতেছেন।" ভগবান এই যে জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া অলক্ষ্যে তাহার অহংমূলক প্রাকৃত চৈতন্যের ভিতর দিয়া কর্ম করেন, জীবের সহিত ভগবানের সর্বত্রই এইরূপ ব্যবহার। তবে কেন আমরা ধরিতে যাইব যে, কোন বিশেষ আধারে তিনি অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসেন বাহ্য চৈতন্যের মধ্যে আসেন এবং অধিকতর সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে দিব্যকর্ম সম্পাদিত হয়? ভগবান ও মানুষের মধ্যে অন্তরাল রহিয়াছে—এবং নিজের প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ মানুষ যাহা নিজে কখনই সরাইতে পারিত না, তাহা লুপ্ত করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

গীতা বলে, জীব সাধারণত যে অপূর্ণভাবে কর্ম করে, তাহার কারণ জীব প্রকৃতির প্রক্রিয়ার বশ এবং মায়া তাহার আত্মজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও মায়া, ভাগবত চৈতন্যের একই কার্যকরী শক্তির দুইটি অনুপূরক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূলত মায়া ভ্রম (illusion) নহে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই মায়ার ভ্রম উৎপন্ন হয়), ভাগবত চৈতন্য যে-শক্তিতে বিভিন্নভাবে নিজেকে নিজের সম্মুখে ধরিতেছে, আত্মপ্রকাশ

করিতেছে—ইহাই মায়া; এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে প্রত্যেকের স্বভাব ও স্বধর্ম অনুসারে প্রকট করা যাহার কাজ, ভাগবত চৈতন্যের সেই কার্যকরী শক্তিই প্রকৃতি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

"আমি আমার নিজের প্রকৃতির উপর চাপিয়া প্রকৃতির শাসনে অবশ এই সকল ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি।" মানবশরীরে অবস্থিত ভগবানকে যাহারা জানে না তাহাদের এই অজ্ঞানের কারণ এই যে তাহারা প্রকৃতির এই যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অধীন, অবশভাবে ইহার মানসিক অজ্ঞান ও অপূর্ণতা-সকলে সায় দেয় এবং আসুরিক প্রকৃতির মধ্যে বাস করে; এই আসুরিক প্রকৃতি বাসনা ও অহংভাবের দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, মোহিনীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ। কারণ হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমকে সকলেই সহজে দেখিতে পায় না; তিনি নিজেকে গভীর অন্ধকার মেঘের অন্তরালে অথবা উজ্জ্বল আলোক মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া রাখেন, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখেন।*

গীতায় বলা হইয়াছে—

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরাং **ভাবম্মাশ্রিতাঃ**॥ ৭।১৫

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হওয়ায় এই সমস্ত জগৎ আমাকে জানিতে পারে না। কারণ, আমার এই গুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য; যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। কিন্তু কুকর্মান্বিত মোহগ্রস্ত নরাধমগণ আমার ভজনা করে না, আসুরিক ভাবের মধ্যে বাস করে, তাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হয়।" অর্থাৎ ভাগবতের জ্ঞান সকলের মধ্যেই ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, কারণ সকলের মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেখানে নিজ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা এই মূল আত্মজ্ঞান অপহৃত হয়, অহংয়ের ভ্রমে পরিণত হয়। তথাপি মানুষ প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া প্রকৃতির অন্ত-

* নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ

নিহিত গুপ্ত অধীশ্বরের দিকে ফিরিলে অন্তর্যামী ভগবানকে জানিতে পারে।

এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে তাহারই বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্তন করিয়া ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে। ভগবান কেমন করিয়া সাধারণ জীবের জন্ম দেন সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৮

এখানে বলা হইয়াছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

"স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি।" আত্মানম্ সৃজামি (I loose forth myself) আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। পূর্ব শ্লোকে ব্যবহৃত "অবষ্টভ্য" কথার দ্বাবা বোঝায়, উপর হইতে নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া যাহাতে অধিকৃত বস্তুটি নির্জিত, নিপীড়িত, তাহার সমস্ত গতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ হয়, সম্পূর্ণভাবে উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে, অবশম্ বশাৎ; প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় কলের (mechanism) মত কাজ করে এবং তাহার জীবসকলের নিজেদের কোন প্রভুত্ব থাকে না; তাহারা এই কলে অবশ ভাবে বদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, "অধিষ্ঠায়" শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অর্থ প্রকৃতিতে বাস করা, অথচ, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে প্রকৃতির কার্য পরিচালনা করা—ইহাতে পুরুষ অজ্ঞানের বশে অবশভাবে প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হয় না, বরং প্রকৃতিই পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্; ভূত সকল; দিব্যজন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা স্বয়ম্ভূ, আত্মচেতন, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, আত্মানম্, কারণ, বেদান্ত আত্মা ও ভূতানি এই দুইয়ের যে প্রভেদ করিয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিযাছে, Being এবং তাহার becomings। উভয় ক্ষেত্রেই মায়াই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির উপায় স্বরূপ (means), কিন্তু, দিব্য-জন্মে ইহা হইতেছে আত্মমায়া, স্বীয় মায়ার দ্বারা; নিম্নতম অবিদ্যা মায়ার মধ্যে বদ্ধ হইযা পড়া নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে স্ব-প্রতিষ্ঠ ভগবানের সজ্ঞানে জাগতিক ব্যাপাবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহার বিদিত। গীতা অন্যত্র ইহাকেই যোগমায়া বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়া দ্বারা নিজেকে নিম্নতম চৈতন্য (lower consciousness) হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, অবিদ্যামায়া, কিন্তু এই একই যোগমায়া আবার আমাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভ করায়, আমরা ভাগবতজ্ঞানে ফিরিয়া আসি, সেই

জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, বিদ্যামায়া দিব্যজন্মে ইহা এইরূপেই কার্য করে— সাধারণত যে সব কার্য অজ্ঞানের বশে করা হয় ইহা সেই সকল কার্যকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত করে।

গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, দিব্যজন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং ইহা মূলত সাধারণ জন্মের বিপরীত (যদিও একই উপায়ের দ্বারা দুইটিই সংঘটিত হইয়া থাকে), কারণ ইহা অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই জন্মগ্রহণ; ইহা শারীরিক ব্যাপার নহে পরন্তু আধ্যাত্ম জন্ম (a soul birth)। আত্মা স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষরূপে নিজের বিবর্তন সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া, অজ্ঞান মেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানে আত্মা প্রকৃতির অধীশ্বররূপেই শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া তাহার ভিতর স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার দ্বারা কর্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে চক্রে ঘূর্ণীয়মান হন না; কারণ এখানে তিনি জ্ঞানের সহিত কর্ম করেন, অধিকাংশের ন্যায় অজ্ঞানের বশে কর্ম করেন না। সকলের মধ্যে যে অধ্যাত্ম পুরুষ গুপ্তভাবে রহিযাছেন এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন, দিব্যজন্মে তিনি সম্মুখে আসিয়া মানবরূপকে ভগবদ্ভাবেই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন। সাধারণ জন্মে ইনি অন্তরালেই ঈশ্বররূপে থাকেন, অন্তরালের সম্মুখে যে বাহ্য চৈতন্য তাহা পরাধীন, স্বাধীন নহে, কারণ সেখানে উহা আংশিক চেতন সত্তা, আত্ম-বিস্মৃত জীব, প্রকৃতির বাহ্য অধীনতায় আপন কর্মে বদ্ধ। অতএব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানবত্বের ভিতর ভাগবতভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশই অবতার*; মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিভূতি অর্জুনকে গুরু এই ভাগবত জীবনের মধ্যে উঠিবার জন্যই আহ্বান করিলেন; তাঁহার সাধারণ মানবোচিত ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞান অতিক্রম করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উঠা সম্ভব নহে। আমাদিগকে নীচে হইতে যাহার বিকাশ করিতে হইবে উপর হইতে তাহার অভিব্যক্তিই অবতার; মানবের যে দিব্যজন্মে আমাদের মত মরজগতের জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভগবানের অবতরণই অবতার; সর্বাঙ্গসুন্দর মানবত্বের ভিতর প্রকটিত এই মনোহর দিব্য আদর্শ ভগবান মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

* অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, যে-রেখা ভাগবতকে মানবীয় স্তব হইতে পৃথক করিতেছে সেই বেখার নীচে ভগবানের নামিয়া আসাই অবতাব।

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণের প্রণালী

মানুষের জন্ম গূঢ় রহস্যময়। আমরা দেখিলাম গীতার মতে ভগবানের মানবরূপে অবতরণ এই রহস্যেরই আর একটা দিক,—অবতারে ভগবান মানবরূপ গ্রহণ করেন, মনুষ্যজন্মও মূলত ভগবানের মানুষরূপ গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক মানুষেরই সনাতন সর্বগত আত্মা ভগবান; এমন কি মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাও ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ,—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ আমরা ভগবানকে খণ্ড-খণ্ড ভাবে বিভক্ত বলিয়া ভাবিতে পারি না; ইহা সেই এক চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, এক বিরাট আনন্দের বিশ্বলীলায় আংশিক আনন্দ, অতএব বিশ্বলীলার মধ্যে সেই অনন্ত অসীম সত্তারই সসীম ও সান্ত সত্তা। এই সসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের বশে মানুষ ভুলিয়া যায় যে, সে ভগবান হইতে আসিয়াছে, এমন কি তাহারই হৃদয়ের মধ্যে গুপ্তভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই মানবচৈতন্যের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন তাঁহাকেও সে ভুলিয়া যায়।

মানুষ অজ্ঞান, কারণ যে প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবানের অনন্ত সত্তা হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে সেই মায়ার ছাপ তাহার অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে এবং তাহার ইন্দ্রিয়সকলের উপরে রহিয়াছে; মায়া তাহাকে ভাগবত সত্তার মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রার ন্যায় খোদিত করিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত গুণসমূহের খাদের দ্বারা তাহার উপর এক কঠিন আবরণ লাগাইয়া দিয়াছে, নিজের ছাপ, পাশবিক মনুষ্যত্বের চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছে; যদিও সেখানে ভগবানের গুপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে, তথাপি তাহা প্রথমে বুঝা যায় না—অনেক কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, আমাদের নিজেদের জীবনের গূঢ় রহস্যে সেই দীক্ষা লাভ না করিলে উহা বস্তুত দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা ভগবদ্‌মুখী মানবের সহিত মর্ত্যমুখী মানবের পার্থক্য হয়। অবতারে, ভাগবতভাবে জাত মানবে, প্রকৃত ধাতুটি আবরণের ভিতর দিয়া দীপ্তিমান হয়। সেখানে প্রকৃতির ছাপ কেবল বাহ্য রূপে, কিন্তু দৃষ্টি অন্তরস্থিত ভগবানের, শক্তি অন্তরস্থিত ভগবানের এবং তাহা গৃহীত মানবীয় প্রকৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া বাহির হয়। সেখানে ভগবানের চিহ্ন (শারীরিক বাহ্যিক চিহ্ন নহে, আধ্যাত্মিক চিহ্ন) স্পষ্ট—যে দেখিতে চায় বা দেখিতে পারে সেই দেখিতে পায়। আসুরিক প্রকৃতির

লোকেরা এই সকল ব্যাপারে সর্বদা অন্ধ, তাহারা শরীরকে দেখে, আত্মাকে দেখে না, বাহিরের সত্তাকে দেখে, ভিতরের সত্তাকে দেখে না, তাহারা শুধু মুখোশটিকে দেখে, ভিতরের পুরুষটিকে দেখিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্যজন্মে বিশ্বগত ভগবানের প্রকৃতি ভাবটাই প্রবল, অবতারের মনুষ্যজন্মে ভাগবত ভাবই প্রবল। একটিতে ভগবানের আংশিক সত্তাকে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার করে, পরিচালিত করে (অবশ্য ভগবান এইরূপ করিতে দেন বলিয়াই করে)। অপরটিতে ভগবানই নিজের অংশ সত্তা ও ইহার প্রকৃতিকে অধিকার করেন, ভাগবতভাবে পরিচালিত করেন। গীতার মতে সাধারণ মানুষ ক্রমবিবর্তনের ফলে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যে ভাগবতভাব লাভ করে তাহা অবতার নহে, ভগবান যখন মানবীয়তার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে নামিয়া আসেন, মানবীয় আকার গ্রহণ করেন, তাহাই অবতার।

তবে, মানুষের এই ঊর্ধ্ব গতিকে, ক্রমবিবর্তনকে, সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতাররূপে নামিয়া আসেন; এইটি গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকাশ সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায় যে, উহা কিরূপ এবং নিজেদিগকে ঐ সত্তায় পরিণত করিবার ভরসা করিতে পারে। অবতারের আরও উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের প্রভাব পৃথিবীতে স্পন্দমান রাখিয়া যাওয়া এবং পার্থিব প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী প্রয়াসকে পরিচালন করিবে এমন অধ্যাত্মশক্তি রাখিয়া যাওয়া। দিব্য মানব কিরূপ তাহার একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেখান অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। অবতারের উদ্দেশ্য একটি ধর্ম দেওয়া, শুধু কোন এক মতবাদ নহে, কিন্তু অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন যাপনের একটা প্রণালী দেওয়া, এমন এক সাধনা দেওয়া যাহার দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আবার মানুষের এই ঊর্ধ্বগতি, এই দেবজন্ম লাভ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত ব্যাপার নহে, কিন্তু জগতে ভগবানের অন্যান্য কার্যের ন্যায় ইহা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণ ইহার লক্ষ্য, অতএব অবতারের উদ্দেশ্য মানবজাতির অগ্রগমনে সাহায্য করা, সকল মহাসন্ধিক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা, যখন নিম্নমুখী শক্তিগুলি খুব প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাদের ধ্বংসসাধন করা, মানুষের প্রকৃতিতে ভগবানের দিকে উঠিবার যে-প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেই মহান ধর্মকে রক্ষা করা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, জগতে যত দূরভবিষ্যতেই হউক স্বর্গরাজ্য (The Kingdom of God) স্থাপনের পথ পরিষ্কার করা, যাঁহারা আলোক ও সিদ্ধি চান (সাধূনাম্) তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করা, যাঁহারা অন্ধকার ও পাপের রাজ্যকেই অটুট রাখিতে যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে পরাজিত করা। অবতারের আগমনের এই সকল উদ্দেশ্য লোকবিদিত। অবতারের কার্য দেখিয়াই সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে চায়, তাহার জন্যই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। কেবল যাঁহারা

আধ্যাত্মিক তাঁহারাই দেখিতে পান, চির-অন্তর্যামী ভগবান যে তাঁহাদেরই মানবীয় দেহ ও মনে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, মানবরূপে এই বাহ্য অবতার তাহারই নিদর্শন, যেন তাঁহারা সেই ভগবানের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারেন এবং ভাগবত-ভাবের দ্বারা অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীস্ট, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে ভগবানের চিরন্তন অবতারের আবির্ভাব-মূলে একই গূঢ় সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যের ভিতরের জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

অবতারের উদ্দেশ্য ইহাই, কিন্তু অবতরণের প্রণালী কি? কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অবতার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, কোন মনুষ্যে দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে তাহাকেই অবতার বলা হয়। এইরূপ ধারণায় কতকটা সত্য আছে। যিনি অবতার তিনি বিভূতিও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরতম ভাগবত সত্তায় মানবরূপী ভগবান, আবার তাঁহার বাহ্য মানবীয় সত্তায় তিনি সেই যুগের নেতা, বৃষ্ণিবংশের মহাপুরুষ। ইহা প্রকৃতির দিক হইতে, কিন্তু আত্মার দিক হইতে নহে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির অনন্ত গুণের (qualities) ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল গুণের শক্তি ও কার্য দেখিয়া ভগবানের প্রকাশের তারতম্য বুঝা যায়। অতএব নির্ব্যক্তিকভাবে ভগবানের বিভূতি হইতেছে তাঁহার গুণের প্রকট শক্তি; উহা জ্ঞান, তেজ, প্রেম, বল ইত্যাদি যে-কোন রূপে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ; আর ব্যক্তিকভাবে, যে প্রাণ-মনোময় আধারের ভিতর দিয়া ভগবানের এই শক্তি প্রকাশিত হয় এবং মহৎ কার্য সম্পাদন করে তাহাই বিভূতি। ভিতরে এইরূপ অসাধারণ ভাগবত গুণের শক্তি এবং বাহিরে তাহার মহান কার্য—ইহাই বিভূতির চিহ্ন। ভাগবত সিদ্ধিলাভের দিকে মানব জাতির প্রচেষ্টায় যিনি নেতা-স্বরূপ তিনিই মানব-বিভূতি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্লাইলের ভাষায় তিনি বীর (hero), তিনি মানুষের মধ্যে ভগবানের একটা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥। ১০।৩৭

"আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং ঋষি-কবিগণের মধ্যে উশনা কবি"—প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশিষ্ট গুণ ও কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইরূপে শক্তির উৎকর্ষ সাধন ভাগবত প্রকাশের প্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। যে-কোন মহাপুরুষ সাধারণ মানবের উপরে উঠেন, তিনি তাহার দ্বারাই মানবসাধারণকে উন্নত করেন; আমাদের ভিতরে যে ভাগবতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমাদের যে ভাগবতভাব লাভের আশা রহিয়াছে

সে বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ভাগবত জ্যোতিরই একটা কিরণ, ভাগবত শক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস।

এইজন্যই মহামনীষী ও বীরপুরুষগণকে দেবতা বলিয়া ভাবিবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে; ভারতবাসীর মনে এরূপ ধারণা সংস্কারগত; তাহারা মহৎ সাধু, গুরু ও ধর্মপ্রচারককে সহজেই ভগবানের অংশ-অবতার বলিয়া মনে করে; দক্ষিণ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের কোন-কোন সাধু মহাপুরুষ বিষ্ণুর প্রতীকাত্মক জীবন্ত অস্ত্র শস্ত্রের অবতার—ইহার গভীর মর্মার্থ রহিয়াছে, কারণ সকল মহাপুরুষই মানবজাতিকে ঊর্ধ্বদিকে লইয়া যাইবার সংগ্রামে জীবন্ত যন্ত্র ও শক্তি। যে সকল আধ্যাত্মিক মতানুসারে ভাগবত সত্তা ও প্রকৃতি এবং মানবীয় সত্তা ও প্রকৃতি এই দুইএর মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, সেই সকল মতে উল্লিখিত ভাব স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। ইহা মানবতার মধ্যে ভাগবতের উপলব্ধি। তথাপি কিন্তু বিভূতি ও অবতার এক নহে; নতুবা অর্জুন, ব্যাস, উশনা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মত অবতার হইতেন, কেবল তাঁহাদের অবতারের ক্ষমতাই কিছু কম হইত। কেবল ভাগবত গুণ থাকিলেই হয় না; ভগবান স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতেছেন, ভিতরে এই জ্ঞান থাকা চাই। গুণসকলের উৎকর্ষ সাধন ভূতগ্রামেরই অংশ, সাধারণ অভিব্যক্তিতেই এইরূপ ঊর্ধ্বগতি হইয়া থাকে। কিন্তু অবতারে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, উপর হইতে দিব্যজন্ম হয়, সনাতন সর্বগত ভগবান কোন বিশেষ মানবীয় রূপের মধ্যে নামিয়া আসেন, আত্মানম্ সৃজামি, এবং তখন কেবল যবনিকার অন্তরালেই যে ভাগবত চৈতন্য থাকে তাহা নহে, বহিঃপ্রকৃতিও সেই চৈতন্যে পূর্ণ থাকে।

অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে, ইহা অধিকতর আধ্যাত্মিক; এই মতানুসারে কোন মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ করান এবং হয় ভগবৎ চৈতন্য কর্তৃক অধিকৃত হন অথবা ভাগবত চৈতন্যের সুযোগ্য আধার বা প্রতিচ্ছায়া হন। কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ সত্যের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত। মানবচৈতন্য বিকশিত ও রূপান্তরিত হইতে-হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষের দিব্যজন্ম, ইহাই মানুষের ঊর্ধ্বগতি—ইহার চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তার লয় হয়। জীব নিজের ব্যষ্টিগত সত্তাকে এক অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তায় ডুবাইয়া দেয়, অথবা এক বিশ্বাতীত সত্তার উচ্চতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; পরমাত্মার সহিত, ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত সে এক হয়, অথবা যেমন কেহ-কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া বলেন যে, জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মই হইয়া যায়, ভগবান হইয়া যায়। গীতা বলিয়াছে বটে যে, জীব ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূতঃ, এবং এইরূপে

পরমেশ্বরের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, গীতা কোথাও বলে নাই, জীব ভগবান বা পুরুষোত্তম হয়, যদিও গীতা বলিয়াছে যে, জীব স্বয়ং নিত্যই ঈশ্বর, ভগবানের অংশ-সত্তা, মমৈবাংশ। কারণ, এই শ্রেষ্ঠ মিলন, এই পরম পরিণতি ঊর্ধ্বগতিরই একটি অংশ মাত্র; সত্য বটে যে, প্রত্যেক জীব দিব্য-জন্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা ভগবানের অবতরণ নহে, অবতার নহে—ইহা বড় জোর বৌদ্ধমতানুযায়ী বুদ্ধত্ব লাভ, জীবের পক্ষে বর্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিয়া এক অনন্ত পরাচৈতন্যে জাগ্রত হওয়া। ইহাতে অবতারের ন্যায় আভ্যন্তরীণ চৈতন্য অথবা অবতারোচিত কর্ম যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এইরূপ ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ভগবানও আমাদের সত্তার মানবীয় অংশে প্রবিষ্ট বা আবির্ভূত হইতে পারেন, নিজেকে মানুষের প্রকৃতি, কর্ম, মন, এমন কি দেহের মধ্যেও ঢালিয়া দিতে পারেন; এবং ইহাকে অন্তত আংশিক অবতার বেশই বলা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে যে, ঈশ্বর হৃদ্দেশে* বাস করেন, কিন্তু তথায় তিনি থাকেন যবনিকা অন্তরালে, যোগমায়াসমাবৃত। কিন্তু ইহার উপরে আরও এক স্থান আছে, তাহা আমাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু তাহা আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত—প্রাচীনেরা ইহাকে স্বর্গ বলিতেন, সেখানে ঈশ্বর ও জীব উভয় মূলত একই সত্তারূপে প্রকাশিত, কোথাও-কোথাও রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র বলা হইয়াছে, ভগবান এবং তাঁহা হইতে আবির্ভূত দিব্য মানব—ঊর্ধ্বের ভাগবত প্রকৃতি (The Virgin Mother),† পরা প্রকৃতি, পরা মায়া হইতে নিম্নতন বা মানবীয় প্রকৃতিতে জাত। ইহাই খ্রীস্টান অবতারবাদের ভিতরের তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়; খ্রীস্টানদের ত্রিসত্তাবাদে (Trinity) পিতা এই আভ্যন্তরীণ স্বর্গ-গামী; পুত্র অথবা পরাপ্রকৃতি গীতার মতানুযায়ী জীব হইয়া ভূতলে নরদেহে দিব্য মানবরূপে অবতীর্ণ; The Holy Spirit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্ম-চৈতন্য, এই আত্মা বা চৈতন্যের দ্বারা পিতা ও পুত্র, ঈশ্বর ও জীব এক হন, এবং এই চৈতন্যের ভিতর দিয়া উভয়ের মধ্যে যোগ হয়; কারণ আমরা শুনি যে, শুদ্ধ আত্মা যীশুর মধ্যে নামিয়া আসিলেন, এবং এইরূপ অবতরণের ফলেই যীশুর শিষ্যগণের সাধারণ মানবত্বের মধ্যেও ঊর্ধ্বের চৈতন্যের ক্ষমতাসকল নামিয়া আসিল।

* এই হৃদ্দেশ বলিতে অবশ্য সূক্ষ্ম দেহের হৃদয়ই বুঝায়, তাহা সমস্ত চিত্তাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিক চৈতন্যের গ্রন্থিস্থান (nodus); সেইখানে জীবপুরুষও অবস্থিত।

† বৌদ্ধ আখ্যায়িকায় বুদ্ধের মাতার যে-নাম তাহাতে এই রূপকটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু পুরুষোত্তমের যে ঊর্ধ্বতর দিব্য চৈতন্য সেইটিও মানবের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে এবং জীবের চৈতন্য তাহাতে লয় হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, মাঝে-মাঝে তাঁহার এইরূপ রূপান্তর হইত। তাঁহার সাধারণ জীবনে তিনি কেবল ঈশ্বরের প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতে দিতেন না; কিন্তু মাঝে-মাঝে তাঁহার দিব্য ভাবান্তর হইত, তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন এবং ভগবানের মত কথা কহিতেন, কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত প্রেম, ভাগবত শক্তি উছলিয়া পড়িত। এইরূপ অবস্থা যদি কাহারও সাধারণ অবস্থা হয়, মানবীয় আধারটি যদি কেবল সর্বদা ভগবানের আবির্ভাব ও ভাগবত চৈতন্যের আধার মাত্র হয়, তাহা হইলে এই মাঝামাঝি মতানুসারে এই অবস্থাকেই অবতার বলা যাইতে পারে; এরূপ অবতার সম্ভব বলিয়া সহজেই মানুষের ধারণা হইতে পারে, কারণ মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে এমনভাবে উন্নত করিতে পারে যে, ভগবান-সত্তার সহিত নিজের সত্তার ঐক্য অনুভব করে, নিজেকে ভগবানের চৈতন্য, জ্যোতি, শক্তি, প্রেমের আধার বলিয়া অনুভব করে, নিজের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বকে ভগবানের ইচ্ছা ও সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে (এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে)—তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই ভাগবত ইচ্ছা, সত্তা, শক্তি, প্রেম, জ্যোতি, চৈতন্য যে মানব-জীবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অধিকার করিবে ইহা একান্ত অসম্ভব কিছু নহে। আর ইহা শুধু মানুষের দিব্যজন্মে ও দিব্যপ্রকৃতিতে উঠা হইবে না, ইহা মানুষের মধ্যে ভাগবত পুরুষের নামিয়া আসা হইবে অবতার হইবে।

যাহা হউক, গীতা কিন্তু আরও অনেক দূরে গিয়াছে। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন: শ্রীকৃষ্ণ নিজের বহু অতীত জন্মের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানকে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারসম্পন্ন মানবের কথাই তিনি বলেন নাই, কিন্তু ভগবানেরই বহু জন্মের কথা বলিয়াছেন, কারণ তিনি এখানে ঠিক সৃষ্টিকর্তার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে যখন জগৎ সৃষ্টির কথা বলিবেন তখন তিনি এই ভাষারই প্রয়োগ করিবেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬

"আমি অজাত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির কার্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করি।" এখানে ঈশ্বর ও মানব-জীবের কোন কথা নাই, স্বর্গীয় পিতা ও তাঁহার পুত্রের,—দিব্য মানবের, কোন কথা নাই, কিন্তু কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির কথা আছে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানব দেহপ্রাণ

মনের মধ্যে নামিয়া আইসেন, এবং এই মানবরূপের মধ্যে ভাগবত চৈতন্য ও ভাগবত শক্তি লইয়া আইসেন, তবে তিনি মানবরূপ, মানব দেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়াই কার্য করিতে স্বীকৃত হন; তিনি অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই দেহের মধ্যে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য সকল সময়েই তিনি উপর হইতে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এইরূপে উপর হইতে সমগ্র প্রকৃতিকে এবং তাহার মধ্যে মানুষকেও পরিচালনা করিয়া থাকেন; ভিতর হইতেও তিনি সর্বদা গুপ্ত থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ও মানুষকে পরিচালনা করিয়া থাকেন; এখানে (অর্থাৎ, অবতারে) প্রভেদ হইতেছে এই যে, তিনি গুপ্ত নহেন, প্রকৃতি এখানে সচেতন যে, তাহার প্রভু স্বয়ং অধিবাসীরূপে উপস্থিত, এবং এখানে ভগবান ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার গোপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, "স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার দ্বারা", প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন না কিন্তু সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। আর এখানে মধ্যস্থরূপে একজন মানুষ থাকিবার কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ এখানে জীবের প্রকৃতিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে পরন্তু নিজের প্রকৃতিকে, স্বাম্ প্রকৃতিম্, অবলম্বন করিয়াই সর্বভূতেশ পরমেশ্বর মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে এরূপ মতে বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার; এবং ইহার কারণও স্পষ্ট, কারণ অবতারের মানবীয়তা, অবতার যে মানুষ তাহা স্পষ্ট ভাবেই লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবতার সকল সময়েই ভাগবতভাব ও মানুষভাব, এই দুইভাব সমন্বিত; ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েন তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বাহ্যিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতাসহ গ্রহণ করেন এবং ইহাদিগকেই ভাগবত চৈতন্য এবং ভাগবত শক্তির উপলক্ষ্য, যন্ত্র, সহায় করিয়া তোলেন, দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের আধার করিয়া তোলেন। কিন্তু এইরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী, নতুবা অবতারের আগমনের যে-উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হয় না; কারণ ঐ উদ্দেশ্য ঠিক ইহাই দেখান যে, মানব-জন্ম ইহার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের সহায় ও যন্ত্র হইতে পারে, মানবচৈতন্য ভাগবতচৈতন্য প্রকাশের মূলত বিরোধী নহে, মানবচৈতন্যকে ভাগবতচৈতন্যের প্রকাশের আধার করা যাইতে পারে, মানব-চৈতন্যের ছাঁচের রূপান্তর সাধন করিয়া এবং ইহার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও বিশুদ্ধ-তার উন্নতি করিয়া ইহাকে ভাগবতচৈতন্যের অনুবর্তী করিয়া তোলা যাইতে পারে; কেমন করিয়া ইহা সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহাও দেখান অবতারের উদ্দেশ্য। অবতার যদি কেবল অলৌকিক ভাবেই কার্য করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কেবল অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত অবতার একটা অর্থহীন অসঙ্গত ব্যাপার। একেবারেই যে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়া

থাকিতে পারিবে না এমন কোন কথা নাই (যীশুখ্রীস্টের রোগ আরোগ্য করিবার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনা যায়), কারণ এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। ইহা অবতারের অপরিহার্য ব্যাপার নহে· আবার, অবতারের জীবন কেবল অলৌকিক আতস বাজি প্রদর্শন হইলেও চলিবে না। অবতার একজন আশ্চর্যকর্মা বাজীকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানবজাতির দিব্য নেতা স্বরূপ, তিনি আসেন দিব্য মানবতার আদর্শ স্বরূপ। এমন কি তাঁহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ কবিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমত, কেমন করিয়া এই দুঃখ-যন্ত্রণাকেই মুক্তির সহায় কবা যাইতে পারে (যীশুখ্রীস্ট এইরূপ করিয়াছিলেন); দ্বিতীয়ত দেখাইতে হইবে যে, কেমন করিয়া ভাগবত-সত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ-যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতেই তাহা জয় করিতে পাবে, বুদ্ধ এইরূপ করিয়াছিলেন। যেসকল তার্কিক খ্রীস্টকে বলিতে পারে—"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস," অথবা, যাহারা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দেয় যে অবতারেরা কখনও ভগবান হইতে পারে না কারণ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে মরণ আবার রোগের দ্বারা হইয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল মরে—তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই। দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্বে দুঃখ ও যন্ত্রণারও অবতার হইতে হইবে। মানুষের অপূর্ণতা গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে হইবে কেমন করিয়া তাহা অতিক্রম করা যায়; এই অতিক্রম কতখানি হইবে এবং কি উপায়ে হইবে, কেবল আন্তরিক হইবে, না বাহ্যিকও হইবে তাহা মানব-জাতির ক্রমোন্নতির অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ইহা কোন অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা সম্পাদন করা চলিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ভগবান কিরূপে মানবদেহ ও মন গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নটিই বাস্তবিক কঠিন, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ইহার কোন কিনারা করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ ও মন সহসা পূর্ণভাবে সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি কোন প্রকার শারীরিক বা আধ্যাত্মিক বা উভয়বিধ বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এটা সত্য যে, অবতারের আবির্ভাব (অন্যদিক হইতে দিব্য-জন্মের ন্যায়ই) মূলত একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার—গীতার ভাষা হইতেই বুঝা যায়, ইহা আত্মার জন্ম, আত্মানম্ সৃজামি; তথাপি ইহার সঙ্গে এখানে শারীরিক জন্মও রহিয়াছে। তাহা হইলে অবতারের এই মানবীয় দেহ ও মন কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল? যদি আমরা ধরিয়া লই যে, অচেতন প্রকৃতি এবং তাহাতে অনুস্যূত প্রাণ-শক্তির বংশানুক্রম বিবর্তনের ফলেই শরীর সকল সময়ে সৃষ্ট হয়, জীবাত্মা ইহাতে কিছু করে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া পড়ে। ভগবানের অবতারের যোগ্য শারীরিক ও মানসিক দেহ কোন উচ্চ বা পবিত্র

বংশে উদ্ভূত হয়; অবতরণকালে ভগবান সেই দেহ অধিকার করেন। কিন্তু গীতা যেখানে অবতারের কথা বলিয়াছে (৪র্থ অধ্যায়, ৫-৮ শ্লোক) সেখানে অকুণ্ঠিত ভাবে অবতারেরও জন্মান্তরের কথা বলিয়াছে (৪-৫), আর সাধারণ জন্মান্তরবাদ অনুসারে জীব জন্মান্তর গ্রহণকালে তাহার অতীত আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিবর্তনের দ্বারা নিজেই নিজের শরীর ও মন ঠিক করিয়া লয়, এক রকম, প্রস্তুত করিয়াই লয়। জীবই নিজের দেহ তৈয়ারী করিয়া নয়; জীবের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া তাহার দেহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, নিত্য ও নিরন্তর এক অবতার নিজেই ক্রমবিবর্তনের দ্বারা পুনঃ-পুনঃ নিজের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দেহের বিকাশ করিয়া লয়েন, এই দেহ কোন যুগে কিরূপ হইবে তাহা সেই যুগের মানব-জাতির প্রয়োজন ও ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে নির্ণয় করেন এবং এইরূপেই তিনি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হন? এইরূপ কোন একভাবেই কেহ-কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—প্রথমে নানা পশুমূর্তি, তাহার পর নরসিংহ মূর্তি, তাহার পর বামন মূর্তি, তাহার পর দুর্ধর্ষ আসুরিক মানব পরশুরাম, তাহার পর দেব-প্রকৃতি মানব মহত্তর রাম, তাহার পর প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক মানব বুদ্ধ; কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্বে কিন্তু স্থান হিসাবে সর্বোচ্চ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ। কল্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আরব্ধ কর্মই সম্পন্ন করেন,—পূর্ব-পূর্ব অবতারেরা মহৎ প্রয়াসের সম্ভাবনাসকল প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, কল্কি তাহাই শক্তিতে সিদ্ধ করেন। বর্তমান যুগের যেরূপ মনোভাব তাহাতে এই সকল বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন, কিন্তু গীতার ভাষা এইরূপেই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। তবে গীতা যখন স্পষ্টভাবে এই সমস্যার সমাধান করে নাই, তখন আমরা আমাদের মনের মতন যেমন হয় সমাধান করিতে পারি; যথা, আমরা বলিতে পারি যে, জীবই (জীবাত্মাই) শরীর প্রস্তুত করে কিন্তু জন্ম হইতেই ভগবান ঐ শরীর গ্রহণ করেন, অথবা গীতায় যে চারি মনুর (চত্বারঃ মনবঃ) কথা বলা হইয়াছে (ইহারা প্রত্যেক মানব মন ও শরীরের আধ্যাত্মিক পিতা) তাহাদের একজনই অবতারে যোগ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু এ-সকল অধ্যাত্ম-রহস্যের (mystic) কথা বর্তমান বুদ্ধিপন্থী লোক এখনও শুনিতে চায় না; কিন্তু যখনই আমরা অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছি তখনই আমরা অধ্যাত্মজগতের কথাই তুলিয়াছি এবং একবার যখন এই কথা তোলা হইয়াছে তখন দৃঢ়তার সহিত ইহার আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

অবতার সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহা বলা হইল। আমরা অবতারের সম্ভাবনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, অবতরণের প্রণালীও সেইরূপভাবে আলোচনা করিলাম, কারণ মানুষের তর্কবুদ্ধি এ সম্বন্ধে যে-সকল

আপত্তি তুলিতে পারে তাহার হিসাব লওয়া এবং তাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। সত্য বটে যে, গীতাতে বাহ্যিক অবতারের (physical avatarhood) স্থান খুব বেশী নহে, তথাপি গীতাশিক্ষার ক্রমপরম্পরায় বাহ্যিক অবতারবাদের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। গীতাশিক্ষার কাঠামোই এই যে অবতার বিভূতিকে, মানবতার উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছে এমন একজন মানবকে, দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। আর ইহাও সত্য যে, মানবাত্মাকে নিজের মধ্যে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত ভগবানের আভ্যন্তরীণ অবতরণই প্রধান ব্যাপার—অন্তরের, ভিতরের খ্রীস্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ লইয়াই কথা। কিন্তু যেমন আভ্যন্তরীণ বিকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক জীবনের সহায়তা সমধিক প্রয়োজনীয় তেমনই ভিতরে এই মহান আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির নিমিত্ত বাহ্যিক অবতারও কম প্রয়োজনীয় নহে। মানসিক ও শারীরিক প্রতীকের পূর্ণ বিকাশের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সত্যবস্তুর বিকাশে সহায়তা হয়; পরে এই আভ্যন্তরীণ বস্তু আরও শক্তির সহিত, নিজের আরও উৎকৃষ্ট রূপে বাহ্যজীবনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে মানসিক ও শারীরিক রূপ আধ্যাত্মিক সত্তার উপর ক্রিয়া করে, আবার আধ্যাত্মিক সত্তা মানসিক ও শারীরিক রূপের উপর ক্রিয়া করে—এই দুইয়ের পরস্পরের-উপর সতত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভগবান কখনও নিজেকে গোপন করিয়া কখনও প্রকট হইয়া মানবতার মধ্যে ভাগবতের বিকাশ সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম

অবতারের জন্মের ন্যায় অবতারের কর্মেরও দুই অর্থ এবং দুই রূপ আছে। ক্রমান্বয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়ম সত্ত্বেও যে দিব্যধর্ম মানবজাতির ভগবদ্‌মুখী প্রয়াসের নিশ্চিত অবনতি প্রতিরোধ করিয়া তৎপরিবর্তে নিশ্চিতভাবে তাহাকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, ভাগবত শক্তি বাহ্যজগতের উপর ক্রিয়া করিয়া সেই ধর্মকে রক্ষা করে, নূতন করিয়া গঠন করিয়া দেয়,—ইহাই অবতারের কর্মের বাহিরের দিক। অবতারের কর্মের একটা ভিতরের দিক আছে; ভাগবতমুখী চৈতন্যের দিব্যশক্তি ব্যক্তির আত্মার উপর ও জাতির আত্মার উপর ক্রিয়া করে, যেন তাহা মানুষের মধ্যে ভাগবতের নব-নব প্রকাশ গ্রহণ করিতে পারে এবং নিজের বিকাশের শক্তিতে বিধৃত, পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সাধারণ কর্মপ্রবণ মানুষ স্বভাবতই মনে করে যে কেবল বাহ্যজগতে একটা মহৎ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তই অবতারের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা ঠিক নহে। বাহ্যিক কর্ম এবং ঘটনার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, তাহাদের পশ্চাতে যে শক্তি ও ভাব থাকে তাহা হইতেই তাহাদের মূল্য।

যে-সন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহা বাহ্যঘটনার এবং জড়জগতে মহাপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ বলিয়াই বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যখন মানব-জাতির চৈতন্যের কোন মহাপরিবর্তন সংসাধন করিতে হয় এবং কোন নূতন বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, মূলত সেই সন্ধিক্ষণেই অবতারের আবির্ভাব হয়। এই পরিবর্তনসাধনের নিমিত্ত একটা দিব্য শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সকল সময়েই এই শক্তি হয় ইহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের অনুযায়ী; এই জন্যই মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ভাগবত-চৈতন্যের আবির্ভাব আবশ্যক। তবে, যখন প্রধানত কেবল মানসিক ও ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তন সংসাধন করিতে হয় তখন অবতারের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় না; তখন চৈতন্যের মহান অভ্যুত্থান হয়, সমুচ্চ শক্তির প্রকাশ হয়, মানুষ তৎকালের নিমিত্ত তাহাদের সাধারণ স্তর হইতে ঊর্ধ্বে উঠে; এবং চৈতন্য ও শক্তির এই অভ্যুদয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে উচ্চসীমায় উঠে; ইঁহারাই বিভূতি, এবং ইঁহাদের নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত সাধারণ কর্মধারাই অভিপ্রেত পরিবর্তনটি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। ইউরোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফরাসী বিপ্লব (French Revolution) ছিল এইরূপই পরিবর্তন; এগুলি মহান আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে,

এগুলি কেবল বুদ্ধি ও কর্মজগতের পরিবর্তন—একটি ধর্ম সম্বন্ধীয়, অপরটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব, রূপ ও আদর্শের পরিবর্তন; ইহাদের ফলে সাধারণ চৈতন্যে যে-পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন নহে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করা উদ্দেশ্য হয় তখন ইহার উদ্ভাবক বা নেতারূপে মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয়। ইহাই অবতার।

গীতায় অবতারের বাহ্যিক কর্ম বলা হইয়াছে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়: যুগে-যুগে যখন ধর্ম মলিন হয়, অবসন্ন হয়, হীনবল হয়, অধর্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে তখন অবতার আবির্ভূত হন এবং ধর্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যেহেতু তখন কর্মের ভিতর দিয়া, মানুষের ভিতর দিয়াই ধর্মাধর্ম প্রকট হয়, তজ্জন্য অবতারের লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয় অধর্মের পীড়নে অভিভূত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক দুষ্কর্মকারীদিগকে বিনাশ করা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

কিন্তু এখানে গীতা যে-ভাষার ব্যবহার করিয়াছে সহজেই তাহার এমন সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যাহাতে অবতারত্বের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম শব্দটির একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—এই সকল অর্থের যে কোন একটি লইয়া এবং অপরগুলি অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, ধর্ম কেবল নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল আধ্যাত্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্মের নীতি, ন্যায্য আচরণের বিধান, অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ধর্মের নৈতিক অর্থ হইতেছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের বিধান; অথবা আরও সংক্ষেপে এই অর্থে ধর্ম হইতেছে কেবল সমাজের অনুশাসন পালন। ধর্মের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সজ্জনগণকে রক্ষা করিতে এবং অসজ্জনকে বিনাশ করিতে, অন্যায় অত্যাচার ধ্বংস করিয়া মানব-সমাজে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন।

এইরূপে পুরাণে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে—কুরুদের

অসৎকর্মের ভার পৃথিবীর পক্ষে এত দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথিবী তাহার ভারের লাঘব করিতে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পান্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্মী কৌরবগণকে বিনাশ করেন। বিষ্ণুর পূর্ব-পূর্ব অবতারের প্রয়োজনও এই-ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—রাবণের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলীর শাসন ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে কেবল নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া পুরাণাদিতে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ বর্ণনায় অবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ধরা হয় নাই, এবং এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত তাহা হইলে খ্রীস্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ মোটেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্য এক নূতন আধ্যাত্মিক বাণী, দিব্য বিকাশ ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির এক অভিনব নীতি। আবার অন্যপক্ষে যদি আমরা ধর্ম শব্দের শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম বলিতে কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্মজীবনের নীতি মাত্র বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল সত্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় দিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা কারণ অবতার জগতের মধ্যে ভগবানের কার্যেরই ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞানেরই অনুসরণ করেন, এবং এই কার্যের সর্বদাই দুইটা দিক, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে মানব সমাজের, মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তনসাধন।

কোন মহান্ আধ্যাত্মিক গুরু ও ত্রাণকর্তারূপে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধরূপে অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পার্থিব প্রকাশকাল শেষ হইবার পরে তাঁহার কর্মের ফলে মানবজাতির কেবল নৈতিক জীবন নহে, সামাজিক এবং বাহ্যিক জীবন ও আদর্শেরও গভীর শক্তিশালী পরিবর্তন সংসাধিত হয়। আবার অন্যপক্ষে তিনি দিব্যজীবন, দিব্যব্যক্তিত্ব, দিব্যশক্তি লইয়া রাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাহ্যত সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সংসাধন করিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ অবতারের ফল সকল সময়েই মানবজাতির আভ্যন্তরীণ জীবনগঠন ও দিব্যজন্মলাভে চিরস্থায়ীভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। বড়ই রহস্যের কথা যে, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টধর্মের স্থায়ী, জীবন্ত, ব্যাপক ফল হইয়াছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এমন কি যেসকল

যুগ ও জাতি এই দুই ধর্মের তত্ত্বকথা, সাধনা ও অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে তাহারাও ইহাদের সামাজিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শে প্রভাবিত হইয়াছে। বুদ্ধ, বুদ্ধের সংঘ এবং ধর্ম পরবর্তী হিন্দু ধর্ম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু হিন্দুর জীবনে, হিন্দুর ধ্যান-ধারণায় বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব যে ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে; আর বর্তমান ইউরোপ নামে খৃস্টান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে খৃস্টধর্মকে বর্জন করিয়াছে, কিন্তু বর্তমান ইউরোপের মানব ধর্ম (humanitarianism) হইতেছে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে খৃস্টধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রয়োগ, আর তাহাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ হইতেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সকল অধ্যাত্মসত্যের প্রয়োগ; বিশেষত যাহারা তীব্রভাবে খৃস্ট ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যে যুক্তিপন্থী যুগ মুক্তিলাভের প্রয়াসে খৃস্ট-ধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই ঐ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে রাম ও কৃষ্ণের যুগের কোন ইতিহাস নাই, কেবল কাব্য ও পুরাণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদের কার্যাবলীর পরিচয় পাই এবং এই সকলকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াও ধরিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের জীবনকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াই ধরি অথবা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ ব্যক্তির ও জাতির আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহাদের দিব্য আদর্শের প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। অবতার দিব্য জীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন বাহ্য কর্ম সম্পাদনেই ইহা প্রকট হইতে পারে, কিন্তু এই কর্ম শেষ হইবার পরও ইহার আধ্যাত্মিক প্রভাব বরাবর থাকিবেই; অথবা ইহা প্রকট হইতে পারে কোন ধর্ম শিক্ষা দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া; কিন্তু এই নূতন ধর্ম বা সাধনার উপযোগিতা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখনও মানব-জাতির চিন্তা, প্রকৃতি ও বাহ্য জীবনে ইহার চিরস্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কর্ম সম্বন্ধে গীতার মত বুঝিতে হইলে ধর্ম শব্দের সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, গভীর এবং ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যে বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভাগবত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে, জাতির জীবনে ইহার পরিবেষ্টন ও পরিণাম সম্পাদন করিয়া দেয়, তাহাকেই ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে ধর্ম বলিতে কেবল সদসৎ কর্মের নীতি, ন্যায়-অন্যায়ের বিধান, নৈতিক অনুশাসন বুঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কর্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এক ভাগবত তত্ত্ব নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেই দিক দিয়া মানুষের সহিত ভগবানের, প্রকৃতির ও অন্যান্য জীবের সকলপ্রকার সম্বন্ধ যে-নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম। আমরা যাহাকে ধরিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুই-ই ধর্ম।* ধর্ম শব্দের প্রাথমিক অর্থ আমাদের প্রকৃতির মূল নীতিকে বুঝায়, ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই অর্থে প্রত্যেক জীব, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সঙ্ঘের স্ব-স্ব ধর্ম আছে। দ্বিতীয়ত আমাদের মধ্যে ভাগবত-প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে; যে-সকল অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ভাগবত-প্রকৃতি আমাদের সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠে তাহাদের নীতিকে ধর্ম বলা যায় এবং ইহাই ধর্ম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আবার, বহির্মুখী চিন্তা ও কর্ম এবং আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে যে-বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভাগবত আদর্শের দিকে আমাদের নিজেদের এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করা হয়, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়, ইহাই ধর্ম শব্দের তৃতীয় অর্থ।

ধর্মকে সাধারণত সনাতন ও অপরিবর্তনশীল বলা হয়; ধর্মের মূল নীতি, আদর্শ এইরূপই বটে, কিন্তু ইহার রূপের পরিবর্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে নাই বা এখনও তাহার মধ্যে বাস করে নাই, কিন্তু সেই আদর্শকে কোনরকমে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার জন্য এবং জীবনে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ক্রমশ তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। এই বিকাশে যাহা কিছু আমাদিগকে দিব্য শুচিতা, উদারতা, জ্যোতি, স্বাধীনতা, তেজ, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য ও সৌন্দর্যে বাড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে সেই সবই ধর্ম, এবং যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিবন্ধক তাহাই অধর্ম, তাহা লইয়া আইসে বিকৃতি ও বিরোধ, অশুচিতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অন্ধকার, দুর্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অনৈক্য; উন্নতির পথে মানুষকে এই সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই অধর্ম ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ধর্মকে পরাভূত করিতে চায়, আমাদিগকে পিছনের দিকে, নীচের দিকে টানে, —অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতে চায়। এই দুইয়ের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে, কখনও ধর্মের শক্তির জয় হইতেছে, কখনও অধর্মের শক্তির জয় হইতেছে। বেদে ইহা দেবাসুর সংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইতেছে, ইহাই জোরোয়াস্ট্রিয়ান (Zoroastrianism) ধর্মে আহুরমাজ্‌দা ও অহির্মানের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্তী ধর্ম-সমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও শয়তান বা ইব্‌লিসের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবের দ্বারাই অবতারের কর্ম নির্ণীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বিধান মত সাধক তাহার মুক্তিপথের বিরোধী ব্যাপারসমূহ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই তিন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইরূপ খ্রীস্টধর্মেও

* ধৃ ধাতু হইতে 'ধর্ম্ম' শব্দের উৎপত্তি এবং ইহাব অর্থ 'ধরা'।

আমরা খ্রীস্টানুযায়ী জীবনযাপনের ধর্ম, চার্চ এবং খ্রীস্ট এই তিনটি দেখিতে পাই। এই তিনটি সকল অবতারেরই কর্মের প্রয়োজনীয় অংগ। তিনি একটি ধর্ম দেন, সাধনার এক ধারা দেন—তাহার সাহায্যে নীচের জীবন হইতে উচ্চ জীবন লাভ করা যায়। কর্ম সম্বন্ধে এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এই ধর্মেরই অংগ—অষ্টাংগমার্গ, অথবা শুদ্ধ প্রেম ও শুচিতার ধর্ম অথবা এইরূপ অন্য কোনভাবে জীবনে ভাগবত ভাবের প্রকাশ। তাহার পর তিনি সংঘের স্থাপনা করেন, তাঁহাকে কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করিয়া ও তাঁহার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহারা একত্রিত হয় তাহাদের মধ্যে সখ্য ও একতা স্থাপন করেন, কারণ মানুষের সকল চেষ্টারই যেমন একটা ব্যষ্টির দিক আছে তেমনই একটা সমষ্টির দিকও আছে এবং যাহারা একই পথের অনুসরণ করে তাহারা স্বভাবতই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য ও একতায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মেও এই তিন আছে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—বৈষ্ণব মতানুযায়ী ভক্তি ও প্রেমের ধর্মই ভাগবত, যাহাদের মধ্যে এই ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সংঘই ভক্ত, যাঁহার সত্তা ও প্রকৃতিতে এই ভাগবত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ পরিণতি সেই পরম প্রেমাস্পদই ভগবান। অবতার এই তৃতীয়টির প্রতিনিধি, অবতারই সেই দিব্যপুরুষ ও সত্তা যিনি সংঘ ও ধর্মের প্রাণ, তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংঘ ও ধর্মকে অনুপ্রাণিত করেন, জীবিত রাখেন এবং মনুষ্যগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে আকৃষ্ট করেন।

গীতায় এই তিনটিই আরও উদার* অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ গীতায় যে ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা বেদান্তমতানুযায়ী সর্বগত ঐক্য—তাহার দ্বারা আত্মা নিজেকে সর্বভূতে এবং নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে দেখে এবং সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া লয়। অতএব, মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া উচ্চ ভাগবতভাবের মধ্যে উত্তোলন করাই এখানে ধর্ম; ঐ ধর্ম সমষ্টিজীবনের ভিত্তিস্বরূপ প্রচলিত নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় বিধান লইয়া আরম্ভ করে এবং উহাকে ব্রাহ্মী চৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করে; গীতার নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, ঈশ্বর-প্রণোদিত মুক্ত নিষ্কাম কর্ম, ভগবৎ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের দ্বারা সকল প্রকৃতি, সকল কর্মকে অনুপ্রাণিত করা, উহাকে দিব্য জীবন, দিব্য চৈতন্যের দিকে লইয়া যাওয়া, এবং ঐ জ্ঞান ও কর্মের পরম শক্তি ও পরিণতিস্বরূপ ভগবদ্ প্রেম। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ভগবানলাভের সাধনার কথা গীতা যেখানে বলিয়াছে, সেইখানেই ভাগবত ভক্তদের সখ্যতা ও পরস্পরকে ভগবানলাভে সহায়তা করার ভাবও আসিয়াছে এবং

* বাস্তবিক পক্ষে গীতার শিক্ষা অনান্য বিশিষ্ট সাধনা ও শিক্ষা অপেক্ষা উদার ও বহুমুখী।

ইহাই সঙ্ঘের ভিত্তি; কিন্তু গীতার শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত সঙ্ঘ হইতেছে সমগ্র মানবজাতি। সমগ্র জগত এই ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেই ভাবেই চলিতেছে—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

সাধক সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিতে, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের সমগ্র জীবন নিজের করিয়া লইতে সাধনা করেন; আর যে মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ সর্বভূতের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সকল মানবজাতির জীবনের মধ্যে বাস করেন, মানবজাতির এক অদ্বিতীয় আত্মার জন্য, সর্বভূতে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাঁহার জন্য জীবনধারণ করেন, লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত, সকলকে সকল পথ এবং সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ভগবানের অভিমুখে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কর্ম করেন; গীতায় অবতার শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি এই অবতারের উপরই সব ঝোঁক দেন নাই, কিন্তু এই অবতার যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের উপরেই ঝোঁক দিয়াছেন, সকল অবতার এই পুরুষোত্তমেরই নরজন্ম, মানুষ যেসকল নাম ও রূপে ভগবানের পূজা করিয়া থাকে সে সব এই পুরুষোত্তমেরই প্রতিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পন্থা অন্যান্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র নহে, অন্যান্য সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। কারণ ভগবানের সর্বব্যাপী সত্তার মধ্যেই সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্মই রহিয়াছে।

এই জগত এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ দুই প্রকারের, ভিতরের যুদ্ধ ও বাহিরের যুদ্ধ। গীতা এই দুই প্রকার যুদ্ধের উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। ভিতরের যুদ্ধে মানুষকে, ব্যক্তিকে, তাহার ভিতরের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহংকারকে বধ করিতে পারিলেই এই যুদ্ধ জয় হয়। কিন্তু মানবসমাজে একটা বাহিরের যুদ্ধও আছে, এখানে ধর্ম-পক্ষ ও অধর্ম-পক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলে। মানুষের মধ্যে যে ভাগবত ভাব, ভাগবত প্রকৃতি আছে এবং যেসকল মনুষ্য এই ভাব ও প্রকৃতির প্রতিনিধি বা সাধক, তাহারা ধর্ম-পক্ষের সহায় হয় এবং দুর্ধর্ষ অহঙ্কারপূর্ণ আসুরিক ও রাক্ষসিক প্রকৃতি ও ঐরূপ প্রকৃতির মনুষ্যসকল অধর্ম-পক্ষের সহায় হয়। এই সংগ্রামের রূপক স্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধের কথায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ; মহাভারতের যে-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রস্বরূপ, তাহাও এই ধর্ম ও অধর্মের যুদ্ধেরই ছবি বলিয়া প্রায়ই বর্ণিত হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরা দেবতার সন্তান, নররূপে দেবশক্তি, তাহারা ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা দানবীয় শক্তির অবতার, অসুর। এই বাহিরের যুদ্ধেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে

সাহায্য করিতে, অসুরগণের, পাপীগণের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া এবং তাহাদের শক্তিকে খর্ব করিয়া উৎপীড়িত ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতার আবির্ভূত হন। যেমন ব্যক্তিগত মানবাত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, তেমনই পৃথিবীতে সমষ্টির মধ্যে স্বর্গরাজ্যকে নিকটতর করিয়া দিতে অবতার আগমন করেন।

অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে যাহারা ইহা হইতে দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ, তাহাদের জ্ঞানের সিদ্ধিপ্রদ শক্তির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে, মদ্ভাবমাগতাঃ; অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, মানুষের এই নীচের প্রকৃতির ঊর্ধ্বে দিব্য প্রকৃতি আনুষের মধ্যেই রহিয়াছে, অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, দিব্য কর্মের স্বরূপ কি—এরূপ কর্ম মুক্ত, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, নির্ব্যক্তিক, সর্বজনীন—ভাগবত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য চরিত্রে মানুষের চিত্ত মন ভরিয়া উঠে এবং তাহার সংকীর্ণ অহমিকা দূর হইয়া যায়, যেন এইরূপে সে ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী সত্তা হইয়া উঠিতে পারে, সংসার হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বে পেঁৗছিতে পারে। তিনি ভাগবত শক্তি ও প্রেম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন যেন তাহারা তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, তাহাদের মানবীয় ভয় কাম ক্রোধাদির দ্বন্দ্ব লইয়াই পড়িয়া না থাকে, যেন এই সব দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ভগবানের শান্তি ও আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারে *। ভগবান কি নাম বা রূপ লইয়া, ভাগবতের কোন ভাব সম্মুখে রাখিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতেও মূলত কিছুই আসিয়া যায় না; কারণ মানুষ আপন আপন স্বভাবানুসারে ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষকালে তাহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে; তিনি যখন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার যে ভাব তাহাদের স্বভাবের অনুযায়ী সেই ভাবের অনুসরণই তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট; মানুষ যে ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভালবাসে, ভগবানে আনন্দ পায়, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে গ্রহণ করেন, ভালবাসেন, তাহাতে আনন্দ পান—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

---

* জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৪।৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপা্তিাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিব্য কর্মী

তাহা হইলে দিব্যজন্ম (এক উর্ধ্বতর চেতনায় আত্মার দিব্যভাবাত্মক জন্ম) লাভ করা এবং দিব্যজন্ম লাভের পূর্বে ইহার উপায় স্বরূপ ও পরে ইহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কর্ম করা—ইহাই গীতাকথিত কর্মযোগের সমগ্র তত্ত্ব। গীতা কর্মের এমন কোন বাহ্য লক্ষণ নির্দেশ করে নাই যাহা বাহ্য দৃষ্টিতেই চিনিতে পারা যায়, সংসারে প্রচলিত সমালোচনায় যাহার বিচার করিতে পাবা যায়; এমন কি মানুষ সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে যে পাপপুণ্যের প্রভেদ করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চায় গীতা ইচ্ছা করিয়াই সে-সব প্রভেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। গীতা দিব্য কর্মের যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়াছে সে-সব হইতেছে অতিশয় গূঢ় ও আভ্যন্তরীণ, যে চিহ্নের দ্বারা দিব্য কর্ম চেনা যায় তাহা অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক, সাধারণ ভালমন্দ, পাপপুণ্য বিচারের অতীত।

আত্মা হইতেই দিব্য কর্মসকল উদ্ভূত হয় এবং কেবল সেই আত্মাব আলোকেই তাহাদিগকে চেনা যাইতে পারে। গীতায় বলা হইয়াছে, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", "কোনটি কর্ম, কোনটিই বা অকর্ম, এ বিষয়ে জ্ঞানীগণও মোহিত ও ভ্রান্ত হন" কারণ তাঁহারা ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক, যৌক্তিক মানদণ্ড লইয়া বিচার করেন বলিয়া বাহ্য দিকটা লইয়াই পার্থক্য করেন, কিন্তু এ বিষয়ের যাহা মূল তত্ত্ব তাহার কোনও সন্ধান পান না।

তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ৪। ১৬—১৭

"আমি তোমাকে সেই কর্মের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অন্যায় কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অকর্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ-সংসারে কর্ম গভীর অরণ্যের মত, গহন।" প্রচলিত ভাব নীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষ হোঁচট খাইতে খাইতে কোনরকমে এই গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে; এই সকল নীতি ও আদর্শ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের ভাব ও আদর্শের মিশ্রণের ফল, এই সবকে লোকে অক্ষর ও সনাতন বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা দেশকালানুগতিক এবং অনিত্য; এই সকল নীতি ও আদর্শের ভিত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া দেখিবার নানারূপ চেষ্টা করা হয়,

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ব্যবহারিক ও অ-যৌক্তিক। জ্ঞানী ব্যক্তি এই সবের মধ্যে কোন স্থায়ী নীতি ও মূল সত্যের উচ্চতম ভিত্তি সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন—সমস্ত কর্ম ও সংসারই কি মিথ্যা, মায়ার ফাঁদ নহে? সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অকর্ম, ইহাই কি ক্লান্ত মোহমুক্ত মানবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল নহে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে. এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, কিন্তু কর্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায়, মুক্তি লাভ করা যায়।

তাহা হইলে এ সমস্যার মীমাংসা কি? কোন প্রকারের কর্ম করিলে আমরা এই জীবনের অশুভ সমূহ হইতে মুক্তি পাইব, এই সংশয়, এই ভ্রম, এই শোক হইতে মুক্তি পাইব, আমাদের শুদ্ধতম মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যেরও মিশ্রিত, অশুদ্ধ, ব্যর্থতাময় পরিণাম হইতে মুক্তি পাইব, এই অসংখ্য প্রকারের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব? ইহার উত্তর এই যে, কোনরূপ বাহ্যিক ভেদ করিবার আবশ্যক নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কর্মও বর্জন করিবার আবশ্যক নাই, আমাদের মানবীয় কর্মের চতুর্দিকে কোন সীমা বা গন্ডী রচনা করিতে হইবে না; পরন্তু সকল কর্মই করা কর্তব্য, তবে ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই সকল কর্ম করিতে হইবে, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অকর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ প্রকৃত পন্থা নহে; যে-ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি বুঝেন যে, এরূপ অকর্মের অবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে অনবরত কর্ম চলিতে থাকে, এই অবস্থা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়ার অধীন। যে-ব্যক্তি শারীরিক কর্ম হইতে বিরত থাকিতে চায়, তাহার এখনও ভ্রম আছে যে, সেই বুঝি কর্ম করে, প্রকৃতি নহে; সে জড়তাকে মুক্তি বলিয়া ভুল করে; সে জানে না যে, যে অবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেখানে ইট পাথর অপেক্ষাও অধিক জড়তা, সেখানেও প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতেছে। আবার অন্যদিকে পূর্ণ কর্মস্রোতের মধ্যেও আত্মা তাহার কর্ম-সকল হইতে মুক্ত, সে কর্তা নহে, কোন কৃত কর্মের দ্বারা বদ্ধ নহে; আর যে-ব্যক্তি আত্মার মুক্তিতে বাস করে, প্রকৃতির গুণের অধীনতায় বাস করে না, কেবল সেই ব্যক্তিই কর্ম হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহাই গীতার নিম্নলিখিত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মাণি চ কর্ম্ম যঃ স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু"—যিনি কর্মের মধ্যে দেখেন কর্ম নাই এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখেন কর্ম চলিতেছে তিনিই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান। গীতার এই বাক্য সাংখ্যকৃত পুরুষ-প্রকৃতির প্রভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, কর্মের মধ্যেও চিরশান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত, আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীলা; প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কর্মস্রোতের মধ্যে যেমন কর্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখায় তাহার মধ্যেও তেমনিই কর্ম করিতেছে। বিচার-বুদ্ধির চরম চেষ্টার

ফলে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি, অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু—যে ভ্রান্ত-চিন্তাশীল ব্যক্তি নিম্নতন বুদ্ধির বাহ্যিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদ সমূহের দ্বারা জীবন ও কর্মের বিচার করিতে চাহে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। অতএব মুক্ত ব্যক্তি কর্মকে ভয় পান না, তিনি সর্বকর্মকারী বৃহৎকর্মী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীনে কর্ম করেন না, পরন্তু আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যোগে ধীরভাবে কর্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ-সকল কর্ম হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃতি নিজ অধীশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারই পরিচালনায় যন্ত্র-স্বরূপ ঐ-সকল কর্ম সম্পাদন করে। এই জ্ঞানের জ্বলন্ত ও পূত অগ্নি-শিখায় তাঁহার সমস্ত কর্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার মনে ঐ-সকল কর্মের দ্বারা কোন দাগ বা বিকৃতি হয় না, সকল কর্মের মধ্যে তাঁহার মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্মল ও পবিত্র থাকে। কর্তৃত্বের অভিমান শূন্য হইয়া, এই মোক্ষদায়ক জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কর্ম করা দিব্যকর্মীর প্রথম লক্ষণ।

বাসনা হইতে মুক্তি দ্বিতীয় লক্ষণ; কারণ যেখানে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের অভিমান বা অহঙ্কার নাই সেখানে বাসনা অসম্ভব; সেখানে বাসনা কোন আহার্য পায় না, অবলম্বন না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। মুক্ত ব্যক্তি বাহ্যত অন্যান্য লোকের মতই সকল প্রকার কর্ম করিতেছেন মনে হয়; বরং তিনি অন্যান্য লোক অপেক্ষা বৃহত্তর কর্ম প্রবলতর সংকল্প ও তেজের সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকেন, কারণ ভগবদিচ্ছার মহতী শক্তি তাঁহার সক্রিয় প্রকৃতির ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু তাঁহার সমুদয় কর্ম ও আরম্ভ নীচের প্রকৃতির বাসনা ও সংকল্প হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ। তিনি তাঁহার কর্মের ফলে সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন; আর যখন কেহ ফলের জন্য কর্ম করে না, কিন্তু সকল কর্মের অধীশ্বর ভগবানের হস্তে কেবল নির্ব্যক্তিক যন্ত্ররূপে কর্ম করে, সেখানে বাসনা কোন স্থান পাইতে পারে না,—এমন কি ভগবানের কার্য সফল করিবার বাসনা বা কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও থাকিতে পারে না, কারণ ফল ভগবানের, ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং ভগবান নিজেই কর্মের কর্তা—ভগবান নিজের যে শক্তিকে কর্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল গৌরব, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের তাহাতে কোন গৌরবই নাই। মুক্ত পুরুষের মানবীয় মন ও আত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিৎ করোতি; যদিও তিনি তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রকৃতি, কার্য-নির্বাহিকা শক্তি, চৈতন্যময়ী ভগবতীই হৃদ্দেশে অবস্থিত ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ঐ কর্ম করেন।

তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে, সফলতার সহিত কর্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য সিদ্ধ হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম করিলে তাহা যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, অতিব্যগ্র মানবীয় ইচ্ছার অস্থির চাঞ্চল্যে কর্ম করিলে তাহা সেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না; গীতা আর এক স্থানে বলিয়াছে যে, যোগই কর্ম করিবার প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কি এই সকল কর্ম ব্যষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক বিরাট বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তি দ্বারা নির্ব্যক্তিকভাবে সম্পাদিত হয়। কর্মযোগী জানেন যে, তাঁহাকে যে-শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা ভগবৎ নির্দিষ্ট ফললাভের উপযোগী হইবে, তাঁহাকে যে-কর্ম করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দিব্য-জ্ঞান তিনি লাভ করিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কর্মে ও লক্ষ্যে ভাগবত প্রজ্ঞার দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে নিয়মিত হইবে—এই ইচ্ছা কর্মীর ব্যক্তিগত বাসনা বা ইচ্ছা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা লাভ ইহার লক্ষ্য নহে, ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এক দিব্য বিজ্ঞানময়ী শক্তির নির্ব্যক্তিক প্রেরণা। এরূপ কর্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে; কিন্তু কর্মযোগী জানেন যে, বাহ্যত যাহাই মনে হউক সমস্ত জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসানের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজের অভিপ্রায় নহে পরন্তু সকল কর্ম ও কর্মফলের নিয়ন্তা সর্বজ্ঞ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখনও বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার অনেক সময়ে বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জুনকে যে-যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জয় সুনিশ্চিত; কিন্তু যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাঁহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধটিই তাঁহার উপস্থিত কর্তব্য বলিয়া অর্জুনকে করিতে দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা নাই; তিনি কোন দ্রব্যই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন না; ভগবানের ইচ্ছা যাহা আনিয়া দেয় তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও দ্রব্যে লোভ করেন না, কাহাকেও ঈর্ষা করেন না; তিনি যাহা পান রাগদ্বেষশূন্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করেন; কোন কিছু হারাইলে তিনি দুঃখ বা শোক করেন না। তাঁহার হৃদয় ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ হইতে তাহারা মুক্ত, বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা বিচলিত হইয়া ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি করে না। তাঁহার কর্ম বাস্তবিকই কেবল শারীরিক, শারীরং কেবলং কর্ম্ম; কারণ বাকী আর যাহা কিছু তাহা ঊর্ধ্ব হইতেই আইসে, মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা

ভগবান পুরুষোত্তমের ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। অতএব তিনি কর্মে ও কর্মের ফলে ঝোঁক দিয়া তাঁহার হৃদয় ও মনে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন না যেগুলিকে আমরা রিপু বা পাপ বলিয়া থাকি। কারণ বাহিরের কর্ম আদৌ পাপ নহে, কিন্তু কর্মীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মন ও হৃদয়ের যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই কর্মের আনুষঙ্গিক বা কারণ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই পাপ; যাহা নির্ব্যক্তিক, আধ্যাত্মিক, তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্, এবং তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্মকেই তাহা নিজস্ব অবিচ্ছেদ্য শুচিতা প্রদান করে। এই আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতা (Spiritual impersonality) দিব্য-কর্মীর তৃতীয় লক্ষণ। অবশ্য যেসকল মানব কতকটা মহত্ত্ব এবং উদারতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অনুভব করেন যে এক নির্ব্যক্তিক শক্তি বা প্রেম বা ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ব্যক্তিগত অহংভাব হইতে মুক্ত নহেন, এবং মাঝে-মাঝে এই অহংভাব খুবই প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে; কারণ তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তাকে নির্ব্যক্তিক সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছেন,—সেখানে ইহা আর তাঁহার নিজের নহে, ভগবান পুরুষোত্তম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সকল সান্ত গুণকে অনন্তভাবে, অবাধে ব্যবহার করিতেছেন এবং কিছুর দ্বারাই বদ্ধ হইতেছেন না। যাঁহার এরূপ মুক্তিলাভ হইয়াছে, তিনি আত্মা হইয়াছেন, তিনি আর শুধু প্রকৃতির গুণসমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন; আর প্রকৃতির কার্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে আভাসটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুর দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা একটা উদার, নমনীয়, বিশ্বব্যাপী সত্তা, তাহা অনন্তের মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমের জীবন্ত প্রতিরূপ।

এই জ্ঞান, এইবাসনাশূন্যতা এবং এই নির্ব্যক্তিকতার ফল হইতেছে আত্মা ও প্রকৃতিতে পূর্ণ সমতা। সমতা দিব্যকর্মীর চতুর্থ লক্ষণ। গীতা বলে, দিব্য-কর্মী সর্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি দ্বন্দ্বাতীত। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি জয়-পরাজয়, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা সবই সমান চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না; কিন্তু শুধু ইহাই নহে, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করেন। সংসারের ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যের মনোভাব যেসকল বাহ্য ভেদাভেদের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, দিব্যকর্মী সে-সকল ভেদাভেদকে তত বড় করিয়া দেখেন না। তিনি এই সকল ভেদাভেদ অস্বীকার করেন না বটে কিন্তু তিনি এই সকলের উপরে। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু নিষ্কাম দিব্য পুরুষের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়ই সমান আদরের, কারণ ইহাদের সংমিশ্রণের দ্বারাই সনাতন শুভের ক্রমবিকাশশীল রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির

কুরুক্ষেত্রে দিব্যজয়ের দিকেই চলিয়াছে—এই যে কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের অধিনায়ক, কর্মসকলের ঈশ্বর, ধর্মের দিশারী ভগবানের সর্বদর্শী দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব হইতেই ঠিক করা আছে। মানুষের সম্মান বা অপমান, প্রশংসা বা নিন্দা দিব্য কর্মীকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্যের একজন মহত্তর স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকর্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ডও আছে; এবং তাঁহার কর্মের প্রেরণা সাংসারিক পুরস্কারের উপর এতটুকুও নির্ভর করে না। ক্ষত্রিয় অর্জুন স্বভাবতই যশ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষ অপবাদকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে ঠিক; কারণ মর্যাদা রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অটুট রাখা তাঁহার ধর্মের অঙ্গ; কিন্তু মুক্তপুরুষ অর্জুনের পক্ষে এ-সব বিষয় গ্রাহ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু জানিতে হইবে যে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন কর্ম দাবি করিতেছেন, ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেই কর্মই করিতে হইবে। এমন কি তিনি পাপ-পুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন; যাহারা অহঙ্কারের প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, রিপুগণের প্রচণ্ড বশ্যতা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে পাপ-পুণ্যের প্রভেদ একান্ত আবশ্যক,—কিন্তু যিনি মুক্ত তিনি এই সকল চেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী প্রবুদ্ধ আত্মার পবিত্রতায় সু-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাঁহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি যে-চূড়ায় উঠিয়া ছেন, যে-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অসৎকর্মে তাহার ক্ষয় নাই বা সৎকর্মে তাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা অহংভাবশূন্য দিব্য প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অপরিবর্তনীয় পবিত্রতা। সেখানে পাপ-পুণ্য বোধের কোন স্থান নাই, কোন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা নাই।

অজ্ঞানের অধীন অর্জুন হৃদয়ের মাঝে ন্যায় ও ধর্মের প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনে-মনে বিচার করিতে পারেন যে, যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে পাপ হইবে কারণ অত্যাচারী শক্তিকে বাড়িতে দিলে দেশের উপর, জাতির উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার হইবে সে-সবের দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িবে; অথবা তিনি হৃদয়ে হিংসা ও নরহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন এবং মনে-মনে বিচার করিতে পারেন যে, সকল অবস্থাতেই রক্তপাত পাপ এবং কিছুতেই ইহার সমর্থন করা যায় না। এই দুই প্রকার মনোভাবই সমান ভাবে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, ইহাদের মধ্যে তাঁহার মনে কোনটির জয় হইবে বা জগৎ কোনটিকে গ্রাহ্য করিবে তাহা অবস্থা কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও শুভকে সমর্থন করিতে অর্জুন কেবল

মর্যাদাবোধ ও হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাতেই নিজেকে বাধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি এই সব বিরোধী আদর্শ ও নীতিকে অতিক্রম করে; তিনি শুধু দেখেন যে, ধর্মের রক্ষা অথবা বিকাশের নিমিত্ত প্রয়োজন বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট কি চাহেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ দ্বেষ তৃপ্ত করিবার নাই, তাঁহার কর্মের এমন কোন চিরনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নাই যাহা বিকাশশীল মানব জাতির ক্রমোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয় অথবা অসীমের ডাককে তুচ্ছ করিয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহার নিজের কোন শত্রু জয় করিবার বা বধ করিবার নাই, তিনি কেবল দেখেন যে, যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহারা বাধাপ্রদানের দ্বারাই নিয়তির গতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ভবিতব্য ও ঘটনাচক্রের দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা বিদ্বেষের কোন স্থান নাই। বাধামাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে-আকাঙ্ক্ষা অসুরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত-পিপাসা রাক্ষসের আছে, তাঁহার ধীরতা, শান্তি এবং সর্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে-সব অসম্ভব। তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতি তাঁহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু হৃদয় স্নায়ু ও রক্তমাংসের শিহরণজনিত যে অনুকম্পা সাধারণত মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবোচিত করুণা তাহা হইতে বিভিন্ন; ইহা হইতেছে মানুষের উপর দিব্য পুরুষের করুণাদৃষ্টি, সকল জীবকেই তিনি নিজের মধ্যে দেখেন। আবার মুক্ত পুরুষ যে শারীরিক জীবনটাকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখেন তাহাও নহে, ইহার উপরে যে আত্মার জীবন আছে সেই দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং এই শরীরের জীবনকে কেবল যন্ত্রমাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু যদি ধর্মের স্রোতে যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্বের শক্তি ও জয়ের উল্লাস নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।

কারণ তিনি সর্বত্র দুইটি জিনিস দেখেন; তিনি দেখেন যে, ভগবান সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনাক্রমে সর্বত্র ভগবানের প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুক্কুরে, অস্পৃশ্য চণ্ডালে, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, উদাসীনে, শত্রুতে এবং বন্ধুতে, শুভ-কারীতে এবং অনিষ্টকারীতে—সর্বত্র তিনি নিজেকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন এবং সকলের প্রতিই তাঁহার অন্তরে সমান দয়া, দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ত কাহাকেও বাহ্যত আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন, আবার কাহাকেও বাহ্যত

যুদ্ধে আক্রমণ করেন—কিন্তু তাঁহার সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় এবং সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার কখনও প্রত্যবায় হয় না। তাঁহার সকল কর্মের মূলে একই অধ্যাত্মনীতি থাকে, পূর্ণতম সমতা, এবং একই কর্মনীতি থাকে—মানবজাতিকে ক্রমশ ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-ইচ্ছার প্রেরণা।

দিব্যকর্মীর আর এক লক্ষণ হইতেছে, পূর্ণ আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি (ইহা দিব্য চৈতন্যেরও মূলতত্ত্ব); ইহার উৎপত্তি স্থায়িত্ব জগতের কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না; এই পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আত্মার চৈতন্যের মূল উপাদান, দিব্য সত্তার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানব তাহার সুখের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে; অতএব তাহার বাসনা আছে; সেই জন্যই তাহার আছে ক্রোধ ও বিক্ষোভ, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক; সেই জন্যই সমস্ত জিনিসকে সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মানদণ্ডে ওজন করে। ইহাদের কোনটিই দিব্য পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না; তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত, নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ; কারণ তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দিব্য স্বস্তি, তাঁহার সুখ, তাঁহার প্রসন্ন জ্যোতি—সবই নিত্য, তাঁহার অন্তরস্থিত, তাঁহার অঙ্গীভূত, আত্মরতিঃ অন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। দিব্য পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুর জন্য নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সে জন্য নহে পরন্তু ঐ সকল বস্তুতে যে আত্মা রহিয়াছে, ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিসের মধ্যে যাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহার অগোচর হইতে পারে না তাহার জন্যই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে-আনন্দ পান সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন কারণ এই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজের আত্মা এক, তিনি সর্বভূতের আত্মার সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদের মধ্যেও যে এক সম-ব্রহ্ম রহিয়াছে সেই ব্রহ্মের সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (৫।২১), সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সুখময় জিনিসের স্পর্শে উল্লসিত হন না বা দুঃখময় জিনিসের স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করেন না; কোন জিনিসের ব্যথা, কোন বন্ধুর দেওয়া বেদনা, শত্রুর আঘাত—কিছুই তাঁহার হৃদয় বা মনের স্থৈর্য নষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার আত্মা স্বভাবত (উপনিষদের ভাষায়) অব্রণম্, ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য। সকল জিনিসেই তাঁহার একই অক্ষয় আনন্দ—

> বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
> স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১

এই সমতা, নির্ব্যক্তিকতা, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি, কর্ম করা-বা-না-করার

ন্যায় বাহ্য ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ত্যাগের প্রভেদের উপর, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগের" প্রভেদের উপর গীতায় পুনঃ-পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ ভিন্ন বাহ্য ত্যাগের কোন মূল্যই নাই, প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীয়টি প্রায় অসম্ভব; আবার যেখানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি আছে সেখানে বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই নাই। বাস্তবিক পক্ষে "ত্যাগ"ই (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) প্রকৃত এবং যথোচিত সন্ন্যাস,

জ্ঞেয় স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫।৩

"যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে; দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এইরূপ ব্যক্তি অনায়াসে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।" দুঃখদায়ক (দুঃখমাপ্তুম্) বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত কর্ম এবং কর্মফল যে সন্ন্যাস করিতে হইবে, ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সন্ন্যাস বাহ্য নহে, আভ্যন্তরীণ; প্রকৃতির তামসিকতায় সমস্ত সমর্পণ করিতে হইবে না, কিন্তু সমস্ত কর্মফল যজ্ঞরূপে পরমেশ্বরকে অর্পণ করিতে হইবে, নির্ব্যক্তিক সত্তার বিরাট শান্তি ও আনন্দের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে,—এই সত্তা হইতে সমস্ত কর্ম উৎপন্ন হইলেও উহার শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করাই প্রকৃত কর্ম-সন্ন্যাস,

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫।১০

"যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া (অথবা ব্রহ্মকে কর্মের আধার বা ভিত্তি করিয়া) কর্ম করেন, জলে কমল পত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫।১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥৫।১২

—অতএব "যোগিগণ প্রথমে শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনাসক্ত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত ব্যক্তি কর্মের ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শান্তি লাভ করেন, কিন্তু যে-ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মে যুক্ত নহেন তিনি কর্মফলে আসক্ত হন এবং বাসনার বশে কর্ম করিয়া বন্ধ হন।" এই প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধি ও শান্তি একবার লাভ করিতে পারিলে দেহী আত্মা তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া এবং সমস্ত কর্ম মনের দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে,

আভ্যন্তরীণভাবে) সন্ন্যাস করিয়া "নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে কর্ম না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান করেন",

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ৫।১৩

কারণ এই আত্মাই সকলের অন্তরস্থিত এক নির্ব্যক্তিক আত্মা, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, "প্রভু", "বিভু", ইনি নির্ব্যক্তিক সত্তায় সংসারের কোন কর্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্তৃত্বভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না; কর্মের সহিত কর্মফলের সংযোগ অর্থাৎ কার্যকারণ শৃঙ্খলও তিনি সৃষ্টি করেন না। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, "স্বভাব", তাহার আত্মবিকাশের মূল শক্তি, সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ৫।১৪

এই সর্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক সত্তা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জীবের অজ্ঞান হইতে, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে, নিজের পরম সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইতে, প্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত জড়িতভাব হইতে সকল পাপপুণ্যের উৎপত্তি; তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান যখন এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে মুক্ত হয়, সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় ভিতরের সত্য আত্মাকে প্রকাশিত করে; তখন সে নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্রসমূহের উপরিস্থিত পরম আত্মা বলিয়া জানিতে পারে। শুদ্ধ, অনন্ত, অবিকার্য, অক্ষর, সে আর বিচলিত হয় না; প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা যে তাহার কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে, তখন আর এ ধারণা থাকে না। নিজেকে সেই নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া, সেও প্রকৃতির বন্ধনে পুনরাবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে,

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৫।১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ৫।১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৫।১৭

অথচ এইরূপ মুক্তিতে তাহার কর্ম করিবার কোন বাধাই হয় না। কেবল তাহার এই জ্ঞান থাকে যে, সে নিজে ক্রিয়াপর নহে, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম করে,

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫।৯

"তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি (নিষ্ক্রিয় নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত) যুক্ত থাকিয়া মনে করেন—'আমি কিছুই করিতেছি না'; তিনি যখন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মোচন ও চক্ষু নিমীলন করেন তখন তিনি এই ধারণা করেন যে, শুধু ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতেছে।" তিনি অক্ষর, অবিকার্য পুরুষের সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় গুণত্রয়ের কবল হইতে ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, ত্রিগুণাতীত; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, রাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন; তাঁহার কর্মে প্রাকৃতিক গুণ সমূহের যে ক্রমান্বয় পরিবর্তন চলে, জ্যোতি ও সুখের, কর্ম ও শক্তির, বিশ্রাম ও জড়িমার যে ছন্দোবদ্ধ লীলা চলে, সে সব তিনি নির্মল শান্তভাবে নিরীক্ষণ করেন। শান্ত আত্মার এই ঊর্ধ্বস্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজের কর্মকে নিরীক্ষণ করা অথচ তাহাতে জড়িত বা বন্ধ না হওয়া, এই ত্রৈগুণাতীত্য দিব্যকর্মীর আর একটি মহৎ চিহ্ন। শুধু এই ভাব হইতে প্রকৃতির অন্ধনিয়মবাদের উৎপত্তি হইতে পারে, পুরুষ সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ও দায়িত্বহীন, এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু, এরূপ মত অসম্পূর্ণ চিন্তার ফল, এই মত গীতা জ্ঞান-দীপ্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণভাবে নিরসন করিয়াছে। গীতার এই মত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি নিজের কার্য নিজেই অন্ধভাবে নির্ণয় করে না; পরম পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে প্রেরণা দেয়; যিনি পূর্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জুন যাঁহার কর্মের মানবীয় যন্ত্র মাত্র, সেই বিশ্বপুরুষ, সেই প্রপঞ্চাতীত ভগবানই প্রকৃতির কর্মের অধীশ্বর। আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়স্বরূপই আমাদিগকে নির্ব্যক্তিক সত্তায় সকল কর্ম অর্পণ করিতে হয়, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সকল কর্ম সর্বভূতমহেশ্বরে, সকলেরই যিনি পরমেশ্বর তাঁহাকে সমর্পণ করা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমাতে তোমার সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস করিয়া, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, "আমি" এবং "আমার" ভাব বর্জন করিয়া, 'বিগতজ্বরঃ' হইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম কর, জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর। ভগবানই সমগ্র কর্মটি উদ্ভাবন করেন, নির্দেশ করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন; যে মানব ব্রহ্মের মধ্যে নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি হন ভগবানের শক্তির শুদ্ধ, নীরব আধার (channel); প্রকৃতিতে আবির্ভূত ঐ শক্তি দিব্য কর্মধারাটি সম্পাদন করে। কেবল এই প্রকারের কর্মই মুক্ত পুরুষের কর্ম, মুক্তস্য কর্ম, কারণ কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে কর্ম

করেন না; এই প্রকারেব কর্ম হয় সিদ্ধ কর্মযোগীর। সে সব কর্ম মুক্ত আত্মা হইতে উত্থিত হয় এবং আত্মাকে কোনরূপ বিকৃত না করিয়াই চলিয়া যায়, ঠিক যেমন গভীর সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়া আবার মিশিয়া যায়,

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪।২৩

ঊনবিংশ অধ্যায়

সমতা

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা, সমতা, আভ্যন্তরীণ স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, সেই হেতু তাহার সকল কর্মে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসারের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে সে যে অবিচলিত শান্তভাব রক্ষা করে, তাহার জন্য ঐগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ব্রহ্মের যে সমতাপূর্ণ অক্ষরভাব, এই শান্তভাব তাহারই প্রতিচ্ছায়া; বিশ্বের বহুর মধ্যে যে অখণ্ড পক্ষপাত-শূন্য একত্ব চিরকাল অনুস্যূত রহিয়াছে, এই শান্তভাব তাহারই। কারণ জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা করিতেছে; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। কারণ জগতের অন্যান্য বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে; কিন্তু জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যেও আমরা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তুসমূহকে পরস্পরের সহিত সুসংবদ্ধ করিয়াই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পারে।

এই জন্যই গীতা কর্মযোগের লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিয়াছে; মুক্ত আত্মা যে মুক্তভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহার সন্ধিস্থল। মুক্তপুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইয়া সংসার হইতে সরিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়াই থাকে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সমতার কোন প্রয়োজন হয় না; কারণ যেসকল বস্তুতে সমতা ও অসমতার দ্বন্দ্ব আছে সে-সকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়ার বহুত্ব, নামরূপ, ভেদ, বৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থার অপর লক্ষণ-গুলিকে এই সমতার ভিতর দিয়াই কার্যে পরিণত করিতে হয়। একমেবা-দ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতের বহু জীব ও বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নির্ব্যক্তিকতাতেই এক অক্ষর আত্মা জগতে তাহার বহু নাম-রূপের বৈচিত্র্যের অতীত; জগতের বিভিন্ন নাম রূপের সহিত ব্যবহারে আত্মার নির্ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হয় সকলের প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া; অবশ্য সকলের সহিত যে একই

প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে—যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহারেরও প্রকারভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই ভিতরের ভাব সম ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯।২৯

তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, তাঁহার ঘৃণাভাজনও কেহ নহে, তাঁহার ভিতরে সকলের প্রতিই সমভাব; তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া, কারণ এরূপ ব্যক্তি ভগবানের সহিত যে-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা, এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পক্ষপাতশূন্য ভগবান তাঁহার সমীপে যে যে-ভাবে আসে তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কাম্যবস্তু আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে -- অসীম আত্মা তাহার নিষ্কামতায় এই টানের অতীত; আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাদিগকে সমান উদাসীন ভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা; আত্মার সেই আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপত অটল অক্ষয়। কারণ, আপনাতেই আত্মার আনন্দ; আর যদি জীবজগতের সম্পর্কের মধ্যেও সে এই আনন্দ পাইতে চায় তাহা হইলে কেবল এই ভাবেই আত্মা তাহার মুক্ত আধ্যাত্মিকতা প্রকট করিতে পারে। আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের স্বভাবত নিত্য চঞ্চল ও অসম ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে এবং ইহাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য, এই আত্মাকে যদি প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্রিয়ার সম্পর্কে আসিতে হয়, মুক্ত পুরুষ যদি নিজের প্রকৃতিকে কোনরূপ কর্ম করিতে দেয় তাহা হইলে সকল কর্ম, সকল ফল, সকল ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ সমভাবের দ্বারাই তাহার ত্রৈগুণাতীত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

সমতা দিব্যকর্মীর লক্ষণও বটে আবার যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পরীক্ষাও বটে। আত্মার মধ্যে যদি অসমতার ভাব থাকে তাহা হইলে বাসনার খেলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মের খেলা, সাধারণ সুখ দুঃখ অথবা চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি সংযুক্ত যে আনন্দ বস্তুত আধ্যাত্মিক নহে পরন্তু মানসিক তৃপ্তি মাত্র, এই সব প্রকৃতির অসম খেলা কিছু-না-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আত্মার অসমতা আছে সেখানে জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি আছে, সর্বব্যাপী সর্বসমন্বয়কারী ব্রহ্মের একত্বে এবং সকল বস্তুর সহিত ঐক্যের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার অভাব আছে। এই সমতার দ্বারাই কর্মযোগী তাহার কর্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত।

গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক; সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। কারণ, হৃদয় মন ও চিত্তের সমতা যে খুবই বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; এই শিক্ষা কেবল যে গীতাতেই আছে তাহা নহে; এই সমতার অবস্থায় আমরা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপরে উঠি। সমতা সকল সময়েই দার্শনিক আদর্শ এবং জ্ঞানীজনোচিত স্বভাব বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। গীতা এই দার্শনিক আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে আরও ঊর্ধ্বদেশে তুলিয়াছে, সেখানে আমরা অধিকতর উদার ও নির্মল বায়ু সেবন করি। ইন্দ্রিয়াকর্ষণের ঘূর্ণী হইতে, বাসনার বিক্ষুব্ধতা হইতে উঠিয়া পরমতম ভগবানেরই দিব্য শান্তি ও আনন্দলাভ করিতে হইলে আত্মাকে যে-অবস্থার মধ্যে দিয়া যাইতে হয় তাহার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে কৃচ্ছ্র বা স্তৈায়িক * সমতা (Stoic poise) ও দার্শনিক বা বিচারলব্ধ সমতা (Philosophic poise)। কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠোর সহিষ্ণুতার দ্বারা যে-আত্মজয় লাভ করা যায় তাহারই উপর স্তৈায়িক সমতার প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক সমতা ইহা অপেক্ষা শান্তিময় সুখময় জ্ঞানলব্ধ আত্মজয়ের উপরেই দার্শনিক সমতার প্রতিষ্ঠা; বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির বিপর্যয় সমূহের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া (উদাসীনবদাসীন) এই সমতা লাভ করা যায়। সর্বদা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকার ভাব, তাঁহার বিধান সর্বদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাব আর এক প্রকারের সমতা, ইহাকে ধর্মভাবের সমতা বা খৃস্টান সমতা বলা যায়। এই তিনটি হইতেছে দিব্য শান্তিলাভের তিনটি ধাপ ও উপায়—বীরোচিত ভাবে সকল কষ্ট সহ্য করা, জ্ঞানের দ্বারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করা, ধর্মভাবের বশে ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া,—"তিতিক্ষা", "উদাসীনতা", "নমঃ" বা "নতি"। গীতা তাহার উদার সমন্বয়ের রীতি অনুসারে এই তিন অবস্থাকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মার উন্নতির উপায়

* গ্রীক Stoic সম্প্রদায়কে নির্দেশ করিতে আমরা "স্তৈায়িক" শব্দই ব্যবহার করিলাম। এই সম্প্রদায়ের মত হইতেছে, সুখদুঃখ বোধ হৃদয়ের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই দুর্বলতাকে পদদলিত করিতে হইবে, মনের জোরে সুখদুঃখকে জয় করিতে হইবে। এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা, ইহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতি সাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে। এরূপ দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক কঠোর প্রেমশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে স্থায়ী উন্নতি নাই। তপস্যায় শক্তি হয় বটে, কিন্তু এই জন্মে যাহা চাপিয়া রাখি, পরজন্মে তাহা সর্বরোধ ভাঙিগয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসে! গীতা বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। গীতা যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে, তাহা স্তৈায়িক সমতার অনেক উপরের জিনিস। গীতার সমতায় হৃদয় শুষ্ক হয় না, গীতার সমতায় ভোগের স্থান আছে, গীতোক্ত সাধনায় সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধভোগ একই পথ। তবে গীতোক্ত সমতালাভের সাধনায় প্রথমাবস্থায় স্তৈায়িক সমতার দ্বারা হয়ত কিছু সাহায্য হইতে পারে, গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। —অনুবাদক।

স্বরূপ ইহাদের মিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই গীতা গভীরতর ভিত্তি, বৃহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর ও ব্যাপকতর সার্থকতা দান করিয়াছে। কারণ গীতা এই তিন অবস্থারই ভিত্তি আত্মার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক সত্তার শক্তি চরিত্রবল অপেক্ষা মহত্তর, মানসিক বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা মহত্তর, হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মহত্তর।

সাধারণ মানবাত্মা তাহার প্রাকৃত জীবনের অভ্যস্ত বিক্ষোভসকলে একটা সুখ পায়; যেহেতু সে এই সুখ পায় এবং যেহেতু এই সুখ পায় বলিয়া সে নীচের প্রকৃতির এই অশান্ত খেলাতে সায় দেয়, সেই জন্যই এই খেলা চিরকাল চলিতে থাকে; কারণ প্রকৃতি তাহার প্রণয়ী ও ভোক্তা পুরুষের সুখের জন্য না হইলে এবং তাহার অনুমতি না পাইলে কোন কর্মই করে না। আমরা এই সত্য ধরিতে পারি না কারণ বাস্তবিক যখন বিপদ আমাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তখন শোক, যন্ত্রণা, অসোয়াস্তি, দুর্ভাগ্য, অকৃতকার্যতা, পরাজয়, নিন্দা, অপমান প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মন সেই আঘাত হইতে পিছাইয়া পড়ে, আবার ইহাদের বিপরীত ও সুখময় বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে সকল প্রকার তৃপ্তি, সৌভাগ্য, আনন্দ, কৃতকার্যতা, জয়, গৌরব, প্রশংসাকে আলিঙ্গন করিয়া লইতে মন আগ্রহের সহিত লাফাইয়া উঠে; কিন্তু আত্মার সংসার-লীলায় যে আনন্দ ইহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। মনের সকল দ্বন্দ্বের পশ্চাতে আত্মার সে আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যোদ্ধা তাহার ক্ষতের বেদনায় কোন শারীরিক সুখ অনুভব করে না, পরাজয়েও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে না; কিন্তু যুদ্ধে তাহার পূর্ণ আনন্দ, যুদ্ধে যে জয়ের আনন্দ আছে তাহার জন্য সে ক্ষত ও পরাজয়ের সম্ভাবনাকেও বরণ করিয়া লয়, এবং এই আশা আশঙ্কার মিশ্রণ যুদ্ধের জন্য তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। এমন কি তাহার ক্ষতের বেদনা স্মরণ করিয়াও সে সুখ ও গৌরব অনুভব করে—ক্ষত যখন সারিয়া যায় তখন এই সুখের অনুভূতি পূর্ণ, ক্ষতের যন্ত্রণাভোগের কালেও অনেক সময় সুখের অনুভূতি থাকে এবং যন্ত্রণাবোধের দ্বারাই সেই সুখ পুষ্ট হয়। পরাজয়ের মধ্যেও তাহার এই সুখ ও গৌরববোধ থাকে যে একজন অধিকতর বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে পশ্চাৎপদ হয় নাই; অথবা যদি সে নীচ প্রকৃতির লোক হয় তবে এই পরাজয়ের ফলে তাহার ভিতরে যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠে তাহার মধ্যেও সে একপ্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপেই আত্মা সংসারের সাধারণ খেলায় আনন্দ গ্রহণ করে।

ব্যথা ও যন্ত্রণার ভয়ে মানুষ বিপদ ও উৎপাত হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, আত্মরক্ষার নীতিকে (জুগুপ্সা) কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ইহাই প্রকৃতির কৌশল—ব্যথা ও যন্ত্রণার প্রতি মনের এই বিরাগের জন্য মানুষ এই রক্ত-মাংসের

ভগ্নপ্রবণ দেহটাকে অযথা ধ্বংসের মধ্যে লইয়া যায় না এবং এইরূপেই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পায়; জীবনের পক্ষে উপকারী স্পর্শ সমূহে মানুষ সুখ পায় এবং এই রাজসিক সুখের লোভ দেখাইয়াই প্রকৃতি মানুষকে জড়তা হইতে তামসিকতা হইতে টানিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষের জয়, দ্বন্দ্ব, বাসনা, কামনার ভিতর দিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লয়। আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্ব ও চেষ্টার মধ্যেই একটা সুখ পায়, এমন কি বিপদ, যন্ত্রণাতেও একপ্রকার সুখ পায়—অতীতের স্মৃতিতে সে সুখ খুবই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান বিপদ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সে সুখবোধ পিছনে থাকে এবং অনেক সময় সম্মুখে আসিয়া বিপদগ্রস্ত মনুষ্যের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে ধৈর্য আনিয়া দেয়; কিন্তু সংসারের যে সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত খেলাকে আমরা জীবন বলি তাহার সমগ্রটির দ্বারাই বাস্তবিক পক্ষে আত্মা আকৃষ্ট হয়, জীবনের সমস্ত চেষ্টা ও বাসনা, রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমাদের রাজসিক বাসনাময় আত্মার কাছে একঘেয়ে সুখ ভাল লাগে না; বিনাযুদ্ধে যে-জয়লাভ, যে-সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখের ছায়া নাই, এই সবে রাজসিক আত্মা বেশীদিন তৃপ্তি অনুভব করে না, শীঘ্রই এ সব অরুচি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে; পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ করা এরূপ আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ এরূপ আত্মা যে-সুখ চায় ও উপভোগ করে তাহার স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—তাহার বিপরীত দুঃখ দর্শনের উপরেই সেই সুখ নির্ভর করে—বিপরীত দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ না করিলে সে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আমাদের মন যে জীবনলীলায় সুখ পায় তাহার গূঢ় রহস্য এই যে, আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্বের খেলায় একপ্রকার আনন্দ অনুভব করে।

মনকে যদি বলা যায় যে, এই সব দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া শুদ্ধ আনন্দময় আত্মার অমিশ্র সুখের মধ্যে উঠিতে হইবে, তাহার সকল দ্বন্দ্বে এই শুদ্ধ আত্মাই তাহাকে শক্তি দিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব সম্ভব করিয়াছে—তাহা হইলে মন তৎক্ষণাৎ সে আহবান হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সে এরূপ শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; আর যদিই বা বিশ্বাস করে, তথাপি মনে করে যে, সেইরূপ উচ্চ অবস্থায় জীবন নাই, সংসারে সে যে বৈচিত্র্যময় খেলার রস পাইয়াছে ঐ উচ্চের অবস্থায় সেই রস নাই; সে-অবস্থা আস্বাদহীন, অরুচিকর। অথবা সে অনুভব করে যে, ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না; উপরে উঠিবার চেষ্টা হইতে সে পশ্চাৎপদ হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে বাসনাময় আত্মা যেসকল আশার স্বপ্ন দেখে সেসব সফল করা অপেক্ষা এই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন

সাধন মোটেই কঠিন নহে, অথবা এরূপ আত্মা তাহার বাসনার তৃপ্তির জন্য অস্থায়ী জিনিসের পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ধাবমান হইয়া যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাহা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তাহার অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ এই যে, সে যে-অবস্থায় রহিয়াছে সে-অবস্থা ছাড়াইয়া তাহাকে এমন এক উচ্চতর, শুদ্ধতর অবস্থায় উঠিতে বলা হইতেছে যেখানকার আনন্দের স্বরূপ সে বুঝে না, কিন্তু তাহার নীচের অশুদ্ধ প্রকৃতির যে-আনন্দ সেইটির সহিতই সে পরিচিত, কেবল সেইটিকেই সে বেশ বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে। এই নীচের অবস্থাতে যে-আনন্দ তাহাও যে একেবারে দোষের বা অলাভের তাহা নহে; আমাদের জড় সত্তা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, মানুষকে যে স্তরে-স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই ঊর্ধ্বগমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই "মধ্যমা গতিঃ" বলা হইয়াছে; কিন্তু আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের ঊর্ধ্বগমন, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক সত্তা ও স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণসিদ্ধি লাভের পন্থা।

নীচের প্রকৃতির বিক্ষোভসকল হইতে উপরে উঠিতে হইলে আমাদিগকে সমতার দিকেই যাইতে হইবে—মনের সমতা, ভাবের সমতা, আত্মার সমতা—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। তবে মনে রাখা উচিত যে, যদিও শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে নীচের প্রকৃতির তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে তথাপি প্রথম-প্রথম আমাদিগকে এই তিন গুণের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সমতার আরম্ভ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে অথবা তামসিক হইতে পারে; কারণ মানবচরিত্রে তামসিক সমতারও সম্ভাবনা আছে। এই সমতা খাঁটি তামসিক হইতে পারে, প্রকৃতিগত জড়তার বশে জীবনের আনন্দ উপভোগে অনিচ্ছা, সংসারের সুখদুঃখের আঘাতে অসাড়তা, ইহা খাঁটি তামসিক সমতার লক্ষণ। আবার, কামনা উপভোগের সঞ্চিত ক্লান্তি হইতে সমতা আসিতে পারে, অথবা সংসার-যুদ্ধে নিরাশ ও পরাভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি বিরাগ আসিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে অবসাদ, ভয় বা আতঙ্ক আসিতে পারে; এরূপ ভাব মিশ্রিত-ভাব, রজোতামসিক, তবে ইহার মধ্যে নিম্নতর গুণ তামসিকতাই প্রবল। আবার তামসিক প্রকৃতির মধ্যে কিছু সাত্ত্বিক ভাবের দিকে ঝোঁক থাকিতে পারে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে জীবনের বাসনাসমূহের তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না, আত্মার

এমন শক্তি নাই যে সংসারকে জয় করিতে পারে, সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় ও অনিত্য, এখানে কোন সত্য নাই, স্বস্তি নাই, আলোক নাই, সুখ নাই; এইরূপ ভাবকে সত্ত্বতামসিক সমতা বলা যাইতে পারে; ইহা প্রকৃতপক্ষে সমতা নয়, ইহা একপ্রকার উদাসীনতা, সবই সমান ভাবে পরিত্যাগ করা—তবে এরূপ ভাব হইতে প্রকৃত সমতা আসিতে পারে। বস্তুত তামসিক সমতা প্রকৃতির আত্ম-রক্ষণ নীতি, জুগুপ্সা নীতিরই প্রসারণ; এই নীতির বশে বিশেষ-বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হইতে লোক স্বভাবত সরিয়া থাকিতে চায়; কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে যখন লোকে সমস্ত প্রাকৃতিক জীবনকেই দুঃখময় ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, বা আত্মা যে-আনন্দ চায় সংসারে সে-আনন্দ নাই, তাহার পরিবর্তে শুধু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে, এইরূপ মনোভাবে যে-সমতা তাহাই তামসিক সমতা।

কেবলমাত্র তামসিক সমতাতেই প্রকৃত মুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতির উপরে অবস্থিত অক্ষর আত্মার মহত্তর সত্তা, সত্যতর শক্তি, উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধি করিয়া এই তামসিক সমতাকে যদি সাত্ত্বিক সমতাতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরম্ভ হিসাবে এইরূপ সমতার শক্তি খুব; ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম (Indian asceticism) এই মার্গই অবলম্বন করে। তবে এই ভাবেব স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে সন্ন্যাসেব দিকে, সংসার ও কর্ম পরিত্যাগ করিবাব দিকে, কিন্তু গীতা যে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছে সে-দিকে ইহার ঝোঁক নহে। গীতা এরূপ তামসিক সমতাকেও স্থান দিয়াছে; সংসারের দোষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি গীতায় আছে, জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (১৩।৮); এই পথে বুদ্ধের সাধনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ; জরা ও মরণ হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশেই যাহারা আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে চায় গীতায় তাহাদের পন্থা পরিত্যক্ত হয় নাই, জরামরণ-মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে (৭।২৯)। তবে ইহা হইতে প্রকৃত কোন ফল লাভ করিতে হইলে এই সঙ্গে এক উচ্চতর অবস্থায় সাত্ত্বিক উপলব্ধি চাই, এবং ভগবানে আনন্দ ও আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, মাম্ আশ্রিত্য। তখন এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

আত্মা গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব উপভোগ করে। বস্তুত সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিতে যে শুধু তামসিক অনিচ্ছা তাহা মানুষকে অধো-গামী ও দুর্বলই করিয়া দেয়, এবং নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও সংসার-

বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া এইজন্যই বিপজ্জনক যে, এরূপ শিক্ষার ফলে অযোগ্য আত্মায় তামসিক দুর্বলতা ও তামসিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, "বুদ্ধিভেদম্ জনয়েৎ", উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন আত্মার হয় নাই তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার নিমিত্ত, আত্মার কল্যাণেরই নিমিত্ত যে রাজসিক চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব প্রয়োজন তাহা দমাইয়া দেওয়া হয়, জীবনের প্রতি ভালবাসা, ধৃতি ও উৎসাহ কমাইয়া দিয়া আত্মার অনিষ্টই করা হয়। কিন্তু যেসকল আত্মা যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ তামসিক বৈরাগ্য উপকারী হইতে পারে; তাহাদের যে রাজসিক বাসনা ও নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাহাদের সাত্ত্বিক উচ্চজীবন লাভের অন্তরায় এই তামসিক বৈরাগ্য দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বৈরাগ্যেব দ্বারা তাহারা জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় একটা আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া তাহারা ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—"এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে কে রহিয়াছ, এস, আমাতে আনন্দ গ্রহণ কর।"

তথাপি এই সমতা সংসারের সকল জিনিসেরই প্রতি সমান বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার ফল হয় উপেক্ষা ও উদাসীনতা, কিন্তু ইহার মধ্যে সে-শক্তি নাই যাহার দ্বারা সংসারের সকল প্রকাব সুখ ও দুঃখের স্পর্শ সমানভাবে অনাসক্তি ও নির্বিকারতার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এইটি হইতেছে গীতোক্ত সাধনার আবশ্যকীয় অংগ। অতএব তামসিক বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই, আর যদিও আমরা ইহা লইয়া আরম্ভ করি, সেটা শুধু উচ্চতর সাধনায় আমাদিগকে প্রথমে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কিন্তু চিরকাল বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য নহে। আমরা প্রথমে যেসকল জিনিস হইতে পলাইয়া যাইতে চাই, যখন সেসকল জিনিসকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিব তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হইবে। এইখানেই একপ্রকার রাজসিক সমতার সম্ভাবনা আছে; চিত্তবিক্ষোভ ও দুর্বলতার উপরে উঠিতে, আত্মসংযম আত্মজয় করিতে শক্তিশালী লোক যে-গর্ব অনুভব করে তাহা এই রাজসিক সমতার নিম্নতম অবস্থা; এই মনোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ইহাকে মূল সূত্ররূপে ধরিয়া নীচের প্রকৃতির সকল দুর্বলতার বশ্যতা হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার যে-সাধনা তাহাই স্তোয়িক আদর্শ (stoic ideal)। তামসিক অন্তর্মুখী বৈরাগ্য যেমন প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতির, জুগুপ্সানীতির প্রসারণ, রাজসিক ঊর্ধ্বমুখী সাধনাও তেমনি প্রকৃতির যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের নীতির, প্রভুত্ব ও জয়ের দিকে জীবনের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির প্রসারণ; তবে কেবলমাত্র যে-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জয় সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ লইয়া যাওয়া হয়। সাধক

নানা বিক্ষিপ্ত বাহ্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে এবং সাময়িক সাফল্য ও জয়লাভ করিতে চেষ্টা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তর্জয়ের দ্বারা একেবারে প্রকৃতিকে এবং জগৎকে জয় করিতে চায়। তামসিক বৈরাগ্য সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয় হইতেই সরিয়া পলাইতে চায়; রাজসিক সাধনা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সহ্য করিতে, জয় করিতে, তাহাদের উপরে উঠিতে চায়। মহাভারতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ ভীমকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিই স্তোয়িক সাধনা কুস্তিগীরের ন্যায় বাসনা ও রিপুগণকে আলিঙ্গনের ভিতরে লইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। যে-সকল সুখের বা দুঃখের জিনিস শরীর ও মনের চাঞ্চল্যের কারণ, স্তোয়িক সাধক তাহাদের আঘাত সহ্য করিয়া তাহাদের ফল ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সাধনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আত্মা কিছুতেই ক্লিষ্ট বা আকৃষ্ট না হইয়া, কোনরূপ উত্তেজিত বা ব্যথিত না হইয়া সকল প্রকার বাহ্যস্পর্শ সহ্য করিতে পারে। এই সাধনা চায় যে, মানুষ তাহার প্রকৃতিকে জয় করুক, তাহার প্রকৃতির রাজা হউক।

গীতা অর্জুনের ক্ষাত্র স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এই বীরোচিত সাধনার কথাই প্রথমে বলিয়াছে। তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে—পরম শত্রু কামনাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে। গীতা সমতার যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা স্তোয়িক দার্শনিকেরই সমতা,

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২। ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২। ৫৭

"যাঁহার মন দুঃখের মাঝে অবিচলিত এবং সুখের মাঝে স্পৃহাশূন্য, যাঁহা হইতে আসক্তি ও ক্রোধ ও ভয় দূর হইয়াছে, সেইরূপ মুনিকেই স্থিতধী বলা হয়। যিনি সর্ববিষয়ে স্নেহশূন্য, কোন শুভ বা কোন অশুভ আসিলে যিনি আনন্দিত হন না বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।" গীতা একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে, যদি কেহ আহার করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, "রস", তাহা থাকিয়াই যায়; কেবল যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয় বাহ্য-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না, আস্বাদ-সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, শুধু তখনই হয় আত্মার উচ্চতম অবস্থা। রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত, আত্মবশীভূত মানসিক ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়ের উপর বিচরণ করিয়াই আত্মার ও প্রকৃতির উদার ও মধুর স্বচ্ছতা লাভ হয়, সেখানে শোক বা দুঃখের কোন স্থান নাই,

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। ২। ৬৫

যেমন নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ বাসনাসমূহ আত্মায় প্রবেশ করিবে অথচ আত্মা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না; এইরূপে অবশেষে সমস্ত বাসনা বর্জন করা যায়। ক্রোধ ও বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হওয়া, ভয় আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া যে-মুক্ত অবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা পুনঃ-পুনঃ বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদিগকে এই সকলের বেগ সহ্য করিতে শিখিতেই হইবে, কিন্তু ইহাদের কারণের সম্মুখীন না হইলে তাহা সম্ভব হয় না,

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ৫। ২৩

"এই সংসারে, এই দেহেই যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সুখী।" ইহার উপায় হইতেছে 'তিতিক্ষা'—সহ্য করিবার সঙ্কল্প ও শক্তি,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২।১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২। ১৫

"বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখের কারণ, এই সকল স্পর্শ আসে যায়, অনিত্য, ইহাদিগকে সহ্য করিতে শিক্ষা কর। কারণ যে ব্যক্তি এই সকল বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যে ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান, তিনি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন।" যাঁহার আত্মা সমভাবাপন্ন (equal-souled) তিনি দুঃখভোগ করেন কিন্তু ঘৃণা করেন না, তিনি সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমন কি সহিষ্ণুতা দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে এবং ইহাও স্তোয়িক সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত উপেক্ষার দ্বারা জয় করিতে হইবে*। নীচের খেলায় প্রকৃতির ছদ্মবেশসকল দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু সে-সবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষসিংহের (পুরুষর্ষভ) সত্য সহজাত প্রেরণা। এইরূপে

* গীতা বলিয়াছে, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি; তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহা দ্বারা ব্যথিত হন না, বিচলিত হন না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। তথাপি তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়, কেবল জয় করিবার জন্যই, জয়ামরণমোক্ষায় যতন্তি।

বাধ্য হইয়া প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ দূর করিয়া দেয়, পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে যে, সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট, সম্রাট।

কিন্তু গীতা এই স্তোয়িক (stoic) সাধনা, এই বীরোচিত আদর্শ শুধু সেই শর্তে স্বীকার করিয়াছে যে-শর্তে গীতা তামসিক বৈরাগ্যও স্বীকাব করিয়াছে—ইহার উপরে থাকা চাই জ্ঞানের সাত্ত্বিক দৃষ্টি, ইহার মূলে থাকা চাই আত্মস্বরূপ লাভের লক্ষ্য এবং ইহার গতি হওয়া চাই ঊর্ধ্বে দিব্যজীবন লাভের দিকে। যে স্তোয়িক সাধনা কেবল মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমল-বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহা তামসিক ক্লান্তি, নিষ্ফল বিষাদ এবং বন্ধ্যা জড়তা হইতে কম বিপজ্জনক বটে কিন্তু তাহা একেবারে অমিশ্র নহে কারণ, তাহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি না আসিয়া কেবল হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা আসিতে পারে। গীতার সাধনায় স্তোয়িক সমতা সমর্থিত হইয়াছে শুধু এইজন্য যে, এইরূপ সমতার সহিত আত্মাব অক্ষরা-বস্থার একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ সমতার সাহায্যে সেই মুক্ত অক্ষর আত্মার স্বরূপ বুঝিবার (পরং দৃষ্টবা) এবং সেই নূতন আত্ম-জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিবার (এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ) সহায়তা হইতে পারে,

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধবা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৩।৪৩

"বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং এই দুর্নিবাব শত্রু কামকে বিনাশ কর।" সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভই যখন লক্ষ্য শুধু তখনই তাহার সহায়স্বরূপ তামসিক বৈরাগ্য বা রাজসিক দ্বন্দ্ব ও জয়ের সার্থকতা আছে, নতুবা তাহাদিগকে সমর্থন করা যায় না।

দার্শনিক, মনীষী, জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল নিজের আদর্শ সমর্থনের জন্যই সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সাত্ত্বি-কতার সাহায্যে আত্মজয়ের সাধনা করেন। সাত্ত্বিক সমতা হইতেই তাঁহাব সাধনা আরম্ভ। তিনিও লক্ষ্য করেন যে, বাহ্য ও জড় জগৎ অনিত্য, তাহা হইতে বাসনার তৃপ্তি হয় না, বা প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে শোক ভয় বা নিরাশার উদয় হয় না। তিনি শান্ত বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সব দেখেন এবং দ্বেষ বা মোহের বশীভূত না হইয়া নিজের অভীষ্ট নির্ণয় করেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

"বস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে সকল ভোগসুখ উৎপন্ন হয় সে সকল পরিণামে

দুঃখের কারণ; তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব যিনি জ্ঞানী, যাঁহার বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে (বুধঃ) তিনি সে সকল ভোগে আনন্দলাভ করেন না। তাঁহার আত্মা বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয় না, তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান।"

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। ৫।২১

তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজেব বন্ধু, আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ, অতএব তিনি নিজেব প্রভুত্ব বর্জন করিয়া নিজেকে কাম-ক্রোধাদির হস্তে ছাড়িয়া দেন না, নাত্মানমবসাদয়েৎ, কিন্তু নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে কাম-ক্রোধাদির বশ্যতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং; কারণ যিনি নিজের নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পান যে, তাঁহার ঊর্ধ্বতন আত্মার মত তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় আর কেহ নাই, বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ (৬।৬)। তিনি হন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক সমতার দ্বারা যোগী *, তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে, মান-অপমানে সমভাবাপন্ন ও প্রশান্ত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬।৮

শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব, কারণ তিনি দেখেন যে, এই সকল সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনের চির-পরিবর্তনশীল অবস্থা হইতে এই সকল সম্বন্ধের উৎপত্তি। এমন কি মানুষ বিদ্যার, শুচিতার, পুণ্যের দাবি করিয়া যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ বিচার করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতেও বিভ্রান্ত হন না। সাধু ও অসাধুর প্রতি, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং পতিত চণ্ডালের প্রতি—সকলের প্রতিই তিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন। গীতা এইরূপে সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনা করিয়াছে; বিজ্ঞ ব্যক্তির যে শান্ত জ্ঞান-সম্মত সমতার সহিত জগৎ পরিচিত, গীতার এই সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনায় তাহার সারটুকু সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই সমতা এবং গীতা যে উদারতর সমতার শিক্ষা দিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বিচার বিতর্কের দ্বারা যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার সহিত আধ্যাত্মিক বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের যে প্রভেদ, এই দুই সমতার মধ্যেও সেই প্রভেদ; এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরে, বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের উপরেই গীতা শিক্ষার ভিত্তি। দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধারণ মন বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া ভিতরে সমভাব রক্ষা করেন;

* কারণ সমতাই যোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)।

কিন্তু শুধু সমতার এইরূপ ভিত্তি মোটেই দৃঢ় নহে। কারণ যদিও দার্শনিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অথবা মনের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে বশে রাখেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁহার নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত নহেন, নানাদিক দিয়া নানাভাবে এই নীচের প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান ও দমন করা হইয়াছে বলিয়া সেই প্রকৃতি যে কোন মুহূর্তে সুযোগ পাইয়া ভীষণ প্রতিশোধ লইতে পারে। কারণ নীচের প্রকৃতির খেলা সকল সময়েই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব, রজঃ তমের খেলা, এবং সাত্ত্বিক মনুষ্যকে কবলিত করিবার জন্য রজঃ ও তমঃ সতত ওৎ পাতিয়া থাকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২। ৬০

"সিদ্ধিলাভে যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও প্রবল বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্বক হরণ করে।" সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণের উপরে, বুদ্ধির উপরে (বুদ্ধেঃ পরং) যে আত্মপুরুষ রহিয়াছে তাহার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় কিছুই নাই—ঐ আত্মপুরুষ দার্শনিকের মনোময় পুরুষ নহে কিন্তু দিব্য ঋষির বিজ্ঞানময় পুরুষ; উহা গুণত্রয়ের অতীত। সকল সাধনার উদ্‌যাপন করিতে হইবে উর্ধ্বের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্য জন্ম লাভ করিয়া।

দার্শনিক জ্ঞানীর যে সমতা তাহা স্তোয়িক সাধকের সমতার ন্যায়, বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সমতার ন্যায়ই মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে নিজের মধ্যেই নিজে থাকার নির্জন সমতা; কিন্তু যে ব্যক্তি দিব্য জন্ম লাভ করিয়াছেন তিনি শুধু নিজের মধ্যেই নহে, পরন্তু সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সমতা সহানুভূতি ও ঐক্যে পরিপূর্ণ। তিনি সকলকে নিজের সহিত অভিন্ন দেখেন এবং নিজের একক মুক্তির জন্য মোটেই ব্যগ্র নহেন; বরং তিনি অপরের সুখ-দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লন, যদিও তিনি নিজে সে সুখ-দুঃখের দ্বারা বিচলিত বা বশীভূত হন না। গীতা একাধিকবার বলিয়াছে যে, সিদ্ধ জ্ঞানী সর্বদা উদার সমতার সহিত সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, এইরূপ হিতসাধনেই তিনি কাজ পান, আনন্দ পান, সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ। পরম সিদ্ধ যোগী কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বাস করিয়া নির্জনে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না, পরন্তু তিনি যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের মধ্যেই যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য, তিনি সর্বকর্মকারী, সর্ব্বতোমুখী কর্ম্ম। কারণ তিনি যেমন একজন ঋষি, একজন যোগী, তেমনিই আবার তিনি একজন ভক্ত, একজন ভাগবত প্রেমিক—প্রেমিক তিনি, যিনি ভগবানকে যেখানে দেখেন সেইখানেই ভালবাসেন এবং

তিনি সর্বত্রই ভগবানকে দেখিতে পান; আবার, তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে সেবা করিতে তিনি বিমুখ হন না; তাঁহার কর্ম তাঁহাকে মিলনসুখ হইতেও বঞ্চিত করে না, কারণ তাঁহার সকল কর্ম তাঁহার হৃদিস্থিত ভগবান হইতেই উত্থিত হয় এবং সর্বভূতে যে এক ভগবান বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশে সম্পাদিত হয়। গীতার সমতা উচ্চ, উদার সমতা, এই সমতায় সবই ভাগবত সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির একত্বের মধ্যে উত্তোলিত হয়।

বিংশ অধ্যায়

সমতা ও জ্ঞান

গীতার শিক্ষার এই গোড়ার দিকে যোগ ও জ্ঞান আত্মার ঊর্ধ্বগমনের দুই পক্ষ স্বরূপ। বাসনাশূন্য হইয়া, সকল বস্তু ও সকল লোকের প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ যে দিব্যকর্ম করা যায় সেই কর্মের ভিতর দিয়া মিলনই যোগ, আর যাহা এই বাসনাশূন্যতা, এই সমতা, এই যজ্ঞশক্তির ভিত্তি তাহাই জ্ঞান। বস্তুত এই দুই পক্ষই পরস্পরকে উড়িতে সাহায্য করে; মানুষের দুইটি চক্ষু যেমন একের পর একটি দেখে বলিয়াই একই সঙ্গে দেখিতে পারে, তেমনি যোগ ও জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে সাহায্য পূর্ব্বক একই সঙ্গে কার্য করিয়া পরস্পরকে বর্ধিত ও পুষ্ট করে। কর্ম যেমন ক্রমশ বেশী-বেশী নিষ্কাম হয়, সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, যজ্ঞ-ভাবাপন্ন হয়, তেমনিই জ্ঞানও বর্ধিত হইতে থাকে; আবার জ্ঞান যেমন বর্ধিত হয় সেই সঙ্গে আত্মাও বাসনাশূন্যতায়, যজ্ঞার্থে কর্মের সমতায় দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে, সকল প্রকার দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড় (৪।৩৩)।

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৪।৩৬
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮

"যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।" জ্ঞানের দ্বারা কামনা এবং কামনার জ্যেষ্ঠ সন্তান পাপ ধ্বংস হয়। মুক্ত মানব যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে পারেন কারণ তাঁহার মন, হৃদয় ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, গতসঙ্গস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। তাঁহার সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবামাত্র অদৃশ্য হয়, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়, প্রবিলীয়তে; সে-কর্ম তাঁহার আত্মার উপর কোন প্রতিক্রিয়ার ফল রাখিয়া যায় না, কোন দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানই সেই কর্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্ম মানুষের নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্রমাত্র। কর্মটিও তখন হয় ব্রহ্মসত্তারই শক্তি (৪।২৪)।

এই অর্থেই গীতা বলিয়াছে যে, সমস্ত কর্ম সমাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ হয় জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৭

"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।" ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত অর্থ গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪।৪১

"যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে পাইয়াছেন সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্মরাশির দ্বারা বন্ধ হন না।" আর একস্থানে গীতা বলিয়াছে, সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে (৫।৭)—যাঁহার আত্মা সর্বভূতের আত্মা হইয়াছে, তিনি কর্ম করেন কিন্তু সে-কর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনি সেই কর্মের জালে বন্ধ হন না, তাঁহার আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম হইতে সৃষ্টি হয় না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। অতএব, গীতার মতে বাহ্য কর্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ ভাল, কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫।২), কারণ দেহবান লোককে শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য কর্ম করিতেই হয়, এবং সেইজন্য তাহাদের পক্ষে বাহ্যকর্মসন্ন্যাস কঠিন ব্যাপার, দুঃখমাপ্তুম, কিন্তু অন্যদিকে কর্মযোগই যথেষ্ট, কর্মযোগ সহজে এবং দ্রুতগতিতে জীবকে ব্রহ্মে লইয়া আসিতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, এই কর্ম-যোগ হইতেছে সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা; ইহাতে বাহিরে কর্মত্যাগ করিতে হয় না, কেবল ভিতরে ত্যাগ করিতে হয়, শারীরিক কর্মত্যাগ নহে, আধ্যাত্মিকভাবে সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, ব্রহ্মণ্যা-ধ্যায় কর্ম্মাণি (৫।১০), ময়ি সংন্যস্য (৩।৩০)। এইরূপ কর্মরাশি যখন ব্রহ্মে সংন্যস্ত হয়, তখন যন্ত্রের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কিছু থাকে না; সে কর্ম করিয়াও কিছু করে না; কারণ সে শুধু কর্মফল ত্যাগ করে নাই কিন্তু সমস্ত কর্ম এবং তাহাদের সম্পাদনও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছে। তখন ভগবান স্বয়ং তাহার নিকট হইতে কর্মের বোঝা তুলিয়া লন; পরমেশ্বরই তখন কর্তা, কর্ম এবং ফল—সবই হন।

গীতা এই যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছে ইহা মানসিক বুদ্ধি বিচারের ক্রিয়া নহে; সত্যের* দিব্য সূর্যালোকে বর্ধিত হইয়া সত্তার উচ্চতম অবস্থা

---

* এই সত্য সম্বন্ধেই ঋগ্বেদ বলিয়াছে:—"তৎ সত্যম্ সূর্য্যম্ তমসি ক্ষীয়ন্তম্"; আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের আবরণে লুক্কায়িত সূর্যই সেই সত্য।

প্রাপ্তিকেই গীতাতে জ্ঞান নাম দেওয়া হইয়াছে। দুঃখদ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচের প্রকৃতি হইতে বহু ঊর্ধ্বে, নির্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত; এখানকার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের পাপের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না, পুণ্যের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না; নীচের প্রকৃতির সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের জয়েতে যে-সুখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, আমাদের পরাজয়ে যে-দুঃখ তাহাতেও তিনি উদাসীন; তিনি সকলের ঈশ্বর পরমতম সর্বব্যাপী, প্রভু, বিভূ, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সর্ববস্তুতে সমান, প্রকৃতির মূল; তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্মের কর্তা নহেন, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী; কর্তা বলিয়া আমাদের যে-ভ্রম, এই ভ্রমও তাঁহার দেওয়া নহে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু এই মুক্তি, এই ঈশ্বরত্ব, এই শুদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই না; প্রকৃতিগত অজ্ঞানের দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত, তাই আমাদের অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। কিন্তু যাঁহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত অজ্ঞান দূর করিয়া দেয়; বহুকাল লুক্কায়িত সূর্যের ন্যায় এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং এই নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্বসকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত পরম স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া দেয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌ ॥ ৫।১৬

বহুকাল একাগ্রভাবে সাধনা করিয়া, আমাদের সমুদয় চেতনসত্তাকে তদভিমুখী করিয়া, তাহাকেই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য করিয়া, আমাদের বুদ্ধির একমাত্র বিষয় করিয়া এবং এইরূপে শুধু আমাদের মধ্যেই নহে কিন্তু সর্বত্রই তাহাকে দেখিয়া আমরা তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ হই, জ্ঞানরূপ সলিলের * দ্বারা আমাদের নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধৌত হইয়া যায়,

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৫।১৭

ইহার ফল হয় এই যে, সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ সমভাব হয়; গীতা বলিয়াছে, কেবল তখনই আমরা আমাদের কর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারি। কারণ, ব্রহ্ম সমস্বরূপ, সমং ব্রহ্ম; যখন আমাদের

* ঋগ্বেদ এইরূপে সত্যের স্রোতধারার কথা বলিয়াছে, এই জলে পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান, এই জল দিব্য সূর্যালোকে পরিপূর্ণ, ঋতস্য ধারাঃ, অপো বিচেতসঃ, সর্বতীর আপঃ। এখানে যাহা উপমামাত্র, বেদে তাহা স্থূল রূপক।

এইরূপ পূর্ণ সমভাব হয়, সাম্যে স্থিতং মনঃ, যখন আমরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে সমদর্শী হই, এবং সকলকে এক ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কেবল তখনই সেই একত্বের মধ্যে বাস করিয়া আমরা ব্রহ্মের মতই দেখিতে পারি যে, আমাদের কর্মসমূহ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তখন আর আসক্তি, পাপ বা বন্ধনের ভয় থাকে না। তখন আর দোষ বা পাপ হইতে পারে না; কারণ তখন আমরা কামনা ও কামনাজাত কর্ম ও প্রতিক্রিয়ায় পূর্ণ অজ্ঞানের খেলাকে, সংসারকে জয় করিয়াছি, তৈর্জিতঃ সর্গঃ, এবং পরম দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করায় তখন আর আমাদের কর্মে কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে না; কারণ এই সমস্ত দোষ ত্রুটি অজ্ঞানের অসমতা হইতেই উদ্ভূত। সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য, নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম, পাপপুণ্যের গণ্ডগোলের উপরে; ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিয়া আমরাও পাপপুণ্যের উপরে উঠি; আমরা সেই শুচিতায় নির্মলভাবে সমতার সহিত সর্বভূতের হিতকামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কর্ম করি, ক্ষীণকল্মষাঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। আমাদের অজ্ঞানের অবস্থাতেও আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই আমাদের কর্মের কারণ, তবে তিনি তাঁহার মায়ার ভিতর দিয়া, আমাদের নীচের প্রকৃতির অহংকারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করেন; এই প্রকৃতিই আমাদের কর্মসমূহের জটিল জাল সৃষ্টি করে এবং তাহাদের জটিল প্রতিক্রিয়া-সকলের প্রতিঘাত আমাদের অহংয়ের উপর আনিয়া দেয়, সেই সব প্রতিক্রিয়াই আভ্যন্তরীণভাবে পাপ ও পুণ্যরূপে এবং বাহ্যিক-ভাবে দুঃখ ও সুখরূপে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যরূপে আমাদিগকে বিচলিত করে; ইহাই কর্মের বিরাট শৃঙ্খল। যখন আমরা জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হই, তখন ঈশ্বর আর আমাদের হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকেন না, আমাদের পরম আত্মারূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সমুদয় কর্ম গ্রহণ করেন, জগতের সাহায্যের নিমিত্ত আমাদিগকে নির্দোষ যন্ত্রভাবে, নিমিত্তমাত্রম্, ব্যবহার করেন। জ্ঞান ও সমতার নিগূঢ় মিলন এইরূপই; বুদ্ধিতে যাহা জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিতে সমভাব রূপে প্রতিফলিত; ঊর্ধ্বে, চেতনার উচ্চতর ভূমিতে জ্ঞান হয় সত্তার জ্যোতি এবং সমতা হয় প্রকৃতির উপাদান।

এই "জ্ঞান" শব্দটি ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রে সর্বত্র এই পরম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; যে জ্যোতির দ্বারা বর্ধিত হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহাই জ্ঞান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা নানা বিষয় জানিতে পারি, নানাদিক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করি, ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে জ্ঞান বলা হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্যনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিই জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, ভারতে জ্ঞান বলিতে এ সব বুঝায় না। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আমাদের বিকাশে সাহায্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই;

তবে এ-সব জীবনের বিবর্তনে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু আত্মস্বরূপলাভে কোন সাহায্য করিতে পারে না। যৌগিক জ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে এই সব জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন পরমতমকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবার জন্য আমরা ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করি; যখন জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জগতের বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর রহস্য ভেদ করি এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের কারণ স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাই, যখন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নিজদিগকে জানিতে পারি, আমাদের ভিতর নীচের খেলা ও উপরের খেলার প্রভেদ, অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং একটিকে বর্জন করিয়া অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, যখন দর্শনশাস্ত্রের আলোকে আমরা জগতের মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সৎ, যাহা নিত্য তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পাপ-পুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং পাপকে বর্জন করিয়া, পুণ্যেরও উপরে উঠিয়া দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন কলা-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দিব্য সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, যখন সাংসারিক ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই ভগবান তাঁহার জীবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন এবং মানুষের সেবার ভিতর দিয়া ভগবানেরই সেবা করিতে এই জ্ঞানকে লাগাইতে পারি, কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তখনও এই সব জ্ঞান কেবলমাত্র সহায়তাই করিতে পারে; প্রকৃত যে-জ্ঞান তাহা মনের অগোচর, মন কেবল তাহার ছায়ামাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানের স্থান হইতেছে আত্মায়।

কিরূপে এই জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে যে, এই জ্ঞানের প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণের নিকট,—যাঁহারা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (৪।৩৪); কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃতভাবে লাভ করা যায় নিজেদের ভিতর হইতে—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" (৪।৩৮), যে-ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথা সময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ং লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে, এবং তিনি বাসনাশূন্যতায়, সমতায়, ভগবদ্ভক্তিতে যত বর্ধিত হন, এই জ্ঞানেও তেমনি বর্ধিত হন। কেবল পরম জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে; মানুষের বুদ্ধি যে-জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয়ের ও বিচার শক্তির সাহায্যে কষ্টেসৃষ্টে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পরম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষানুভূত, স্বপ্রকাশ—ইহা লাভ করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত ও সংযত করিতে হইবে, সংযতেন্দ্রিয়ঃ; যেন আর আমরা তাহাদের ছলনায় ভ্রান্ত না হই, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গণ যেন সেই পরম জ্ঞানের

নির্মল দর্পণ স্বরূপ হয়; যে পরম সত্তার মধ্যে সর্বভূত রহিয়াছে, আমাদের সমগ্র চেতনাকে তাহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে, তৎপরঃ—এইরূপে তাহার জ্যোতির্ময় স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আর চাই আমাদের এমন শ্রদ্ধা, এমন বিশ্বাস, কোনরূপ সংশয়েই যাহাকে বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না; শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং,

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪।৪০

"যে অজ্ঞান ব্যক্তির বিশ্বাস নাই, যাহার আত্মা সংশয়যুক্ত, সে বিনষ্ট হয়; সন্দেহাকুলচিত্ত মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, কোন সুখও নাই।" বস্তুত ইহা সত্য যে, বিশ্বাস ভিন্ন ইহজগতে স্থায়ী কিছু সম্পাদন করা যায় না, কিংবা ঊর্ধ্বলোক লাভের নিমিত্তও কিছু করা যায় না, কোন নিশ্চিত ভিত্তি ও দৃঢ় অবলম্বনকে ধরিতে না পারিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায় না, কোন তৃপ্তি বা সুখ লাভ করা যায় না; যে-মন কেবল সংশয়পূর্ণ তাহা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তবু কিন্তু নিম্নস্তরের জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে; উপরের জ্ঞানে এ-সব বিষম বাধা, কারণ সেখানকার গূঢ়তত্ত্ব এই যে, সেখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য-অসত্যের বিচার করিতে-করিতে অগ্রসর হইতে হয় না, পরন্তু স্বতঃ প্রকাশমান সত্যকে ক্রমশ বেশী প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে-করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির স্তরে যে-জ্ঞান তাহার সহিত সকল সময়েই অসম্পূর্ণতা, বা মিথ্যা মিশিয়া রহিয়াছে, অতএব সংশয় দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া মিথ্যার ভাগ বর্জন করিতে হয়; কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না এবং নানা মতের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধি যে-সংশয় উৎপাদন করে তাহা কেবল বিচারের দ্বারা দূর করা যায় না, ক্রমশ অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা সে-সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এই-রূপে লব্ধজ্ঞানে যে-কোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহা দূর করিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে তাহাতে সংশয় করিলে চলিবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে গভীরতর, উচ্চতর ভাবে বাস করিয়া পূর্ণতর অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা সে অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যে-টুকু এখনও অনুভূত হয় নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচারের দ্বারা নহে; কারণ এই জ্ঞান দান করা বিচার-বিতর্কের সাধ্যাতীত, বাস্তবিক বিচার-বিতর্কের দ্বারা মন যে-সকল ধারণার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, অনেক সময়েই সে-সব উচ্চস্তরের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত,—এই সত্য বিচারের দ্বারা প্রমাণের বিষয় নহে, জীবনের মধ্যে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ক্রমবিকাশের দ্বারা আমাদিগকে যে উচ্চতর আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইবে ইহা সেই সত্য।

শেষতঃ, এই সত্য হইতেছে স্বয়ংসিদ্ধ, আমরা যে অজ্ঞানের ছলনার মধ্যে বাস করি তাহা না থাকিলে ইহা আপনিই প্রকাশ হইত; যে সংশয় মোহ আমাদিগকে এই সত্য দেখিতে ও অনুসরণ করিতে দেয় না তাহা সেই অজ্ঞান হইতেই আইসে, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ সংশয়ম্—আমাদের ইন্দ্রিয়বিক্ষুব্ধ, নানা মতে ভ্রান্ত হৃদয় ও মন নীচের ব্যবহারিক সত্যে ডুবিয়া আছে বলিয়াই তাহারা উপরের সত্য বস্তু সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা এই সংশয় ছেদন করিতে হইবে, অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা এই সন্দেহ দূর করিতে হইবে, সতত যোগের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং, যাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়, সেই পরম পুরুষের সহিত যোগে জীবনযাপন করিয়া সকল সন্দেহ ভ্রান্তি নিরসন করিতে হইবে।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪।৪২

সর্বদা ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সকল সময়েই সেই উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে সমস্ত জিনিস অবলোকন করেন। তাহা অন্য জিনিসকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে দেখা নহে, পরন্তু সমস্ত জিনিসকেই ব্রহ্মে দেখা এবং আত্মা বলিয়া দেখা। কারণ গীতা বলিয়াছে, যে-জ্ঞান লাভ করিলে আর আমাদিগকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির মোহজালের মধ্যে পুনরায় পড়িতে হয় না, "সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্বভূতকেই (কাহাকেও বাদ না দিয়া) আত্মাতে দেখিবে, পরে আমাতে দেখিবে।"

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪।৩৫

এই কথাই গীতা অন্যত্র আরও বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬।৩২

"সর্বত্র সমদর্শী যোগী সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সকলকে ও প্রত্যেককেই আমার মধ্যে দেখেন আমি তাহাকে কখনও হারাই না, তিনিও আমাকে কখনও হারান না। যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে

ভজনা করেন, তিনি যেখানে থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন। হে অর্জুন, যিনি সুখে দুঃখে সর্বত্র সকলকে সমান ভাবে নিজের মত দেখেন আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।" ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান, এই জ্ঞানকে গীতা সর্বদা আমাদের সমুখে ধরিয়াছে; তবে এই জ্ঞানের অন্যান্য পরবর্তী বিবৃতির তুলনায় গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই জ্ঞানের সাহায্যে কেমন করিয়া কার্যত দিব্যজীবন গড়িয়া তুলিতে হয় তাহারই উপর গীতা একান্তভাবে ঝোঁক দিয়াছে। এই ঐক্যজ্ঞানের সহিত কর্মযোগের সম্বন্ধ গীতায় বার-বার বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে—দেখান হইয়াছে যে, সংসারে মুক্তভাবে কর্ম করিবার ভিত্তিই হইতেছে এই ঐক্যের জ্ঞান। গীতা যখনই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে, তখনই ইহার ফলস্বরূপ সমতার কথাও বলিয়াছে; গীতা যখনই সমতার কথা বলিয়াছে তখনই এই সমতার ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞানের কথাও বলিতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা যে-সমতার উপদেশ দিয়াছে তাহার আরম্ভ এবং শেষ কেবল আত্মমুক্তির উপযোগী নিশ্চল অধ্যাত্ম অবস্থায় নহে; তাহা সকল সময়েই কর্মের ভিত্তি। মুক্ত পুরুষের আত্মায় প্রতিষ্ঠারূপে থাকে ব্রহ্মের শান্তি; মুক্ত প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিরাট, মুক্ত, সম, বিশ্বব্যাপী কর্ম সেই শান্তি হইতে উত্থিত শক্তি বিকীরণ করে। এই দুইকে এক করিয়াই দিব্যকর্ম ও ভাগবত জ্ঞানের সমন্বয় হয়।

অন্যান্য দর্শন, নীতি বা ধর্মশাস্ত্রে জীবনের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে, গীতা সে-সব লইয়া তাহাদের কিরূপ গভীর বিস্তার সাধন করিয়াছে তাহা এখন সহজেই বুঝা যায়। সহিষ্ণুতা, দার্শনিক উদাসীনতা এবং নতি যে তিন প্রকার সমতার ভিত্তি তাহা আমরা বলিয়াছি; গীতা যে কেবল এই তিনটিরই সমন্বয় সাধন করিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা তাহাদিগকে অসীম গভীরতা এবং অপূর্ব উদার সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। সহিষ্ণুতার দ্বারা আত্মজয় করিবার যে-শক্তি আত্মার আছে তাহার জ্ঞানই স্তোয়িক জ্ঞান (stoic knowledge), নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই সমতা লাভ করিতে হয়, সতত সজাগ দৃষ্টি, খাড়া পাহারার দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিদ্রোহসমূহকে দমন করিয়া এই সমতা বজায় রাখিতে হয়; ইহা হইতে একটা মহৎ শান্তি, একটা কঠোর সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু মুক্ত পুরুষের জীবনে যে পরম আনন্দ তাহা লাভ করা যায় না;—এই মুক্ত পুরুষের জীবন বিধি-নিষেধ অনুসারে যাপিত হয় না, তাঁহার দিব্যসত্তার শুদ্ধ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধাবস্থাতে তিনি জীবন যাপন করেন,—সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে,—"তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন," কারণ এখানে সিদ্ধি শুধু লব্ধই হয় না, জন্মগত অধিকার হইয়া উঠে, উহাকে চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে হয় না কারণ উহা আত্মার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে।

আমাদের নীচের প্রকৃতিকে জয় করিতে সাধনার প্রথমাবস্থায় ধৈর্য ও তিতিক্ষার সার্থকতা গীতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় কতকটা জয়লাভ করিতে পারিলেও পূর্ণজয়ের মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবানের সহিত যোগসাধন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই,—সেই এক দিব্য পুরুষের সত্তায় নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, ভগবদিচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে লয় করিতে হইবে। প্রকৃতির এবং তাহার কর্মের একজন দিব্য অধীশ্বর আছেন, তিনি প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়াও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, তিনিই আমাদের উচ্চতম সত্তা, আমাদের বিশ্বব্যাপী আত্মা; তাঁহার সহিত এক হওয়াই আমাদের দিব্যাবস্থালাভ। ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণ মুক্তি ও পরম জয় লাভ করি। স্তোয়িকদের যে-আদর্শ, যে জ্ঞানীব্যক্তি আত্মজয়ের দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও জয় করিয়া রাজা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত বেদান্তের স্বরাট্, সম্রাট্ আদর্শের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু তাহা হইতেছে নীচের স্তরে। স্তোয়িকের প্রভুত্ব আত্মার উপর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বল প্রয়োগ করিয়া বজায় রাখিতে হয়; যোগীর যে পূর্ণ মুক্ত প্রভুত্ব তাহা দিব্যপ্রকৃতির চিরন্তন ঈশ্বরত্ব হইতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত—নীচের প্রকৃতি যাহার যন্ত্র মাত্র, ঊর্ধ্বে সেই দিব্যপ্রকৃতির মুক্ত বিশালতায় বাস করিয়াই এই পূর্ণ জয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতায় সহজ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি সকল জিনিসের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন তাহার কারণ এই যে, তিনি সকল জিনিসের সহিত একাত্মা হন, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। প্রাচীন রোমক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত লইয়া স্তোয়িক মুক্তি বুঝান যাইতে পারে—যে ক্রীতদাসকে তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেওয়া হইত (libertus) সে যেমন মুক্ত হইয়াও বস্তুত পূর্ব প্রভুরই অধীন থাকিত, স্তোয়িক সাধনায় মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রকৃতি তেমনই তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেয়। কিন্তু গীতা যে-মুক্তির কথা বলিয়াছে তাহা স্বাধীন মনুষ্যের (freeman) জন্মগত স্বাধীনতা, দিব্যপ্রকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া সেই সত্য স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা দিব্য সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ। মুক্ত পুরুষ যাহাই করুন, যেখানেই থাকুন, তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করেন; তিনি বাড়ীর দুলাল, বালবৎ, তাঁহার ভুল হইতে পারে না, পতন হইতে পারে না কারণ তিনি নিজে যাহা এবং তিনি যাহা করেন সে সবই সিদ্ধ, পরম আনন্দময়, পরম প্রেমময়, পরম সুন্দর। তিনি যে-রাজ্য ভোগ করেন, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, তাহা সুখ ও মধুরতার রাজ্য, তাহার সম্বন্ধে গ্রীক্ পণ্ডিতের গভীর ভাষায় বলা যায়, "শিশুর রাজ্য—The Kingdom is of the child."

বিশ্বজগতের প্রকৃত ধারা, বাহ্যবস্তুর অনিত্যতা, সাংসারিক ভেদ-বৈষম্যের নিরর্থকতা এবং আভ্যন্তরীণ ধীরতা, শান্তি, জ্যোতি ও আত্মনির্ভরতার

সার্থকতা, এই সবের জ্ঞানই দার্শনিক * জ্ঞান। ইহা দার্শনিক জ্ঞানলব্ধ উদাসীনতার সমতা; ইহা হইতে একটা উচ্চ শান্তভাব আইসে কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায় না; এই মুক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা—উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া কত লোক হাবুডুবু খাইতেছে, এই দুরবস্থা হইতে দূরে উচ্চ শৈলশিখর হইতে কেহ যেরূপ অন্যান্য সকলের দুরবস্থা দর্শন করে ইহাও সেইরূপ,—শেষ পর্যন্ত ইহা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহা সংসারের কোন কাজেই লাগে না। সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ দার্শনিক উদাসীনতার যে উপযোগিতা আছে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু যে-উদাসীনতা গীতার চরম লক্ষ্য তাহাতে সংসারকে উপেক্ষার কোন ভাব নাই; সে-অবস্থাকে ঠিক উদাসীনতা বলা চলে কি না সন্দেহ। যেন উচ্চে বসিয়া আছে এরূপ একটা ভাব সে-অবস্থায় আছে বটে, উদাসীনবৎ, কিন্তু যেমন ভগবান উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া জীবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সাহায্য করিতেছেন, পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সর্বভূতের সহিত একত্বের উপলব্ধির উপর এই সমতা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক সমতাতে যে অভাব আছে, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে; কারণ ইহার মূলে শান্তি আছে, উপরন্তু প্রেম আছে। এই সমতার অবস্থায় সর্বভূতকে নির্বিশেষে ভগবানের মধ্যে দেখা যায়, সর্বভূতের সহিত একাত্মবোধ হয়, অতএব সকলের প্রতিই পরম সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যায়। কেহই বাদ থাকে না, "অশেষেণ", কেবল যে-সব বস্তু শুভ, সুন্দর ও আনন্দদায়ক শুধু সেইসবই নহে, যত নীচ, পতিত, পাপী কুরূপ হউক না কেন এই সার্বজনীন ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক একত্ব হইতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে যে কেবল ঘৃণা, ক্রোধ বা হৃদয়হীনতার স্থান নাই শুধু তাহাই নহে, এখানে উপেক্ষা তাচ্ছিল্য বা মহত্ত্বের গর্বেরও স্থান নাই। অবশ্য মানবমনের দ্বন্দ্ব ও অজ্ঞানের প্রতি দিব্য করুণা থাকিবে, তাহাকে জ্ঞান দিবার, শক্তি দিবার, আনন্দ দিবার দিব্য প্রবৃত্তি থাকিবে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দিব্য আত্মা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও অধিক কিছু থাকিবে, ভক্তি ও প্রেম থাকিবে। কারণ সকলের ভিতর হইতে,—যেমন সাধু ও জ্ঞানীর ভিতর হইতে, তেমনই চোর, চণ্ডাল, পতিতার ভিতর হইতেও প্রেমময় চাহিয়া আছেন এবং আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—

* ইংরাজী 'Philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাংলায় 'দর্শন' শব্দ ব্যবহারই প্রচলিত রীতি এবং আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তবে মনে রাখা উচিত যে, Philosophy তত্ত্বদর্শী ঋষির অপরোক্ষানুভূত তত্ত্বজ্ঞান নহে, মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা লইয়াই Philosophy.

"এখানেও আমি।" সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, "সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আমাকে যে ভালবাসে"—দিব্য সর্বজনীন প্রেমের চরম পূর্ণতা ও গভীরতার এতবড় শক্তিমান কথা জগতের আর কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ ধর্মে বলা হইয়াছে?

নতি এক প্রকার ভক্তসুলভ সমতাব ভিত্তি—এই সমতা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া, সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ধীর ভাবে সহ্য করা। গীতার এই ভাব হইয়াছে আরও পূর্ণতর, সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করা। ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় নতি (passive submission) নহে, পরন্তু ইহা সক্রিয় আত্মদান (active self-giving)। গীতায় সমর্পণের অর্থ কেবল সমস্ত জিনিসেই ভগবানের ইচ্ছা দেখা এবং স্বীকার করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বকর্মের প্রভু ভগবানের যন্ত্র করিয়া দেওয়া; এই যন্ত্রভাব কেবল নিম্নতর দাসভাব নহে,—প্রথমাবস্থায় যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত আমাদের চৈতন্য ও কর্ম এমন পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যেন আমাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সহিত এক হইয়া যায় এবং আমাদের নির্ব্যক্তিক-ভাবাপন্ন প্রকৃতি হয় কেবল একটি যন্ত্র, আর কিছুই নহে। শুভ-অশুভ, সুখদুঃখ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য—সকল প্রকার ফলই সর্বকর্মের প্রভু ভগবানের বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, অতএব শেষ পর্যন্ত শোক-দুঃখ যে কেবল সহ্য করা হয় তাহা নহে, শোক-দুঃখ একেবারে লোপ পায়; হৃদয়ে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন বোধ থাকে না; সর্বজ্ঞ সর্ব-শক্তিমান বিশ্বপুরুষ পূর্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের অহংকার ভগবানের সেই ইচ্ছাব কোন ব্যতিক্রমই করিতে পারে না, এই জ্ঞান হয়। অতএব শেষ ভাব হইবে যেমন একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে নির্দেশ করা হইয়াছে—"আমার দিব্য ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে আমি ইতিপূর্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জুন, তুমি এখন কেবল নিমিত্তমাত্র হও"—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩)। এইরূপ ভাব হইতে শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগ হয় এবং ক্রমশ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এমন অবস্থা লাভ করা যায় যে তখন যন্ত্র সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবেই ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানে সাড়া দেয়। বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের সহিত ব্যক্তির এই চরম মিলনের অবস্থায় আত্মসমর্পণের পূর্ণতম চরমতম সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মন দিব্য আলোক ও শক্তির নমনীয় আধার হয়, সক্রিয় সত্তা জগতে এই দিব্য আলোক ও শক্তির মহান কার্যক্ষম যন্ত্র হয়।

অপরে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধেও সমভাব হইবে। সর্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া, অন্তরে যে একত্ব বোধ, প্রেম, সহানুভূতির উদয় হয় তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না, অপরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা

যাহা করিবে নির্বিরোধে তাহা মানিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথাই নাই; এরূপ হইতেই পারে না, কারণ সংসারে লোকে আপন-আপন অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে, ভগবদিচ্ছার সহিত ইহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, অতএব যাহারা সর্বদা ভগবদিচ্ছার যন্ত্রভাবে কার্য করিবে তাহাদিগকে সংসারে বাসনা-চালিত অহঙ্কৃত নানা ব্যক্তির, নানা কর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। সেইজন্যই অর্জুন বাধা দিতে, যুদ্ধ করিতে, জয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা ব্যক্তিগত বাসনা বা ব্যক্তিগত শত্রুভাব পরিহার করিয়াই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ মুক্ত পুরুষে এই সকল ভাব সম্ভবে না। নির্ব্যক্তিকভাবে লোকসংগ্রহের জন্য, ভাগবত আদর্শের দিকে লোক সকলকে পরিচালনার জন্য কর্ম করা, এই নীতি ভগবানের সহিত, বিশ্বপুরুষের সহিত জীবের একাত্মবোধ হইতেই উত্থিত হয়, কারণ বিশ্বকর্মের উহাই সমগ্র লক্ষ্য ও অর্থ। আবার সর্বভূতের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহারও সহিত এই নীতির কোন বিরোধ নাই, হউক না কেন এখানে অনেকেই আমাদের সম্মুখে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত। কারণ ভাগবত আদর্শ তাহাদেরও আদর্শ, যাহাদের বাহ্য মন অজ্ঞান ও অহঙ্কারের দ্বারা বিপথে চালিত হয় এবং ভাগবত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাদেরও নিগূঢ় লক্ষ্য হইতেছে ভাগবত আদর্শে পেঁছান। তাহাদিগকে বাধা দিলে বা পরাস্ত করিলেই তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক সেবা বা উপকার করা হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া গীতা বাহ্যিক ব্যবহার-বৈষম্যের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করে নাই, কিম্বা অজ্ঞানজনিত দুর্বল অনুকম্পার উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানসম্মত সমতা ও প্রেমের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আত্মায় সকলের সহিত একত্ব থাকিবে, হৃদয়ে সকলের প্রতি শান্ত সর্বজনীন প্রেম, সহানুভূতি, করুণা থাকিবে, কিন্তু হস্ত মুক্ত থাকিবে নির্ব্যক্তিকভাবে কল্যাণ সাধন করিতে, মানবজাতিকে শুভ ও মোক্ষের পথে আগাইয়া দিতে, সর্বভূতের সমগ্র হিতসাধন করিতে; এই ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক মঙ্গল করিতে যাইয়া কখনই তাহা ভাগবত কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

ভগবানের সহিত একত্ব, সর্বভূতের সহিত একত্ব, সর্বত্র সনাতন দিব্য ঐক্যের উপলব্ধি এবং সকল মনুষ্যকে এই একত্বের দিকে টানিয়া লওয়া—ইহাই জীবনের ধর্মরূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গভীর, উদার, মহৎ ধর্ম আর কিছুই হইতে পারে না। নিজে মুক্ত হইয়া এই একত্বের মধ্যে বাস করা, যে-পথে ইহা লাভ করা যায় সমস্ত মানবজাতিকে সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা, এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ম ভগবদর্থে সম্পাদন করা এবং অপরকেও এইরূপে সম্মতি ও আনন্দের সহিত আপন-আপন কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করা, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বকর্ম্মাণি জোষয়ন্—দিব্যকর্মের ইহা

অপেক্ষা উদার বা মহৎ নীতি আর কিছু দিতে পারা যায় না। এই মুক্তি এবং এই একত্বই আমাদের মানবীয় প্রকৃতির নিগূঢ় লক্ষ্য এবং মানবজাতির জীবনে ইহাই চরম ইচ্ছা। সমগ্র মানবজাতি আজ যে-সুখের জন্য বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে তাহার জন্য এই দিকে ফিরিতেই হইবে; যখন মানুষ একবার নিজেদের মধ্যে ও চারিদিকে, সর্ব্বেষু, সর্বত্র ভগবানকে দেখিবার জন্য চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবে এবং শিখিবে যে, তাহারা ভগবানের মধ্যেই বাস করিতেছে, এই নীচের প্রকৃতি কেবল কারাপ্রাচীর মাত্র, ইহাকে ভাঙিগয়া ফেলিতেই হইবে, বড় জোর ইহা শৈশবের পাঠশালা মাত্র, ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে তবেই আমরা প্রকৃতিতে সাবালক হইতে পারিব, আত্মায় মুক্ত স্বাধীন হইতে পারিব। ভগবান ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে রহিয়াছেন, জগতের মধ্যে রহিযাছেন—সেই সর্বত্র বিরাজমান ভগবানের সহিত একাত্ম হইতে হইবে ইহাই মুক্তির অর্থ, ইহাই সিদ্ধির পরম রহস্য।

একবিংশ অধ্যায়

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব

আত্মজ্ঞান ও কর্মের ঐক্যের দ্বারা যখন আমরা ঊর্ধ্বতন আত্মার মধ্যে বাস করিতে পারি, তখন আমরা প্রকৃতির নিম্নতম কর্মপদ্ধতির ঊর্ধ্বে উঠি। তখন আর আমরা প্রকৃতি ও তাহার গুণ-সকলের অধীন থাকি না, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির প্রভু ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে ভগবদ্ ইচ্ছার উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে পারি, তখন আর আমাদিগকে কর্মবন্ধনের অধীন হইতে হয় না; কারণ আমাদের মধ্যে যে মহত্তর আত্মা তাহা তিনিই, তিনি প্রকৃতির কর্মের অধীশ্বর, তাহার প্রতিক্রিয়াসকলের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অন্য পক্ষে যে আত্মা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে সে সেই অজ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতির গুণে বদ্ধ হয়, কারণ সেখানে সে তাহার প্রকৃত সত্তার সহিত, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত নিজেকে স্বচ্ছন্দে এক করিয়া দেখে না পরন্তু নির্বোধভাবে এবং অস্বচ্ছন্দে মনের "আমি"কেই নিজের স্বরূপ বলিয়া দেখে, এই "আমি" নিজেকে যত বড়ই দেখাক না কেন ইহা বস্তুত প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি নীচের অংশ মাত্র, ইহা কেবল একটি মানসিক গ্রন্থি, একটি কেন্দ্র; ইহাকে ধরিয়া প্রকৃতির কর্মধারাসকলের খেলা চলে। এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করা, "আমি"-কেই আব আমাদের কর্মের কেন্দ্র ও ভোক্তা না করা পরন্তু দিব্য পরমপুরুষ হইতেই সব প্রেরণা লাভ করা এবং তাঁহাকেই সব কিছু উৎসর্গ করা—ইহাই হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের সকল অশান্ত বিক্ষোভের অতীত হইবার পন্থা। কারণ তখন আমরা পরম চৈতন্যের মধ্যে বাস করি, মনের "আমি" হইতেছে তাহার একটা নীচের রূপ মাত্র; তখন আমরা ভাগবত ইচ্ছা ও শক্তির সাম্যে ও ঐক্যে কর্ম করি, গুণসকলের খেলার অসাম্যে নহে, এই খেলা হইতেছে একটা ঐক্য-হীন প্রয়াস, একটা বিক্ষোভ, একটা নীচের মায়া।

গীতা যে-সকল স্থানে অহংকে প্রকৃতির অধীন বলিয়াছে, কেহ-কেহ সেই সকলের অর্থ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, গীতার মতে বিশ্বজগতের কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, সবই অলঙ্ঘ্য যন্ত্রবৎ নিয়মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অবশ্য গীতা যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে তাহা খুবই জোরের, এবং তাহা একেবারেই চরম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও আমাদিগকে গীতার কথাটিকে সমগ্রভাবে ধরিতে হইবে, অন্যান্য অংশ হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইহার অর্থ করিলে চলিবে না, কারণ প্রত্যেক সত্য, তা নিজে যতই সত্য হউক না কেন,—অন্য যে-সব সত্য তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে সে-সব হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা হয় বুদ্ধির পক্ষে একটি ফাঁদের মত, তাহা ভ্রান্তিপ্রদ হঠোক্তিতে পরিণত হয়, কারণ প্রত্যেকটিই হইতেছে একটি সমগ্রের অংশ, সেই সমগ্র হইতে কোনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে চলিবে না। সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, অকৃৎস্নবিৎ, যাহারা আংশিক সত্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, আর যে-যোগী সমগ্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কৃৎস্নবিৎ—গীতা নিজেই এই দুইয়ের প্রভেদ করিয়াছে। সমস্ত জীবনকে ধীরভাবে দেখা এবং সমগ্র ভাবে দেখা, জীবনের আপাতবিরোধী সত্যসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া ইহাই হইতেছে যোগীজনবাঞ্ছিত শান্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন। আমাদের এই বিচিত্র সত্তার এক প্রান্তে এক প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতাই হইতেছে আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের একটা দিক; আবার বিপরীত প্রান্তে প্রকৃতির এক প্রকার পূর্ণ নিয়ন্তৃত্বই (absolute determinism) হইতেছে উহার বিপরীত দিক; আবার এই দুই বিপরীত সত্যের বিকৃত ছায়া ক্রমবিকাশশীল মনের উপর পড়িলে আত্মার এক প্রকার স্বাধীনতার আভাস হয় —ইহা আংশিক ও আভাসমাত্র, অতএব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। এই শেষেরটিকে সাধারণত আমরা কতকটা ভ্রান্তভাবেই স্বাধীন ইচ্ছা (free will) নাম দিয়া থাকি; কিন্তু গীতা পূর্ণ মুক্তি ও প্রভুত্ব ভিন্ন আর কিছুকেই স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করে নাই।

সকল সময়েই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান তত্ত্ব রহিয়াছে, (১) সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব বেদান্তের পুরুষত্রয়ের তত্ত্বের দ্বারা সংশোধিত ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত এবং (২) যুগ্ম প্রকৃতি, ইহার নীচের রূপ হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এবং ঊর্ধ্বের রূপ হইতেছে দিব্য প্রকৃতি, প্রকৃত আধ্যাত্মপ্রকৃতি। গীতার শিক্ষার নানাস্থানে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, সে সমুদয়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিবার ইহাই হইতেছে মূল সূত্র। বস্তুত আমাদের চৈতন্যময় জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে, যাহা এক স্তরে কার্যত সত্য উপরের আর এক স্তরে উঠিলে তাহাই আর সত্য থাকে না, কারণ তখন তাহা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, উপর হইতে জিনিসসকলকে আমরা আরও সমগ্রভাবে দেখিতে পারি। আধুনিক গবেষণা নির্ধারণ করিয়াছে যে, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ এমন কি ধাতুদ্রব্য পর্যন্ত সকলের মধ্যে মূলত একই জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, অতএব প্রত্যেকের মধ্যেই কোন এক প্রকারের স্নায়বিক চৈতন্য (nervous consciousness) রহিয়াছে, তাহাদের স্থূল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি একই। অথচ

প্রত্যেকেই যদি তাহার অনুভূতি উপলব্ধিসকলের বর্ণনা দিতে পারিত তাহা হইলে আমরা একই প্রাকৃত তত্ত্বের চারিপ্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেকাংশেই বিরোধী বর্ণনা পাইতাম, কারণ আমরা যেমন জীবনের পর্যায়ে ঊর্ধ্বতর স্তরে উঠি তেমনই তাহাদের অর্থ ও উপযোগিতার বিভিন্নতা হয় এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে হয়। মানবাত্মার স্তর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের সাধারণ ধারণায় আমরা যেটিকে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলি, এবং এরূপ বলিবার কতকটা ন্যায্যতাও আছে, তথাপি যে যোগী ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং আমাদের রাত্রি যাহার নিকট দিন স্বরূপ এবং আমাদের দিন রাত্রি স্বরূপ, তাঁহার নিকট সেটি আদৌ স্বাধীন ইচ্ছা নহে, পরন্তু প্রকৃতির গুণসমূহের বশ্যতা; তিনি একই জিনিস দেখেন, কিন্তু সমগ্র জ্ঞানীর, কৃৎস্নবিৎ ব্যক্তির উচ্চতর দৃষ্টি লইয়া দেখেন, আর আমরা দেখি আমাদের আংশিক জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি হইতে, অকৃৎস্নবিৎ, ইহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেটাকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া গর্ব করি, তিনি দেখেন যে সেটা দাসত্ব।

নীচের প্রকৃতির জালে সর্বদা বদ্ধ থাকিয়াও আমরা যে নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করি, গীতা ইহাকে অজ্ঞান বলিয়াই দেখিয়াছে এবং এই অজ্ঞান ধারণার বিরুদ্ধেই গীতা বলিয়াছে যে, এই স্তরে অহংরূপী আত্মা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির গুণসমূহের অধীন। গীতা বলিয়াছে, * "কর্মসকল সর্বতোভাবে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও যে ব্যক্তি-আত্মা অহংভাবের দ্বারা বিমূঢ় সে মনে করে যে তাহার "অহং"ই সে-সব করিতেছে। কিন্তু যে-ব্যক্তি গুণ ও কর্মবিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি উপলব্ধি করেন যে, গুণসকলই পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে, তিনি আসক্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। যাহারা গুণসকলের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া পড়ে, সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, সমগ্র-জ্ঞানীরা যেন তাহাদের মানসিক ধারণাকে বিচলিত না করেন। তোমার সকল কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, কামনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, শোকত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ কর।" এখানে চেতনার দুইটি স্তরের, কর্মের দুইটি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে, এক স্তরে আত্মা তাহার অহংভাবাপন্ন প্রকৃতিতে বদ্ধ, প্রকৃতির

*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ৩।২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ৩।২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীনির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০

দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম করিতেছে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন স্বাধীনতাই নাই; আর এক স্তরে আত্মা মুক্ত, সে আর নিজেকে অহং-এর সহিত এক করিয়া দেখিতেছি না, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া প্রকৃতির কর্মসকল সাক্ষীভাবে অবলোকন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

আমরা বলি আত্মা প্রকৃতির অধীন; কিন্তু অন্যাদিকে আবার গীতা আত্মা ও প্রকৃতির লক্ষণ প্রভেদ করিতে গিয়া বলিয়াছে যে, আত্মা সকল সময়েই প্রভু, ঈশ্বর, আর প্রকৃতি কার্যনির্বাহক শক্তি। এখানে গীতা বলিতেছে, আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, কিন্তু বেদান্তের মতে প্রকৃত যে আত্মা তাহা ভাগবত, চিরমুক্ত, আত্মবিৎ। তাহা হইলে এই যে-আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বিমূঢ় হয়, এই যে-আত্মা প্রকৃতির অধীন, ইহা কি? ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, এখানে আমরা নিম্নতম মানসিক জ্ঞানের ভাষাই প্রয়োগ করিতেছি; আমরা বলিতেছি, আভাস আত্মার কথা, প্রকৃত পুরুষের কথা নহে। প্রকৃত পক্ষে অহংই হইতেছে প্রকৃতির অধীন, আর ইহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এই অহং নিজেই হইতেছে প্রকৃতির অংশ, তাহার যন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া; মানসিক চেতনায় যে আত্মসম্বিৎ তাহা যখন নিজেকে এই অহং-এর সহিত এক করিয়া দেখে, তখন একটা নিম্নতন আত্মা, অহং আত্মার আভাস সৃষ্ট হয়। সেই রকমই আমরা যাহাকে সাধারণত অন্তর্পুরুষ বলিয়া মনে করি বস্তুত তাহা হইতেছে প্রাকৃতিক ব্যক্তি-সত্তা, সত্য পুরুষ নহে, পরন্তু আমাদের মধ্যে বাসনাত্মক আত্মা, (desire-soul), তাহা হইতেছে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া : বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকৃতির গুণত্রয়েরই একটি ক্রিয়া, অতএব প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা বা বাসনাত্মক আত্মা, গুণত্রয়ের পরিবর্তনের সহিত ইহা পরিবর্তিত হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, অপরটি হইতেছে মুক্ত ও শাশ্বত-পুরুষ, প্রকৃতি এবং তাহার গুণসকলের অতীত। আমাদের দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা, তাহা কেবল অহং, আমাদের মধ্যে সেই মানসিক কেন্দ্র যাহা প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল ক্রিয়াকে, এই পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-সত্তাকে গ্রহণ করিয়া বলে, "আমিই এই পুরুষ, আমিই এই প্রাকৃতিক সত্তা, আমিই এই সকল কর্ম করিতেছি",—কিন্তু ঐ প্রাকৃতিক সত্তা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহা গুণসকলেরই একটা সমবায়,—অপরটি হইতেছে প্রকৃত আত্মা, তাহা বাস্তবিক পক্ষেই প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর, তাহা প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু নিজে ঐ পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সত্তা নহে। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা হইতেছে, এই বাসনাত্মক

আত্মার বাসনা-কামনা সকল বর্জন করা এবং এই অহংএর মিথ্যা আত্ম-অভিমান বর্জন করা। গুরু বলিলেন, নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা, বাসনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার আত্মাকে কাতরতা হইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধ কর।

আমাদের সত্তা সম্বন্ধে এই যে মত, সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতি যুগ্মতত্ত্বের বিশেলষণ হইতেই ইহার আরম্ভ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্তা; প্রকৃতি ক্রিয়া-শীলা, কর্ত্রী। পুরুষ চৈতন্যের জ্যোতিতে পূর্ণ সত্তা; প্রকৃতি জড় নিশ্চেতন, তাহার সমুদয় ক্রিয়া চৈতন্যময় সাক্ষিপুরুষে প্রতিফলিত করিতেছে। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের অসাম্যের দ্বারা কর্ম করে, তাহারা অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে; প্রকৃতি তাহার অহংবুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষকে এই সকল ক্রিয়ার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতে বাধ্য করে, এবং এইভাবেই আত্মার চিরনিশ্চলতা ও নীরবতার মধ্যে সক্রিয়, পরিবর্তনশীল অনিত্য ব্যক্তিত্ব ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অশুদ্ধ প্রাকৃতিক চৈতন্য শুদ্ধ আত্মচৈতন্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দেয়; মন অহংভাব ও ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে পুরুষকে ভুলিয়া যায়; আমরা ইন্দ্রিয়গত মন (sense mind) এবং ইহার বহির্মুখী ক্রিয়াসকলের দ্বারা এবং প্রাণ ও শরীরের বাসনার দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত হইতে দিই। যতদিন পুরুষ এই কার্যে অনুমতি দিবে, অহং, বাসনা ও অজ্ঞান প্রাকৃত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই।

কিন্তু ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে একমাত্র প্রতিকার হইত ঐ অনুমতি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা; এই প্রত্যাহারের দ্বারা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে গুণত্রয়ের নিশ্চল সাম্যাবস্থার মধ্যে পড়িতে দেওয়া বা পড়িতে বাধ্য করা এবং এইভাবে সকল কর্ম হইতে বিরত হওয়া। ইহা যে একপ্রকার প্রতিকার তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিতে পারা যায় যে, এই প্রতিকারের দ্বারা রোগের সহিত রোগীকেও শেষ করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু গীতা ঠিক এই প্রতি-কারটিকেই পুনঃ-পুনঃ নিন্দা করিয়াছে। বিশেষত অজ্ঞানীদের উপর এই শিক্ষা চাপাইয়া দিলে তাহারা ঠিক তামসিক নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করিবে; তাহাদের বিচারবুদ্ধি মিথ্যা ভেদে মিথ্যা বিরোধে পতিত হইবে, বুদ্ধিভেদঃ; তাহাদের কর্মপ্রবণ প্রকৃতি এবং তাহাদের বুদ্ধি পরস্পরের বিরোধী হইয়া উঠিবে, কোন সত্য ফল উৎপন্ন না করিয়া বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিবে, মিথ্যা ও আত্মপ্রতারণামূলক কর্মধারা, মিথ্যাচার, সৃষ্টি করিবে, অথবা আসিবে একটা কেবল তামসিক নিষ্ক্রিয়তা, কর্ম হইতে বিরতি, জীবন ও কর্মের প্রবৃত্তির হ্রাস, অতএব তাহা প্রকৃত মুক্তি হইবে না, পরন্তু প্রকৃতির অধমতম গুণের, তমঃ গুণেরই বশ্যতা হইবে, সে গুণের লক্ষণ অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি। অথবা তাহারা ইহার কোন মর্মই গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহারা এই উচ্চতর শিক্ষায়

দোষ ধরিবে, ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের বর্তমান মানসিক অনুভূতিকে, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞান ধারণাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিবে, এবং তাহাদের নিজেদের যুক্তিকেই সারবান মনে করিয়া তাহাদের অহং ও বাসনার ভ্রান্তি ও ছলনাতে আরও অধিক দৃঢ় হইবে, তাহাদের অজ্ঞান গভীরতর এবং প্রখরতর সমর্থন লাভ করিয়া তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই সকল উচ্চতর সত্য কেবল চৈতন্য ও সত্তার উচ্চতর ও উদারতর ক্ষেত্রেই সাহায্যপ্রদ হইতে পারে, কাবণ কেবল সেইখানেই তাহারা অনুভূতিতে সত্য হইয়া উঠে এবং জীবনে অনুসরণের উপযোগী হয়। নীচে হইতে এই সকল সত্য দেখিলে ভুল দেখা হইবে, ভুল বুঝা হইবে। সম্ভবত তাহাদের অপপ্রয়োগই করা হইবে। পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ অহংভাবপূর্ণ মানবজীবনের পক্ষেই উপযোগী ব্যবহারিক সত্য, এই জীবন হইতেছে পশু-ভাব হইতে দেবভাবে উঠিবার সন্ধিস্থল, কিন্তু উচ্চতর স্তরে উঠিলে আমরা পাপ ও পুণ্যের ঊর্ধ্বে উঠি, ভগবান যেমন তাহাদের দ্বন্দ্বের অতীত আমরাও সেইরূপ হই—এই যে সত্য, ইহা এইরূপই উচ্চতর সত্য। কিন্তু নিম্নতর চৈতন্যে ইহা কার্যত সত্য নহে, সেখান হইতে না উঠিয়াই যে অপরিপক্ক মন এই সত্যকে ধরিতে যাইবে, সে এইটিকে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তিসকলকে প্রশ্রয় দিবার একটি সুবিধাজনক অছিলা করিয়া তুলিবে, পাপ পুণ্যের ভেদ একেবারেই অস্বীকার করিবে এবং নীচ ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অধঃপাতে যাইবে, সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ অচেতসঃ। প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ; এইটিকে লোকে ভুল বুঝিবে, ইহার অপব্যবহার করিবে; এই সত্যের অপব্যবহার তাহারাই করে যাহারা বলে যে, মানুষকে তাহার প্রকৃতি যেমন গড়িয়াছে সে সেইরূপই হইয়াছে, এবং তাহার প্রকৃতি যাহা করাইবে মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। ইহা এক হিসাবে সত্য বটে কিন্তু লোকে ইহাকে যে অর্থে বুঝে তাহা সত্য নহে, ইহার এই অর্থ নহে যে, অহং যেসব কাজ করিতেছে সেসব সম্বন্ধে তাহার কোন দায়িত্বই নাই এবং সে সবের জন্য তাহাকে কোন ফলভোগ করিতে হইবে না; কারণ অহং এর ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে, আর যতক্ষণ সে তাহার ইচ্ছা অনুসারে, বাসনা অনুসারে কর্ম করিবে, সেটা তাহার প্রকৃতি হইলেও তাহাকে তাহার কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। বলিতে পার যে, সে একটা জালে পড়িয়াছে একটা ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহার বর্তমান অনুভূতিতে, তাহার সীমাবদ্ধ আত্মজ্ঞানে সেটা দুর্বোধ্য, যুক্তি-বিগর্হিত, অন্যায়, ভয়ংকর বলিয়া বেশই মনে হইতে পারে, তথাপি সে ফাঁদে সে নিজেই সাধ করিয়া পড়িয়াছে, সে জাল তাহার নিজেরই তৈয়ারী।

গীতা বলিয়াছে বটে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, "সর্ব-ভূতই আপন-আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকে নিগ্রহ করিলে কি

হইবে ?" যদি শুধু এই কথাটিই ধরা হয় তাহা হইলে মনে হয় যে, আত্মার প্রকৃতির আধিপত্য অসীম, অনতিক্রম্য, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি, "জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিয়া থাকেন।" ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গীতা বিধান দিয়াছে :

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫

"স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বধর্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল কিন্তু পরধর্মের অনুসরণ বিপজ্জনক।" এই স্বধর্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমরা দেখিতে পাইব যখন গীতার শেষের দিকে যেখানে পুরুষ, প্রকৃতি এবং গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে সেখানে যাইব, কিন্তু নিশ্চয়ই ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলি তাহা আমাদিগকে যে-কোন প্রেরণা দিবে সেটি অশুভ হইলেও আমাদিগকে সেটি অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ এই দুইটি শ্লোকের মধ্যস্থলে গীতা আর একটি এই বিধান দিয়াছে—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩।৩৪

"প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বেষ অবস্থিত রহিয়াছে; তাহাদের কবলে পতিত হইও না, তাহারা আত্মার শ্রেয়মার্গে বিঘ্নকারী।" ইহার অব্যবহিত পরেই অর্জুন যখন প্রশ্ন তুলিলেন, আমাদের প্রকৃতির অনুসরণ করিতে যদি কোন দোষই নাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন বলপূর্বক পাপে প্রবৃত্ত করায় সে সম্বন্ধে কি ? তখন গুরু উত্তর দিলেন, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ, ইহা কাম এবং কামের সহচর ক্রোধ, ইহারা প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণ বিক্ষোভাত্মক রজোগুণের সন্তান, এই কাম বা বাসনা আত্মার পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতে হইবে। গীতা বলিয়াছে, মুক্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পাপকর্ম পরিত্যাগ করা এবং গীতা সর্বদা আত্মজয়, আত্মসংযম, মন ও ইন্দ্রিয়, সমগ্র নিম্নতম প্রকৃতির সংযম উপদেশ দিয়াছে।

অতএব এখানে একটা প্রভেদ করা আবশ্যক; প্রকৃতিতে যাহা মূলগত, যাহা ইহার নিজস্ব ও অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া তাহাকে দমন করিবার, চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার চেষ্টা বৃথা; আর প্রকৃতিতে যাহা মূলগত নহে পরন্তু আগন্তুক, প্রকৃতির পথচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, বিকৃতি—এ-সবকে সংযত করিতেই হইবে। "নিগ্রহ" ও "সংযম" এই দুইয়ের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে, জোর করিয়া দমন করা, চাপিয়া দেওয়া "নিগ্রহ", আর যথাযথ ব্যবহার, যথাযথ পরিচালনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই "সংযম"। প্রথমটি হইতেছে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর অত্যাচার, তাহা শেষ পর্যন্ত সত্তার স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে

অবসন্ন করিয়া দেয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ; দ্বিতীয়টি হইতেছে ঊর্ধ্বতন আত্মার দ্বারা নিম্নতন আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করা, তাহা সকল স্বাভাবিক শক্তিকে তাহাদের যথাযথ ক্রিয়া এবং উচ্চতম দক্ষতা প্রদান করে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংযমের এই স্বরূপ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বেশ স্পষ্ট করিয়াছে *। "আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (অতিরিক্ত) ভোগ বা দমনের দ্বারা নির্জিত ও অবসন্ন করিবে না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার মধ্যে (নিম্নতন) আত্মা (ঊর্ধ্বতন) আত্মার দ্বারা বিজিত হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার (ঊর্ধ্বতন) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার (নিম্নতন) আত্মা শত্রুবৎ এবং শত্রুর ন্যায়ই কার্য করে।" যখন কেহ নিজ আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং পূর্ণ আত্মজয় ও আত্মলাভের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন তাঁহার মধ্যে পরমাত্মা বাহ্য মানবীয় চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে, নিম্নতন আত্মাকে ঊর্ধ্বতন আত্মার দ্বারা জয় করা, প্রকৃত সত্তাকে আধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা জয় করা, ইহাই মানুষের সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে এইখানেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব কত বেশী পরিমিত এবং ইহার অর্থ ও পরিধির সঠিক সীমা কি। প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় তাহা আমরা উত্তমরূপে দেখিতে পাই যদি আমরা অনুধাবন করি প্রকৃতির গুণগুলির ক্রিয়া পর্যায়ক্রমে অধঃ হইতে ঊর্ধ্ব পর্যন্ত কিরূপ। সর্বনিম্নস্তরে যে-সব বস্তু রহিয়াছে তাহাদের উপর তমোগুণেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাহারা এখনও আত্মচেতনার আলোক লাভ করে নাই, তাহারা প্রকৃতির প্রবাহের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। পরমাণুর (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, তাহা স্বাধীন ইচ্ছা নহে, কারণ ইহা যন্ত্রবৎ (mechanical), আর ঐ ইচ্ছা পরমাণুটির অধিকৃত নহে, পরমাণুটিই ঐ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা অধিকৃত। এখানে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে বোধ ও সংকল্পের তত্ত্ব, ইহা বস্তুত এবং স্পষ্টত সাংখ্য যাহা বলিয়াছে তাহাই, জড়, একটা যন্ত্রবৎ এমন কি নিশ্চেতন তত্ত্ব, সেখানে চেতন আত্মার জ্যোতি

*উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬।৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৬।৭

আদৌ সম্মুখে আসিতে পারে নাই, পরমাণু তাহার বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান নহে, অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের তত্ত্ব তমোগুণ তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, নিজের রজোগুণকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সত্ত্বগুণকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং অবাধ প্রভুত্বের লীলা করিতেছে। সত্য বটে প্রকৃতি এই সকল বস্তুকে বিরাট শক্তির সহিত কর্ম করাইতেছে, কিন্তু জড় যন্ত্ররূপে, যন্ত্রারূঢ়ম্ মায়য়া। ইহারই উপরের স্তরে উদ্ভিদ, সেখানে রজোগুণ সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত আনিয়াছে জীবনীশক্তি এবং আমাদের মধ্যে যাহা সুখদুঃখ বলিয়া অনুভূত হয় সেই সব স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য, কিন্তু সত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এখনও চেতন বুদ্ধির আলোক জাগ্রত করিতে অগ্রসর হয় নাই, এখনও সবই যন্ত্রবৎ অবচেতন বা অর্ধচেতন, তমঃ রজঃ অপেক্ষাও প্রবল, উভয়ে মিলিয়া সত্ত্বকে বন্দী কবিয়া রাখিয়াছে।

ইহার উপরের স্তরে হইতেছে পশু, যদিও তমঃ এখন খুবই প্রবল, যদিও আমরা পশুকে তামসিক সর্গেরই অন্তর্গত বলিতে পারি, তথাপি এখানে তমোগুণের বিরুদ্ধে রজোগুণের শক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক, রজঃ তাহার সহিত লইয়া আসিয়াছে তাহার জীবন, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখের বিকশিত শক্তি আর সত্ত্ব এখনও নীচের ক্রিয়ার অধীন হইলেও সম্মুখে আসিতেছে, এই সমুদয়কে সচেতন মনের প্রথম আলোক, স্থূল অহংভাব, সচেতন স্মৃতি, এক প্রকারের চিন্তাশক্তি, বিশেষত সহজাত প্রেরণা এবং পশুসুলভ সহজবোধের আশ্চর্য শক্তি আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখনও বুদ্ধি চৈতন্যের পূর্ণ আলোক লাভ করে নাই, অতএব পশুকে তাহার কার্যের জন্য দায়ী করা যায় না যেমন পরমাণুকে তাহার অন্ধগতির জন্য, অগ্নিকে দগ্ধ করার জন্য, ঝড়কে ধ্বংস করার জন্য দোষ দেওয়া যায় না তেমনই ব্যাঘ্রকে হত্যা ও গ্রাস করার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাঘ্র যদি জবাব দিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মানুষের মত বলিত যে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে; কর্তার অহংবোধ তাহার মধ্যে থাকিত এবং সে বলিত, "আমি হত্যা করি, আমি গ্রাস করি"; কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে বাস্তবিক পক্ষে ব্যাঘ্র নহে পরন্তু ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতিই গ্রাস করে আর যদি সে বধ করিতে বা গ্রাস করিতে বিরত হয় তবে সেটা ক্ষুধার অভাব, ভয় বা আলস্য হইতে এবং ইহা তাহার মধ্যে প্রকৃতিরই আর একটি গুণের ক্রিয়া, তমোগুণের ক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতি যেমন বধ করে তেমনি ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতিই বধকার্য হইতে বিরত হয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে যে-আত্মাই থাকুক তাহা নির্বিরোধে প্রকৃতির কার্যে সায় দেয়, ব্যাঘ্রের আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তায় সে যেমন নিশ্চেষ্ট, পশুটির ক্রোধ ও কর্মের মধ্যেও তেমনই নিশ্চেষ্ট। পরমাণুর ন্যায় পশুও তাহার প্রকৃতির

যান্ত্রিক ক্রিয়ার বশেই কর্ম করে, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ, যেন যন্ত্রে আরূঢ়, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

তাহা হউক, কিন্তু অন্তত মানুষের মধ্যে ত অন্য এক রকমের ক্রিয়া আছে, একটা স্বাধীন আত্মা আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে, প্রকৃতি ব্যতীত, মায়ার যান্ত্রিক কৌশল ব্যতীত একজন সত্যকার কর্তা আছে? এইরূপই মনে হয়, কারণ মানুষের মধ্যে রহিয়াছে সচেতন বুদ্ধি, সাক্ষী পুরুষের জ্যোতিতে এই বুদ্ধি পূর্ণ; মনে হয় পুরুষ এই বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখে, বুঝে, সম্মত হয় অথবা অসম্মত হয়, অনুমতি দেয় অথবা নিষেধ করে, মনে হয় এইবার বুঝি পুরুষ তাহার প্রকৃতির প্রভু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ ব্যাঘ্র বা জড় পরমাণুর মত নহে; সে খুন করিয়া এমন সাফাই দিতে পারে না যে, "আমি আমার প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতেছি", পারে না কারণ ব্যাঘ্র, জড় বা অগ্নির প্রকৃতি তাহার প্রকৃতি নহে এবং তাহাদের স্বধর্ম, তাহাদের কর্মের নীতি, তাহার স্বধর্ম নহে। তাহার আছে একটা সচেতন বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে কর্ম করিতে হইবে। যদি সে তাহা না করে, যদি সে তাহার ইন্দ্রিয়ের বশে, রিপুর তাড়নায় অন্ধভাবে কর্ম করে, তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করা হয় না, স্বধর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিতঃ; তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের যোগ্য কর্ম করা হয় না, কেবল পশুর মতনই কর্ম করা হয়। সত্য বটে যে, সে যে-কোন কর্মই করুক বা যে-কোন কর্তব্যই অবহেলা করুক, তাহার মধ্যে রজোগুণ অথবা তমোগুণ তাহার বুদ্ধিকে ধরিয়া তাহা সমর্থন করাইয়া লয়, তবুও যেমন করিয়া হউক বুদ্ধির সমর্থন লইতেই হয়, অন্তত বুদ্ধিকে জানাইতে হয়, তা সে কর্মের আগেই হউক বা পরেই হউক। তাহা ছাড়া মানুষের মধ্যে সত্ত্ব জাগ্রত, তাহা কেবল বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমূলক সঙ্কল্পরূপেই ক্রিয়া করে না—পরন্তু আলোকের সন্ধান করে, যথাযথ জ্ঞান চায় এবং সে-জ্ঞান অনুযায়ী যথাযথ কর্ম করিতে চায়, অপরের জীবন ও দাবি সম্বন্ধে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকতা তাহার নিজের প্রকৃতির যে উচ্চতর ধর্ম সৃষ্টি করে তাহা জানিতে এবং তাহা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, এবং পুণ্য জ্ঞান ও সহানুভূতি যে মহত্তর শান্তি ও সুখ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে সে সম্বন্ধে ধারণা করে। মানুষ অল্পাধিক অসম্পূর্ণভাবে জানে যে, তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতির দ্বারা তাহার রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার সাধারণ মনুষ্যত্বে পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভের ইহাই পন্থা।

কিন্তু প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকতার প্রাধান্যই কি মুক্তির অবস্থা, আর মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা কি স্বাধীন ইচ্ছা? গীতা এক উচ্চতর চৈতন্যের দিক হইতে দেখিয়া ইহা অস্বীকার করিয়াছে। তাত্ত্বিক অবস্থাতে চেতন বুদ্ধি হইতেছে

প্রকৃতিরই একটি যন্ত্র এবং যখন তাহা কাজ করে, যত সাত্ত্বিকভাবেই সে কাজ করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই সে কাজ করে এবং আত্মা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়ার দ্বারাই চালিত হয়। অন্ততপক্ষে ইহা ঠিকই যে আমরা যাহাকে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলি তাহার দশ অংশের নয় অংশই স্পষ্টত ভ্রম; কোন বিশেষ মুহূর্তে ঐ ইচ্ছা কি হইবে, কোন দিকে চালিত হইবে তাহা স্বতঃনির্ধারিত হয় না পরন্তু আমাদের অতীত, আমাদের বংশ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের পরিবেষ্টনীর দ্বারা, যে বিরাট জটিল জিনিসকে আমরা "কর্ম" বলি সমগ্রভাবে তাহার দ্বারাই নির্ধারিত হয়; এই "কর্ম" আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, আমাদের উপরে এবং জগতের উপরে প্রকৃতির যে সমগ্র অতীত ক্রিয়া তাহা এক-এক ব্যক্তির উপরে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, সে কি হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দিতেছে, কোন বিশেষ মুহূর্তে তাহার ইচ্ছা কি হইবে এবং যতদূর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, সেই মুহূর্তে সে কি কাজ কবিবে তাহাও নির্ধারিত করিয়া দিতেছে, অহং সকল সময়েই নিজের "কর্মের" সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং বলে, "আমি করিয়াছি", "আমি ইচ্ছা করি", "আমি দুঃখ ভোগ করি", কিন্তু সে যদি নিজের দিকে চাহিয়া দেখে এবং বুঝে যে, সে কিরূপে গঠিত হইয়াছে তাহা হইলে সে যেমন পশুর সম্বন্ধে তেমনই মানুষের সম্বন্ধেও বলিতে বাধ্য হইবে যে, "প্রকৃতি আমার মধ্যে ইহা করিয়াছে, প্রকৃতি আমার মধ্যে ইচ্ছা করে," আর যদি সে সংশোধন করিয়া বলে "আমার প্রকৃতি," তাহার অর্থ কেবল ইহাই হয়—"প্রকৃতি এই বিশেষ জীবটির মধ্যে নিজে যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে।" জগতের এই দিকটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমস্তই হইতেছে "কর্ম", আত্মা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই, আত্মা হইতেছে মানসিক অহংয়ের একটা ভ্রম মাত্র। অহং যখন মনে করে, "আমি এই পুণ্য কর্ম করিতে সঙ্কল্প করিতেছি, ঐ পাপ কর্মটা বর্জন করিতেছি", তখন সে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের একটি ক্রিয়াকে নিজ ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে, বস্তুত এই সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রকৃতি বুদ্ধির ভিতর দিয়া এক প্রকার কর্ম বাছিয়া লয়, অন্য প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করে; প্রকৃতির এই ক্রিয়ার সহিত অহং নিজেকে এক করিয়া দেখে ঠিক যেমন ঘূর্ণীয়মান চক্রের উপরিস্থিত মক্ষিকা অথবা ঐ চক্রেরই দন্ত বা অন্য কোন অংশ (যদি তাহা সচেতন হইত) মনে করিতে পারে যে, সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ঘুরিতেছে। সাংখ্য বলে, নিষ্ক্রিয় সাক্ষী পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, সঙ্কল্প করিতেছে, কর্ম করিতেছে।

কিন্তু যদিও সাংখ্যের এই একান্ত উক্তি সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক (কিভাবে সংশোধন প্রয়োজন তাহা আমরা পরে দেখিব) তথাপি আমাদের

ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীনতা (যদি আমরা উহাকে এই নাম দিতেই চাই) খুবই আপেক্ষিক (relative), প্রায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে অন্য এমন বহু জিনিস যাহাদের উপর আমাদের কোন হাতই নাই। ইহার যে প্রবলতম শক্তি তাহাও প্রকৃত প্রভুত্ব নহে। উহা যে ঘটনাস্রোতের তীব্র বেগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে সে ভরসা করিতে পারা যায় না; রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে দাবাইয়া রাখে, অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয় অথবা উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, আর যদি তা না পারে ত সূক্ষ্মভাবে উহাকে প্রতারিত করে, ফাঁকি দেয়। আমাদের ইচ্ছা যত সাত্ত্বিকই হউক না কেন, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা উহা এরূপ অভিভূত বা মিশ্রিত বা প্রতারিত হয় যে তাহা কেবল আংশিকভাবেই সাত্ত্বিক হইতে পারে; মনোবিজ্ঞানীর নির্মম সূক্ষ্মদৃষ্টি মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট কর্মের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণ আত্মপ্রতারণার অংশ ধরিয়া ফেলে তাহা এইভাবেই উত্থিত হয়, অজ্ঞাতসারে এমন কি নির্দোষভাবেই মানুষ মনকে চোখ ঠারে, নিজেদের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করিতেছি, তখনও আমাদের কর্মের পশ্চাতে কত-কত শক্তি লুকাইয়া থাকে, অতিশয় সতর্ক আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বারাও তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না; যখন আমরা মনে করি অহং হইতে মুক্ত হইয়াছি, তখনও অহং থাকে, প্রচ্ছন্নভাবে—যেমন পাপীর মনের মধ্যে থাকে তেমনি সাধুর মনের মধ্যেও থাকে। আমাদের কর্ম এবং কর্মের উৎস সম্বন্ধে যখন আমাদের চক্ষু প্রকৃতভাবে খুলিয়া যায়, তখন আমরা গীতার সঙ্গেই বলিতে বাধ্য হই, গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে, "প্রকৃতির গুণসকলই গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে।"

এইজন্য সত্ত্বগুণের সমুচ্চ প্রাধান্য হইলেও তাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা হয় না। কারণ, গীতা দেখাইয়াছে যে, অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বও বন্ধন করে, এবং অন্যান্য গুণের ন্যায়ই বাসনার দ্বারা, অহংএর দ্বারা বন্ধন করে; সে বাসনা মহত্তর, সে অহং শুদ্ধতর—কিন্তু যতদিন এই দুইটি যে কোন রূপে সত্তাকে অধিকার করিয়া থাকিবে ততদিন স্বাধীনতা নাই। যে মনুষ্য সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার মধ্যে সাধুর অহং রহিয়াছে, জ্ঞানীর অহং রহিয়াছে এবং তিনি সেই সাত্ত্বিক অহংকে তৃপ্ত করিতে চান। তিনি নিজের জন্য সাধুতা চান, জ্ঞান চান। আমাদের মধ্যে যে অহং রহিয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র "আমি", যখন আমরা আর তাহাকে তৃপ্ত করিতে চাহি না, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করি না, ইচ্ছা করি না, কেবল তখনই হয় প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা। অন্য কথায়, স্বাধীনতা, উচ্চতম আত্মজয় আরম্ভ হয় যখন প্রাকৃত আত্মার ঊর্ধ্বে আমরা পরম আত্মাকে দেখিতে পাই, ধরিতে পারি; অহং তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, অন্ধকার ছায়ায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আর

ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক আত্মাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাকে সত্তায় ও চেতনায় তাহার সহিত এক করি এবং তাহাকে তাহার ব্যষ্টিগত কর্মশীল প্রকৃতিতে এক পরম ইচ্ছাশক্তির, যে একমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন, তাহারই যন্ত্র করিয়া দিই। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের বহু ঊর্ধ্বে উঠিতেই হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; কারণ ঐ আত্মা সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে। আমাদিগকে তাহাতে উঠিতে হইবে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই, কিন্তু আমরা যখন সত্ত্বকে অতিক্রম করিব কেবল তখনই তাহাকে লাভ করিব; অহংকে ধরিয়াই আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু অহংকে না ছাড়িলে তাহাতে উপনীত হইতে পারি না; আমরা তাহার দিকে আকৃষ্ট হই যে বাসনার দ্বারা তাহা উচ্চতম, অন্য সকল বাসনা অপেক্ষা তাহা প্রবল ও উল্লাসময়; কিন্তু যতক্ষণ না সকল বাসনা আমাদের সত্তা হইতে খসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে নিশ্চিতভাবে বাস করিতে পারি না। একটা অবস্থায় আমাদিগকে আমাদের মুক্তির বাসনা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণাতীত

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বের সীমা কতদূর তাহা আমরা দেখিলাম, এই নিয়ন্তৃত্বের অর্থ কেবল এই যে, আমরা যে অহং হইতে কর্ম করি তাহা নিজেই প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি যন্ত্রবিশেষ এবং সেই জন্যই তাহা প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না; অহংয়ের যে ইচ্ছা তাহা প্রকৃতির দ্বারাই নির্ণীত ইচ্ছা, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহাব নিজেরই অতীত কর্ম ও আত্ম-পরিবর্তন-সমূহের দ্বারা যেভাবে গঠিত হইয়াছে ঐ ইচ্ছা সেই প্রকৃতিরই অংশ, আর আমাদের মধ্যে এইভাবে গঠিত প্রকৃতির দ্বারা এবং ইহার মধ্যে এইভাবে গঠিত ইচ্ছাব দ্বারাই আমাদের বর্তমান কর্ম নির্ধারিত হয়। কেহ-কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা সর্বপ্রথমে যে কর্ম কবি সেটি আমরা সর্বদা স্বাধীনভাবেই বাছিয়া লই, তাহার পরে যাহা কিছু আসে তাহা সেই প্রাথমিক কর্মের দ্বাবা যতই নির্ধারিত হউক না কেন; আর এই প্রথমে আবম্ভ করিবার ক্ষমতা এবং আমাদের ভবিষ্যতের উপর ইহার পরিণাম, এইখানেই রহিয়াছে আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন প্রথম কর্ম কোথায় যাহার পিছনে কোন অতীত নাই, তাহাকে নির্ধারণ করিয়া দেয় নাই? আমাদের প্রকৃতির সেই বর্তমান অবস্থা কোথায় যাহা সাফল্যে এবং খুঁটিনাটিতে আমাদের অতীত প্রকৃতির কর্মের পরিণাম নহে? স্বাধীন প্রাথমিক কর্মের ধারণা এইজন্যই আমাদের মনে উঠে যে, আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই জীবন যাপন করি, আমরা সর্বদা আমাদের বর্তমান হইতে আমাদের অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহি না, সেইজন্যই বর্তমান এবং বর্তমানের পরিণাম-ফলই আমাদের মনে জীবন্তভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে, আর আমাদের বর্তমান যে সম্পূর্ণভাবেই আমাদের অতীতের পরিণাম সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকে; এই অতীতকে আমরা দেখি যেন একেবারে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা কথা কই, কর্ম করি যেন শুদ্ধ ও নবীন মুহূর্তে আমরা আমাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, আমরা ভিতর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সংকল্প গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এমন কোন সম্পূর্ণ মুক্তি নাই, আমাদের সংকল্পে এমন কোনও স্বাধীনতা নাই।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাকে সকল সময়েই কয়েকটি

সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হয়, কারণ প্রকৃতি সর্বদা এই-ভাবেই কর্ম করে; এমন কি আমাদের নিশ্চেষ্টতা, কোনরূপ ইচ্ছা করিতে অস্বীকার, ইহাও একটা নির্বাচন। ইহাও হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছার একটি ক্রিয়া, এমন কি পরমাণুর মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি সকল সময়েই কর্ম করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে ইচ্ছা কর্ম করিতেছে তাহার সহিত আমরা আমাদের অহংভাবকে কতটা সংযুক্ত করি তাহা লইয়াই সমস্ত প্রভেদ; যখন আমরা এইভাবে নিজদিগকে উহার সহিত সংযুক্ত করি, তখন আমরা মনে করি যে ঐটি আমাদেরই ইচ্ছা এবং বলি যে উহা হইতেছে স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমরা নিজেরাই কর্ম করিতেছি। আর ভুল হউক আর না হউক, ভ্রান্তি হউক আর না হউক, ইহা যে নিষ্ফল, ইহার যে কোন উপযোগিতা নাই তাহা নহে; প্রকৃতিতে প্রত্যেক জিনিসেরই ফল আছে, উপযোগিতা আছে। বস্তুত ইহা হইতেছে আমাদের চেতন সত্তার সেই প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহার অন্তরস্থিত গুপ্ত পুরুষের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে ক্রমশ বেশী বেশী সজ্ঞান ও সজাগ হইয়া উঠে এবং সেই জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা কর্ম সম্বন্ধে বৃহত্তর সম্ভাবনায় উন্মুক্ত হয়; এই অহংভাব ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাহায্যেই সে নিজেকে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসমূহে উন্নীত করে, তামসিক প্রকৃতির পূর্ণ বা সাময়িক নিশ্চেষ্টতা হইতে রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রামের মধ্যে উঠে এবং রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রাম হইতে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহত্তর জ্যোতি, সুখ ও পবিত্রতার মধ্যে উঠে। প্রাকৃত মানব নিজের উপর যে আপেক্ষিক আত্মজয় লাভ করে তাহা হইতেছে তাহার প্রকৃতির নিম্নতম সম্ভাবনাসকলের উপরে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসকলের প্রাধান্য; আর ইহা সম্পন্ন হয় যখন উচ্চতর গুণ নিম্নতর গুণকে জয় করিবার, বশীভূত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত সে তাহার অহংভাবকে সংযুক্ত করে। স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি ভ্রান্ত হউক আর নাই হউক, ইহা প্রকৃতির কর্মের একটি আবশ্যকীয় কৌশল, মানুষের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়, আর সে যতক্ষণ না উচ্চতর সত্যের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ এই অনুভূতি নষ্ট হইলে তাহার পক্ষে বিভ্রাট হইবে। যদি বলা যায় (এমন বলা হইয়া থাকে) যে, প্রকৃতি মানুষকে প্রতারণা করিয়া নিজের আদেশ পালন করাইয়া লয়, আর ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা হইতেছে এইসব প্রতারণার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবলতম, তাহা হইলেও ইহাও বলিতে হইবে যে, এই প্রতারণা তাহারই কল্যাণের জন্য এবং ইহা ছাড়া তাহার পূর্ণ সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ হইতে পারে না।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবেই প্রতারণা নহে, ইহা কেবল একটা দেখিবার ভুল, ইহাকে ঠিক যে-ভাবে যেখানে দেখিতে হইবে সেরূপ দেখা হয় না; অহং মনে

করে যে, সে-ই হইতেছে প্রকৃত আত্মা, সে এমনভাবে ব্যবহার করে যে সে-ই হইতেছে কর্মের কেন্দ্র, যেন সব কিছু রহিয়াছে তাহারই জন্য, এবং এখানেই সে দেখিবার ভুল করে, বুঝিবার ভুল করে। সে যে মনে করে, আমাদের প্রকৃতির এই কর্মের মধ্যে এমন কেহ বা কোন বস্তু রহিয়াছে যে তাহার কর্মের প্রকৃত কেন্দ্র, তাহার জন্যই সব কিছু রহিয়াছে—ইহাতে কোন ভুল নাই; কিন্তু এইটি অহং নহে, ইহা হইতেছে আমাদের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বর, ভাগবত পুরুষ, এবং তাঁহার অংশস্বরূপ জীব—এই জীব আর অহং এক বস্তু নহে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত এক আত্মা রহিয়াছে, সে সকলের প্রভু, তাহারই জন্য, তাহারই আদেশে প্রকৃতি সমুদয় কর্ম করিতেছে—আমাদের মনে এই সত্যেরই বিকৃত চূর্ণিত ছায়া হইতেছে অহংয়ের অহমিকা। সেইরূপই অহংয়ের যে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি তাহাও হইতেছে—আমাদের এক মুক্ত আত্মা রহিয়াছে এই সত্যেরই বিকৃত ও অযথান্যস্ত অনুভূতি; প্রকৃতিতে যে ইচ্ছা তাহা হইতেছে এই আত্মারই ইচ্ছার মন্দীভূত ও বিকৃত ছায়া—মন্দীভূত ও বিকৃত কারণ উহা কালের মুহূর্তসকলের ধারাবাহিকতার মধ্যে রহিয়াছে এবং অনবরত পরিবর্তনের দ্বারা কর্ম করিতেছে, তাহাতে অতীতের পূর্ণ স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের ফলাফল ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। কিন্তু অন্তরে যে দিব্য ইচ্ছা তাহা কালের মুহূর্তসকলের ঊর্ধ্বে এবং তাহা এই সমস্তই জানে; আমরা বলিতে পারি যে, ঐ আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা ও জ্ঞান পূর্ণ অতিমানস জ্যোতিতে যাহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি করে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম হইতেছে সেইটিকে প্রাকৃত ও অহংভাবময় অজ্ঞানের দুরূহ পরিস্থিতিতে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা।

কিন্তু আমাদের ক্রম-প্রগতিতে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যের দিকে চক্ষু উন্মীলন করিতে প্রস্তুত হইব, আর তখন আমাদের অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। অহংভাবাত্মক স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা বর্জনের অর্থ কর্মের অবসান নহে, কারণ প্রকৃতিই হইতেছে কর্ত্রী, তাহার ক্রমবিকাশে অহংভাবের উদ্ভব হইবার পূর্বে যেমন সে কর্ম করিত, এই যন্ত্রটি পরিত্যক্ত হইবার পরও সে তেমনিই কর্ম করিবে; এমন কি যে মানুষের মধ্যে ইহা পরিত্যক্ত হইবে তাহার মধ্যে বৃহত্তর কর্মের বিকাশ করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কারণ তাহার মন আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে অতীতের আত্মবিকাশের দ্বারা তাহার প্রকৃতি বর্তমানে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও ভাল-রূপে জানিতে পারিবে কি কি পারিপার্শ্বিক শক্তি তাহার প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতির বিকাশের বাধা বা সহায় হইতেছে, আর তাহার মধ্যে যে-সব জিনিস প্রকট হইতে পারে কিন্তু এখনও প্রকট হয় নাই সে-সবের

জন্য যে সকল মহত্তর সম্ভাবনা তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সে সকল সম্বন্ধেও সে অধিকতর সজ্ঞান হইয়া উঠিবে; আর এই যে মহত্তর সম্ভাবনা সকলের সন্ধান সে পায় এই সব সম্বন্ধে আত্মপুরুষের অনুমতি এই অহং-ভাবশূন্য মনের ভিতর দিয়া আরও অবাধে আসিতে পারে এবং তাহাতে প্রকৃতির সাড়া দিবার পক্ষে এবং তাহার ফলস্বরূপ ঐ সকল সম্ভাবনার বিকাশ ও সিদ্ধির পক্ষে এইরূপ মন আরও অবাধ যন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার বর্জন যেন আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে দৃষ্টিবিরহিত বুদ্ধিতে কেবল অদৃষ্টবাদ (fatalism) বা প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব-বাদ না হয়; কারণ তাহা হইলে কেবলমাত্র অহংকেই আত্মা বলিয়া আমাদের মনে ধারণা থাকিয়া যাইবে, আর যেহেতু ঐ অহং সকল সময়েই প্রকৃতির যন্ত্রমাত্র, আমরা অহংকে ধরিয়া এবং আমাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কর্ম করিব, এবং এইরূপ ধারণা কোন প্রকৃত পরিবর্তন আনিবে না, কেবল আমাদের বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু সংশোধন হইবে। আমাদের অহং ও অহংয়ের ক্রিয়া যে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই বাহ্যিক সত্যটিই আমরা মানিয়া লইব; কিন্তু আমাদের মধ্যে গুণসকলের ক্রিয়ার অতীত যে অজাত আত্মা রহিয়াছে তাহার দর্শন আমরা পাইব না; আমাদের মুক্তির দ্বার কোথায় রহিয়াছে তাহার দর্শন আমরা পাইব না। প্রকৃতি ও অহং লইয়াই আমাদের সব নহে; আমাদের মধ্যে রহিয়াছে মুক্ত আত্মা, পুরুষ।

কিন্তু পুরুষের স্বাধীনতার স্বরূপ কি? প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের পুরুষ আপন মূল সত্তায় স্বাধীন, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়, "অকর্তা" বলিয়াই স্বাধীন; সে প্রকৃতিকে তাহার কর্মের ছায়া নিষ্ক্রিয় আত্মার উপর ফেলিতে যখন অনুমতি দেয় তখন সে বাহ্যত গুণসকলের কর্মাবলীর দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ না সে প্রকৃতি হইতে নিজেকে বিযুক্ত করে এবং প্রকৃতির খেলা বন্ধ না হইয়া যায় ততক্ষণ সে তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় না। তাহা হইলে যদি কোন মনুষ্য "আমি কর্তা" বা "আমার কর্ম" এইরূপ অহংভাব বর্জন করে, যদি গীতার উপদেশ মত সে নিজেকে অকর্তা বলিয়া দেখে, আত্মানম্ অকর্ত্তারম্, কর্মসকল তাহার নিজের নহে পরন্তু প্রকৃতির, প্রকৃতির গুণত্রয়ের খেলা—এই উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কি অনুরূপ ফল হইবে না? সাংখ্যের পুরুষ হইতেছে অনুমন্তা, কিন্তু সে কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবেই অনুমতি দেয়, কর্মটি সম্পূর্ণভাবেই হইতেছে প্রকৃতির; মূলত সেই পুরুষ হইতেছে দ্রষ্টা ও ভর্তা, বিশ্ব-ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রী ও সক্রিয়া চৈতন্য নহে। সে পুরুষ দেখে, গ্রহণ করে, কোন নাটক অভিনয়ের দ্রষ্টা যেভাবে ঐ অভিনয়কে গ্রহণ করে সেইভাবে সে গ্রহণ করে, কিন্তু যে-পুরুষ নিজের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং নিজের সত্তার মধ্যে অভিনীত নাটককে দেখে এবং নিয়ন্ত্রণও করে

সাংখ্যের পুরুষ তাহা নহে। তাহা হইলে যদি সে অনুমতিটি প্রত্যাহার করিয়া লয়, যে কর্তৃত্বভাবের ভ্রান্তি হইতে অভিনয়টি চলিতেছে সেই ভ্রান্তি স্বীকার করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সে আর ভর্তা থাকে না, প্রকৃতির ঐ খেলাকে ধরিয়া থাকে না এবং সেইজন্য কর্মটি থামিয়া যায়, কারণ কেবল দ্রষ্টা চৈতন্যময় পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি ঐ কর্ম সম্পাদন করে এবং কেবল পুরুষের দ্বারা বিধৃত হইলেই সে উহা চালাইতে পারে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার শিক্ষা সাংখ্য হইতে ভিন্ন, কারণ একই প্রক্রিয়ার ফল হইতেছে সম্পূর্ণ পৃথক, এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে কর্মের বিরতি, আর এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে মহান কর্ম, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম, দিব্য কর্ম। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে দুইটি বিভিন্ন বস্তু, গীতার মতে তাহারা হইতেছে একই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার দুইটি দিক, দুইটি শক্তি; পুরুষ কেবল অনুমতিদাতা নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি জগৎলীলা উপভোগ করিতেছেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া জগতে ভাগবত ইচ্ছা ও জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিতে-ছেন—এই জগতের ব্যবস্থা তাঁহারই অনুমতির দ্বারা বিধৃত, তিনি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, ইহা রহিয়াছে তাঁহারই সত্তায়; তাঁহার সত্তার ধর্মের দ্বারা এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত সচেতন ইচ্ছার দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত। এই পুরুষকে জানা, ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া, ইহার দিব্য সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই উদ্দেশ্যেই অহং এবং তাহার ক্রিয়াকে বর্জন করিতে হয়। তখন মানুষ ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বতন ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠে।

নীচের প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতিতে এই উন্নয়ন যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয় তাহা পুরুষের সহিত প্রকৃতির জটিল সম্বন্ধ হইতেই উদ্ভূত; ইহা গীতার পুরুষত্রয় তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে। যে পুরুষ সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির কার্য. তাহার পরিবর্তন লীলা, তাহার ক্রমান্বয় বিকাশকে অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহাই ক্ষর পুরুষ; মনে হয় ইহা প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার চলার সহিত চলিতেছে, প্রকৃতির "কর্মের" অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা এই পুরুষের নানারূপের যে-সব পরিবর্তন হইতেছে সে-সবকে সে তাহার সত্তার পরিবর্তন বলিয়াই অনুসরণ করিতেছে। প্রকৃতি এখানে ক্ষর, কালের মধ্যে অবিরাম গতি ও পরিবর্তন, অবিরাম বিবর্তন। কিন্তু এই প্রকৃতি পুরুষেরই কার্যকরী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ প্রকৃতি কি হইবে তাহা পুরুষের স্বরূপেরই উপর নির্ভর করে, পুরুষের বিবর্তনের যে-সব সম্ভাবনা রহিয়াছে তদনুসারেই প্রকৃতি কার্য করিতে পারে; প্রকৃতি পুরুষের সত্তার বিবর্তনকে প্রকট করিতেছে। প্রকৃতির "কর্ম"

পুরুষের "স্বভাবের" (the own-nature) দ্বারা তাহার আত্ম-বিবর্তনের (self-becoming) ধারার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, যদিও অনেক সময় মনে হয় যে কর্মের দ্বারাই প্রকৃতি নির্ধারিত হইতেছে, কারণ ইহার দ্বারাই বিবর্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা স্বরূপে যাহা তদনুসারে আমরা কর্ম করি, আবার আমাদের কর্মের দ্বারাই আমাদের স্বরূপকে বিকশিত করি, প্রকট করি। প্রকৃতিই হইতেছে কর্ম, পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রকৃতিই হইতেছে সেই শক্তি যাহার দ্বারা এই সব সম্পাদিত হয়; কিন্তু পুরুষ হইতেছে চৈতন্যময় সত্তা, তাহা হইতেই ঐ শক্তি উদ্ভূত, তাহারই চৈতন্যের জ্যোতির্ময় উপাদান হইতে প্রকৃতি পরিবর্তনশীল ইচ্ছা আহরণ করিয়াছে, সেই ইচ্ছা নিজ পরিবর্তনসমূহ প্রকৃতির কর্মের মধ্যেই প্রকট করিতেছে। আর এই পুরুষ একও বটে, বহুও বটে; ইহা হইতেছে সেই এক প্রাণ-সত্তা যাহা হইতে সমস্ত প্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে আবার ইহাই সমস্ত প্রাণী; ইহা হইতেছে এক বিশ্ব-সত্তা আবার ইহাই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত সত্তা, সর্ব্বভূতানি, কারণ এই সবই হইতেছে অদ্বিতীয় এক; সবই হইতেছে বহু পুরুষ। তাহাদের মূল সত্তায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ এক মাত্র পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যান্ত্রিক কৌশল-স্বরূপ যে অহংভাব রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতিরই ক্রিয়ার একটা অংশ, তাহার বশে মন বর্তমান মুহূর্তের সীমাবদ্ধ বিবর্তনের সহিত, কোন বিশেষ দেশ ও কালে প্রকৃতির সক্রিয় চৈতন্যের সমষ্টির সহিত, প্রকৃতির অতীত কর্মসমষ্টির যে-ফল মুহূর্তে-মুহূর্তে হইতেছে তাহার সহিত পুরুষের চৈতন্যকে একই বলিয়া ধারণা করে। প্রকৃতির মধ্যেই এই সব জীবের একত্ব এক প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র কর্মে এক বিশ্বপুরুষ অভি-ব্যক্ত, প্রকৃতি পুরুষকে অভিব্যক্ত করিতেছে, পুরুষই প্রকৃতি হইতেছে— এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল বিরাট বিশ্ব-বিবর্তনকে জানা; এই বিবর্তন মিথ্যা নহে, মায়া নহে কিন্তু ইহার জ্ঞান হইতেই আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা সকল সময়েই ইহা অপেক্ষা আরও কিছু, ইহার ঊর্ধ্বে আরও কিছু।

কারণ যে পুরুষ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এবং তাহার কর্মে বদ্ধ তাহার ঊর্ধ্বে রহিয়াছে পুরুষের আর এক স্থিতি (status) ; তাহা শুধুই একটা স্থিতি, একেবারেই ক্রিয়া নহে, সেইটি হইতেছে নীরব, অক্ষর, সর্বব্যাপী, স্বপ্রতিষ্ঠ, নিশ্চল আত্মা, সর্ব্বগতম্ অচলম্, তাহা বিবর্তন নহে পরন্তু অপরিবর্তনীয় সত্তা, তাহাই অক্ষর পুরুষ। ক্ষরে পুরুষ প্রকৃতির কর্মের মধ্যে জড়িত হইয়াছে, অতএব সে কালের স্রোতে, বিবর্তনের তরঙ্গে কেন্দ্রীভূত, যেমন নিজেকে তাহার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে নহে, কেবল এইরূপ

দেখায় মাত্র। অক্ষরে প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে নীরবতায় পতিত হয় এবং বিশ্রাম করে, অতএব পুরুষ নিজ অক্ষর সত্তা অবগত হয়। ক্ষর হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন সে প্রকৃতির গুণসকলের বৈচিত্র্যময় খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, এবং নিজেকে সগুণ (the personal) বলিয়া জানে; অক্ষর হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন এই গুণসকল সাম্যাবস্থায় পতিত হয় এবং পুরুষ নিজেকে নির্গুণ (the impersonal) বলিয়া জানে। অতএব ক্ষর পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির কর্মের সহিত এক করায় কর্তা বলিয়া মনে হয়, আর গুণসমূহের ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত অক্ষর হইতেছে নিষ্ক্রিয় অকর্তা এবং সাক্ষী। মানুষের আত্মা যখন ক্ষরের প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করে, তখন নামরূপের খেলার সহিত নিজেকে এক বলিয়া দেখে এবং প্রকৃতিতে যে অহংভাব রহিয়াছে তাহার দ্বারা নিজ আত্ম-জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিতে তৎপর হয়, অতএব সে তাহার অহংকেই কর্তা বলিয়া মনে করে, আর যখন সে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক পুরুষের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এবং প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া ও নিজেকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী বলিয়া অবগত হয়, অকর্তারম্। মানুষের মনকে এই দুইটি প্রতিষ্ঠার কোন একটির দিকে ঝুঁকিতে হয়, একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে সে অপরটি ছাড়িয়া দেয়, হয় সে প্রকৃতির দ্বারা গুণের ও নামরূপের পরিবর্তনের ধারায় কর্মে বন্ধ হয় অথবা সে অক্ষর নির্ব্যক্তিক সত্তায় প্রকৃতির কর্মপরম্পরা হইতে মুক্ত হয়।

কিন্তু এই দুইটি পুরুষের স্থিতি ও অক্ষরতা এবং প্রকৃতিতে পুরুষের কর্ম, তাহার ক্ষরতা—ইহারা বস্তুত একই সঙ্গে যুগপৎ রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে মায়াবাদ বা দ্বৈতবাদের ন্যায় কোন মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত যদি না পুরুষের এমন এক পরম সত্তা থাকিত, এই দুইটি, ক্ষর ও অক্ষর, যাহার দুইটি বিপরীত দিক, কিন্তু যাহা দুইটির কোনটির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে। আমরা দেখিয়াছি, গীতা এই সত্তা পাইয়াছে পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে। পরম পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর, ভগবান, সর্ব জীবের প্রভু, সর্বভূতমহেশ্বর। তিনি তাঁহার নিজ সক্রিয়া প্রকৃতিকে (গীতার ভাষায় স্বাম প্রকৃতিম্) জীবের মধ্যে প্রকট করেন, তাহা প্রত্যেক জীবের স্বভাবের দ্বারা, তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার ধর্ম অনুসারে (প্রত্যেক জীবকেই এই ধর্মের মূল ধারাগুলি অনুসরণ করিতে হয়) প্রকটিত হয়, যদিও তাহা অহংভাবাত্মক প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের উপর জটিল ক্রিয়ার দ্বারাই (গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে) প্রকটিত হয়। ইহাই ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া, মানুষের পক্ষে এই মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন, দুরত্যয়া,—তথাপি গুণত্রয়ের অতীত হইয়া মানুষ ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে। কারণ যদিও ঈশ্বর ক্ষরভাবে তাঁহার প্রকৃতিশক্তির দ্বারা এই সব সম্পন্ন করেন, তথাপি অক্ষরভাবে তিনি অস্পৃষ্ট, উদাসীন, সব সমভাবে দেখেন,

সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত, অথচ সকলের ঊর্ধ্বে। তিন অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বর, সর্বোচ্চ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর, অক্ষর অবস্থায় তিনি প্রভু ও বিভু, সর্ব-ব্যাপী নির্ব্যক্তিক সত্তা, এবং ক্ষর অবস্থায় তিনি সর্বগত ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বত্র বিদ্যমান সক্রিয় ঈশ্বর। যখন তিনি তাঁহার নামরূপের খেলা প্রকট করিতেছেন তখনও তিনি নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক সত্তায় মুক্ত; তিনি কেবল নির্গুণও নহেন, কেবল সগুণও নহেন, তিনি এই দুইভাবে একই অদ্বিতীয় সত্তা; উপনিষদের ভাষায় তিনি নির্গুণো গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে সে সব তিনি পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন (তখনও জীবিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে তিনি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, "আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্বেই মারিয়া রাখিয়াছি"), আর প্রকৃতি যাহা সংঘটিত করে তাহা কেবল তাঁহারই দিব্য সঙ্কল্পের ফল; তথাপি পিছনে তাঁহার নির্ব্যক্তিকতার জন্য তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

কিন্তু ব্যষ্টিগত সত্তারূপে মানুষ অজ্ঞানের বশে নিজেকে কর্মের সহিত এবং বিবর্তনের সহিত এক করিয়া দেখে, যেন ঐটিই তাহার আত্মার সবখানি, যেন উহা আত্মার কেবল একটা শক্তি নহে, উহা হইতেই উদ্ভূত নহে—এই জন্যই সে অহংভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সে মনে করে যে, সে এবং অন্যান্য লোকই সব করিতেছে; সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতিই সব করিতেছে এবং সে অজ্ঞান ও আসক্তির বশে প্রকৃতির কর্মাবলীকে ভুল করিয়া দেখিতেছে। সে গুণসকলের দাস, কখনও তমোগুণের জড়তার দ্বারা প্রতিহত হইতেছে, কখনও রজোগুণের প্রবল ঝটিকার বেগে উড়িয়া যাইতেছে, কখনও সত্ত্বগুণের আংশিক আলোকের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাকৃত মনই এইভাবে গুণসকলের দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে, সেই মন হইতে সে নিজেকে আদৌ পৃথক করিয়া দেখিতেছে না। সেইজন্যই সে দুঃখ ও সুখ, হর্ষ ও শোক, বাসনা ও রিপু, আসক্তি ও ঘৃণা এই সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে; তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা নাই।

মুক্ত হইতে হইলে তাহাকে প্রকৃতির কর্ম হইতে ফিরিয়া অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে; তখন সে গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে উঠিবে, ত্রিগুণাতীত হইবে। নিজেকে অক্ষর ব্রহ্ম, অপরিবর্তনীয় পুরুষ জানিয়া সে নিজেকে অক্ষর নির্ব্যক্তিক সত্তা বলিয়া, আত্মা বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির কর্মধারাকে শান্তভাবে দর্শন করিবে, নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করিবে, কিন্তু নিজে থাকিবে উদাসীন, অস্পৃষ্ট, অচল শুদ্ধ, সর্বভূতের সহিত তাহাদের আত্মায় এক, প্রকৃতি এবং তাহার কার্যাবলীর সহিত এক নহে। যদিও এই আত্মা হইতেছে "প্রভু", "বিভু", তাহার উপস্থিতির দ্বারা প্রকৃতিকে কর্ম করিবার অধিকার দিতেছে,

তাহার সর্বব্যাপী সত্তার দ্বারা প্রকৃতির সেই সকল ধর্ম ধরিয়া রহিয়াছে, অনুমোদন করিতেছে, তথাপি সে নিজে কর্ম সৃষ্টি করে না, কর্তৃত্বের ভাবও সৃষ্টি করে না, অথবা কর্মের সহিত ফলের সংযোগও সৃষ্টি করে না * পরন্তু ক্ষরভাবে প্রকৃতি কেমন করিয়া এইসব সংঘটিত করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, কেবল তাহাই দর্শন করে, এবং সংসারে জাত কোন জীবের পাপ বা পুণ্য সে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে না।† সে তাহার আধ্যাত্মিক নির্মলতা রক্ষা করে। অজ্ঞানে বিমূঢ় অহংই এই সব জিনিসকে নিজের উপর আরোপ করে, কারণ সে কর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, বাস্তবিক পক্ষে সে যে এক মহত্তর শক্তির যন্ত্র তাহা ভুলিয়া নিজেই কর্তা সাজে, অজ্ঞানেনাবৃতম্ জ্ঞানম্ তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। নির্গুণ নির্ব্যক্তিক সত্তায় ফিরিয়া গিয়া জীবাত্মা মহত্তর আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহার গুণসকলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তাহার শুভ অশুভের পাপ পুণ্যের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয়। প্রাকৃত সত্তা, মন, দেহ, প্রাণ তখনও থাকে, প্রকৃতি তখনও কার্য করে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সত্তা আর এই সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না, আর প্রাকৃত সত্তার গুণসকলের খেলা চলিলেও সে হর্ষ বা শোক করে না। সে হয় সকল ব্যাপারের দ্রষ্টা, স্থির ও মুক্ত অক্ষর আত্মা।

এইটি কি শেষ অবস্থা, চূড়ান্ত সম্ভাবনা, শ্রেষ্ঠ রহস্য; তাহা হইতেই পারে না, কারণ ইহা একটা মিশ্রিত বা দ্বিখণ্ডিত অবস্থা, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের অবস্থা নহে, এখানে সত্তা দ্বিধা, তাহাতে ঐক্য সিদ্ধ হয় নাই, আত্মায় রহিয়াছে মুক্তি, কিন্তু প্রকৃতিতে রহিয়াছে অপূর্ণতা। ইহা কেবল একটি ধাপ মাত্র হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার ঊর্ধ্বে আর কি আছে? এক সমাধান হইতেছে সন্ন্যাসীর, তিনি প্রাকৃতিক কর্মকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করেন, অন্তত কর্ম যতদূর বর্জন করা সম্ভব তাহা করেন, যেন অমিশ্র অখণ্ড মুক্তিলাভ করা যায়, কিন্তু ইহা গীতা কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও গীতার অনুমোদিত সমাধান নহে। গীতাও কর্ম ত্যাগের উপর জোর দিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যাস্য, কিন্তু সে ত্যাগ ভিতরের, ব্রহ্মে কর্ম সমর্পণ। ক্ষরে ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির কর্ম সমর্থন করিতেছেন, অক্ষরভাবে সে কর্ম সমর্থন করিলেও নিজেকে সে-কর্ম হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেছেন, নিজের মুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন; ব্রহ্মের অক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যষ্টিগত জীব মুক্ত ও স্বতন্ত্র হয়, অথচ ব্রহ্মের ক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া প্রকৃতির কর্মকে সমর্থন করে কিন্তু তাহার

* ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪

† নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতঃ জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৫

দ্বারা স্পৃষ্ট বা বন্ধ হয় না। ইহা সে সর্বোত্তমভাবে করিতে পারে যখন সে দেখে যে, এই দুইটি হইতেছে এক পুরুষোত্তমেরই দুইটি ভাব। পুরুষোত্তম সর্বভূতের মধ্যে গুপ্ত ঈশ্বররূপে বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বশে প্রকৃতি স্বভাবের দ্বারা কর্মসকল সম্পাদন করে, সে ইচ্ছা আর তখন জীবের অহংভাবের দ্বারা বিকৃত ও স্বরূপভ্রষ্ট হয় না। ব্যষ্টিগত জীব দিব্যভাবাপন্ন প্রকৃতিকে ভাগবত ইচ্ছার যন্ত্র করিয়া দেয়, নিমিত্তমাত্রম্। সে কর্মের মধ্যেও থাকে ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে, গুণ-সকল হইতে মুক্ত, নিস্ত্রৈগুণ্য; গীতা পূর্বেই যে আদেশ দিয়াছে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভাবার্জুন, শেষ পর্যন্ত সে তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণ করে। অবশ্য তখনও সে ব্রহ্মের ন্যায়ই গুণসকলের ভোক্তা থাকে, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা সীমা-বন্ধ থাকে না, নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ, সে ব্রহ্মের ন্যায় সব কিছু ধরিয়া থাকিয়াও অনাসক্ত থাকে, অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ; কিন্তু তাহার মধ্যে গুণসকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাহাদের অহংমূলক স্বরূপ ও প্রতি-ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়। কারণ সে তাহার সমগ্র সত্তাকে পুরুষোত্তমের মধ্যে একীভূত করিয়াছে, সে ভাগবত সত্তাকে এবং উচ্চতর ভাগবত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, মদ্ভাবম, এমন কি তাহার মন এবং প্রাকৃত চৈতন্যকেও ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছে, মন্মনা মচ্চিত্ত। এই রূপান্তরই প্রকৃতির চরম বিকাশ এবং দিব্য জন্মের পূর্ণ সিদ্ধি, রহস্যম্ উত্তমম্। যখন ইহা সংসাধিত হয়, জীব নিজেকে প্রকৃতির প্রভু বলিয়া জানিতে পারে এবং ভাগবত জ্যোতির জ্যোতি হইয়া এবং ভাগবত ইচ্ছার ইচ্ছা হইয়া তাহার প্রাকৃত কার্যাবলীকে দিব্য কর্মে পরিণত করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নির্বাণ ও সংসারের কাজ

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনের যে সংকীর্ণতর মত তাহা নহে। এইজন্যই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তিই হইতেছে উত্তম রহস্যে পেঁীছিবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। কারণ যদি অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনই একমাত্র রহস্য বা উচ্চতম রহস্য হইত তাহা হইলে উহা আদৌ সম্ভব হইত না; কারণ তাহা হইলে একটা বিশেষ অবস্থায় যেমন আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইত ঠিক তেমনিই প্রেম ও ভক্তিরও আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত সম্পূর্ণ ও অনন্য মিলনের অর্থ হইতেছে ক্ষরভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, শুধু ইহার সাধারণ ও নিম্নতন ক্রিয়া নহে পরন্তু ইহার যাহা একেবারে মূল, যাহা ইহার অস্তিত্বকে সম্ভব করিয়াছে, শুধু অজ্ঞানের মধ্যে কার্যাবলী নহে, পরন্তু জ্ঞানের মধ্যেও কার্যাবলী, সবেরই সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। ইহার অর্থ হইবে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সচেতন প্রতিষ্ঠা ও কর্মে যে পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার ফলে ক্ষরপুরুষের খেলা সম্ভব হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, কারণ তখন ক্ষরের কর্ম হইবে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানেরই খেলা, তাহাতে ভাগবত সত্যের কোন মূল বা ভিত্তি থাকিবে না। অন্য পক্ষে যোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের অর্থ হইতেছে আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় তাঁহার সহিত আমার একত্বের উপলব্ধি ও আস্বাদন এবং আমাদের ক্রিয়াশীল সত্তায় তাঁহার সহিত একটা প্রভেদ বিশেষ। এই প্রভেদ দিব্যকর্মের খেলায় বর্তমান থাকে, সে কর্ম হয় দিব্য প্রেমের দ্বারা প্ররোচিত এবং সিদ্ধ ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত, দিব্য কর্মে এই প্রভেদের স্থায়িত্ব এবং আত্মায় ভগবানের যে উপলব্ধি তাহার সহিত জগতে ভগবানের উপলব্ধির সামঞ্জস্য, ইহার জন্যই মুক্ত কর্মীর পক্ষে কর্ম ও ভক্তি সম্ভব হয়; আর শুধু সম্ভব নহে, তাহার পূর্ণসিদ্ধ অবস্থায় উহা অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু অক্ষর আত্মার সুপ্রতিষ্ঠিত উপলব্ধির ভিতর দিয়াই হইতেছে পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের সোজা পথ, আর যে-হেতু এইটি না হইলে কর্ম ও ভক্তি তাহাদের পূর্ণ দিব্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে না বলিয়া গীতা প্রথম প্রয়োজনরূপে এইটির উপর এত জোর দিয়াছে সেইজন্যই গীতার অর্থ

বুঝিতে ভুল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কারণ গীতা যে-সকল শ্লোকে এই প্রয়োজনের উপর খুব বেশী জোর দিয়াছে কেবল সেইগুলিই যদি গ্রহণ করি, কিন্তু পূর্বাপর চিন্তাধারায় তাহাদের স্থান কি সেইটি সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিতে অবহেলা করি তাহা হইলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গীতা বাস্তবিক পক্ষে কর্মহীন লয়ের অবস্থাকেই জীবের চরম গতি বলিয়া শিক্ষা দিতেছে, অচল অক্ষর সত্তায় নিথর শান্তিলাভের সাধনায় কর্ম কেবল প্রথমাবস্থায় উপযোগী উপায়মাত্র; পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই প্রয়োজনের উপর যে-জোর দিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ব্যাপক। সেখানে আমরা যে-যোগের বর্ণনা পাই তাহার সহিত কর্মের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের মনে হইতে পারে এবং যোগী যে পরম পদ লাভ করেন তাহার বর্ণনা করিতে সেখানে "নির্বাণ" শব্দটি পুনঃ-পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পদের লক্ষণ হইতেছে শান্ত আত্ম-নির্বাণের পরম শান্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং, আর ইহা যে বৌদ্ধ মতানুযায়ী শূন্যে আনন্দময় আত্মবিলয়, যেন তাহাই স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গীতা সর্বদা "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ", ব্রহ্মের মধ্যে নির্বাণ, এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছে; স্পষ্টতই মনে হয় যে, এখানে ব্রহ্ম বলিতে অক্ষরকেই বুঝাইতেছে, যাহা প্রকৃতির বাহ্য ব্যাপারে অনুস্যূত থাকিলেও সক্রিয়ভাবে কোনই অংশ গ্রহণ করে না। অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এখানে গীতার কথার প্রকৃত মর্ম কি, বিশেষত এই যে শান্তির কথা বলা হইতেছে ইহা কি সম্পূর্ণ কর্মশূন্য বিরতির শান্তি, অক্ষরে আত্ম-নির্বাণের অর্থ কি ক্ষরের সমস্ত জ্ঞান ও চৈতন্যের এবং ক্ষরের সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ বর্জন? বস্তুত নির্বাণের সহিত সংসারে কোনরূপ অস্তিত্ব ও কর্মের সামঞ্জস্য হয় না এইরূপ ধারণাতেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর আমরা যুক্তি দেখাইতে পারি যে, "নির্বাণ" শব্দটির ব্যবহারই যথেষ্ট এবং ইহার দ্বারাই প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি বৌদ্ধ-মতই অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নির্বাণের সহিত সংসার ও সাংসারিক কর্মের অসামঞ্জস্য বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধদেরই মত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে, আর যদি আমরা গীতার শিক্ষা অনুধাবন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এরূপ মত এই মহত্তম বৈদান্তিক শিক্ষার অন্তর্গত নহে।

যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ, তাঁহার পূর্ণ সমতার কথা বলিয়া গীতা ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মে নির্বাণ বলিতে কি বুঝে পরবর্তী নয়টি শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই রহিয়াছে, "আত্মা যখন আর বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত নহে তখনই মানুষ আত্মায় যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করে, এরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ

করেন, কারণ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত।" * বাসনা ও ক্রোধ ও চিত্তবিক্ষোভের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে অনাসক্তি হইতেছে মূল প্রয়োজন, এবং এইরূপ মুক্তি না হইলে প্রকৃত সুখও সম্ভব নহে, ইহাই গীতার বক্তব্য। ঐ সুখ এবং ঐ সমতা মানুষকে এই শরীরেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে, বিক্ষোভময় নীচের প্রকৃতির বশ্যতার লেশ মাত্র রহিবে না, শরীর ত্যাগ করিয়াই পূর্ণ মুক্তি লাভ করা যায় এই ধারণা বর্জন করিতে হইবে, পূর্ণতম অধ্যাত্ম-মুক্তি এই পৃথিবীতেই লাভ করিতে হইবে, এই মানব জীবনেই উপভোগ করিতে হইবে, প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।† তাহার পর গীতা বলিতেছে, "যিনি আভ্যন্তরীণ সুখ, আভ্যন্তরীণ আরাম এবং আভ্যন্তরীণ জ্যোতি লাভ করিয়াছেন সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে আত্মনির্বাণ লাভ করেন।" * এখানে নির্বাণ শব্দের অতি স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর আধ্যাত্মিক, আভ্যন্তরীণ সত্তায় অহংয়ের নির্বাণ, সে সত্তা চিরদিন দেশ ও কালের অতীত, কার্যকারণ শৃঙ্খল এবং ক্ষর জগতের পরিবর্তন সকলের দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা আত্মানন্দ, আত্মজ্যোতি এবং শাশ্বত শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যোগী আর "অহং" থাকেন না, মন ও শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি থাকেন না; তিনি হন ব্রহ্ম; যে শাশ্বত আত্মা তাঁহার প্রাকৃত সত্তায় অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার অক্ষর ভাগবত স্বরূপের সহিত তিনি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হন।

কিন্তু ইহা কি সকল বিশ্বচৈতন্য হইতে দূরে সমাধির কোন গভীর নিদ্রায় প্রবেশ করা, অথবা ইহা কি প্রকৃতি এবং তাহার কার্যাবলীর সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য অতীত কোন কৈবল্যাত্মক সত্তায় প্রাকৃত সত্তা ও ব্যষ্টিগত আত্মার লয় বা মোক্ষ লাভের উদ্যোগ? নির্বাণে প্রবেশ করিতে হইলে কি বিশ্বচৈতন্য হইতে এইরূপে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক, না, পূর্বাপর বাক্য হইতে যাহা বুঝা যায়, নির্বাণ বিশ্বচৈতন্যের সহিত একই সঙ্গে থাকিতে পারে, এমন কি একভাবে ইহা নির্বাণেরই অন্তর্গত? শেষেরটিই যথার্থ বলিয়া মনে হয় কারণ গীতা পরের শ্লোকেই বলিতেছে, "সেই ঋষিগণই ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন যাঁহাদের মধ্যে পাপের দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী এবং সর্বভূতের হিতসাধনে ব্রতী।" * এই অবস্থা

* বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ৫।২১

† শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ৫।২৩

* যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ৫।২৪

* লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ॥
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৫।২৫

লাভ করাই নির্বাণ লাভ—এইরূপ অর্থ এখানে করা যাইতে পারে। কিন্তু পরের শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের স্থান নাই, যে যতিগণ † কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মনির্বাণ তাঁহাদের চতুর্দিকে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার মধ্যে বাস করিতেছেন, কারণ তাঁহারা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন", † অর্থাৎ আত্মাকে জানা এবং আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্বাণে অবস্থান। ইহা যে নির্বাণ-তত্ত্বের উদার প্রসারণ তাহা সুস্পষ্ট। রিপুগণের সর্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতেষু, সর্বভূতের প্রতিই সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, যে-সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্বঐক্যসাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান—এইসব হইতেছে নির্বাণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এইসবকে লইয়াই নির্বাণ এবং ইহারাই নির্বাণের অধ্যাত্ম সত্তা, গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

অতএব নির্বাণ স্পষ্টতই বিশ্বচৈতন্য এবং সংসারের কর্মের সহিত সুসংগত। কারণ যে-সকল ঋষি ইহা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষরজগতে প্রকট ভগবান সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্মের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যোগযুক্ত; তাঁহারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত। তাঁহারা ক্ষর-পুরুষের অনুভূতিসকলকে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সে-সবকে দিব্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, কারণ গীতা বলিয়াছে, ক্ষরঃ সর্ব্বভূতানি, ক্ষরই সর্বভূত, এবং ব্যাপকভাবে সকলের হিতসাধন হইতেছে প্রকৃতির ক্ষরলীলার মধ্যে দিব্য কর্ম। ব্রহ্মে বাস করার সহিত জগতে এইরূপ কর্ম করার কোনই অসামঞ্জস্য নাই, বরং এইরূপ কর্ম ব্রহ্মে বাসের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং উহার বাহ্যিক পরিণতি কারণ যে ব্রহ্মে আমরা নির্বাণ লাভ করি, যে অধ্যাত্ম চৈতন্যে আমরা ভেদাত্মক অহং-চৈতন্যের লয় সাধন করি, তাহা যে শুধু আমাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহা নহে পরন্তু তাহা এই সর্বভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা শুধু এই সব বিশ্বব্যাপারের উর্ধ্বে ও দূরে নাই পরন্তু এই সবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মে নির্বাণ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে সীমাবদ্ধ ভেদাত্মক চৈতন্য ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতর মায়ার দ্বারা সৃষ্টির বাহিরের দিকে প্রকটিত হইয়াছে, যাহা মিথ্যা ও ভেদের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই বিনাশ ও নির্বাণ, এবং নির্বাণে প্রবেশ হইতেছে এই

† যাঁহারা যোগ ও তপস্যার দ্বারা আত্ম-জয়ের সাধনা করেন তাঁহাদিগকেই "যতী" বলা যায়।

† কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ৫।২৬

অপর সত্য ঐক্যসাধক চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ, যাহা হইতেছে সৃষ্টির অন্তঃস্থল এবং ইহার আধার,—ইহারই মধ্যে সৃষ্টি সমগ্রভাবে বিধৃত, ইহাই হইতেছে সৃষ্টির সমগ্র মূল ও শাশ্বত ও চরম সত্য। যখন আমরা নির্বাণ লাভ করি, নির্বাণের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন ইহা কেবল আমাদের ভিতরেই থাকে না পরন্তু চতুর্দিকে বিদ্যমান থাকে অভিতো বর্ত্ততে, কারণ এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু এই ব্রহ্ম-চৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যে-আত্মা ইহা তাহাই, আমাদের ব্যাষ্টিগত সত্তার পরমাত্মা; আবার আমরা বাহিরে যে-আত্মা ইহা তাহাও, বিশ্বের পরম আত্মা, সর্বভূতের আত্মা। সেই আত্মার মধ্যে বাস করিয়া আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন আর কেবল আমাদের অহং-মূলক সত্তায় বাস করি না; সেই আত্মার সহিত একত্ব লাভ করায় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত অবিচল ঐক্যবোধ আমাদের সত্তার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের সক্রিয় চৈতন্যের মূল প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা হয়।

কিন্তু আবার ঠিক ইহার পরেই আমরা দুইটি শ্লোক পাই, তাহা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত বলিয়াই মনে হইতে পারে। "সমস্ত বাহ্য স্পর্শ বহিষ্কৃত করিয়া এবং দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ন্যাস্ত রাখিয়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ক্রোধ ও ভয়শূন্য হইয়া নিত্য-মুক্ত হন।" * এখানে এই যোগের প্রণালীতে এমন একটা জিনিস আনা হইয়াছে যাহা কর্মযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, এমন কি বিচাব ও ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভের যে খাঁটি জ্ঞানযোগ, তাহা হইতেও ইহা বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়; ইহার সব বিশেষ লক্ষণগুলিই হইতেছে রাজ-যোগের, ইহাতে রাজযোগেরই দেহমন সম্বন্ধীয় তপস্যা গৃহীত হইয়াছে। এখানে মনের সমস্ত বৃত্তিকে জয় করিবার কথা রহিয়াছে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ; শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযমও রহিয়াছে, প্রাণায়াম; ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টিকে ভিতর দিকে টানিয়া লইবার কথাও রহিয়াছে, প্রত্যাহার। এই সবই হইতেছে আভ্যন্তরীণ সমাধিতে মগ্ন হইবার প্রণালী; ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ, আর মোক্ষ বলিতে সাধারণ ভাষায় কেবল ভেদাত্মক অহং চৈতন্যেরই বর্জন বুঝায় না, পরন্তু সমগ্র সক্রিয় চৈতন্যেরই বর্জন বুঝায়, উচ্চতম ব্রহ্মে আমাদের সত্তার লয় বুঝায়। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গীতা ঐ অর্থে

* স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫।২৮

লয়ের দ্বারা মোক্ষলাভের শেষ প্রক্রিয়ারূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে, না, বহির্মুখী মনকে জয় করিবার একটা বিশেষ উপায়রূপে, একটি শক্তিশালী সহায় রূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে? এইটিই কি চরম, চূড়ান্ত, শেষ কথা? ইহা একটা বিশেষ উপায়, একটা সহায় বটে আবার চরম গতিরও অন্তত একটা দ্বার বটে, সে গতি লয় নহে, পরন্তু বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে উন্নয়ন; পরে আমরা দেখিব যে এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। কারণ এখানে এই অংশেও এইটিই শেষ কথা নহে; শেষ কথাটি, চরম চূড়ান্ত কথাটি আসিয়াছে পরের শ্লোকে, সেইটিই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক। "মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিতে পারে, ভুবনসকলের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া, জীবসকলের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে শান্তি লাভ করে।" * এখানে আবার কর্মযোগেরই শক্তি আসিয়াছে। এখানে জোর দিয়াই বলা হইয়াছে যে, নির্বাণের শান্তিলাভ করিতে হইলে সক্রিয় ব্রহ্মের জ্ঞান, বিশ্বপুরুষের জ্ঞান আবশ্যক।

এখানে আবার আমরা গীতার সেই মহান্ তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাইতেছি,—যদিও এই "পুরুষোত্তম" নামটি একেবারে শেষের দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বে ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি কৃষ্ণ "অহং" (আমি), "মাং" (আমাকে) বলিতে সর্বদা পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন, যে ভগবান আমাদের কালাতীত অক্ষর সত্তায় এক আত্মারূপে রহিয়াছেন, আবার যিনি জগতের মধ্যে, সর্বভূতের মধ্যে, সর্বকর্মের মধ্যেও রহিয়াছেন, নিশ্চল নীরবতা ও শান্তির অধীশ্বর, আবার শক্তি ও কর্মেরও অধীশ্বর, যিনি এখানে এই মহাযুদ্ধে সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, পরমাত্মা, সর্বমিদং, সকল ব্যষ্টিগত জীবেরই প্রভু,—শ্রীকৃষ্ণ "অহং" বা "মাং" বলিতে সর্বদা সেই পুরুষোত্তম ভগবানকেই বুঝিয়াছেন। তিনি সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার ভোক্তা, অতএব মুক্তিকামী মানবকে যজ্ঞরূপে তপস্যারূপে কর্ম করিতে হইবে; তিনি ভুবনসকলের অধীশ্বর, সর্বলোকমহেশ্বর, প্রকৃতিতে এবং এই সর্বভূতে অভিব্যক্ত, অতএব মুক্তিলাভের পরও মুক্ত মানব কর্ম করিবেন জনগণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য, লোকসংগ্রহ; তিনি সর্বজীবের সুহৃদ, অতএব যে ঋষি নিজের মধ্যে এবং চতুর্দিকে (অভিতঃ) নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি তখনও এবং সর্বদা সকল জীবের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন,—যেমন মহাযান বৌদ্ধমতে নির্বাণের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বিশ্বজনের প্রতি করুণার বশে কর্ম। যখন তিনি তাঁহার কালাতীত ও অক্ষর সত্তায় ভগবানের সহিত একত্বলাভ করিয়াছেন তখনও তিনি প্রকৃতির লীলায় সম্বন্ধ-

* ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৫।২৯

সকলকে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রতি দিব্য প্রেম এবং ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয়।

ইহাই যে গীতার শিক্ষার মর্ম তাহা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ তলাইয়া দেখি; এই অধ্যায়টি হইতেছে পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ কয়েকটি শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্ণ পরিণতি—ইহা হইতেই বুঝা যায়, গীতা এই শ্লোকগুলিকে কত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছে। অতএব আমরা এখানে যত সংক্ষেপে সম্ভব সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারমর্মটি অনুধাবন করিব। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রকৃত সন্ন্যাস বাহিরের ত্যাগ নহে, ভিতরের ত্যাগ—পুনঃ-পুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমেই বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। "যিনি ফলকে অবলম্বন না করিয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, যে-ব্যক্তি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না এবং কর্ম করেন না তিনি নহেন। যাহাকে লোকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও; কারণ মনের বাসনামূলক সঙ্কল্প সন্ন্যাস (বা ত্যাগ) না করিলে কেহ যোগী হয় না"।* কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ ক্রম অনুসারে? প্রথমে যোগশৈল আরোহণের সময় কর্ম করিতে হইবে, কারণ তখন কর্মই কারণ। কিসের কারণ? আত্মসিদ্ধির, মুক্তির, ব্রহ্মে নির্বাণের কারণ; কারণ ভিতরে ত্যাগের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে-করিতে কর্ম করিলে এই সিদ্ধি, এই মুক্তি—বাসনাত্মক মন, অহং এবং নীচের প্রকৃতির উপর এই বিজয় সহজেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু যখন কেহ শিখরে উঠিয়াছেন? তখন আর কর্ম কারণ নহে; কর্মের দ্বারা আত্মজয় এবং আত্মোপলব্ধির যে-শান্তি লাভ করা যায় তখন তাহাই হয় কারণ। আবার কিসের কারণ? আত্মাতে ব্রহ্মচৈতন্যে অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতায় মুক্ত মানবের দিব্য কর্মসকল সম্পাদিত হয় তাহার কারণ। "যখন কেহ ইন্দ্রিয় বিষয়ে অথবা কর্মে আসক্ত হয় না, এবং মন হইতে সকল বাসনাত্মক সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে, তখনই বলা যায় যে, সে যোগশিখরে আরোহণ করিয়াছে"।† এই ভাব লইয়াই মুক্ত মানব কর্ম করেন

* অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ৬।১
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ৬।২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৬।৩
† যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৬।৪
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৬।৭

তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি; তিনি কর্ম করেন বাসনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, অহংমূলক ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও যে মানসিক লিপ্সা বাসনার জনক তাহা পরিত্যাগ করিয়া। তিনি তাঁহার নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণতম শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উচ্চতম আত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে; সেই উচ্চতম আত্মা সর্বদা নিজের সত্তায় সমাহিত, সমাধিমগ্ন, যখন বাহ্য জগৎ হইতে চেতনাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়া হয় তখনই নহে, পরন্তু সর্বদা, মনের জাগ্রত অবস্থাতেও, যখন বাসনা ও অশান্তির কারণ বিদ্যমান থাকে, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, সর্ববিধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ। এই উচ্চতর আত্মা হইতেছে অক্ষর, কূটস্থ, তাহা প্রাকৃত সত্তার সকল পরিবর্তন ও বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবস্থিত; আর ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায় যখন তিনি ইহারই মত কূটস্থ হন, যখন তিনি সকল বাহ্য দৃশ্য ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে উঠেন, যখন তিনি আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হন, যখন তিনি সকল বস্তু সকল ঘটনা এবং সকল ব্যক্তির প্রতি সমভাবাপন্ন হন।*

তবে যাহাই হউক এই যোগ লাভ করা সহজ নহে, বস্তুত অর্জুন পরে স্পষ্টতই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন,† কারণ চঞ্চল মন যে-কোন সময়ে বাহ্য বিষয়ের আক্রমণে এই সকল উচ্চভাব হইতে স্খলিত হইতে পারে এবং শোক ও চিত্তবিক্ষোভ ও অসমতার দারুণ কবলে পুনরায় পতিত হইতে পারে। মনে হয় এইজন্যই গীতা নিজের জ্ঞান ও কর্মের সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও রাজযোগের ধ্যানের এক বিশেষ পদ্ধতি দিতে অগ্রসর হইয়াছে, মন এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে এই পদ্ধতি খুবই শক্তিশালী। এই পদ্ধতিতে যোগীকে সদা সর্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে যেন ইহাই তাঁহার সাধারণ চেতনা হইয়া পড়ে। তাঁহাকে নির্জন স্থানে একাকী উপবেশন করিতে হইবে, মন হইতে সমস্ত বাসনা ও রিপুর চিন্তা দূর করিতে হইবে। সমগ্র সত্তা ও চিত্তকে আত্ম-বশীভূত করিতে হইবে। "তিনি নির্মল স্থানে নিজের স্থির আসন পাতিবেন, উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগচর্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন; তদুপরি উপবেশনপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া এবং মানসিক চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য

* জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬।৮

† যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম ॥ ৬।৩৩

যোগ অভ্যাস করিবেন"।* রাজযোগের পদ্ধতি অনুসারে শরীরকে সোজা ও স্থিরভাবে রাখিতে হইবে; দৃষ্টিকে টানিয়া লইয়া ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, দিশশ্চানবলোকয়ন্। মনকে প্রশান্ত ও ভয়মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে হইবে; সমগ্র চিত্তকে সংযত করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে যেন চৈতন্যের নিম্নতন ক্রিয়া ঊর্ধ্বতন শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। কারণ এই সাধনার দ্বারা নির্বাণের শান্তিলাভই লক্ষ্য। "এইরূপে মন সংযমের দ্বারা যোগ অভ্যাস করিয়া যোগী নির্বাণের পরম শান্তি লাভ করেন, আমার মধ্যেই সেই পরম শান্তির ভিত্তি, শান্তিং নিৰ্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্"।†

নির্বাণের এই শান্তি তখনই লাভ করা যায় যখন সমগ্র মানস-চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে সংযত হয় এবং বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং আত্মাতে স্থির হইয়া নিবিষ্ট থাকে, তখন বায়ুশূন্য স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় মন তাহার অস্থির ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, তাহার বহির্মুখী গতি বন্ধ হয়, এবং মনের এই নিশ্চল নীরবতায় অন্তরের মধ্যে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, মন আত্মা সম্বন্ধে যে মিথ্যা ও আংশিক পরিচয় দেয় এবং অহংয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে যেমন দেখা যায় তেমন দেখা নহে, পরন্তু আত্মার আত্মোপলব্ধিতেই আত্মা প্রকাশিত হয়, স্বপ্রকাশ।* তখন জীব সন্তুষ্ট হয় এবং

---

* শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ৬।১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৬।১৩
† প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসং।
শান্তিং নিৰ্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ৬।১৫
* যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ৬।১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ৬।১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬।২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্;
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥ ৬।২৩

তাহার নিজস্ব প্রকৃত সত্তার সন্ধান পায় এবং নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে— এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাপ্য অশান্ত সুখ নহে পরন্তু ইহা আভ্যন্তরীণ প্রশান্ত সৌখ্য, ইহার মধ্যে সে মনের চাঞ্চল্য হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর তাহার সত্তার অধ্যাত্ম সত্য হইতে স্খলিত হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। মানসিক দুঃখের তীব্রতম আক্রমণও আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ আমাদের মানসিক দুঃখ আইসে বাহির হইতে, তাহা বাহ্য বস্তুর স্পর্শেরই প্রতিক্রিয়া, আর আত্মার সুখ হইতেছে আভ্যন্তরীণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ, বাহ্য বস্তুর স্পর্শে মনে যে অস্থির প্রতিক্রিয়া সকলের উদ্ভব হয়, যাঁহারা সে-সবের বশ্যতা আর স্বীকার করেন না কেবল তাঁহারাই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন। ইহা হইতেছে দুঃখের সহিত সংযোগ দূর করিয়া দেওয়া, মনের সহিত শোকের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, দুঃখসংযোগবিয়োগম্। সুদৃঢ়ভাবে এই অবিচ্ছেদ্য আনন্দলাভই যোগ, ইহাই দিব্য মিলন; ইহা সকল লাভের পরম লাভ, এই সম্পদের কাছে আর সবই তুচ্ছ। অতএব এই যোগ দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে, অনির্ব্বিন্নচেতসা, যতদিন না মুক্তি লাভ করা যায়, যতদিন না নির্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করা যায় ততদিন দুষ্করতা বা অসাফল্যের দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

এখানে অনুভাবাত্মক মনকে স্থির ও শান্ত করার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, এই মনের মধ্যেই চলে বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ গ্রহণ করে এবং আমাদের সাধারণ সুখ-দুঃখ আদি ভাবের প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাতে সাড়া দেয়; কিন্তু স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার নিশ্চল নীরবতায় মানসিক চিন্তাকেও স্থির ও শান্ত করিতে হইবে। * প্রথমত, সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে, এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে যে তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে ইতস্তত ধাবমান হইতে না পারে; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে, এবং মনকে ঊর্ধ্বতন আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সাধক কোন কিছু

* সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ৬।২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬।২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬।২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২।২৭

চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে-দিকে ছুটিবে তখনই সেই দিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। মন যখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইবে, তখনই যোগী ব্রহ্মভূত আত্মার উচ্চতম, নিষ্কলঙ্ক, বিক্ষোভহীন সুখলাভ করিবেন। "এই ভাবে রিপুবিক্ষোভের গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্বদা নিজেকে যোগযুক্ত রাখিয়া যোগী সহজে এবং সুখে অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্মস্পর্শ উপভোগ করেন।" *

অথচ ইহার ফলে জীবিতাবস্থাতে এমন নির্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়; প্রথমে মনে হইতে পারে যে এইরূপ ফলই হইবে। যখন সমস্ত বাসনা রিপুবিক্ষোভ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যখন মন আর নিজেকে চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পায় না, যখন নীরব নির্জন যোগ অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কি কাজ থাকিতে পারে, বাহ্যস্পর্শময় অনিত্য সংসারের সহিত আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? অবশ্য যোগী আরও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার পক্ষে পর্বতগুহা, অরণ্য বা শৈল-শিখরই যোগ্যতম স্থান বলিয়া মনে হয়, কেবল এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই তিনি বাস করিতে পারেন এবং নিরন্তর সমাধিতে মগ্ন থাকাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ ও কাজ হইতে পারে। কিন্তু প্রথমত যখন এই নির্জন যোগ অভ্যাস করা হয় তখন অন্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে গীতা উপদেশ দেয় নাই। গীতা বলিয়াছে, যাহারা নিদ্রা ও আহার ও খেলা ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের এ-যোগ হয় না, আবার যাহারা দেহ ও মনের এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্ন তাহাদেরও এ-যোগ হয় না; পরন্তু নিদ্রা ও জাগরণ, আহার, বিহার, কর্ম প্রচেষ্টা সবই "যুক্ত" হওয়া আবশ্যক।* ইহার সাধারণত এই অর্থ করা যায় যে, সমস্তই পরিমিত, নিয়ন্ত্রিত, যথাযথ মাত্রায় অনুষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য, এবং বস্তুত ইহাই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু অন্তত যখন যোগ লব্ধ হইয়াছে তখন এই সমস্ত ব্যাপারকেই আর এক অর্থে "যুক্ত" হইতে হইবে, এবং সেই অর্থে-ই এই কথাটি গীতার অন্য সকল স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল অবস্থাতে, জাগরণে ও নিদ্রায়, আহারে ও বিহারে ও কর্মে তখন যোগী ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবেন, এবং যোগী সমস্ত করিবেন এই জ্ঞানে যে, ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব এবং তাঁহার নিজের জীবন, নিজের

* যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ৬।২৮

* নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ৬।১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৬।১৭

কর্ম ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ভগবানই ধরিয়া রহিয়াছেন। বাসনা, অহং, ব্যক্তিগত সংকল্প, মনের চিন্তা এই সব আমাদের কর্মের প্ররোচক হয় কেবল আমাদের নিম্নতন প্রকৃতিতে; যখন অহং বিনষ্ট হয় এবং যোগী ব্রহ্ম হন, যখন তিনি এক সমুচ্চ ও বিশ্বময় চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন, এমন কি তাহাই হন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম আইসে সেখান হইতে, মানসিক চিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর জ্যোতির্ময় জ্ঞান আইসে সেখান হইতে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা মহত্তর অন্য এক শক্তি সেখান হইতে আসিয়া যোগীর কর্ম সম্পন্ন করিয়া দেয় এবং তাহার ফল আনিয়া দেয়; তখন ব্যক্তিগত কর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সমস্তই ব্রহ্মে সংন্যস্ত হইয়াছে, ভগবান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি।

ভেদাত্মক মানসিক অহংকে চিন্তা ও অনুভূতি ও কর্ম সম্বন্ধে তাহার প্রেরণা সকলকে ব্রহ্মচৈতন্যে নির্বাণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি লাভ করা যায় তাহার স্বরূপ এবং যোগের * ফল বর্ণনা করিবার সময় গীতা বলিয়াছে যে, বিশ্বজ্ঞান (cosmic sense) এই ব্রহ্ম চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহা এক নবতর দৃষ্টিতে উন্নীত হয়। "যে মানবের আত্মা যোগযুক্ত, যিনি সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখেন, তিনি সকল জিনিসকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন।" † তিনি যাহা কিছু দেখেন তাঁহার নিকট সবই আত্মা, সব তাঁহারই আত্মা, সবই ভগবান। কিন্তু তিনি যদি ক্ষরের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আদৌ বাস করেন তাহা হইলে কি আশঙ্কা নাই যে, এই কঠিন যোগসাধনার সমস্ত ফল তিনি হারাইয়া ফেলিবেন, আত্মাকে হারাইয়া পুনরায় মনের মধ্যে পতিত হইবেন। ভগবান তাঁহাকে হারাইবেন এবং সংসার তাঁহাকে পাইয়া বসিবে, তিনি ভগবানকে হারাইয়া তাঁহার স্থানে পুনরায় অহংকে এবং নিম্নতন প্রকৃতিকে পাইবেন? গীতা বলিয়াছে, না, এরূপ কোন আশঙ্কা নাইঃ—"যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমার মধ্যে সব কিছুই দেখেন, আমি তাঁহাকে হারাই না, তিনিও আমাকে হারান না।" * কারণ যদিও এই নির্বাণের শান্তি অক্ষরের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয় তথাপি ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্, আর এই সত্তা, ভগবান, ব্রহ্ম, জগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত এবং যদিও তাহা জগতের অতীত তথাপি সেই অতীত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নহে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে

* যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

* যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

যে, সকল বস্তুই তিনি (ভগবান, পুরুষোত্তম), বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, সম্পূর্ণভাবে এই দিব্যদৃষ্টিতেই বাস করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে; এইটিই হইতেছে যোগের পূর্ণতম সিদ্ধি।

কিন্তু কর্ম করা কেন? নির্জনে নিজের আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে, ইচ্ছা হয় সেখান হইতে সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিবে, সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখিবে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ যোগদান করিবে না, সেখানে বিচরণ করিবে না, বাস করিবে না, কর্ম করিবে না, কেবল সাধারণত আভ্যন্তরীণ সমাধির মধ্যেই বাস করিবে—এইটিই কি অধিকতর নিরাপদ নহে? এইটিই কি এই উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থার নিয়ম নহে, বিধি নহে, ধর্ম নহে? আবার বলি, না; মুক্ত যোগীর পক্ষে আর কোনও নিয়ম নাই, বিধি নাই, ধর্ম নাই, শুধু ইহাই যে, তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করিবেন, ভগবানকে ভালবাসিবেন এবং সর্বভূতের সহিত এক হইবেন; তাঁহার মুক্তি চূড়ান্ত, তাহা সাপেক্ষ মুক্তি নহে, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, আর কোন কর্তব্যের বিধি, জীবনের ধর্ম বা কোনরূপ গন্ডীর উপর তাহা নির্ভর করে না। আর কোন যোগ প্রণালীতে তাঁহার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এখন সর্বদাই যোগযুক্ত, নিত্যযুক্ত। "যে যোগী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্বভূতের মধ্যে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন"।* তখন সংসারের প্রতি ভালবাসা আধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ইন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে তাহা আত্ম-অনুভূতিতে পরিণত হয়, ভগবৎপ্রেমের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই প্রেমে কোন বিপদ নাই, কোন দোষ নাই। নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয় অনেক সময় দরকার হইতে পারে, কারণ বস্তুত ইহা হইতেছে সংসারের মধ্যে প্রতিফলিত আমাদের অহংয়েরই প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয়। কিন্তু ভগবানকে সংসারের মধ্যে দেখিতে পাইলে আর কিছুকেই ভয় থাকে না, তখন সকলকেই ভগবানের সত্তার মধ্যে আলিঙ্গন করা যায়; সকলকে ভগবান বলিয়া দেখিলে আর কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা থাকে না, তখন সংসারের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সংসারকে ভালবাসা যায়।

কিন্তু অন্ততপক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিসগুলিকে ত বর্জন করিতে হইবে, ভয় করিতে হইবে? এই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য যোগীকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! না, তাহাও নহে, আত্ম-দর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করা হয়। "হে অর্জুন, যে-ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিসকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক তাঁহাকে

* সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৬।৩১

আমি শ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি।" * আর ইহার দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, তিনি নিজে দুঃখলেশশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখের মধ্য দিয়াই পুনরায় সংসারের দুঃখ ভোগ করিবেন, পরন্তু তিনি যে সকল দ্বন্দ্ব বর্জন করিয়াছেন, জয় করিয়াছেন, সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে চলিতে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন, এবং সেই সকল জিনিসের বাহ্য দৃশ্যে বিচলিত বা বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদের প্রেরণায় সাহায্য করিতে, নিরাময় করিতে সর্বভূতের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিতে, মানব-সকলকে অধ্যাত্ম আনন্দের দিকে লইয়া যাইতে, ভগবদ্ অভিমুখে সংসারের প্রগতির জন্য কর্ম করিতে অগ্রসর হইবেন, এই সংসারে যতদিন তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হয় এইভাবেই তিনি দিব্য জীবন যাপন করিবেন। যে ভগবদ্ভক্ত ইহা করিতে পারেন, এইভাবে সকল জিনিসকেই ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করিতে পারেন, শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণসকলের মধ্যে এবং তাহাদের উপরে ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ অধ্যাত্ম একত্বের উচ্চভূমি ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি ভগবদ্-দর্শনের উদারতায় মুক্ত ও স্বাধীন, ভাগবত-প্রকৃতির শক্তিতে মধুর, মহান ও জ্যোতির্ময়, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম যোগী বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।

গীতা সর্বত্র যেমন তেমনি এখানেও ভক্তিকেই যোগের পরাকাষ্ঠা বলিয়াছে, সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, ইহাকে সমগ্র গীতা শিক্ষার শেষ ও সার কথা বলা যাইতে পারে—যে-ব্যক্তি সর্বভূতে ভগবানকে ভালবাসেন এবং যাঁহার আত্মা ভাগবত একত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যেখানেই থাকুন এবং যাহাই করুন তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম করেন। এই কথাটা আরও জোরের সহিত বলিবার জন্য দিব্য গুরু মাঝে অর্জুনের একটা প্রশ্নের (মানুষের চঞ্চল মনের পক্ষে এরূপ কঠিন যোগ আদৌ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে এই সংশয়ের) জবাব দিয়া পুনরায় এই কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং এইটিই হইল তাঁহার চূড়ান্ত উক্তি। "যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা বড়, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা বড়, কর্মিগণ অপেক্ষাও বড়; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।" * যোগী কর্ম ও জ্ঞান ও তপস্যা বা অন্য যে-কোন

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৬।৪৬

উপায়ে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান চান না, আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই শক্তি চান না, অন্য কোন কিছুই চান না, কেবল ভগবানের সহিত যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, লাভ করেন; কারণ উহার মধ্যেই আর সব কিছুই রহিয়াছে, নিজেদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়া দিব্যতম সার্থকতা লাভ করিতেছে। কিন্তু আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠতম। "যোগিগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই আমার সহিত যোগে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।" * এইটিই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্ট অংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখনও বলা হয় নাই এবং যাহা কোথাও পূর্ণভাবে বলা হয় নাই তাহার বীজ এইখানেই রহিয়াছে; কারণ তাহা সকল সময়েই কতকটা গূঢ় রহস্যের মতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাই শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং দিব্য রহস্য।

* যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কর্মযোগের সারতত্ত্ব

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়কে গীতাশিক্ষার এক রকম স্থূল কাঠামো বলা যাইতে পারে; এখানে প্রধান-প্রধান তত্ত্বগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে, এবং গীতায় বাকী দ্বাদশটি অধ্যায়ে যে-সকল বিষয় বিশদভাবে পরিস্ফুট করা হইবে সেগুলি এখানে অসম্পূর্ণভাবে, ইঙ্গিতমাত্র হইয়া রহিয়াছে, অথচ এই বিষয়গুলির নিজস্ব গুরুত্ব খুবই বেশী, সেইজন্যই অবশিষ্ট দুইটি ভাগে সেইগুলিকে বিশদতরভাবে আলোচনা করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। গীতা যদি একটি লিখিত মহান শাস্ত্রগ্রন্থ না হইত এবং সেইজন্য ইহার শিক্ষা শেষ করিতেই না হইত, এই শিক্ষা যদি কোন জীবিত গুরু তাঁহার শিষ্যকে দিতেন এবং শিষ্য যেমন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সেই অনুসারে যথাসময়ে অন্যান্য সত্য বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেই থামিয়া বলিতে পারিতেন—"প্রথমে এইটুকুই সাধনা কর, তোমার করিবার মত যথেষ্ট জিনিস ইহার মধ্যে রহিয়াছে, এখানেই তুমি যতদূর সম্ভব প্রশস্ততম ভিত্তি পাইবে; সমস্যা ও সংশয়সকল যেমন উঠিবে, আপনা হইতেই সে-সকলের সমাধান হইয়া যাইবে অথবা আমিই তোমার জন্য সে-সকলের সমাধান করিয়া দিব। উপস্থিত আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই তোমার জীবনে সিদ্ধ করিয়া তোল; ভিতরে এই ভাব রাখিয়া কর্ম কর।" সত্য বটে, এখানে এমন অনেক জিনিসই আছে. পরবর্তী অংশে যাহা বলা হইবে, তাহার আলোকে সেগুলিকে না দেখিলে সেগুলির ঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নহে। উপস্থিত সমস্যার মীমাংসার জন্য এবং ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নিরসনের জন্য আমাকেও পরের অনেক কথা এখনই বলিতে হইয়াছে, যেমন পুরুষোত্তমের তত্ত্ব, কারণ এই তত্ত্বের অবতারণা না করিলে আত্মা, কর্ম এবং কর্মের অধীশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করা যাইত না; মানব শিষ্যের মন এখনও ধারণা করিতে পারিবে না এমন মহান তত্ত্বসকলের অবতারণা করিলে পাছে তাহার প্রথম সাধনার পথে দৃঢ় নিষ্ঠা বিচলিত হয়, সেইজন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সংশয়গুলি সমাধান করিবার কোন চেষ্টা এখানে করে নাই।

গুরু এইখানেই শিক্ষা স্থগিত রাখিলে অর্জুনও আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারিতেন—"আপনি বাসনা ও আসক্তির বিনাশ সম্বন্ধে, সমতা সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়-গণকে জয় করা এবং মনকে নিশ্চল করা সম্বন্ধে, কামক্রোধাদি হইতে মুক্ত

এবং নিব্যক্তিক কর্ম সম্বন্ধে, যজ্ঞার্থে কর্ম সম্বন্ধে, বাহ্যিক ত্যাগ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ ত্যাগের বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, এবং এই-গুলি কার্যত সাধন করা আমার নিকট যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, এইগুলি আমি বুদ্ধিব দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আবার আপনি কর্মের মধ্যে থাকিবার সময়েই গুণসকলের ঊর্ধ্বে উঠিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই সকল গুণ কিভাবে কাজ করে তাহা আপনি আমাকে বলেন নাই, আর যতক্ষণ না আমি তাহা জানিতেছি ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা এবং তাহাদের ঊর্ধ্বে উঠা কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া আপনি ভক্তিকেই যোগেব শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ বলিয়াছেন, অথচ আপনি কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে এক রকম কিছুই বলেন নাই; আর কাহাকেই বা এই ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠতম জিনিস অর্পণ করিতে হইবে? নিশ্চল নীরব নির্গুণ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই নহে, ভক্তি করিতে হইবে আপনাকে, ঈশ্বরকে। তাহা হইলে আমাকে বলুন, আপনি কি? জ্ঞান যেমন কর্ম অপেক্ষা বড় তেমনিই অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষর প্রকৃতি অপেক্ষা বড়—বলুন আপনার স্বরূপ কি? এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কর্ম, জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং যিনি একই সঙ্গে সকলের অক্ষর আত্মা এবং জ্ঞান ও ভক্তি ও কর্মের অধীশ্বর, যে পরম ভগবান এই মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসকাণ্ডে এখানে আমার সঙ্গে রহিয়াছেন, যিনি এই ঘোর ভীষণ কর্মে আমার রথে সারথিরূপে বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই গীতার বাকী অংশ লিখিত হইয়াছে; বাস্তবিক, বুদ্ধির পক্ষে একটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা দিতে হইলে এই সকল প্রশ্ন ফেলিয়া রাখা চলে না, ইহাদের আলোচনা ও সমাধান এখনই করিতে হয়। কিন্তু বাস্তব সাধনায় স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয়, অনেক জিনিস, বস্তুত উচ্চতম জিনিসগুলি বাকী থাকে, আমরা অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে অগ্রসর হইলে তাহারই আলোকে ঐ সকল জিনিস পরে উঠে এবং আপনা-আপনি পূর্ণভাবে মীমাংসিত হইয়া যায়। গীতা কতকটা এই উপলব্ধির রেখাই অনুসরণ করিয়াছে, এবং প্রথমে কর্ম ও জ্ঞানের একটা প্রশস্ত আদ্য ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, ইহার মধ্যে এমন একটা জিনিস রহিয়াছে যাহা হইতে ভক্তি ও মহত্তর জ্ঞানে পৌঁছান যাইতে পারে কিন্তু সেখানে এখনও সম্পূর্ণভাবে পৌঁছান যায় নাই। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আমরা এই ভিত্তিটি পাই।

তাহা হইলে যে-সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ তাহার সমাধান এই ছয় অধ্যায়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা এইখানে থামিয়া তাহা আলোচনা করিতে পারি। এইখানে আবার বলা যাইতে পারে যে, কেবল ঐ সমস্যাটিরই

সমাধানের জন্য জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধারণ জীবনের পরিবর্তে অধ্যাত্মজীবন লাভ সম্বন্ধে সমগ্র প্রশ্নটি না তুলিলেও চলিতে পারিত। ব্যবহারিক দিক হইতে, অথবা নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে অথবা মানসিক যুক্তি কিংবা আদর্শের দিক হইতে অথবা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই একটা মীমাংসা করা চলিত; বস্তুত ঐরূপ সমাধানই আমাদের আধুনিক পদ্ধতির অনুযায়ী হইত। শুধু এই সমস্যাটিকে ধরিলে প্রথমত কেবল এই প্রশ্নটি উঠে, হত্যাকাণ্ডের ব্যক্তিগত পাপ সম্বন্ধে যে নৈতিক বিরাগ, অর্জুন কি তাহার দ্বারাই পরিচালিত হইবে, না, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে যে বোধ সমানভাবেই নৈতিক, ন্যায় ও ধর্মকে রক্ষা করা, অন্যায় অত্যাচারের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে সকল মহানুভব ব্যক্তিরই বিবেক যে দাবি করে তাহার অনুসরণ করা—এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইবে? আমাদের যুগে, বর্তমান মুহূর্তেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, নানাভাবে নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় এবং বস্তুতপক্ষে আমরা করিতেছি, কিন্তু এ-সমস্ত সমাধানই হইতেছে আমাদের সাধারণ জীবনের দিক হইতে, আমাদের সাধারণ মানবীয় মনের দিক হইতে। আমাদের ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশ পালন করা উচিত, না, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহারই অনুসরণ করা উচিত, একটা আদর্শ নীতির অনুসরণ করা উচিত, না, কার্যক্ষেত্রে যাহা উপযোগী এমন ব্যবহারিক নীতিরই অনুসরণ করা উচিত, আত্মার শক্তির ("Soul-force") উপর নির্ভর করা উচিত, না, জীবন এখনও অন্তত সমগ্রভাবে আত্মা হইয়া উঠে নাই এবং ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কখনও-কখনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এই কঠোর সত্যকে স্বীকার করা উচিত? এইসব প্রশ্ন তুলিয়াই সমস্যাটির সমাধান করা যাইতে পারে কিন্তু সে-সব সমাধান হইবে মানসিক যুক্তি, প্রকৃতি, হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়া; এ-সব সমাধান নির্ভর করে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে, আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার যে-সমাধান আমাদের পক্ষে উপযোগী বড় জোর তাহাই হইতে পারে, আমাদের পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির, আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত বিকাশের যে স্তরে আমরা রহিয়াছি তাহারই উপযোগী হইতে পারে, আমাদের যতটুকু জ্ঞান তাহারই আলোকে আমরা আমাদের সাধ্যমত যতটুকু দেখিতে পারি, করিতে পারি এই সমাধান হয় তাহারই অনুযায়ী; এইভাবে কোনরূপ চরম মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। কারণ এই মীমাংসা আমাদের মন হইতে আইসে, এই মনের মধ্যে রহিয়াছে আমাদের সত্তার নানা বিচিত্র প্রবৃত্তির জটিলতা, আমাদের বিচারবুদ্ধি, নৈতিকবোধ, আমাদের কর্মপ্রেরণা; আমাদের প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি এবং আমাদের মধ্যে যে-সব দুর্লভ

জিনিসকে আমরা আত্মার সহজাত প্রবৃত্তি বা চৈত্য প্রেরণা (psychical preferences) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি—এইসবের মধ্যে মন একটিকেই বাছিয়া লয় অথবা, ইহাদের মধ্যে যাহা হউক একটা সামঞ্জস্য করিয়া লয়। গীতা দেখিয়াছে যে, এইদিক দিয়া কোন চরম মীমাংসা হইতে পারে না, কেবল একটা সাময়িক কাজচলা মীমাংসা হইতে পারে মাত্র; অর্জুনকে প্রথমে তৎকাল-প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসারে এইরূপই একটা কাজচলা মীমাংসা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ মীমাংসা গ্রহণ করিবার মত মতি-গতি অর্জুনের ছিল না, বাস্তবিক অর্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা যে দিব্য গুরুরও ছিল না তাহা খুবই স্পষ্ট। তখন গুরু এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে, এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন।

গীতার মীমাংসা হইতেছে, আমাদের সাধারণ সত্তা ও সাধারণ মনের ঊর্ধ্বে, আমাদের যৌক্তিক ও নৈতিক সংশয় সমূহের ঊর্ধ্বে অন্য এক চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে, সেখানে সত্তার ধর্ম আলাদা এবং সেইজন্য আমাদের কর্মের আদর্শও আলাদা; সেখানে ব্যক্তিগত বাসনা এবং ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আর কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে না; সেখানে দ্বন্দ্বসকলের অবসান হয়; সেখানে কর্ম আর আমাদের নিজেদের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পুণ্য বা ব্যক্তিগত পাপ বোধের ঊর্ধ্বে উঠা যায়; সেখানে বিশ্বগত, নির্ব্যক্তিক ভাবগত সত্তা আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করে; সেখানে আমরা নিজেরা এক নূতন ও দিব্য জন্মের দ্বারা সেই সত্তার সত্তায়, সেই চৈতন্যের চৈতন্যে, সেই শক্তির শক্তিতে, সেই আনন্দের আনন্দে পরিণত হই, এবং তখন আমরা আর নিম্নতন প্রকৃতিতে বাস করি না বলিয়া আমাদের নিজেদের কোন কর্ম করিবার থাকে না, নিজেদের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অনুসরণ করিবার থাকে না, পরন্তু যদি আমরা আদৌ কর্ম করি (কেবল এই একটিমাত্র প্রকৃত সমস্যা ও প্রশ্ন বাকী থাকে), তাহা হইলে আমরা কেবল ভাগবত কর্ম করি, আমাদের বাহ্য প্রকৃতি সে কর্মের কারণ হয় না, সেখান হইতে তাহার প্রেরণা আসে না, পরন্তু বাহ্য প্রকৃতি হয় সে কর্মের কেবল শান্ত অবাধ যন্ত্র: কারণ প্রেরণা শক্তি আইসে আমাদের ঊর্ধ্বে আমাদের কর্মের অধী-শ্বরেরই ইচ্ছা হইতে। আর এইটিকেই যথার্থ মীমাংসা বলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যের অনুযায়ী, আর আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবনযাপন করাই যে শ্রেষ্ঠ মীমাংসা, আমাদের জীবনের সমস্যাসকলের একমাত্র সম্পূর্ণভাবে সত্য মীমাংসা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মানসিক ও প্রাণিক চরিত্র হইতেছে আমাদের প্রাকৃত জীবনের সত্য, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের সত্য, আর যাহা কিছু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সে-সবই এই স্তরের সত্য; অজ্ঞানের মধ্যে

কাজ করিবার জন্য তাহারা কার্যত উপযোগী, কিন্তু যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যে ফিরিয়া যাই তখন আর তাহাদের কোন উপযোগিতা থাকে না। কিন্তু এইটিই যে সত্য সে-সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া নিঃসন্দেহ হইব? যতক্ষণ আমরা আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট ততক্ষণ আমরা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না; কারণ আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি হইতেছে সম্পূর্ণ ভাবেই এই অজ্ঞানময়ী নিম্নতন প্রকৃতির উপলব্ধি। আমরা এই মহত্তর সত্যকে জানিতে পারি কেবল যখন উহা আমাদের জীবনের মধ্যে সত্য হইয়া উঠে, অর্থাৎ, যখন আমরা যোগের দ্বারা মানসিক উপলব্ধি ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে প্রবেশ লাভ করি। কারণ অধ্যাত্ম উপলব্ধি অনুসারে জীবনযাপন করা, যেন শেষ পর্যন্ত আর আমরা মন থাকি না পরন্তু আত্মা হইয়া উঠি, যেন আমাদের বর্তমান প্রকৃতির ত্রুটিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের সত্য ও দিব্য সত্তার মধ্যে বাস করিতে পারি—ইহাই হইতেছে যোগের চরম অর্থ।

এই ভাবে আমাদের সত্তার কেন্দ্রকে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করা এবং তাহার ফলস্বরূপ আমাদের সমগ্র জীবন ও চেতনার রূপান্তর সাধন এবং সেই সঙ্গে আমাদের কর্মের ভাব ও প্রেরণার পরিবর্তন (বাহ্যিক লক্ষণ সকলে কর্ম অনেক সময়ে ঠিক একই রকম থাকিতে পারে)—ইহা হইতেছে গীতোক্ত কর্মযোগের সারতত্ত্ব। তোমার সত্তার পরিবর্তন কর, আত্মার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ কর এবং সেই নব জন্ম লাভ করিয়া তোমার অন্তরস্থিত ভগবান তোমাকে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই কর্ম করিতে অগ্রসর হও, ইহাই গীতার বাণীর মর্মকথা। অথবা অন্যভাবে আরও গভীর ও অধিকতর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সহিত বলা যাইতে পারে, তোমাকে এখানে যে-কর্ম করিতে হইবে সেইটিকেই তোমার আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পুনর্জন্মলাভের, দিব্য জন্মলাভের সাধন স্বরূপ কর, আর যখন দিব্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ তখনও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের যন্ত্ররূপে দিব্য কর্মসকল সম্পাদন কর। অতএব এখানে দুইটি জিনিস স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে হইবে; প্রথমত, পরিবর্তনের পন্থাটি, এই ঊর্ধ্বমুখী সঞ্চারণের, এই অভিনব দিব্যজন্ম লাভের পন্থাটি এবং দ্বিতীয়ত, কর্মের স্বরূপ, অথবা যে ভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে, কারণ কর্মের বাহ্য রূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন আবশ্যক না হইতে পারে, বস্তুত ইহার অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি জিনিস কার্যত একই, কারণ একটির ব্যাখ্যা করিলে অপরটিরও ব্যাখ্যা হইয়া যায়। আমাদের কর্মের ভাব আমাদের সত্তার স্বরূপ হইতে এবং সত্তার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু আবার এই স্বরূপই আমাদের কর্মের ধারা ও অধ্যাত্ম ফলের দ্বারা পরিবর্তিত হয়; আমাদের কর্মের ভাবে

খুব বেশী পরিবর্তন হইলে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপকে পরিবর্তিত করে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠারও পরিবর্তন করিয়া দেয়; আমরা সচেতন শক্তির যে কেন্দ্র হইতে কর্ম করি, ইহা সেইটিকে সরাইয়া দেয়। কেহ কেহ যেমন বলিয়া থাকেন, জীবন ও কর্ম যদি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা মায়া হইত, জীবন বা কর্মের সহিত আত্মার যদি কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ করিতে পারিত না; কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্তঃপুরুষ নিজেকে জীবন ও কর্মের দ্বারাই বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, বস্তুত ততটা কর্মের দ্বারাই নহে পরন্তু আমাদের অন্তঃপুরুষের কর্মশক্তির আভ্যন্তরীণ ধারার দ্বারাই আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। মহত্তর অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভের কার্যকরী উপায়রূপে ইহাই হইতেছে কর্মযোগের সার্থকতা।

গোড়াতে ভিত্তিস্বরূপ আমরা ইহাই পাইতেছি যে, মানুষের এই যে বর্তমান আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পূর্ণভাবেই তাহার দৈহিক ও প্রাণিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, কেবল মানসিক শক্তির স্বল্প ক্রিয়ার দ্বারা ইহার ঊর্ধ্বে উন্নীত—তাহার জীবনের সম্ভাবনা ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এমন কি ইহা তাহার প্রকৃত বর্তমান জীবনেরও সবখানি নহে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক নিগূঢ় আত্মা, তাহার বর্তমান প্রকৃতি হইতেছে এই আত্মারই একটা বাহ্য রূপ অথবা উহার আংশিক সক্রিয় প্রকাশ। গীতা বরাবরই আত্মার সক্রিয়তাকে সত্য বলিয়াই ধরিয়াছে বলিয়া মনে হয়, চরমপন্থী বৈদান্তিকদের ন্যায় ইহাকে মিথ্যা মায়া মাত্র বলে নাই, এইরূপ বেদান্ত মত গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কর্ম ও সক্রিয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। গীতা এই বিষয়ে নিজ দার্শনিক মতটি ব্যক্ত করিতে সাংখ্যদর্শনকৃত প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ স্বীকার করিয়াছে (অন্য ভাবেও ইহা করা চলিত)—পুরুষ জানে, ধরিয়া থাকে, প্রেরণা দেয় আর প্রকৃতি কর্ম করে, যন্ত্রের, আধারের, পদ্ধতির নানা বৈচিত্র বিকাশ করে। কেবল গীতা সাংখ্যর মুক্ত ও অক্ষর পুরুষকে লইয়া ইহাকে বেদান্তের ভাষায় অদ্বিতীয় অক্ষর সর্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়াছে এবং ইহার সহিত এই অন্য প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের প্রভেদ করিয়াছে, এই শেষোক্ত পুরুষই হইতেছে আমাদের ক্ষর ও ক্রিয়াশীল সত্তা, বহুরূপে সকল জিনিসের অন্তরাত্মা, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভিত্তি। কিন্তু তাহা হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বরূপ কি?

তিনটি মূল গুণের পরস্পরের উপর ক্রিয়াই প্রকৃতির পদ্ধতি। আর ইহার আধার কি? প্রকৃতির কারণসকলের ক্রমিক বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্নাংশাত্মক সত্তাই হইতেছে আধার, পুরুষের অনুভূতিতে প্রকৃতির ক্রিয়াসকল যে-ভাবে প্রতিফলিত হয় তদনুসারে আমরা ঐসব কারণকে যথাক্রমে উল্লেখ করিতে পারি—বুদ্ধি ও অহংভাব, মন, ইন্দ্রিয়গণ এবং জড়শক্তির রূপসমূহের ভিত্তিস্বরূপ উপাদান পঞ্চভূত। এই সমস্তই হইতেছে যন্ত্রবৎ, প্রকৃতির বিভিন্নাং-

শাত্মক যন্ত্র; আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহারা সকলেই জড়শক্তির অন্তর্গত, প্রকৃতি-স্থ পুরুষ যেমন এক একটি যন্ত্রের বিবর্তনের দ্বারা নিজ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তেমনই ইহারাও জড়শক্তির মধ্যে ক্রমশ প্রকটিত হয়, তবে ইহাদের অভিব্যক্তির ক্রম পূর্বে উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত, যথা—প্রথমে জড়পদার্থ (matter), তাহার পর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation), তাহার পর মন, পরে বুদ্ধি এবং শেষে অধ্যাত্ম চৈতন্য। বুদ্ধি প্রথমে প্রকৃতির ক্রিয়াসমূহেই নিবিষ্ট ছিল, এখন সে তাহাদের যথার্থ স্বরূপটি ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে যে এইসব কেবল তিন গুণের খেলা, পুরুষ ইহার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষকে এই সকল ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াও দেখিতে পারে; তখনই পুরুষ নিজেকে মুক্ত করিবার এবং তাহার আদ্য স্বাধীনতা ও অক্ষর জীবনে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করে। বেদান্তের ভাষায় সে তখন আত্মাকে দেখে, সত্তাকে দেখে; সে আর প্রকৃতির করণসমূহ ও ক্রিয়াসকলের সহিত, প্রকৃতির বিবর্তনের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না; সে তাহার সত্য আত্মা ও সত্তার সহিতই নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং নিজের অক্ষর অধ্যাত্ম স্ব-প্রতিষ্ঠ জীবন ফিরিয়া পায়। তখনই সেই অধ্যাত্ম আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে সে মুক্তভাবে নিজের সত্তার প্রভু-রূপে ঈশ্বররূপে নিজের বিবর্তনের ক্রিয়াকে সমর্থন করিতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের যে-সকল তথ্যের উপর এই সব দার্শনিক* ভেদবিচার প্রতিষ্ঠিত কেবল সেইগুলিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারা যায় যে, আমরা দুই প্রকার জীবন যাপন করিতে পারি, (১) নিজের সক্রিয়া প্রকৃতির কর্ম-পরম্পরায় নিমগ্ন পুরুষের জীবন, সে নিজেকে তাহার মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রসকলের সহিত এক করিয়া দেখে, তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, নিজের নামরূপের মধ্যে বদ্ধ হয়, প্রকৃতির অধীন হয়; আর (২) আত্মার জীবন, তাহা এই সকল জিনিসের ঊর্ধ্বে, বৃহৎ, নামরূপের অতীত, বিশ্বময়, মুক্ত, অসীম, তুরীয়, তাহা অনন্ত সমতার সহিত তাহার প্রাকৃত সত্তা, ও কর্মকে ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের মুক্তি ও আনন্ত্যের দ্বারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকে। এখন আমাদের যাহা প্রাকৃত সত্তা তাহার মধ্যেই আমরা বাস করিতে পারি অথবা আমাদের যে মহত্তর ও অধ্যাত্ম সত্তা তাহারই মধ্যে বাস করিতে পারি। প্রথমত এই মহৎ প্রভেদটির উপরে গীতার কর্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আমাদের বর্তমান প্রাকৃত সত্তা হইতে অন্তর্পুরুষকে মুক্ত করাই হইতেছে সমগ্র সমস্যা এবং সমগ্র পদ্ধতি। আমাদের প্রাকৃত জীবনে যে

* জড়জগৎ ও মনোজগতের ব্যাপার সমূহেব মূল তত্ত্ব এবং পরম সত্য বস্তু যাহাই হউক তাহার সহিত ইহাদের মূল সম্বন্ধ বিচারবুদ্ধির সহায়ে বিবৃত করাই ফিলজফি philosophy বা দর্শনশাস্ত্র।

জিনিসটি আর সব কিছুকেই ঢাকিয়া রাখিয়াছে সেইটি হইতেছে জড়প্রকৃতির রূপসকলের বশ্যতা, বাহ্যস্পর্শের বশ্যতা। এইগুলি ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং প্রাণও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া উহাদিগকে ধরিবার জন্য, উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য ধাবিত হয়, বাসনা করে, আসক্ত হইয়া পড়ে, ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। মন তাহার সকল আভ্যন্তরীণ অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, হৃদয়াবেগ, তাহার প্রত্যক্ষ চিন্তা ও অনুভবের সকল অভ্যস্ত ধারায় ইন্দ্রিয়গণের এই ক্রিয়ারই অনুসরণ করে; বুদ্ধিও মনের টানে পড়িয়া এই ইন্দ্রিয়গত জীবনে নিজেকে ছাড়িয়া দেয় এই জীবনে অন্তঃপুরুষ বস্তুসকলের বাহ্য রূপের অধীন হইয়া পড়ে, মুহূর্তের জন্যও প্রকৃত পক্ষে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না, বাহ্যজগৎ আমাদের উপর যে ক্রিয়া করে এবং আমাদের মনে তাহার যে-সব ফল ও প্রতিক্রিয়া হয় ইহাদের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। পারে না অহংবোধের জন্য, এই অহং-বোধের দ্বারাই বুদ্ধি আমাদের মন, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় ও শরীরের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়ার সমষ্টিকে অন্যের মন, ইচ্ছা, স্নায়ুমণ্ডল, শরীরের উপর প্রকৃতির ক্রিয়ার প্রভেদ করে; আমরা জীবন বলিতে বুঝি কেবল প্রকৃতি আমাদের অহংয়ের উপর কিভাবে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার স্পর্শে আমাদের অহং কিভাবে সাড়া দিতেছে। আমরা আর কিছুই জানি না, আমরা যে আর কিছু তাহা মনে হয় না; আত্মাকেই তখন মনে হয় কেবল মন, ইচ্ছা, হৃদয়বৃত্তি ও স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার একটা স্বতন্ত্র স্তূপমাত্র। আমরা আমাদের অহংকে প্রসারিত করিতে পারি, নিজদিগকে পরিবার, কুল, সম্প্রদায়, দেশ, অধিজাতি (nation) এমন কি সমগ্র মানব জাতির সহিতই এক করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তথাপি এইসব ছদ্মবেশের অন্তরালে অহংই থাকে আমাদের কর্মের মূলতত্ত্ব, কেবল সে বাহ্য বস্তুসকলের সহিত এই উদারতর ব্যবহারের দ্বারা নিজের স্বতন্ত্র সত্তার অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করে।

তখনও আমাদের মধ্যে প্রাকৃত সত্তার ইচ্ছাই কার্য করে, বাহ্যজগতের স্পর্শ-সকলকে ধরিয়া ব্যক্তিগত অহংয়ের বিভিন্ন দিককেই পরিতৃপ্ত করিতে চায়, এবং এই ক্রিয়ার ইচ্ছা হইতেছে সকল সময়েই বাসনা কামনার ইচ্ছা, আমাদের কর্ম এবং কর্মের ফলে আসক্তির ইচ্ছা, ইহা হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতিরই ইচ্ছা; আমরা বলি বটে যে, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কিন্তু আমাদের অহংয়ের যে ব্যক্তিগত রূপ তাহা হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি, তাহা আমাদের মুক্ত আত্মা, আমাদের স্বাধীন সত্তা নহে, হইতেই পারে না। সমস্তটিই হইতেছে প্রকৃতির গুণের খেলা। ইহা তমোগুণের ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় জড়, তামসিক, তাহা হয় বস্তুসকলের গতানুগতিক ধারার অধীন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট; মুক্ততর কর্ম ও প্রভুত্বের জন্য সবল প্রয়াস

করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না। অথবা ইহা রজোগুণের ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় অস্থির কর্মপ্রবণ, তাহা প্রকৃতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাকে নিজের প্রয়োজনে ও বাসনার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেখিতে পায় না যে তাহার আপাতদৃষ্ট প্রভুত্ব বস্তুতপক্ষে দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ তাহার প্রয়োজন ও বাসনাসমূহ হইতেছে প্রকৃতিরই, আর যতক্ষণ আমরা উহাদের বশ ততক্ষণ আমাদের কোন স্বাধীনতাই সম্ভব নহে। অথবা ইহা সত্ত্ব গুণেরই ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় জ্ঞানময়, তাহা বিচারবুদ্ধি অনুসরণে জীবনযাপন করিতে অথবা সত্য, শিব বা সুন্দরের কোন আদর্শ সিদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রয়াস করে; কিন্তু এই বিচারবুদ্ধিও প্রকৃতির বাহ্য রূপেরই অধীন এবং এই সকল আদর্শ আমাদের ব্যক্তিত্বেরই পরিবর্তনশীল ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই সবে শেষ পর্যন্ত আমরা কোন নিশ্চিত নীতি বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তখনও আমরা একটা পরিবর্তনের চক্রে ঘূর্ণিত হইতে থাকি, আমাদের অহংয়ের ভিতর দিয়া এক শক্তি আমাদিগকে ঘুরায়, সে শক্তি আমাদের মধ্যে, এই সবের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজেরা সে শক্তি নহি অথবা তাহার সহিত আমাদের যোগ বা সহকারিতা নাই। তখনও স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত প্রভুত্ব নাই।

অথচ স্বাধীনতা সম্ভব। ইহার জন্য প্রথমে আমাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যজগতে যে ক্রিয়া তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের ভিতরে আসিতে হইবে, অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া চলিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়গণ যে স্বভাবত তাহাদের বাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব, তাহারা যে-সব বস্তুর জন্য লালায়িত সে-সব বর্জন করিবার সামর্থ্য—ইহাই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন; কেবল এইরূপেই আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদের ভিতরে এক আত্মা আছে, বাহ্য বস্তুর স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মনের যে অবস্থা-বিপর্যয় হয় সে আত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, সে আত্মা নিজের গভীরতর সত্তায় স্ব-প্রতিষ্ঠ, অক্ষর, প্রশান্ত, আত্মবশ, গম্ভীর, স্থির ও সুমহান, তাহা নিজেই নিজের ঈশ্বর এবং আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির সাগ্রহ ছুটাছুটিতে সম্পূর্ণ অবিচলিত। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বাসনার বশ ততক্ষণ ভিতরের এই আত্মাকে অনুভব করা যায় না। কারণ আমাদের সমগ্র বাহ্যজীবনের মূল তত্ত্ব এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের জীবনেই তৃপ্তি পায়, কাম ক্রোধাদি রিপুগণের ক্রিয়াতেই সে মত্ত থাকে। অতএব আমাদিগকে বাসনা দূর করিতেই হইবে। আমাদের প্রাকৃত সত্তার এই প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে ইহার অনুভাবাত্মক ফলস্বরূপ কামক্রোধাদি চিত্তবিকার সকল শান্ত হইয়া পড়িবে; কারণ যে সুখ-দুঃখের বোধ এই সকল চিত্তবিকার সৃষ্টি করে তাহা আমাদের অন্তর হইতে

চলিয়া যাইবে, বাসনা বিদূরিত হইলে আর আমরা লাভ ও ক্ষতিতে, জয় ও পরাজয়ে, সুখময় ও বেদনাময় বাহ্যস্পর্শে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিব না। তখন আসিবে এক প্রশান্ত সমতা। আর যেহেতু তখনও আমাদিগকে সংসারে বাস করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে, আর যেহেতু আমাদের প্রকৃতি এইরূপ যে কর্ম করিতে হইলেই ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিতে হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃতির পরিবর্তন করিতেই হইবে এবং কর্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে, নতুবা বাসনা এবং বাসনার সমস্ত পরিণাম থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কর্মীর এই প্রকৃতি কেমন করিয়া পরিবর্তন করা যায়? কর্মকে অহং ও ব্যক্তিসত্তা হইতে পৃথক করিতে হইবে, বুদ্ধির দ্বারা দেখিতে হইবে যে, এসবই হইতেছে প্রকৃতির গুণের খেলা, আমাদের অন্তপুরুষকে এই খেলা হইতে পৃথক করিতে হইবে, প্রথমেই তাহাকে করিতে হইবে প্রকৃতির কর্মসকলের সাক্ষী, এবং ঐ সকল কর্মকে সেই শক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে যে-শক্তি বস্তুতপক্ষে উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে—প্রকৃতির মধ্যে ঐ শক্তি হইতেছে আমাদের অপেক্ষা মহত্তর, তাহা আমাদের ব্যক্তিসত্তা নহে, তাহা হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বর। কিন্তু মন এই সব করিতে দিবে না; মনের স্বভাবই হইতেছে বাহিরের দিকে ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকেও নিজের সঙ্গে টানিয়া লওয়া। অতএব মনকে কেমন করিয়া শান্ত করা যায় তাহা আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। আমাদিগকে এমন পূর্ণতম শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করিতে হইবে যাহাতে আমরা আমাদের অন্তরস্থিত প্রশান্ত, নিশ্চল, আনন্দময় আত্মাকে জানিতে পারি, সে-আত্মা বস্তুসকলের স্পর্শে চির-অক্ষত চির-অবিচলিত, তাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ, নিজের মধ্যেই তাহা অনন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এই আত্মাই হইতেছে আমাদের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা। ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্বভূতের মধ্যে এক, সর্বব্যাপী, সকল বস্তুর প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তার দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধারণ করিয়াছে, কিন্তু কোন সসীম বস্তুর দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নহে, প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সকলের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। যখন এই আত্মা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, যখন আমরা ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব করি, তখন আমরা এই আত্মা হইয়া উঠিতে পারি; আমরা আমাদের অন্ত-পুরুষকে প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিম্নতর অবস্থা হইতে উত্তোলিত করিয়া আত্মার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমরা ইহা করিতে পারি, আমরা যে সকল জিনিস লাভ করিয়াছি, শান্তি, সমতা, বিক্ষোভহীন নির্ব্যক্তিকতা—এই সকলের শক্তির দ্বারা। কারণ যতই আমরা এই সকল জিনিসে বর্ধিত হই, ইহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলি, আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে ইহাদের অধীন

করিয়া দিই ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নির্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী আত্মা হইয়া উঠি। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ঐ নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং আমাদের উপর বাহ্যজগতের স্পর্শ সকলকে পরম শান্তির সহিত গ্রহণ করে; আমাদের মন নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং শান্ত বিশ্বমুখীন সাক্ষী হইয়া উঠে; আমাদের অহং এই নির্ব্যক্তিক সত্তায় লয় হইয়া যায়। আমরা নিজেরা এই যে আত্মা হইয়াছি তাহার মধ্যেই আমরা সকল বস্তুকে দেখি; আমরা মূল অধ্যাত্ম সত্তায় সর্বভূতের সহিত এক হইয়া উঠি। এই অহংভাব-শূন্য শান্তি ও নির্ব্যক্তিকতায় কর্ম করিয়া, আমাদের কর্ম আর আমাদের থাকে না, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আর আমাদিগকে বদ্ধ করে না, বিক্ষুব্ধ করে না। প্রকৃতি এবং তাহার গুণসমূহ তাহার কর্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখলেশশূন্য স্ব-প্রতিষ্ঠ শান্তির হানি করিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

কিন্তু এখানে দুইটি সমস্যা থাকিয়া যায়। প্রথমত, শান্ত ও অক্ষর আত্মা এবং প্রকৃতির কর্ম এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কর্মের অস্তিত্ব আদৌ কেমন করিয়া সম্ভব হয় অথবা একবার অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রবেশ লাভ করিলে আর কর্ম কেমন করিয়া চলিতে পারে? সেখানে কর্মের সেই প্রেরণা কোথায় যাহার দ্বারা আমাদের প্রস্তুতির কর্ম সম্ভব হইবে? যদি আমরা সাংখ্যের সহিত বলি যে, প্রেরণা রহিয়াছে প্রকৃতিরই মধ্যে, আত্মার মধ্যে নহে, তাহা হইলে প্রকৃতিতে একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, পুরুষকে অনুরাগ, অহংভাব ও আসক্তির দ্বারা তাহাদের কর্মের মধ্যে টানিয়া লইবার শক্তি থাকা চাই, আর যখন এইসব জিনিস আর নিজদিগকে পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে প্রতিফলিত করে না তখন প্রকৃতির আর শক্তি থাকে না এবং সেই সঙ্গে কর্মের প্রেরণাও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ করে নাই, বস্তুত এই মত অনুসারে বহু-বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কেবল এক বিশ্বপুরুষ নহে, নতুবা জীবের পৃথক-পৃথক জীবন এবং যখন লক্ষ-লক্ষ অন্য জীব বদ্ধ রহিয়াছে তখন কোন একটি জীবের মুক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ভগবানের যে-শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে বাহির হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান যদি কেবল এই অক্ষর আত্মা হন এবং জীব হয় কেবল এমন একটি জিনিস যাহা তাহা হইতে শক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলে যে-মুহূর্তে সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেই মুহূর্তেই পরম ঐক্য ও পরম নিস্তব্ধতা ভিন্ন আর সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত যদিই কোন অচিন্ত্য উপায়ে কর্ম তখনও চলিতে থাকে, তথাপি যেহেতু আত্মা সকল জিনিসের প্রতিই সমভাবাপন্ন, সেহেতু কর্ম হইল কি না তাহাতে কিছুই

আসিয়া যায় না, আর যদিও কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, কি কর্ম করা হইল তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। তাহা হইলে এই ঘোরতম ও নিষ্ঠুরতম কর্ম করিতে পুনঃ-পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ, এই যুদ্ধ, এই রথী, এই দিব্য সারথী কেন?

গীতা ইহার উত্তরে দেখাইয়াছে যে, ভগবান অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও মহত্তর, অধিকতর ব্যাপক, তিনি একাধারে এই আত্মা আবার প্রকৃতির কর্মের অধীশ্বর। কিন্তু অক্ষরের যে অনন্ত শান্তি, যে সমতা, যে কর্ম ও ব্যক্তিত্বের অতীত স্বরূপ—ভগবান ভিতরে অক্ষরের এই ভাব লইয়াই প্রকৃতির কর্মসকল পরিচালনা করেন। আমরা বলিতে পারি যে, সত্তার এই প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি কর্ম পরিচালনা করেন, আর আমরা যতই এই প্রতিষ্ঠায় গড়িয়া উঠি ততই আমরা তাঁহার সত্তায় এবং দিব্য কর্মের প্রতিষ্ঠায় গড়িয়া উঠি। এই অক্ষর প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি প্রকৃতিতে ইচ্ছা ও শক্তিরূপে বহির্গত হন, নিজেকে সর্বভূতে অভিব্যক্ত করেন, জগতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সকলের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, অবতাররূপে, মানুষের মধ্যে দিব্য জন্মরূপে নিজেকে প্রকট করেন; আর মানুষ যেমন তাঁহার সত্তায় গড়িয়া উঠে, এই দিব্য জন্মের মধ্যেই সে গড়িয়া উঠে। কর্ম করিতে হইবে আমাদের কর্মের এই অধীশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে, এবং আমাদিগকে আত্মায় গড়িয়া উঠিয়া আমাদের সত্তায় তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক অভিব্যক্তিরূপে। সত্তায় তাঁহার সহিত এক হইয়া আমরা বিশ্বের সকল জীবের সহিত এক হইয়া উঠিব এবং দিব্য কর্ম করিব, আমাদের নিজের কাজ বলিয়া নহে, পরন্তু লোক রক্ষা ও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহারই কর্ম বলিয়া।

এইটি সিদ্ধ করিয়া তোলাই মূল কথা, এবং একবার এইটি সিদ্ধ হইলে, অর্জুনের সম্মুখে যে-সকল সমস্যা উঠিয়াছে সে-সব দূর হইয়া যাইবে। সমস্যাটি তখন আর আমাদের ব্যক্তিগত কর্মের সমস্যা থাকে না, কারণ যাহা লইয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহা তখন সাময়িক ও নীচের জিনিস হইয়া পড়ে, সমস্যাটি তখন হয়—ভগবৎ ইচ্ছা আমাদের ভিতর দিয়া বিশ্বমাঝে যে-কর্ম করিতেছে তাহারই সমস্যা। এইটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, এই পরম পুরুষ নিজে কি এবং প্রকৃতিতেই বা কি, প্রকৃতির কর্মপরম্পরা কি এবং তাহাদের লক্ষ্যই বা কি; প্রকৃতি-স্থ পুরুষ এবং এই পরম পুরুষের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জ্ঞানযুক্ত ভক্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহা জানিতে হইবে। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই গীতার বাকী অংশের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড (পূর্বার্ধ)

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়

প্রথম অধ্যায়

দুই প্রকৃতি

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ রচিত হইয়াছে। ঐ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধনা ও জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। সেই ভাবেই গীতার বাকী দ্বাদশ অধ্যায়কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি ভাগ রূপে লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগের শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই দুই ভাগে গীতাশিক্ষার বাকী অংশ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় সমন্বয় করা হইয়াছে ঠিক যেমন গীতার প্রথম ভাগে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করা হইয়াছে। গীতার সমন্বয়ের এই অবস্থায় মাঝখানে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার দ্বারা এই সমন্বয়কে জীবন্ত ও পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে; এবং ইহার সহিত জীবন ও কর্মের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত শিক্ষাটিকে পুনরায় ঘুরাইয়া অর্জুনের গোড়াকার প্রশ্নে লইয়া আসা হইয়াছে;—বাস্তবিক অর্জুনের সেই প্রথম প্রশ্নই গীতার সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রশ্নটিরই চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ করিয়া গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওয়া, নিষ্কাম কর্ম কেমন জ্ঞানে পরিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হয়—এই সব সম্বন্ধে নিজের মত পরিস্ফুট করিয়াছে; এবং সেখান হইতে তাহার শিক্ষার মহান চূড়ান্ত কথায় উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণের গুহ্যতম রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে।

গীতার এই দ্বিতীয় খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায় না। যে সকল সংজ্ঞার দ্বারা মূল সত্যটি বুঝিবার সূত্র পাওয়া যায়, প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; সংশয়-সকল যেমন উঠিয়াছে তেমনিই তাহাদের সমাধান করা হইয়াছে। সেখানে গীতার শিক্ষাটি যেন একটু কষ্টেসৃষ্টে অগ্রসর হইয়াছে এবং অনেক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। অনেক এমন কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডে মনে হয়, আমরা যেন আরও পরিষ্কার ভূমি পাইয়াছি। এখানে কথাগুলি আর

তেমন আল্‌গা-আল্‌গা নহে—সোজাসুজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী; এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটি হারাইয়া না ফেলি সেজন্য আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতার সহিতই অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই। এখানে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে, এমন কি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। এরূপ তাত্ত্বিক (Metaphysical statement) বর্ণনার মুশকিল এই যে, যাহা বাস্তবিক অনন্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হয়, সসীম সান্ত মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ চেষ্টা করা দরকার হয় বটে, কিন্তু, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে পারে না, চরম ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পূর্ণই হতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ যে পদ্ধতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এ-সব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই সমীচীন। উপনিষদ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজি প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনা ও আভাসের দ্বারা সত্যের সংকেত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু, গীতা এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে নাই; কারণ, মনের সংশয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্য। মনের যে অবস্থায় বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুলির সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহা বুদ্ধির উপরে; কিন্তু, বুদ্ধির নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরন অনুসারেই তাহাকে চালাইতে হইবে। গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তর্জীবনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের উপর তাহার ভিত্তি। সে ভিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা নাই। অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট করিতে হইলে, জীবনের যে সকল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত যে-সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার মত সমর্থন করিয়াছে, অর্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একেবারে নূতন নহে; এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা। প্রথমে, আত্মার (the self) সহিত প্রকৃতিস্থ জীবের

প্রভেদ করা হইয়াছে। এই প্রভেদের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্রকৃতিস্থ (individual being in Nature) অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ, ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই; মানুষের মন-বুদ্ধির যে ক্রিয়া, তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সে-সব এই গুণত্রয়ের, সত্ত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই গণ্ডীর মধ্যে কোনই সমাধান নাই। প্রকৃত সমাধান পাইতে হইলে এই গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে; এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উপরে উঠিয়া এক অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে ও নীরব আত্মায় পোঁছিতে হইবে; কারণ তখনই মানুষ সকল অনর্থের মূল অহঙ্কার ও বাসনার ক্রিয়াকে অতিক্রম করিবে। কিন্তু, এইভাবে মানুষ কি একেবারে নিষ্ক্রিয়তায় উপনীত হইবে না? প্রকৃতির বাহিরে ত কোথাও কর্ম-শক্তি নাই, কর্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়,—সকল বস্তু, সকল কর্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ। এইজন্যই গীতা যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে,—ঈশ্বর সকল কর্মের, সকল যজ্ঞের প্রভু। গীতা এখানে স্পষ্টভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর পুরুষেরও উপরে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অতএব পুরুষ বা আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্মের বন্ধন হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির মধ্যে কর্ম করা যায়। কিন্তু, এই যে পরমেশ্বর দিব্যগুরুরূপে দিব্যসারথিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মার সহিত এবং প্রকৃতিস্থ জীবের সহিত ইঁহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা এখনও প্রকাশ কবিয়া বলা হয় নাই। আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্মের যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন কিসে, তাহাও এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। এবং যদি উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু না হয়, তাহা হইলে উহার অনুসারে কর্ম করিয়া জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? তাহা হইলে যে-মুক্তির ভরসা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ হইবে না? সত্তার যেটা ক্রিয়ার দিক তাহাই প্রকৃতি, শক্তি; ক্রিয়াশক্তি রূপে ইচ্ছা তাহার অন্তর্নিহিত। তাহা হইলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াও তাহার উপরে কি আর কোনও প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসনা, মন ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাণের আবেগ—এই সব ব্যতীত কর্মের, ইচ্ছার, বাস্তব সৃষ্টির কি আর কোন শক্তি আছে?

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। অতএব *দিব্য কর্মের* ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পূর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সকল কর্মের মূল উৎস ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ সমগ্র জ্ঞানই এইরূপ দিব্য কর্মের ভিত্তি হইতে পারে। সেই জ্ঞান লাভ করিয়া কর্মী ভগবানের সত্তাতেই মুক্ত হন; কারণ, *তিনি সেই মুক্ত আত্মাকে জানেন, যাহা হইতে সকল*

কর্মের উৎপত্তি; এবং তাহার মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা হইয়াছে তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক চেতনা ও কর্মের অন্য সকল প্রেরণা ও শক্তির উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান হইবে সেই পরমেশ্বরের, সেই সর্বভূতমহেশ্বরের, যাঁহার নিকটে জীব পূর্ণ সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে। এই পূর্ণ আত্মনিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়ান্ত—গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের শ্লোক-গুলিতে করিলেন। এইখান হইতে যে তত্ত্বব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আমাতে মন লাগাইয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতনা ও কর্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগ সাধনা করিলে তুমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। কোন কিছু বাকী না রাখিয়া, কোন কিছু বাদ না দিয়া আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ এমন জ্ঞান বলিব, যাহা জানিলে এখানে তোমার অবিদিত আর কিছু থাকিবে না।" (সপ্তম অধ্যায় ১—২)। এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার যে প্রস্তাব করা হইল. তাহার তাৎপর্য এই যে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ভগবানই সব; অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জানা যায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়। তখন আর এখানে জানিতে বাকী কিছুই থাকে না; কারণ, সবই সেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে এরূপ সমগ্র নহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্দ্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অহংকারের দ্বারা খণ্ডিত হয়। কেবল সেই জন্যই মনের দ্বারা যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অহংকার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; এবং ইহার দুইটি দিক আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তত্ত্বকে জানা—জ্ঞান; মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্ম-প্রকাশ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহা কিছু আছে সকল জিনিসেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদের প্রকৃতির চরম সত্য জানিতে পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান সুদুর্লভ,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭।৩

"সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ন করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক-জন তত্ত্বতঃ আমাকে জানে (Knows me in all the principles of my existence)।

এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ গীতা প্রথমেই দুই প্রকৃতির, প্রাতিভাসিক (phenomenal) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। এই প্রভেদের উপরেই কার্যত গীতার সমস্ত যোগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫

"পঞ্চভূত (জড়সত্তার পঞ্চ অবস্থা), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপরা; কিন্তু, ইহা হইতে বিভিন্ন আমার অন্য এক প্রকৃতি আছে জানিও। তাহা পরা প্রকৃতি। তাহাই জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে।" তত্ত্ববর্ণনায় এইটিই গীতার প্রথম নূতন কথা। ইহার সাহায্যেই গীতা সাংখ্য দর্শনের মত হইতে আরম্ভ করিয়াও সাংখ্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে; এবং সাংখ্যের বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদান্তিক অর্থ দিতে পারিয়াছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। গীতার এই বর্ণনা সাংখ্যেরই প্রকৃতির বর্ণনা। সাংখ্য এইখানেই থামিয়াছে এবং এইখানে থামিয়াছে বলিয়াই সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে বলিতে হইয়াছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি বস্তু (primary entities)। গীতাও যদি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও পুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রমণীয় বিরোধ স্বীকার করিতে হইত; এবং তাহা হইলে বিশ্ব-প্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়া; এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা, আর কিছুই নহে। কিন্তু, আরও কিছু আছে—এক উচ্চতর তত্ত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে; তাহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল—আদ্যা সৃজনী শক্তি ও কর্ম-শক্তি। নীচের অজ্ঞান অপরা প্রকৃতি সেই পরা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহারই অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম ক্রিয়াস্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। সেখানে প্রকৃতি পুরুষেরই সঙ্কল্প ও কার্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকৃতি পুরুষেরই সক্রিয়তা—পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে,—পুরুষই স্বয়ং শক্তিরূপে আবির্ভূত।

এই পরা প্রকৃতি ভগবানের শক্তিরূপে কেবল যে বিশ্বলীলার মধ্যে অনুস্যূতই রহিয়াছে তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে যে সর্বব্যাপী আত্মা নিষ্ক্রিয়ভাবে সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে, সকল জিনিসের মধ্যে রহিয়াছে, সকলকেই ধরিয়া আছে, বিশ্বলীলা চলিতে একভাবে বাধ্য করিতেছে অথচ নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই নিষ্ক্রিয় আত্মার সহিত এই পরা প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত না। এই পরা প্রকৃতি সাংখ্যের অব্যক্তও নহে; ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত; সাংখ্যের মতে তাহাই প্রকৃতির একমাত্র মূল সৃজনীশক্তি, তাহা হইতেই প্রকৃতির বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব। আবার অব্যক্ত তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে চলিবে না যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে যে শক্তি বদ্ধ ও নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, যাহাতে বিশ্বের লয় হইতেছে, তাহাই এই পরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক; কারণ সেটি পরাপ্রকৃতির নানা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে কেবল একটি অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে পূর্ণ চিৎ-শক্তি রহিয়াছে তাহাই পরা প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষে ইহা আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত; ইহা সেখানে রহিয়াছে কিন্তু কর্ম করিতেছে না, নিবৃত্তিতে রহিয়াছে। ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা কর্মে বহির্গত হইয়াছে,—প্রবৃত্তি। সেখানে প্রকট শক্তিরূপে থাকিয়া উহা আত্মার সত্তার মধ্যে সর্বভূতের বিকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহাদের অন্তরতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহের পশ্চাতে স্থায়ী সত্যরূপে বিরাজ করিতেছে। উহাই ভূত-সকলের আবির্ভাবের মূল গুণ ও শক্তি, তাহাদের বাহ্য-প্রকাশের পশ্চাতে অন্তরতম সত্তা এবং দিব্যশক্তি। সত্ত্বাদি গুণের যে দ্বন্দ্ব তাহা এই পরা প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন নীচের খেলা, স্থূল খেলা। নামরূপের এসব খেলা, নীচের প্রকৃতির মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির খেলা, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ঘটনা, phenomenon। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না। ঐ শক্তি হইতেই এ-সব উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই রহিয়াছে, এবং কেবল উহার দ্বারাই চলিতেছে। আমরা যদি শুধু এই প্রাতি-ভাসিক প্রকৃতির (phenomenal nature) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতির বস্তুসকলকে যেমন দেখায় শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা হইলে আমাদের কর্ম-জীবনের প্রকৃত সত্যটি আমরা ধরিতে পারিব না। প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধ্যাত্মিক শক্তি, দিব্য প্রকৃতি, সকল বস্তুর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক গুণ; অথবা বলা যাইতে পারে, যে-আত্মার মধ্যে বস্তু-সকল রহিয়াছে, যাহা হইতে তাহারা তাহাদের সকল শক্তি এবং কর্মের বীজ

পাইতেছে, ইহা সেই আত্মারই অন্তরতম গুণ। সেই সত্যকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমরা ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার সত্য নিয়মটি আমরা ধরিতে পারিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধরিতে পারিব; কেবল জীবনের অজ্ঞান খেলায় মগ্ন থাকিয়া, জ্ঞানের মধ্যেই ইহার যে মূল ও সার্থকতা আছে তাহার সন্ধান পাইব।

এখানে যে ভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা করা হইল তাহা আমাদের বর্তমান চিন্তাধারার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপযোগী। কিন্তু, গীতা পরা প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, গীতা বস্তুত এই কথাই বলিয়াছে। কারণ, প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই উপরের প্রকৃতি আমারই পরা প্রকৃতি, প্রকৃতিম্ মে পরাম্। এখানে "আমি" বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই পরমাত্মার আদ্যা ও সনাতনী প্রকৃতি এবং ইহার বিশ্বাতীতা এবং সর্বসৃষ্টির মূলস্বরূপা শক্তি—ইহাকেই পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহার প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, "এতদ্‌যোনিনী ভূতানি"—এই প্রকৃতি হইতেই সর্বভূতির উৎপত্তি। এবং এই শ্লোকেরই দ্বিতীয় পদে সকল সৃষ্টির মূল আত্মার দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা", আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই ইহার লয় হয়। আমা অপেক্ষা বড়, আমার উপরে আর কিছুই নাই।" অতএব এখানে পরমাত্মা পুরুষোত্তম এবং সর্বোত্তমা প্রকৃতি পরা প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে। এখান হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা একই সত্যের কেবল দুইটা দেখিবার ভঙ্গী মাত্র কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন—"আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও স্থান", তাঁহার পরা প্রকৃতিই যে এই দুই স্থান তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান তাঁহার অনন্ত চেতনাস্বরূপেই পরমাত্মা এবং পরমাত্মার অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছাই পরা প্রকৃতি,—পরমাত্মা তাঁহার অনন্ত চেতনার অন্তর্গত দিব্য তেজ এবং দিব্য কর্ম স্বরূপেই পরা প্রকৃতি। পরমাত্মার মধ্য হইতে এই চিৎশক্তির বিবর্তন ও বিকাশ (the movement of evolution), পরা প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর-জগতে ইহার লীলা—ইহাই সৃষ্টি, প্রভবঃ; ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষরের মধ্যে এই লীলার সংহরণ, পরমাত্মার আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান—ইহাই প্রলয়। তাহা হইলে পরা প্রকৃতি বলিতে প্রথমত ইহাই বুঝাইতেছে।

অতএব পরা প্রকৃতি হইতেছে অনাদি ভাগবত সত্তার সেই অনন্ত কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে বাহির হইয়াছে। কিন্তু জগতে এই বিচিত্র বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার জন্য অধ্যাত্ম সত্তার প্রয়োজন;

তাই পরা প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, জীবভূতা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষোত্তমের সনাতন বহুধা আত্মা জগতে সমস্ত নামরূপের মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এক অখন্ড পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্তু অনুপ্রাণিত। সেই এক পুরুষের সনাতন বহুত্বই সকলের ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও নামরূপকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগকে সর্তক হইতে হইবে যেন আমরা না ভাবি যে, কালের মধ্যে যে-জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং পরা প্রকৃতি এমনভাবে এক যে পরা প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে; উহা শুধুই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু সৎস্বরূপ নহে। পরমাত্মার পরা প্রকৃতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা প্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা তাহা বলে নাই; গীতা বলে নাই যে, পরা প্রকৃতি তাহার মূল সত্তায় জীব, জীবাত্মকাম্। গীতা বলিয়াছে, পরা প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতাম্; এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, জীবরূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে পরা প্রকৃতি মূলত আরও কিছু, আবও উচ্চ সত্তা,—ইহা এক পরম আত্মারই স্বরূপ। পরে বলা হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বর, মমৈবাংশঃ। কি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিংবা অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সেই সব মিলিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে,—তাহারা কেবলমাত্র সেই এক অনন্তের আংশিক প্রকাশ। তাহাদেব মধ্যে এক অবিভক্ত ব্রহ্ম যেন বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন,— অবিভক্ত ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার নীচের সত্য, যদিও উভয়েই সত্য এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা ভ্রম নহে।

এই আধ্যাত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ;—যেমন ইহা হইতেই সর্ব ভূতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, এতদ্-যোনিনী ভূতানি, এবং ইহাই প্রলয়কালের সর্বভূতসহ সমগ্র জগৎকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়,—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। কিন্তু পরমাত্মার মধ্যে এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে, এই লীলায় জীবই বহুত্বের ভিত্তি। ইহাকে বহুধা আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা জগতে আমরা যে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাঁহার আত্মা—ইহা বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল সত্তায় সকল সময়েই ভগবানের সহিত এক; কেবল শক্তিতেই ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহা বুঝায় না যে, জীব আদৌ ঐ শক্তি নহে, পরন্তু কেবল ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে আংশিক বহুধা ব্যষ্টিগত ক্রিয়ায় ধরিয়া আছে। অতএব সকল বস্তু আদিতে অন্তে এবং স্থিতিকালেও সেই পরমাত্মা। সকলেরই মূল

প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতি। কেবল নীচের বিশেষাত্মক খেলাতেই মনে হয় যেন তাহারা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন; মনে হয় শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়গণই বুঝি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশ মাত্র,—ইহারা আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের জীবনের নিগূঢ় সত্য নহে।

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীতে সত্তার মূল সত্য ও শক্তি; আবার সেই পরা প্রকৃতিই বিশ্বমাঝে প্রকাশলীলার মূল ভিত্তি স্বরূপ অধ্যাত্ম সত্য। কিন্তু তাহা হইলে এই পরাপ্রকৃতির সহিত নীচের প্রাতিভাসিক প্রকৃতির, অপরা-প্রকৃতির সম্বন্ধের সূত্র কোথায়? কৃষ্ণ বলিলেন, এসব, এখানে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই, আমাতে সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, ময়ি সর্ব্বমিদং (৩) প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। কিন্তু ইহা কেবল একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে না; কারণ, মণিগণ সূত্রের দ্বারা এক সঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র। সূত্রের সহিত তাহাদের একত্ব বা অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে অবলম্বন করিয়া মণিগণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব উপমা ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। পরমাত্মার পরা প্রকৃতি, তাঁহার সত্তার অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা আত্মবিদ্, সর্ববিদ্, সর্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তু-সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া সকলকে একত্র সাজাইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছে। এই এক পরা-শক্তি সকলের মধ্যে যে এক পরম সত্তারূপে আবির্ভূত হয় কেবল তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যেকের মধ্যে জীবরূপে, ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হয়, আবার প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারূপেও আবির্ভূত হয়। তাহা হইলে সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত অধ্যাত্ম শক্তি। এই সর্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া নহে: ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি মাত্র, ইহার আধ্যাত্মিক সারবত্তা নহে। বস্তুত ইহা হইতেছে এই সব বাহ্যিক বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশীল আভ্যন্তরীণ শক্তি। প্রকটনের ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে আধ্যাত্মিক ও দিব্য সার্থকতা প্রদান করিতেছে। ত্রিগুণের ক্রিয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার, প্রাণ ও জড়দেহের বাহ্যিক চঞ্চল ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকটনের সার স্থির মূল নিগূঢ় শক্তি—

(৩) জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে "সর্ব্বমিদং" এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বভাব। সকল প্রকটনের এবং প্রত্যেক জীবের মূল ধর্ম, স্ব-ধর্ম, ইহার দ্বারাই নির্ণীত হয়; ইহাই জীব প্রকৃতির মূল সত্তা এবং ইহাই তাহার ক্রিয়ার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ত্ব ভগবানের বিশ্বাতীত আত্মপ্রকাশ (মদ্-ভাবঃ) হইতে উৎপন্ন এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহাই এই। দিব্য ভাবের সহিত স্বভাবের এই সম্বন্ধ এবং স্বভাবের সহিত বাহ্যিক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত গুণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ, এইখানেই আমরা উপরের দিব্য জীবন এবং নীচের প্রাকৃত জীবনের সম্বন্ধ-সূত্র দেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন শক্তি ও সম্পদসমূহ পরা প্রকৃতির মহান শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই উৎপন্ন, এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তবে তাহারা নিজেদের মূল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্মের নিগূঢ় নীতির সন্ধান পাইবে। সেই রকম, জীব যে ত্রিগুণের শৃঙ্খলিত, ক্ষুদ্র, নীচ খেলায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে যদি—সে মুক্ত হইতে চায় এবং দিব্য ও সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার স্বভাবের মূল গুণকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে তাহার নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্মে ফিরিয়া যাইতেই হইবে, সেখানে সে তাহার দিব্য প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, সক্রিয়তা ও সর্বোত্তম বিকাশের সন্ধান পাইবে।

ঠিক পরের শ্লোকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থ-সমূহের মধ্যে নিজের পরা প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবির্ভূত হন। শ্লোকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুলি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। প্রথমত, দিব্য-শক্তি ও দিব্য-সত্তা পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ মূল অবস্থার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া কাজ করিতেছে। "আমি জলে রস, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, অগ্নিতে তেজ", এবং আমরা এখানে যোগ করিয়া দিতে পারি, বায়ুতে স্পর্শ। ইহার তাৎপর্য এই যে, পঞ্চভূত (৪) যে রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয়, স্বয়ং ভগবান নিজের পরা প্রকৃতিতে সেই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল শক্তি। জড়ের পাঁচটি মূল

(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essential conditions)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid), কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

অবস্থা পঞ্চভূত। ইহারাই নীচের প্রকৃতিতে বস্তুস্বরূপ এবং ইহারাই জড়ের আকারভেদের আশ্রয়স্থল। পঞ্চ তন্মাত্র—রস, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহার গুণ-স্বরূপ। এই তন্মাত্রগুলি সূক্ষ্ম শক্তি। ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিয়-চৈতন্য জড়বস্তু-সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড়ই সদ্‌বস্তু, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড় হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উল্টাটাই সত্য। জড়-বস্তু এবং জড়-আধার ইহারা নিজেই উদ্ভূত শক্তি। জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিকট প্রকৃতির গুণসমূহের ক্রিয়া যে স্থূল-ভাবে প্রকট হয়, জড় মূলত সেই স্থূলভাব বা অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মূল সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। তাহাই ইন্দ্রিয়া-নুভূতির ভিতর দিয়া জীবাত্মার সম্মুখে নানা রূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্রিয়েরও যে সার শক্তি, গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তি, সূক্ষ্মতম শক্তি, তাহাও ঐ সনাতন শক্তিরই অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির যে-শক্তি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবানই সেই শক্তি; অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধ সত্তায় সেই ভাগবত প্রকৃতি,—ভগবানই তাঁহার নিজ সক্রিয় চৈতন্যশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইয়াছেন।

এই শ্রেণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বস্তু হইতে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। "আমি চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, মানুষের পৌরুষ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানদের বল, তপস্বীর তপঃশক্তি।" "আমি সর্বভূতের জীবন।" এই সকল বস্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইবার জন্য শক্তির যে মূল গুণের উপরে উহারা নির্ভর করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই শক্তিকেই নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃতিতে ভাগবত শক্তির অধিষ্ঠানের ঐটিই স্বরূপ লক্ষণ। আবার, "আমি সর্ববেদে প্রণব" অর্থাৎ মূলশব্দ ওঁ। এই ওঁকারই শ্রুতির সকল শক্তিশালী সৃজনক্ষম শব্দের মূল ভিত্তি; শব্দ ও বাক্যের যে শক্তি তাহারই সর্বসাধারণ রূপটি হইতেছে ওঁ। এই ওঁকারের মধ্যে বাক্‌ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিকাশ-সম্ভাবনা সংক্ষেপে নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য যে-সব শব্দ ভাষার উপাদান, সে সকল এই মূল ওঁকারেরই ক্রমবিকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। এইবার কথাটি খুব পরিষ্কার হইল; ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ বা তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহা পরা-প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নহে। মূল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্ব-ভাব, তাহাই পরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার যে-শক্তি এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, আত্মার চেতনার যে-জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিসে ইহার তেজের যে-শক্তি, তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি। সেই শক্তি, জ্যোতিই সনাতন বীজ, তাহা হইতেই

আর সব জিনিস উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে,—আর সব জিনিস তাহারই বিচিত্র লীলা। অতএব গীতা খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্ব্ব-ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্—"হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও।" এই সনাতন বীজ আত্মার শক্তি, আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা. ভগবান এই বীজ মহদ্‌ব্রহ্মে নিক্ষেপ করেন এবং তাহা হইতেই সর্বভূতের আবির্ভাব হয়। আত্মার এই বীজই সর্বভূতের মূল গুণরূপে আবির্ভূত হয় এবং তাহাদের স্বভাব হয়।

মূল গুণের এই আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শুদ্ধ স্বরূপে যাহা (the thing in itself) এবং নিম্নস্তর-ক্রমে উহা যেরূপ দেখায় (the thing in the lower appearance), এই দুয়ের যে প্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে—বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম—"বলবানদিগের কাম ও আসক্তিবর্জিত বল আমি।" ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ—"জীবগণের মধ্যে যে কাম তাহাদের ধর্মের বিরুদ্ধে নহে, আমিই সেই কাম।" আর উপরের প্রকৃতি হইতে যে-সকল জিনিস নীচের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছে, ভাবাঃ (মনের ভাব, বাসনার অনুরাগ, রিপুর প্রেরণা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ও দন্দ্বময় খেলা, হৃদয়ের নানা অনুভূতি এবং পাপ পুণ্য বিবেক), যে সকল ভাব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই যে সব ত্রিগুণের খেলা, গীতা বলিয়াছে, তাহারাই পরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপের খেলা নহে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত; "মত্ত এব," আমা হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি তাহা সত্য, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু তে ময়ি, আমি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহারাই আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা হইলে এখানে একটা বেশ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও উহা খুবই সূক্ষ্ম। ভগবান বলিলেন, "আমিই মূল জ্যোতি, তেজ, কাম, বল, বুদ্ধি। কিন্তু. এই সব হইতে নীচের প্রকৃতিতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে আমি মূলসত্তায় তাহা নই এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তবে তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভূত এবং আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে।" অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উপরের প্রকৃতি হইতে সব জিনিস নীচের প্রকৃতিতে কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়াই বা উপরের প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়।

প্রথম কথাটিতে কোন গোলমাল নাই। বলবান পুরুষের যে বল তাহার স্বরূপ মূলত দিব্য; তাহা সত্ত্বেও ঐ পুরুষ কাম ও আসক্তির অধীন হইয়া পড়ে, পাপে পতিত হয় এবং সংগ্রাম করিতে করিতে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু. এরূপ যে হয় তাহার কারণ সে তাহার সকল বাহ্য ক্রিয়ায়

ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে; উপর হইতে, নিজের মূল দিব্য প্রকৃতি হইতে সেই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তাহার এই সব নীচের খেলার জন্য তাহার শক্তির দিব্যস্বরূপের কোনই হানি হয় না। সমস্ত অজ্ঞান, মোহ, সমস্ত স্খলন সত্ত্বেও মূলত তাহা ঠিক একই কথা। তাহার সেই দিব্য প্রকৃতিতে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না সে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, নিজের সত্তার প্রকৃত সূর্যালোকে তাহার সমস্ত জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরের প্রকৃতিতে অবস্থিত ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহার ইচ্ছা এবং কর্মসকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃংখলার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, ভগবান কেমন করিয়া কাম হইতে পারেন? এই কামকেই যে বলা হইয়াছে আমাদের একমাত্র পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে! কিন্তু, সে কাম হইতেছে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ গুণ হইতে—রজোগুণসমুদ্ভবঃ; কারণ কাম বলিতে সচরাচর আমরা এইটিকেই বুঝি। কিন্তু অপরটি আধ্যাত্মিক। সে কাম বা ইচ্ছা ধর্মের বিরুদ্ধ নহে।

আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণ্য-কামনা, নীতি-ধর্মের অনুযায়ী সাত্ত্বিক (৫) কামনা? কিন্তু, তাহা হইলে এখানে একটা স্পষ্ট বিরোধ হয়; কারণ, পরের ছত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাত্ত্বিকভাব-সকল দিব্যভাব নহে তাহারা শুধু নীচের খেলা। অবশ্য পাপকে বর্জন করিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার পর্যন্তও যাইতে পারিবে না; কিন্তু, তেমনই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে হইবে; নতুবা আমরা ভাগবত সত্তায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব না। সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পর ইহারও উপরে উঠিতে হইবে। নীতিধর্মের অনুযায়ী কর্ম আত্মশুদ্ধির কেবল একটা উপায় মাত্র, ইহার দ্বারা আমরা দিব্যপ্রকৃতির দিকে উঠিতে পারি, কিন্তু সেই প্রকৃতি নিজে পাপ-পুণ্য সকল দ্বন্দ্বের অতীত—বাস্তবিক তাহা না হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য সত্তা, বা দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। ধর্মের যে আধ্যাত্মিক অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিস। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম। আর এই স্বভাব মূলত আত্মারই শুদ্ধ গুণ। আত্মার অন্তর্নিহিত যে সজ্ঞান ইচ্ছা এবং নিজস্ব কর্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে যে-কামের

(৫) কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলত এবং কার্যত সাত্ত্বিক।

কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকৃতির ভোগসুখের লালসা নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের সন্ধান। জীবন-লীলার যে দিব্য আনন্দ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে নিজস্ব সজ্ঞান কর্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, ইহা সেই দিব্য আনন্দের কামনা।

কিন্তু তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ কি যে, নীচের প্রকৃতির ভাব, রূপ, বিকার-সকলের মধ্যে ভগবান নাই, এমন কি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, যদিও সে সব ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ? ভগবান যে কোন না কোন ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা তাহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এখানে কেবল ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের যে সত্য পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এসব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার মধ্যে তাঁহার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিস উল্টাভাবে দেখায় এবং এমন অনুভূতি উপলব্ধি দেয় যাহা অন্তত কতকটা বিকৃত। আমরা মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, যেন উহা শরীরেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন; আমাদের অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু বস্তুত শরীরই জীবাত্মার মধ্যে রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই উদ্ভূত। আমরা মনে করি, এই বিশাল জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্মা যেন আমাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ। কিন্তু বস্তুত জগৎটা যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার মধ্যে উহা একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিস। এখানেও তাই: অনেকটা ঠিক এইভাবেই এই সব জিনিস ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, পরন্তু ভগবান ইহাদের মধ্যে নাই। এই যে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতি জিনিস-সকলকে এইরূপ মিথ্যাভাবে দেখায় এবং তাহাদের স্বরূপকে হীন করিয়া দেয় ইহা মায়া, একটা ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি; তাই বলিয়া বুঝায় না যে, এ-সবের কোন অস্তিত্বই নাই, এ সবই মিথ্যা। কথা এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, জিনিসের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে দেয় না, আমাদিগকে অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, খণ্ডিত বুদ্ধির মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে। আমরা যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা, মায়া তাহা আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ৭।১৩

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব-সকলের দ্বারা সমস্ত জগৎ বিভ্রান্ত হয়, এবং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে চিনিতে পারে না।" যদি আমরা

দেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা হইলে আর সবকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতাম, তাহাদের প্রকৃত সত্য আমাদের নিকট ধরা পড়িত, এবং আমাদের জীবন ও কর্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিব্য-প্রকৃতির নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত।

কিন্তু যাহাই হউক, ভগবান এবং ভাগবত প্রকৃতি যখন এই সকল বিভ্রান্ত ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, যখন আমরাই জীব এবং জীবই সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন—মায়া দুরত্যয়া? ইহার কারণ এই যে, এই মায়া ভগবানেরই মায়া, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া, "এই গুণ-ময়ী মায়া আমারই দৈবী মায়া।" ইহা নিজে দিব্য, এবং ভগবানের প্রকৃতি হইতে বিকশিত, কিন্তু দেবতারূপী ভগবানের প্রকৃতি হইতে; ইহা দৈবী, দেবতাদের, অথবা বলিতে পার, দেবতার; কিন্তু দেবতার যে দ্বন্দ্বময় নীচের জাগতিক খেলা, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইহা তাহাই। এই জাগতিক মায়ার আবরণ দেবতা আমাদের বুদ্ধির চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই আবরণের জটিল সূত্র বয়ন করিয়াছেন; শক্তি, পরা প্রকৃতি ইহার ভিত্তি এবং ইহার প্রত্যেক অংশে অনুস্যূত রহিয়াছে। আমাদিগকে আমাদের মধ্যে এই মায়ার জাল খুলিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া, পিছনে ফেলিয়া, দেবতাদিগকে ছাড়াইয়া সেই এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরের দিকে ফিরিতে হইবে। তাঁহার মধ্যে আমরা দেবতাগণের এবং তাঁহাদের কার্যের চরম সার্থকতার সন্ধান পাইব এবং আমাদের অক্ষয় জীবনেরও অন্তরতম আধ্যাত্মিক সত্য-সকলের সন্ধান পাইব

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

"আমার দিকে যাহারা ফিরিয়া আইসে কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়*

গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার গ্রন্থ নহে; কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার জন্যই কোন তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পারে; কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্য নহে, কিন্তু যেন ঐ সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্তমান মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই (সপ্তম) অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দশ শ্লোকে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শনিক সত্যের বর্ণনা করিয়া, ইহার পরেই ষোলটি শ্লোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সত্যকে লইয়াই গীতা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছে; ইহার পূর্বে শুধু কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন. তাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (Power)— পুরুষোত্তম, আত্মা ও জীব; আমাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই চরম সত্য হইতেছে পুরুষোত্তম। এই তিনটিকে অন্যভাবে বলা যাইতে পারে— পরাৎপর (the Supreme); নামরূপের অতীত আত্মা (the impersonal spirit); ; এবং বহুধা জীবাত্মা (the multiple soul), যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কালাতীত ভিত্তি, সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি—মমৈবাংশঃ সনাতনঃ। এই তিনটিই ভাগবত, এই তিনটিই ভগবান। সর্ব্বোত্তমা যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, অবিদ্যার সকল খণ্ডতা হইতে মুক্ত যে পরা প্রকৃতি, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি। নির্ব্যক্তিক নামরূপের অতীত আত্মাতে সেই দিব্য প্রকৃতিই রহিয়াছে; কিন্তু এখানে উহা রহিয়াছে চিরবিশ্রামের অবস্থায়—সাম্য, নিষ্ক্রিয়তা, নিবৃত্তির অবস্থায়। আর ক্রিয়ার জন্য, প্রবৃত্তির জন্য পরা প্রকৃতি বহুধা আত্ম-সত্তা (the multiple spiritual personality)হইয়াছে, জীব হইয়াছে। কিন্তু এই উত্তমা প্রকৃতির যে নিগূঢ় ক্রিয়া তাহা সকল সময়েই আধ্যাত্মিক দিব্য ক্রিয়া। দিব্য পরা প্রকৃতির শক্তিই, ভগবানের সচেতন ইচ্ছাই জীবের বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুণশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়; সেই মূল শক্তিই

* গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৫—২৮ শ্লোক।

জীবের স্বভাব। যে-সব কর্ম ও ভাব (becoming) সাক্ষাৎভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উদ্ভূত সে সকলই দিব্যভাব এবং শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কর্ম। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দিব্যভাবে কর্ম করিতে হইলে মানুষকে তাহার সত্য আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তাহার সকল কর্মকে পরা প্রকৃতি হইতেই প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; যেন আত্মার ভিতর দিয়া এবং অন্তরতম নিগূঢ় সত্তার ভিতর দিয়াই কর্মের বিকাশ হয়, মনের চিন্তা ও প্রাণের বাসনার ভিতর দিয়া নহে; যেন তাহার সকল কর্ম ভগবদ্‌ ইচ্ছারই শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হয়, তাহার সমস্ত জীবন দিব্য প্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হয়।

কিন্তু আবার ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতিও রহিয়াছে; ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কর্ম হইতেছে অজ্ঞানের কর্ম, মিশ্রিত, ভ্রান্ত, বিকৃত। এই কর্ম নীচের সত্তার কর্ম, "অহং"য়ের কর্ম—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কর্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির কর্ম। এই নীচের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব (false personality) হইতে উপরে উঠিবার জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক আত্মাকে (the impersonal Self) ধরিতে হয় তাহার সহিত নিজদিগকে এক করিতে হয়। তখন, এইভাবে অহংয়ের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পুরুষোত্তমের সহিত সত্য ব্যষ্টির সম্বন্ধটি আবিষ্কার করিতে পারি। কর্মে এবং প্রকৃতির কালাধীনে বিকাশে ইহা পুরুষোত্তমের অংশ ও বিশেষ রূপ মাত্র। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহা ব্যষ্টি। তথাপি মূল সত্তায় ইহা পুরুষোত্তমের সহিত এক। আবার, নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে আমরা উপরের দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অতএব আত্মা হইতে কর্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, বাসনাময় আত্মা হইতে কর্ম করা; কারণ, এই বাসনাময় আত্মা উপরের নিগূঢ় বস্তু নহে; ইহা কেবল নীচের প্রাকৃত ও বাহ্য রূপ, সত্য বস্তুর আভাস বা ছায়া। নিগূঢ় প্রকৃতি অনুসারে, স্বভাব অনুসারে কর্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, অহংয়ের কামক্রোধাদি রিপুর বশে কর্ম করা, নির্বিকার চিত্তে অথবা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও গুণত্রয়ের চঞ্চল খেলা অনুসারে পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা। রিপুর বশীভূত হওয়া, স্বেচ্ছায় বা জড়তার বশে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহা উচ্চতম নির্ব্যক্তিক (highest impersonality) সত্তার আধ্যাত্মিক শান্ত নিষ্ক্রিয় ভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব পরম-পুরুষের ইচ্ছার যন্ত্র হইবে, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ হইবে, তাহার কর্মের দিব্যভাব লাভেরও ইহা পথ নহে।

গীতা প্রথম হইতেই নির্দেশ করিয়াছে যে, দিব্যজন্ম, ঊর্ধ্বের জীবন লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রেই প্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং ইহা হইতে উদ্ভূত

অন্যান্য রিপুগণকে বধ করিতে হইবে; এবং ইহার অর্থ, পাপকে বর্জন করিতে হইবে।* আত্মা কর্তৃক প্রকৃতির সর্বপ্রকার আত্মসংযম ও আত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, মূঢ় বা দুর্ধর্ষ রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিসমূহের অশুদ্ধ ভোগের জন্য কর্ম করে তাহাই পাপ। নীচের প্রকৃতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা মানুষকে অশুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লয়, ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির সর্বোচ্চ ভাব সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক এবং কর্মের সত্য নীতির সন্ধান করে। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রহিয়াছে, যে আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন প্রেরণায় সায় দিতেছে, তাহাকে সাত্ত্বিক প্রেরণায় অনুমতি দিতে হইবে। আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা তামসিক প্রেরণার বশে নহে। কর্মে সকল উচ্চ যৌক্তিকতার এবং সকল প্রকৃত নৈতিকতার ইহাই অর্থ। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে নিয়ম প্রকৃতির নীচ বিশৃঙ্খল কর্ম হইতে তাহার উপরের সুশৃঙ্খল কর্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইহা তাহাই। রিপুর বশে, অজ্ঞানের বশে কর্ম করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। তাহা না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ম করিয়া আভ্যন্তরীণ সুখ, স্থিরতা ও শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। আমরা গুণত্রয়ের উপরে উঠিতে পারি না, যদি আমরা আমাদের মধ্যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণ সত্ত্বের ধর্ম বিকাশ না করি।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭।১৫

"মূঢ়, নরাধম, পাপীগণ আমাকে লাভ করিতে পারে না; কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞানকে হরণ করিয়া লয় এবং তাহারা অসুরভাব প্রাপ্ত হয়।" প্রকৃতিতে অবস্থিত আত্মা "আমি"র ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই এইরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পাপী ভগবানকে পায় না; কারণ, সে মানবীয় প্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্বদা "আমি" দেবতার তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই "আমি"ই তাহার ভগবান। তাহার মন ও বুদ্ধি ত্রিগুণের মায়ার দ্বারা অপহৃত হওয়ায় আত্মার যন্ত্র না হইয়া স্বেচ্ছায় তাহার বাসনার দাস হয়; অথবা আত্ম-প্রতারণার বশে তাহার বাসনা-তৃপ্তির যন্ত্র হয়। সে দেখে কেবল তাহার এই নীচের প্রকৃতিকে, কিন্তু তাহার উচ্চতম আত্মা বা

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩।৩৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৩।৪১

শ্রেষ্ঠ সত্তাকে সে দেখিতে পায় না, তাহার মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকেও দেখিতে পায় না। তাহার "আমি"কে এবং বাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে সংসারকে বুঝিয়া থাকে; এবং কেবল এই অহঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। ঊর্ধ্বের প্রকৃতি এবং উচ্চতর জীবনধারা লাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অহঙ্কার ও বাসনার সেবা করে—ইহাই অসুরের মন, অসুরের ভাব। উপরের দিকে উঠিতে হইলে সর্বপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, ঊর্ধ্বের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা, আস্পৃহা (aspiration), চাই বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা। "আমি"র পূজা না করিয়া, "আমি"কেই বড় করিয়া দেবতার আসনে না বসাইয়া চাই কোনও মহত্তর দেবতাকে জানা ও পূজা করা, চাই সত্য চিন্তা করা, সত্য কর্মের কর্মী হওয়া। তবে শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে; কারণ সাত্ত্বিক মানুষও ত্রিগুণের খেলায় মুগ্ধ হয়; যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও দ্বেষের অধীন। সে প্রকৃতির নামরূপের চতুঃসীমার মধ্যেই ঘুরিতেছে, এখনও সে উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, প্রপঞ্চাতীত (transcendental) ও অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি সর্বদা সত্য চিন্তা ও সত্য কর্ম করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাব ফলে অবশেষে সে পাপের মোহ হইতে অর্থাৎ রাজসিক বাসনা ও রিপুর মোহ হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি লাভ করে। তখন ত্রিগুণময়ী মায়ার আধিপত্য ছাড়াইয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। কেবল পুণ্যের দ্বারাই মানুষ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যের * দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ গতির প্রথম যোগ্যতা বা অধিকার লাভ করা যায়। কারণ, অসংস্কৃত রাজসিক "আমি"কে অথবা জড়ভাবাপন্ন তামসিক "আমি"কে বর্জন করা বা ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। সাত্ত্বিক "আমি" তত কঠিন নহে; এবং অবশেষে যখন ইহা নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন ইহাকে অতিক্রম করা, রূপান্তরিত করা বা ধ্বংস করা সহজেই সম্ভব হয়।

অতএব মানুষকে সর্বপ্রথমে নীতিপরায়ণ, সুকৃতি (ethical) হইতে হইবে, এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া, তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্ম প্রকৃতির আলোক, প্রসারতা ও শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেখানে সে দ্বন্দ্বমোহের অতীত হইবে; সেখানে আর সে তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণ বা সুখ খুঁজিবে না, অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণা এড়াইতে চাহিবে না, কারণ, এই সকলের দ্বারা তখন আর সে বিচলিত হইবে না, তখন আর সে বলিবে না, "আমি পুণ্যবান," "আমি

* অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিক ভাবে সামাজিক বা লৌকিক বিধিনিষেধের অনুসরণ বুঝাইতেছে না, ভিতরের সত্যিকারের যে পুণ্য—চিন্তা, ভাব, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আচরণের যে সাত্ত্বিক স্বচ্ছতা তাহার দ্বারাই মানুষ ঊর্ধ্বগতির প্রথম অধিকার লাভ করে।

পাপী", কিন্তু নিজের উচ্চ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশ্বকল্যাণের জন্য কার্য করিবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই অবস্থায় পেঁছিতে হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন—আত্মজ্ঞান, সমতা ও নির্ব্যক্তিক ভাব (impersonality), জ্ঞানের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক কাজের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, কালাতীত আত্মার অচল নিষ্ক্রিয়তার সহিত প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির অনন্ত লীলার সামঞ্জস্য করিতে হইলে উহাই পথ। কিন্তু, যে কর্মযোগী এইভাবে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় করিয়াছে, গীতা এইবার তাহার পক্ষে আর একটি আরও মহান্ প্রয়োজনের কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান ও কর্মই চাওয়া হয় নাই, ভক্তিও চাওয়া হইতেছে। চাই ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্-প্রেম, ভগবদুপাসনা, চাই পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার জন্য আত্মার আকাঙ্ক্ষা। এ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রয়োজনের কথা বলা না হইলেও ইহার জন্য শিষ্যকে ইতিপূর্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন গুরু বলিয়াছেন যে, তাঁহার যোগে সকল কর্মকে ক্রমশ আমাদের জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পরিণত করিতেই হইবে। সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিযাই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদের নির্ব্যক্তিক আত্মার (impersonal self) সমর্পণ নহে, নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাঁহা হইতে আমাদের সকল ইচ্ছা, সকল শক্তির উৎপত্তি। সেখানে যাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে; এবং এখন আমরা গীতার উদ্দেশ্যটি আরও পূর্ণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি।

এখন আমাদের সম্মুখে তিনটি পরস্পর-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা আমরা সাধারণ প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং দিব্য অধ্যাত্মজীবনে গড়িয়া উঠিতে পারি।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭।২৭

"ইচ্ছা দ্বেষ হইতে যে সকল দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তাহাদের মোহে সংসারের সকলেই ভ্রমে পতিত হয়।" সেই অজ্ঞান, সেই অহংকার সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না; কারণ উহা শুধু প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমূহকেই দেখিয়া থাকে এবং সর্বদা নিজের স্বতন্ত্র সত্তা এবং বাসনা ও বিরাগসমূহকে লইয়া ব্যস্ত থাকে। এই চক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমাদের কর্মে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে রাজসিক "আমি"র পাপ হইতে মুক্ত হওয়া, রিপুর জ্বালা হইতে, রাজসিক প্রকৃতির বাসনার উপদ্রব হইতে মুক্ত হওয়া, এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সাত্ত্বিক প্রেরণা ও সংযমের দ্বারাই ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং

পুণ্যকর্ম্মাণাম্—অথবা যখন উহা সম্পন্ন করা হইতেছে, কারণ, কতক দূর অগ্রসর হইবার পরই সাত্ত্বিক প্রকৃতির যতই বিকাশ হইবে ততই এক উচ্চ-স্তরের শান্তি. সমতা ও মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে—তখন প্রয়োজন হইবে দ্বন্দ্বসকলের উপরে উঠা এবং নির্ব্যক্তিক ভাব ও সমতা লাভ করা, অক্ষরের সহিত একাত্মভাব, সর্বভূতের সহিত একাত্মভাব লাভ করা। অধ্যাত্ম-ভাবের এরূপ বিকাশই আমাদের শুদ্ধিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যখন ইহা করা হইতেছে, জীব যখন আত্মজ্ঞানে বর্ধিত হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতে বর্ধিত হইতে হইবে। কারণ, জীবকে যে সমতার এক উদার ভাব লইয়া কর্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহে—ঈশ্বরার্থ যজ্ঞও করিতে হইবে। ঈশ্বর সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে এখনও সে সম্পূর্ণভাবে জানে না; কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে সে জানিতে পারিবে—সমগ্রম্ মাম্—যখন সর্বত্র এবং সর্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি সে লাভ করিবে। সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে—তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ—তখন উত্তমা ভক্তি, ভগবানের প্রতি সর্বতোমুখী ভক্তি হইবে জীবনের সমগ্র ও একমাত্র নীতি। কতব্যাকর্তব্যের অন্য সকল নীতি সেই আত্মসমর্পণের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে. তাহার সকল জীবন, জ্ঞান ও কর্ম উৎসর্গ করিবার সংকল্পে সে সুদৃঢ় হইবে; কারণ তখন সে সর্বনিয়ন্তা ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ, সমগ্র, ঐক্যসাধক জ্ঞানেই নিজের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনের ও কর্মের চরম ভিত্তি পাইবে—তে ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিবার পর আবার ভক্তির দিকে ফিরিয়া আসা অথবা হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া চলিতে দেওয়া, ইহা পশ্চাৎগমন বলিয়াই মনে হইতে পারে। কারণ, ভক্তিতে সকল সময়েই ব্যক্তিত্বের ভাব, এমন কি, ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রহিয়াছে। কারণ ভক্তির মূল প্রেরণা হইতেছে জগদীশ্বরের প্রতি ব্যষ্টিগত আত্মা বা জীবের প্রেম ও শ্রদ্ধা। কিন্তু গীতার দিক হইতে দেখিলে এইরূপ আপত্তি আদৌ উঠিতে পারে না; কারণ, নামরূপের অতীত অনন্ত নির্ব্যক্তিক সত্তার (the eternal impersonal) মধ্যে লয় হওয়া, নিষ্ক্রিয় হওয়া, গীতার লক্ষ্য নহে—আমাদের সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হওয়াই গীতার লক্ষ্য। সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজের নির্ব্যক্তিক ও অক্ষর আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া নীচের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু তখনও সে কর্ম করে, এবং প্রকৃতির ক্ষরলীলায় রত বহুধা-আত্মাই সকল কর্মের অধিপতি। নিরতিশয় নিষ্ক্রিয়তাকে সংশোধন করিবার জন্য আমরা যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞের আদর্শ না আনি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এই যে কর্ম চলিতে থাকে,

সেইটাকে দেখিতে হয় যেন আদৌ আমাদের নয়, সেটা যেন ত্রিগুণের খেলারই কিছু অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই, তাহা আমাদের যে-অহং, যে-আমিত্ব লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারই একটা রূপ, নীচের প্রকৃতির খেলারই জের। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, কারণ, আমাদের জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মার শান্ত নির্ব্যক্তিক ভাবের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির কর্মলীলা যোগ করিয়া দিয়া আমরা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বারা নীচের অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গড়িয়া উঠিতে পারি। তখন আর আমরা নীচের প্রকৃতির বদ্ধ অজ্ঞান "আমি" থাকি না; তখন দিব্য পরা প্রকৃতিতে মুক্ত জীব হই। তখন আর আমরা এই জ্ঞানের মধ্যে থাকি না যে, এক অক্ষর ও নির্ব্যক্তিক আত্মা এবং এই ক্ষর বহুধা প্রকৃতি, এই দুইটি পরস্পরবিরোধী সত্তা; কিন্তু আমাদের জীবনের এই দুইটি দিক দিয়া একসঙ্গে উঠিয়া পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনের মধ্যেই বাস করি। এই তিনই আধ্যাত্মিক সত্তা। তৃতীয় সত্তাটিই উচ্চতম; এবং যে দুইটিকে পরস্পরের বিরোধী দেখায়, তাহারা ঐ তৃতীয় সত্তারই দুইটি সাম্না-সাম্নি দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে বলিবেন *—

"আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি—নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত (personal) ক্ষর পুরুষ। কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ধরিয়া আছেন। তিনি ঈশ্বর অব্যয়। আমিই এই পুরুষোত্তম, আমি ক্ষরের উপর, এমন কি আমি অক্ষর অপেক্ষাও বড়, অক্ষরেরও উপরে। যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জ্ঞানের সহিত সর্বভাবে, তাহার প্রাকৃত জীবনের সকল দিক দিয়া আমাকে ভজনা করে।" এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত ভক্তি, গীতা এখন তাহাই পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিতেছে।

কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্যের নিকট জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই

*দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৬—১৯

চাহিয়াছে; এবং অন্যান্য প্রকারের ভক্তি আপন-আপন ভাবে ভাল হইলেও, গীতা বলিয়াছে যে, সে সব নিম্নস্তরের ভক্তি; সাধনমার্গে তাহারা কল্যাণকর হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার যে চরম সিদ্ধি গীতার লক্ষ্য, ঐ সব ভক্তি সে জিনিস নহে। যে-সকল ব্যক্তি রাজসিক আমিত্বের পাপ বর্জন করিয়াছে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গীতা চারি শ্রেণীর ভক্তকে পৃথক করিয়াছে।* কেহ সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয়ের জন্য তাঁহার দিকে যায়—আর্ত্ত। কেহ ঐহিক কল্যাণদাতা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করে—অর্থার্থী। কেহ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকটে আসে—জিজ্ঞাসু। আবার কেহ জ্ঞানের সহিত তাঁহাকে ভজনা করে—জ্ঞানী। গীতা সকলকেই প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কেবল শেষেরটিকেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছে। এই সকল চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগুলিই উদার ও কল্যাণকর—উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে—কিন্তু জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি তাহাই সর্ব-শ্রেষ্ঠ—বিশিষ্যতে। এই যে কয়েক প্রকারের ভক্তি ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বলিতে পারা যায়, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (আর্ত্ত), কর্মপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (অর্থার্থী), চিন্তাপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (জিজ্ঞাসু), এবং সর্বোচ্চ অন্ত-র্জ্ঞানময় সত্তার (the highest intuitive being) ভক্তি (জ্ঞানী)। এই সত্তাই প্রকৃতির অন্যান্য অংশকে লইয়া ভগবানের সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউক, কার্যত অন্যান্য প্রকারের ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতা নিজেই এখানে বলিয়াছেন যে, বহু জন্ম পরে সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন করিয়া তবে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কারণ, যাহা কিছু আছে সে সবই ভগবান, এই জ্ঞান লাভ করা অতিশয় কঠিন; এবং যিনি এইরূপ সমগ্র ভাবে ভগবানকে দেখিতে পারেন, এবং নিজের সমগ্র সত্তা লইয়া, প্রকৃতির সর্বভাব লইয়া ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন—সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব-ভাবেন—সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।*

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেবল ঐহিক লাভের জন্যই যে-ভক্তি ভগবানের উপাসনা করে, অথবা সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা এড়াইবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগবানকে পাইবার জন্যই ভগবানের উপাসনা করে না, সে ভক্তি কেমন করিয়া উদার ও মহৎ হইল—উদারাঃ? এইরূপ ভক্তিতে কি অহঙ্কার, দুর্বলতা ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা কি নীচের প্রকৃতিরই

*চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬
* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯

খেলা নহে ? আরো কথা এই যে, যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে সর্বতোভাবে জানিয়া—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না; কিন্তু, অসম্পূর্ণ নামরূপের ভিতর দিয়া ভগবানের কল্পনা করে, সেসব তাহার নিজেরই প্রয়োজন স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং সেই সব নামরূপের পূজা করিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি করিতে চায়। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্নিরূপে, বিষ্ণু বা শিবরূপে, খ্রীস্ট বা বুদ্ধরূপে কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি প্রাকৃত গুণরাশির সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করে—তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল; কেহ বা আবার ভাবে ভগবান অতি কঠোর ন্যায়পরায়ণ, বিচারপরায়ণ; কেহ ভগবানকে ক্রোধপরায়ণ, ভীষণ দণ্ডদাতা ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে; আবার কেহ এই সব লক্ষণ কোন রকমে মিলাইয়া মিশাইয়া ভগবানের কল্পনা করে, অন্তরে এবং বাহিরে সেই ভগবানের বেদী স্থাপন করে এবং তাঁহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া পার্থিব কল্যাণ ও সুখ প্রার্থনা করে অথবা শোক-দুঃখে সান্ত্বনা প্রার্থনা করে, অথবা নিজেদের ভ্রান্ত গোঁড়ামিপূর্ণ পরমত অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক জ্ঞানের সমর্থন প্রার্থনা করে। এই সবই কতক দূর পর্যন্ত খুবই সত্য। যাহা কিছু আছে সে-সবই সর্বব্যাপী বাসুদেব, এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অতি দুর্লভ—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। বিবিধ বাহ্য বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্য-সকল বিপথগামী হয়। ঐ সকল বাসনা তাহাদের ভিতরের জ্ঞান-ক্রিয়াকে হরণ করিয়া লয়—কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ। অজ্ঞান তাহারা, অপর দেবতার আরাধনা করে, তাহারা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপের পূজা করে যাহা তাহাদের বাসনার অনুরূপ হয়—প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তাহারা নিজেরা ক্ষুদ্র, তাই এমন সব সংকীর্ণ নিয়ম বা মতবাদ স্থাপন করে, যাহা হইতে তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় সিদ্ধ হয়—তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। এবং এই সবেতেই তাহাদের নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণার দ্বারাই বাধ্য হয়—তাহারা নিজেদের প্রকৃতিরই এই সংকীর্ণ প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলে এবং সেটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে—অনন্তকে তাহার বিশালতার সহিত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাহাদের শ্রদ্ধা যদি পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের ভিতর দিয়াই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সব ফল ও ভোগ ক্ষণস্থায়ী। যাদের মন ক্ষুদ্র, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয় নাই, কেবল তাহারাই এই সকলের অনুসরণকে ধর্মের ও জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয়, তা কেবল দেবতাদের নিকট পর্যন্তই পৌঁছান; ক্ষর প্রকৃতির লীলার মধ্যে ভগবান যে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফল প্রদান

করিতেছেন, তাহারা ভগবানকে কেবল প্রকৃতির সেই সব নামরূপের মধ্যে লাভ করে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির অতীত ভগবানকে সমগ্র সত্তার উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায়, এবং এই সবেরই রূপান্তর সাধন করে—দেবতাগণকে তাহাদের উচ্চতম স্তরে, প্রকৃতিকে তাহার উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করে; এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একেবারে ভগবানের নিকটেই পৌঁছায়, বিশ্বাতীত পরম বস্তুকে লাভ করে—দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্‌ভক্তা যান্তি মামপি।

তথাপি পরমেশ্বর ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেন না; কারণ ভগবানের এই সকল আংশিক প্রকাশের অতীত যে অজ, অব্যয়, শ্রেষ্ঠ ভাব, কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। মায়ার বিরাট আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।* তিনি যে জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও অগোচর, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত নহেন, ইহা তাঁহারই যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে বদ্ধ মানুষ মনে করে যে, প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের যে-সব প্রকাশ তাহাই ভগবানের সব; কিন্তু বস্তুত সে-সব কেবল তাঁহার ক্রিয়া, তাঁহার শক্তি, তাঁহাব অবগুণ্ঠন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই সমগ্রভাবে জানেন; কিন্তু তাঁহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে নাই।* তাহা হইলে ভগবান প্রকৃতিতে নিজের লীলার দ্বারা তাহাদিগকে এইভাবে বিমূঢ় করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানুষের পক্ষে, মায়ায় বদ্ধ কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাওয়ার কোনও আশাই থাকিবে না। অতএব, আপন-আপন প্রকৃতি অনুসারে যে যে-ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ করেন এবং ভগবদ্ প্রেম ও দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন। এই যে-সব বিভিন্ন দেবতার রূপ, বস্তুত ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের অপূর্ণ-বুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে; এই যে-সব বাসনার অনুসরণ প্রথমত ইহাদের ভিতর দিয়াই মানুষ ভগবানের দিকে মুখ ফিরায়; কোনও ভক্তি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে বৃথা বা নিরর্থক নহে। ইহার মধ্যে অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিসটি রহিয়াছে —শ্রদ্ধা (faith)। "যে-কোনও ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমার যে-কোনও

*নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫
*বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭।২৬

রূপের পূজা করে আমি তাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল করিয়া দিই।" † তাহার নিজের মতানুযায়ী পূজায় তাহার যে-বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনানুযায়ী ফল লাভ করে এবং সেই সময়ে যে-আধ্যাত্মিক সিদ্ধি-লাভের সে যোগ্য, সেই সিদ্ধি সে লাভ করে। তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে-চাহিতে শেষ পর্যন্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তাহার সমস্ত আনন্দের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে-করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের সন্ধান করিতে শিখিবে। ভগবানকে তাঁহার নামরূপ ও গুণের মধ্যে জানিতে-জানিতে অবশেষে সে জানিতে পারিবে যে, ভগবানই সব, তিনি বিশ্বের অতীত এবং তিনিই সকল বস্তুর মূল। *

এইভাবে আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা ভক্তি জ্ঞানের সহিত এক হয়। জীব ক্রমশ একমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ করে, সে জানে যে ভগবানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্তু, সকল জীব, সকল ঘটনা। সে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে জানে, আত্মাতে ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্রকৃতির অতীত তাহাও অবগত হয়। সে সর্বদা ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান করে—নিত্যযুক্তঃ। যে-বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, যে-বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাঁহার সহিত চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, সমগ্র সত্তা। তাঁহার উপরেই তাহার সকল ভক্তি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়—কোনও অংশদেবতা, বিধি বা মতবাদের উপরে নহে। এই ঐকান্তিক ভক্তিই হয় তাহার জীবনের সমগ্র নীতি। সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও বিশ্বাসের উপরে চলিয়া যায়; সকল নৈতিক বিধি-নিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত সকল বাসনা-কামনার উপরে চলিয়া যায়। তখন আর তাহার কোনও শোক দুঃখ থাকে না যে উপশম করিতে হইবে; কারণ, সে সকল আনন্দের আধারকে লাভ করিয়াছে। কোনও বাসনার তৃপ্তির জন্য তখন তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের উপরে, তাঁহাকেই সে লাভ করিয়াছে; যিনি সকল সিদ্ধি প্রদান করেন,

† যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭।২১
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭।২২

* নীচের তিন প্রকারের যে ভক্তি, সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও তাহাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু তখন তাহারা রূপান্তরিত, তখন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ভাব আর থাকে না। দুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, এই প্রাকৃত জগতে সর্বোত্তম কল্যাণ, শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হউক, পূর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনার বেগ তখনও হৃদয়ে থাকিতে পারে।

সে সেই সর্বশক্তিমানের সামীপ্য লাভ করিয়াছে। তাহার কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা অবশিষ্ট থাকে না, কারণ যে-দিব্য জ্যোতির মধ্যে সে বাস করে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণপ্রেম এবং সে ভগবানের প্রিয়; কারণ, সে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও তাহাতে সেইরূপই আনন্দ পান।*

জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের ভজনা করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই তাহার স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাঁহার আত্মা—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্তা ও লীলাকে আশ্রয় করে, তাঁহারাই সহিত সে যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রকৃতিতে দিব্যজন্ম, জীবনে সে পূর্ণবিকশিত, ইচ্ছাশক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ। তাহাতেই জীবের বিশ্বলীলা সার্থক হইয়াছে; কারণ, সে নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে লাভ করিয়াছে।

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

তৃতীয় অধ্যায়

পরম পুরুষ

সপ্তম অধ্যায়ে এপর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আমাদের সাধনার নূতন প্রতিষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার সন্ধানও মিলিয়াছে। সংক্ষেপত উহা এই, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে না; কিন্তু এখন আমরা মূলত বস্তুত যাহা কিছু, সে-সবেরই একটা উচ্চতর, একটা অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। কেবল আমাদের মর্ত্যের অপরিপূর্ণতা ছাড়াইয়া দিব্য-জীবনেব পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। এরূপ হওয়া যে সম্ভব তাহার কারণ, প্রথমত, মানুষের মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মা, রহিয়াছে উহা মূল সনাতন সত্তায় এবং মূল শক্তিতে পরমাত্মা ও ভগবানেরই স্ফুলিঙ্গ, এখানে উহা ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, তাঁহারই সত্তার সত্তা, তাঁহারই চৈতন্যের চৈতন্য, তাঁহারই প্রকৃতির প্রকৃতি, কিন্তু এই দেহ-মনের অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের প্রকৃত সত্তা ও সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। দ্বিতীয়ত, জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে দুই প্রকৃতিকে ধরিয়া। মূল প্রকৃতিতে উহা উহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নীচের প্রকৃতিতে উহা অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে বর্জন করিতে হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে সচল ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, এক নূতন জীবনের দ্বার উন্মোচন করিয়া, এক নূতন শক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং আমরা যে-ভগবান হইতে এই মর্ত্য রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি পুনরায় তাঁহারই অংশ হই।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনকে অস্বীকার করিবার ভাব, 'নেতি নেতি'র ভাব কম; স্বীকার করার ভাবই বেশী। প্রকৃতির আত্মবিনাশের (a self-annulment of Nature) উপরেই ছিল সেই যুগের একান্ত ঝোঁক; তাহার পরিবর্তে আমরা এক পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্তীকালে যে-সব ভক্তিমূলক ধর্মের বিকাশ হয়, তাহাদেরও অন্তত একটা

পূর্বাভাস এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে যে-সত্য রহিয়াছে, আমরা যে-অহংভাবের মধ্যে বাস করি তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত যে-সত্য, সে-সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও ঐক্যের মধ্যে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি—তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সংকীর্ণ প্রেরণাকে বর্জন করি। কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমেয় পুরুষ; আমরা যাহা কিছু সবই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমরা, সবই তাঁহার। আত্মায় যখন আমরা তাঁহার সহিত এক হই তখন আমরা লয়প্রাপ্ত হই না; বরং এই অনন্তের মহত্ত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই মধ্যে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয় একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বারা—তাঁহার ও আমাদের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান লাভ করা (an integral self-finding); যাঁহার মধ্যে সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মস্বরূপে গড়িয়া উঠা (an integral self-becoming); এবং এই সর্বময়, সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রতি প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তির ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করা (an integral self-giving), আমাদের সকল কর্মের প্রভু, আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র চেতন সত্তার আধার এই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তৃতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম-সিদ্ধিপ্রদ প্রক্রিয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাঁহাকেই আমাদের সব সমর্পণ করি। আমাদের অবিরত আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাদের সকল জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানে পরিণত হয়, আমাদের সকল কর্ম তাঁহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্মসমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাঁহার স্বরূপের গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই যে ত্রিধা সাধনা, উত্তম রহস্যের দ্বার খুলিবার ত্রিধা শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের দ্বারাই তাহা পূর্ণতম সিদ্ধি লাভ করে।

আমাদের আত্মসমর্পণ কার্যকরী হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্বপ্রথমেই এই পুরুষকে জানিতে হইবে তাঁহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল তত্ত্বে, তত্ত্বতঃ, সনাতন মূল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্যে। কিন্তু প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানের, মূল্য কেবল এই ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমরা মরজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক পরম জীবনের অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি।

কিন্তু এই মুক্তিও উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনার পরিণামে লাভ করা যায়, গীতা এখানে তাহাই দেখাইতেছে। গীতার কথার মর্ম এই যে, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করে—মামাশ্রিত্য, তাহাদের দিব্য জ্যোতি, তাহাদের মুক্তিদাতা, তাহাদের আত্মার গ্রহীতা ও আশ্রয়দাতা বলিয়া ভজনা করে—যাহারা জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য আধ্যাত্মসাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা "সেই ব্রহ্মকে" জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্মকে জানিতে পারে। * আর যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেই জন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে এবং সেই মুহূর্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখে। † সেই জন্যই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে আর বন্ধ না থাকায় উহারা উচ্চতম দিব্য পদ ঠিক তাহাদেরই ন্যায় লাভ করে যাহারা নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রহ্মে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

এখানে আমরা কয়েকটি কথা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যেই ভগবানের জগৎ-লীলায় আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান-প্রধান মূল সত্যগুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিসূত্র ও কার্য-প্রণালীর সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জীবাত্মাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে, "সেই ব্রহ্ম"—তদ্‌ব্রহ্ম; পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ—অধ্যাত্ম; তাহার পর, অধিভূত এবং অধিদৈব যথাক্রমে বহির্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার; শেষে, অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা ফলত এই—"আমি পুরুষোত্তম (মাং বিদুঃ), আমি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য দিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের সহায়তাতেই আমাকে সন্ধান করিতে হইবে. জানিতে হইবে—মানুষের চেতনা যে-আমাকে ফিরিয়া পাইবার পথ খুঁজিতেছে, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পূর্ণ সাধনা।" কিন্তু কেবল এই শব্দগুলি হইতেই ইহাদের অর্থ প্রথমে স্পষ্ট বুঝা যায় না, অন্তত ইহাদের নানারূপ অর্থ করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দের দ্বারা

* জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্‌॥ ৭।২৯

† সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৭।৩০

ঠিক কি বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; এবং আদর্শ শিষ্য অর্জুনও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন তাহাদের সত্যটি ধরিতে পারা যায়, এবং সাধক নিজেই অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতে পারে। প্রাতিভাসিক (the phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তাকে বুঝাইতে উপনিষদ্ একাধিকবার "তদ্ ব্রহ্ম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্তনীয় আনন্ত্যের উপরে বাকী সব —যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত—অক্ষরম্ পরম্। * পরা প্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম—স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। গীতা বলিয়াছে, সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম বলা হয়—বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ। ঐ প্রথম মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্মই বস্তুত সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে—অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ, প্রকৃতিতে যে-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন—প্রকৃতিস্থ আত্মা—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষরভাব কর্ম প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্মের ও যজ্ঞের অধিপতি—অধিযজ্ঞ—বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্তম—এখানে এই সব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি।" অতএব যাহা কিছু আছে—সর্ব্বমিদং—সবই এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া জ্ঞানের দ্বারা অন্তিমে যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে আরও এমন ব্যাখ্যা দিবে কর্মের জন্য এবং আভ্যন্তরীণ উপলব্ধির জন্য যাহা আবশ্যক। ততক্ষণ পর্যন্ত

* অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৮।৩
অভিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৮।৪

আমরা এই সকল শব্দ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্বে, এখানে এবং ইহার আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতটা বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, এখানে বিশ্ব-লীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমত রহিয়াছে ব্রহ্ম—ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তা; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে-খেলা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্বভূত বস্তুত ব্রহ্ম। কারণ, ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্তের বিভাগ এবং নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষর ব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সংকল্প করে না। ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া আছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহা হইলে উৎপাদন করে কে, সংকল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে? কর্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্যত বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরাৎপর, ভগবান, পুরুষোত্তম রহিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ—তাহাই পরা প্রকৃতি। ভগবান তাঁহার সত্তায় যাহা কিছু আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা ঐ পরা প্রকৃতিতে আত্মসম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্যত প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসার মধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিকৃতি, বিপর্যয়ের ভিতরেও দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যাহা নিহিত আছে সে সব বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিসৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহা লইয়া পুরুষোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার করে। নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভুতের মূল প্রকৃতি ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে—নিজের নামরূপের সমস্ত পরিবর্তনের খেলা দেশ-কাল-নিমিত্তের পরিবর্তনের খেলা প্রকট করিতেছে।*

* দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে তাহাকেই আমরা নিমিত্ত (causality) বলি।

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অনবরত অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন—ইহাই কর্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্মী, সৃষ্টির দেবী। স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের—ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিসেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল। প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। হইাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়-বস্তু (the object of the soul's consciousness)। এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ—জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেয়ালকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ, ইহাই পরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্মলীলা। এই আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর পুরুষ, অপরিবর্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু ক্ষর-পুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্মের ক্রিয়া চলে। তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে—পরমং ধাম।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতি এবং কর্মের ক্রিয়ার বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ (Purusha in Prakriti) ইহাই তাহার সূত্র; তাহার মধ্যে আত্মা যাহা চিন্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্বদা তাহাই হয়। পূর্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা

করিয়াছে, সেই সবের দ্বারাই তাহার বর্তমান জন্ম নির্ধারিত হইয়াছে। আবার এই জন্মে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে যেরূপ থাকিবে, যাহা ভাবিবে, যাহা করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি "হওয়া" (becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও "হওয়া", মৃত্যু কোন ক্রমেই ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মা আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত্বা কলেবরম্)। অতএব তাহাব মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-রূপ "হওয়া"র উপর তাহার চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বেও সর্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। কারণ প্রকৃতি কর্মের দ্বারা জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তিসকলের বিকাশ করে। বস্তুত উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি পুরুষোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিসেব প্রয়োজন। দুইটি শর্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব হইতে পারিবে। পার্থিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে ঐ আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যুকালেও তাহার সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিক ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণপূর্বক তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়"।* ভগবানের মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাব)। এইখানেই কর্মের শেষ পরিণতি—কর্ম এখানে নিজের মধ্যে আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি, স্বভাব, ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার চৈতন্যের অন্যান্য প্রাতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়—তম্ তম্ ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রাতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার সেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার, আত্মার, সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে (মদ্ভাবম্)। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে সে তখন ভগবান হয়; কারণ, তাহার প্রাতিভাসিক প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বারা সে ভগবানের প্রকৃতির সহিতই মিলিত হয়।

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ জোর দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে

* অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮।৫

যদি আমরা চৈতন্যের আত্মসৃজনী শক্তি (self-creative power of the consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই শক্তির পরিচয় না লই। চিন্তা আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পূর্ণ ও ঐকান্তিক সংকল্পের সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তারও তাহাতে পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই সম্ভাবনা নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয় যখন আমরা সেই সকল উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি আমাদের সাধারণ মনস্তত্ত্বের ন্যায় বাহ্য জিনিসের অধীন নহে (এই সাধারণ মনস্তত্ত্ব বাহ্যপ্রকৃতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ)। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবদ্ধ করিয়া রাখি এবং সর্বদা যে দিকে উন্মুখ হইয়া থাকি, আমরা নিশ্চিতভাবে ক্রমশ তাহাই হইয়া উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, স্মৃতির কোন ভ্রংশতা হইলেই ঐ পরিবর্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা ইহার ক্রিয়ার কিছু অধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা ছিলাম আবার সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব—অন্তত যতক্ষণ না মূলত অনিবর্ত্য ভাবে আমরা আমাদের নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ এরূপ অধঃপতনের আশংকা আছে। যখন আমরা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতির উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্মৃতি আপনা হইতেই থাকে: কারণ তখন উহাই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বাভাবিক স্বরূপ। এই মরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে আমাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালীন অনুস্মরণ আমাদিগকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না। লৌকিক ধর্ম-সকল মুক্তিলাভের যে-সব সহজ পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্মযাজক আসিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীস্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু ("Christian death") হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—যম্ স্মরণ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্—দৈহিক জীবনেও প্রতি মুহূর্তে আত্মাকে অন্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে—সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ।* শ্রীগুরু বলিলেন

* যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

"অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাতে অর্পণ করিতে পার—ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি আমাতেই আসিবে। কারণ সর্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে-ভাবিতে লোক দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়"। †

এখানে আমরা এই পরমপুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীতা পরে ইঁহাকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে। তাঁহাব কালাতীত অনন্ততায় তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের মধ্যে আমরা তাঁহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা বিচিত্র রূপ ও ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোঽক্ষরঃ)। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ অনির্দেশ্য নহেন, অথবা তিনি কেবল এই জন্যই অনির্দেশ্য যে, মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্মতার ধারণা করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ভগবানের রূপ আমাদের চিন্তার অতীত—অণোরণীয়াংসম্ অচিন্ত্যরূপম্।* এই পরমপুরুষ পরমাত্মাই দ্রষ্টা, অতি পুরাতন। তাঁহার অনন্ত আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু এবং শাস্তা। তিনি তাঁহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন—কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্। বেদবিদ্‌গণ যে স্বয়ম্ভূ অক্ষরব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম। যতিগণ তপস্যার দ্বারা মানসিক বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়া ইঁহার মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন, ইঁহাকেই পাইবার জন্য তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করেন।† সেই অনন্ত সদ্বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম লক্ষ্য); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান—পরমম্ স্থানম্ আদ্যম।

† তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৮।৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

* কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯

† যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮।১১

যোগী অন্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পেঁাছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারের সহিত যোগ থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না, শেষ পর্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে); এবং প্রাণশক্তি ভ্রূমধ্যে, দিব্যদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত। * সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়; বুদ্ধি ওম্ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয়, (মামনুস্মরন্)। † ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা— বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ। তথাপি, ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে এমন কি যুদ্ধ ও কর্মের মধ্যেও, সর্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা—মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ)। * ভগবান বলিলেন, "যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মাই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়"। †

এইরূপ জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে অবস্থায় পেঁাছায় তাহা বিশ্বাতীত (supracosmic) অবস্থা। বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, সেখান হইতেও পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে জীব পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। †† অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই পাওয়া যাউক, অন্যতম পূর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের সম্মিলনের দ্বারা সর্বকর্মের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্বভূতের সুহৃদ স্বয়ম্ভূ ভগবানের

* প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮।১০
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ৮।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮।১৩
* অনন্যচেতাঃ সততঃ যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪
† মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮।১৫
†† আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। তাঁহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাঁহার উপাসনা করায় পুনর্জন্মে বা কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা হইতে (দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ করিতে জীবের যে আকাঙ্ক্ষা, জীব তাহা পূর্ণ করিতে পারে। জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার দিবস বলা হয়, জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী বলা হয়। কালের পরিমাণে উভয়েই সমান। ব্রহ্মার কর্ম চলে সহস্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও সহস্র নীরব যুগ। (১) দিবসাগমে ব্যক্ত বস্তু সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অব্যক্তের মধ্যে লীন হয়। (২) এইরূপে সর্বভূত অবশভাবে প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে; পুনঃ-পুনঃ তাহারা দিবসাগমে আবির্ভূত হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে। (৩) কিন্তু এই অব্যক্তই ভগবানের দিব্য আদ্য অবস্থা নহে; তাঁহার আর এক অবস্থা (ভাবোঽন্যঃ) আছে, বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থার উপরেও এক বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা এই ব্যক্ত বিশ্বের বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অপরিবর্তনীয়, সনাতন— সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। (৪) "তাঁহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাঁহাকেই লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাঁহাতে পৌঁছায় তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম"।* কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌঁছিয়াছে, সে বিশ্বের প্রকাশ ও প্রলয় চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ-চক্র সম্বন্ধে এই মত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ("অহোরাত্র-বিদ্"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি তাহার উপরেই উহা নির্ভর

(১) সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিংযুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ৮।১৭

(২) অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮।১৮

(৩) ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ৮।১৯

(৪) পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ৮।২০

* অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৮।২১

করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভিব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির-অনির্দেশ্য, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম; এবং উহাতে পেঁছিতে হইলে, জীবন-লীলায় আমরা যাহা হইয়াছি সেই সব বর্জন করাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত পন্থা। মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, জাগ্রত প্রাণশক্তি—এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার দিকে আমাদের সমগ্র আন্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ নহে। বিশেষত যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধশূন্য, অব্যবহার্য, তাহার প্রতি ভক্তি প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির-অব্যক্ত, তথাপি "সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন।" † অর্থাৎ এই পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু তিনি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, এই জগৎসমূহের শাস্তা, কবিম্ অনুশাসিতারম্, ধাতারম্। তাঁহাকেই এক এবং সব, বাসুদেবঃ সর্বমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিয়া, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্মে তাঁহার সহিত আমাদের সমগ্র চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরমা গতি, পূর্ণ সিদ্ধি, চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে।

তাহার পরই আরও রহস্যময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা। এইটি গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (mystics) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলেই বা তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা। * অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা কুহেলিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্ল-পক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন—এইগুলি পরস্পর বিপরীত। প্রথমগুলিতে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু দ্বিতীয়-গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে তাঁহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়। † এই দুইটিই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ। উপনিষদে এই

---

† পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২

* যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ৮।২৩

† অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮।২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ৮।২৫

দুইটিকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যে যোগী এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানেন, তাঁহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না।*এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক যে-কোন সত্য বা সঙ্কেতসূত্রই থাকুক† (এই বিশ্বাস প্রাচীন সাধকদের যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা সর্বত্র ভিতরের সহিত বাহিরের, আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া ও কতকটা ঐক্যও নির্ণয় করিতেন)—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীতা এখানে কথাটিকে কি ভাবে ঘুরাইয়া শেষ করিয়াছে, "অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত থাক",—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভাবার্জ্জুন।

ফলত মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক করা। এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব রকমে এক, যেন সর্বদা স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। এবং এইরূপে সমগ্র জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ সবকেই ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত করা। "আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর," ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অনুস্মরণ যেন অনিত্য সংসারের দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও হারাইয়া না যায়। এবং ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত ইহা কেবল তখনই সম্পূর্ণ-ভাবে সম্ভব হয় যদি অন্যান্য প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করা হয়। যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে, যেন কোন জিনিসকে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়া কখনও ভুল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, পরন্তু ঐ বাহ্য রূপের মধ্যে ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হয়, এবং আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া ঐ ভগবদিচ্ছা হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব করি—উহা ভগবদিচ্ছারই ক্রিয়া,

* শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৮।২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ৮।২৭

† যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনো-জগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা সত্য রহিয়াছে, যদিও তাহা সর্ব্বত্র খাটে না; যথা—অন্তরে আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের শক্তি-সমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকার শক্তি-গুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বর্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণভাবে সম্পাদন করা যায়। তখন আর ভগবানের অনুস্মরণ মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না; পরন্তু তখন উহাই হয় আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের চেতনার সার বস্তু। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, পুরুষোত্তমেব সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে —সে ঐক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই তাহা সাধিত হইয়া চলিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গুহ্যাদ গুহ্যতরং

যে সত্যটি এইভাবে ধীরে-ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে প্রতি পদে অখণ্ড জ্ঞানের এক-একটা নূতন দিক ব্যক্ত করিয়াছে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব ও কর্ম, তাহার মূল্য ও সার্থকতা এইবার আমরা বুঝিব। সেইহেতু ভগবান অর্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবার জন্য, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহার অবধান আকর্ষণ করিলেন। কারণ, তিনি অর্জুনের মনকে পূর্ণ-ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা তাহার জীবনের, কর্মের, লক্ষ্যের যিনি কর্তা ও ভর্তা, মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবে; মানুষের মধ্যে বা জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে; কারণ তাঁহা হইতেই সবের উৎপত্তি, তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সবার খেলা, তাঁহার ইচ্ছার দ্বারাই সব চলিতেছে, বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের মধ্যেই সবের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তিনিই সকলের মূল ও সারবস্তু ও চরম লক্ষ্য। অর্জুনকে জানিতে হইবে যে, সে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অন্তরস্থিত শক্তির দ্বারাই কাজ করিতেছে, তাহার কাজ কেবল ভাগবত কর্মের যন্ত্র মাত্র, তাহার অহঙ্কৃত চেতনা কেবল একটা আচ্ছাদন, তাহার মধ্যে ভগবানের যে অমর স্ফুলিঙ্গ ও অংশ রহিয়াছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

তাহার মনে এখনও যদি কোন সংশয় থাকে, এই বিশ্বরূপদর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজের জন্য শক্তিমান করিয়া তুলিবে যে-কাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, সেই কাজের জন্য সে অলঙ্ঘ্যভাবে নিয়োজিত, তাহার আর ফেরা চলে না—কারণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা ও আদর্শকে অমান্য করা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্বেই তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বিরাট বিশ্বলীলার মধ্যেও যে সে-কর্মের নির্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে অর্জুনের সম্মুখে দেখা দিবেন, অনন্ত কাল সেই দেহের

আত্মা, তিনি তাঁহার মহান ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে অর্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিবেন। অর্জুন তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইবে আত্মার মুক্তি-সাধন করিতে, এই বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে তাহার কর্ম সম্পাদন করিতে, এবং এই দুইটি—মুক্তি-সাধন ও কর্ম—একই সাধনা হইবে। অর্জুনের সম্মুখে আত্ম-জ্ঞানের উচ্চতর আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হইলেই চলিবে না; তাহাকে দেখিতে হইবে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যাহা তাহার বহির্মুখী মানবীয় দৃষ্টিকে আলোকিত করিবে, যেন সে কর্ম করিতে পারে সমগ্র সত্তার সম্মতির সহিত, তাহার প্রতি অঙ্গের পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত, তাহার মধ্যে যে-আত্মা তাহার জীবনের অধীশ্বর, আবার সেই আত্মাই বিশ্বের এবং সমগ্র বিশ্বজীবনের অধীশ্বর, সেই একই আত্মার প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত।

ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে-সব জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইহার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পূর্ণ আকার তাহার উন্মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে ধরা হইবে। ইহার পরে যাহা আসিবে সে-সবও খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ, সে-সব এই কাঠামোর অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্‌টির কি মর্ম তাহা বুঝাইয়া দিবে; কিন্তু যে-পুরুষ তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলত এখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা হইবে যেন না-দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভব না হয়। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইয়াছে, অজ্ঞান ও অহঙ্কৃত কর্মের গ্রন্থিতে তাহাকে যে অবশ্যম্ভাবী-ভাবে বাঁধা থাকিতেই হইবে তাহা নহে—এইরূপ কর্মেই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, শেষে উহা আর তাহার মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, উহাতে কোনও সমস্যারই পূর্ণ সমাধান নাই, সংসারের কর্মের মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিয়াছে তাহাতে তাহার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্মের জালে বদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন ও কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তির কোন পথই সে দেখিতে পায় নাই। তাহাকে দেখান হইয়াছে যে, কর্ম ও জীবন-যাত্রার দুইটি বিরোধী পথ আছে, একটি হইতেছে অহংয়ের অজ্ঞানে, অপরটি হইতেছে সত্তার স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। সে কর্ম করিতে পারে বাসনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা তাড়িত "অহং" রূপে, পাপ-পুণ্যের সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া, কর্মের ফল পরিণামের চিন্তায়, জয়-পরাজয়ের, শুভ ও অশুভের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বদ্ধ হইয়া, কর্ম অকর্ম বিকর্ম যে পরিবর্তনশীল বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত

করে সে-সকলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া। কিন্তু অজ্ঞানের কর্মেই সে অকাট্য ভাবে বন্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের কর্মও করিতে পারে। সংসারে সে কর্ম করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাসু রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে মুক্ত-আত্মা রূপে। এই মহান সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে-জ্ঞান ও আত্মদৃষ্টি কার্যত উহা সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানবজীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার পথ।

আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহা শান্ত, কর্মের অতীত, সম, এই বাহিরের কর্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, উৎপত্তিস্থল, অন্তর্যামী সাক্ষীরূপে উহাকে পর্যবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। উহা অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতির সমগ্র কর্মকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে, এ-সব কেবল প্রকৃতির কর্ম, তাহার নিজের কর্ম নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র, এবং ইহাদের সকল কর্মই প্রকৃতির তিন গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে ঐ সব হইতে মুক্ত। এই সব হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, সে জানে যে প্রকৃতি এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (the personal being) লইয়াই সমগ্র জগৎ নহে। কারণ জগতে অনবরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা বিষাদজনক নিখিল পরিবর্তনশীল দৃশ্য—কেবল ইহাই জগতের (existence) সবটুকু নহে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত স্বয়ম্ভূ সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্তনসকল তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, কাহাকেও বিচলিত করে না, নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম করে না, কাহারও কর্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, সে পুণ্যবানও নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান এবং অক্ষত। অহং-ভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয় উহা তাহাতে শোকান্বিত বা হর্ষান্বিত হয় না, উহা কাহারও মিত্রও নহে, কাহারও শত্রুও নহে, কিন্তু সকলের মধ্যে এক সম আত্মা। মানুষ এখন এই আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে, কারণ সে বহির্মুখী মনের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় না, অথবা শিখে নাই; নিজের কর্ম হইতে নিজেকে সে পৃথক করিয়া ধরে না, সরিয়া দাঁড়ায় না এবং ঐ কর্মকে প্রকৃতির কর্ম বলিয়া দেখে না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি। জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের লয় করাই মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সত্তা হওয়া, আর কেবল মন এবং অহং হইয়া না থাকা, ইহাই এই মুক্তি-বাণীর প্রথম কথা।

অর্জুনকে এই জন্য প্রথমেই বলা হইয়াছে তাহার কর্মের সমস্ত ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক সেই কর্তব্য শুধু নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্মীভাবে সম্পাদন করিতে—এই বিশ্বকর্মসমূহের যিনিই ঈশ্বর হউন তাঁহার হস্তে সমস্ত ফলাফল ছাড়িয়া দিতে। কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্তির জন্য প্রকৃতি আপনার পথে প্রবর্তিত হয় নাই। তাহার বাসনা, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশ্ব-প্রাণ জীবন-লীলা করিতেছে না; তাহার মানসিক মতামত, তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্য বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষ্য বা পার্থিব কর্মধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় না। এই সব অধিকারের দাবি কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে সমস্ত জিনিসকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর তাহার অহঙ্কারের দাবি ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণীত নহে কিন্তু নিখিল কর্ম ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের চেষ্টা ও যত্নের অংশটুকু যোগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে—সে যে কর্তা এই অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন, প্রাণই তার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম করিতেছে। প্রকৃতিই নিখিল কর্তা; তার কর্ম, প্রকৃতিরই কর্ম, ঠিক যেমন তার মধ্যে প্রকৃতির কর্মের ফল তার চেয়ে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান ফলসমষ্টির অংশ-মাত্র। অধ্যাত্মভাবে সে যদি এই দুইটি জিনিস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্মের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; কারণ ঐ বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবিতে এবং কর্তৃত্বাভিমানে। রিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তাহার আত্মা হইতে অদৃশ্য হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান, শান্ত, সকল লোক ও সকল জিনিসে সমভাবাপন্ন হইয়া অন্তরের মধ্যে বাস করিবে। কর্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্মলতা ও শান্তির উপর কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে আভ্যন্তরীণ সুখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ। ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের জের থাকিবে না; কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা—তাহার বাহ্য প্রকৃতিও নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে

অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সত্তার নির্ব্যক্তিক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্বাপিত হইবে; তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত একীভূত হইবে।

কিন্তু, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে—স্পষ্ট-ভাবে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন। এই দুইটি উপলব্ধির সামঞ্জস্য এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে জড়বাদী দার্শনিকও নিজের আত্মা এবং অধ্যাত্ম সত্তার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি সম্বন্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া এরূপ নিঃসঙ্গ হইতে পারে। ইহা চৈতন্যবাদী জ্ঞানী (the idealistic sage) ও মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক-সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকারী রূপগুলি অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও উদার, আরও জীবন্ত, আরও পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা। প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে যে পরম সত্তা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্তু, এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির কেবল গোড়াকার রহস্য, ইহা দিব্যরহস্যের সমগ্র সূত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্ম ও নিষ্ক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্মজীবনের বিরোধ থাকিয়া যায়। দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্মেরই ভিত্তি। আগে যেমন অহং-ভাবের বশে প্রকৃতির কার্যে যোগ দেওয়া হইত, তাহার পরিবর্তে দিব্য ভাবে প্রকৃতির কার্যে যোগ দিতে হইবে, দিব্য শান্তি দিব্য ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়া থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্মের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম বুঝিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্যের উপর এতক্ষণ তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। যে-সকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি, নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং ঐক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায় সেই সকল সত্যই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম শক্তি ও সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অন্য যে মহান প্রয়োজনীয় সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে। পুনঃপুনঃ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিস্ফুট করা হইতেছে।

অবতার, গুরু, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই

নিজের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাই প্রকৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র সত্যের বৃহত্তম চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাস্বরূপ পুনঃপুনঃ তুলিয়াছেন। সেই সুর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে মহত্তর, আত্মার নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সত্যের ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন যেন জাগ্রত দ্রষ্টা ও কর্মীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাঁহার একান্ত দাবি উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব-শরীরে রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর অস্তিত্ব, সকলে কর্ম করে, চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগূঢ় সত্য; আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও নিগূঢ় সত্য। এই যে 'আমি,' ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানব-সত্তাই হউক না কেন, তাহা এই 'আমি'র এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র, প্রকৃতি নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাত্মার ঈশ্বর, বিশ্বের সকল কর্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতি, একমাত্র শক্তি, একমাত্র সত্তা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই গুরু, সবিতা—সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্তা যাহাতে তুমি তোমার অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া পাইবে। অতএব সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ যেন এই ভাবে তুমি সর্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্বভূতকে এক অধ্যাত্ম আত্মা এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ; কারণ, সর্বভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পন্থা। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে অবগত হও; কারণ, এই ভাবেই তুমি পরম ব্রহ্ম ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আত্মা হও, যেন এই ভাবে তুমি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার—এই কালাতীত আত্মা আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা স্বচ্ছ আবরণ। ভগবান আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার চরম সত্য।"

অর্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার উচ্চতর সত্য নহেন, পরন্তু প্রকৃতির এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য—

একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। তাঁহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্বব্যাপী, প্রকৃতির কর্মসকল তাঁহা হইতেই আসিতেছে। তিনি সেই সকল কর্ম অপেক্ষা মহত্তর—প্রকৃতির কর্ম, মানুষের কর্ম এবং সকল কর্মের ফল সবই তাঁহার। অতএব তাহাকে যজ্ঞরূপে কর্ম করিতে হইবে; কারণ, সেইটিই হইতেছে তাহার কর্মের, সকল কর্মের প্রকৃত সত্য। প্রকৃতিই কর্মী, অহং কর্মী নহে; কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু—বিশ্বযজ্ঞের যুগযুগান্তরের একমাত্র ঈশ্বর। তাহার কর্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধ্যে ও জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যলীলায় ঐ সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকেই তাহার সকল কর্ম সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্য, অহংয়ের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনন্তের মধ্যে মুক্তি লাভের জন্য এই দুইটি প্রয়োজন—প্রথমে নিজের কালাতীত অক্ষর আত্মার জ্ঞান ও ইহার ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি রহিয়াছেন, সর্বভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরূপেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া সেই একের সহিত জীবন্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশকালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই। অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি এতদুভয় অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাঁহার ভজনা ও আরাধনাই এই ভক্তি। তখন সকল জ্ঞান হয় ভজনা ও আরাধনা; কিন্তু সকল কর্মও হয় ভজনা ও আরাধনা। এই ভজনাতেই প্রকৃতির কর্ম এবং আত্মার মুক্তি একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। চরম মুক্তি, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপরে অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া—ইহা আত্মার নির্বাণ নহে, কেবল তাহার অহং-রূপেরই নির্বাণ হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বসত্তার মধ্যে আর না থাকিয়া বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা—ইহা ধ্বংস নহে, সিদ্ধি।

অর্জুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন—নির্ব্যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রকৃতি

গুণসমূহের জড় শৃঙ্খল, আত্মা এই শৃঙ্খলের অধীন অহঙ্কৃত সত্তা। কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি হইবে কর্মে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্ত্বে আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিতে বন্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময় প্রাণময়, দেহময় আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে পারে না; কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, স্বপ্রতিষ্ঠ—তাহা হইবে মন, প্রাণ, দেহের ঊর্ধ্বে। এই সংশয় এবং তাহারা যে-অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সে-সব অপসৃত হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জ্বল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা। জড়প্রকৃতি কেবল একটা নীচের সত্য; নীচের প্রাতিভাসিক ক্রিয়াই জড়প্রকৃতি নামে অভিহিত। উপরের এক প্রকৃতি আছে, তাহা অধ্যাত্মপ্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের সত্য ব্যক্তিসত্তা। ভগবান একই সংগে নির্ব্যক্তিক (impersonal) আবার ব্যক্তিক (personal)। আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান হয যে, তাঁহার নির্ব্যক্তিক ভাব কালের অতীত অনন্ত সদ্স্বরূপ, চিদ্স্বরূপ, অস্তিত্বোপলব্ধির আনন্দস্বরূপ; তাঁহার ব্যক্তিক ভাব দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরূপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধা আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্দ্ররূপে। মূল অক্ষর সত্তায় আমরাও সেই একই নির্ব্যক্তিক; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে আমরা প্রত্যেকেই সেই মূল শক্তির বহুধা রূপ। কিন্তু এই যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য। দিব্য নির্ব্যক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহাই আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা। উহাই মহান অহম্—সোঽহম্, আমিই সেই—যাঁহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্তা ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয় এবং নির্ব্যক্তিকভাবে প্রতীয়মান এই যে জগৎ, ইহার মধ্যে বিচিত্ররূপে লীলা করে। যাহা-কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের কথা, কারণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্যের চারি স্তরে দেখিতেছেন। বাসুদেব শাশ্বত পুরুষই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ইহাই গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার ঊর্ধ্বের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি সজ্ঞানে সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের বাহ্যদৃশ্য লইয়া যে অপরা প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। শাশ্বতের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাঁহার শাশ্বত বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বহু কেন্দ্র হইতে তাঁহারই আত্মদর্শন। ভগবান, প্রকৃতি, জীব—এই তিন লইয়াই বিশ্বলীলা এবং এই তিনই এক সত্তা।

এই পুরুষ নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করেন? প্রথমত অক্ষর কালাতীত আত্মরূপে—তাহা সর্বব্যাপী, সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার শাশ্বততায় তাহা শুধুই সত্তা, তাহা ভূতগ্রাম নহে। তারপর, সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম ধারা—স্বভাব। তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই সত্তা সংকল্প করে, বিকাশ করে,—তাহার মধ্যে যাহা-কিছু অপ্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়া সৃষ্টি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহা-কিছু সংকল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ সেই সবকে বিশ্বকর্মরূপে বিসৃষ্ট করে। সকল সৃষ্টিই এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম। কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া উঠিতেছে অপরা প্রকৃতির মধ্যে—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের বাহ্য রূপের মধ্যে। তাহা পূর্ণ জ্যোতি হইতে বস্তুত বিচ্ছিন্ন, এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ। অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর রূপে অধিযজ্ঞ রূপে বিরাজিত। তাঁহার সান্নিধ্যে, তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা হয়, জগৎ-মাঝে ভগবানকে দর্শন করা হয় এবং অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কারণ, এই জ্ঞান যখন-যখন কার্যকরী হয়, মানুষ তাহার কর্ম এবং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ করে, তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপরা ক্ষর প্রকৃতির উপরে শাশ্বত ও ভাস্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগূঢ় সত্য, আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যকর্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল রহস্যের গুহ্যতম রহস্য।* ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান—সমগ্রম্ মাম্—অর্জুনকে যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু

*ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১।৯
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২।৯
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩।৯

বাকী থাকে না। যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে বিমূঢ় করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম করিতে তাহার ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ছেদিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম জ্যোতি। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইহার প্রমাণ পায়, নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়া দেখিতে পারে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম, জীবনের মূল নীতি। মানুষ যখন ইহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুসরণ করা সহজ হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। তর্কবুদ্ধি বাহ্য ব্যাপারের অনুগমন করে, অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত যাচাই করিয়া দেখিতে চায় কারণ তাহা দৃশ্য প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতাসমূহের সহিত মিলে না—মনে হয়, তাহা এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেছে—এমন কথা বলিতেছে, যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে অশুভ হইতে উপরে লইতে চায়। যে-জীব সেই উপরের সত্য ও ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে। যে ভাগবৎ সত্তাকে সে অস্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ এই যে সত্য, জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, ইহারই অনুসরণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে—আত্মার ক্রমবর্ধনশীল জ্যোতিতে অনুসরণ করিতে হইবে—মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে। মানুষকে এই সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে—এই সত্য হইতে হইবে—ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সত্তাকে অতিক্রম করিয়াই মানুষ প্রকৃত দিব্যসত্তা হইতে পারে এবং আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা-কিছু ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায়—সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহ্যিক সত্য। নীচের প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, "অশুভ" হইতে মুক্তিলাভ করা যায় কেবল এক ঊর্ধ্বের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া—সেখানে ঐ সকল বাহ্যিক অশুভ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, আমাদেরই অজ্ঞানের সৃষ্টি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই ভাবে দিব্য প্রকৃতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে আমাদের বর্তমান বদ্ধ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ কেবল এই

জন্যই হয় যে, আমরা স্বভাবত যাহা, সে সমুদয়ের ক্রিয়াকে এই সাধনায় সেই আভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা সমর্পণ করিয়া দিই। ভগবানই আমাদের মধ্যে দিব্যজন্মের বিকাশ করিয়া দেন ক্রমবর্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের সত্তাকে তাঁহারই সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইয়া এবং ইহাকে তাঁহারই জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া, জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, তিনি তাঁহার কল্যাণ হস্তের স্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে তাঁহারই নিজের জ্যোতি ও বিশালতায় রূপান্তরিত করিয়া লন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে বিশ্বাস করি এবং ভগবদ্‌প্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া অনুমিত হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত গুহ্য ভগবানের হস্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে সমর্পণ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

দিব্য সত্য ও পন্থা

গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্য, সেই এক তত্ত্ব ও সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,—সিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে যাহাতে বাস করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্মকে অনুসরণ করিয়াই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্য—তিনিই সব এবং সর্বত্র বিরাজিত, অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত্তর ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুর মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, কোন কিছুই বস্তুত তাঁহাকে প্রকট করিতে পারে না—দেশ ও কালের মধ্যে যে-সব বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে-সম্বন্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে-ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা তাঁহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া ভজনা এবং ইহার মূল অধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসারে আমাদের সমগ্র জীবনকে (শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তের দিকে একাগ্রভাবে প্রবাহিত করা। এক দিব্য যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমরা তাঁহার অনির্বচনীয় নিগূঢ় সত্তার মধ্য হইতে এই প্রাতিভাসিক জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি। সেই যোগেরই এক বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্তর চেতনাকে ফিরিয়া পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ভগবানের মধ্যে, শাশ্বতের মধ্যে বাস করিতে পারিব।

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয় না। তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না, মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না,—অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্তি।* আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ,—তাঁহার শাশ্বত রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্ব-

* ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪

চনীয় অনন্ত ভাগবত সত্তা,—অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন, সেই সত্তা সে-ধারণার বহু ঊর্ধ্বে। এই যে-সকল জিনিসের সমবায়কে আমরা বিশ্বজগৎ বলিয়া অভিহিত করি, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা আমরা নির্ধারণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাই না, দাঁড়াইয়া ধরিবার মত কোন স্থান, স্তর বা কেন্দ্র খুঁজিয়া পাইনা—সে-সব এই ঊর্ধ্বতন অনন্ত সত্তা কর্তৃক প্রকট হইয়াছে, নির্মিত হইয়াছে, এই অনির্বচনীয় বিশ্বাতীত রহস্যের উপরে সেসব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এক আত্ম-স্বরূপের উপরে এই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে অব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে সব সৃষ্টি অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে, চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিস, সব জীবন্ত মূর্তি—ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই · তাহাদের মধ্যে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবন ও কর্মের লীলা চলিতেছে না, ভগবান এই ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই জীবন ও কর্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্য উদ্ভূত; তাহারা তাঁহাব সম্ভূতি (becomings), তিনি তাঁহাদের মূল সত্তা (being), মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাঁহার সত্তার অচিন্ত্য দেশ-কালাতীত আনন্ত্যের মধ্যে ইহাকে এক ক্ষুদ্র ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন।

সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার এ বিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্র ভাবে বলা হয় না; কারণ, এরূপ বলিলে ভগবানের উপর দেশ-বাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত।* দেশ ও কাল, অনুস্যূতি (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion) ও অতিক্রান্তি (exceeding)—এ-সব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে—মে যোগঃ ঐশ্বরঃ—সেই যোগের দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অনন্ত আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম—জড়জগৎ সেই আত্মারূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান একীভূত হন। এই অনন্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (Pantheist মতানুসারে ভগবানের

* ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯।৫

সহিত বিশ্বকে যে এক বলা হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সংকীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি যাহা-কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তার বিস্তৃত অনন্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহা হইতেও অন্য। তাঁহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা আত্মচেতনার এক সৃষ্টি-রূপে ধরিয়া রহিয়াছে—আমরা বিশ্ব বা সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সে-সকলেরই উপরে। ইহাই ভগবানের সত্তার নিগূঢ় রহস্য যে, তিনি বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। কারণ এই সবের আত্মরূপে তিনি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এই ভাস্বর মুক্ত আত্মসত্তা—মম আত্মা—সর্বত্র বিরাজ করিতেছে, সর্বভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল আছেন বলিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবির্ভূত হইতেছে—ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। এই জন্যই আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) ও সম্ভূতি (becoming). স্বয়ম্ভূ আত্মা এবং ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগমায়ার (অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা এবং আধেয় সর্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমরা তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধের সন্ধান পাইতে পারি।

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই শ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরে। তাহারা সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অখণ্ডভাবে উঠিয়াছে। জগতে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক আমরা যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমরা পাই, এবং ভিন্ন-ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অস্পষ্ট উপলব্ধি পাই—তিনি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর—কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের চতুর্দিকে জগতের বাহ্যিক (phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ করি। কারণ

পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং যাহা কিছু বাহিরের প্রাতিভাসিক মনে হয় সে-সব স্ব-চেতন আত্মার আনন্ত্য হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, হয়ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়া। যতক্ষণ আমরা এই ভেদজ্ঞান লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত সেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এ সব তাঁহার সত্তার বাহিরে; কারণ সেই এক অনন্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমরা কেবল তাঁহার মধ্যেই বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি—তাঁহা হইতে আমরা যতই বিভিন্ন হই না কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা তাঁহারই উপরে নির্ভর করি—এবং এই বিশ্বজগৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও লীলা।

কিন্তু আবার ইহা ছাড়াও আরও উপরের অনুভূতি আমরা পাই যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তাঁহার আত্মসত্তার সহিত এক। সর্বভূতের এক আত্মা আমরা উপলব্ধি করি এবং সে সম্বন্ধে আমরা চেতনা ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না বা ভাবিতে পারি না যে, আমরা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বুঝি যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্মা (Self) এবং বহিঃপ্রকাশ (phenomenon); আত্মাতে সকলেই এক কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই বিভিন্ন। কেবলমাত্র আত্মার সহিত একান্ত আবেগে যোগ সাধনা করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, বহিঃপ্রকাশটা কেবল একটা স্বপ্নবৎ, অসত্য। কিন্তু আবার দুই দিকেই সমান আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, আত্মসত্তায় তাঁহার সহিত এক পরম ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারি, অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহার সত্তা হইতেই উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে আমাদের অস্তিত্ব এ-সবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন সত্তার এক নিত্য ও সত্য রূপ। এই অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই তাঁহার সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ—অনন্তের অন্য সমস্ত চেতন বা অচেতন শক্তির সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহার যে বিশ্ব-আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহারা আত্মার চেতনার একটা শক্তির নীচের সৃষ্টি, এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহারা সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ

এ-সকলকে আংশিক বা সর্ব্ব ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন। অথচ এ-সকল তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তাঁহারই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। কারণ আত্মা সর্বত্র যাহা দেখিতেছে সে-সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে। আর ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে, এই সকল সম্বন্ধের অনুরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নাই; আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্য-শক্তির দ্বারা তাহারা সৃষ্ট অথচ সেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তার এই সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ।

আবার অন্য এক দিকে যদি আমরা আত্মা ও আত্মার রূপসমূহ এতদুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে যে, আত্মা সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে—সকলের মধ্যে অনুস্যূত। আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্মার রূপসমূহ, যে-সব আকারের মধ্যে আত্মা বিরাজমান, সে-সব যে আমাদের কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য ছায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমরা উপলব্ধি করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে আমাদের এই অনুভূতি হইতেছে যে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, এই অনুভূতিটি আগেকার অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পারে, অথবা মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে যে, বিশ্বজগৎ তাঁহার ও আমাদের চৈতন্যের কেবল একটা বাহ্য রূপ, অথবা একটা প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাঁহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশ তাঁহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি। কিন্তু আবার অন্যদিকে আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয় যাহাতে আমরা সব জিনিসকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই বাধ্য—এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে যাহা-কিছু হইয়াছে সে সবই তিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক দিব্য সত্য বস্তু যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। যদি কেবল এই অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে আমরা সর্বেশ্বর-বাদীদের (pantheistic) ঐক্য পাই—সেই একই সব। কিন্তু, সর্বেশ্বর-বাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি। এই যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর এক অনন্ত আছে যাহার দ্বারা

ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ব ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একটা আত্মাভিব্যক্তি, তাঁহার সত্তার একটা সত্য কিন্তু নীচের খেলা। এই সব অধ্যাত্ম উপলব্ধি—প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ দেখা যাউক, তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন একটিরই উপরে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জিনিস সেই ভাগবত সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে—সকলেই তাঁহার প্রকাশক বলিতে পারা যায়, তাহাদের কোন অংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সে-সব তাঁহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহারা ভাগবত সত্তারই উপাদানে নির্মিত না হইয়া অন্য কিছু হইত। সেইটিই সত্য বস্তু; কিন্তু তাহারা তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু।*

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যের দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; যাহা-কিছু এই বিশ্বজগৎ, যাহা-কিছু এই বিশ্বজগতে রহিয়াছে এবং যাহা-কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান। গীতা প্রথমে তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। নতুবা মানুষের মন তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই চাহিয়া থাকিবে, অথবা বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে। পরে গীতা তাঁহার বিশ্বসত্তার উপরে জোর দিয়াছে, যাঁহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম করিতেছে। কারণ, ঐটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, ঐটিই ভগবানের বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ রূপে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী কর্ম করিতেছেন। তাহার পর গীতা বেশ জোর দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবদেহের মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্যামী পুরুষকে স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকতা থাকিবে না এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন-বিকাশের প্রেরণার শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সমাজের মধ্যে জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকিয়া যাইবে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, অহংকৃত।

* যদিও আমাদের মনের অনুভূতিতে চরম সত্যের পার্শ্বে এইগুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পারে। শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়া, উহার মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি রহিয়াছে তাহা ধরিলে দেখা যায় যে, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতার অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না, কারণ সেখানে ঐ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় বা যোগপন্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর অনুভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনন্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

অবশেষে, গীতা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহা-কিছু আছে সে-সব এক ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্য হইতে উদ্ভূত। কারণ, এই দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মূলত প্রয়োজনীয়; এই ভিত্তির উপরেই মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্ অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কার্য স্বীকার করে, তাহার নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্মের স্বরূপে রূপান্তরিত করিবার সম্ভাবনা স্বীকার করে—সে-কর্মের প্রেরণা আসে উপর হইতে, সে-কর্মের দ্বারা বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে-কর্ম ব্যক্তির বা জীবের মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়।

তাহা হইলে পরাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্যের পশ্চাতে অক্ষর পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাবগত সত্তা, বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাহার সকল কর্ম জীবের মধ্যে গোপনভাবে সচেতন অথবা আংশিকভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা—এ সকলই এক সত্য বস্তু, এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে যে-সকল সত্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার অন্য ভাব সম্বন্ধে সে সত্যগুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সেগুলি উল্টাইয়া যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চারিটি ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ করিতে পারি না। বিশ্ব-প্রকৃতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তারূপে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের সহিত কার্য করেন। বলিতে পারা যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্রকৃতি, কিন্তু সেই প্রকৃতির কার্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্মচেতনা যাহা পূর্ব হইতে সব দেখিতে পায়, পূর্ব হইতে সব সংকল্প করে, ইচ্ছা করে, সব বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কর্ম ও শেষ পর্যন্ত কর্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শান্ত দ্রষ্টারূপে তিনি অকর্তা, কবেল প্রকৃতিই কর্তা। তিনি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কর্ম করিতে ছাড়িয়া দেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ততে, তথাপি এখানেও তিনি ঈশ্বর—প্রভু, বিভু, কারণ তিনি আমাদের কর্ম দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাঁহার নীরব অনুমতির দ্বারা প্রকৃতিকে কার্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা তিনি পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাঁহার সর্বব্যাপী নিশ্চল অবস্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং দ্রষ্টা পুরুষের সমভাবের দ্বারা সকল বস্তুতে উহার ক্রিয়াকে সমর্থন করেন। পরাৎপর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের মূল সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করেন: কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন না; অথবা তাঁহার প্রকৃতির কর্মে নিজেকে আসক্ত করেন না। প্রকৃতির কর্মে যে

অলঙ্ঘ্য নিয়মানুবর্তিতা, তাহার পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাঁহারই মুক্ত সত্তার ইচ্ছাশক্তি। ব্যষ্টিগত সত্তায় অজ্ঞানের সময় তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবান, সকলকে অবশভাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং একটা বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী ও অকর্তা হইতে পারি। অথবা আমরা আমাদের ব্যষ্টি-সত্তায় আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানবাত্মার যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় সেই অন্তর্যামী পুরুষের পরম মুক্ত আসক্তিহীন প্রভুত্বের ভাগী হইতে পারি। এইটিই আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে; কোন্ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ করা হইতেছে সেই অনুসারে একই সত্যের যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই সেখানে আমরা তাহা দেখিতে পাইব অথবা অর্জুনের ন্যায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তাই গীতা এই বলিয়া আরম্ভ করিল যে, ভগবান নিজের মধ্যে সবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু, তিনি নিজে কাহারও মধ্যে নহেন—মৎস্থানি সর্ব্ব-ভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতং। আবার তখনই বলিলেন, "অথচ সর্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার আত্মা সর্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহে।" আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন —মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্। বলিয়াছে যে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে-সব কথার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুত এরূপ কোন বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাই সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে। কারণ, আমরা যে সত্তা (Being) ও সম্ভূতির (Becoming) মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল রূপাত্মক জগতেই প্রযোজ্য। বিশ্বাতীত স্তরে সমস্তই শাশ্বত সত্তা, এবং যদি সেখানেও বহুত্ব থাকে তবে সকলেই শাশ্বত সত্তা। এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ বিশ্বাতীত যে-পরম বস্তু তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন

নহে, ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশকালের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে অধ্যাত্ম সহবর্তিতা, co-existence (তাহা দেশ ও কালের অনুযায়ী সহবির্তিতা নহে), অধ্যাত্ম ঐক্য ও সমানুপাতই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, ব্যক্ত জগতে, পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত পুরুষ কর্তৃক বিশ্ব দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মারূপে আবির্ভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন—ভূতভৃৎ, তাঁহার সর্বব্যাপী আত্মসত্তায় সর্ব-ভূতকে বহন করেন। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি এবং সর্বভূতের আবির্ভাবের গুপ্ত অধ্যাত্ম কারণ। আমাদের মধ্যে গুপ্ত আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কর্ম, গতিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেই-ভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি হয় যে, তিনি মন, প্রাণ, দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার সত্তার দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপ্তি ইহা চৈতন্যের একটা ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্তি নহে; এই জড় শরীরও আত্মার চৈতন্যের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দিব্য আত্মা সর্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার মধ্যে অবস্থিত, মূলত জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্মভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাহারই মধ্যে সকলে অবস্থিত। ঐ অধ্যাত্ম বিস্তৃতিকে আমাদের জড়ানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যেভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। বস্তুত এখানেও সবই অধ্যাত্ম সহবর্তিতায়, ঐক্যে ও সমানুপাতে রহিয়াছে; কিন্তু ইহা মূল সত্য,—যতক্ষণ না আমরা সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা কেবল আমাদের মনের একটা ধারণা মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু বাস্তব উপলব্ধিতে ইহার অনুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। অতএব এইসব দেশ-কাল-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমাদিগকে বলিতে হয় যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিস আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। তাই গুরু এখানে অর্জুনকে বলিলেন, "যেমন মহান সর্বত্রগামী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে হইবে।" * বিশ্বসত্তা সর্ব-ব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্বব্যাপী গতি—সর্ব্বত্রগঃ। আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বসত্তা সর্বভূতরূপে নিজেকে

* যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্‌।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯।৬

প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্বভূতেরই সমষ্টি। একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্বমূল সর্বাধার অক্ষর আত্মায় সত্তায় চলিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম করিতেছে। আত্মা এই সকল সৃষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ তাহাদের কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,—ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্যন্ত আকাশ হইতেই উৎপন্ন। সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্বত্রগ বায়ুর মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা ঐ বায়ুর রূপ ও শক্তি-সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় না। তথাপি ঐ গতির মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন; তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই দুই প্রকার সম্বন্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ; অপরটি অনুস্যূতি, বিশ্বসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে সত্তার, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, অপর সত্যটি হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই আত্মগোপন ও আত্ম-প্রকাশ-লীলাকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছে।

পরাৎপর ভগবান বিশ্বসত্তার ঊর্ধ্ব হইতে নিজের প্রকৃতির উপর চাপ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা-কিছু আছে, যাহা-কিছু এককালে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে-সবকে এক অনন্ত আবর্তনে পুনঃ-পুনঃ সৃষ্টি করেন।* বিশ্বমাঝে সকল সৃষ্ট বস্তু এই সৃষ্টিক্রিয়ার দ্বারা অবশ হইয়া চালিত হয়—জগতের যে-সব নিয়ম সর্বভূতরূপে প্রকট ভাগবত সত্তার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে—সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির ক্রিয়াতেই জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অনুসরণ করে—প্রকৃতিম্ মামিকাম্, স্বাম্ প্রকৃতিম্। প্রকৃতির বিকাশের নিয়মানুসারে জীব কখনও এক রূপ, কখনও অন্য রূপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম, জীব সকল সময়েই সেই স্বধর্মের রেখা অনুসরণ করিয়া চলে, প্রকৃতির ঊর্ধ্বতন সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অন্তে জীব প্রকৃতির কর্মলীলা হইতে তাহার অচলতা ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া যায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, নিজে নিজের প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিত—অবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

* প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

কেবল দিব্য-চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই জীব ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও ঐ কল্প-চক্রের অনুসরণ করেন, কিন্তু উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরিচালক আত্মা রূপে, তাঁহার সমগ্র সত্তা উহাতে নিয়োজিত হয় না, কিন্তু তাঁহার সত্তার শক্তির দ্বারা তিনি উহাকে অনুসরণ করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার যে-কর্ম চলিতেছে সে-কর্মের তিনিই অধ্যক্ষ, তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম সৃষ্টিকর্তা রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।† তাঁহার শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সকল কর্মের প্রবর্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবার প্রকৃতির বাহিরেও বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক সত্তায় অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাঁহার কর্মসকলের দ্বারা বদ্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় এবং সেসকলের পূর্ববর্তী, কালের চক্রে যে-সব কর্ম-পরম্পরা চলিতেছে, তাহাদের পূর্বে, তাহাদের সমকালে এবং তাহাদের পরেও তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তার কোনও পরিবর্তন হয় না। যে নীরব অধ্যাত্ম সত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহা বিশ্বের কোন পরিবর্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ যদিও উহা ধরিয়া রাহিয়াছে, তথাপি উহা ঐ পরিবর্তনের লীলায় যোগদান করে না। এই মহত্তম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে-সকলের দ্বারা বিচলিত হয় না, কারণ, ইহা তাহাদের অতীত, চিরকাল তাহাদের উপরে রহিয়াছে।

কিন্তু আবার যেহেতু এই কর্ম দিব্য-প্রকৃতির কর্ম—স্বাম্ প্রকৃতিম্, এবং দিব্য-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই সৃষ্টি করুক না কেন তাহার মধ্যে নিশ্চয় ভগবান অনুস্যূত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবার এই সত্যকে আমরা আদৌ অবহেলাও করিতে পারি না। তিনি মানবদেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।† যাহারা এখানে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না,

† ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

* ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥৯।৯

† অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯।১৩

মানব-দেহের মধ্যে ভাগবত সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গুপ্ত রহিয়াছেন, অবতারে তিনি সজ্ঞানে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারণ মানুষে তিনি তাঁহার মায়ার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাঁহার মাহাত্মা, যাঁহারা অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাঁহারা অন্তর্যামী ভগবানের দিকে নিজেদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারেন তাঁহারা জানেন যে, মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্বচনীয় জ্যোতি যাহাকে আমরা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করি। যেখানে তিনি সর্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর, ভগবানের সেই পরম পদ তাঁহারা জানেন; অথচ তাঁহারা দেখিতে পান যে, প্রত্যেক ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎপর দেবতা এবং অন্তর্যামী ভগবান। বাকী যাহা-কিছু সে-সবই বিশ্বমাঝে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে নিজেকে খণ্ডিত করেন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে, তাঁহারই প্রকৃতি বিশ্বে যাহা-কিছু আছে সব হইয়াছে, সুতরাং ইহসংসারে প্রত্যেক বস্তুই মূলত ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং তাঁহারা যে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাতীত পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করেন শুধু তাহাই নহে, কিন্তু ইহসংসারে, তাহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সত্তায় তাঁহাকে পূজা করেন।* তাঁহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জীবনযাপন করেন, কর্ম করেন; তাঁহাকেই তাঁহারা উপাসনা করেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল বস্তুর ঊর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার বিশ্বমাঝে অবস্থিত ভগবান রূপে, এই দুই রূপেই তাঁহার পূজা করেন, কর্মযজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে সন্ধান করেন, সর্বত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং তাঁহাদের আত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাঁহারা উদার ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানেন; কারণ এইটিই পরাৎপর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা।

* জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯।১৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯।৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান

ইহাই তাহা হইলে সমগ্র সত্য, সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত জ্ঞান। ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরব্রহ্ম—তাঁহার নিজেরই সত্তা ও প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, সে-সবকে তিনি তাঁহার দেশ ও কালের অতীত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, বিশ্বের সকল নামরূপ ও গতিধারার আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি পুরুষোত্তম; সকল আত্মা ও প্রকৃতি, এই বিশ্বের বা অন্য সকল বিশ্বের সকল সত্তা ও সম্ভূতি তাঁহারই আত্মরূপায়ণ ও আত্মশক্তি-প্রকাশ। তিনি পরমেশ্বর, সকল বিশ্বের অনির্বচনীয় প্রভু, তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্ত শক্তিকে অধ্যাত্ম-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎচক্র প্রবর্তিত করিতেছেন, এবং জগতে সর্বভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই জীব এখানে এই সত্তায় জীবের অস্তিত্ব, তাঁহারই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, তাঁহারই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা জীব জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্মের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারই বিশ্বলীলার দিব্য আনন্দে জীব জীবনকে উপভোগ করিতেছে।

মানুষের অন্তর-আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানের আংশিক আত্মপ্রকাশ, জগতে তাঁহার প্রকৃতির কার্যের জন্য তিনি নিজেকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ। ব্যষ্টিগত মানুষ তাহার মূল অধ্যাত্ম সত্তায় ভগবানের সহিত এক। দিব্য-প্রকৃতির ক্রিয়ায় সে ভগবানের সহিত এক, অথচ কার্যত একটা ভেদ আছে, এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্ব-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভগবান এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রকার সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতির নীচের খেলায় অজ্ঞান ও অহঙ্কারমূলক ভেদ নীতির বশে মনে হয় যেন মানুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এবং ভেদ-চেতনার মধ্যে থাকিয়াই সে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম করে, ভোগ করে নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্য, জগতে নিজে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন এবং অন্যান্য মানুষের সহিত নিজের বাহ্যিক সম্বন্ধের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য। কিন্তু বস্তুত তাহার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কর্ম ও আনন্দভোগ এ-সবই ভগবানের সত্তার, ভগবানের চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম ও প্রকৃতি-উপভোগের প্রতিচ্ছায়া—যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ তাহা অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত ও বিকৃত। তাহার নিজের এই সত্যে

ফিরিয়া যাওয়াই তাহার মুক্তিলাভের সোজা পথ, অজ্ঞানের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্বপেক্ষা নিকট ও প্রশস্ত দ্বার। মানুষ প্রকৃতিযুক্ত আত্মা, এবং তাহার প্রকৃতিতে রহিয়াছে মন ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কর্ম, হৃদয়াবেগ, সংবেদন এবং জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; সুতরাং এই সকল শক্তিকে ভগবদভিমুখী করিয়াই তাহার নিজের উচ্চতম সত্যে ফিরিয়া যাওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতে হইবে; তাহার প্রেম ও ভক্তিকে পরম-পুরুষের দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছা ও কর্মকে পরম জগদীশ্বরের অধীন করিতে হইবে। তখন সে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতিতে উঠিয়া যাইতে পারিবে, তখন সে তাহার অজ্ঞানের চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্ম বর্জন করিয়া ভগবানের সহিত ঐক্যে, সেই এক আত্মারই আত্মা, শক্তি, জ্যোতি হইয়া চিন্তা করিতে, ইচ্ছা করিতে, কর্ম করিতে পারিবে; তখন সে ভিতরে ভগবানের সমস্ত আনন্ত্য উপভোগ করিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব বাহিরের স্পর্শ, ছদ্ম-বেশ ও বাহ্যরূপের ভোগ লইয়াই থাকিতে হইবে না। এইরূপে দিব্য জীবন যাপন করিয়া, এইরূপে তাহার সমগ্র আত্মা, সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমুখী করিয়া, সে পরমব্রহ্মের সত্যতম সত্যের মধ্যে গৃহীত হইবে।

বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, বাসুদেবই সব, ইহা জানা এবং এই জ্ঞানের মধ্যে বাস করা, ইহাই নিগূঢ় রহস্য। সে জানে যে, তিনি আত্মা, অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন আবার সকল জিনিসের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। নীচের প্রকৃতির বিশৃঙ্খল ও অশান্ত খেলা হইতে সরিয়া আসিয়া সে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তব্ধতা এবং অবিচ্ছেদ্য শান্তি ও জ্যোতির মধ্যে বাস করে। সে সেখানে ভগবানের এই আত্মার সহিত নিত্য ঐক্য উপলব্ধি করে, যে-আত্মা সর্বভূতের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া ও ব্যাপারকে ধরিয়া রহিয়াছে। পরিবর্তনশীল জগতের ভিত্তিস্বরূপ এই যে সনাতন অপরিবর্তনশীল অধ্যাত্ম সত্তা, ইহা হইতে সে উপরে মহত্তর সনাতন, বিশ্বা-তীত, পরম সত্য বস্তুর দিকে চাহিয়া দেখে। সে জানে যে, যাহা-কিছু আছে সে-সবেরই মধ্যে তিনি দিব্য অধিবাসী, মানুষের হৃদ্দেশে তিনি গুহ্য ঈশ্বর-রূপে বর্তমান, এবং তাহার প্রকৃত সত্তা ও এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম প্রভুর মধ্যে যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে সে সেই আবরণকে অপসৃত করিয়া দেয়। সে তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, কর্মকে জ্ঞানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, চিন্তা, ও কর্মের সহিত এক করিয়া দেয়, অন্তর্যামী ভগবানকে সে সকল সময় অনুভব করে এবং তাহার সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম সেই নিত্য ভগবদনুভূতির সহিত এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে ও ভজনা করে, এবং সমস্ত মানবীয় কর্মকে দিব্য প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শে রূপান্তরিত করে। সে জানে

যে, বিশ্বজগতে তাহার চারিদিকে যাহা-কিছু রহিয়াছে সে-সবের মূল ও সার সত্তা তিনি—সংসারের সমস্ত জিনিসকে সে দেখে যে, তাহাদের বাহ্যরূপে সে-সব হইতেছে (veils)—ছদ্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের নিগূঢ় মর্মে তাহারা হইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য ও উপায়; যে-ঐক্য, ব্রহ্ম, পুরুষ, আত্মা, বাসুদেব, যে-সত্তা এই সর্বভূত হইয়াছে, সে সর্বত্র তাহাকে দেখিতে পায়। সেই জন্যই তাহার সমগ্র আভ্যন্তরীণ জীবন অনন্তের সহিত এক সুরে ও ছন্দে গাঁথা হইয়া যায়, সে-অনন্ত তখন হয় সকল জীবে, তাহার ভিতরে ও চতুষ্পার্শ্বে সকল বস্তুতে স্বপ্রকাশ, এবং তাহার সমগ্র বাহ্য জীবন বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তরাত্মার ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরব্রহ্মের দিকে চাহিয়া দেখে, যিনি এখানে এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরের ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরম পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় সকল আবাসের উপরে। বিশ্বমাঝে যে-ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার ভিতর দিয়া উপরে সেই পরমেশ্বরের দিকে সে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার সকল সৃষ্টি, সকল প্রকাশের উপরে থাকিয়া সবকে পরিচালিত করিতেছেন। এইরূপে জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশ এবং ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টি ও আস্পৃহার (aspiration) ভিতর দিয়া সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে সে একান্ত সমগ্রভাবে, সর্ব্বভাবেন, ভজনা করিয়াছে।

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওয়া, ইহাকেই গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের মহান ভিত্তি করিয়াছে। ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে জানার অর্থ, আত্মায়, সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগতের অতীতে, তাঁহাকে এক বলিয়া জানা—জানা যে, ভগবান একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবার এই ভাবে জানাই যথেষ্ট নহে, যদি সেই সঙ্গেই হৃদয় ও আত্মাকে প্রগাঢ়ভাবে ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরা না হয়, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই সর্বতোমুখী প্রেম, ভক্তি, আস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ না করে। বস্তুত যে-জ্ঞানের সঙ্গে আস্পৃহা নাই, যাহা হৃদয়ের ঊর্ধ্বমুখী ভাবের দ্বারা সঞ্জীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহা কেবল তর্কবুদ্ধির খেলা, শুষ্ক বিচারের নিষ্ফল প্রয়াস। ভগবানের দর্শন প্রকৃতভাবে লাভ করিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবার জন্য তীব্র আবেগ আনিয়া দেয়—ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার প্রতি, আবার আমাদের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারও প্রতি গাঢ় অনুরাগ আনিয়া দেয়। বুদ্ধি দ্বারা জানা মানে, শুধু বুঝা; এইভাবে আরম্ভ করা কার্যকরী হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে—কার্যকরী হইবেই না যদি ঐ জানার মধ্যে কোন আন্তরিকতা না থাকে, আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি লাভের জন্য ইচ্ছার

কোনও অনুপ্রেরণা না থাকে, ভিতরের সত্তার উপর কোনও প্রভাব না হয়, আত্মায় কোনও সাড়া না আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, মস্তিষ্ক বাহ্যিক ভাবে বুঝিয়াছে কিন্তু আত্মা আভ্যন্তরীণ ভাবে কিছুই দেখে নাই। সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতরের সত্তার দ্বারা জানা, এবং যখন ঐ ভিতরের সত্তায় আলোকের স্পর্শ লাগে, তখন সে যাহা দেখে সেটিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়, সেটিকে লাভ করিতে বাসনা করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে এবং নিজে তাহাতে গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে-সত্যের মহিমা সে দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া যাইবার জন্য সাধনা করে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে. একাত্মতার উপলব্ধি; আর ঐ ভিতরের সত্তা নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলে চৈতন্য ও আনন্দের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, নিজের যাহাই সে দর্শন করিয়াছে তাহাকে লাভ করিয়া তাহার সহিত ঐক্যের দ্বারা, সুতরাং এই জ্ঞান যখনই জাগিয়া উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভের অদম্য প্রেরণা নিশ্চয়ই আনিয়া দেয়। এই জ্ঞানে যাহাকে জানা যায় তাহা বাহ্য বস্তু নহে, তাহা দিব্য পুরুষ; আমরা যাহা-কিছু তিনি সেই সবের আত্মা ও ঈশ্বর। তাঁহাতে সমগ্র সত্তার আনন্দ এবং তাঁহার প্রতি গভীর ও প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা এই জ্ঞানের প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই হৃদয়ের কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। অতএব ইহা উৎসর্গের রূপও নিশ্চয়ই গ্রহণ করে; এখানে আছে আমাদের সকল কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করা, এখানে আছে আমাদের সমগ্র বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতরের খেলায় এবং সমস্ত বাহিরের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করা। আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া তাঁহারই মধ্যে চলিতে থাকে, সে-সব তাঁহাকে, সেই ঈশ্বর ও আত্মাকেই, তাঁহাদের শক্তির ও প্রচেষ্টার মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান করে। আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া জগতের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার দিকেই প্রসারিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানের সেবার আয়োজন করে, সে-সেবা ও কর্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদের অন্তরস্থিত ভগবান, তাঁহাতেই আমরা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল জীবের সহিত এক আত্মা। কারণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহার মধ্যে স্থিত জীব উভয়েই সেই একমেবাদ্বিতীয়মের চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত, উভয়েই সেই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শরীর। এই ভাবে সেই এক আত্মার মধ্যে মন, হৃদয় ও ইচ্ছার সমন্বয় হয় এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই সর্বতোমুখী ভগবদুপলব্ধিতে, এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হয়।

কিন্তু এই দিব্য যোগের সাধনা আরম্ভ করাও অহংভাবে বদ্ধ জীবের পক্ষে কঠিন—শুধু তাহাই নহে, যাহারা আবার শেষ পর্যন্ত আর সব ছাড়িয়া

চিরকালের মত এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহার পূর্ণ সার্থকতা ও সামঞ্জস্যে পৌঁছান সহজ নহে—মর্ত্য মানুষের মন অজ্ঞানের বশে ছায়া ও বাহ্যরূপের উপর নির্ভর করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; ইহা শুধু মানুষের বাহ্যিক শরীর, বাহ্যিক মন, বাহ্যিক জীবনধারাকেই দেখে কিন্তু জীবের মধ্যে যে-দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মুক্তি-প্রদ দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। নিজেরই মধ্যে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাকে সে অগ্রাহ্য করে, এবং অপর মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও ভগবান মানুষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূতিরূপে প্রকাশিত করেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া মানুষীং তনু-মাশ্রিতম্। * আর যদি সে জীবন্ত মানুষের মধ্যেই ভগবানকে অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে বাহ্য জগতে ভগবানকে দেখা তাহার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়। কারণ এই বাহ্য জগৎকে সে দেখে তাহার ভেদাত্মক অহংভাবের কারাগার হইতে, তাহার সীমাবদ্ধ মনের রুদ্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়া। বিশ্বের মধ্যে সে ভগবানকে দেখিতে পায় না; যে পরম ভগবান এই বিচিত্র সৃষ্টিপূর্ণ জগৎ-সমূহের অধীশ্বর এবং তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; যে-দৃষ্টির দ্বারা জগতের সকল বস্তু বিদ্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং জীব নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বে জাগ্রত হইয়া উঠে এবং ভগবানের হয়, ভগবত্তুল্য হয়, সে দৃষ্টি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ। মানুষের যে অহং ক্ষুদ্র জিনিসের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাহিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়ের পার্থিব ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছে—সেই অহংয়ের জীবনটিকেই সে সহজে দেখিতে পায় এবং তাহাতে তীব্রভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই বহির্মুখী গতির দিকে যাহারা অতিমাত্রায় সমগ্রভাবে নিজেদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা নীচের প্রকৃতির কবলে পতিত হয়, সেইটিকেই একান্ত ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজেদের জীবনের ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে যে রাক্ষসী † প্রকৃতি রহিয়াছে তাহারা তাহারই অধীন হইয়া পড়ে, এরূপ মানুষ প্রাণের তাড়নার বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহংয়ের উগ্র ও অপরিমিত তৃপ্তির জন্য সব-কিছুকেই উৎসর্গ করে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম ও ভোগের তমোময় দেবতা করিয়া তোলে। অথবা আসুরী প্রকৃতির দাম্ভিক অহঙ্কার, স্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপর কর্ম

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

† মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা॥ ৯।১২

এবং ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চির-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা—এই সবের দ্বারা তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্তু ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহং-চৈতন্যের মধ্যে অবিরত বাস করিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদের সকল কর্মের কেন্দ্র করিয়া তুলিলে—আমরা প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানকে একেবারেই ধরিতে পারিব না। আত্মার বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলির উপর ইহা যে মোহ বিস্তার করে তাহা জীবনকে নিষ্ফল ভাবে ঘুরায়। এই অহং-চৈতন্যের সমস্ত আশা, কর্ম, জ্ঞানকে যখন দিব্য ও সনাতন আদর্শের তুলনায় বিচার করা যায় তখন সে-সব শূন্য, ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ ইহা মহত্তর আশার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, মুক্তিপ্রদ কর্মকে বহিষ্কার করে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্বাসিত করে। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরের সত্যকে দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জ্ঞান; এই আশা অনিত্যের পশ্চাতে ছুটে কিন্তু নিত্য বস্তুর সন্ধান করে না অতএব ইহা মিথ্যা আশা; ক্ষতির দ্বারা এই কর্মের সমস্ত লাভ নষ্ট হইয়া যায় অতএব এই কর্ম অন্তহীন পণ্ডশ্রম।

মানুষের পক্ষে যে উচ্চতর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করা সম্ভব সেই দৈবী প্রকৃতির আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যে-সব মহাত্মারা নিজেদিগকে খুলিয়া ধরেন কেবল তাঁহারাই মুক্তি ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, সে-পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ কিন্তু পরিশেষে এমনই প্রশস্ত যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।* মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, ইহাই মানুষের প্রকৃত কাজ, এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনের সুরক্ষিত গুপ্ত রহস্য। এই দেবত্ব যতই পরিবর্ধিত হয়, ততই মায়ার আবরণ খসিয়া পড়ে এবং জীব কর্মের মহত্তর সার্থকতা এবং জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পায়। মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের মধ্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি তখন ঘুরিয়া যায়; সেই দৃষ্টি অন্তরের দিক দিয়া দেখে ও বাহিরের দিক দিয়া জানে সেই অসীম আত্মাকে, সেই অবিনাশী সত্তাকে যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার দ্বারা সবকিছুই নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব যখন এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাত্মাকে অধিকার করে, তখন, তাহার জীবনের সমস্ত আস্পৃহা ভগবান ও অনন্তের প্রতি সর্বাতিরেকী প্রেম এবং অপরিসীম ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই নিত্য, সনাতন, অধ্যাত্ম, জীবন্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তুতে মন অনন্যভাবে আসক্ত

* মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌॥ ৯।১৩

হয়, সেই সত্য বস্তু ছাড়া তাহার কাছে আর কোন জিনিসেরই কোনও মূল্য থাকে না, একমাত্র সেই সর্বানন্দময় পরম পুরুষেই সে পরম প্রীতি লাভ করে। যে সর্বব্যাপী মহত্ত্ব, জ্যোতি, সৌন্দর্য, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মার নিকটে প্রকাশিত করিয়াছে, তাহার গুণকীর্তন করা এবং সেই পরম আত্মা ও অনন্ত পুরুষের উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল বাক্য, সকল চিন্তার একান্ত লক্ষ্য। * ভিতরের সত্তা সকল আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য এত কাল যে চেষ্টা করিয়াছে এখন সে-সব চেষ্টা অন্তরাত্মায় ভগবানকে পাইবার এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ করিবার অধ্যাত্ম সাধনা ও আস্পৃহাতে পরিণত হয়। সমস্ত জীবন হয় সেই ভগবানের সহিত এই মানবাত্মার নিত্য যোগ ও মিলন। ইহাই পূর্ণভক্তির ধারা; নিবেদিত হৃদয়ের উৎসর্গের দ্বারা উহা আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে নিত্য সনাতন পুরুষোত্তমের দিকে একাগ্রভাবে তুলিয়া দেয়। যাঁহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন তাঁহারাও তাঁহাদের আত্মা ও প্রকৃতির উপর ভগবদ্ জ্ঞান, ভগবদ্ দর্শনের যে নিত্যবর্ধনশীল, সর্বতোমুখী, অনতিক্রম্য প্রভাব তদ্দ্বারা সেই একই স্থানে উপনীত হন। * তাঁহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্বচনীয় আনন্দের দ্বারা তাঁহারা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহার যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা পরম সত্তাকে কেবল শূন্যময় ঐক্যে কিংবা সকল সম্বন্ধের অতীত অনির্দেশ্য সত্তারূপে চাওয়া নহে। ইহা হইতেছে সেই পরম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদয়াবেগের সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তাঁহার অনন্ততায় পাওয়া আবার যাহা-কিছু সান্ত আছে সে-সবের মধ্যেও তাঁহাকে পাওয়া, এককে তাঁহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা আবার তাঁহাকে তাঁহার সকল বিভিন্ন তত্ত্বে, তাঁহার অসংখ্য মূর্তিতে, শক্তিতে, রূপে, এখানে, সেখানে, সর্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালের মধ্যে, বহুধা, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অনন্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাঁহাকে দেখা ও আলিঙ্গন করা, একত্বেন, পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। সহজেই এই জ্ঞান হইয়া উঠে উপাসনা, উদার ভক্তি, বিশাল আত্মদান, সমগ্র আত্মসমর্পণ, কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মার জ্ঞান, এমন সত্তার স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষের সহিত আলিঙ্গন, যিনি আমাদের সবকিছুর উপরেই দাবি রাখেন, আবার আমরা যখন তাঁহার সমীপে যাই

* সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪

* জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ৯।১৫

তিনি তাঁহার অনন্ত আনন্দলীলার সমস্ত সম্পদ আমাদের উপরে অবিরতধারে ঢালিয়া দেন।

কর্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্বক আত্মদানে পরিণত হয় কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম পূর্ণভাবে সেই এক পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা। বেদের বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী রূপক, ইহার উদ্দেশ্য খুব উচ্চ না হইলেও তাহা স্বর্গাভিমুখী; কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে ভিতরের, ইহাতে সর্বময় ভগবান নিজেই হন বৈধ আচার, যজ্ঞ এবং যজ্ঞের প্রত্যেক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। * সেই অন্তর্যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়া ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহারই শক্তির আত্মবিধান ও আত্মপ্রকাশ, সেই শক্তি আমাদের আস্পৃহাকে আশ্রয় করিয়া আপন উৎসের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। অন্তর্যামী ভগবান নিজেই অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিরহং হুতম্, কারণ ঐ অগ্নি ভগবদ্মুখী ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান। আর ভগবানের যে রূপ ও শক্তি উপাদানস্বরূপ আমাদের প্রকৃতি ও সত্তায় বর্তমান, তাহাই অগ্নিতে অর্পিত হব্য; ভগবানের নিকট হইতে যাহা-কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই আপন সত্তার, আপন পরম সত্য ও মূলের সেবায় ও পূজায় উৎসর্গ করা হয়। মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র, মন্ত্র ভগবদ্মুখী চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তারই জ্যোতি, ঐ চিন্তার নিগূঢ় তত্ত্ব-পূর্ণ জ্যোতির্ময় শ্রুতবাক্যে ও মানুষের নিকট প্রকাশিত অনন্তের ছন্দে সেই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, আবার বেদে যাহা-কিছু জানা যায়, বেদ্য, তাহাও তিনি। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই। ঋক্ যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানের বাণী মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, যে শক্তির বাণী কর্মকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যে শান্তি ও সুসমঞ্জস সিদ্ধির বাণী আত্মার দিব্যবাসনার তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এই সবই ব্রহ্ম, সবই ভগবান। * দিব্যচৈতন্যের মন্ত্র সত্যদৃষ্টির জ্যোতি আনিয়া দেয়, দিব্যশক্তির মন্ত্র কার্যকরী ইচ্ছাশক্তি আনিয়া দেয়, দিব্যআনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাত্ম আনন্দের পূর্ণতা আনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান ওঁ-এরই পরিস্ফুরণ, ওঁ-ই সনাতন বাক্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর রূপের মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকল বস্তু ও রূপ যে সৃজনশীল আত্মরূপায়ণমূলক চৈতন্যক্রিয়ার অভি-ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকলের পশ্চাতে অনন্তের যে আত্মসমাহিত পরাচেতন শক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ—ওঁ-ই সকল বস্তু ও ভাবের, সকল

* অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ৯।১৬

* পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ৯।১৭

নাম ও রূপের পরম উৎস, বীজ, আশয়—ইহা নিজেই সমগ্রভাবে পরম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি ঐক্য, কালাতীত পরম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতের ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীত সত্তায় স্বয়ম্ভূ।† অতএব এই যে যজ্ঞ, ইহা একই সঙ্গে কর্ম ও ভক্তি ও জ্ঞান।

এইরূপে যে জানে, ভজনা করে, নিজের সমস্ত কর্মকে এক পরম আত্মোৎসর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে তাহার পক্ষে ভগবানই সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিতা বলিয়া জানে, যিনি তাঁহার সন্তানগণকে পোষণ করিতেছেন, পালন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলিয়া জানে, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপর তাঁহার প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ তাঁহার দিব্য সৌন্দর্যের মূর্তিতে ভরিয়া দিতেছেন। সে ভগবানকে এই জগতের আদি, প্রথম সৃষ্টিকর্তা, পিতামহ বলিয়া জানে; দেশ, কাল ও সম্বন্ধের মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি করিতে যাহারা ব্রতী রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সে ভগবানকে সকল বিশ্বগত ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে। যে মানুষ নিজেকে অনন্তের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আর আতঙ্কিত করিতে পারে না; দুঃখ ও অশুভ দেখিয়া সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যাহার দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্যস্থল,* সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সেই গন্তব্যের দিকে তাহার সদ্‌বুদ্ধি-পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তে তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইয়া যায়। সে জানে ভগবান তাহার এবং সকলের প্রভু, তাহার প্রকৃতির আধার, প্রাকৃত জীবের পতি, প্রণয়ী ভর্তা, তাহার সকল চিন্তা ও কর্মের অন্তর্যামী সাক্ষী। ভগবানই তাহার আবাস, তাহার গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। দৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তাহার দৃষ্টি ও অনুভূতিতে সেই একেরই খেলা; চিরন্তন পুনরাবর্তনলীলায় পুনঃপুনঃ তিনি নিজের আত্মপ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন আবার প্রত্যাহার করিতেছেন। একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ,

† ওং—অ, উ, ম্—অ. বাহ্য ও স্থূলের মূল সত্তা, বিরাট; উ, সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণের মূল সত্তা, তৈজস; ম্ নিগূঢ় পরাচেতন মহত্ত্বের সত্তা, প্রজ্ঞা; ওঁ—সর্ব্বাতীত পরম বস্তু, তুরীয়।

—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

* গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং বিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৮

যাহা-কিছুর উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিয়া মনে হয় তিনি সে-সবের মূল, আবার অব্যক্ত অবস্থায় সে-সব তাঁহার মধ্যেই চিরবিশ্রাম লাভ করে, নিধানং বীজমব্যয়ম্। সূর্য ও অগ্নির তাপের ভিতর দিয়া তিনিই উত্তাপ প্রদান করেন; তিনিই বর্ষার প্রাচুর্য আবার তিনিই শোষণ; এই জড়প্রকৃতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া তিনিই।* মৃত্যু তাঁহার মুখোশ, এবং অমৃতত্ব তাঁহার আত্মপ্রকাশ। যাহা-কিছু আমরা আছে বলি, সৎ, সে-সবই তিনি, আবার যাহা-কিছু নাই, অসৎ, বলিয়া আমরা মনে করি সে-সবও গুপ্তভাবে অনন্তের মধ্যে বিরাজমান এবং অনির্বচনীয় ভগবানের পরম রহস্যময় সত্তার অংশভূত।

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনি এই সব, সেই পরম পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে সেই পরম পুরুষের নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্য ধর্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ ফল প্রদান করে, কিন্তু এ-সব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক ও আভাসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল সময়েই আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে, বাহ্যিক জ্ঞান বা অন্তরতম জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা বা নিগূঢ় অন্তরতম সাধনা। বাহ্যিক ধর্ম হইতেছে বাহিরের কোনও দেবতাকে ভজনা করা এবং বাহ্যিক কোনও সুখময় অবস্থা প্রার্থনা করা; এই পথের সাধকেরা তাহাদের চরিত্রকে নির্মল পাপশূন্য করে, এবং শাস্ত্রের বাহ্য বিধান পালন করিবার জন্য নৈতিক ধর্মানুযায়ী কর্ম করে; তাহারা প্রতীক-স্বরূপ বাহ্যিক যোগের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে।† কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিব জীবনের অনিত্য নশ্বর সুখ দুঃখের অন্তে স্বর্গলোকের আনন্দলাভ করা, সে-সুখ পৃথিবীর সুখের চেয়ে মহত্তর কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ও লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র দুঃখময় পৃথিবীর অপেক্ষা বড়। আর এই যে-ভোগ তাহারা কামনা করে, শ্রদ্ধা ও সদাচারের দ্বারা তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের ব্যক্তিগত সম্ভাবনার চরম নহে বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতর সুখের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্। এইরূপে প্রাচীন কালের বৈদিক ক্রিয়া-

* তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ৯।১৯

† ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ৯।২০

পরায়ণ ব্যক্তি বেদত্রয়ের বহিরঙ্গ অর্থ আয়ত্ত করিতেন, পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেন, দেবসংসর্গের মদিরা সোম পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সৎ-কর্মের দ্বারা স্বর্গফল প্রার্থনা করিতেন। পরলোকে এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে গমনের আকাঙ্ক্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যাহার দ্বারা সে মৃত্যুর পর তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আবার এই মর্ত্য জীবনেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সত্যলক্ষ্য, সেইটির সন্ধান বা সিদ্ধি সে লাভ করিতে পাবে নাই। অন্য কোথাও নহে, এইখানেই সর্বোত্তম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ জড় মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত ঐক্যের ভিতর দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন জীবনের মাঝেই তাহার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবেই আমাদের দীর্ঘ পুনরাবর্তন-চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বজগতে আমাদের জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়া সর্বদা সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে,—এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র অহং-এর ভোগ বা স্বর্গভোগকে নহে; পরম বিশ্ব-পুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে। * ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্তে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকা, সকল জীবের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসা এবং সকল বস্তুতে তাঁহারই আনন্দ গ্রহণ করা,—ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র স্বরূপ। তাহার ভগবদ্-দর্শন তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার বিন্দু-মাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হইতেই তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম † আনিয়া দেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। সে যাহা

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
  ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
  গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ৯।২১

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
  তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

† যে-সব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ নাই তাহাদের প্রাপ্তিকে যোগ বলা যায়, এবং সেই লব্ধ সম্পদ রক্ষাই ক্ষেম।—অনুবাদক

পায়, স্বর্গের সুখ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য ছায়া মাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভাবে গড়িয়া উঠে, তেমনই ভগবানও তাঁহার অনন্তজীবনের অজস্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ লইয়া তাহার মধ্যে নামিয়া আসেন।

সাধারণ ধর্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পূজা, পূর্ণ ভগবানের পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধর্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা এই বহিরঙ্গের উপাসনাকে বলিয়াছে অন্যদেবতার প্রতি যজ্ঞ *; অন্যদেবতা যথা দেবান্, পিতৃন্, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধারণা করে সেই সবের নিকটেই সাধারণত তাহাদের জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ করে— মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল প্রধান-প্রধান জিনিস সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রধানত সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাব-সকলের উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে, অথবা যে-সব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত করে সেই সবের পূজা করিয়া থাকে। যদি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে, তবে তাহাদের সে শ্রদ্ধা সার্থক হয়; কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং তনুম্, শ্রদ্ধয়া অর্চতি, এবং তাহার মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সকল আন্তরিক ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুত সেই এক পরম বিশ্বপুরুষেরই উপাসনা; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তাহার সকল সাধনা ও উপাসনার অনন্ত ভোক্তা। † পূজার ধরন-ধারণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, নিজের অহংকে পূজা ও সেবা করিবার মায়া ও জড় প্রকৃতির বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্য হউক, তথাপি ইহার দ্বারাই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং একটা সাড়াও পাওয়া যায়। তবে জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটি হয় ঐ সাড়াও তদনুরূপই হয়, সেই পূজা-উপাসনার ফলপ্রাপ্তি তদনুযায়ীই হয়, এ-সবের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র যে মহত্তর ভগবদ্‌জ্ঞান জীবনলীলার সমগ্র সত্য দিতে পারে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পূজা যজ্ঞের সত্য ও উচ্চতম বিধি অনু-সারে অর্পিত হয় না। পরম ভগবদ্‌পুরুষকে তাঁহার সমগ্র সত্তায় ও তাঁহার আত্মবিকাশের সকল তত্ত্বে যে জানা সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তির উপর এই অর্পণ

* যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯।২৩

† অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তে তে॥ ৯।২৪

প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা শুধু বহিরঙ্গের ও আংশিক আভাসের উপরেই অনুরক্ত, ন মাং অভিজানন্তি তত্ত্বতঃ। সেই জন্য এই যজ্ঞের উদ্দেশ্যও পরিচ্ছিন্ন; প্রধানত অহং-এর সেবাই ইহার লক্ষ্য, ইহার ক্রিয়া ও অর্পণ আংশিক ও ভ্রান্ত, যজন্তি অবিধিপূর্বকম্। সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা; নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিসই পাওয়া যায় এবং সে-সবকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা পরম বিশ্বপুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহারা অন্যান্য সাধনালব্ধ সমস্ত জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুষোত্তমের দিকে যাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে। *

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়ের চূড়া, এই পূর্ণতম আত্মদান, এই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম ও চেষ্টা এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয়। * "তুমি যে কর্ম কর, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।" এইরূপে জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ হইতে বা নিজের যাহা-কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্ম—সমস্তই তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্‌ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন। বাসনা ও অহং কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত ভেদ তখন দূর হয়। কর্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য উদ্বেগ থাকে না, অশুভ ফল এড়াইবার চেষ্টা থাকে না, কিন্তু সকল কর্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ করা হয় যিনি জগতের সমস্ত কর্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, সুতরাং আর কর্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্মসমর্পণের দ্বারা সমস্ত অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম,

* যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ৯।২৫

* পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ৯।২৬-২৮

সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্যভাবে ক্রিয়া করে, সে-সব আর সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অহংএর থাকে না। সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এইভাবে সমর্পিত হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়; জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, অনন্তের সহিত তাহার ঐক্যে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্বভূতে সমান এবং সমানভাবে সকল জীবের বন্ধু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী, ভর্ত্তা। * তিনি কাহারও শত্রু নহেন, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনা কারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হইলে শেষপর্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস সম্বন্ধে সজ্ঞান সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্বতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই সর্বাপেক্ষা সরল পথে ও সত্বর ভাগবত ঐক্যে পৌঁছিতে পারা যায়। আমাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি প্রথমত আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র আত্মসমর্পণ শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেই বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত দূর হইয়া যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, পাপীকে ভগবদ্-সান্নিধ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় না; এই পথ দিয়া পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত। ভগবানের সম্মুখে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন না; সকলেই সোজাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে পারে, সেজন্য কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধাসূচক শর্তপূরণের প্রয়োজন হয় না। গুরু ভগবান বলিলেন, * "অত্যন্ত দুরাচারও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ভজনা করে,

* সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯।২৯

*অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯।৩০—৩১

তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত, কারণ সে-ব্যক্তির সাধনার যে অবিচলিত সংকল্প তাহা সত্য ও অখণ্ড। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া উঠে এবং চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।" অন্য কথায়, পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে সুদৃঢ় সংকল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের নিকট ভগবানের পূর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্যজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে জ্ঞান, পুণ্য-কর্ম বা কৃচ্ছ্র আত্মসংযমের দ্বারা ঊর্ধ্ব গতি লাভ করিতে চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু মানুষ যখন নিজের অহংকে, নিজের সমস্ত কর্মকে ভগবানে সমর্পণ করে তখন ভগবান নিজে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোক আনিয়া দেন, দুর্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছাশক্তির বল আনিয়া দেন, পাপীকে তিনি দিব্য পবিত্রতার মুক্তি আনিয়া দেন, দীন-দুঃখীকে তিনি অনন্ত অধ্যাত্ম সুখ ও আনন্দ আনিয়া দেন। তাহাদের দুর্বলতায়, তাহাদের মানবীয় শক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভগবান বলিতেছেন, "নিশ্চয় জেনো, অর্জুন, আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাই।" পূর্ব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পুণ্য, কর্মে ও জ্ঞানে মহান রাজর্ষির জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এ-সবেরই মূল্য আছে কারণ দুর্বল অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়া এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু এরূপ উদ্যোগ না থাকিলেও যাহারা প্রেমদাতা ভগবানের শরণাপন্ন হয়*— ধনোপার্জনের সংকীর্ণতা এবং ধনোৎপাদনের চেষ্টায় মগ্ন বৈশ্য, শত কঠিন বিধিনিষেধ-পিষ্ট শূদ্র, সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আত্মবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক, এমন কি পাপযোনি, পূর্বজন্মের কর্মফলে যাহারা অতি নীচ কুলে পতিত, পারিয়া চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে ভগবানের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পায়। মানুষের বাহ্য মন যে-সব বাহ্যিক ভেদবৈষম্যকে অতিবড় করিয়া দেখে, সে-সব ভেদ-বৈষম্য অধ্যাত্ম-

* মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৯।৩২—৩৩

জীবনের মধ্যে দিব্যজ্যোতির সাম্য এবং নিরপেক্ষ ভগবানের অনন্ত অজেয় শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না।

পার্থিব জগৎ দ্বন্দ্বে পূর্ণ এবং অনিত্য বাহ্যিক সম্বন্ধ-সকলের দ্বারা বদ্ধ; মানুষ যতদিন এখানে এই সকল জিনিসে আসক্ত হইয়া বাস করে এবং এই জগৎ তাহাকে যে-ভাবে চালাইতে চায় সেইটিকেই নিজের জীবনের আদর্শ নীতি বলিয়া গ্রহণ করে, ততদিন এ-জগৎ তাহার পক্ষে দ্বন্দ্ব, দুঃখ, যন্ত্রণার জগৎ, অনিত্যং অসুখম্ লোকম্। ইহা হইতে মুক্তির পথ হইতেছে বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হওয়া; জড়-জগৎ যে মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং মানুষকে দেহ ও প্রাণের সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে সেই জগতের সৃষ্ট মায়া হইতে ফিরিয়া সত্য ভাগবত সত্তার অভিমুখী হওয়া—সে ভাগবত সত্তা আত্মার মুক্তির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে। মায়াময় মিথ্যা জগতেব প্রতি যে প্রেম তাহাকে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। একবার এই নিগূঢ় অন্তরতম ভগবানকে জানিতে ও ধরিতে পারিলে, সমগ্র সত্তা, সমগ্র জীবন অত্যুচ্চ গতি লাভ করিবে, অত্যাশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইবে। বহির্মুখী কর্ম ও দৃশ্যে মগ্ন নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানতার পরিবর্তে চক্ষু সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে পাইবে, আত্মার ঐক্য ও সার্বভৌমিকতা দেখিতে পাইবে। জগতের দুঃখ যন্ত্রণা সর্বানন্দময়ের আনন্দের মধ্যে লোপ পাইবে, আমাদের দুর্বলতা, ভ্রান্তি ও পাপ অনন্ত ভগবানের সর্বগ্রাহী, সর্বরূপান্তরসাধক শক্তি, সত্য ও পবিত্রতায় পরিণত হইবে। মনকে ভাগবত চৈতন্যের সহিত এক করা, আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগকে সর্বভূতে বিরাজিত ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমে পরিণত করা, আমাদের সকল কর্মকে জগদীশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞরূপে পরিণত করা, আমাদের সকল পূজা উপাসনাকে একমাত্র তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণে পরিণত করা, পূর্ণযোগে আমাদের সমস্ত সত্তাকে ভগবদভিমুখী করা—ইহাই পার্থিব জীবন হইতে দিব্যজীবনে উঠিবার পন্থা।* ভগবদ্প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে ইহাই গীতার শিক্ষা, ইহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পরম সামঞ্জস্যে মিলিয়া এক হইয়াছে, সকল সূত্র একত্রে সংগ্রথিত হইয়াছে, এক অত্যুচ্চ সমন্বয়, উদারতম ঐক্য সংসাধিত হইয়াছে।

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

সপ্তম অধ্যায়

গীতার পরম বাক্য

এখন আমরা গীতোক্ত যোগের অন্তরতম সারাংশে, উহার শিক্ষার সমগ্র জীবন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমরা অতি স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, সীমাবদ্ধ মানবাত্মা যখন অহং ও নীচের প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্ত, নীরব, অচলপ্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার মধ্যে উঠে, সে ঊর্ধ্বগতি কেবল একটা প্রথম ধাপ, একটা প্রারম্ভিক পরিবর্তন মাত্র। আর এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, কেন গীতা প্রথম হইতেই ঈশ্বরের উপরে, মানবরূপী ভগবানের উপরে এত ঝোঁক দিয়াছে; তিনি সর্বদাই নিজেকে লক্ষ্য করিয়া (অহং, মাম্) এমনভাবে কথা বলিতেছেন যেন তিনি এক মহান্ গুহ্য ও সর্বব্যাপী সত্তা, জগৎ-সকলের ঈশ্বর, মানবাত্মার প্রভু; এমন কি প্রাকৃত বিশ্ব-জগতের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়সমূহ যাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই চির-শান্ত, অবিচল, অক্ষর, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা অপেক্ষাও মহত্তর।

সকল যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, অনন্তের সহিত মিলনের প্রয়াস। ভগবান ও অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি যত পূর্ণ হয়, তদনুযায়ীই হয় সেই সন্ধানের ধারা, সেই মিলনের গভীরতা ও পূর্ণতা এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। মানুষ মনোময় পুরুষ, তাহাকে তাহার সান্ত মনের ভিতর দিয়াই অন্তরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, এই সান্তেরই কোন সন্নিহিত দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া ধরিতে হয়। সে এমন কোনও পরিকল্পনার সন্ধান করে যেটিকে তাহার মন ধরিতে পারে, তাহার প্রকৃতির এমন কোনও শক্তিকে সে বাছিয়া লয় যাহা নিজেকে পরমে উন্নীত করিয়া অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পারে, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে, যে সত্যের স্বরূপ তাহার মনের ধারণার অতীত। সত্য অনন্ত, সেই জন্যই তাহার কাছে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থের অগণ্য বাক্য, অগণ্য ব্যঞ্জনা, সেই অনন্ত সত্যের কোনও একটি মুখকে সে দেখিবার চেষ্টা করে, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতর দিয়া, সেইটি যাহার একটি রূপ সেই অপরিমেয় সত্যে সে পৌঁছিতে পারে। সে দ্বার যতই সঙ্কীর্ণ হউক, যদি তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত আনন্ত্যের দিকে কতকটা দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে যে আহ্বান করিয়াছে তাহার অপরিসীম গভীরতা ও দুরারোহ শিখরের দিকে

তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সে পরিতুষ্ট হয়। আর যে-ভাবে সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, সেও তাহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে, যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে।

দার্শনিক চিন্তাশীল মন ব্যতিরেকী (Abstractive) জ্ঞানের দ্বারা অনন্তে পৌঁছিতে চায়। জ্ঞানের কার্য—অবধারণ করা, আর সান্ত বুদ্ধির পক্ষে ইহার অর্থ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করা, সীমা-নির্ধারণ করা। কিন্তু অনির্দেশ্য বস্তুকে নির্দেশ করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে কোন প্রকার সর্বতোমুখী নেতি নেতি। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় এমন সকল জিনিসকেই মন অনন্তের পরিকল্পনা হইতে বাদ দিতে অগ্রসর হয়। আত্মা ও অনাত্মাকে সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া দেখা হয়; এক শাশ্বত অক্ষর অনির্দেশ্য স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা ও সকল সৃষ্ট জিনিস, ব্রহ্ম ও মায়া, অনির্বচনীয় সদ্বস্তু ও যাহা কিছু তাহাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না—এই সবকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা হয়; কর্ম ও নির্বাণ—একদিকে বিশ্ব-শক্তির অবিরত অথচ চির-পরিবর্তনশীল কর্মধারা, অন্যদিকে এক অনির্বচনীয় পরম নিষ্ক্রিয়তা, যেখানে কোনও জীবন নাই, মনোবৃত্তি নাই, কর্মের আর কোনই উপযোগিতা নাই—ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ধারণা করা হয়। শাশ্বতের দিকে জ্ঞানের এই প্রবল বেগ মানুষকে অনিত্য ও অস্থায়ী সব কিছু হইতেই সরাইয়া লইয়া যায়। জীবনের উৎসে ফিরিবার জন্য উহা জীবনকেই অস্বীকার করে, আমরা যে রূপে প্রতীয়মান হই সে সমস্তই বর্জিত করা হয়, যেন ইহাদের উপরে আমাদের সত্তার যে নামরূপের অতীত সত্য সেখানে পৌঁছিতে পারা যায়। হৃদয়ের বাসনা, ইচ্ছাশক্তির কর্ম, মনের পরিকল্পনা সবই বর্জিত হয়; এমন কি পরিশেষে জ্ঞানও পরম অজ্ঞেয় ও নির্বিশেষ সত্তার মধ্যে নির্বাপিত, নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই যে ক্রমবর্ধমান নিবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টতার পথ শেষ পর্যন্ত চরম নিষ্ক্রিয়তায় লইয়া যায়, ইহার দ্বারা মায়া-সৃষ্ট আত্মা, অথবা যে সংস্কার-সমষ্টিকে আমরা "আমরা" বলিয়া অভিহেত করি, নিজের ব্যক্তিত্ব-ভাবের লয় সাধন করে, জীবনরূপ মিথ্যার অবসান করে, নির্বাণের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে আত্ম-নির্বাণের কঠিন ব্যতিরেকী প্রণালী, ইহা দুই চারিজন অসাধারণ প্রকৃতির লোককে আকৃষ্ট করিলেও, মানুষের মধ্যে দেহধারী আত্মাকে সর্বত্র তৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ পূর্ণতম শাশ্বতের অভিমুখে যাইবার জন্য তাহার বহুমুখী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে, ইহা সে-সবকে কোনও পথ দেখাইয়া দেয় না। কেবল তাহার ব্যতিরেকী ধ্যানী বুদ্ধিই নহে, তাহার পিপাসু হৃদয়, তাহার কর্মপর ইচ্ছা, তাহার যে ব্যবহারিক

মন এমন কোনও সত্যের সন্ধান করিতেছে তাহার নিজের জীবন এবং বিশ্বের জীবন যাহার বিচিত্র প্রকাশ—এই সবেরই আছে শাশ্বত ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস, তাহার মধ্যেই তাহাদের দিব্য উৎস এবং তাহাদের জীবন ও প্রকৃতির সার্থকতা তাহারা পাইতে চায়। এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ভক্তিমূলক ও কর্মমূলক ধর্মসকল, তাহাদের শক্তি হইতেছে এই যে, তাহারা আমাদের মানবতার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিকশিত বৃত্তিসকলকে তৃপ্ত করে, ভগবানের দিকে লইয়া যায়—কারণ ইহাদিগকে লইয়া আরম্ভ করিয়াই জ্ঞান ফলপ্রসূ হইতে পারে। এমন কি বৌদ্ধধর্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা ও বাহ্য বস্তু উভয়কেই কঠোর ও অকুন্ঠভাবে "নেতি" করা সত্ত্বেও নিজেকে প্রথমত কর্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ভক্তির স্থলে এক সার্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ কেবল এই ভাবেই তাহার পক্ষে মানবজাতির জন্য এক সিদ্ধিপ্রদ পন্থা হওয়া, এক বস্তুত মুক্তিপ্রদ ধর্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম ও মানসিক সৃষ্টিসকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে এবং বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায়; মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ যেটিকে অস্বীকার করে সেটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু কর্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্মসমূহের দুর্বলতা এই যে, তাহারা ভগবানের কোনও বিশেষ ব্যক্তিরূপে এবং সান্তেরই দিব্য ভাবসকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায়। আর যদি কখনও তাহাদের অনন্ত ভগবদ্‌সত্তা সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা থাকে, তাহারা আমাদিগকে জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, কারণ তাহারা ইহার পরম ও ঊর্ধ্বতম পরিণতি পর্যন্ত যাইতে চাহে না। শাশ্বতের মধ্যে যে পূর্ণ নিমজ্জন এবং একাত্মতার দ্বারা পূর্ণতম মিলন, এই সকল ধর্ম ততদূর পর্যন্ত যায় না—অথচ, সেই একাত্মতাতে মানবাত্মাকে একদিন পৌঁছিতেই হইবে, যদি নেতিমূলক পন্থায় না হয়, যে কোনও উপায়ে কারণ সেইখানেই রহিয়াছে সকল একত্বের ভিত্তি। অন্যপক্ষে, শুধু ধ্যানপরায়ণ নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্বলতা হইতেছে এই যে, তাহা এই পরিণতিতে উপস্থিত হয় অতিরিক্ত নেতির দ্বারা এবং শেষকালে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্তু বা মিথ্যা কল্পনামাত্র করিয়া তোলে, অথচ বারবার এই আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঐ মিলনপ্রয়াস, নতুবা তাহার কোন অর্থই থাকে না কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে মুক্তি ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই চিন্তাধারা মানবজীবনের অন্যান্য

শক্তিকে যতটুকু স্বীকার করে, তাহাকে সে প্রাথমিক নিম্নতর ক্রিয়ার জন্য রাখিয়া দেয়, শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে আসিয়া সে-ক্রিয়া কখনই কোন পূর্ণ বা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পায় না। অথচ এই যে সব জিনিসকে তাহা অসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে—সমর্থ ইচ্ছাশক্তি, প্রেমের তীব্র আবেগ, সচেতন মানস সত্তার ব্যবহারিক দৃষ্টি ও সর্বতোমুখী বোধি, এ-সবও আসিয়াছে ভগবান হইতে, তাহারা ভগবানেরই মূল শক্তিসকলের প্রতিরূপ, তাহাদের উৎপত্তিস্থলে তাহাদের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, এবং ভগবানেরই মধ্যে তাহাদের পূর্ণতালাভের একটা জীবন্ত সাধনাও আছে। তাহাদের চূড়ান্ত দাবী পূরণ না করিলে কোনও ভগবদ্‌জ্ঞানই সমগ্র পূর্ণ বা সর্বতোভাবে সন্তোষজনক হইতে পারে না। ভগবদ্‌সত্তার এই সকল ভাবের পিছনে যে অধ্যাত্মবস্তু রহিয়াছে, বৈরাগ্যমুখী জিজ্ঞাসার সংকীর্ণতায় তাহাকে নেতি করিয়া অথবা শুদ্ধ জ্ঞানের গর্বে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোন বিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্রগুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে, তাহার মহত্ত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বয়মূলক শক্তি যাহা বিশ্ব-মাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয়; আর মানুষ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের সন্ধানে, কোনও এক ঊর্ধ্বতম আনন্দ, শক্তি ও শান্তির সন্ধানে যে পরম ও অনন্ত সত্য, শক্তি, প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার সেই বহুমুখী প্রয়োজনকে উদার ও যথাযথ ঐক্যসাধনের দ্বারা সার্থকতা দেওয়া হয়। এখানে রহিয়াছে ভগবান, মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক ব্যাপক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের দিকে একটা সতেজ ও উদার প্রয়াস। অবশ্য এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সব জিনিসকে নিঃশেষে ধরা হইয়াছে, আর কোনও অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান হইতে বাকী নাই, এমন নহে; তথাপি এমন এক প্রশস্ত কাঠামো দেওয়া হইয়াছে, যেটিকে কেবল পূরণ করিয়া, পরিস্ফুট করিয়া, সামান্য পরিবর্তিত করিয়া, ইঙ্গিতসকলের অনুসরণ করিয়া, অস্পষ্ট স্থান-গুলিকে আলোকিত করিয়া, আমরা আমাদের বুদ্ধির অন্যান্য সমস্যারও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের আত্মার অন্যান্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিতে পারি। গীতা নিজে তাহার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কোনও সম্পূর্ণ নূতন সমাধান উপস্থিত করে নাই। যে ব্যাপকতা তাহার লক্ষ্য তাহাতে উপনীত হইতে গীতা বিখ্যাত দর্শনগুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদের পশ্চাতে উপনিষদের যে মূল বেদান্ত রহিয়াছে সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে, কারণ সেইখানেই আমরা পাই আত্মা ও মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রশস্ততম ও গভীরতম সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু উপনিষদগুলিতে অন্তর্জ্ঞানমূলক দৃষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতির্ময় আচ্ছাদনে আবরিত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিকট

অনধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিমূলক চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

ব্যতিরেকী চিন্তার দ্বারা যাহারা অনির্দেশ্যের, চির-অব্যক্ত অক্ষরের সন্ধান করে যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে, গীতা নিজের সমন্বয়ের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পন্থাকেও স্থান দিয়াছে। যাহারা এই পন্থার অনুসরণ করে তাহারাও পুরুষোত্তমকে, পরম দিব্য পুরুষকে, সর্বভূতের পরম আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব। কারণ তাঁহার যে উর্ধ্বতম স্ব-প্রতিষ্ঠ ভাব তাহা অচিন্ত্যই, অচিন্ত্যরূপম্, তাহা এক কল্পনাতীত সদ্বস্তু, সদসৎসার পরাৎপর, বুদ্ধির নির্ধারণের বহু উর্ধ্বে। যে নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তা, নীরব নিশ্চলতা, জীবন ও কর্মবর্জনের পন্থা দ্বারা মানুষ এই বোধাতীত নিরুপাধিক বস্তুর সন্ধান করে, গীতার দার্শনিক চিন্তায় তাহা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা গৌণ অনুমতি মাত্র। এই নেতিমূলক জ্ঞান সত্যের কেবল একটা দিককে ধরিয়া শাশ্বতের দিকে অগ্রসর হয়, আর সেই দিকটার অনুসরণ হইতেছে দেহধারী প্রাকৃত জীবের পক্ষে অতিশয় কঠিন, দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে; ইহা এক অতিশয় সংকীর্ণ, এমন কি অনাবশ্যক দুষ্করতর পথ অবলম্বন করিয়া চলে, ক্ষুরস্য ধারাঃ নিশিতৈব দুরত্যয়া। সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া নহে, পরন্তু সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সবাপেক্ষা সহজভাবে, ব্যাপকভাবে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাকে ধরিতে পাবে। এই যে বিশ্বমাঝে মানুষের মন, প্রাণ, দেহের জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরমেশ্বরকে দেখা, অব্যবহার্য্যম্, এইটি বস্তুত প্রশস্ততম ও সত্যতম সত্যও নহে; আর যাহাকে বস্তুসকলের ব্যবহারিক সত্য বলা হয়, সম্বন্ধ-মূলক সত্য, সেইটিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যেব পরমার্থের, সম্পূর্ণ বিপরীত নহে। বরঞ্চ সহস্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমাদের মানব-জীবনের সহিত পরম শাশ্বত বস্তুর নিগূঢ় স্পর্শ ও সংযোগ রহিয়াছে, আর আমাদের প্রকৃতির এবং বিশ্বের প্রকৃতির সকল মূলধারাকে ধরিয়াই, সর্ব্বভাবেন, সেই স্পর্শকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির নিকট সত্য করিয়া তোলা যায়। অতএব এই অপর পন্থাটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ, সুখম্ আপ্তুম্। ভগবান নিজেকে এমন করিযা রাখেন নাই যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়; কেবল একটি মাত্র জিনিসের প্রয়োজন, একটি দাবি পূরণ করা চাই, চাই আমাদের অজ্ঞানের আবরণকে দীর্ণ করিবার একাগ্র অদম্য সঙ্কল্প, যাহা সকল সময়েই আমাদের নিকটে রহিয়াছে, আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা আমাদের মূল সত্তা ও অধ্যাত্মসার, আমাদের ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার, আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির নিগূঢ়

তত্ত্ব, চাই তাহাকে মন ও হৃদয় ও প্রাণ দিয়া সমগ্রভাবে, অবিরতভাবে সন্ধান করা। আমাদের পক্ষে কেবল এই একটি জিনিসই কঠিন, বাকী যা কিছু আমাদের জীবনের পরম অধীশ্বর নিজেই সব দেখিবেন, নিজেই সব সম্পন্ন করিয়া দিবেন, অহম্ ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার সমন্বয়মূলক শিক্ষা যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে ঠিক সেইখানেই গীতা অবিরত এই পূর্ণতর সত্যের ও অধিকতর ফলদায়ক উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করিয়াছে। বস্তুত, গীতা স্ব-প্রতিষ্ঠ অক্ষর সত্তার উপলব্ধিকে যে-রূপ দিয়াছে তাহাতেই ইহা উপলক্ষিত হইয়াছে। মনে হয় বটে যে, সর্বভূতের সেই অক্ষর আত্মা প্রকৃতির কর্মপরম্পরায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান না করিয়া সরিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই অক্ষর আত্মা একেবারে সকল সম্বন্ধ-শূন্য নহে, সকল প্রকার সংযোগ হইতে সুদূরে নহে। তাহা আমাদের সাক্ষী ও ভর্তা; নীরবে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুমতি দিতেছে, এমন কি উদাসীনভাবে ভোগের আনন্দও গ্রহণ করিতেছে। জীব যখন সেই শান্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অবস্থিত তখনও প্রকৃতির বহুমুখী ক্রিয়া সম্ভব, কারণ সাক্ষী আত্মা হইতেছে অক্ষর পুরুষ, আর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সকল সময়েই কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তা একই সঙ্গে দুইটা দিক, ইহার সম্পূর্ণ অর্থটি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে—কারণ নিষ্ক্রিয় সর্বব্যাপী আত্মা ভগবানের কেবল একটা দিকের সত্য মাত্র। যিনি এক অপরিবর্তনীয় আত্মারূপে জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহার সকল পরিবর্তনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আবার মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবান, সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ বিকাশ এবং সকল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বাস্তব কর্মধারার সচেতন কারণ ও প্রভু। যিনি যোগীদের ঈশ্বর তিনিই জ্ঞান-পন্থীদের ব্রহ্ম, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী আত্মা, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী ভগবান।

লৌকিক ধর্মসকলের যে সীমাবদ্ধ সগুণ ভগবান, এই ভগবান তাহা নহেন; কারণ সে-সব হইতেছে ইহার কেবল আংশিক ও বাহ্যিক রূপায়ণ; ভগবানের সত্তার যে পরিপূর্ণ সত্য ইনি তাহারই ব্যক্তিকতার দিক, স্রষ্টা ও পরিচালক। ইনি হইতেছেন অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, আত্মা, সৎ,—সকল দেবতারা এই পুরুষের এক একটি দিক, সকল ব্যষ্টিগত রূপ বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহারাই খন্ড বিকাশ। ভক্তের যে ইষ্ট-দেবতা, ভক্ত তাহার বুদ্ধি দিয়া ভগবানের যে বিশিষ্ট নামরূপের পরিকল্পনা করে, বা যে বিগ্রহ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী ইনি তাহা নহেন। যিনি সকল ভক্তের, সকল ধর্মের বিশ্বজনীন ঈশ্বর, এই সমস্ত নাম-রূপ সেই এক দেবের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মুখ; কিন্তু ইনি নিজেই সেই বিশ্ব-দেব, দেব-দেব। এই ঈশ্বর ভ্রমাত্মিকা

মায়ার নির্গুণ অনির্দেশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র নহেন; কারণ সকল বিশ্বের অতীতে থাকিয়া, আবার ইহার মধ্যেও থাকিয়া তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং তিনি জগৎসকলের এবং জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। তিনি পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর কারণ তিনি পরম আত্মা ও পরম পুরুষ এবং তাঁহার ঊর্ধ্বতম মূল সত্তা হইতে তিনি এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন, নিজেকে মোহাবিষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু সর্ববিদ্ সর্বশক্তিমত্তা লইয়া। আর বিশ্বমাঝে তাঁহার দিব্য প্রকৃতির যে লীলা সেটিও তাঁহার কিম্বা আমাদের চেতনার একটা ভ্রান্তিমাত্র নহে। একমাত্র ভ্রমাত্মিকা মায়া হইতেছে নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান; তাহা এক অদ্বিতীয় অনির্দেশ্যের অলক্ষ্য ভূমিকার উপরে অসদ্ বস্তুসকল সৃষ্টি করিতেছে না, পরন্তু তাহার ক্রিয়া অন্ধ, ভারাক্রান্ত, সীমাবদ্ধ, সেইজন্য সৃষ্টির গভীরতর সত্যসকলকে সে অহংয়ের রূপের, মন, প্রাণ, জড়ের অন্যান্য অসম্পূর্ণ রূপের ভিতর দিয়া বিকৃতভাবে মানব-মনের সম্মুখে ধরিতেছে। এক পরা ভগবদ্-প্রকৃতি আছে, তাহাই এই বিশ্বের প্রকৃত সৃজনকর্ত্রী। সকল জীব, সকল বস্তু সেই একই ভগবদ্ সত্তার বিভিন্ন রূপ; সকল জীবন-লীলা একই ঈশ্বরের শক্তির লীলা; সকল প্রকৃতি একই অনন্তের অভিব্যক্তি। তিনি মানুষের অন্তরে ভগবান; জীব তাঁহারই সত্তার সত্তা। তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবান; এই দেশ ও কালের জগৎ তাঁহারই প্রাতিভাসিক আত্ম-বিস্তার।

সৃষ্টির ও সৃষ্টির অতীত সত্য সম্বন্ধে দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্যই গীতোক্ত যোগ তাহার সমন্বয়মূলক সার্থকতা ও অতুলনীয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যাহা কিছু আছে সে-সবের মধ্যে এই পরম ভগবানই এক অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর আত্মা; অতএব এই পরিবর্তনরহিত, বিনাশরহিত আত্মার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে মানুষকে জাগ্রত হইতে হইবে এবং ইহার সহিত তাহার আভ্যন্তরীণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে যুক্ত করিতে হইবে। তিনি মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান, মানুষের সকল ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছেন, পরিচালন করিতেছেন; অতএব মানুষকে তাহার অন্তরস্থিত ভগবান সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে হইবে, যে ভগবৎ সত্তাকে সে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাকে জানিতে হইবে, যাহা কিছু ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সে-সবকেই ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে এবং তাহার সত্তার এই অন্তরতম সত্তার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, তাহার চৈতন্যের এই মহত্তর চৈতন্য, তাহার সকল ইচ্ছা সকল কর্মের এই প্রচ্ছন্ন অধীশ্বর, তাহার মধ্যে এই যে সত্তা অবস্থিত রহিয়াছে—যাহা তাহার বিভিন্ন আত্ম-প্রকাশের মূল ও লক্ষ্য, তাহার সহিত তাহাকে যুক্ত হইতে হইবে। ভগবান তিনি, তাঁহার যে দিব্য প্রকৃতি আমরা, যাহা কিছু সেই সমুদয়ের মূল, তাহা এই সব নীচের প্রাকৃত সৃষ্টির দ্বারা

গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব মানুষকে তাহার নীচের আপাত-দৃশ্য জীবন হইতে, এই অপূর্ণ ও মৃত্যুময় জীবন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার সেই মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যাহার স্বরূপ অমৃতত্ব ও পূর্ণতা। এই ভগবানের যাহা কিছু আছে সে সকল বস্তুর মধ্যে এক, তিনি সেই আত্মা যাহা সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে সর্বভূত রহিয়াছে, চলিতেছে ফিরিতেছে; অতএব মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে সকল জীবের সহিত তাহার অধ্যাত্ম ঐক্য, সর্বভূতকে আত্মার মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখিতে হইবে, এমন কি সকল বস্তু সকল জীবকে আপনার মত করিয়াই দেখিতে হইবে, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র, এবং তদনুযায়ী তাহার সকল মনে ইচ্ছায় জীবনে চিন্তা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে। এখানে বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, এই ভগবানই সে সমুদয়ের আদি এবং তিনি তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা এই অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু হইয়াছেন, অভূৎ সর্ব্বভূতানি; অতএব মানুষকে চেতন অচেতন সকল বস্তুর মধ্যেই সেই এক অদ্বিতীয়কে দেখিতে হইবে, আরাধনা করিতে হইবে, সূর্যে, নক্ষত্রে, পুষ্পে তাঁহার যে প্রকাশ, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, সবেরই পূজা করিতে হইবে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য ঐক্যানুভূতির দ্বারা এবং সর্ব শেষে নিবিড় আভ্যন্তরীণ একত্বের দ্বারা তাহাকে বিশ্বের সহিত এক বিশ্ব-ব্যাপকত্ব লাভ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধরহিত একত্বের মধ্যে প্রেম ও কর্মের কোনও স্থান নাই, কিন্তু এই যে বৃহত্তর ও পূর্ণতর ঐক্য ইহা কর্ম ও শুদ্ধ হৃদয়াবেগের ভিতর দিয়া নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই হইয়া উঠে আমাদের সকল কর্মের সকল অনুভবের আধার, উৎস, সার-বস্তু, প্রেরণা, দিব্য উদ্দেশ্য। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, কোন্ দেবতাকে আমরা আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্ম অর্পণ করিব? ইনিই সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের আত্মবলি দাবি করিতেছেন। নিশ্চেষ্ট সকল সম্বন্ধ-শূন্য যে একত্ব তাহার মধ্যে পূজা ও ভক্তির আনন্দের কোনও স্থান নাই; কিন্তু এই যে সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর, নিবিড়তর মিলন, ইহার আত্মা ও হৃদয় ও শীর্ষ হইতেছে ভক্তি। এই ভগবানই আমাদের পিতা, মাতা, প্রেমাস্পদ, বন্ধু, সকল সম্বন্ধের পূর্ণ পরিণতি, সকল জীবের আত্মার আশ্রয়। তিনিই গুহ্যবিদ্যার বিষয় সেই এক পরম ও বিশ্ব-দেব, আত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর। তিনি তাঁহার দিব্য যোগের দ্বারা এইসকল ভবেই জগৎকে নিজের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন; ইহার অসংখ্য সত্তা-সকল তাঁহার মধ্যে এক এবং তিনি তাঁহাদের মধ্যে নানারূপে, নানাভাবে এক। মানুষের দিক দিয়া সেই একই দিব্য যোগ হইতেছে, যুগপৎ তাঁহার এই সকল ভাবে আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া।

এইটিই যে তাঁহার শিক্ষার পরম ও পূর্ণ সত্য, তিনি যাহা প্রকাশ করিতে অংগীকার করিয়াছিলেন এইটিই যে সেই সমগ্র জ্ঞান, তাহা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট করিবার জন্য অবতার পুরুষ এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলেন তাহার সার সংকলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইহাই তাঁহার পরম বাক্য, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ভূয়ঃ এব শৃনু মে পরমম্ বচঃ। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই পরম বাক্য হইতেছে, প্রথমত এই স্পষ্ট ঘোষণা যে, সৃষ্টিতে যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবেরই পরম ও দিব্য উৎস-রূপে, সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎবাসী সকল জীবের সেই মহান্ অধীশ্বর রূপে শাশ্বতকে জানা ও আরাধনা করা—ইহাই হইতেছে শাশ্বতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা। দ্বিতীয়ত, ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা· শাশ্বত ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইলে, মানুষের পক্ষে এইটিই হইতেছে নির্ধারিত ও স্বাভাবিক পন্থা। পন্থাটির এই সংজ্ঞাকে আরও অর্থগৌরবপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই যে-ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত এবং ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্মের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা-শক্তিস্বরূপ, ইহার শ্রেষ্ঠতাকে সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, শিষ্যের হৃদয় ও মন দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন এখানে সূচিত হইল; এই ধারার অনুসরণ করিয়াই অতঃপর মানব-যন্ত্র অর্জুনের প্রতি কর্মের চরম আদেশ প্রদত্ত হইবে। ভগবান বলিলেন, "তোমার আত্মার কল্যাণকমনায় পরম বাক্য আমি তোমাকে বলিব, কারণ তোমার হৃদয় এখন আমাতেই প্রীতি অনুভব করিতেছে", তে প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি। কারণ ভগবানে হৃদয়ের এই যে প্রীতি, ইহাই হইতেছে যথার্থ ভক্তির সমগ্র সার ও উপাদান। পরম বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র অর্জুনকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কি উপায়ে ব্যবহারত প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবানকে দেখিতে পারা যায়। এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ ও সহজ পরিণাম হইল ভগবানকে বিশ্বের আত্মা-রূপে দর্শন, এবং সেই সঙ্গেই জগতের যুগান্তর-কারী কর্মের মহান আদেশ সংঘোষিত হইল।

গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাকে সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বলিয়া, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলিয়া জোর দিয়াছে, তাহার দ্বারা বিশ্বাতীত আনন্ত্যের সহিত কালাধীন বিশ্ব-লীলার সমন্বয় সাধিত হয়, অথচ উভয়ের কোনটিকেই অস্বীকার করা হয় না, কাহারও বাস্তবতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় না। সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ তত্ত্ব, উচ্চতম সত্তা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আমাদের

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১০।১

আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধির এই সকল বিভিন্ন ধারার গীতা সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। ভগবান অজ, শাশ্বত, অনাদি; যাহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহার পূর্ববর্তী এমন কোনও বস্তু নাই, থাকিতে পারে না, কারণ তিনি এক অদ্বিতীয় ও কালাতীত ও পূর্ণতম পরম বস্তু। "কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন...যিনি আমাকে অজ অনাদি বলিয়া জানেন"*...এইগুলিই হইতেছে সেই পরম বাক্যের প্রথম কথা। আর তাহা এই সমুচ্চ আশ্বাস দিতেছে যে, এই জ্ঞান সংকীর্ণ মানসিক জ্ঞান নহে পরন্তু শুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান—কারণ তাঁহার রূপ ও প্রকৃতি (যদি বিশ্বাতীত পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা চলে) মনের ধারণার অতীত 'অচিন্ত্যরূপ'—এই জ্ঞান মরমানবকে অজ্ঞানের সকল মোহ হইতে এবং পাপের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। যে মানবাত্মা এই পরম অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে বাস করিতে পারে, সে ইহার দ্বারা বিশ্বের মনঃকল্পিত ভাবমূর্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সকলের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। সে এমন এক ঐক্যের অনির্বচনীয় শক্তির মধ্যে উঠিয়া যায় যাহা সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে অথচ সকলকেই সার্থক করিয়া তুলিতেছে; তাহা এখানেও যেমন, ঊর্ধ্বেও তেমনিই। বিশ্বাতীত অনন্ত সম্বন্ধে এই যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সংকীর্ণতা অতিক্রমিত হয়। যে অদ্বৈতবাদ ভগবানকে বিশ্বের সহিত এক বলিয়া দেখে, সে তাহার পরিকল্পিত অনন্ত ভগবানকে তাঁহার বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, এবং সেইটিকেই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ যে উপলব্ধি, উহা আমাদিগকে দেশ ও কালের অতীত শাশ্বতের মধ্যে মুক্তি দেয়। অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার অভিব্যক্তি জানে না"; সমগ্র বিশ্ব, এমন কি অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়াও তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁহার অনির্বচনীয় জ্যোতি, অনন্ত মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে না। অন্যান্য নিম্নতর যে ভগবদ্‌জ্ঞান, বিশ্বাতীত ভগবানের চির অব্যক্ত অনির্বচনীয় সত্তাকে ধরিয়াই তাহারা প্রকৃত সত্য হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ইহাও সত্য যে, বিশ্বাতীত ভগবদ্‌ সত্তা কেবল একটা নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধশূন্য নির্বিশেষ তৎস্বরূপ নহে। তাহা এক পরম সম্বস্তু, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা। বিশ্বের সকল

* ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০।২,৩

সম্বন্ধ এই পরম হইতেই উদ্ভূত; সকল বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ফিরিয়া যায় এবং কেবল তাঁহার মধ্যে গিয়াই তাহাদের সত্য এবং অপরিমেয় সত্তা প্রাপ্ত হয়। "কারণ আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্বথা উৎপত্তির হেতু।" দেবতাগণ হইতেছেন সেই সকল অক্ষয় শক্তিপুঞ্জ ও অমর ব্যক্তি, যাঁহারা সজ্ঞানে বিশ্বের আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তিসমূহকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, গঠন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন। দেবতাগণ হইতেছেন শাশ্বত ও আদি দেবের আধ্যাত্মিক রূপ, তাঁহারা তাঁহা হইতেই নামিয়া আসিয়াছেন জগতের বহুমুখী ক্রিয়ার মধ্যে। দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী,—তাঁহারা সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্ব, প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া, সমস্তই সর্বপ্রকারে, সকল সূত্রে এবং প্রত্যেক অংশে সেই বিশ্বাতীত অনির্বচনীয় সত্তা হইতে আসিতেছে। এই দিব্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা এখানে কিছুই স্বাধীন-ভাবে সৃষ্ট হয় না, কোনও জিনিসই নিরপেক্ষভাবে উদ্ভাবিত হয় না; প্রত্যেক বস্তুর মূল ও কারণ, তাহার সত্তার ও আত্মপ্রকাশপ্রবৃত্তির আধ্যাত্মিক হেতু রহিয়াছে বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যেই, অহম্ আদিঃ সর্ব্বশঃ। বিশ্বের কোনও জিনিসেরই প্রকৃত কারণ বিশ্বের মধ্যে নাই, সমস্তই আসিতেছে সেই বিশ্বাতীত সত্তা হইতে।

যে-সকল মহর্ষিকে বেদের ন্যায় এখানেও সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে,* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবদ্ প্রজ্ঞার ধী-শক্তি; সেই প্রজ্ঞা নিজের আত্ম-চেতন অনন্ততা হইতে সকল বস্তুকে উৎপন্ন করিয়াছে, প্রজ্ঞা পুরাণী,—নিজের মূল সত্তার সাতটি তত্ত্ব ক্রম অনুসারে বিকশিত করিয়াছে। এই ঋষিগণ হইতেছেন, বেদের সপ্ত ধীয়াঃ, সর্ব-ধারক, সর্ব-উদ্ভাসক, সর্ব-প্রকাশক সপ্ত ধী-শক্তির বিগ্রহ-মূর্তি—উপনিষদ সকল জিনিসকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সপ্তে সাজানো। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা চারি শাশ্বত মনু, চত্বারো মনবস্তথা,—কারণ ভগবানের যে কর্মপরা প্রকৃতি তাহা চতুর্মুখী, এবং মানুষ তাহার চতুর্মুখী স্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, ইহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। জীবনের যে-সব ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহারা নির্ভর করিতেছে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট মনের উপর; উহারা হইতেছেন এই সমুদয়ের সৃষ্টি-কর্তা, জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাঁহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে; সকলেই তাঁহাদের সন্তান, যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। আর এই সকল মহর্ষি

* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১০।৬

এবং এই চারি মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইতেছেন পরমাত্মার নিত্য মানস সৃষ্টি, মদ্‌ভাবা মানসা জাতা, তাঁহার বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত—তাঁহারা স্রষ্টা, কিন্তু বিশ্বের যত স্রষ্টা তিনিই তাঁহাদের স্রষ্টা। সকল অধ্যাত্ম সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, সকল অন্তরাত্মার অন্তরাত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, সকল রূপের আভ্যন্তরিক সার বস্তু, এই বিশ্বাতীত পরম পুরুষ আমরা যাহা কিছু, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু নহেন, অন্য পক্ষে আমাদের ও জগতের, সত্তার ও প্রকৃতির, সকল সূত্র, সকল শক্তি তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট, তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাসিত।

আমাদের জীবনের এই যে বিশ্বাতীত উৎস, তাহার ও আমাদের মধ্যে কোনও অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের বিচ্ছেদ নাই, যে-সকল জীব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করেন না, অথবা তাহাদিগকে কেবল মায়ার বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দেন না। তিনি সৎ (the Being), আর সব কিছু তাঁহারই প্রকাশ (becomings)। তিনি একটা শূন্য হইতে, একটা "নাস্তি" হইতে অথবা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই সৃষ্টি করেন, নিজেই সৃষ্ট হন; সকলেই তাঁহার সত্তার মধ্যে, সকলেই তাঁহার সত্তার অংশ। এই যে সত্য ইহা সর্বেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াও অতিক্রম করিয়া যায়। বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, কিন্তু বিশ্বে যাহা কিছু আবির্ভূত সেই সমুদয়ই বাসুদেব এই জন্য যে, যাহা কিছু এখানে আবির্ভূত হয় নাই, যাহা কিছু কখনও প্রকট হয় না সে-সবও তিনি। তাঁহার সত্তা তাঁহার প্রকাশের দ্বারা কোনরূপে খণ্ডিত হয় না; এই সম্বন্ধের জগতের দ্বারা তিনি এতটুকুও সম্বদ্ধ নহেন। যখন তিনি সব কিছু হইতেছেন তখনও তিনি বিশ্বাতীত; যখন তিনি সান্ত রূপ গ্রহণ করিতেছেন তখনও তিনি নিত্য অনন্ত। প্রকৃতি (Nature) তাহার মূল সত্তায় তাঁহারই অধ্যাত্ম শক্তি, আত্মশক্তি; এই অধ্যাত্ম আত্মশক্তি বস্তুসকলের প্রকাশের জন্য তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি-স্বরূপ অসংখ্য মূল গুণ সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগকেই বাহিরের রূপে ও কর্মে প্রকট করে। কারণ সে-শক্তির যে মৌলিক, নিগূঢ়, দিব্য ক্রমবিন্যাস তাহাতে প্রত্যেক বস্তুরই অধ্যাত্ম সত্যটি আসে প্রথমে, তাহা হইতেছে প্রকৃতির গভীরতম একত্বের জিনিস; যে গুণ ও প্রকৃতি তাহাদের মনস্তত্ত্বের সত্য তাহার মধ্যে যথার্থ বস্তু যাহা আছে সে-সব নির্ভর করিতেছে ঐ অধ্যাত্ম সত্যের উপর, তাহা আত্মা হইতেই উদ্ভূত; রূপ ও কর্মের যে বাহ্যিক সত্য প্রয়োজনীয়তায় ন্যূনতম এবং ক্রমবিন্যাসে সর্বশেষ, তাহা প্রকৃতির আভ্যন্তরিক গুণ হইতে উদ্ভূত, এবং বাহ্য জগতে এই সকল বিচিত্র প্রকাশের জন্য সর্বতোভাবে তাহারই উপর নির্ভর করে। অথবা অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সত্য হইতেছে কেবল

অন্তরাত্মার শক্তিসমষ্টির বহিঃপ্রকাশ, এবং সর্বদাই তাহাদের পিছনে তাহাদের বহিঃপ্রকাশের অধ্যাত্ম কারণটি বর্তমান রহিয়াছে।

এই যে সান্ত বাহ্য সৃষ্টি, ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানই প্রকটিত হইতেছেন। অপরা প্রকৃতি প্রকৃতির গৌণরূপ; অনন্তের মধ্যে সংযোজনার যে বহু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কয়েকটির একটা অধস্তন পরিণতি হইতেছে এই অপরা প্রকৃতি। সত্তার যে মূল গুণ ও আত্মপ্রকাশের ধারা তাহা হইতে উদ্ভূত এই সকল সংযোজনা, রূপ ও শক্তির, কর্ম ও গতির সংযোজনা, ইহারা জগৎ ঐশ্যের মধ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সম্বন্ধের ও পারস্পরিক অনুভূতি উপলব্ধির জন্য। আর এই নীচের বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান ব্যবস্থায় ভগবানের প্রকাশশক্তি-রূপা প্রকৃতি এক মোহাচ্ছন্ন বিশ্বগত অবিদ্যার বিকৃতির দ্বারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অনুভূতির জড়ানুগত, ভেদাত্মক ও অহংভাবমূলক ক্রিয়ায় নিজের দিব্য সত্যসকলকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এখনেও সব কিছুই ভগবান হইতে আসিতেছে, সব কিছুই হইতেছে প্রভাব, ভাব, প্রবৃত্তি; বিশ্বাতীত সত্তার মধ্য হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া বিকাশ-ধারা। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, "আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতে বাহির হইয়া সকলে কর্ম ও গতির বিকাশে চলিয়াছে।" আর ইহা কেবল সেই সব জিনিসের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে যাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি এবং দিব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, যে-সব হইতেছে জ্যোতির্ময়, সাত্ত্বিক, নৈতিক ও শান্তিপ্রদ, অধ্যাত্মভাবে আনন্দপ্রদ * "বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা ও দান।" পরন্তু ইহা সেই সব বিপরীত জিনিসসকলের পক্ষেও যাহারা নর-মানবের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে এবং অজ্ঞান ও তাহার সংমোহ লইয়া আসে, "সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু, ভয় ও অভয়, যশ ও অযশ্য", আর এইরূপ বাকী যাহা কিছু জ্যোতি ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ হইতে উত্থিত, যে-সব অসংখ্য মিশ্রিত তন্ত্রী এমনই বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে অথচ আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন মন ও তাহার অজ্ঞান ভাবসকলে জড়িত হইয়া অনবরত উত্তেজনায় শিহরিত হইতেছে। জীবগণের এই সব পৃথক-পৃথক ভাব এক মহান্ আত্ম-প্রকাশধারার অন্তর্গত, এবং যিনি ইহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন তাঁহা হইতেই তাহারা তাহাদের উদ্ভব ও সত্তা লাভ

* বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ১০।৪,৫

করিয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তা এই সমুদয় জিনিসকে জানেন এবং সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই পৃথগ্‌ভূত জ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত হন না। এখানে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে ভূ ধাতু (to become—হওয়া) হইতে উৎপন্ন তিনটি কথাকে কেমন একত্র করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে ভবন্তি, ভাবাঃ ভূতানাম্‌। ভগবান নিজেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছেন, ভূতানি; সমস্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ক্রিয়া তাঁহার এবং তাহাদের মানসিক ভাব, ভাবাঃ। এই সকলও,—যেমন আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবসকল ঠিক তেমনিই আমাদের নিম্নতর আভ্যন্তরীণ ভাবসকল এবং তাহাদের পরিদৃশ্যমান পরিণামসকল, সমস্তই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভবন্তি মত্ত এব *। গীতা সত্তা এবং তাহার প্রকাশ এই দুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়াছে এবং এই প্রভেদের উপর জোর দিয়াছে, কিন্তু এই প্রভেদকে বিরোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। কারণ তাহা হইলে বিশ্বগত একত্বকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ভগবান এক, তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার এক, বস্তুসকলের এক সর্বব্যাপী আধার-রূপে এক, তাঁহার বিশ্ব-প্রকৃতির একত্বে এক। এই তিনই এক অদ্বিতীয় ভগবান; সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, সকলেই তাঁহার সত্তার প্রকট রূপ, সকলেই শাশ্বতের সনাতন অংশ অথবা কালাধীন প্রকাশ। যদি আমাদিগকে গীতার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বাতীত পরম সত্তার মধ্যে সকল জিনিসের চরম নির্বাণ অনুসন্ধান করা চলিবে না, পরন্তু সেখানেই তাহাদের রহস্যের সুমীমাংসার সন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের সমন্বয়সাধক সত্যের সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু অনন্তে আরও একটি পরম সত্য আছে, সেটিকেও মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অপরিহার্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সত্য হইতেছে এই যে, বিশ্বের দিব্য নিয়ন্তা তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আবার ইহার মধ্যেও নিবিড়ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে পরমেশ্বর নিজে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছেন, অথচ ইহাকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত কোনো ইচ্ছাশক্তিশূন্য কারণ মাত্র নহেন। এমন নহে যে, এই জগৎ তাঁহার অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি এবং তাঁহার বিশ্ব-শক্তির এই সকল পরিণামের জন্য তিনি কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, অথবা তাঁহার চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ভ্রমাত্মিকা চৈতন্যের উপর, মায়ার উপর, ঐ সবকে আরোপ করেন, কিংবা সৃষ্টিকে এক যন্ত্রবৎ অন্ধনিয়মের বশে, অথবা কোনো প্রতিনিধির হস্তে, অথবা পাপ ও পুণ্যের চির-দ্বন্দ্বের

---

* যথা উপনিষদে, আত্মা এব অর্থাৎ সর্ব্বভূতানি, আত্মাই সর্বভূত হইয়াছে; এখানে শব্দগুলির নির্বাচনে এই ব্যঞ্জনা নিহিত রহিয়াছে যে, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাই এই সর্বভূত হইয়াছে।

মধ্যে ছাড়িয়া দেন। এমন নহে যে, তিনি উদাসীন সাক্ষীরূপে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করিতেছেন কখন সব কিছু নিজদিগকে লুপ্ত করিয়া দিবে, অথবা তাঁহার অবিচল আদি তত্ত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। তিনি জগৎ ও জনসমূহের মহান্ ঈশ্বর, লোকমহেশ্বরম্, তিনি শুধু জগতের মধ্যে থাকিয়াই নহে, পরন্তু ঊর্ধ্ব হইতেও, তাঁহার পরম বিশ্বাতীত পদ হইতেও জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও অবস্থিত নহে, এমন কোনো শক্তির দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতে পারে না। জগতেব উপর এক দিব্য নিয়মের রাজত্ব চলিতেছে, ইহা বলিলে বুঝায় যে, ইহার উপরে এক সর্বশক্তিমান নিয়ন্তার প্রভুত্ব রহিয়াছে, কোনো যন্ত্রবৎ শক্তির বা বিশ্বের আপাতদৃশ্য রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো অলঙ্ঘ্য অন্ধনিয়তির নহে। এইটিই হইতেছে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরবাদমূলক (theistic) দৃষ্টি, কিন্তু যে ঈশ্বর-বাদ সঙ্কোচের সহিত অতি সন্তপণে অগ্রসর হয় এবং জগতের বৈপরীত্য-সকলের দিকে সোজাভাবে চাহিয়া দেখিতে ভয় পায়, ইহা সেরূপ ঈশ্বরবাদ নহে, ইহা দেখে ভগবান সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় আদিদেব, তিনি শুভ-অশুভ, সুখ-দুঃখ, জ্যোতি-অন্ধকার সব কিছুই নিজের সত্তার উপাদান-রূপে নিজের মধ্যে প্রকট করিতেছেন, এবং নিজের মধ্যে যাহা প্রকট করিয়াছেন, নিজেই তাহা পরিচালন করিতেছেন। ইহার বৈপরীত্যসকল তাঁহাকে স্পষ্ট করিতে পারে না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা তিনি কোনরূপে সীমা-বদ্ধ হন না, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও তিনি তাহার সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহার জীবগণের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে এক, তাহাদেব মূল অধ্যাত্ম সত্তা, আত্মা, ঊর্ধ্বতম চিৎশক্তি, তাহাদের প্রভু, প্রণয়ী, বন্ধু আশ্রয়, তিনি তাহাদের মধ্যে থাকিয়া আবার ঊর্ধ্ব হইতেও মর্ত্যজগতে পরি-দৃশ্যমান অজ্ঞান, দুঃখ ও পাপ অশুভের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সবদা পরিচালিত করিতেছেন, প্রত্যেককে তাহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবং সকলকে বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক পরম জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্ব ও পরম পদের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। এইটিই হইতেছে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সমগ্রতা। ভগবান আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে অবস্থিত, আবার সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বের অতীত অনন্ত সত্তা, ইহাই সেই সমগ্র জ্ঞান। পরাৎপর তিনি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির, তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার কার্যকরী শক্তির দ্বারা তিনি সর্ব্বমিদং হইয়াছেন, তাঁহার লোকাতীত পরম পদ হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অবস্থিত, বিশ্বের সকল ঘটনা পরম্পরার কারণ, নিয়ন্তা, পরিচালক, অথচ তিনি এত উচ্চ, মহান্ ও অনন্ত যে তাঁহার কোনো সৃষ্টিই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না।

এই জ্ঞানের স্বরূপ তিনটি পৃথক আশ্বাসপূর্ণ শ্লোকে সুস্পষ্ট করা

হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, *"যে আমায় অজ, অনাদি ও সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বররূপে জানে, সে মর্ত্যলোকে মোহশূন্য হইয়া বাস করে এবং সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে আমার এই বিভূতি, এই সর্বব্যাপী ঈশ্বরত্ব এবং আমার এই যোগ (ঐশ্বর যোগ, যাহার দ্বারা বিশ্বাতীত ভগবান সকল সৃষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াও সকলের সহিত এক, সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং সকলকে স্বীয় প্রকৃতির পরিণামরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) যথার্থরূপে জানে সে অবিকম্পিত যোগে আমার সহিত যুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতেই সকলের কর্ম ও গতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ আমার ভজনা করেন... এবং আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন এবং আমি তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিই।" ঐ জ্ঞানের স্বরূপ হইতেই, এবং যে যোগসাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশ, অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে পরিণত হয় সেই যোগের স্বরূপ হইতেই এই সকল ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ মানুষের মনের ও কর্মের সকল ভ্রান্তি, তাহার মন, ইচ্ছা, নৈতিক প্রবৃত্তির, তাহার হৃদয়ের, ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের প্রেরণার যত স্খলন, অনিশ্চয়তা ও সন্তাপ, সমুদয়েরই মূল হইতেছে তাহার সম্মোহ; এই সম্মোহ, এই তমসাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তিময় জ্ঞান ও কর্মই মর দেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিমূঢ় মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে সকল বস্তুর দিব্য উৎসটিকে দেখিতে পায়, যখন সে বিশ্বের দৃশ্যমান রূপ হইতে বিশ্বাতীত সদ্বস্তুর দিকে অবিচলিত ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, এবং সেই সদ্বস্তু হইতে আবার এই দৃশ্যমান রূপে ফিরিয়া আসে, তখন সে মন, ইচ্ছা, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের এই সম্মোহ হইতে মুক্তিলাভ করে, জ্ঞানদীপ্ত ও মুক্ত হইয়া বিচরণ করে, অসংমূঢ়ঃ মর্ত্তেষু। প্রত্যেক জিনিসকে তাহার পরম ও যথার্থ স্বরূপে সে দেখে, আর শুধুই তাহার বর্তমান ও আপাতদৃশ্য রূপে নহে; এইভাবে সে প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র ও সম্বন্ধসকল দেখিতে পায়, সে সজ্ঞানে সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করে, তাহাদের মহান্ ও সত্য লক্ষ্য অনুসারে কর্ম করে এবং নিজের অন্তরস্থিত ভগবান হইতে যে শক্তি ও জ্যোতি তাহার

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০।৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১০।৮
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

নিকট আসে তাহার দ্বারাই সে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবেই সে ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে, মন ও ইচ্ছার ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া হইতে, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়প্রেরণা হইতে মুক্ত হয়, আর এই সবই হইতেছে এখানকার সকল পাপ, ভ্রান্তি ও দুঃখের মূল, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে, কারণ এইভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী সত্তার মধ্যে বাস করিয়া সে নিজের ও আর সকলের ব্যষ্টিগত সত্তাকে তাহাদের মহত্তর স্বরূপে দেখিতে পায়, এবং তাহার ভেদাত্মক ও অহমাত্মক ইচ্ছা ও জ্ঞানের মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয়। এইটিই হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তির সার তত্ত্ব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতে মুক্ত পুরুষের যে জ্ঞান তাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সম্বন্ধ-শূন্য নৈব্যক্তিক ভাব চৈতন্য নহে, একটা কিছু-না-করা শান্ত অবস্থা নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের মন ও আত্মার সকল সময়েই এই বোধ, এই সমগ্র অনুভূতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, বিশ্বের ঈশ্বর ভগবান সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া সব কিছুকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছেন, এতাং বিভূতিং মম যো বেত্তি। তিনি জানেন যে তাঁহার আত্মা বিশ্ব-জগতের অতীত সত্তা, কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে, ঐশ্বরিক যোগের দ্বারা তিনি এই বিশ্বের সহিত এক, যোগম্ চ মম। এবং তিনি বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও ব্যষ্টি-সত্তার প্রত্যেকটি দিক পরম সত্যের সহিত যথার্থ সম্বন্ধে দেখেন এবং সবকে ঐশ্বরিক যোগের ঐক্যের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিবেশিত করেন। তিনি আর জিনিসসকলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখেন না—এইরূপ পার্থক্যে দেখিলে কোনো জিনিসেরই সুব্যাখ্যা হয় না অথবা শুধু একটা দিকই দেখা হয়। আবার তিনি যে সকল জিনিসকে গোলমালে একাকার করিয়া দেখেন তাহাও নহে—এরূপ গোলমাল করিয়া দেখার ফল হইতেছে ভ্রান্ত দৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল কর্ম। তিনি বিশ্বাতীত সত্তায় নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি বিশ্বের দ্বন্দ্বে এবং কাল ও ঘটনাচক্রের গন্ডগোলে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হন না। এই সকল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেও তিনি অবিচলিত, তাঁহার আত্মা বিশ্বমাঝে শাশ্বত ও অধ্যাত্মের সহিত অচল অটল নিষ্কম্প যোগে নিবিষ্ট। এই সবের ভিতর দিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, যোগেশ্বরের দিব্য সংকল্পই অব্যর্থভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, এবং তিনি শান্ত বিশ্বব্যাপকত্ব ও সকল বস্তু, সকল প্রাণীর সহিত একত্বের বোধ লইয়া কাজ করেন। আর এই যে-সকল বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, ইহার অর্থ নহে যে, তাঁহার আত্মা ও মন ভেদাত্মক নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ; কারণ তাঁহার

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০।৭

অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তি নীচের প্রাতিভাসিক রূপ ও ক্রিয়া নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে আভ্যন্তরীণ সর্বব্যাপী আত্মা এবং পরম বিশ্বাতীত সত্তা। তিনি তাঁহার প্রকৃতিতে ও সত্তার ধর্মে ভগবানেরই সদৃশ হন, সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, আত্মার বিশ্বব্যাপকত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বাতীত, মন প্রাণ দেহের ব্যষ্টিত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বব্যাপী। এই যোগ একবার সিদ্ধ, অটল, সুদৃঢ় হইলে, তিনি প্রকৃতির যে কোনো ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, যে কোনো মানবীয় অবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যে কোনো বিশ্ব-কর্ম করিতে পারেন, তাহাতে আর তিনি ভগবদ্ আত্মার সহিত ঐক্য হইতে কিছুমাত্র স্খলিত হন না, সর্বভূত মহেশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য মিলন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

ভাব ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান সেই ভগবানের প্রতি শান্ত প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয় যিনি আমাদের ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীত আদিদেব, আর এখানে সকল বস্তুর অধীশ্বর, মানুষের মধ্যে ভগবান, প্রকৃতির মধ্যে ভগবান। প্রথম-প্রথম ইহা হয় শুধু বুদ্ধির একটা জ্ঞান, কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত হয় হৃদয়ের আবেগময় অধ্যাত্মভাব, বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ। হৃদয় ও মনের এই যে পরিবর্তন, ইহাই সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরের সূচনা। এক নূতন আভ্যন্তরীণ জন্ম ও বিকাশ আমাদিগকে আমাদের প্রেম ও ভক্তির পরম পাত্রের সহিত একত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, মদ্ভাবায়। এই যে-ভগবান তখন জগতের সর্বত্র এবং ইহার ঊর্ধ্বে দৃষ্ট হন, তাঁহার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও পূর্ণতায় প্রগাঢ় প্রেমানন্দ, প্রীতি, অনুভূত হয়। মন যে জগতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বাহ্য সুখের সন্ধান করিতেছে, এই গভীরতর আনন্দোল্লাস তাহার স্থান গ্রহণ করে, অথবা বলিতে পারা যায় যে, উহা আর সকল আনন্দকে নিজের মধ্যেই টানিয়া লয় এবং এক অত্যাশ্চর্য রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা মনের ও হৃদয়ের অনুভবসকলকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। সমগ্র চিত্র ভগবদ্‌ময় হইয়া উঠে এবং ভগবদ্ চৈতন্যের সাড়ায় ভরিয়া উঠে; সমগ্র জীবন আনন্দানুভূতির এক সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্ প্রেমিকগণের সরল বাক্য ও চিন্তা হয় পরস্পরের সহিত ভগবদ্ বিষয়ে আলাপন, ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুধাবন। সেই একই আনন্দে সত্তার সকল তৃপ্তি, প্রকৃতির সকল লীলা, সকল সুখ কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তায় ও স্মৃতিতে মুহূর্তে-মুহূর্তে নিত্য মিলন হয়, আত্মার একত্বের অনুভূতি কখনও কোনক্রমে ছিন্ন হয় না। আর যে মুহূর্তে এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরম্ভ হয়, ইহা যখন অপূর্ণ রহিয়াছে তখনও ভগবান পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বারা ইহাকে দৃঢ় করিয়া দেন। তিনি আমাদের মধ্যে ভাস্বর জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলেন ভেদাত্মক মন ও বুদ্ধির অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া দেন, মানবা-

আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হন।* কর্ম ও জ্ঞানের প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের নীচের বিক্ষুব্ধ মানসিক স্তর হইতে সক্রিয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে সাক্ষী আত্মপুরুষের অক্ষর শান্তির মধ্যে উন্নয়ন সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই যে মহত্তর বুদ্ধিযোগ সর্বব্যাপক জ্ঞানের সহিত প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারা এখন মানবাত্মা এক বিশাল আনন্দে সর্ব উদ্ভবকর্তা পরমেশ্বরের সমগ্র লোকাতীত সত্যের মধ্যে উঠিয়া যায়। ব্যষ্টিগত আত্মা ও ব্যষ্টিগত প্রকৃতির মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশ পূর্ণ হয়; ব্যষ্টিগত আত্মা কালাধীন জন্ম হইতে শাশ্বতের অনন্তত্বের মধ্যে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

* মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।৯-১১

অষ্টম অধ্যায়

বিভূতিরূপে ভগবান

এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, অধ্যাত্ম-মুক্তি এবং দিব্যকর্ম সম্বন্ধে গীতা যে শিক্ষা পরিস্ফুট করিতেছিল তাহার সহিত গীতার দার্শনিক তত্ত্বগত সমন্বয়ের বিবৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্জুনের বুদ্ধিতে ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন; মনের অনুসন্ধান ও হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাকে পরম ও বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে, পরম ও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপে, আমাদের জীবনের অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে গোচর করান হইয়াছে; মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি তাঁহাকেই অজ্ঞান কুহেলিকার ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল। এখন কেবল বাকী রহিয়াছে বহুল-রূপী বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ, তাহা হইলেই দিব্য প্রকাশনটির নানা দিকের আর একটি দিক পূর্ণ হইবে।

তাত্ত্বিক সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আত্মাকে নীচের প্রকৃতি হইতে পৃথক করিবার জন্য সাংখ্যকে স্বীকার করা হইয়াছে, এই পার্থক্য সাধন করিতে হইবে বিবেকবুদ্ধির ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ গুণত্রয়ের বশ্যতা হইতে উপরে উঠিয়া। পরম পুরুষ ও পরাপ্রকৃতির ঐক্য উদারভাবে প্রকট করিয়া সাংখ্যকে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করা হইয়াছে। অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাকৃত ভেদাত্মক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া উঠে তাহার আত্মবিলোপ সাধনের জন্য দার্শনিকদের বেদান্তকে স্বীকার করা হইয়াছে। উদার নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকতার নিরসন করিতে, ব্রহ্মের ঐক্যে ভেদাত্মক ভ্রান্তির ধ্বংস করিতে এবং অহংয়ের অন্ধ দৃষ্টির পরিবর্তে সর্বভূতকে এক আত্মায় এবং আত্মাকে সর্বভূতে দেখিবার সত্যতর দৃষ্টি লাভ করিতে বেদান্তের প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বেদান্তের সত্যকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পরব্রহ্মকে নিরপেক্ষ-ভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তাহা হইতে সচল ও অচল, ক্ষর ও অক্ষর, কর্ম ও অকর্ম উভয়ই উদ্ভূত। ইহার মধ্যে যে-সকল সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়া সম্ভব সে-সব অতিক্রম করিতে পরমপুরুষ ও ঈশ্বরকে নিগূঢ়ভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তিনিই সমস্ত প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইতেছেন, সকল ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সকল কর্মেই তাঁহার প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইচ্ছাশক্তি, মন ও হৃদয়কে, সমগ্র আভ্যন্তরীণ সত্তাকে

ঈশ্বরের নিকট, প্রকৃতির দিব্য অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিবাব জন্য যোগকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্বের পরম অধীশ্বরকে আদিদেব বলিয়া প্রকট করা হইয়াছে, জীব প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক সত্তা, মমৈবাংশ। এক অখণ্ড অধ্যাত্ম ঐক্যের জ্যোতিতে সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া অন্তরাত্মার যে-দৃষ্টি তাহার দ্বারা এই যোগের সকল সম্ভাব্য সংকীর্ণতা অতিক্রমিত হইয়াছে।

ফলে হইয়াছে ভগবদ্-সত্তা সম্বন্ধে এক অখণ্ড দৃষ্টি, তাহা একই সঙ্গে বিশ্বের বিশ্বাতীত উৎপত্তিস্থল স্বরূপ পরম সত্তা, বিশ্বের শান্ত আধার স্বরূপ সর্বভূতের নিরূপাধিক আত্মা, আবার সকল জীবে, ব্যক্তিতে, দ্রব্যে, শক্তিতে, গুণে অনুস্যূত ভগবান; সেই অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কার্যকরী প্রকৃতি এবং আন্তর ও বাহ্য রূপায়ণ। এক অদ্বিতীয়কে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখিয়া ও জানিয়াই জ্ঞানযোগ তাহার পরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কর্মযোগ তাহার পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিয়াছে সকল কর্মকে তাহাদের অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারণ প্রাকৃত যে মানব সে এখন কেবল তাঁহার ইচ্ছার একটি যন্ত্রমাত্র, নিমিত্ত মাত্র। ভক্তি-যোগের প্রশস্ততম রূপগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির প্রগাঢ় সমন্বয় আত্মার সহিত পরমাত্মার ঊর্ধ্বতম মিলনকে পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে। সেই মিলনে জ্ঞানের প্রকাশসকল যেমন বুদ্ধির নিকটে তেমনিই হৃদয়ের নিকটেও সত্য হইয়া উঠে। সেই মিলনে যন্ত্ররূপে কর্ম করার দুষ্কর আত্মবলি এক জীবন্ত ঐক্যের সহজ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র পন্থাটি দেওয়া হইয়াছে; দিব্য কর্মের সমগ্র ভিত্তিটি রচিত হইয়াছে।

দিব্যগুরু এইরূপে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জুনকে দিলেন, অর্জুন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহার মন ইতিমধ্যেই সংশয় ও অন্বেষণ হইতে মুক্ত হইয়াছে; তাঁহার হৃদয় এখন জগতের বাহ্য দিক হইতে, ইহার বিভ্রান্তকারী বাহ্য দৃশ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার পরম অর্থ ও উৎপত্তির দিকে, ইহার আভ্যন্তরীণ সত্যসকলের দিকে ফিরিয়াছে, ইতিমধ্যেই শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এবং এক দিব্য দৃষ্টির অনির্বচনীয় আনন্দের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। অর্জুন যে ভাষায় তাঁহার স্বীকৃতি ব্যক্ত করিলেন তাহাতে পুনরায় এই জ্ঞানের সুগভীর সমগ্রতা এবং ইহার সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে অবতার, নর-রূপী ভগবান, তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, প্রথমত, তাঁহাকে তিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; তিনি বিশ্বাতীত সর্বাত্মক সত্তা, পরাৎপর; জীব যখন এই ব্যক্তজগৎ ও এই আংশিক প্রকাশ হইতে উঠিয়া তাহার মূলে ফিরিয়া যায় তখন সে

তাঁহার মধ্যে বাস করে, পরং ধাম।* তাঁহাকে তাঁহার চিরমুক্ত সত্তার পরম পবিত্রতায় তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন, পবিত্রম্ পরমম্; আত্মার অক্ষর চিরশান্ত ও স্থির নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে অহংকে লুপ্ত করিয়া দিয়া মানুষ এই পরম পবিত্রতায় উপনীত হয়। তাহাব পর তিনি তাঁহাকে শাশ্বত সনাতন দিব্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যং। তাঁহার মধ্যেই তিনি আদিদেবকে অভিবাদন করিলেন, যে অজাত পুরুষ সকল বিশ্বের সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী আত্ম-প্রসারী প্রভু তাঁহার স্তব করিলেন, আদি-দেবমজং বিভুম্। যিনি সকল বর্ণনার অতীত, কারণ কিছুই তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ,† কি দেব, কি দানব কেহই তাঁহার অভিব্যক্তি জানে না, সেই আশ্চর্যময় পুরুষ-রূপেই যে তিনি তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তিনি তাঁহাকে সর্বভূতের অধীশ্বর এবং তাহাদের সকল রূপায়নের এক দিব্য কারণ বলিয়াও মানিয়া লইলেন, তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি, তিনি জগতের পতি, ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার পরম ও বিশ্বগত প্রকৃতির দ্বারা ইহাকে প্রকট করিতেছেন, পরিচালনাও করিতেছেন, ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।* অবশেষে তিনি তাঁহাকে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সেই বাসুদেব বলিয়া মানিয়া লইলেন যিনি তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী সর্বত্র-বিরাজিত সর্ব-সংগঠনকারী বিভূতি। সকলকে আশ্রয় করিয়া ইহ-সংসারের সকল বস্তু হইয়াছেন।†

এই সত্যকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আনুগত্য দিয়া, তাঁহার বুদ্ধির ধারণা দিয়া। এই জ্ঞানে এবং এই আত্মসমর্পণের সহিত ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম করিতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু এক স্থায়ী গভীরতর অধ্যাত্ম অনুভূতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে ও ইচ্ছায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই যে সত্য ইহা কেবল পরম-পুরুষের কাছে তাঁহার নিজের আত্মজ্ঞানেই প্রকট—কারণ অর্জুন বলিয়া উঠিলেনঃ "কেবল তুমি, হে পুরুষোত্তম, নিজেকে দিয়া নিজেকে জান", স্বয়মে-বাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। এই যে জ্ঞান ইহা আসে আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যের

* পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১০।১২
† সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১০।১৪
* স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥
† বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০।১৫-১৬

দ্বারা এবং প্রাকৃত মানবের হৃদয় ইচ্ছা বুদ্ধি বিনা সহায়ে নিজেদের ক্রিয়া দ্বারা ইহা লাভ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল অসম্পূর্ণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া পাইতে পারে, তাহাতে যত প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা আবরিত ও বিকৃত হয় অধিক। এই গুহ্য বিদ্যা শুনিতে হয় সেই সব ঋষির নিকট হইতে যাঁহারা সাক্ষাৎ সত্যকে দেখিয়াছেন, ইহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং সত্তায় ও আত্মায় ইহার সহিত এক হইয়াছেন। "সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন!" * অথবা যে অন্তর্যামী ভগবান আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের জ্বলন্ত দীপ তুলিয়া ধবেন তাঁহার নিকট হইতে দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি সহায়ে এই সত্যকে অন্তবেব মধ্যেই লাভ করিতে হয়। স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে, "এবং তুমি স্বয়ং আমাকে এইরূপ বলিতেছ।" একবার এই সত্য প্রকটিত হইলে মনের সম্মতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি এবং হৃদয়ের আনন্দ ও আনুগত্যসহ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে; পরিপূর্ণ মানসিক শ্রদ্ধা এই তিনটিকে লইয়াই গঠিত। অর্জুন ঠিক এইভাবেই সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছেন; সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব, "হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে আমার মন সে সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।" কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রয়োজন আমাদের নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তায় এই সত্যকে আয়ত্ত করা; আমাদের অন্তরতম অন্তরাত্মা চায় অলঙ্ঘনীয় অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি—মানসিক অনুভূতি তাহাব কেবল উপক্রমণিকা বা ছায়ামাত্র, এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অনন্তের সহিত পূর্ণ মিলন হওয়া সম্ভব নহে।

সেই উপলব্ধি কেমন করিয়া লাভ করা যায় অর্জুনকে সেই পন্থাই দেওয়া হইতেছে। আর মহান স্বতঃসিদ্ধ যে-সব দিব্য তত্ত্ব, সে-সব মনকে বিভ্রান্ত করে না। পরম পুরুষ ভগবানের ধারণা, অক্ষর পুরুষের অনুভূতি, সর্বত্র চৈতন্যময় অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ. চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের স্পর্শ—এই সবের দিকে মন নিজেকে উন্মুক্ত করিতে পারে। একবার মন এই ধারণায় উদ্ভাসিত হইলে, মানুষ সহজেই পথটি অনুসরণ করিতে পাবে এবং প্রথম-প্রথম সাধারণ মানসিক অনুভূতি উপলব্ধি সকলের উপরে উঠা যতই কঠিন হউক, শেষ পর্যন্ত আত্মার অনুভূতিতে সেই সকল মূল সত্যে পৌঁছিতে পারে; যাহারা আমাদের সত্তার এবং সর্বভূতের সত্তার পশ্চাতে রহিয়াছে, আত্মনা আত্মনম্। সে সহজেই ইহা পারে কারণ এই সকল জিনিস একবার ধারণা করিতে পারিলেই স্পষ্ট সে-সবকে দিব্য সত্য বলিয়া বুঝিতে

* আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১০।১৩

পারা যায়; আমাদের মানসিক সংস্কারাদির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ভগবানের এই সব উচ্চভাবকে স্বীকার করার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু কঠিন হইতেছে জগৎ বস্তুত যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহার মধ্যেই ভগবানকে দেখা, প্রকৃতির এই বাস্তব সত্যের মধ্যে এবং এই সব ঘটনাপরম্পরার ছদ্মবেশের মধ্যে তাঁহার সন্ধান পাওয়া; কারণ এখানে সবই এই মহান্ ঐক্য-সাধক ভাবের বিরোধী। কেমন করিয়া আমরা মানিয়া লই যে ভগবান রহিয়াছেন মানুষে, পশুতে, জড়পদার্থে ? উত্তমে ও অধমে ? মধুরে ও ভীষণে ? শুভে ও অশুভে ? ভগবান বিশ্বের সকল পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ কোন ধারণা লইয়া যদি আমরা তাঁহাকে জ্ঞানের আদর্শ আলোকের মধ্যে, শক্তির মহত্ত্বের মধ্যে, সৌন্দর্যের মনোহারিত্বের মধ্যে, প্রেমের কল্যাণকারিতার মধ্যে, আত্মার উদাব বিশালতার মধ্যে, তাহা হইলে এই সকল মহৎ জিনিসের সহিত ইহাদের বিপরীত যে-গুলি বাস্তবে জড়িত রহিয়াছে, ইহাদিগকে ঢাকিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সেই ঐক্যবোধ বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা আমরা কেমন করিয়া নিবারণ করিব ? আর যদি মানবীয় মন ও প্রকৃতির অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা ভগবানকে দেখিতে পারি, তাহা হইলে যাহারা তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, আমরা ভগবদ্‌বিরোধী বলিতে যাহা বুঝি, যাহারা কর্মে ও বাস্তবে তাহারই প্রতিনিধি, তাহাদের মধ্যে আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে দেখিব ? যদি সাধু-সজ্জনের মধ্যে নারায়ণকে দেখা সহজ হয়, পাপীর মধ্যে, দুরাচারীর মধ্যে, পতিতা ও অন্ত্যজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা কেমন করিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে ? জগতের সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে পরম পবিত্রতা ও ঐক্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানীকে দৃঢ়-স্বরেই বলিতে হয় নেতি, নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়। যদিও জগতের অনেক জিনিসেই আমরা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সায় দিতে পারি এবং বিশ্ব-মাঝে ভগবান রহিয়াছেন স্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলেও অধিকাংশ জিনিসের সম্মুখেই মন কি পুনঃ-পুনঃ বলিবে না, “ইহা নয়, ইহা নয়” ? মানব মন সর্বদা বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে এখানে বুদ্ধির স্বীকৃতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। অন্তত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশন প্রয়োজন, কতকগুলি এমন সূত্র ও সেতু প্রয়োজন যাহা ঐক্যবোধের কঠিন প্রয়াসের সহায় হইবে।

অর্জুন এইরূপ সহায় ও নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, যদিও তিনি বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্বম্, এই দিব্য সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ইহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে (কারণ ইতি-মধ্যেই তিনি দেখিতেছেন যে এই সত্য তাঁহার মনের বৈকল্য ও ভেদবৈষম্য সকল হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতেছে, বিরোধসঙ্কুল জগতের সমস্যাসকলের

দ্বারা বিভ্রান্ত তাঁহার সেই মন একটি সূত্র খুঁজিতেছিল, একটি দিশারী সত্যের সন্ধান করিতেছিল; এবং তাঁহার শ্রবণে ইহা অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, তৃপ্তির্হি নাস্তি মেঽমৃতম্)। তিনি অনুভব করিতেছেন যে পূর্ণ ও সুদৃঢ় উপলব্ধির দুরূহতা দূর করিবার জন্য ঐরূপ নিদর্শন ও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ তাহা না হইলে এই জ্ঞানকে কেমন করিয়া হৃদয়ের এবং জীবনের জিনিস করিয়া তোলা যাইবে? তিনি সহায়ক নিদর্শন সকল জানিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দিব্য বিভূতিসকল সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন, প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে কিছুই না বাদ পড়ে, আর যেন কিছুর দ্বারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত হইতে না হয়। * তিনি বলিলেন, "তুমি যে-সকল বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তোমার সেই দিব্য আত্মবিভূতিসকল নিঃশেষে সমস্ত বর্ণনা কর। হে যোগিন্! আমি সদা সর্বত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে জানিব? হে ভগবান! কি কি প্রধান-প্রধান ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব? এই যোগের দ্বারা তুমি সবের সহিত এক এবং সবের মধ্যে এক এবং সব তোমারই সত্তার পরিণাম, সবই তোমার প্রকৃতির ব্যাপক বা প্রকৃষ্ট বা প্রচ্ছন্ন শক্তি, সেই যোগ আমাকে বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর এবং বার বার বল; আমার নিকটে ইহা অমৃত স্বরূপ, আমি যতই ইহা শ্রবণ করি না কেন, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না।" এখানে আমরা গীতার মধ্যে একটা জিনিসের ইঙ্গিত পাইতেছি, যেটি গীতা কোথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে পুনঃ-পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে এবং পরে তাহা বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্মের দ্বারা গভীরতর দৃষ্টির সহিত বিকশিত হইয়াছিল —জগৎ মাঝে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাতে মানুষের আনন্দলাভের সম্ভাবনা, বিশ্বানন্দ, জগজ্জননীর লীলা, ভগবদ্ লীলার মাধুরী ও সৌন্দর্য।

দিব্যগুরু শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে। কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁহার প্রকাশও অনন্ত। তাঁহার প্রকাশের রূপসকলও অসংখ্য। প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগবদ্ শক্তির প্রতীক, বিভূতি, যাঁহাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তুই আপন-আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে আমার দিব্য বিভূতি-

* বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১০।১৬-১৮

সকল বর্ণনা করিব, তবে কেবল নিদর্শন হিসাবে প্রধান-প্রধান বিভূতির কয়েকটি মাত্র বলিব; এমন কতকগুলি জিনিসের দৃষ্টান্ত দিব যে-সবের মধ্যে তুমি খুব সহজেই ভগবানের শক্তি দেখিতে পাইবে, প্রাধান্যতঃ, উদ্দেশতঃ।* কারণ জগতে ভগবানের আত্মবিস্তারের অন্ত নাই, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গুরু বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, বর্ণনার শেষেও আবার তাহার উল্লেখ করিলেন এইটির উপর বিশেষ ভাবে জোর দিবার জন্য যেন এ-সম্বন্ধে আর কোনও ভুল না হইতে পারে। তাহার পর এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত আমরা পাই এই সকল প্রধান-প্রধান দৃষ্টান্তের, জগতের মানুষ ও জিনিসসকলের মধ্যে যে ভগবদ্ শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার এই সব প্রকৃষ্ট লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রথমে মনে হয় যেন সেগুলি এলোমেলো-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও পারম্পর্য নাই; তথাপি সেই বর্ণনায় একটি বিশেষ সূত্র অনুসরণ করা হইয়াছে, যদি আমরা একবার সেই সূত্রটিকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এখানকার বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ ও পরিণতি বুঝার পক্ষে সাহায্য হইবে। এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, বিভূতি যোগ, এ-যোগটি অপরিহার্য। ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ-অশুভ পূর্ণতা-অপূর্ণতা, আলো-আঁধার, ভগবানের সকল বিভূতির সহিতই সমানভাবে আমাদিগকে ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একটা উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তুসকলের মধ্যে ভগবানের আত্ম-প্রকাশের একটা ক্রমবর্ধমান শক্তি রহিয়াছে, একটি এমন স্তরবিন্যাসের রহস্য রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে নীচের ছদ্মবেশসকল হইতে ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া যাহা এই বিশ্বপ্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইটি এই যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাকে সেখানে আবিষ্কার করা যায়; তিনি সকল জীব, সকল বস্তুর মন ও হৃদয় গুহায় বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবন-ধারার মর্মস্থলে অন্তরাত্মা, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে তিনি সে-সবেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত।* কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ দিব্য

* হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥
*অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০।১৯-২০

আত্মা মন ও হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের অগোচরে বাস করিতেছেন, এই যে জ্যোতির্ময় অন্তর্বাসী তাহারই প্রতিনিধিরূপে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার অগোচর, ইনিই নিরন্তর কালের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের বিকাশ করিতেছেন এবং দেশের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক জীবনের বিকাশ করিতেছেন—কাল ও দেশ আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভাবাত্মক গতি ও বিস্তার। সবই এই আত্মদর্শী আত্মা, আত্মবিকাশশীল অধ্যাত্ম সত্তা। কারণ, সর্বদা সকল জীবের মধ্য হইতে, সকল চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্য হইতে, এই চিন্ময় পুরুষ নিজের প্রকট সত্তাকে গুণে ও শক্তিতে বিকশিত করিতেছেন, তাহাকে বস্তুসকলের নানা রূপে, আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে, জ্ঞানে, বাক্যে, চিন্তায়, মনের সৃষ্টিতে এবং কর্মীর ভাবাবেগ ও কর্মে, কালের গতিক্রমে, বিশ্বের শক্তিপুঞ্জে ও দেবতায় এবং প্রকৃতির শক্তিসকলে, উদ্ভিদ-জীবনে, পশু-জীবনে, মানব-জীবনে এবং অতিমানব-জীবনে বিকশিত করিতেছেন।

আমরা যদি সকল জিনিস এই জ্ঞানের চক্ষু লইয়া দেখি, গুণ ও পরিমাণের ভেদ বৈষম্যের দ্বারা অথবা শক্তির তারতম্য বা প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত না হই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সকল জিনিসই বস্তুত এই প্রকটনের শক্তি এবং ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছুই হইতে পারে না, তাহারা এই বিশ্বাত্মা বিশ্বপুরুষের বিভূতি, এই মহাযোগীর যোগ, এই আশ্চর্যময় আত্মস্রষ্টার সৃষ্টি। জগতে তাঁহার অসংখ্য আত্মপ্রকাশের তিনিই অজাত এবং সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, অজঃ, বিভুঃ; সব জিনিসই তাঁহার আত্মপ্রকৃতিতে তাঁহারই শক্তি ও কর্ম, তাঁহারই বিভূতি। তিনি তাহাদের সব কিছুর মূল, তাহাদের আদি; তাহাদের চির-পরিবর্তমান অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তাহাদের মধ্য; আবার তিনিই তাহাদের অন্ত, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসকালে তাঁহারই মধ্যে পরম গতি লাভ করে বা লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি নিজের চৈতন্য হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন এবং তাহাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, তিনি তাহাদিগকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া লন এবং তাহারা কিছুকালের জন্য বা চিরকালের জন্য তাঁহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। আমাদের নিকট যাহা প্রতিভাত হয় তাহা কেবল সেই অদ্বৈত একের আত্মপ্রকাশের একটি শক্তি, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যাহা লুপ্ত হয় তাহা কেবল একের সেই আত্মপ্রকাশ শক্তির ক্রিয়া মাত্র। সকল শ্রেণী, গণ (Genus), প্রজাতি (Species), ব্যক্তি এইরূপ বিভূতি। কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মপ্রকাশের শক্তির ভিতর দিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, সেই জন্য যাহা কিছু বিশেষ গুণসম্পন্ন অথবা বিশেষ শক্তির সহিত কার্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহার মধ্যেই ভগবান বিশেষভাবে প্রকট। আর সেই জন্যই প্রত্যেক শ্রেণীর জীবে আমরা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে

পাই তাহাদেরই মধ্যে, যাহাদের মধ্যে সেই শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রকৃতি শ্রেষ্ঠভাবে, উৎকৃষ্টভাবে, সর্বাপেক্ষা সার্থকতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সবকেই বিশেষ অর্থে বিভূতি নামে অভিহিত করা হয়। তথাপি সর্বোচ্চ শক্তি এবং প্রকাশ অনন্তের অতি ক্ষুদ্র আভাস মাত্র; এমন কি সমগ্র বিশ্ব তাঁহার মহত্ত্বের একটি মাত্র কণায় অনুপ্রাণিত, তাঁহার জ্যোতির একটি মাত্র রশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত, তাঁহার আনন্দ ও সৌন্দর্যের ক্ষীণ আভাসমাত্র লাভ করিয়া মহিমান্বিত। সংক্ষেপে ইহাই হইতেছে বিভূতি বর্ণনার সারাংশ, ইহা হইতে আমরা এই ফলই লাভ করি, এইটিই নিগূঢ় অর্থ।

ভগবান অবিনশ্বর অনাদি অনন্ত কাল; এইটাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বিভূতি, সমস্ত জগৎলীলার মূল তত্ত্ব, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ। সেই কালের ও প্রকাশের লীলায় ভগবান বস্তু সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং আপন-আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহার এই সকল কার্যের দ্বারা তিনি দিব্যশক্তিময় ধাতারূপে আমাদের ধারণায় বা অনুভূতিতে প্রতীয়মান হন। আবার দেশরূপে তিনিই সকল দিক হইতে আমাদের সম্মুখীন হন, লক্ষ-লক্ষ তাঁহার শরীর, অসংখ্য তাঁহার মন, সর্বভূতে তিনি প্রকাশমান; আমরা আমাদের সকল দিকে তাঁহারই মুখ দেখিতে পাই, ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ। কারণ এই যে, কোটি-কোটি জীব ও বস্তু সকলের মধ্যে, সর্ব্বভূতেষু, একই সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে তাঁহার আত্মা এবং চিন্তা ও শক্তির রহস্য, তাঁহার দিব্য সৃজন-প্রতিভা, তাঁহার আশ্চর্যময় গঠন-নৈপুণ্য এবং সম্বন্ধ, সম্ভাবনা এবং অনিবার্য কার্যকারণ-পরম্পরা নির্ধারণের অভ্রান্ত নীতি। আবার তিনি জগতে সর্ব-সংহারকর্তা মৃত্যুরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, মনে হয় তিনি যেন সৃষ্টি করিতেছেন শুধু শেষকালে তাঁহার সৃষ্টিসকলকে ধ্বংস করিবার জন্যই, অহম্ মৃত্যুঃ সর্ব্বহরঃ। অথচ তাঁহার প্রকটন শক্তির কার্য বন্ধ হয় না, কারণ পুনর্জন্ম এবং নবসৃষ্টির শক্তি মৃত্যু ও ধ্বংসের সহিত সমান গতিতে চলিয়াছে, অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্। সর্বভূতের অন্তর্নিহিত যে দিব্য আত্মা তাহাই বর্তমানকে ধরিয়া রহিয়াছে, অতীতকে সংহরণ করিতেছে, ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছে।

তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্বদেবতা, অতিমানব, মানব এবং মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং এই সকল গুণ, শক্তি, বস্তুর মধ্যে—প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষস্বরূপ, গুণে সর্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি। ভগবান বলিলেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রগণের মধ্যে শিব, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে রণদেবতা স্কন্দ, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে ধনপতি কুবের, নাগগণের মধ্যে

অনন্ত নাগ, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জনয়িতাদের মধ্যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, নিয়মস্থাপয়িতাগণের মধ্যে নিয়মের দেবতা যম বায়ুগণের মধ্যে পবনদেবতা। আবার অন্যদিকে আমি জ্যোতি ও দীপ্তি-গণের মধ্যে জ্যোতির্ময় সূর্য, নিশার নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, তরঙ্গায়িত জলাশয সমূহের মধ্যে সাগর, শিখরগণের মধ্যে সুমেরু, পর্বতমালা সমূহের মধ্যে হিমালয়, নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে দিব্যাস্ত্র বজ্র। সকল লতা বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, অশ্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকী, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, অরণ্যের পশুগণের মধ্যে সিংহ। আমি বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), ঋতুসমূহের মধ্যে আমি সুন্দরতম বসন্ত ঋতু।

ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদিগকে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হয়। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, মনের দ্বারাই তাহারা বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাহাদের মনের, চরিত্রের, শরীরের, কর্মের সকল গুণই আমি। আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা; তেজস্বিগণের তেজ আমি, বলবানগণের বল আমি। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ও জয়; আমি পুণ্যবানগণেব সত্ত্বগুণ, চতুর-গণের দ্যুত ছল, আমি শাসকদের শাসন দন্ড, জিগীষুদের নীতি। আমি গুহ্যবিষয় সমূহের মধ্যে মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান, তার্কিকের তর্কবুদ্ধি। অক্ষর-সমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাস-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ, বাক্য-সমূহের মধ্যে পূত একাক্ষর ওঁ-কার, ছন্দ-সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, বেদ-সমূহের মধ্যে সামবেদ এবং মন্ত্র সমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম। আমি গণকদের মধ্যে কাল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। মানুষের যাবতীয় সামর্থ্য আমি, বিশ্বের এবং বিশ্বের অন্তর্গত জীবসকলের যাবতীয শক্তি আমি।

যাহাদের মধ্যে আমার শক্তিসকল মানবীয় সিদ্ধির উচ্চতম সীমায় উঠে, তাহারা সর্বদা আমিই, আমার বিশেষ বিভূতি। আমি নরগণের মধ্যে নরাধিপ, নেতা, বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যোদ্ধাগণের মধ্যে আমি রাম, বৃষ্ণিগণের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি আমার বিভূতি; মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। মহান্ দ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত কবি যিনি ভাবের আলোকে এবং বাক্যের ধ্বনিতে সত্যকে দেখেন এবং প্রকট করেন, তিনিও আমি, মানবাধারে আমারই জ্যোতি; দ্রষ্টাকবিগণের মধ্যে আমি উশনা। মহৎ মুনি, মনীষী,

দার্শনিক মানুষের মধ্যে আমারই শক্তি, আমারই বৃহৎ মনীষা; মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। কিন্তু প্রকাশ-ক্রমের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সকল জিনিসই আপন-আপন ভাবে ও প্রকৃতিতে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি; আমা ব্যতীত জগতে স্থাবর-জঙ্গম, সজীব-নির্জীব, কিছুই থাকিতে পারে না। সর্বভূতের আমি দিব্য বীজ, এবং সকলে সেই বীজেরই শাখা ও পুষ্প; আত্মার বীজরূপে যাহা আছে, তাহাই তাহারা প্রকৃতিতে বিকাশ করিতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিসকলের সীমা সংখ্যা নাই; আমি যাহা বলিলাম ইহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আমি কেবল কতকগুলি প্রধান-প্রধান ইঙ্গিতের আলোক দিয়াছি, এবং দৃঢ়ভাবে অসংখ্য সত্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি। জগতের সুন্দর ও শ্রীমান যত জীব দেখিবে, মানবজাতির মধ্যে, তাহার ঊর্ধ্বে এবং তাহার নীচে যাহাকেই দেখিবে মহান এবং শক্তিমান, তাহাকে আমার প্রভা, জ্যোতি, শক্তি বলিয়া এবং আমারই সত্তার তেজোময় অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অত খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে আমি এই জগতে এবং সর্বত্র বিরাজ করিতেছি, আমি সকলের মধ্যে আছি এবং সকলের উপাদান; আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাকে ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি এই সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছি আমার অসীম শক্তির একটি মাত্রার দ্বারা, আমার অমেয় অধ্যাত্ম সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। এই সকল জগৎ শাশ্বত অপরিমেয় ভগবানের স্ফুলিঙ্গ, ইঙ্গিত, স্ফুরণ মাত্র।

নবম অধ্যায়

বিভূতি তত্ত্ব

গীতায় দশম অধ্যায়টি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। যে মতবাদ সংসারের জীবন হইতে চরম মুক্তি চায়, মানব আত্মাকে সংসার-লীলা হইতে বিমুখ করিয়া বিশ্বের অতীত, সকল সম্বন্ধের অতীত সুদূর নিরুপাধিক সত্তার দিকে লইতে চায়, গীতার মধ্যে কেবল সেই মতবাদের সমর্থন খুঁজিতে গেলে এই দশম অধ্যায়ের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা বুঝা যায় না। মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন—এই মহান সত্যই গীতার বাণী। তিনি ক্রমবর্ধমান যোগশক্তির বলে নীচের প্রকৃতির মায়া-আবরণ সরাইয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন, মানবাত্মার সকাশে নিজের বিশ্ব-সত্তা প্রকট করেন, তাঁহার বিশ্বাতীত পরম সত্যসকল প্রকট করেন, মানুষের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যেই যে তিনি রহিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেন। এই যে দিব্যযোগ, মানুষের ভাগবত সত্তায় গড়িয়া উঠা, মানবাত্মার মধ্যে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, ইহারই ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া এক দিব্য মানবতার ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিতে উঠিতে সক্ষম হই। মর্ত্যজীবনের জালে, গুণত্রয়ের জটিল বন্ধনে নহে, পরন্তু সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মে ভগবানের সহিত এক হইয়া এবং নিজের সমস্ত সত্তাকে ভগবানে অর্পণ করিয়া মানুষ চরমতম বিশ্বাতীত গতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু আবার সংসারের মধ্যেও কর্ম করিতে পারে; সে কর্ম তখন আর অজ্ঞানের কর্ম থাকে না, ভগবানের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সত্য সম্বন্ধে, আত্মার সত্যে, পূর্ণ অমৃতত্বে সে কর্ম করা হয়; সে কর্ম আর অহংয়ের জন্য সম্পাদিত হয় না, পরন্তু জগতে ভগবানের জন্যই সম্পাদিত হয়। অর্জুনকে এই কর্মের জন্য আহ্বান করা, সে নিজে কি সত্তা ও শক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়া কোন্ মহান সত্তা ও শক্তির ইচ্ছা কার্য করিতেছে তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া, ইহাই মানবদেহধারী ভগবানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান কৃষ্ণ তাহার রথের সারথি হইয়াছেন; এই জন্যই অর্জুনের গভীর বিষাদ আসিয়াছিল, মানুষ সাধারণত যে-সব ক্ষুদ্র বাসনা ও আদর্শ লইয়া কার্য করে সে-সবের প্রতি তাহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সে-সবের পরিবর্তে তাহাকে উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রেরণা দিবার জন্য ভগবান কুরুক্ষেত্রে, অর্জুনের ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পরম মুহূর্তে

তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য এবং যুদ্ধ করিতে ভগবদ্ আদেশ শুনাইবার জন্য এতক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখন সেই সময় আসন্ন; কিন্তু এই অধ্যায়ে বিভূতি-যোগের ভিতর দিয়া তাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইবে, ইহা না হইলে অর্জুন তাঁহার প্রকৃত কর্ম বুঝিতে পারিতেন না।

বিশ্ব-লীলার যে নিগূঢ় রহস্য, গীতাতে তাহা আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আংশিকভাবে, কারণ সে-রহস্যের অনন্ত গভীরতাসকল কে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ করিতে পারে? কোন্ মতবাদ, কোন্ দর্শন-শাস্ত্র বলিতে পারে যে, এই অত্যাশ্চর্য বিশ্ব-লীলার সমস্ত মর্ম অল্প-পরিসরের মধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে কিংবা একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যেই নিঃশেষে ধরিয়া দিয়াছে? কিন্তু গীতার যাহা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, গীতা তাহা প্রকাশ করিয়াছে। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, জগৎ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে; সর্বভূত সকল সৃষ্টি মূলত এক। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির অজ্ঞানে আবদ্ধ মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি, মানুষ কেমন করিয়া আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়, এক মহত্তর চৈতন্যে নবজন্ম লাভ করে, নিজেরই উচ্চতর অধ্যাত্ম-সত্তায় উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন প্রাথমিক অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া এই নূতন আত্মদৃষ্টি ও চেতনা লাভ করা যায়, তখন সেই মুক্তপুরুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জগৎকে কি চক্ষে দেখিবে? যে বিশ্ব-লীলার মূল রহস্য সে পাইয়াছে, সেই বিশ্ব-লীলার প্রতি তাহার ভাব, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? প্রথমেই সে সর্বভূতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানের চক্ষুতেই সব কিছুকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, তাহার চারিপাশে যাহা কিছু রহিয়াছে সে সব একই ভাগবত সত্তার অংশ, রূপ, শক্তি। তখন হইতে সেই দৃষ্টিই হইবে তাহার চেতনার সমস্ত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রচেষ্টার আরম্ভ; ইহাই হইবে তাহার সকল কর্মের মূল দৃষ্টি, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা। সে দেখিবে সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব সেই একের মধ্যেই বাস করিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম করিতেছে, সেই দিব্য ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু সে আরও দেখিবে যে, সেই এক ভগবান সকলের মধ্যেই অধিবাসী, সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই মূল অধ্যাত্ম সত্তা; তিনি তাহাদের চেতন প্রকৃতিতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা আদৌ বাঁচিতে পারিত না, চলিতে, ফিরিতে বা কর্ম করিতে পারিত না, তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, অনুমতি বা প্রশ্রয় ব্যতীত মুহূর্তের জন্যও তাহাদের বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সম্ভব হইত না। সে দেখিবে যে, তাহারা নিজেরাও, তাহাদের আত্মা, মন, প্রাণ, শরীরাধার এ-সব সেই এক আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তারই শক্তি ও ইচ্ছার

পরিণাম। তাহার কাছে সমস্তই হইবে সেই এক বিশ্বপুরুষের সম্ভূতি (becoming)। সে দেখিবে যে, তাহাদের চেতনা সমগ্রভাবেই সেই বিশ্ব-পুরুষের চেতনা হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদের শক্তি ও সংকল্প সেই পুরুষেরই শক্তি ও সংকল্প হইতে আহৃত এবং তাঁহারই আশ্রিত; তাহাদের আংশিক প্রকৃতি এখন যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে তাহা ভগবানের প্রকাশ বা ছদ্মবেশ, রূপ বা বিকৃতি যাহাই মনে হউক না কেন, সে দেখিবে যে তাহা সেই বিশ্ব-পুরুষের মহত্তর দিব্য প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট। বাহ্যত বস্তুসকল যেমনই বিসদৃশ বা বিশৃঙ্খল দেখা যাউক, যেমনই দুর্বোধ্য হউক, তাহারা আর তাহার এই দৃষ্টির পূর্ণতাকে কিছুতেই এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিবে না বা তাহার বিরোধী হইবে না। সে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছে, এইটিই তাহার মূল ভিত্তি, তাহার চতুর্দিকে এই জ্যোতির প্রকাশ অপরিহার্য, এইটিই যথার্থ দৃষ্টির একমাত্র সিদ্ধ পন্থা, এক সত্য যাহা দ্বারা অন্য সকল সত্যই সম্ভব হয়।

কিন্তু জগৎ ভগবানের কেবল আংশিক প্রকাশ, ইহা নিজেই ভগবান নহে। প্রাকৃত প্রকাশ যেমনই হউক না কেন, ভগবান তাহা হইতে অনন্ত গুণে বড়। সকল বন্ধনের অতীত তাঁহার এই আনন্ত্যে তিনি এত উচ্চে রহিয়াছেন যে, যত প্রকারেরই জগৎ হউক না কেন, বিশ্ব-প্রকৃতি যতই অশেষ বৈচিত্র্যের সহিত বিস্তৃত, বহুমাত্মক হউক না কেন, তাঁহাকে কিছুতেই সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, যদিও আমাদের শান্ত দৃষ্টির সম্মুখে তাহা অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। অতএব মুক্ত জীবের দৃষ্টি বিশ্বজগতের অতীতে পরম ভগবানকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, জগৎ ভগবানের একটি রূপ কিন্তু তিনি সকল রূপের অতীত, দেখিবে যে, ভগবানের কৈবল্যাত্মক সত্তার মধ্যে জগৎ নিত্য হইলেও একটা গৌণ ক্রম। সে দেখিবে সকল সান্ত ও আপেক্ষিক বস্তু অনপেক্ষ অনন্ত ভগবানেরই এক একটি রূপ, এবং সকল সান্ত বস্তুর ঊর্ধ্বে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়াও সে সেই একই ভগবানে পৌঁছিবে, প্রত্যেক প্রাকৃত ব্যাপার, প্রাকৃত জীব এবং আপেক্ষিক ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে সে সর্বদা সেই একই ভগবানকে লক্ষ্য করিবে; এই সকলের দিকে এবং ইহাদের অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ভগবানের মধ্যেই প্রত্যেকের অধ্যাত্ম সার্থকতার সন্ধান পাইবে।

এই সব তাহার মনের কাছে কেবল বুদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র হইবে না, জগতের প্রতি এইরূপ মনোভাব কেবল একটা চিন্তার ধারা বা কর্মোপযোগী মতবাদ মাত্র হইবে না। কারণ, তাহার জ্ঞান যদি কেবল এইরূপ পরিকল্পনা-মূলক হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটা দার্শনিক মতবাদ (Philosophy), একটা মানসিক রচনা, তাহা অধ্যাত্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি হইবে না, অধ্যাত্মভাব ও চেতনা হইবে না। ভগবান ও জগৎকে অধ্যাত্মভাবে দেখা কেবল চিন্তামূলক

একটা ক্রিয়া নহে, এমন কি প্রধানত বা মূলতও তাহা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মন যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মূর্তি, বস্তু, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে ও অনুভব করে, তাহারই মত বাস্তব, সুস্পষ্ট, সন্নিকট, নিত্য, কার্যকরী, নিবিড়। কেবল স্থূল মনই ভাবে যে, ভগবান ও আত্মা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র; নাম, রূপ, প্রতীক বা কল্পনার সাহায্য ভিন্ন ভগবানকে দেখা যায় না, ধারণা করা যায় না। আত্মা আত্মাকে দেখে, দিব্যভাবাপন্ন চেতনা ভগবানকে দেখে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বা আরও অধিক প্রত্যক্ষভাবে, ঠিক সেইরূপ নিবিড়ভাবে বা আরও অধিক নিবিড়ভাবে, যেমন স্থূল চৈতন্য জড়বস্তুকে দেখে। ইহা ভগবানকে দেখে, অনুভব করে, ধ্যান করে, ইন্দ্রিয়গোচর করে। কারণ অধ্যাত্ম চেতনার সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ প্রতীয়মান হয় যেন জড়ের জগৎ নহে, প্রাণের জগৎ নহে, এমন কি মনেরও জগৎ নহে, কিন্তু আত্মার জগৎ, এই সব জিনিস তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যেন ভগবৎ-চিন্তা, ভগবৎ-শক্তি ভগবৎ-রূপ। বাসুদেবের মধ্যে বাস করা, কর্ম করা, ময়ি বর্ত্ততে, বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনা ভগবানকে যে ঐক্যবোধমূলক নিবিড় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয় তাহা এত অত্যন্ত ভাবে অধিক সত্য যে মনের প্রতীতি বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এইভাবে ইহা সেই বিশ্বাতীত কেবলকেও অবগত হয় যিনি সমস্ত জগৎলীলার পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরদিন ইহার অবস্থা-বিপর্যয়ের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আর এই ভগবান নিজের যে অচল অক্ষর সত্তার দ্বারা জগতের সমস্ত পরিবর্তন লীলাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, সেইটিকে ঐ অধ্যাত্ম চেতনা অবগত হয় সেইরূপ ঐক্যবোধের দ্বারা, আমাদের নিজেদের কালাতীত অপরিবর্তনশীল অবিনাশী সত্তার সহিত ঐ অক্ষর সত্তার তাদাত্ম্য (identity) উপলব্ধির দ্বারা। আবার এই ভাবেই ইহা সেই দিব্য পুরুষকেও জানিতে পারে যিনি এই সকল বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে নিজে অবগত হন, যিনি নিজের চেতনায় এই সকল বস্তু ও জীব হইয়াছেন এবং নিজের অনুস্যূত ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের চিন্তা ও রূপসকল গঠন করিয়া দিতেছেন, তাহাদের কর্মসকল পরিচালন করিতেছেন। ইহা ভগবানকে কৈবল্যাত্মক (Absolute) সত্তারূপে, বিশ্বের আত্মারূপে, আবার জীবের আত্মা, অন্তর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে নিগূঢ় জ্ঞানে অবগত হয়। এমন কি এই যে বাহ্য প্রকৃতি (external Nature), ইহাকেও সে অবগত হয় ঐক্য-বোধ এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা, কিন্তু সে-ঐক্য বৈচিত্র্যের বাধক নহে, তাহা সম্বন্ধকে অস্বীকার করে না, বিশ্বলীলার একই শক্তির বিভিন্ন ক্রম, উচ্চতর এবং নিম্নতর ক্রিয়া স্বীকার করে। কারণ প্রকৃতি ভগবানের বিচিত্র আত্মপ্রকাশলীলার শক্তি, আত্ম-বিভূতি।

সাধারণ মানব মন অজ্ঞানের বশে জগতে প্রকৃতিকে যেরূপ দেখে, অথবা অজ্ঞানের পরিণামে উহা যেরূপ, এই অধ্যাত্ম চেতনা, জগৎ সম্বন্ধে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিন্তু সে ভাবে দেখিবে না। এই প্রকৃতিতে অজ্ঞানের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু অপূর্ণ বা দুঃখময় বা বিকৃত ও ঘৃণ্য, সে-সব ভগবানের প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু নহে, কিন্তু তাহাদের পিছনে তাহাদের প্রকৃত মূল রহিয়াছে, তাহাদের পিছনে এমন অধ্যাত্ম শক্তি আছে যাহার মধ্যে গিয়া তাহারা নিজেদের সত্য সত্তা ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এক আদ্যা ও সৃজনশীলা পরমা প্রকৃতি আছে যাহার মধ্যে ভাগবত শক্তি ও সংকল্প নিজের পূর্ণ স্বরূপ এবং শুদ্ধ প্রকাশের আনন্দ উপভোগ করে। জগতে আমরা যে-সব শক্তি ক্রিয়মাণ দেখিতে পাই, তাহাদের উচ্চতম সিদ্ধতম শক্তি সেইখানেই পাওয়া যায়। সেইটিই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় ভগবানের আদর্শ প্রকৃতিরূপে, সে প্রকৃতি পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণ তেজ ও ইচ্ছাশক্তির, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের। তাঁহার অনন্তগুণ, অগণন শক্তিসকল সেখানে আশ্চর্যভাবে বৈচিত্র্যময়, সে-সমুদয় সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ তেজ, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ সামঞ্জস্যময় স্বাচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ। সেখানে সবই হইতেছে সকল আনন্ত্যের বহুমুখী ঐক্য। সেই আদর্শ ভগবদ্ প্রকৃতিতে প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক গুণই শুদ্ধ, পূর্ণ, আত্মস্থ, আপন-আপন ক্রিয়ায় সামঞ্জস্যময়; সেখানে কোন কিছুই নিজের স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করে না, সকলেই এক অনির্বচনীয় ঐক্যের সহিত কর্ম করে। সেখানে সকল ধর্মই (ভগবদ্ শক্তি ও গুণের যাহা যথার্থ ক্রিয়া, গুণকর্ম, তাহাই ধর্ম) এক স্বচ্ছন্দ সাবলীল ধর্ম। ভগবানের সেই চিৎ শক্তি, তপঃ, অপরিসীম স্বাধীনতার সহিত কর্ম করে, কোনও একমাত্র নীতির বন্ধনে বদ্ধ থাকে না, কোনও এক সংকীর্ণ পদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, নিজের অনন্তলীলা নিজেই উপভোগ করে, তাহার আত্মপ্রকাশের সত্যে কখনও পদস্খালন হয় না, তাহা চিরসিদ্ধ।

কিন্তু যে জগতে আমরা বাস করিতেছি সেখানে রহিয়াছে নির্বাচন ও পার্থক্যের ভেদমূলক নীতি। সেখানে আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল শক্তি ও গুণ প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই যেন শুধু নিজের জন্যই সচেষ্ট, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছে যে-কোনও উপায়ে যতদূর সম্ভব শুধু নিজেরই আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অন্যান্য শক্তি ও গুণের নিজ-নিজ স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের জন্য সহবর্তী বা প্রতিযোগী চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টার ভাল বা মন্দ যাহা সম্ভব কোনও রকম একটা আপস করিতে। এই দ্বন্দ্বময় পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে ভগবান অবস্থান করিতেছেন এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়া যে নিগূঢ় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অব্যভিচারী বিধানে সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই একটা সুসংগতি আনিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সুসংগতি আপেক্ষিক

(relative); মনে হয় উহা এক মূল ভেদ হইতেই উত্থিত, বিভিন্ন জিনিস-সকলের ঘাত-প্রতিঘাতে একরকম সঙ্গতি হইয়াছে, কোনও মূল ঐক্য হইতে উহার উৎপত্তি নহে। অন্তত মনে হয় যে, ঐ ঐক্য দমিত ও গুপ্ত রহিয়াছে, নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, কখনই ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্তুত ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না এই পার্থিব প্রকৃতিতে আবির্ভূত ব্যক্তিগত জীব নিজের মধ্যে সেই উচ্চতর দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পাইতেছে যাহা হইতেই এই নীচের ক্রিয়ার উৎপত্তি। তথাপি জগতে যে সব গুণ ও শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, মানুষে, পশুতে, উদ্ভিদে, জড়পদার্থে নানাভাবে কর্ম করিতেছে, যে কোনও রূপ তাহারা গ্রহণ করুক না কেন তাহারা সকলেই দিব্য গুণ ও দিব্য শক্তি। সকল শক্তি ও গুণই ভগবানের শক্তি। প্রত্যেকেই ঊর্ধ্বে দিব্য প্রকৃতি হইতে আসিযাছে, এখানে নীচের প্রকৃতিতে নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, এই সব বাধা প্রতিবন্ধ-কের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব উপযোগিতার শক্তিকে বর্ধিত করিতেছে, এবং যখন নিজের আত্মশক্তির শিখরে উঠিতেছে, তখন ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশের সমীপবর্তী হইতেছে এবং ঊর্ধ্বে পরা আদর্শ দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নিজের যে সিদ্ধ স্বরূপ সেই দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে। কারণ প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের সত্তা ও শক্তি, এবং শক্তির বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ সকল সময়ে ভগবানেরই বিস্তার ও প্রকাশ।

এমনও বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, প্রেমের শক্তি, আনন্দের শক্তি, যে কোনও শক্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়া নীচের রূপের গণ্ডীটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং সেই শক্তি ভেদাত্মক ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের অসীমতা ও শক্তির সহিত যুক্ত হয়। ভগবানের দিকে টানের যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা মনকে জ্ঞানের পূর্ণতম দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্ত করে, হৃদয়কে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্ত করে, সমস্ত জীবনকে এক উচ্চতর জীবন লাভের পূর্ণ ঐকান্তিক সংকল্পের ভিতর দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই যে বিস্ফোরণের ফলে নীচের বন্ধন টুটিয়া যায়, আমাদের বর্তমান প্রকৃতির উপর ভগবানের স্পর্শ হইতেই তাহা সম্ভব হয়; তাহা শক্তিটিকে সাধারণ সীমাবদ্ধ ভেদাত্মক ক্রিয়া ও বিষয় সকল হইতে ফিরাইয়া শাশ্বতের দিকে, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত সত্তার দিকে পরিচালিত করে, অনন্ত, পূর্ণ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যায়। সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া ভাগবত শক্তি এইরূপ জীবন্তভাবে কার্য করিতেছে, এই সত্যই বিভূতি-তত্ত্বের ভিত্তি।

অনন্ত ভগবদ্ শক্তি সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং গুপ্তভাবে এই নীচের জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরা প্রকৃতি র্যেয়া ধার্য্যতে জগৎ, কিন্তু ইহা নিজেকে পিছনে রাখে, প্রত্যেক প্রাকৃত সত্তার হৃদয়ে লুকাইয়া থাকে, সর্ব্বভূতানাম্

হৃদ্দেশে, যতক্ষণ না জ্ঞানের জ্যোতিতে যোগমায়ার আবরণ বিদীর্ণ হইতেছে। মানুষের অধ্যাত্ম সত্তা অর্থাৎ জীবের আছে দিব্য প্রকৃতি। সে হইতেছে এই প্রকৃতিতে ভগবানের আবির্ভাব, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ, এবং তাহার মধ্যে সমস্ত দিব্য শক্তি ও গুণ, ভাগবত সত্তার জ্যোতি, বল, শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নীচের প্রকৃতিতে আমরা বাস করিতেছি, এখানে জীব নির্বাচনের ও সসীম রূপায়ণের নীতি অনুসরণ করে, এবং এখানে শক্তির যে-কোন ধারা, যে-কোন গুণ বা অধ্যাত্মভাব সঙ্গে লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা তাহার আত্মপ্রকাশের বীজ স্বরূপ সম্মুখে আনিয়াছে, সেইটিই হয় তাহার স্বভাবের কার্যকরী অংশ, তাহার আত্মবিকাশের মূল ধর্ম এবং সেইটিই তাহার স্বধর্ম, তাহার কর্মের নীতি নির্ণয় করিয়া দেয়। আর কেবল যদি ইহাই সব হইত তাহা হইলে কোনও সমস্যা বা দুরূহতা থাকিত না, মানুষের জীবন হইত ভাগবত সত্তার জ্যোতির্ময় ক্রমবিকাশ। কিন্তু আমাদের জগতের এই যে নীচের শক্তি, অপরা প্রকৃতি, ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান ও অহংকার, ইহা ত্রিগুণ-ময়ী। অহংকার এই প্রকৃতির স্বরূপ, সেইজন্য জীব নিজেকে ভেদাত্মক অহং বলিয়া ধারণা করে; তাহার ন্যায় অপরের মধ্যেও স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সহযোগে এবং সংঘর্ষে অহংভাবের বশে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সে জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ধরিতে চায়, ঐক্য ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া নহে; অহংকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সে বিরোধকে বাড়াইয়া তোলে। এই প্রকৃতির স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং অপূর্ণ ও আংশিক আত্মপ্রকাশ, সেইজন্য সে নিজেকে জানিতে পারে না, নিজের সত্তার ধর্ম সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় সংস্কারের বশে অন্ধভাবে উহার অনুসরণ করে, কষ্টে-সৃষ্টে, ভিতরে বহু দ্বন্দ্ব লইয়া অগ্রসর হয়, পথভ্রষ্ট হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সেইজন্য আত্মবিকাশের এই বিশৃংখল ও কষ্টকর প্রয়াস নানা অক্ষমতার, বিকৃতির ও আংশিক আত্মোপলব্ধির রূপ গ্রহণ করে। যখন অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তিমূলক তমোগুণের আধিপত্য হয়, তখন সত্তার শক্তি দুর্বল বিশৃংখ-লায় সর্বদা অক্ষমতার সহিত কর্ম করে, অজ্ঞানের শক্তিসমূহের অন্ধ নিয়মের বশবর্তী হইয়া কর্ম করে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যখন প্রবৃত্তি-বাসনা-ভোগমূলক রজোগুণের আধিপত্য হয়, তখন দেখা দেয় একটা সংগ্রাম, একটা চেষ্টা; শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পদে-পদে স্খলন হয়, সে চেষ্টা হয় ব্যথাসঙ্কুল, উগ্র; ভ্রান্ত পদ্ধতি ও আদর্শের দ্বারা বিপথে চালিত হয়, সত্য ধারণা, পদ্ধতি ও আদর্শসমূহকে বিকৃত ও দূষিত করা হয়, বিশেষত অহঙ্কারকে অতিশয়, এমন কি অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিবার প্রবণতা আসে। যখন জ্যোতি-স্থৈর্য-শান্তিমূলক সত্ত্বগুণের আধিপত্য হয়, তখন

কর্ম অধিকতর সুসমঞ্জস হয়, প্রকৃতিকে যথাযথ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু এই যে যথাযথ ব্যবহার ইহা ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, নীচের প্রকৃতির যে মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই সবেরই উচ্চতর রূপের ঊর্ধ্বে উঠিবার সামথ্য থাকে না। এই জটিলতার জাল হইতে মুক্ত হওয়া, অজ্ঞান, অহং ও গুণত্রয়ের উপরে উঠা, ইহাই দিব্য সিদ্ধিলাভের পথে প্রকৃত প্রথম ধাপ। এই-রূপে উপরে উঠিয়াই জীব তাহার নিজের দিব্য প্রকৃতির, নিজের সত্য জীবনের সন্ধান পায়।

অধ্যাত্ম চেতনায় জ্ঞানের যে মুক্ত দৃষ্টি তাহা জগৎকে দেখিবার সময় কেবল এই নীচের দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতিকেই দেখে না। আমারা যদি আমাদের এবং অপরের প্রকৃতির কেবল বাহিরের দৃশ্যমান দিকটাই অবলোকন করি, তাহা হইলে সেটা অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা ভগবানকে সর্বত্র সমানভাবে জানিতে পারি না, সাত্ত্বিক জীবে, রাজসিক জীবে, তামসিক জীবে, দেবতায় ও দানবে, পাপাত্মায় ও পুণ্যবানে, জ্ঞানীতে ও মূর্খে, মহতে ও ক্ষুদ্রে, মানুষে, জন্তুতে, উদ্ভিদে, জড়জগতে সর্বত্র সমানভাবে ভগবানকে দেখিতে পারি না। যিনি জ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি একই সঙ্গে তিনটি জিনিস প্রকৃতির সমগ্র নিগূঢ় সত্য বলিয়া দেখেন। সর্ব প্রথমেই তিনি দেখেন যে, সকলের মধ্যে ভগবদ্ প্রকৃতি গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ক্রমবিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তিনি দেখেন যে, এই ভগবদ্ প্রকৃতিই সকল বস্তুর প্রকৃত শক্তি, এই যে সব বিচিত্র গুণ ও শক্তির আপাতদৃষ্ট ক্রিয়া এসব সেই ভগবদ্ প্রকৃতি হইতেই সার্থকতা লাভ করিতেছে; আর তিনি এই সব ক্রিয়ার অর্থ ইহাদের আপন অহং ও অজ্ঞানের ভাষায় নহে, পরন্তু ভগবদ্ প্রকৃতির আলোকেই দেখিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি দ্বিতীয়ত দেখিতে পান যে, দেব ও রাক্ষস, মানুষ ও পশু ও পক্ষী ও সরীসৃপ, সাধু ও অসাধু, মূর্খ ও পণ্ডিত, ইহাদের কর্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আপাতদৃষ্ট হয়, সে সব ভগবদ্ গুণ ও শক্তিরই নানা অবস্থায়, নানা ছদ্মবেশের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি ছদ্মবেশের দ্বারা প্রতারিত হন না, কিন্তু প্রত্যেক ছদ্মবেশের অন্তরালেই ভগবানকে চিনিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টি বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে কিন্তু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া পিছনে আত্মার যে সত্য রহিয়াছে সেইখানে পোঁছায়, বিকৃতি ও অপূর্ণতার মধ্যেও আত্মাকে দেখিতে পায়, দেখে যে আত্মা নিজে নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজেকে পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নানারূপ আত্মপ্রকাশ ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখে, নিজেরই অনন্ত ও পূর্ণতম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি বিকৃতি ও অপূর্ণতার উপরেই অযথা ঝোঁক্ দেয় না কিন্তু সকলকেই দেখিতে পারে হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও উদারতার সহিত, বুদ্ধিতে পূর্ণ বোধের সহিত,

আত্মায় পূর্ণ সমতার সহিত। তৃতীয়ত তিনি দেখেন আত্মপ্রকাশের শক্তিসকল ভগবানের দিকেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; যেখানেই তিনি দেখিতে পান গুণ ও শক্তির সমুচ্চ প্রকাশ, ভাগবত সত্তার প্রদীপ্ত শিখা, যেখানে তিনি দেখেন আত্মা মন প্রাণ নীচের প্রকৃতির সাধারণ স্তর হইতে উঠিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞান, মহান্ শক্তি, তেজ, সক্ষমতা, সাহস, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মদানের কল্যাণময় মধুরতা, আবেগ ও মহিমা, বিশিষ্ট পুণ্য, মহৎ কর্ম, মনোহর সৌন্দর্য ও সুষমা, দেবতুল্য সুন্দর সৃষ্টি, এইসব অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে সেখানেই তিনি সেইসবকে শ্রদ্ধা করেন, অভ্যর্থনা করেন, উৎসাহিত করেন। আত্মার মুক্ত দৃষ্টি মহৎ বিভূতির মধ্যে দেখে যে মানুষের দেবত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

ইহা হইতেছে ভগবানকে শক্তিরূপে চেনা,—ব্যাপকতম অর্থে শক্তি, শুধু বলের শক্তি নহে পরন্তু জ্ঞানের, ইচ্ছার, প্রেমের, কর্মের, পবিত্রতার, মধুরতার সৌন্দর্যের শক্তি। ভগবান হইতেছেন সৎ, চিৎ, আনন্দ; জগতের প্রত্যেক জিনিস সৎ-এর শক্তি, চিৎ-এর শক্তি, আনন্দের শক্তি দ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকট করিতেছে এবং নিজের দিব্যস্বরূপ লাভ করিতেছে; এই জগৎ ভগবদ্ শক্তির কর্মের জগৎ। ঐ শক্তি অসংখ্য প্রকারের জীবে নিজেকে এখানে নানারূপে গড়িতেছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার বিশেষ-বিশেষ শক্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিই এক একটি রূপের মধ্যে স্বয়ং ভগবান; ভগবান সিংহও হইয়াছেন আবার হরিণও হইয়াছেন, দানবও হইয়াছেন আবার দেবতাও হইয়াছেন, আকাশের উপর প্রদীপ্তমান অচেতন সূর্য হইয়াছেন, আবার পৃথিবীর উপর মননশীল মানুষও হইয়াছেন। গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে যে বিকৃতির উদ্ভব তাহা কেবল একটা গৌণ ভাব, মুখ্য ভাব নহে; মূল জিনিস হইতেছে ভগবদ্ শক্তি যাহা নিজের আত্মপ্রকাশের সন্ধান করিতেছে। উচ্চ মনীষী, বীর, নেতা, সিদ্ধগুরু, ঋষি, নবী, ধর্মপ্রবর্তক, সাধু, মানব-প্রেমিক, বড় কবি, বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক, আত্ম-সংযমী সন্ন্যাসী, জগজ্জয়ী শক্তিমান মানব, সকলের মধ্যে ভগবানই নিজেকে প্রকট করিতেছেন। কার্যটিও—মহৎ কাব্য, সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ, গভীর প্রেম, মহৎ কর্ম, দিব্য সিদ্ধি, এ-সবই ভাগবতলীলা, ভগবানের আত্মপ্রকাশ।

এই যে সত্য, সকল প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষাই ইহাকে স্বীকার করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক মানবমনের একটা দিক এই সত্যের প্রতি কেমন যেন বিরূপ, ইহার মধ্যে কেবল বল ও শক্তির পূজাই দেখিতেছে, মনে করিতেছে এইভাবে শক্তিমানের পূজা করা অজ্ঞানপ্রসূত, ইহাতে মানুষকে হীন করা হয়, ইহা শুধু আসুরিক অতিমানবের তত্ত্ব। অবশ্য এই সত্যকে লোকে ভুলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, বস্তুত সকল সত্যকেই ভুলভাবে গ্রহণ করা যায়; কিন্তু এই সত্যের যথাযোগ্য স্থান আছে, প্রকৃতির দিব্য ব্যবস্থায় ইহার অপরিহার্য ক্রিয়া

আছে। গীতা সত্যটিকে সেই যথাস্থান ও যথার্থ রূপ দিয়াছে। সকল মানুষ, সকল জীবে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, এই জ্ঞানের উপর ঐ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই সত্য যেন উচ্চ-নীচ, উজ্জ্বল-ম্লান সকল প্রকার প্রকাশের প্রতি হৃদয়ের সমতা রাখার বিরোধী না হয়। মূর্খ, নীচ, দুর্বল, অধম, পতিত, সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে হইবে ও ভালবাসিতে হইবে। বিভূতিকেও যে পূজা করিতে হইবে, তাহা বাহ্যিক ব্যক্তিটিকে নহে, কিন্তু যে ভগবান তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন সেই ভগবানকেই পূজা করিতে হইবে (তবে বিভূতির বাহ্য ব্যক্তিস্বরূপকে ভগবানের প্রতীক হিসাবে পূজা করা চলিতে পারে)। কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্যটিকে অস্বীকার করা চলে না যে, প্রকাশেরও উচ্চ-নীচ ক্রম আছে; প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রকাশের ধারায় স্তরে-স্তরে ঊর্ধ্বের দিকে চলিয়াছে, অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, অস্ফুট প্রতীকসকল হইতে ভগবানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তি, প্রত্যেক মহৎ কর্ম, প্রকৃতির নিজেকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্যের নিদর্শন, এবং সর্বশেষ ও পরম ঊর্ধ্বায়ণের আশ্বাস। প্রকৃতির বিকাশে মানুষ নিজেই পশু পক্ষী সরীসৃপের তুলনায় একটা উচ্চতর ক্রম, যদিও সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্ম রহিয়াছেন, সমং ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষ নিজেকেও অতিক্রম করিয়া যত ঊর্ধ্বতম শিখরে উঠিতে পারে এখনও সেখানে পৌঁছায় নাই; ইতিমধ্যে যখনই তাহার মধ্যে আত্মবিকাশের কোনও মহত্তর শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে, সেইটিকেই তাহার পরম ঊর্ধ্বগতির আশা ও সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে-সকল অগ্রগামী মহাজন নিজেদের যে-কোনরূপ সিদ্ধির দ্বারা মানুষকে অতিমানবত্বের সম্ভাবনা দেখাইয়া দেন বা সেই দিকে পরিচালিত করেন তাঁহাদের চিহ্নিত পথের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অশ্রদ্ধা করা হয় না, বরং সে শ্রদ্ধা আরও উচ্চ, আরও গভীরতর অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অর্জুন নিজেই একজন বিভূতি; আধ্যাত্মবিকাশে তিনি একজন উচ্চস্তরের মানব, সমসাময়িক জনগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি নারায়ণের, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের, নির্বাচিত যন্ত্র। এক স্থানে গুরু সকলের পরম ও এক আত্মারূপে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, আবার অন্যান্য স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, অর্জুন তাঁহার প্রিয়, তাঁহার ভক্ত, সেই জন্যই তিনি অর্জুনের ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন, দৃষ্টি ও জ্ঞান দিবার জন্য তিনি অর্জুনকেই নির্বাচিত করিয়াছেন। এখানে গুরুর কথায় বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত কোনই বিরোধ নাই। বিশ্বের আত্মারূপে ভগবদ্শক্তি সকলের প্রতিই সমান, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন; কিন্তু পুরুষোত্তমের সহিত মানুষের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও আছে, যে-মানব তাঁহার নিকট আসে তিনিও বিশেষ

করিয়া তাহার নিকটে যান। এই যে সব বীর ও শক্তিমান পুরুষ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছেন, ইহারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র, প্রত্যেকেব ভিতর দিয়া প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে ভগবানই কর্ম করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অহংএর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম করিতেছেন। অর্জুন এমন অবস্থায় পেঁাছিয়াছেন যখন তাঁহার এই অজ্ঞান আবরণ ভেদ করা যাইতে পারে এবং মানবদেহে অবতীর্ণ ভগবান তাঁহার বিভূতিকে তাঁহার কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারেন। এমন কি এইরূপ প্রকাশ অপরিহার্য। অর্জুন এক মহান কর্মের যন্ত্র, সে কর্ম বাহ্যত অতি ভীষণ বটে, কিন্তু মানবজাতিকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাইয়া দিবার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে মানবজাতির যে প্রয়াস তাহার সহায়তায় এই যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। মানবের যুগাবর্তনের ইতিহাস, মানবের আত্মা ও প্রাণে ভাগবত সত্তারই ক্রমবর্ধমান প্রকাশ; এই ইতিহাসের প্রত্যেক মহান ঘটনা ও অবস্থা ভগবানেরই এক একটি আবির্ভাব। অর্জুন ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার প্রধান যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের মহান কর্মী, তিনি যাহাতে কার্যটিকে ভগবানের কর্ম বলিয়া জানিয়াই সজ্ঞানে করিতে পারেন সেই জন্য তাঁহাকে দিব্য মানব হইতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই সে কর্ম অধ্যাত্মভাবে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক সার্থকতা, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের জ্যোতি ও শক্তি লাভ করিবে। অর্জুনকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করা হইল; তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ভগবানই এই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের সকল জীব, সকল ঘটনার উৎপত্তিস্থল, সমস্তই প্রকৃতিতে ভগবানের আত্ম-প্রকাশ, সর্বত্র ভগবানকে দেখিতে হইবে। তাহার নিজের মানুষরূপে ও বিভূতিরূপে ভগবানকে দেখিতে হইবে, নীচ উচ্চ সকল স্তরের সত্তার মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, উচ্চতম শিখরে ভগবানকে দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে মানুষও উন্নত অবস্থায় বিভূতি, সেখান হইতে পরম মুক্তি ও মিলনের মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে। কাল যে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছে, সেটিকেও ভগবানের রূপ, ভগবানের পদক্ষেপ বলিয়া দেখিতে হইবে,—সেই পদক্ষেপে জগতের যুগান্তর সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে ভগবদ্ সত্তা সেই যুগান্তরের বেগকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মাঝে বিভূতি রূপে ভগবদ্ কর্ম সম্পাদন করিতে-করিতে পরম সিদ্ধি লাভ করে। অর্জুনকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে; এখন তাঁহাকে ভগবানের মহাকালরূপ দেখান হইবে এবং সেই রূপের সহস্র-সহস্র মুখ হইতে মুক্ত বিভূতির প্রতি ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ ঘোষিত হইবে।

দশম অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

সংহারক মহাকাল

বিশ্বরূপ দর্শন গীতার একটি সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং কবিত্বশক্তিপূর্ণ অংশ, কিন্তু গীতার চিন্তাধারায় ইহার যে বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সেইটি সহসা ধরিতে পারা যায় না। ইহা যে একটি কবিত্বময় ও দিব্যার্থময় রূপক তাহা সুস্পষ্ট, এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে ইহাকে আনা হইয়াছে, আবিষ্কার করিতে হইবে ইহার গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অংশগুলির নির্দেশ কি, তবেই আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিব। যে-অধ্যাত্মসত্তা ও শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে তাহার জীবন্ত রূপ, অদৃশ্য ভগবানের দৃশ্য মহত্ত্ব, তাঁহার স্থূল শরীরটিই দেখিবার জন্য অর্জুনের যে-ইচ্ছা তাহার দ্বারাই তিনি ইহাকে আহ্বান করিলেন। জগতের যে পরম গুহ্য আধ্যাত্ম তত্ত্ব তাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, ভগবান হইতেই সব, সবই ভগবান এবং সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন, লুক্কায়িত রহিয়াছেন, এবং প্রত্যেক সসীম বস্তুর মধ্যেই তাঁহাকে প্রকট করিতে পারা যায়।* যে-মোহ এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বস্তুসকল ভগবান ছাড়া নিজেদের মধ্যেই নিজদিগকে লইয়া থাকিতে পারে অথবা প্রকৃতির অধীন কোনও জিনিস স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, নিজদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, এই ধারণা অর্জুনের চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়াছে—ঐটিই ছিল তাঁহার সংশয়ের, তাঁহার বিমূঢ়তার, তাঁহার কর্মত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখন তিনি জানিয়াছেন যে, সত্তাসকলের উৎপত্তি ও লয়ের প্রকৃত অর্থ কি। তিনি জানিয়াছেন যে, দিব্য চৈতন্যময় আত্মার অব্যয় মাহাত্ম্যই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের নিগূঢ় তত্ত্ব। সর্বভূতের মধ্যে এই মহান শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা, সবই তাঁহার যোগ এবং সকল ঘটনা সেই যোগেরই পরিণাম ও প্রকাশ, নিখিল প্রকৃতি সেই গোপন ভগবদ্‌ সত্তায় পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে তাহাকে প্রকট করিতে প্রয়াসী। কিন্তু অর্জুন

*মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১১।১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ১১।২

সেই ভগবদ্‌সত্তার স্থূলরূপ ও শরীরটিও দেখিতে চান, যদি তাহা সম্ভব হয়।* তিনি তাঁহার গুণসকল শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধারা কি, ক্রম কি তাহাও বুঝিয়াছেন; কিন্তু এখন তিনি তাঁহার সেই অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করান। অবশ্য তাঁহার নিষ্ক্রিয় অক্ষর সত্তার অরূপ স্তব্ধতা নহে, পরন্তু সেই পরম পুরুষ যাঁহা হইতে সকল তেজ ও কর্মের উৎপত্তি, সকল রূপ যাঁহার ছদ্মবেশ, যিনি বিভূতিতে নিজের শক্তি প্রকট করেন,—কর্মের ঈশ্বর, জ্ঞান ও ভক্তির ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং তাহার সকল জীবের ঈশ্বর। এই মহত্তম সর্বব্যাপী দর্শনের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করান হইল কারণ এই ভাবেই বিশ্বমাঝে প্রকট পরমাত্মার নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্মে তাঁহার নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিবার আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অবতার উত্তর দিলেন, তোমাকে যাহা দেখিতে হইবে, মানবীয় চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না, কারণ মানুষের চক্ষু কেবল জিনিসসকলের বাহ্যিক রূপই দেখিতে পায় অথবা তাহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীকরূপে দেখে, ইহারা প্রত্যেকে অনন্ত রহস্যের কেবলমাত্র কয়েকটি দিকের আভাস দেয়।* কিন্তু দিব্যচক্ষু আছে, অন্তরতম দৃষ্টি, তাহার দ্বারা পরম ভগবানকে তাঁহার যোগশক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চক্ষু এখন আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি দেখিবে আমার নানাবিধ, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির শত-শত সহস্র-সহস্র দিব্য রূপ: তুমি দেখিবে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, মরুতগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; তুমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখিবে যাহা কেহ কখনও দেখে নাই; আমার দেহের মধ্যে সমগ্র জগৎকে সংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে, আর যাহা কিছু দেখিতে চাও সবই দেখিতে পাইবে, এইটিই তাহা হইলে মূলভাব, ভিতরের অর্থ। ইহা হইতেছে বহুর মধ্যে এককে দর্শন, একের মধ্যে বহুকে দর্শন—সবই সেই এক। দিব্যযোগের চক্ষুতে এই যে দর্শন মুক্তি আনিয়া দেয়, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু হইবে সে-সবেরই সার্থকতা

* এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১।৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যযম্ ॥ ১১।৪

* ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচারাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১।৫-৭

দেখাইয়া দেয়, সবেরই ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। একবার এই দর্শন লাভ করিতে পারিলে এবং ইহাকে ধারণ করিতে পারিলে, ইহা ভগবদ্ জ্যোতির কুঠারে সকল সংশয় ও ভ্রান্তির মূল ছিন্ন করিয়া দেয় এবং সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই যে দর্শন ইহা সামঞ্জস্য করে, ঐক্যসাধন করে। এই দর্শনে ভগবানকে যে-ভাবে দেখা যায় যদি তাহার সহিত আত্মা ঐক্যবোধ লাভ করিতে পারে (অর্জুন এখনও তাহা পরেন নাই, তাই আমরা দেখি তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন), জগতে ভীষণ যাহা কিছু আছে সে-সবেরও ভীষণতা দূর হইয়া যায়। সেইটিকেও আমরা ভগবানেরই একটি ভাব বলিয়া দেখিতে পাই, এবং যখন আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার দিব্য উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই, শুধু এইটিকেই স্বতন্ত্র ভাবে দেখি না, তখন আমরা সর্বতোমুখী আনন্দ ও বিপুল সাহসের সহিত জগৎকে সমগ্রভাবেই বরণ করিয়া লইতে পারি, আমাদের উপর যে-কর্মের ভার অর্পিত হইয়াছে অবিচলিত পদবিক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। যে-দিব্য জ্ঞান সকল জিনিসকে ঐক্যের দৃষ্টিতে দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে আংশিকভাবে দেখে না এবং সেইজন্যই বিমূঢ় হয় না, আত্মা একবার সেই জ্ঞানে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে জগৎকে এবং আর যাহা কিছু সে দেখিতে ইচ্ছা করে সবকেই নূতনভাবে আবিষ্কার করিতে পারে, যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি। সকলের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, ঐক্য-স্থাপনকারী এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দিব্যজ্ঞান হইতে পূর্ণতর দিব্যজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তাহার পর পরম ঐশ রূপ অর্জুনের দৃষ্টিগোচর করা হইল।* সে-রূপ অনন্ত ভগবানের, তাঁহার মুখ সর্বত্র এবং তাঁহার মধ্যে সমস্ত আশ্চর্যময় বস্তু, তিনি অনবরত তাঁহার সত্তার যে-সকল অপরূপ প্রকটন করিতেছেন তাহাদের শেষ নাই—সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত ভগবান তিনি, অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন, অসংখ্য মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন, অসংখ্য দিব্য-অস্ত্রে তিনি যুদ্ধের জন্য

* এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্। ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১১।৯-১৪

সজ্জিত, দিব্য আভরণে ভূষিত, দিব্য বস্ত্র পরিহিত, দিব্য পুষ্পের মালায় অলঙ্কৃত, দিব্য সৌগন্ধ্যে অনুলিপ্ত। ভগবানের এই শরীরের এমন প্রভা যেন আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য উদিত হইয়াছে। সেই দেবদেবের শরীরে সমগ্র জগৎ বহুধা বিভক্ত অথচ একীভূত দেখা যাইতেছে। অর্জুন দেখিলেন অত্যাশ্চর্যময়, সুন্দর, ভীষণ ভগবান, জীবগণের অধিপতি, যিনি তাঁহার অধ্যাত্ম-সত্তার মহিমা ও মহত্ত্বে এই উদ্দাম ও বিকট, সুশৃঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর ও ভয়ংকর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং তিনি বিস্ময়ে, হর্ষে, ভয়ে অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে নমস্কারপূর্বক ভক্তিপূর্ণবাক্যে করজোড়ে সেই বিরাট মূর্তির স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেব, তোমার দেহে আমি সকল দেবতা, বিশেষ-বিশেষ ভূতবর্গ, কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দর্শন করিতেছি। * আমি দেখিতেছি অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ; সর্বত্র আমি তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি তোমার অন্ত মধ্য আদি দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমাকে দেখিতেছি কিরীটী, গদাচক্রধারী, আমার চতুর্দিকে দীপ্তিমান, তেজোপুঞ্জ তুমি দুর্নিরীক্ষ্য, সর্বব্যাপী দ্যুতি, সূর্য-প্রভ, অগ্নি-প্রভ অপ্রমেয়। তুমি পরম অক্ষর এবং তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার ও আশ্রয় তুমিই শাশ্বত ধর্মসমূহের অবিনশ্বর প্রতিপালক, তুমিই সনাতন পুরুষ।

কিন্তু এই মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ সংহারকেরও মূর্তি রহিয়াছে। এই যে অপ্রমেয়, যাঁহার অন্ত নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে সকল জিনিসের

* পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১১।১৫-১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

উদ্ভব, স্থিতি ও লয়।† এই যে-ভগবান অসংখ্য বাহুর দ্বারা জগৎসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন এবং কোটি কোটি হস্তের দ্বারা সংহার করিতেছেন, সূর্য ও চন্দ্রসকল যাঁহার চক্ষু, ইঁহার মুখমন্ডলে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত, এবং নিজ তেজবহ্নিতে তিনি নিরন্তর নিখিল বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন। তাঁহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও চমৎকার; একাকীই তাহা দিক্সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সমগ্র ব্যবধান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ভীতান্তঃকরণে স্তব করিতে-করিতে সুরসঙ্ঘ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "শান্তি হউক, কল্যাণ হউক" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বহুলভাবে স্তব করিতেছেন। দেবগণ, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব যক্ষ অসুরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতেছে। তাঁহার নয়নসকল প্রদীপ্ত ও বিশাল; তাঁহার মুখমন্ডল করাল দংষ্ট্রাযুক্ত এবং ভক্ষণ করিবার জন্য বিস্ফারিত; প্রলয় কালের হুতাশন সদৃশ তাঁহার ভীষণ আনন।† সেই মহাযুদ্ধে উভয়পক্ষের

† অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ১১।১৮-২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ১১।২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ১১।২২
† রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

নৃপতিগণ, সেনাপতিগণ, বীরগণ তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেহ-কেহ তাঁহার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধি-স্থলে সংলগ্ন, তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে; যেমন বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় অথবা যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনিই লোকসমূহ অবশভাবে মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তাঁহার অগ্নি-ময় মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই সকল প্রদীপ্ত বদন লইয়া সেই করাল মূর্তি চারিদিক লেহন করিতেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার অগ্নিময় তেজে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার অত্যুগ্র দীপ্তিতে সন্তপ্ত। জগৎ এবং তাহার লোক-সমূহ ধ্বংসভয়ে কম্পিত ও ব্যথিত, এবং চারিদিকে যে ভয় ও যন্ত্রণা অর্জুনও তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই করাল মূর্তি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই উগ্র মূর্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কারণ তোমার সংকল্প ও কর্মধারা আমি বুঝিতেছি না।"

অর্জুনের এই যে শেষ প্রশ্ন ইহার মধ্যে বিশ্বরূপের দুইটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইটি হইতেছে সনাতন চির-পুরাতন বিশ্বপুরুষের রূপ, সনা-

---

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ১১।২৩-৩১

তনম্ পুরুষম্ পুরাণম্, ইনিই চিরকাল সৃষ্টি করিতেছেন কারণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইঁহারই দেহে দৃশ্য দেবগণের মধ্যে একজন, তিনি হইতেছেন সর্বদা জগতের স্থিতি, কারণ তিনিই শাশ্বত ধর্মসকলের প্রতিপালক, কিন্তু তিনিই আবার সর্বদা ধ্বংস করিতেছেন যেন পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি নটরাজ রুদ্র, তিনি কালী মুণ্ডমালা পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য করিতেছেন এবং নিহত অসুরগণের শোণিতে নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন, তিনিই ঘূর্ণ্যাবর্ত, দাবানল, ভূমিকম্প, তিনিই দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, ধ্বংস এবং সর্বগ্রাসী সমুদ্র। আর এই যে তাঁহার শেষোক্ত রূপ, এইটিই তিনি এখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের মন স্বভাবতই প্রত্যাবৃত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় যে সে নিজে না দেখিলে হয়ত বা সেই ভীষণমূর্তি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মানুষের দুর্বল হৃদয় শুধু চায় মনোরম ও আরামদায়ক সত্য, আর তাহা না পাওয়া গেলে চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী; ইহা সত্যকে তাহার পূর্ণতায় চায় না কারণ তহার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যাহা স্পষ্ট নহে, মনোবম নহে, আরামপ্রদ নহে, পরন্তু বুঝা কঠিন এবং সহ্য করা আরও কঠিন। অপক্ক ধর্মপন্থী, তরলবুদ্ধি আশাবাদী, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ, নির্মম সিদ্ধান্তসকলকে, বিশ্বজগতের কর্কশ ও ভীষণ দিকগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চায়। ভারতের ধর্মকে অনেকেই অজ্ঞভাবে নিন্দা করিয়া থাকে কারণ উহা এই লুকোচুরি খেলায় যোগ দেয় না, বরং ভগবানের যেমন মধুর ও সুন্দর ভাবগুলির তেমনিই ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাব সুদীর্ঘ চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মসাধনার গভীরতা ও উদারতার কল্যাণে ইহা এই সব দৌর্বল্যসূচক সঙ্কোচ অনুভব করে নাই বা সে-সবকে প্রশ্রয় দেয় নাই।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা জানে যে, ভগবান প্রেমময়, শান্তিময় এবং সুস্থির শাশ্বত,—যে গীতা আমাদিগকে এই সব ভীষণ রূপ দর্শন করাইয়াছে, সেই গীতাই বলিয়াছে যে, ভগবান সর্বভূতের প্রেমিকরূপে, সুহৃদরূপে তাহাদের মধ্যে প্রকট। কিন্তু তাঁহার দিব্যভাবে জগৎপরিপালনের নির্মম দিকও রহিয়াছে, ধ্বংসের দিক, এবং তাহা প্রথম হইতেই আমাদের চক্ষে পড়ে; এইটিকে দেখিতে অস্বীকার করার অর্থ ভগবদ্ প্রেম, শান্তি, ও আনন্ত্যের পূর্ণ মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হওয়া, এমন কি তাহার উপরে একটা পক্ষপাত ও মিথ্যার ভাব আরোপ করা হয়, কারণ ইহাকে যে একান্ত প্রীতিদায়ক রূপ দেওয়া হয়, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহার প্রকৃতির সহিত যেটির মিল হয় না। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর প্রয়াসের জগৎ, ইহা ভীষণ, বিপজ্জনক, ধ্বংসকারী, গ্রাসকারী জগৎ, এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের আত্মা

ও দেহ এখানে অসংখ্য বিপদের মধ্যে বিচরণ করে, এইটি এমন জগৎ যে এখানে আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, কোন না কোন জিনিসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়, এখানে জীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস মরণেরও নিশ্বাস। যাহা কিছু অশুভ বলিয়া, ভীষণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, সে-সবের দায়িত্ব একটি প্রায়-সর্বশক্তিমান শয়তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া, অথবা প্রকৃতির অংশ বলিয়া উপেক্ষা করা এবং এইভাবে ভগবদ্ প্রকৃতি এবং জাগতিক প্রকৃতির মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করা, যেন প্রকৃতি ভগবান ছাড়া একটা কিছু, অথবা সমস্ত দায়িত্ব মানুষ এবং তাহার পাপের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, যেন জগৎ কিরূপ হইবে সে-বিষয়ে তাহার মতের খুব প্রাধান্য ছিল বা সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিত—এইসব কৌশলের দ্বারা লোকে যে কোনরকমে নিজেদের ভুলাইতে চায়, ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা কখনও এ-সবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে সাহসভরে সত্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবানই নিজের সত্তার মধ্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এমনি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ করিতেছে, কাল জীব-সকলের জীবন গ্রাস করিতেছে সর্বব্যাপী ও অপরিহার্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্র শক্তিসকলের প্রচণ্ডতা, এই সব হইতেছে পরম ভগবানেরই বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ভগবান মুক্ত-হস্ত অমিত সৃষ্টিকর্তা, সাহায্যদাতা, শক্তিমান ও করুণাময় রক্ষাকর্তা, আবার সেই ভগবানই গ্রাসকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। সুখ, মাধুর্য ও আনন্দ যেমন তাঁহার স্পর্শ, তেমনই যে দুঃখ ও অশুভের পীড়ন-যন্ত্রে আমরা দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করি তাহাও তাঁহারই স্পর্শ। যখন আমরা পূর্ণ মিলনের দৃষ্টি লইয়া দেখি এবং আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে এই সত্য অনুভব করি, কেবল তখনই আমরা সেই ছদ্মবেশেরও পশ্চাতে সর্বমঙ্গলময় ভগবানের শান্ত ও সুন্দর মুখ পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে পারি, এবং এই যে বেদনার স্পর্শ আমাদের দোষ-ত্রুটির পরীক্ষা করে তাহার মধ্যেই বন্ধুর স্পর্শ, মানুষের আধ্যাত্মজীবন-বিকাশকর্তার স্পর্শ উপলব্ধি করিতে পারি। জগতে যে-সব দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সে-সব ভগবানেরই দ্বন্দ্ব-বিরোধ, আর কেবল সেই সবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া যাইয়াই আমরা তাঁহার পরম সামঞ্জস্যের মহত্তর সুরসঙ্গতিগুলির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত আনন্দের শিখর ও অনন্তপ্রসারী পুলকস্পন্দনসকলের মধ্যে উপনীত হইতে পারি।

গীতা যে-সমস্যাটি তুলিয়াছে এবং তাহার যে সমাধান দিয়াছে, তাহাতে বিশ্বপুরুষকে এই স্বরূপেই দেখাইতে হয়। সমস্যাটি হইতেছে এক বিরাট

যুদ্ধের, ধ্বংসের, হত্যাকাণ্ডের—যাহা সর্বনিয়ন্তা ভগবদিচ্ছার দ্বারাই আনীত হইয়াছে এবং তাহাতে চির-অবতার নিজে প্রধান যোদ্ধার রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ যিনি দর্শন করিতেছেন তিনি নিজেই সেই প্রধান যোদ্ধা, সংগ্রামপরায়ণ মানবাত্মার প্রতিভূ তিনি, তাঁহাকে তাঁহার ক্রম-বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নির্মম ও অত্যাচারী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে এবং এক উচ্চতর অধিকারের, মহত্তর ধর্মের রাজ্য স্থাপন ও উপভোগ করিতে হইবে। যে-বিরাট উপপ্লবে আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করে, জাতি-সকল সমূলে বিনষ্ট হয়, সমগ্র সমাজই বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের আবর্তে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তাহার ভীষণ স্বরূপে বিকল হইয়া তিনি পিছাইয়া পড়িয়াছেন, নিয়তির নির্ধারিত কর্ম করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার দিব্য বন্ধু ও দিশারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন তাঁহাকে এই ভীষণ কর্মে নিযুক্ত করা হইল, কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি? তখন তাঁহাকে দেখান হইয়াছে, যে-কোন কর্মই সে করুক না কেন, কেমন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সেই কর্মের বাহ্যিক স্বরূপের উপরে উঠা যায়, কেমন করিয়া দেখা যায় যে, কার্যনির্বাহিকাশক্তিরূপিণী প্রকৃতিই কর্মের কর্ত্রী, তাঁহার প্রাকৃত সত্তা যন্ত্রস্বরূপ, ভগবান প্রকৃতির এবং কর্মসকলের অধীশ্বর, কোনরূপ বাসনা বা স্বার্থপরতা না রাখিয়া সকল কর্মই যজ্ঞরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আরও দেখান হইয়াছে যে, ভগবান এই সব জিনিসের ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, তাহাদের স্পর্শের অতীত, অথচ তিনি মনুষ্যে ও প্রকৃতিতে ও তাহাদের কর্মে নিজেকে প্রকট করিতেছেন এবং সংসারের সব কিছুই ভগবানের এই লীলাবর্তের অঙ্গ। কিন্তু এখন তাঁহাকে এই সত্যের মূর্তিমান বিগ্রহের সম্মুখীন করা হইল, এই মহান ভগবদ্ রূপের মধ্যে তিনি ভীষণতা ও ধ্বংসের দিকটিকে অতিশয় পরিবর্ধিতাকারে দেখিলেন, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ বিশ্বপুরুষকে এমন করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে হয় কেন? এই যে মর-জীবন সৃজন ও ধ্বংসের বহ্নিতে এই জগৎব্যাপী সংগ্রাম, অনর্থকারী বিপ্লবের এইরূপ পুনঃ-পুনঃ সংঘটন, জীবগণের এই কষ্টকর প্রয়াস, নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা ও মৃত্যু—এ-সবের কি অর্থ? তিনি সেই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শাশ্বত প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন—"আমাকে বল, এই উগ্রমূর্তিধারী তুমি কে? আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; কারণ আমি তোমার সংকল্প ও কর্মধারা কিছুই জানি না। তুমি প্রসন্ন হও।" *

* আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ১১।৩১

ভগবান উত্তর দিলেন, 'ধ্বংসই আমার কর্মের সংকল্প, সেই সংকল্প লইয়াই আমি এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ("ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" মানবের কর্মক্ষেত্রেরই রূপক) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই জগৎব্যাপী ধ্বংসকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা অনিবার্যরূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক বা না দিক কিছুতেই সে-উদ্দেশ্যকে বাধা দিতে, পরিবর্তন করিতে বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না; মানুষ পৃথিবীতে আদৌ তাহা সম্পন্ন করিবার পূর্বে আমার সংকল্পের শাশ্বত দৃষ্টিতে আমি পূর্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি। মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংস করিতে হয় এবং নূতন, মহান, গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়। এই যুদ্ধ তুমি নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহাতে ভাগবত শক্তি ও জ্ঞানের মানবীয় যন্ত্রস্বরূপ তোমাকে ধর্মের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ধর্মবিরোধীগণকে নিধন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে। প্রকৃতিতে আবির্ভূত মানবাত্মা তুমি, আমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তোমাকে যে ফল প্রদান করিব, ধর্ম ও ন্যায়ের রাজ্য, তাহাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়—তোমার আত্মায় ভগবানের সহিত এক হওয়া, তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লওয়া, তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করা, জগতে এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, শান্তভাবে তাহা অবলোকন করা।' "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি, লোকসকলকে ধ্বংস করাই এখানে আমার সংকল্প ও কর্মধারা। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না। * অতএব উঠ, যশোরাশি লাভ কর, তোমার শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। তাহারা ইতিপূর্বে আমারই দ্বারা নিহত হইয়া আছে, হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্ত-মাত্র হও। আমার দ্বারা যাহারা নিহত হইয়াছে সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে বধ কর, ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইও না। যুদ্ধ

* কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ১১।৩২-৩৪

কর, তুমি শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে।" এই মহান ও ভীষণ কর্মের ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, মানুষ যে বাসনার বশবর্তী হইয়া ফল কামনা করে সে ফল নহে—কারণ কর্ম-ফলে আসক্তি রাখা চলিবে না—পরন্তু ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ, যে-কার্যটি করিতে হইবে তাহার সম্পাদনের গৌরব ও সাফল্য, এই গৌরব ভগবান বিভূতি-রূপে নিজেকেই দিতেছেন। এই ভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান নায়ককে কর্মে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করা হইল।

যিনি কালের অতীত তিনিই মহাকাল ও বিশ্ব-পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ ভগবান যখন বলিলেন, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ, আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী মহাকাল, তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে, তিনি শুধুই মহাকাল এবং মহাকালের সমগ্র মূল তত্ত্বই হইতেছে ধ্বংস করা। কিন্তু এইটিই বর্তমানে তাঁহার সংকল্প ও কর্মধারা, প্রবৃত্তি। ধ্বংস সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে চলে, এবং ধ্বংস ও নব-সৃষ্টি করিতে করিতেই জীবনের অধীশ্বর তাঁহার সুদীর্ঘ রক্ষা-কার্য সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। অন্তর রাজ্যে যে-মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা জনসমাজ বা জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশী দিন ধরিয়া ইতস্তত করে, সে নিজেই ধ্বংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে অন্য রাষ্ট্র, জনসমাজ এবং জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে যে-সব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদ্‌বিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। যে-কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়া দিতে চায়, সে বিশ্ব-পুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথা চেষ্টা করে। যে-কেহ তাহার নিম্নতন প্রকৃতির দুর্বলতার জন্য ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায় (যেমন অর্জুন প্রথমে চাহিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই ভগবান তাহার এই কাতরতাকে মিথ্যা কৃপা, অযশস্কর অনার্যসেবিত অস্বর্গ্য ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্বল্য বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন) সে প্রকৃত ধর্মের পথ অনুসরণ করিতেছে না, পরন্তু প্রকৃতির কর্মের এবং জীবনের যে-সকল রূঢ়তর সত্য সেইগুলির সম্মুখীন হইবার অধ্যাত্ম সাহসেরই অভাব দেখাইতেছে। মানুষ যুদ্ধের নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে কেবল তাহার মধ্যে অমৃতত্বের মহত্তর নীতি আবিষ্কার করিয়া। কেহ কেহ ইহাকে সেইখানে সন্ধান করেন যেখানে ইহা নিরন্তর রহিয়াছে, শুদ্ধ আত্মার ঊর্ধ্বতন স্তর-

সকলে, এবং ইহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা মৃত্যুর কবলিত সংসার হইতে সরিয়া যাইতে চাহেন। এইরূপে ব্যক্তিগত সমাধান মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির বা জগতের কোনই লাভ হয় না, অথবা শুধু এইটুকু ফল হয় যে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহাদিগকে যে তাহাদের ক্রমবিকাশের দুষ্কর পথে সাহায্য করিতে পারিত, সেই সাহায্যটুকু হইতেই তাহারা বঞ্চিত হয়।

তাহা হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, দিব্য কর্মী, বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র, তিনি যখন দেখিবেন যে, বিশ্ব-পুরুষ এক বিরাট বিপ্লবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সংহারক মহাকালরূপে লোকসকলকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উত্থিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেও স্থূল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা-রূপে অথবা লোকসকলের নেতা, দিশারী বা অনুপ্রেরকরূপে সম্মুখে আনা হইয়াছে (তাঁহার স্বভাবজ অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁহাকে এই অবস্থায় আনিবেই, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা), তখন তিনি কি করিবেন? তিনি কি বিরত হইবেন, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, ঐ কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিবাদ করিবেন? কিন্তু বিরত হইয়া কোনও লাভ নাই, তাহাতে ঐ সংহারক ইচ্ছার পরিপূরণ নিবারিত হইবে না, বরং ঐ ছিদ্রকে ধরিয়া অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠিবে। ভগবান বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিলেও, আমার এই ধ্বংসের সংকল্প পূর্ণ হইবেই, ঋতেঽপি ত্বাং। যদি অর্জুন বিরত হন, এমন কি যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও সংঘটিত না হয়, সেই বিরতির ফলে অবশ্যম্ভাবী উপপ্লব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কারণ এই সব জিনিস কেবল আকস্মিক ঘটনা নহে, যে অনিবার্য বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যেমন কর্ম তেমন ফল হইবেই। তাঁহার প্রকৃতিও তাঁহাকে সত্য-সত্যই বিরত হইতে দিবে না, প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিয়োক্ষ্যতি। গুরু শেষে অর্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেনঃ—"অহঙ্কারের বশে তুমি যে জল্পনা করিতেছে, 'আমি যুদ্ধ করিব না', তোমার সে-সঙ্কল্প বৃথাই। প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্মে নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবজনিত স্বীয় কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।" * তাহা হইলে কি অন্যপন্থা অবলম্বন করিবে, স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কোনরকম অধ্যাত্ম শক্তি, যৌগিক শক্তি ও প্রণালী প্রয়োগ করিবে? কিন্তু সেইটিও হইবে ঐ কর্মেরই কেবল আর একটি রূপ; তাহাতেও ধ্বংস সংঘটিত হইবে, আর এই ভাবে

* যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৮।৫৯,৬০

যে অন্য পন্থা অবলম্বন তাহাও বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে, ব্যক্তিগত অহংয়ের ইচ্ছা অনুসারে নহে। এমন কি ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আরও ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, এবং কালী আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভীষণতর অট্টহাসির রোলে জগৎকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় শান্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে; বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। তবে কি প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে? এই যে মানবজাতি এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাকে প্রেম ও ঐক্যের বাণী শুনাইতে হইবে? প্রেম ও ঐক্যধর্মের প্রচারক থাকিবেনই, কারণ শেষ পর্যন্ত ঐ পথেই মুক্তি আসিবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কালধর্ম যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাহিরের সত্যের পরিবর্তে ভিতরের সত্য, দৃশ্যমান সত্যের পরিবর্তে পরম সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। খ্রীস্ট ও বুদ্ধের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া গেল, কিন্তু রুদ্র এখনও তাঁহার কবলে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী শক্তিসকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্য ভীষণ ও দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে।

তাঁহার জন্য যে নির্ধারিত শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা হইতেছে অহংভাবশূন্য হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করা, যাহা ভগবদ্‌নির্দিষ্ট বলিয়া তিনি দেখিতে পাইতেছেন তাহারই মানবীয় নিমিত্ত ও যন্ত্র হওয়া, তাঁহার মধ্যে, মানুষের মধ্যে, যে-ভগবান রহিয়াছেন সর্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখা, মাম্ অনুস্মরন্, তাঁহার প্রকৃতির অধীশ্বর তাঁহাকে যে-পথে চালাইবেন সেই পথই অনুসরণ করা। নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্। কাহারও প্রতি তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা, ক্রোধ, ঘৃণা পোষণ করিবেন না, স্বার্থপর বাসনা বা আবেগের বশবর্তী হইবেন না, দুর্দান্ত অসুরের ন্যায় দ্বন্দ্বের দিকে ধাবিত হইবেন না, উপদ্রব ও ধ্বংসের জন্য উন্মত্ত হইবেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য করিবেন লোকসংগ্রহায়। কার্যটির ঊর্ধ্বে তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন কার্যের লক্ষ্যের দিকে, যাহার জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেছেন। কারণ মহাকালরূপী ভগবান ধ্বংস করেন শুধু ধ্বংসের জন্যই নহে পরন্তু এক মহত্তর ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, প্রগতিশীল বিবর্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য। বহির্মুখী মন যাহা দেখিতে পায় না, এই যুদ্ধের মহত্ত্ব, জয়ের গৌরব, তিনি গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিবেন; যদি প্রয়োজন হয় তিনি সেই জয়েরই গৌরব গ্রহণ করিবেন যাহা পরাজয়ের ছদ্মবেশে আসে, এবং মানুষকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগের দিকেই লইয়া যায়। বিশ্বসংহারমূর্তির আনন দর্শনে ভীত না হইয়া, তিনি ইহার মধ্যে দেখিবেন

সেই শাশ্বত আত্মাকে যিনি সকল বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর এবং ইহার পশ্চাতে দেখিবেন সেই চির-সারথির মুখ যিনি মানবের পথপ্রদর্শক, সব ভূতের সুহৃদ, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্। এই করাল বিশ্বরূপ দর্শন করা হইল, স্বীকার করা হইল, তাহার পর এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে এই আশ্বাসময় সত্যটিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে; পরিশেষে শাশ্বতের এক অধিকতর হৃদয়-গ্রাহী মুখ ও মূর্তি দর্শন করান হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ দর্শন

দুই ভাব

সেই ভীষণ বিশবরূপদর্শনের প্রভাব তখনও অর্জুনের উপর রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অর্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে-কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই-মৃত্যু ও ধ্বংসমূর্তির পশ্চাতে যে মহত্তর উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই নির্দেশে পূর্ণ। তিনি বলিয়া উঠিলেন, * "হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনতমস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। হে মহাত্মা! তোমাকে তাঁহারা কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ তুমিই আদি স্রষ্টা ও কর্মকর্তা, তুমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তুমিই পরাৎপর। তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি আদি-দেব এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই পরম-ধাম; হে অনন্তরূপ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে। * যম, বায়ু, অগ্নি, সোম, বরুণ, সবই তুমি; তুমি প্রজাপতি, জীব-

* স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ১১।৩৬

* কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ১১।৩৭-৪০

সকলের পিতা এবং প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃ-পুনঃ সহস্র-সহস্রবার নমস্কার, সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে তোমাকে নমস্কার, সকল দিক হইতে তোমাকে নমস্কার, কারণ যাহা কিছু আছে সে-সবই তুমি। তুমি অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম, তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব।

এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানব-মূর্তি লইয়া মরদেহে তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি দিব্য মানব, দেহধারী ভগবান, অবতার—কিন্তু ইতিপূর্বে অর্জুন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার মানব স্বরূপটিই দেখিয়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই মত ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতে যে ভগবান বিরাজিত, মানবরূপটি যাঁহার কেবল একটি আধার, একটি প্রতীক মাত্র, তাঁহাকে তিনি দেখিতে পান নাই, তাই এখন তাঁহার অন্ধ অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্য তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।* "হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানবসখা মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে, তোমার প্রতি যত কিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয় আমার সে সব অপরাধ ক্ষমা কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।* ত্রিজগতে

* সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১।৪১-৪২

* পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

তোমার সমানই কেহ নাই, তাহা হইলে হে অমিতপ্রভাব, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? অতএব হে বন্দনীয় ঈশ্বর! তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমি দেখিয়াছি ও পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার সেই অন্য রূপটি দেখাও। আমি পূর্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর।

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই করাল রূপ-সকলের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ত্ব যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল-বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, এমন কি ধ্বংসের মধ্যে সর্বভূত-সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, অশুভের মধ্যে শুদ্ধ অপরিবর্তনীয় কল্যাণরূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতত্বের অধিপতিকে দেখিতে পাই। দিব্যকর্মের অধীশ্বরের করালমূর্তির সম্মুখ হইতে অন্ধকারের দুর্দান্ত দানবীয় শক্তিসকল, রাক্ষস সকল, নিহত, পরাজিত, অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জানেন ও কীর্তন করেন এবং তাঁহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি। বাস্তবিক কাহারও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে—অশুভ, অজ্ঞান, নিশা-চমূ, রাক্ষসী শক্তিসংঘ। করাল রুদ্রের যত গতি, যত ক্রিয়া সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা।

কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবদ্‌পুরুষ, ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক, এই সব সসীম বস্তুর ধ্বংসকর্তা মহাকাল; কিন্তু নিজের সত্তায় তিনি অনন্ত, বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাঁহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া নিশ্চিতভা'ব বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্বদা উদ্ভাবনশীল সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টিশক্তির মূর্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান; তাঁহার যে ত্রয়ীভাব, স্থিতি

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ১১।৪৩-৪৬

ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাবরূপে তিনি ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্য সৃষ্টি তাহা শাশ্বত; তাহা হইতেছে সসীম জিনিসের মধ্যে অনন্তের নিত্য প্রকাশ, পরমাত্মা তাঁহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্যে নিজেকে চিরকাল লুক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিনি সনাতন, অক্ষর; সৎ অসৎ, ব্যক্ত চির-অব্যক্ত, যে-সব জিনিস ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিস আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিস ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে—এ-সব তাঁহারই দুই ভাব। কিন্তু এই সকলের ঊর্ধ্বে তিনি যাহা তাহা হইতেছে তৎ পরং, পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিসকে কালের এক আনন্ত্যের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, সেখানে সবই চির-বিরাজমান। তাঁহার অক্ষর সত্তা রহিয়াছে কালের অতীত আনন্ত্যে, কাল এবং সৃষ্টি তাহারই চির-প্রকাশমান রূপ।

তাঁহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে; যুগপৎ ও পরস্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামঞ্জস্য সেই এক সত্য হইতে উদ্ভূত এবং এই সকলকে লইয়াই সেই সত্য। এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার, যাঁহার পরমা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নীচের রূপ; তিনি পুরাণ পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন; তিনি আদিদেব সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্তা, তাঁহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা; তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন; তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়, যিনি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নববিকাশ তাঁহারই আংশিক প্রকাশ, আর আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গ ভাবে, গভীর ভাবে, সমগ্র ভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। তিনি উচ্চ পরম সংস্থান, পরং নিধানং, বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি করিতেছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজেরই সত্তার মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহার সর্ব-জয়ী শক্তি দ্বারা, তাঁহার অলৌকিক আত্মরূপায়ণ, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টির আনন্ত্যের দ্বারা। তাঁহার অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই সমগ্র বিশ্ব। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি, জীবগণের পিতা, সকলেই তাঁহার সন্ততি, তাঁহার প্রজা। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা, এই সকল বিভিন্ন জাতির জীবগণের দিব্য স্রষ্টা যাঁহারা, তিনি তাঁহাদের পিতার পিতা, প্রপিতামহ। এই সত্যটির উপর পুনঃ-পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই তিনি, সর্ব্বঃ। তিনি অনন্ত

বিশ্বসত্তা আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক বস্তুই তিনি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা রহিয়াছে তাহা তিনিই, তিনি অনন্ত তেজ যাহা অসংখ্য বস্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিতেছে, তিনি অপ্রমেয় ইচ্ছা এবং গতি ও কর্মের মহতী বীর্য নিজের মধ্য হইতে কালের সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে আত্মার সমুদয় ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন করিতেছেন।

এই সত্যটির উপর পুনঃ-পুনঃ জোর দেওয়ায় মানুষের মধ্যে এই যে মহান ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাঁহার কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। বিশ্বরূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমত, তাঁহার উপলব্ধি হইল, এই যে মানব-সন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এক স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং যাঁহার সহিত তিনি কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে, মন্ত্রণা পরিষদে এবং সাধারণ ব্যাপারে কর্মী হইয়াছেন, ইঁহার দেহে, মর মানবের এই মূর্তিটির মধ্যে বরাবরই একটি মহান ও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুক্কায়িত ছিল,—এক দেবতা, এক অবতার, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক বিশ্বাতীত পরম সত্তা। এই যে গুহ্য দেবত্ব, যাহার মধ্যে মানুষ এবং তাহার সমগ্র ইতিহাসের তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব-জীবন অনির্বচনীয় মহত্বপূর্ণ নিগূঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অর্জুন এই দিকে অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে ভগবান, প্রকৃতির এই প্রতীকের মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পরম পুরুষ। দৃশ্যমান বস্তু সকলের এই যে বিরাট, অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বরূপ যিনি প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই যাঁহার আবাস-গৃহ, অর্জুন কেবল এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কারণ সেই মহান সত্তা সমান এবং অনন্ত, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে তিনি একই। আর প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার অন্ধতা, ভগবানের প্রতি সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার, তাঁহার সহিত কেবল মানসিক ও শারীরিক সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু না দেখা—তাঁহার পক্ষে এ-সব হইয়াছে সেই মহান শক্তিময়ের বিরুদ্ধে পাপ। কারণ যাঁহাকে তিনি কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই এই অপ্রমেয় মহত্ত্ব, এই অতুলনীয় বীর্য, এই সর্বভূতস্থিত আত্মা যাঁহার সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ। মানবীয় তনুটিকে অবজ্ঞা না করিয়া সেইটিকে আশ্রয় করিয়া যিনি বিরাজিত তাঁহাকেই বিস্ময়, ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তাঁহার দেখা ও উপাসনা করা উচিত ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যাহা মূর্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য, বিশ্বরূপের করাল

স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্মক রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নহে। সেই ঐক্যসাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। কিন্তু শুধু এইটির দ্বারা বিশ্বাতীত সত্তা এবং নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ এই সসীম জীবাত্মার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপের যে পূর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতার পক্ষে তাহা অসহনীয়। একটি যোগসূত্র চাই যাহার সাহায্যে সে বিরাট বিশ্বপুরুষকে দেখিতে পারে নিজের ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তায়, নিজের সন্নিকটে। তিনি শুধু তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও অপ্রমেয় বীর্যের দ্বারা তাহার সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পরন্তু মানবীয় মূর্তিতে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধেব ভিতর দিয়া তাহাকে ঐক্যের মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন। যে-ভক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব অনন্তের সম্মুখে প্রণত হয়, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুর্যে ভরিয়া উঠে এবং সখ্য ও ঐক্যের নিগূঢ়তম সত্যের সমীপবর্তী হয়, যখন তাহা গভীর হইয়া অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হয়, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব করা যায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যায়। কারণ ভগবান মানব আত্মা, মানব দেহের মধ্যে বাস করেন। তিমি পরিচ্ছদের ন্যায় মানবীয় মন ও মূর্তির দ্বারা নিজেকে আবরিত করেন। মরদেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা পরস্পরের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সে-সব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি, এখানে গীতার কথাগুলির মধ্যে ইহার বীজ রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহাদের অধিকতর গভীর, আনন্দময় ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আর এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেই আর একটি তত্ত্ব আপনিই উদ্ভূত হইতেছে। এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ, ইহা বীর্যের উৎস, এই দর্শন সমতা সাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিসের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্বোধ্য। এই যে সর্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্মধারা, ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্তী রূপও আছে, সেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকট, এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি

চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয়ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধ্যবর্তী রূপটিই সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। কারণ যে-সত্য আশ্বাস প্রদান করে, নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রতীক। বিশ্বের কর্মধারাসকল তাহাদের বিরাট আবর্তন, পশ্চাৎ-গতি. অগ্রগতির ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা ও অন্তর্জীবনের পক্ষে যে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি লাভ করে, যেটি তাহাদের অত্যাশ্চর্য কল্যাণময় লক্ষ্য, সেইটি অন্তরঙ্গ, দৃশ্য, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমূর্তির সাহায্যে। এই মানবীয় ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও সান্নিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম,—মানুষের সহিত ভগবানের নিত্য সাহচর্য। মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবনযাপন করে, ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্যময় জগৎলীলাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছাসকলই পূর্ণ করেন। আর মানুষের এই পরিণামেরও পরে হইতেছে অধিকতর আশ্চর্যময় ঐক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরসকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস করা।

অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণ রূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, স্বকং রূপম্. প্রসাদ ও প্রেম ও মাধুরী ও সৌন্দর্যের বাঞ্ছনীয় মূর্তি *। কিন্তু অন্য যে বিরাট মূর্তিটি তিনি সম্বরণ করিতেছেন সেইটির অপরিমেয় গূঢ়ার্থের কথা প্রথমেই বলিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহা তুমি এখন দেখিতেছ, ইহা আমার পরম মূর্তি, আমার তেজোময় রূপ, বিশ্বাত্মক, আদ্য, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্যন্ত আর কোন মানব দেখিতে পায় নাই। † আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি। কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম পুরুষ নিজেকে বিশ্বলীলায় প্রকট করিয়াছেন; আমার সঙ্গে যে পূর্ণযোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না, কারণ ইহার বাহ্যরূপে যাহা ভয়ঙ্কর ও দঃসহনীয় আছে সে শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু ইহার মহান ও আশ্বাসময়

* ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ১১।৫০

† ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ১১।৪৭

নিগূঢ় মর্মও উপলব্ধি করিতে পারে। আর তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া আমার এই ঘোর রূপ দর্শন করা *; কিন্তু তোমার নিম্নতন প্রকৃতি এখনও ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্থৈর্যের সহিত দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার নারায়ণ রূপ ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথকভাবে, মানবীয় শক্তির অনুযায়ী প্রশমিত ভাবে সুহৃদরূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আনুকূল্য ও আনন্দকে দেখিতে পায়।" মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন, † "কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই ঐ রূপ দেখিতে পান। দেবতাগণই নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না, ইহাকে দেখা যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা সর্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।"

কিন্তু তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমন কি তাহার অধ্যাত্ম সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে সে রূই দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিকভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাঁহার ব্যষ্টি-গত, বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য, যাহাতে এক সময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, সবই

* মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ১১।৪৯

† সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ১১।৫২-৫৪

* মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

এখানে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা যাহা পূর্ণ বিকশিত কর্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয়, এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাঁহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়,—সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের ঊর্ধ্বে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দী সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহা কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান বলিলেন, "আমার কর্ম কর, আমাকে পরম পুরুষ, পরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার কর, আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জন কর, সর্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও; কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।" অন্য কথায়, নিম্নতন প্রকৃতিকে জয়, সর্বভূতের সহিত ঐক্য, বিশ্বাত্মক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্মে ভগবদিচ্ছার সহিত ঐক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি পূর্ণতম প্রেম,—ইহাই হইতেছে পন্থা যাহা দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পথ ও ভক্ত

গীতার একাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাকে কতকটা পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। দিব্য কর্মের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে-আত্মা জগতের মধ্যে এবং ইহার জীবসকলের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে জগতের সকল ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। তাহার সহিত যোগে, জগতের হিতের জন্য সে-কর্ম করিতে হইবে, এবং বিভূতি সে আদেশ মানিয়া লইয়াছেন। শিষ্যকে তাহার সাধারণ মানবোচিত পুরাতন ভাব, তাহার অজ্ঞানের আদর্শ, উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থচেতনা হইতে ফিরান হইয়াছে। শেষকালে তাহার অধ্যাত্ম সংকটের সময় যে-সব আর তাহার কোন কাজেই লাগে নাই তা থেকেও। সেই প্রতিষ্ঠায় যে-কর্মটিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘোর কর্ম, ভয়াবহ প্রয়াসকেই তিনি এখন স্বীকার করিতে, এক নূতন আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক সমন্বয়কারী মহত্তর জ্ঞান, এক দিব্যতর চৈতন্য, এক উচ্চ নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য, যে ভগবদিচ্ছা অধ্যাত্ম প্রকৃতির জ্যোতি হইতে উৎসারিত এবং তাহারই হইয়া প্রেরণাশক্তি লইয়া জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সহিত ঐক্যের আধ্যাত্মিক স্থিতি—ইহাই হইতেছে কর্মের নূতন আভ্যন্তরীণ নীতি, ইহাই পূর্বতন অজ্ঞান কর্মকে রূপান্তরিত করিয়া দিবে। যে-জ্ঞান ভগবানের সহিত ঐক্য স্থাপন করে এবং ভগবানের ভিতর দিয়া সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত সজ্ঞান একত্বে উপনীত হয়, যে-সংকল্প অহংভাবশূন্য, যাহা কেবল কর্মের নিগূঢ় অধীশ্বরের আদেশে তাঁহার যন্ত্ররূপে কাজ করে, যে দিব্য প্রেমের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পরম পুরুষের সহিত অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা, এই তিন শক্তির পূর্ণতা ও একত্বের দ্বারা সংসিদ্ধ বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্বপুরুষ ও প্রকৃতি এবং সকল জীবের সহিত যে আভ্যন্তরীণ সর্বব্যাপী একত্ব—এই গুলিকেই তাঁহার কর্মসকলের ভিত্তি করিবার জন্য মুক্ত পুরুষকে বলা হইয়াছে। কারণ সেই ভিত্তি হইতেই তাঁহার আভ্যন্তরীণ আত্মা নিরাপদে প্রকৃতিকে যন্ত্ররূপে কাজ করিতে দিতে পারে; তিনি সকল প্রকার বিচ্যুতির কারণের উপরে উঠেন, অহংকার ও তাহার সকল সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হন, পাপ ও অশুভ বা কর্মফল ভোগের সকলপ্রকার ভয় হইতেই পরিত্রাণ লাভ করিয়া, বাহ্য প্রকৃতি এবং সীমাবদ্ধ কর্মের যে-বন্ধন হইতেছে অজ্ঞানের গ্রন্থি তাহা অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি

তখন জ্যোতির শক্তিতে কর্ম করিতে পারেন, অস্পষ্ট আলোকে বা অন্ধকারে নহে, এবং ভগবদ্ সম্মতি তাঁহার আচরণের প্রতি পদক্ষেপকেই সমর্থন করে। আত্মার স্বাধীনতা এবং প্রকৃতিস্থ জীবের বন্ধন, এই দুইয়ের বিরোধের দ্বারা যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, আত্মার সহিত প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সমন্বয়ের দ্বারা তাহার সমাধান হইয়াছে। ঐ বিরোধ আছে অজ্ঞানের অধীন মনে; আত্মার জ্ঞানের সম্মুখে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

কিন্তু আরও কিছু বলিবার আছে, তাহা হইলেই এই মহান অধ্যাত্ম পরিবর্তনের অর্থটি সমগ্রভাবে পরিস্ফুট করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই অবশিষ্ট জ্ঞানটিরই অবতারণা করা হইয়াছে এবং পরবর্তী ছয় অধ্যায় ইহার বিকাশ সাধন করিয়া এক মহান চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এই যে জিনিসটি এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে, এইটি হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত বেদান্ত মতের সহিত গীতার শিক্ষার প্রভেদ লইয়া,—গীতা আত্মার সম্মুখে এক উদারতর ব্যাপক মুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছে। এখন আবার সেই প্রভেদটির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। প্রচলিত বেদান্তের পথ হইতেছে, কঠোর ও অনন্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া। যে-যোগ, যে-একত্বকে ইহা অধ্যাত্ম মুক্তির উপায় এবং সার তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেইটি হইতেছে শুদ্ধ জ্ঞানের যোগ, এক পরম অক্ষর, এক সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য সত্তার সহিত নিথর একত্ব—সে সত্তা অব্যক্ত ব্রহ্ম, অনন্ত, নিস্তব্ধ স্পর্শাতীত, উদাসীন, এই যে নানা সম্বন্ধের জগৎ এ-সবেরই বহু ঊর্ধ্বে। গীতা যে পথ দেখাইয়াছে তাহাতে অবশ্য জ্ঞানই অপরিহার্য ভিত্তি, কিন্তু তাহা হইতেছে সমগ্র জ্ঞান। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সর্বকর্মসাধনই প্রাথমিক অপরিহার্য পন্থা; কিন্তু গভীর এবং উদার প্রেম ও ভক্তিই হইতেছে অধ্যাত্ম সিদ্ধি এবং অমৃতত্বের আনন্দ লাভ করিবার পক্ষে বলবত্তম ও উচ্চতম শক্তি; সম্বন্ধাতীত অব্যক্ত সত্তা, উদাসীন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এইরূপ প্রেম ও ভক্তিতে কোনও সাড়া দিতে পারে না, কারণ এ-সব জিনিসের জন্য চাই একটা সম্বন্ধ, নিবিড় ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ ভাব। যে-ভগবানের সহিত মানবাত্মাকে এই নিবিড়তম ঐক্যে প্রবেশ করিতে হইবে, তিনি অবশ্য তাঁহার পরম পদে বিশ্বাতীত অচিন্ত্য সত্তা, সকল প্রকাশনের বহু ঊর্ধ্বে, পরব্রহ্ম; কিন্তু তিনিই আবার সর্বভূতের জীবন্ত পরম আত্মা। তিনি পরম ঈশ্বর, সকল কর্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু। তিনি একই সময়ে জীবের অন্তরপুরুষরূপে তাহার দেহ মন আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন, আবার সে-সবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও পরমাত্মা এবং এই সকল সমতুল্য রূপের মধ্যেই তিনি সেই এক শাশ্বত ভগবান। এই সমগ্র সমন্বয়সাধক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আত্মার চরম মুক্তিলাভের এবং প্রকৃতির কল্পনাতীত অচিন্ত্য সংসিদ্ধিলাভের প্রশস্ত দ্বার। এই যে-ভগবানে তাঁহার

সকল রূপের সম্মিলন হইয়াছে, ইহারই উদ্দেশ্যে আমাদের কর্ম, আমাদের ভক্তি, আমাদের জ্ঞানকে নিত্য আভ্যন্তরীণ যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই যে পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, বিশ্বের অতীত আবার ইহার আধারস্বরূপ আত্মা, ইহার অধিবাসী, ইহার অধিপতি, যিনি ঠিক এই ভাবেই কুরুক্ষেত্রের মহান বিশ্বরূপের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছেন, ইঁহারই মধ্যে মুক্ত আত্মাকে প্রবেশ করিতে হইবে; আর সে ইহা পারিবে যখন সে একবার তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্ব এবং সকল শক্তির সহিত জানিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, যখন সে তাঁহার অনন্তমুখী ঐক্যকে ধারণা করিতে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ।

অদ্বিতীয় একের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া জীবের ব্যক্তিগত সত্তার যে আত্ম-বিস্মৃত বিলোপসাধন, সাযুজ্যমুক্তি, গীতার মুক্তি তাহা নহে; ইহা একই সঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। এখানে আছে পরম ভগবানের সহিত মূল সত্তায়, চৈতন্যের অন্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের ঐক্যে সম্পূর্ণ সংযোজন, সাযুজ্য,--কারণ এই যোগের একটি লক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মভূতঃ। এখানে আছে পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তার মধ্যে আনন্দময় চিরনিবাস, সালোক্য,—কারণ বলা হইয়াছে, তুমি আমার মধ্যে বাস করিবে, নিবসিষ্যসি মায্যেব। এখানে আছে ঐক্যসাধক সামীপ্যে অনন্ত প্রেম ও ভক্তি, এখানে মুক্ত জীব তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানের আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তাহার সকল আনন্ত্যের আধার আত্মায় পরিবৃত সামীপ্য। এখানে আছে ভগবদ্ প্রকৃতির সহিত জীবের মুক্ত প্রকৃতির একত্ব, সাদৃশ্য মুক্তি, কারণ মুক্ত জীবের সিদ্ধাবস্থা হইতেছে ভগবানেরই তুল্য হওয়া মদ্ভাবমাগতঃ, এবং সত্তার ধর্মে, কর্মে ও প্রকৃতির ধর্মে তাঁহার সহিত এক হওয়া, সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ। প্রাচীনপন্থী জ্ঞান-যোগের লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সত্তার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, সাযুজ্য: তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়া গণ্য করে। ভক্তিযোগ ভগবানের সামীপ্য কিংবা তাঁহার মধ্যে নিত্য নিবাসকেই মহত্তর মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, সালোক্য, সামীপ্য। কর্মযোগ চায় সত্তা ও প্রকৃতির শক্তিতে একত্ব, সাদৃশ্য। কিন্তু গীতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক মহত্তর, সমৃদ্ধতম দিব্যমুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে।

এই প্রভেদটি সম্বন্ধে অর্জুনকে দিয়া প্রশ্ন করান হইল। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম যিনি একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক এবং দিব্য পুরুষ এবং এই দুইয়েরও বহু ঊর্ধ্বে, এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ (কৃষ্ণ পুনঃ-পুনঃ অহম্, মাম্ বলিতে যে ভাগবত "আমি" কে বুঝিয়াছেন তাহাতে এই মুখ্য প্রভেদটি উপলক্ষিত হইয়াছে), এ পর্যন্ত স্পষ্ট

ভাবে, সঠিকভাবে এই প্রভেদটি করা হয় নাই। আমরা বরাবর এই প্রভেদটি পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছি, যাহাতে প্রথম হইতেই গীতার বাণীর পূর্ণ মর্মটি বুঝিতে পারা যায়, নতুবা এই মহত্তর সত্যের আলোকে নূতনভাবে দেখিয়া আমাদিগকে সেই একই কথা পুনরায় বলিতে হইত। অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রথমত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপকে এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ও অক্ষর আত্মার শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে, এ শিক্ষা তাঁহার পূর্ব ধারণাসকলের অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং ইহা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার সম্মুখে দেখান হইতেছে এই মহত্তম বিশ্বাতীত সত্তাকে, এই বিশালতম বিশ্বপুরুষকে এবং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি দ্বারা ইহার সহিতই একত্বলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইতেছে, অতএব, এ-সম্বন্ধে যে-সন্দেহ উঠিতে পারে তাহার সমাধান করা ভাল মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে-সকল ভক্ত এইভাবে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করে, ত্বাম্, এবং যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর আত্মার উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কাহারা?"* আত্মনি অথ ময়ি, "আমাতে তাহার পর আত্মাতে", এই সব বাক্যের দ্বারা প্রথমেই যে প্রভেদ করা হইয়াছিল, এখানে সেইটিই পুনরায় সূচিত হইতেছে। অর্জুন প্রভেদ করিলেন, ত্বাম্ আর অক্ষরম্ অব্যক্তম্। তাঁহার বক্তব্যের সার মর্ম এই, তুমি সকল সত্তার পরম উৎস ও আদি, সকল বস্তুতে অনুস্যূত ভগবদ্‌সত্তা, তোমার রূপসকলের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত শক্তি তুমি, তোমার বিভূতি সকলের মধ্যে, জীবগণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রকট পুরুষ তুমি, তোমার মহীয়ান বিশ্বযোগের দ্বারা কর্মের অধীশ্বররূপে জগতের মধ্যে এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত। এই ভাবেই তোমায় আমাকে জানিতে হইবে, ভক্তি করিতে হইবে, আমার সকল সত্তায়, চেতনায় চিন্তায়, অনুভবে ও কর্মে তোমার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে, সততযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে এই যে অক্ষর সত্তা যাহা কখনও ব্যক্ত হয় না, কখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে না, সকল কর্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে সরিয়া দাঁড়ায়, জগতের সহিত বা ইহার কোনও বস্তুর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না, যাহা চিরনিস্তব্ধ, অদ্বিতীয়, নৈর্ব্যক্তিক, অচল—ইহা কি? সকল প্রচলিত মতবাদ অনুসারে এই শাশ্বত আত্মাই হইতেছে মহত্তর তত্ত্ব, ব্যক্ত ভগবান একটি নিম্নতন রূপ; ব্যক্ত নহে, অব্যক্তই হইতেছে শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা। তাহা হইলে এই যে যোগ অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে, নিম্নতন বস্তুকে স্বীকার করে এইটি কেমন করিয়া মহত্তর যোগ-জ্ঞান হইল?

* এবং সততযুক্তা ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ॥
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২।১

শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন। "যাহারা আমার উপর মন নিবেশ করে এবং নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী।" * তাহাই পরম শ্রদ্ধা যাহা সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখে, যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত একই ভগবান। তাহাই পূর্ণতম যোগ যাহা ভগবানকে পায় প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেক কর্মে এবং প্রকৃতির সকল সমগ্রতা দিয়া। কিন্তু যাহারা কঠিন পথ ধরিয়া অনির্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরের অভিমুখে আরোহণ করিতে চায়, ভগবান বলিলেন, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়। কারণ তাহাদের লক্ষ্যে কোনও ভুল নাই, কেবল তাহাদের পথ অধিকতর কঠিন এবং তাহা ততখানি সম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট নহে। অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য এখানে যে-ব্যক্ত অক্ষর সত্তা রহিয়াছে ইহারই মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উঠিতে হয়, এবং তাহাদের পক্ষে এইটিই সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। এই ব্যক্ত অক্ষর সত্তা হইতেছে আমারই সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি; বিরাট, অচিন্ত্য কূটস্থ, ধ্রুব, সর্বত্র বিদ্যমান ইহাই ক্ষর পুরুষের কর্মকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে যোগদান করে না। মন ইহার মধ্যে অবলম্বন করিবার কিছুই পায় না; ইহাকে পাওয়া যায় কেবল এক নিশ্চল অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি দ্বারা, আর যাহারা শুধু ইহাকেই অনুসরণ করে তাহাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়গণের কর্মকে সম্যকরূপে সংযত করিতে হয়, এমন কি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাহার করিতে হয়। তথাপি তাহাদের বুদ্ধির সমতা দ্বারা, সকল জিনিসের মধ্যে এক আত্মাকে দর্শনের দ্বারা এবং সর্বভূতের হিতের জন্য স্থির শান্ত ও শুভ সংকল্পের দ্বারা তাহারাও সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা তাহাদের সত্তার সকল ভাবে, সর্ব্বভাবেন, নিজদিগকে ভগবানের সহিত যুক্ত করে, এবং বিশ্বের বস্তুসকলের জীবন্ত উৎস অচিন্ত্য দিব্য পুরুষের মধ্যে সমগ্র ও পূর্ণভাবে প্রবেশ করে, ঠিক তাহাদেরই ন্যায় এই যে-সব উপাসক এই অধিকতর কষ্টকর অনন্য একত্বের ভিতর দিয়া এক সম্বন্ধবিহীন অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে লাভ করিতে চায় ইহারাও পরিশেষে সেই একই শাশ্বতকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ-পথটি তেমন সরল নহে এবং ইহা অধিকতর ক্লেশদায়ক। অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির পক্ষে এইটি সমগ্র ও স্বাভাবিক গতি নহে।

আর ইহা মনে করাও ভুল যে, এই পথটি অধিকতর ক্লেশদায়ক সেই জন্যই

* ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১২।২-৪

ইহা উচ্চতর এবং অধিকতর ফলদায়ী প্রণালী। গীতার যে অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা তাহা অধিকতর দ্রুত, স্বাভাবিক ও সহজভাবে সেই একই পূর্ণ মুক্তির দিকে লইয়া যায়। কারণ ইহা ভাগবত পুরুষকে স্বীকার করে বলিয়া যে দেহ-ধারী প্রকৃতির মানসিক ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বন্ধনসকলে আসক্ত হইয়া পড়ে তাহা নহে। বরঞ্চ ইহা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক বন্ধন হইতে অচিরে নিশ্চিতভাবে মুক্তি আনিয়া দেয়।* অনন্য জ্ঞান-পন্থার যোগীকে নিজের প্রকৃতির নানা-প্রকার দাবির সহিত কণ্টকর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়; তিনি তাহাদিগকে উচ্চ-তম ভোগ হইতেও বঞ্চিত করেন এবং তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃত্তি-গুলিকেও বর্জন করেন যখনই তাহার কোনরূপ সম্বন্ধের সূচনা করে অথবা নেতিমূলক কৈবল্যাত্মক সত্তায় পৌঁছাইয়া দিতে অক্ষম হয়। অন্য পক্ষে গীতার যে জীবন্ত পন্থা তাহা আমাদের সত্তার তীব্রতম ঊর্ধ্বমুখী গতিকে আবিষ্কার করে এবং সেইটিকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া জ্ঞান, সংকল্প, অনুভব, সিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক প্রেরণা, এই সকলকে শক্তিশালী সহায়রূপে ব্যবহার করিয়া পূর্ণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহার অনির্দেশ্য একত্বে এমন জিনিস যে দেহধারী ক্বচিৎ তাহাকে লাভ করিতে পারে, এবং তাহাও পারে কেবল সর্বদা দুঃখ স্বীকার করিয়া, সকল অঙ্গকে নিগ্রহ করিয়া, প্রকৃতিকে কঠোরভাবে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া, দুঃখম্ অবাপ্যতে, ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ *। অনির্দেশ্য অদ্বিতীয় সত্তা যাহারা তাহার নিকট উঠিয়া আসে সকলকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করে না, আরোহণকারীদিগকে ধরিবার মত কোনও অবলম্বন দেয় না। সবই করিয়া লইতে হয় কঠোর তপ-স্যার দ্বারা, কঠিন ও একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। কিন্তু যাহারা গীতার পন্থায় পুরুষোত্তমের উপাসনা করে তাহাদের পথ কত পৃথক! যখন তাহারা অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান করে, যেহেতু তাহারা সকলকেই বাসুদেব বলিয়া দেখে, তিনি প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্তে, অসংখ্য মূর্তিতে তাহাদিগকে দেখা দেন তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধরেন, এবং ইহার দিব্য ও সুখময় জ্যোতিতে সমগ্র জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেন। জ্ঞানদীপ্ত তাহারা প্রত্যেক মূর্তিতেই পরম আত্মাকে চিনিতে পারে, সকল প্রকৃতির ভিতর দিয়া একেবারেই তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সকল সত্তার ভিতর দিয়া সকল সত্তার অন্তর্পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, নিজেদের ভিতর দিয়া তাহারা নিজেরা যাহা কিছু সে-সবেরই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; অবাধে শত দ্বার যুগপৎ বিদীর্ণ

* তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৭

* ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ১২।৫

করিয়া তাহারা তাহাকে প্রাপ্ত হয় যাহা হইতে প্রত্যেক জিনিসের উৎপত্তি। অন্য প্রণালীটি কঠিন সম্বন্ধহীন স্তব্ধতার পথ, তাহা চায় সকল কর্ম হইতে সরিয়া যাইতে, কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। আর এখানে সকল কর্ম পরম কর্মেশ্বরকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয় এবং তিনি পরম ইচ্ছাশক্তিরূপে যজ্ঞের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন, ইহার সকল বোঝা তুলিয়া লন, এবং আমাদের মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কর্মের ভার নিজে গ্রহণ করেন। আর যখন ভক্ত বিপুল প্রেমাবেগে মানবের ও সর্বভূতের দিব্য সখা ও প্রেমাস্পদের উপরে সমগ্র হৃদয় ও চিত্ত নিবেশ করে, তাঁহাতেই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে, তখনও পরম পুরুষ সমুদ্ধর্তা ও রক্ষাকর্তারূপে দ্রুত তাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তাহার মন, হৃদয়, দেহে সুখময় আলিঙ্গন দিয়া তাহাকে এই মৃত্যুসমাকুল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন এবং শাশ্বতের চির-নিরাপদ বক্ষের মধ্যে তুলিয়া লন।

তাহা হইলে এইটিই দ্রুততম, উদারতম, মহত্তম পন্থা। ভগবান মানবাত্মাকে বলিলেন, * আমাতে তোমার সমস্ত মন স্থাপন কর, সমস্ত বুদ্ধি নিবেশ কর। আমি দিব্য প্রেম ও ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরম জ্যোতিতে এই সকলকে অভিষিক্ত করিয়া ইহাদের উৎস আমারই মধ্যে তুলিয়া লইব। সংশয় করিও না, এই মরজীবনের ঊর্ধ্বে তুমি আমার মধ্যেই বাস করিবে। যে অমর আত্মা শাশ্বত প্রেম, সংকল্প ও জ্ঞানের আবেগ, শক্তি ও জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র পার্থিব প্রকৃতির শৃঙ্খল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্য এই পথেও বিঘ্ন আছে; কারণ নীচের প্রকৃতি রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড অথবা স্থূল নিম্নমুখী আকর্ষণ লইয়া, তাহা আরোহণের গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উন্নয়ন ও ঊর্ধ্বমুখী উল্লাসের গতিপথ অবরুদ্ধ করে। ভাগবত চৈতন্যকে যখন কোন অপূর্ব মুহূর্তে অথবা কোন প্রশান্ত ও প্রোজ্জ্বল অবকাশে প্রথম লাভ করা যায়, তখনও তাহাকে একেবারে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না, বা ইচ্ছামত পুনরায় ডাকিয়া আনা যায় না*; অনেক সময়েই ব্যক্তিগত চৈতন্যকে ভগবানে স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায় না; জ্যোতি হইতে নির্বাসনের কত দীর্ঘ রজনী আছে, বিদ্রোহ, সংশয়, ব্যর্থতার কত প্রহর বা মুহূর্ত আছে। তথাপি যোগ অভ্যাসের দ্বারা, এবং অনুভূত উপলব্ধির

* ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২।৮

* অথ চিত্তং সমাধাতুম্ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।৯-১০

পুনরাবৃত্তির দ্বারা সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য সত্তার মধ্যে বিকশিত হয় এবং প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া লয়। মনের বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও দুর্নিবারতার জন্য এইরূপ অভ্যাসও কি অতি কঠিন? তাহা হইলে সহজ পথ, কর্মেশ্বরের উদ্দেশে সকল কর্ম করা যেন মনের প্রত্যেক বহির্মুখী গতি সত্তার ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যের সহিত সংযুক্ত হয় এবং কর্মের ভিতর দিযাই শাশ্বত সত্যের দিকে, নিজের উৎসের দিকে ফিরিয়া যায়। তখন প্রাকৃত মানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া উঠিবে, এবং ক্রমশ সে ইহার দ্বারা পূর্ণ হইয়া একটি দেবতায়, এক অধ্যাত্মপুরুষে পরিণত হইবে; সকল জীবন হইবে ভগবানের নিত্য অনুস্মরণ, এবং সিদ্ধিরও বিকাশ হইবে, এবং পরম ভাগবত সত্তার সহিত মানবাত্মার সমগ্র জীবনের একত্ব বিকশিত হইবে।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভগবানের এইরূপ নিত্য অনুস্মরণ এবং আমাদের সমস্ত কর্ম তাঁহাতে উৎসর্গ করা সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া অনুভূত হয়, কারণ স্মৃতিভ্রংশতা বশত সে-মন কর্ম এবং কর্মের বাহ্যিক লক্ষ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবানের দিব্য বেদীতলে অর্পণ করিতে ভুলিয়া যায়। তাহা হইলে পথ হইতেছে কর্মে নীচের সত্তাকে সংযত করা এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম করা।* সকল ফল বর্জন করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং, যে দিব্য শক্তি কর্মকে পরিচালিত করিতেছে তাহার নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে, অথচ সে-শক্তি প্রকৃতির উপর যে-কর্মের ভার অর্পণ করে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ এই উপায়ে বাধা ক্রমশ হ্রাস পায় এবং সহজেই দূর হইয়া যায়, মন ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে এবং ভাগবত চেতনার মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিতে সুযোগ পায়। আর এইখানে গীতা শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রম নির্দেশ করিয়াছে এবং এই নিষ্কাম কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে†। কোন প্রচেষ্টা ও অনুভূতির পুনরাবৃত্তি, অভ্যাস, মহান ও শক্তিশালী বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে জ্ঞান, বস্তু-সকলের পশ্চাতে যে-সত্য রহিয়াছে চিন্তাকে তদভিমুখী করিয়া সফল ও জ্যোতির্ময় করিয়া তোলা; আবার এই মানসিক জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতেছে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত সত্যকে নীরবে ধ্যান করা যেন চৈতন্য পরিশেষে ইহার মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সর্বদা ইহার সহিত এক হইতে পারে।

* অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২।১১-১২

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইতেছে কর্মের ফল পরিত্যাগ করা, কারণ তাহা অনতিবিলম্বে সকল রকম বিক্ষোভের কারণ নাশ করে, এবং স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে আভ্যন্তরীণ স্থিরতা ও শান্তি স্থাপন করে, আর স্থিরতা ও শান্তিই হইতেছে সেই ভিত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এবং প্রশান্ত আত্মার অধিকারের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। তখন চৈতন্য নিরুদ্বেগ হইতে পারে, সানন্দে নিজেকে ভগবানে নিবিষ্ট করিতে পারে এবং অবিচলিতভাবে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তখন জ্ঞান, সংকল্প ও ভক্তি অটুট শান্তির সুদৃঢ় ভূমি হইতে শাশ্বতের আকাশের মধ্যে নিজেদের শিখর উন্নীত করিতে পারে।

তাহা হইলে যে ভক্ত এই পন্থা অনুসরণ করিয়া শাশ্বতের অনুরক্ত হয় তাহার দিব্য প্রকৃতি কি হইবে, তাহার চেতনার ও সত্তার মহত্তর অবস্থাটি কি হইবে? গীতা প্রথম হইতেই যে সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্ম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছে, এখানে কয়েকটি শ্লোকে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্বদা এইটিই হইবে ভিত্তি এবং সেইজন্য প্রারম্ভেই ইহার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল। এবং সেই সমতায় ভক্তি, পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ আত্মাকে এক মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির দিকে তুলিয়া লইয়া যাইবে, এই শান্ত সমতাই হইবে তাহার উদার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এই মূলগত সম-চৈতন্যের কয়েকটি সূত্র এখানে দেওয়া হইয়াছে।* প্রথমত, অহংভাবের, "আমি" ও "আমার" ভাবের বর্জন, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ। যিনি পুরুষোত্তমের ভক্ত তাঁহার হৃদয় ও মন বিশ্ব-প্রসারিত, তাহা অহংয়ের সকল সংকীর্ণ প্রাচীর ভাঙিগয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সেখান হইতে সর্বভূতের প্রতি করুণা সর্বতোমুখী সমুদ্রের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার থাকিবে সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও করুণা, কোন জীবের উপরেই তাঁহার ঘৃণা নাই; কারণ তিনি ধৈর্যশীল, চির-সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশালী, তিনি ক্ষমার

* অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১২।১৩-১৮

নির্ঝর। তাঁহার আছে কামনাশূন্য সন্তোষ, সুখে দুঃখে, আনন্দে ও যন্ত্রণায় স্থির সমতা, অবিচলিত আত্মসংযম এবং যোগীজনসুলভ দৃঢ় অটল সংকল্প ও স্থিরনিশ্চয়তা এবং এমন প্রেম ও ভক্তি যাহা সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে তাঁহার চৈতন্য ও জ্ঞানের অধীশ্বর ভগবানে অর্পণ করে। অথবা সংক্ষেপে তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল নীচের প্রকৃতি হইতে এবং ইহার হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতির তরঙ্গ হইতে মুক্ত, তিনি হইবেন শান্ত আত্মা, তাঁহার দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত বা ব্যথিত হয় না, তিনিও জগতের দ্বারা সন্তপ্ত বা ব্যথিত হন না—তিনি শান্ত আত্মা তাই তাঁহার নিকটে সকলেই শান্ত।

অথবা তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সকল কামনা ও কর্ম তাঁহার জীবনের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ও শান্ত, যাহাই আসুক সকল বিষয়ে উদাসীন, কোন ফল, কোন ঘটনার দ্বারাই তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হন না, তিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী, অহঙ্কারের বশে, ব্যক্তিগত ভাবে ও মনের দ্বারা তিনি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোন কর্মই আরম্ভ করেন না, তিনি তাঁহার মধ্য দিয়া ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত জ্ঞানকে তাঁহার নিজের সংকল্প, ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা বিচ্যুত না করিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দেন, অথচ ঠিক সেই জন্যই তিনি তাঁহার প্রকৃতির সকল কর্মে হন ক্ষিপ্র ও সুকৌশলী, কারণ পরম ভগবানের ইচ্ছার সহিত এই যে নিখুঁত ঐক্য, এই যে শুদ্ধ যন্ত্রভাব, ইহা হইতেই আসে কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল। আবার তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সুখের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাতে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখের স্পর্শেও দ্বেষ করেন না বা তাহার ভারে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার ভক্তি তাঁহার শাশ্বত প্রেমিক ও প্রভুর হস্ত হইতে সকল জিনিসই সমানভাবে মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করে। যিনি ভগবানের প্রিয় ভগবদ্ভক্ত তাঁহার আত্মায় আছে উদার সমতা, শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি এই যে-সব দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় এ-সবেরই প্রতি তাঁহার সমভাব। কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে, কোন স্থান বা নিকেতনে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না *; তিনি যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই থাকুন, মানুষ তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক, তাঁহার পদ বা ভাগ্য যাহাই হউক সবেতেই তিনি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। সকল জিনিসেই তাঁহার মন থাকিবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কারণ তাহা শ্রেষ্ঠতম আত্মায় নিত্য অবস্থিত এবং তাঁহার প্রেম ও ভক্তি একমাত্র

* তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯

ভগবানে চিরনিবিষ্ট। সমতা, কামনাশূন্যতা এবং নীচের অহংভাবময় প্রকৃতির এবং তাহার দাবিসকল হইতে মুক্তি—গীতা মহান মুক্তির একমাত্র সর্বাঙ্গসম্পন্ন ভিত্তিস্বরূপ সর্বদা এইগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার মূল শিক্ষা ও প্রথম প্রয়োজনটির উপর পুনঃ-পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে—শান্ত জ্ঞানময় আত্মা যাহা সকল জিনিসের মধ্যেই এক অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখিতে পায়, স্থির অহংভাবশূন্য সমতা যাহা এই জ্ঞানেরই ফল, নিষ্কাম কর্ম যাহা এই সমতার মধ্যে কর্মেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়, মানুষের সমগ্র মানসিক প্রকৃতিকে মহত্তর আভ্যন্তরীণ ভগবৎ-সত্তার হস্তে সমর্পণ। আর এই সমতার শিখর হইতেছে সেই প্রেম যাহার ভিত্তি জ্ঞানে, যাহা যন্ত্রভাবে কর্ম করায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, যাহা সকল জিনিস, সকল বস্তুব প্রতিই প্রসারিত, যে ভাগবত পুরুষ এই বিশ্বের স্রষ্টা ও অধীশ্বর, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্, তাঁহার প্রতি উদার একনিষ্ঠ সর্বতোমুখী প্রেম।

এইটিই হইতেছে সেই ভিত্তি, সেই বিধান, সেই উপায় যাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মমুক্তি লাভ করিতে হইবে; ভগবান বলিলেন, যাহাদের ইহা কোনরূপ আছে তাহারা সকলেই আমার প্রিয়, ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ। কিন্তু আমার অতীব প্রিয়, অতীব মে প্রিয়াঃ, হইতেছে ভগবানের নিকটতম সেই সকল ভক্ত যাহাদের ভগবদ্ভক্তি আরও উদারতর ও মহত্তর সিদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এই মাত্র আমি সেইটীরই পথ ও প্রণালী তোমাকে দেখাইলাম*। সেই সব ভক্ত পুরুষোত্তমকেই তাহাদের একমাত্র পরম লক্ষ্য করে এবং এই শিক্ষায় বর্ণিত অমৃত ধর্ম পূর্ণতম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে। গীতার ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ হইতেছে, সত্তা ও তাহার কর্মের স্বভাবসিদ্ধ নীতি এবং আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে উৎসারিত এবং তদ্দ্বারা নির্ধারিত কর্ম, স্বভাবনিয়তম্ কর্ম। মন, প্রাণ, দেহের যে নিম্নতন অজ্ঞান চৈতন্য তাহাতে আছে বহু ধর্ম, বহু নীতি, বহু আদর্শ ও নিয়ম, কারণ মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির আছে বহু বিচিত্র রূপায়ণ ও শ্রেণী। অমৃত ধর্ম এক; উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্য এবং তাহার শক্তি-সকলের ধর্ম। তাহা গুণত্রয়ের অতীত, এবং তাহা লাভ করিতে হইলে এই সকল নীচের ধর্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। সে-সবের পরিবর্তে শাশ্বতের এক মুক্তিপ্রদ একত্বসাধক চৈতন্য ও শক্তিই হইবে আমাদের কর্মের একমাত্র অনন্ত উৎস, আমাদের কর্মের ছাঁচ, নিয়ামক শক্তি ও দৃষ্টান্ত-

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

স্বরূপ আদর্শ। আমাদের নিম্নতন ব্যক্তিগত অহংভাবকে ছাড়াইয়া উঠা, শাশ্বত সর্বব্যাপী অক্ষরপুরুষের নৈর্ব্যক্তিক ও সমতাপূর্ণ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা, সেই শান্তি হইতে আমাদের সকল প্রকৃতি, সকল সত্তার সমগ্র আত্মসমর্পণের দ্বারা অক্ষরেরও উপরে যে অন্যতম ও উচ্চতর পুরুষ রহিয়াছেন, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তদভিমুখী করা, ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষার শক্তিতেই আমরা অমৃত-ধর্মে উঠিতে সক্ষম হই। সেখানে সত্তায় চৈতন্যে ও ভাগবত আনন্দে শ্রেষ্ঠতম উত্তম পুরুষের সহিত এক হইয়া, তাঁহার পরম ক্রীড়াত্মিকা প্রকৃতি-শক্তির (স্বা প্রকৃতি) সহিত এক হইয়া মুক্ত আত্মা অনন্তভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অসীমভাবে ভালবাসিতে পারে, এক উচ্চতম অমৃতত্ব ও পূর্ণতম মুক্তির যথার্থ শক্তিতে অটল ভাবে কর্ম করিতে পারে। গীতার অবশিষ্টাংশে এই অমৃত ধর্মের উপরেই পূর্ণতর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড (উত্তরার্ধ)

পরম রহস্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

গীতা শেষ ছয় অধ্যায়ে জীবের পক্ষে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উঠিবার পন্থাটি সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, গুরু ইতিপূর্বেই অর্জুনকে যে-শিক্ষা দিয়াছেন সেইটিই অন্য প্রকারে বর্ণনা করিয়াছে। মূলত ইহা সেই একই জ্ঞান, কিন্তু বিশেষ অংশ ও সম্বন্ধ-গুলিকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ মর্ম বুঝান হইয়াছে, যে-সকল চিন্তা ও সত্য কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছিল অথবা অন্য উদ্দেশ্যের অনুসরণে সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছিল সেইগুলিকে বিবৃত করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখান হইয়াছে। যথা, প্রথম ছয় অধ্যায়ে অক্ষর আত্মার সহিত প্রকৃতিতে বদ্ধ জীবাত্মার প্রভেদ করিবার জন্য যে-জ্ঞান প্রয়োজন সেইটিকে পূর্ণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পরম আত্মা, পরমপুরুষের কথা সংক্ষেপেই উপলক্ষিত হইয়াছে, পরিস্ফুট করা হয় নাই; জগতের কর্মের সার্থকতা বুঝাইবার জন্য তাঁহার অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকেই জীবনের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া এমন আর কিছুই নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি কি, এবং তাঁহার সহিত অন্যান্যের সম্বন্ধ কি তাহার ইঙ্গিতও করা হয় নাই, পরিস্ফুট করা ত দূরের কথা। এই যে জ্ঞানকে অপ্রকট রাখা হইয়াছিল, অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে সেইটিকেই সুস্পষ্ট আলোকে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর, ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতন প্রকৃতির প্রভেদ, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সর্বস্রষ্টা সর্বাধার ভগবান, সকল সত্তার মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্—পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে (৭-১২) জ্ঞানের সহিত কর্ম ও প্রেমের মূল ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই তত্ত্ব-গুলির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন পরম পুরুষ, অক্ষর আত্মা ও জীবের সহিত কর্মময়ী ও গুণময়ী প্রকৃতির সঠিক সম্বন্ধটি আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। সেইজন্য অর্জুনকে দিয়া এমন একটি প্রশ্ন করান হইল যাহার উত্তরে এই সকল অস্পষ্ট বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হইতে পারে। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি জানিতে চাহিলেন।* এইখানেই নিহিত

---

* প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥ ১৩।১

রহিয়াছে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞান; জীবকে যদি প্রাকৃত অজ্ঞান দূর করিতে হয় এবং জ্ঞানের, জীবনের, কর্মের যথাযথ ব্যবহার করিয়া এবং এই সকল জিনিসে ভগবানের সহিত নিজেরই সম্বন্ধের যথাযথ ব্যবহার করিয়া নিশ্চিত পদবিক্ষেপে জগতের শাশ্বত আত্মার সহিত সত্তাগত একত্বের মধ্যে উঠিতে হয়, তাহা হইলে এখনও এই জ্ঞানেরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

গীতার চিন্তাধারার শেষ পরিণতির পূর্বাভাস স্বরূপ এই সকল বিষয়ে গীতাশিক্ষার মূলতত্ত্ব ইতিপূর্বেই কতক পরিমাণে পরিস্ফুট করা হইয়াছে; কিন্তু গীতারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা সে-সবের পুনরুল্লেখ করিতেছি। কর্মকে যদি স্বীকার করা হয়, জগতে ভগবদিচ্ছার যন্ত্র স্বরূপ আত্মজ্ঞানের সহিত সম্পাদিত দিব্য কর্ম (ঐ কর্ম আভ্যন্তরীণভাবে পরম পুরুষের উদ্দেশে ভক্তির সহিত যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হইলে) যদি ব্রাহ্মীস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ অবিরোধী বলিয়া এবং ভগবদ্‌মুখী সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই পন্থা কার্যত কি ভাবে অধ্যাত্মজীবনের মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে, নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্ধ্বতন প্রকৃতিতে আরোহণে সহায় হইবে? সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম হইতেছে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আদান-প্রদান। সেই আদান-প্রদানের আদি স্বরূপ কি? অধ্যাত্মবিকাশের চরম সীমায় উহা কিসে পরিণত হয়? যে জীব নিম্নতর ও বাহ্যতর প্রেরণাসকল হইতে মুক্ত হইয়া অন্তরে-অন্তরে আত্মার উচ্চতম স্থিতিতে এবং জগতে ইহার শক্তির কর্মের গভীরতম প্রেরণায় বিকশিত হইয়া উঠে—তাহাকে এই পন্থা কোন্ সিদ্ধির মধ্যে লইয়া যাইবে? এই সকল প্রশ্ন এখানে নিহিত রহিয়াছে (অন্য প্রশ্নও আছে, গীতা সে সবের উত্থাপন বা মীমাংসা করে নাই, কারণ সেই যুগের মানবমনের নিকট সেসকল প্রশ্ন তীব্র হইয়া উঠে নাই), এবং জগৎ সম্বন্ধে বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগের শিক্ষার যে উদার সমন্বয়ে গীতার সমগ্র চিন্তাধারার আরম্ভ, তাহারই আলোকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

যে জীবাত্মা এখানে প্রকৃতির মধ্যে দেহধারী রূপে আবির্ভূত হয় তাহার আত্ম-অভিজ্ঞতায় আছে তিনটি সত্য। প্রথমত সে হইতেছে একটি অধ্যাত্ম সত্তা, দৃশ্যত অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়ার বশীভূত এবং তাহার গতিশীলতার মধ্যে সক্রিয়, চিন্তাশীল, ক্ষর ব্যক্তিরূপে, প্রকৃতির সৃষ্ট একটি জীবরূপে, অহংরূপে প্রতিভাত। পরে যখন সে এই সব কর্ম ও গতির পিছনে সরিয়া দাঁড়ায় তখন সে তাহার নিজের উচ্চতর সত্তাকে দেখিতে পায় এক শাশ্বত নির্ব্যক্তিক আত্মা ও অক্ষর অধ্যাত্ম সত্তারূপে সে নিজের উপস্থিতির দ্বারা এই কর্ম ও গতির ধারাকে সমর্থন করা ব্যতীত ইহাতে কোনরূপ যোগদান করে না, শুধু উদাসীন সমতাপূর্ণ সাক্ষিরূপে ইহাকে অবলোকন করে। আর

শেষত যখন সে এই দুইটি বিরোধী সত্তারই ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখে, সে এক মহত্তর অনির্বচনীয় সত্যের সন্ধান পায়, যাহা হইতে উভয়েরই উৎপত্তি, সেই শাশ্বত সত্তা আত্মার আত্মা এবং সকল প্রকৃতি ও সকল কর্মের অধীশ্বর, এবং শুধুই অধীশ্বর নহেন, পরন্তু বিশ্বমধ্যে তাঁহার শক্তির এই সকল ক্রিয়ার তিনিই আদি এবং অধ্যাত্ম আধার ও ক্ষেত্র, এবং শুধুই আদি ও আধার নহেন পরন্তু সকল শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তার মধ্যে আধ্যাত্ম অধিবাসী, এবং শুধুই অধিবাসী নহেন পরন্তু এই যে তাঁহার সত্তার এই শাশ্বত শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করি ইহার যাবতীয় বিকাশের দ্বারা তিনি নিজেই সকল তেজ ও শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তা হইয়াছেন। এই প্রকৃতিও দুই প্রকার, একটি উৎপন্ন ও অপরা, অপরটি মূল ও পরা। বিশ্ব-যন্ত্র পরিচালনের এক নিম্নতন প্রকৃতি আছে, তাহার সহিত সংযোগে প্রকৃতিস্থ জীব মায়া-সম্ভূত একটা অজ্ঞানেব মধ্যে (ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া) বাস করে, সে নিজেকে দেহগত প্রাণ ও মন লইয়া গঠিত অহং বলিয়া ধারণা করে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের শক্তির অধীনে কর্ম করে, মনে করে যে, সে বন্ধ, দুঃখময়, ব্যক্তিত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পুনর্জন্ম ও কর্মের চক্রে শৃংখলিত, বাসনাময় বস্তু, নশ্বর, আপন প্রকৃতির ক্রীতদাস। এই নিম্নতন বিশ্বশক্তির ঊর্ধ্বে রহিয়াছে জীবের নিজের প্রকৃত সত্তার এক উচ্চতম ভাগবত ও অধ্যাত্ম প্রকৃতি, সেখানে সে চিরকাল শাশ্বত পুরুষ ভগবানের সচেতন অংশ, আনন্দময়, মুক্ত, বিবর্তনের ছদ্মবেশের ঊর্ধ্বে, মৃত্যুহীন, অবিনাশী, ভগবানেরই একটি শক্তি। এই ঊর্ধ্বতন প্রকৃতির দ্বারা, অধ্যাত্ম বিশ্বভাবের উপব প্রতিষ্ঠিত দিব্য জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের ভিতর দিয়া শাশ্বতের মধ্যে উঠা—ইহাই পূর্ণ অধ্যাত্মমুক্তির মূল সূত্র। এতটুকু সুস্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে; এখন আমাদিগকে আরও সবিস্তারে দেখিতে হইবে এই রূপান্তর সম্বন্ধে আরও কি সব বিবেচ্য রহিয়াছে, বিশেষত এই দুই প্রকৃতির প্রভেদ কি এবং আমাদের মুক্তির দ্বারা আমাদের কর্মে, আমাদের অধ্যাত্মস্থিতিতে কি পরিবর্তন হয়। সেই উদ্দেশ্যে গীতা উচ্চতম জ্ঞানের যে কতকগুলি অংশ এতক্ষণ পর্যন্ত পিছনে রাখিয়াছিল সেই গুলির বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিতেছে। বিশেষ করিয়া সত্তা (Being) ও বিবর্তনের (Becoming) মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ, গুণত্রয়ের ক্রিয়া, ঊর্ধ্বতম মুক্তি, ভাগবত পুরুষের নিকট মানবাত্মার উদারতম পূর্ণতম আত্ম-সমর্পণ, এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে। শেষের এই ছয় অধ্যায়ে গীতা যাহা কিছু বলিয়াছে সে-সবের মধ্যে পরম প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস আছে, কিন্তু যে শেষ তত্ত্ব লইয়া গীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে সেইটিই হইতেছে পরম রহস্যময়; কারণ তাহারই মধ্যে আমরা পাইব গীতা-শিক্ষার মূল কথাটি, মানবাত্মার প্রতি ইহার মহাবাক্য এবং ইহার শ্রেষ্ঠতম বাণী।

প্রথমত, সমগ্র জগৎকে দেখিতে হইবে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের সৃষ্টি ও কর্মের ক্ষেত্রে বলিয়া। গীতা "ক্ষেত্র" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছে, এই দেহকেই আত্মার ক্ষেত্র বলা হয়, এবং এই দেহের মধ্যেই এমন একজন আছেন যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, প্রকৃতির বেত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ।* যাহাই হউক পরে যে-সব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল এই স্থূল দেহটিই ক্ষেত্র নহে, পরন্তু এই দেহ যাহা কিছুর আধার, প্রকৃতির ক্রিয়া, মন, আমাদের সত্তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক কর্ম, এই সবও ক্ষেত্র। এই ব্যাপকতর শরীরও শুধু ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র; ঐ একই ক্ষেত্রজ্ঞের ইহা অপেক্ষা এক বৃহত্তর, সর্বগত, বিশ্বশরীর বিশ্বক্ষেত্র আছে। কারণ প্রত্যেক দেহধারী জীবেই রহিয়াছেন এই একই ক্ষেত্রজ্ঞ; প্রত্যেক সত্তায় তিনি প্রধানত ও মূলত এইটিকেই ব্যবহার করেন, (তাঁহার প্রকৃতির শক্তির একটি মাত্র বাহ্য ফলস্বরূপ এইটিকে তিনি তাঁহার বাসের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, ঈশা বাস্যম্ সর্বম্ যৎকিঞ্চ), তাঁহার গতিময় শক্তির প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংহত কেন্দ্রকে তাঁহার বিকাশমান ছন্দসকলের প্রথম ভিত্তি ও ক্ষেত্র করেন। প্রকৃতিতে তিনি জগৎকে সেই ভাবেই জানেন যে-ভাবে উহা এই এক সীমাবদ্ধ দেহের চৈতন্যের উপর ক্রিয়া করে এবং ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমাদের এক একটি মন যে-ভাবে জগৎকে দেখে, আমাদের পক্ষে জগৎ তাহাই,—আর পরিশেষে, এই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত দেহাশ্রিত চৈতন্যও নিজেকে এমন ভাবে প্রসারিত করিতে পারে যে সে নিজের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে, আত্মনি বিশ্বদর্শনম্। কিন্তু স্থূলত এইটি হইতেছে এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ড (a microcosm in a macrocosm) এবং ঐ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটিও একটি শরীর ও ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ বাস করিতেছেন।

ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যখন গীতা অতঃপর আমাদের সত্তার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের স্বরূপ, প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিকার ও শক্তিগুলি বর্ণনা করিয়াছে।* আমরা তখন দেখিতে পাই যে, ক্ষেত্র বলিতে নিম্নতন প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়াকেই বুঝাইতেছে। সেই সমগ্রই হইতেছে এখানে আমাদের মধ্যে অবস্থিত দেহধারী

* ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১৩।২
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ১৩।২-৩

* তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চাযো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥
† ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ১৩।৪-৬

আত্মার কর্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রেই সে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই প্রাকৃত জগতের মূল কর্মপদ্ধতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায় সে-সম্বন্ধে বহুমুখী ও বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য গীতা বেদ ও উপনিষদের দ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক গীত বিবিধ ছন্দের এবং ব্রহ্মসূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছে; বেদ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা পাই ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্ট এই সব বস্তু সম্বন্ধে অনুপ্রেরিত ও সাক্ষাৎদৃষ্টিমূলক বর্ণনা এবং ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাই যুক্তিসম্মত দার্শনিক বিশ্লেষণ। গীতা শুধু সাংখ্য মনীষিগণের ভাষায় আমাদের নিম্নতন প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কার্যকরী বর্ণনা দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই নির্বিশেষ অব্যক্ত শক্তি; তাহার পর, ইহা হইতেই বাহ্যজগতের পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থার বিকাশ, তাহার পর অন্তর্জগতের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহংকারের বিকাশ; পরিশেষে পাঁচটি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় অর্থাৎ জগৎকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিবার পাঁচটি বিভিন্ন প্রণালী, বিশ্বপ্রকৃতি বাহ্যজগতের উপাদান পঞ্চভূত হইতে যে সব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহিত ব্যবহারের জন্য এই সকল শক্তির বিকাশ করিয়াছে,—এই সকল ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-সমন্বিত অহং বিশ্বের পদার্থ-সকলের উপর ক্রিয়া করে। ইহাই হইতেছে ক্ষেত্রের গঠন। তাহার পর হইতেছে এক সাধারণ চৈতন্য, তাহা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার কর্মে প্রথমে অনুপ্রাণিত করে এবং পরে জ্ঞানালোকিত করে; ঐ চৈতন্যের এক বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা প্রকৃতি বস্তুসকলের সম্বধগুলিকে একত্র ধরিয়া রাখে, সংঘাত; আমাদের চৈতন্যের নিজ বিষয়-সকলের সহিত যে সব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্বন্ধ তাহাদেরও আছে ধৃতি।* এই গুলিই হইতেছে ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় শক্তি; এই সবই হইতেছে একই সঙ্গে মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির সাধারণ এবং সর্বগত শক্তি। সুখ ও দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ, এইগুলিই ক্ষেত্রের প্রধান বিকার। বেদান্তের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সুখ ও দুঃখ হইতেছে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকার, আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যখন নিম্নতন প্রকৃতির ক্রিয়ার সংস্পর্শে আসে তখন তাহা এই ভাবেই বিকৃত হয়। আর ঐ দিক হইতেই বলিতে পারি যে, রাগ ও দ্বেষ হইতেছে অনুরূপ মানসিক বিকার, আত্মা তাহার যে ইচ্ছাশক্তির প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতির স্পর্শে সাড়া দেয়, প্রকৃতি তাহাকে এই ভাবেই বিকৃত করিয়া দেয়। এই সকল বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই নিম্নতন প্রকৃতির অহংরূপী আত্মা জগৎকে ভোগ করে। অভাবাত্মক যথা—যন্ত্রণা, বিরাগ, দুঃখ, দ্বেষ এইগুলি হইতেছে বিকৃত প্রতিক্রিয়া অথবা যদি খুব ভাল হয় ত অজ্ঞানসম্ভূত বিপরীত

* ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৭

প্রতিক্রিয়া; ভাবাত্মক যথা—অনুরাগ, সুখ, হর্ষ, আকর্ষণ, এই সব হইতেছে অনিয়মিত প্রতিক্রিয়া অথবা যদি খুব ভাল হয় ত অপর্যাপ্ত এবং সত্য অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় স্বরূপত নিকৃষ্ট।

প্রাকৃতজগতের সহিত আমাদের যে প্রথম কারবার তাহার মূল স্বরূপ এই সকল জিনিস লইয়াই গঠিত, কিন্তু ইহাই যে আমাদের জীবনের সম্যক বর্ণনা নহে তাহা সুস্পষ্ট; ইহা আমাদের বাস্তব জীবন কিন্তু ইহাই আমাদের সকল সম্ভাবনার সীমা নহে। ঊর্ধ্বের এক বস্তুকে জানিবার আছে, জ্ঞেয়ম, আর যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার মধ্যে অবস্থিত অপনাকেই জানিতে চায় এবং ইহার বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবকেই জানিতে চায় তখনই আরম্ভ হয় প্রকৃত জ্ঞান, জ্ঞানম্—যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তেমনই ক্ষেত্র সম্বন্ধেও প্রকৃত জ্ঞান। এই যে অন্তর্মুখী হওয়া, কেবল ইহাই অজ্ঞান হইতে মুক্তি আনিয়া দেয়। কারণ যতই আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা বস্তুসকলের মহত্তর ও পূর্ণতর সত্যকে আয়ত্ত করিতে পারি এবং যেমন ভগবান ও জীব সম্বন্ধে তেমনিই জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যটিকে প্রণিধান করিতে পারি। অতএব দিব্য-গুরু বলিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়েরই যে জ্ঞান, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং, আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের সংযোগ, এমন কি সমন্বয়-সাধন এইটিই প্রকৃত আলোক এবং একমাত্র সত্য জ্ঞান। কারণ জীবাত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাকৃত জগতের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে কেবল সেই মুক্ত জ্ঞানী পুরুষেব দ্বারা যিনি আত্মার সত্যটিকেও আয়ত্ত করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম, আত্মা ও প্রকৃতিতে এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, ইহাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য।

তাহার পর গীতা অধ্যাত্মজ্ঞান কি, তাহাই বর্ণনা করিয়াছে, অথবা সেই জ্ঞানের জন্য কি-কি জিনিস প্রয়োজন, যে-মানুষের আত্মা আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের অভিমুখী হইয়াছে তাহার চিহ্ন কি, লক্ষণ কি তাহাই বলিয়াছে। এই সব লক্ষণ জ্ঞানীর স্বরূপ বলিয়া আবহমান কাল হইতে সুপরিচিত,—বাহ্যিক ও ঐহিক জিনিস-সকলের প্রতি আসক্তি হইতে তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক নিবৃত্তি, তাঁহার অন্তরমুখী ও ধ্যানরত ভাব, তাঁহার অচঞ্চল মন ও শান্ত সমতা, মহত্তম অন্তরতম সত্য-সকলের উপর, বাস্তব ও নিত্য পদার্থ-সকলের উপর তাঁহার চিন্তা ও সংকল্পের দৃঢ় অভিনিবেশ। প্রথমেই হইতেছে একটা নৈতিক অবস্থা, প্রাকৃত সত্তার সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ।* তাঁহার মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সাংসারিক গর্ব ও দম্ভের সম্পূর্ণ অভাব, সরলতা, ক্ষমাশীল ধৈর্য-

* অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ১৩।৮

শীল হিতৈষী হৃদয়, মন ও শরীরের শুচিতা, শান্ত স্থৈর্য, আত্মসংযম এবং নিম্নতন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব, এবং আচার্যের প্রতি হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ, সে আচার্য অন্তরস্থিত দিব্য-গুরুই হউন অথবা দিব্য জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ মানব-গুরুই হউন,—কারণ গুরুকে যে ভক্তি করা হয় ইহাই তাহার তাৎপর্য। তাহার পর হইতেছে পূর্ণ অনাসক্তি ও সমতার মহত্তর ও মুক্ততর ভাব, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকলের প্রতি প্রাকৃত সত্তার আকর্ষণ দৃঢ়তার সহিত অপনোদন করা, যে নিত্য অশান্ত অহং বোধ, অহং জ্ঞান, অহং প্রেরণা সাধারণ মানুষকে উৎপীড়িত করে তাহার দাবিসকল হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ, তখন আর পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্ত বা মগ্ন থাকিবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল প্রাণিক ও পশুসুলভ প্রবৃত্তির পরিবর্তে থাকে আসক্তিশূন্য সংকল্প ও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, লক্ষ্যহীন ও যন্ত্রণাপূর্ণভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অধীন যে সাধারণ জীবন প্রাকৃত মানব যাপন করে তাহার দোষময় স্বরূপের সুতীব্র অনুভূতি, সকল ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনার প্রতি সর্বদা সমচিত্ততা (কারণ আত্মা অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, বাহ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না), * আর থাকে জনতা এবং মানবীয় সভা সমিতির বৃথা গোলমাল হইতে নিবৃত্ত, নির্জনতার দিকে আকৃষ্ট ধ্যানপরায়ণ মন। পরিশেষে হইতেছে, যে-সকল জিনিস বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় ভিতরে দৃঢ়তার সহিত সেইগুলির অভিমুখ হওয়া, জগতের প্রকৃত অর্থ ও প্রধান তত্ত্বসকল সম্বন্ধে দার্শনিক অনুভূতি, আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও জ্যোতির শান্ত নিরবচ্ছিন্নতা, অব্যভিচারী ভক্তিযোগ, ভগবৎপ্রেম, বিশ্বব্যাপী সনাতন ভাগবত সত্তার প্রতি হৃদয়ের গভীর ও নির-বচ্ছিন্ন অনুরাগ। †

অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনকে যে একমাত্র জ্ঞেয়ের অভিমুখী হইতে হইবে তাহা হইতেছে অনাদি ব্রহ্ম, তাহাতে নিবিষ্ট হইলে যে-জীবাত্মা এখানে মেঘাবৃত এবং প্রকৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে সে তাহার স্বাভাবিক ও মূল অমৃতচৈতন্য এবং লোকোত্তরতা ফিরিয়া পায় এবং উপভোগ করিতে পারে। * অনিত্য বস্তুতে নিবিষ্ট থাকা, বাহ্যদৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা—ইহাই মৃত্যুকে

* ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

† ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১৩।৯-১২

* জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩।১৩

স্বীকার করা; নশ্বর জিনিসসকলের মধ্যে তাহাই হইতেছে নিত্য সত্য যাহা আভ্যন্তরীণ ও অক্ষর। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যাবলীর দ্বারা অভিভূত হইতে দেয় তখন সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে এবং তাহার দেহ-সকলের জন্ম ও মৃত্যুচক্রে ঘুরিতে থাকে। সেখানে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অনু-রাগসকলের অন্তহীন পরিবর্তন আবেগের সহিত অনুসরণ করিত-করিতে সে আর নিবৃত্ত হইয়া তাহার নির্ব্যক্তিক ও অজাত আত্মসত্তাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা করিতে সমর্থ হওয়ার অর্থ নিজেকে পাওয়া এবং নিজের প্রকৃত সত্তায় ফিরিয়া যাওয়া। সেই সত্তাই বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার বিভিন্ন রূপ-সকলের বিনাশে নিজে বিনিষ্ট হয় না। জন্ম ও মৃত্যু যে আনন্ত্যের পক্ষে বাহ্যিক ঘটনামাত্র তাহা উপভোগ করাই জীবের পক্ষে প্রকৃত অমৃতত্ব ও লোকোত্তরতা। সেই অনন্ত বা সেই আনন্ত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছে তৎ, বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বব্যাপী সত্তা; ব্রহ্ম সেই মুক্ত অধ্যাত্ম পুরুষ যিনি সম্মুখে প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার খেলাকে ধরিয়া থাকেন এবং পশ্চাতে তাহাদের অবিনশ্বর একত্বের ভিত্তিস্বরূপ হন; ব্রহ্ম একই সঙ্গে ক্ষর অক্ষর দুইই, এক হইয়াও সর্ব। তাঁহার উচ্চতম বিশ্বাতীত পদে ব্রহ্ম হইতেছেন তুরীয় অনন্ত, অনাদি ও অপরিবর্তনীয়; এই যে সৎ অসৎ, নিত্য অনিত্যের প্রাতিভাসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বাহ্যজগৎ চলিতেছে, ব্রহ্ম এ-সবেরই ঊর্ধ্বে। কিন্তু একবার যদি জগৎকে এই অনন্তের সত্তায় ও আলোকে দর্শন করা যায় তাহা হইলে মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে জগৎ যেমন প্রতিভাত হইতেছে তাহা হইতে তাহা ভিন্ন হইয়া পড়ে; কারণ তখন আমরা বিশ্বকে দেখি আর মন প্রাণ ও জড়ের ঘূর্ণাবর্ত নহে, শক্তি ও সত্তার বিভিন্ন রূপের সমবায় মাত্র নহে, পরন্তু এই অনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি এই সর্ব জগৎকে নিজ সত্তার দ্বারা অমিতভাবে পূর্ণ ও বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন (বস্তুত এই জগৎলীলাও তিনিই), যিনি সকল সসীম বস্তুর উপরেই তাঁহার অসীমতার জ্যোতি নিক্ষেপ করিতেছেন, অদেহী ও সহস্র দেহসম্পন্ন যে-পুরুষের শক্তিময় হস্তসকল, দ্রুতগামী পাদসকল আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, আমরা যে-দিকেই ফিরি না কেন অসংখ্য রূপের মধ্যে আমরা যাঁহার শীর্ষ ও চক্ষু ও মুখ-মন্ডল দেখিতে পাই, যাঁহার শ্রবণ সর্বত্র শাশ্বতের নীরবতা ও জগৎসমূহের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, তিনিই হইতেছেন সেই বিশ্বময় বিশ্বপুরুষ যাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি।*

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
† সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৩।১৪-১৫

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সকল সম্বন্ধই ব্রহ্মের আনন্ত্যের অন্তর্বর্তী ঘটনা; ইন্দ্রিয় ও গুণ, তাহাদের প্রকাশক ও উপাদান, এ-সবই হইতেছে এই পরম পুরুষের কৌশল, তাঁহার নিজেরই শক্তি বস্তুসকলের মধ্যে যে-সব কর্ম-ধারাকে নিরন্তর গতিময় করিয়া তুলিতেছে এই সব কৌশলের দ্বারাই তাহারা সম্মুখে প্রতিভাত হয়। † তিনি নিজে ইন্দ্রিয়সকলের সীমার অতীত, তিনি সকল জিনিসকে দেখেন কিন্তু স্থূল চক্ষু দিয়া নহে, সকল জিনিস শ্রবণ করেন কিন্তু স্থূল কর্ণ দিয়া নহে, সকল জিনিস অবগত হন কিন্তু খণ্ডতাসাধক মনের দ্বারা নহে—মন কেবল আভাস দিতে পারে কিন্তু সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কোন গুণের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, নিজ সত্তার মধ্যে তিনি সকল গুণকে ধারণ করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তিনি নিজেরই প্রকৃতির গুণময়ী ক্রিয়া উপভোগ করেন। তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন, কিছু দ্বারা বদ্ধ নহেন, তিনি যাহাই করুন কিছুতেই লিপ্ত হন না; প্রশান্ত তিনি, এক উদার ও অবিনশ্বর মুক্তির মধ্যে তিনি তাঁহার বিশ্বময়ী শক্তির সকল কর্ম ও গতি ও আবেগকে ধরিয়া থাকেন। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সে-সব হইয়াছেন; আমাদের অন্তরে যাহা আছে সব তিনি, আমাদের বাহিরে যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি সে-সবও তিনি। * অন্তর বাহির, দূর ও নিকট, স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি একই সঙ্গে এই সব হইয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমাদের জ্ঞানের অগোচর; আবার শক্তি ও সত্তার যে ঘনীভূত অবস্থা আমাদের মন ধারণা করিতে পারে তাহাও তিনি। তিনি অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়, অথবা নানা রূপে, নানা জীবে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন সত্তারূপে তিনি প্রতিভাত হন। † সকল বস্তুই তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে, আত্মার মধ্যে তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার অবিভাজ্য ঐক্যে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। সবই নিত্য তাঁহা হইতে প্রসূত, তাঁহার আনন্ত্যে বিধৃত, নিত্য তাঁহার ঐক্যের মধ্যে পুনর্গৃহীত। তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি, এবং আমাদের সকল অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ময় পুরুষ। * তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়। যে অধ্যাত্ম অতিমানস জ্ঞান প্রদীপ্ত মনকে পরিপ্লাবিত করে এবং তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, এই

* বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৩।১৬

† অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩।১৭

* জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

† ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৩।১৮-১৯

অধ্যাত্ম পুরুষই হইতেছেন সেই জ্ঞান, যে মায়া-অন্ধ জীবকে তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পাঠাইয়াছেন তাহার সম্মুখে জ্যোতি রূপে তিনি নিজেকেই প্রকট করেন। এই শাশ্বত জ্যোতি প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; তিনিই ক্ষেত্রের গোপন জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্রের এবং তাঁহার অভিব্যক্ত সম্ভূতি ও ক্রিয়ার এই সমুদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাতারূপে তিনি সকল বস্তুর হৃদয়ে বিরাজ করেন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এই শাশ্বত ও বিশ্বময় ভগবানকে দেখিতে পায়, যখন সে সকল বস্তুর অন্তরপুরুষকে জানিতে পারে এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মার সন্ধান পায়, যখন সে উপলব্ধি করে যে সমগ্র বিশ্ব এই শাশ্বতের মধ্যে একটি তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে, যাহা কিছু আছে সবই হইতেছে এক অদ্বিতীয় সত্তা, তখন সে ভগবানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে এবং প্রকৃতির জগৎসকলের মধ্যে মুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। † দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তির সহিত পূর্ণভাবে এই ভগবানের অভিমুখী হওয়া, ইহাই মহান অধ্যাত্ম মুক্তির নিগূঢ় রহস্য। মুক্তি, প্রেম এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান আমাদিগকে মর প্রকৃতি হইতে অমৃতত্বের মধ্যে উত্তোলিত করে।

পুরুষ ও প্রকৃতি শাশ্বত ব্রহ্মের দুইটি দিকমাত্র, এই আভাসিক দ্বৈতভাবই তাঁহার বিশ্বলীলার ভিত্তিস্বরূপ। * পুরুষ অনাদি ও শাশ্বত, প্রকৃতিও অনাদি ও শাশ্বত; কিন্তু প্রকৃতির গুণসমূহ এবং আমাদের সচেতন উপলব্ধিতে প্রকৃতি যে যে-সব নিম্নতন রূপ লইয়া প্রতিভাত হয়, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত; কার্য ও কারণ, কর্ম ও কর্মের ফল, শক্তি ও শক্তির ক্রিয়া—এই যে তাহাদের বাহ্য শৃঙ্খলা ইহা প্রকৃতি কর্তৃকই সৃষ্ট, এখানে যাহা কিছু অনিত্য ও পরিবর্তনশীল সবই আসিতেছে প্রকৃতি হইতে। অনবরত তাহারা পরিবর্তিত হইতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বরূপত এই দুইটি শক্তিই শাশ্বত এবং সকল সময়ে একই রহিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে, কর্ম করে, তাহার সেই সৃষ্টি ও কর্ম উপভোগ করে পুরুষ; কিন্তু তাহার ক্রিয়ার এই নিম্নতন রূপে প্রকৃতি এই উপভোগকে মোহগ্রস্ত ও ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ভোগে পরিণত করে। জীব বা ব্যক্তিগত পুরুষ প্রকৃতির গুণাত্মক ক্রিয়াসকলের দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হয় এবং প্রকৃতির গুণসমূহের এই আকর্ষণ তাহাকে অবিরত নানা জন্মের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, সেখানে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অবস্থাবিপর্যয়,

* প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ১৩।২০-২১

প্রকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণের শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে হয়।* কিন্তু ইহা হইতেছে পুরুষের কেবল বাহ্যিক অনুভূতি, আর ক্ষর প্রকৃতির সহিত সঙ্গের ফলে পুরুষ ক্ষরভাবাপন্ন হয়। এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রকৃতির ও আমাদের ভগবান, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, প্রকৃতির মহান ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতির কার্য সাক্ষিরূপে দর্শন করেন, তাহার ক্রিয়ায় অনুমতি দেন, সে যাহা কিছু করে তাহা সমর্থন করেন, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রকৃতি যে তাঁহার নিজেরই সত্তার নানা রূপ সৃষ্টি করিয়া খেলা করিতেছে, নিজের বিশ্বগত আনন্দ দিয়া তিনি তাহা উপভোগ করেন।† এই যে আত্ম-জ্ঞান, আমাদের মনকে ইহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমরা নিজেদিগকে সনাতন ভগবানের সনাতন অংশ বলিয়া প্রকৃতভাবে জানিতে পারিব।†† একবার যদি এই আত্ম-জ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্তরপুরুষ প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে বাহ্যত যে-ভাবেই চলুক, দৃশ্যত সে যাহাই করুক বা ব্যক্তিকতা ও কর্মশক্তি ও দেহধারী অহংয়ের যে-কোন রূপই গ্রহণ করুক, সে থাকে নিজ সত্তায় মুক্ত, আর জন্মান্তর-চক্রে বন্ধ নহে, কারণ আত্মার নির্ব্যক্তিকতায় সে আভ্যন্তরীণ অজাত অধ্যাত্মসত্তার সহিত এক হইয়া যায়। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সে-সবের যে অহমিকাশূন্য পরম অহং, তাহার সহিত মিলন হইতেছে ঐ নির্ব্যক্তিকতা।

এই জ্ঞান আইসে আভ্যন্তরীণ ধ্যানের দ্বারা, তাহার ভিতর দিয়া শাশ্বত আত্মা আমাদের আত্ম-সত্তার মধ্যেই আমাদের নিকট প্রকট হয়।* অথবা ঐ জ্ঞান আইসে সাংখ্য-যোগের দ্বারা, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ সাধনের দ্বারা। অথবা উহা আইসে কর্মযোগের দ্বারা, মন ও হৃদয় ও আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে ভগবানের দিকে উন্মুক্ত করায় ব্যক্তিগত সংকল্প ও ইচ্ছা লুপ্ত হইয়া যায়, প্রকৃতিতে আমাদের সমুদয় কর্মের ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মারই প্রেরণায় যে-কোন যোগ, ঐক্য সাধনের যে-কোন পন্থা ধরিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইতে পারে। অথবা আমরা এই জ্ঞান লাভ করিতে পারি অন্যের নিকট হইতে সত্যটি শ্রবণ করিয়া এবং মন শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার

* পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ১৩।২২

† উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩।২৩

†† য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ১৩।২৪

* ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ১৩।২৫

সহিত যাহা শ্রবণ করে তাহারই মর্ম অনুযায়ী মনকে গঠিত করিয়া। † কিন্তু যে-ভাবেই লাভ করা যাউক, ইহা আমাদিগকে মৃত্যুর পারে অমৃতত্বে লইয়া যায়। জ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় প্রকৃতির নশ্বরতার সহিত পুরুষের পরিবর্তনশীল ব্যাপারসকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত আমাদের ঊর্ধ্বতম আত্মাকে, তিনিই প্রকৃতির সকল কর্মের পরম অধীশ্বর, সকল বস্তু সকল জীবের মধ্যে তিনি এক এবং সম, দেহ গ্রহণ করিয়াও তিনি জাত হন না, এই সকল দেহের ধ্বংস হইলেও তিনি মৃত্যুর অধীন হন না। * এইটিই সত্য দর্শন, আমাদের মধ্যে যাহা শাশ্বত ও অবিনশ্বর তাহারই দর্শন। যত আমরা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করি ততই আমরা আত্মার সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত হই; যতই আমরা এই বিশ্বময় সত্তার মধ্যে বাস করি ততই আমরা নিজেরাও বিশ্বময় সত্তা হইয়া উঠি; যতই আমরা এই শাশ্বত পুরুষকে অবগত হই ততই আমরা নিজেদের শাশ্বতভাব পরিগ্রহ করি এবং চিরন্তন হই। আমরা নিজেদিগকে আত্মার শাশ্বতভাবের সহিত এক করিয়া দিই, আর আমাদের মানসিক ও দৈহিক অজ্ঞানতার খণ্ডতা ও দুর্দশার সহিত নহে। তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সকল কর্মই প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ও প্রক্রিয়া, আমাদের যে প্রকৃত আত্মা সে কর্মকর্তা নহে, পরন্তু সে হইতেছে ঐ কর্মের মুক্ত সাক্ষী ও ঈশ্বর ও অনাসক্ত ভোক্তা। † বিশ্বলীলার এই যে বাহিরের দিক, এই সমস্তই হইতেছে এক শাশ্বত পুরুষের সত্তার মধ্যে ভূতসমূহের পৃথক-পৃথক ভাব, বিশ্বশক্তি সেই পুরুষের গভীরতায় নিহিত নিজ বিজ্ঞানের বীজসমূহ হইতে এই সমুদয় বিস্তৃত করিয়াছে, প্রকট করিয়াছে, মেলিয়া দিয়াছে; * কিন্তু যদিও পরমাত্মা আমাদের এই শরীরে প্রকৃতির ক্রিয়াসকল পরিগ্রহ করেন উপভোগ করেন, তথাপি ইহার নশ্বরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত শাশ্বত, তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে বহু রূপ গ্রহণ করেন সে-সবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না কারণ তিনি এই সকল

† অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৩।২৬

* যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্‌ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৩।২৭-২৯

† প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ১৩।৩০

* যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩।৩২

ব্যক্তরূপের এক অদ্বিতীয় পরম আত্মা, তিনি গুণসকলের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হন না কারণ তিনি নিজে গুণাত্মক নহেন, তিনি কর্মের মধ্যেও কর্ম করেন না, কর্ত্তারমপি অকর্ত্তারম্, কারণ তিনি প্রকৃতির কর্মকে ধরিয়া থাকেন আত্মায় সেই কর্মের ফলসকল হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত থাকিয়া, বস্তুত তিনিই সকল কর্মের মূল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির লীলা দ্বারা তিনি কোনরূপেই পরিবর্তিত বা বিকৃত হন না। † যেমন সর্বব্যাপী আকাশ বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়াও তাহাদের দ্বারা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না, পরন্তু সকল সময়েই এক শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, মৌলিক পদার্থরূপেই বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনিই এই আত্মা যাহা কিছু সম্ভব সকল কর্ম করিয়া সকল রূপ ধরিয়াও সে-সকলের মধ্যে সেই এক শুদ্ধ অক্ষর সূক্ষ্ম অনন্ত সত্তারূপে বিদ্যমান থাকে। † সেইটিই জীবের পরা গতি, সেইটিই দিব্য সত্তা, দিব্য ভাব, মদ্ভাব; এবং যে-কেহ অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে সে-ই শাশ্বতের সেই পরম অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতে পারে।

এই ব্রহ্ম, আপন প্রাকৃত বিবর্তনের ক্ষেত্রের এই অধ্যাত্ম জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তাঁহারই চিরন্তনী শক্তি এই যে প্রকৃতি নিজেকে সেই ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতেছে, মর প্রকৃতির মধ্যেই আত্মার এই অমৃতত্ব—এই সব জিনিসকে লইয়াই আমাদের জীবনের সমগ্র সত্য। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার দিকে যখন আমরা ফিরি তখন তাহা তাহার জ্যোতির্ময় সত্যের দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ক্ষেত্রটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। * সেই জ্ঞান-সূর্যের আলোকে আমাদের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় এবং আমরা সেই সত্যের মধ্যে বাস করি, আর এই অজ্ঞানের মধ্যে নহে। তখন অমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের বর্তমান মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা অন্ধকারের ভ্রান্তি মাত্র, তখন আমরা নিম্নতন প্রকৃতির ধর্ম হইতে, মন ও দেহের ধর্ম হইতে মুক্ত হই, আমরা আত্মার পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হই। † সেই মহিমময় সমুচ্চ পরিবর্তনই হইতেছে শেষ রূপান্তর, দিব্য অনন্ত সম্ভূতি, মর-প্রকৃতিকে পরিহার করা এক অমৃতময় জীবন পরিগ্রহ করা।

† অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩।৩২

†† যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ১৩।৩৩

* যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবি।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ১৩।৩৪

† ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ১৩।৩৫

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণাতীত

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে কয়েকটি নিশ্চয়াত্মক বিশেষণের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির যে-সব ভেদ দেখান হইয়াছে, তাহাদের পৃথক শক্তি এবং ক্রিয়ার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গূঢ়ার্থব্যঞ্জক লক্ষণ বলা হইয়াছে, বিশেষত যে দেহধারী জীবাত্মা প্রকৃতির গুণসকলকে ভোগ করার দরুন তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং যে পরমাত্মা গুণসকলকে ভোগ করে কিন্তু তাহার অধীন হয় না কারণ সে নিজে তাহাদের অতীত, এই দুয়ের মধ্যে যে ভেদ করা হইয়াছে—এইগুলিই হইতেছে ভিত্তি যাহার উপর গীতার সাধর্ম্যের সমগ্র আদর্শটি, মুক্ত পুরুষ তাহার সত্তার সজ্ঞান ধর্মে ভগবানের সহিত কেমন করিয়া এক হয় সেই আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত। সেই মুক্তি, সেই একত্ব, সেই দিব্য প্রকৃতিলাভ, সাধর্ম্য, ইহাকেই গীতা অধ্যাত্মমুক্তির সারতত্ত্ব বলিয়া, অমৃতত্বের পূর্ণ মর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই যে সাধর্ম্যকে পরম সার্থকতা দেওয়া, এইটিই গীতার শিক্ষার প্রধান কথা।

অমৃতত্ব বলিতে প্রাচীন অধ্যাত্ম শিক্ষায় কখনই শরীরের মৃত্যুর পর কেবল ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকা বুঝায় নাই; সে অর্থে সকল সত্তাই অমর, কেবল রূপেরই ধ্বংস হয়। যে-সকল জীব মুক্তিলাভ করে না, তাহারা যুগবিবর্তনের ধারায় জীবনযাপন করিয়া চলে; ব্যক্ত জগৎ-সকলের প্রলয় হইলে সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে লীন বা গুপ্ত থাকে, নূতন কল্পারম্ভে আবার তাহারা জন্মগ্রহণ করে। প্রলয় হইতেছে এক কল্পের অন্ত, তাহাতে একটি বিশ্বরূপের সাময়িক ভাবে ধ্বংস হয় এবং তাহার সহিত যত ব্যষ্টিরূপ ঘুরিতেছে তাহাদেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু তাহা হইতেছে একটা সাময়িক বিরতি মাত্র, একটা নীরব অবকাশের পরে আবার প্রকটিত হয় নূতন সৃষ্টি, নূতন সমাহার, পুনর্গঠন, তাহাতে তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের প্রগতির প্রেরণাশক্তি ফিরিয়া পায়। আমাদের দৈহিক মৃত্যুও একটা প্রলয়, গীতা এখনই ঐ শব্দটিকে এই মৃত্যুর অর্থেই ব্যবহার করিবে, প্রলয়ম্ যান্তি দেহভৃৎ, দেহধারী জীব প্রলয়প্রাপ্ত হয়। জড়ের যে রূপকে অজ্ঞানের বশে সে নিজ সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছে, এবং এখন যাহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তাহারই প্রলয় হয়। কিন্তু জীবাত্মা নিজে বর্তমান থাকে এবং কিছুকাল পরে ঐ পঞ্চভূত হইতেই নির্মিত নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মজন্মান্তর চক্রে ঘুরিতে থাকে, ঠিক যেমন বিশ্ব-

পুরুষ কিছুকাল বিশ্রাম ও বিরতির পর আবার কালচক্রে তাঁহার অন্তহীন আবর্তন আরম্ভ করেন। কালচক্রের আবর্তনে এই যে অমরত্ব ইহা সকল দেহ-ধারী আত্মারই আছে।

গভীরতর অর্থে যে অমরত্ব তাহা এইরূপ মৃত্যুর পরেও উদ্বর্তন এবং পুনঃ-পুনঃ আবর্তন হইতে পৃথক জিনিস। অমরত্ব হইতেছে সেই পরমপদ যাহাতে আত্মা জানে যে, সে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, নিজের প্রকাশনের স্বরূপের দ্বারা সে সীমাবদ্ধ নহে, সে অনন্ত, অক্ষয়, অপরিবর্তমান শাশ্বত,—অমর, কারণ সে কখনও জন্মায় নাই, তাই কখনও মরে না। ভাগবত পুরুষোত্তম, তিনি পরম ঈশ্বর এবং পরমব্রহ্ম, তিনি অমর শাশ্বততার চির অধিকারী, শরীর গ্রহণ করিলে বা অনবরত নানা বিশ্বরূপ বিশ্বশক্তি পরিগ্রহ করিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কারণ তিনি সর্বদা এই আত্মজ্ঞানে বাস করেন। তাঁহার স্বরূপই হইতেছে নিজের শাশ্বততা সম্বন্ধে অবিক্রিয় ভাবে সচেতন থাকা; তাঁহার যে আত্মজ্ঞান তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি এখানে সকল দেহেরই দিব্য অধিবাসী, কিন্তু প্রত্যেক দেহে তিনি অজাত, সে-আবির্ভাবের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যে তিনি সীমাবদ্ধ হন না, তিনি যে দৈহিক প্রকৃতি পরিগ্রহ করেন তাহার সহিত এক হইয়া পড়েন না; কারণে সেইটি গৌণ ঘটনা মাত্র। পুরুষোত্তমের এই যে নিত্য-সচেতন শাশ্বত সত্তা ইহার মধ্যে বাস করাই মুক্তি, অমৃতত্ব।* কিন্তু এখানে এই মহত্তর অধ্যাত্ম অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে দেহধারী জীবকে নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন করা বন্ধ করিতেই হইবে; ভগবানের যে পরম জীবনধারা তাহারই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বস্তুত সেইটিই তাহার নিজের মূলসত্তার প্রকৃত ধর্ম। যেমন তাহার নিগূঢ় আদি সত্তায় তেমনি তাহার জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশধারাতেও তাহাকে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে।

এই যে মহান সিদ্ধি, মানব প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠা, ইহা আমরা পারি কেবল ভগবদ্‌মুখী জ্ঞান, এষণা ও ভক্তির প্রয়াসের দ্বারা। কারণ যদিও জীব পরম ভগবান কর্তৃক নিজের সনাতন অংশ রূপে, নিজের অমর

* গীতায় কোথাও কোনরূপ আভাস দেওয়া হয় নাই যে, অব্যক্ত অনির্দেশ্য বা কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তার লয় সাধনই অমৃতত্বের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত অবস্থা অথবা যোগের প্রকৃত লক্ষ্য। পক্ষান্তরে গীতা পরে বলিয়াছে যে, ঈশ্বরের যে পরম পদ তাহার মধ্যে বাস করাই অমৃতত্ব, ময়ি নিবসিষ্যসি, পরং ধাম, এবং এখানে অমৃতত্বকে বলিয়াছে সাধর্ম্য, পরাম্ সিদ্ধিম্, পরমেশ্বরের সহিত সত্তা ও প্রকৃতির ধর্মে এক হওয়া, তখনও আপন সত্তায় অক্ষুণ্ণ থাকা এবং বিশ্বধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বে থাকা, যেমন সকল মুনিরা এখনও রহিয়াছেন, মুনয়ঃ সর্ব্বেঃ, তাঁহারা সৃষ্টিকালে জন্মের অধীন হন না, প্রলয়কালেও ব্যথাপ্রাপ্ত হন না, সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

প্রতিভূরূপে বিশ্ব প্রকৃতির কর্মধারার মধ্যে প্রেরিত তথাপি সে এই কর্মধারা-সকলের ধর্মের দ্বারা বাধ্য হইয়া, অবশম্ প্রকৃতের্বশাৎ, নিজেকে বাহ্য চেতনায় প্রকৃতির বন্ধনসকলের সহিত এক করিয়া দেখে; সে নিজেকে যে প্রাণ মন দেহ বলিয়া দেখে তাহারা তাহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য এবং অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তা সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাওয়া, পুরুষের সহিত প্রকৃতির আপাতদৃশ্য সম্বন্ধের নহে পরন্তু প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা, ভগবানকে, নিজেদিগকে এবং জগৎকে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারা জানা, আর শুধু ভৌতিক ও বাহ্যিক অনুভূতির দ্বারা নহে, আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের গভীরতম সত্যের ভিতর দিয়া, ইন্দ্রিয়ানুগ মন এবং বহির্মুখী বুদ্ধির বিভ্রান্তকারী প্রাতিভাসিক জ্ঞানের ভিতর দিয়া নহে—ইহাই এই সিদ্ধিলাভের অপরিহার্য পন্থা। আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ জ্ঞান ব্যতীত, আমাদের প্রাকৃত জীবনের দিকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিপাত ব্যতীত সিদ্ধি আসিতেই পারে না, এবং এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির উপর এত জোর দিয়াছিলেন,—সে জ্ঞান শুধু বিচারবুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলকে জানা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে মনোময় জীব মানুষের এক মহত্তর অধ্যাত্মচৈতন্যে গড়িয়া উঠা। জীব পূর্ণতা লাভ না করিলে, ভাগবত প্রকৃতিতে গড়িয়া না উঠিলে জীবের মুক্তি হইতেই পারে না; নিরপেক্ষ ভগবান হঠাৎ খেয়ালের বশে বা তাঁহার কৃপায় খামখেয়ালী সনদের দ্বারা তাহা আনিয়া দিবেন না। দিব্য-কর্মসকল মুক্তির জন্য ফলপ্রদ হয় কারণ তাহারা আমাদের জীবনের আভ্যন্তরীণ অধীশ্বরের সহিত ক্রমবিকাশমান একত্বের দ্বারা আমাদিগকে এই সিদ্ধির দিকে এবং আত্মা ও প্রকৃতি ও ভগবানের জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। ভগবদ্ প্রেম ফলপ্রদ হয় কারণ ইহার দ্বারা আমরা আমাদের ভক্তির একমাত্র পরম পাত্রের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠি এবং পরম ভগবানের প্রেমকে প্রতিদানরূপে নামাইয়া আনি, তাহা আমাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতে এবং তাঁহার শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার উন্নয়নকারী শক্তি ও পবিত্রতায় প্লাবিত করিয়া দেয়। সেই জন্যই গীতা বলিল যে এইটিই পরম জ্ঞান, জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্, কারণ ইহা পরম সিদ্ধি ও পরম অধ্যাত্ম-পদে লইয়া যায় এবং জীবকে ভগবানের সাধর্ম্যে লইয়া আসে।* ইহাই সনাতন জ্ঞান, মহান অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সকল মুনি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পরম ভগবানের সহিত সত্তার ধর্মে এক হইয়া উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার শাশ্বততার মধ্যে অনন্ত কালের জন্য

* পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমতো গতাঃ।
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৪।১,২

বাস করিতেছেন, সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং বিশ্বপ্রলয়ের ব্যথাতেও ব্যথিত হন না। তাহা হইলে এই যে সিদ্ধি ও এই যে সাধর্ম্য—ইহাই অমৃতত্বের পন্থা এবং সেই অপরিহার্য বিধান যাহা ব্যতীত জীব শাশ্বতের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারে না।

মানবাত্মা যদি নিজ গুহ্য মূল সত্তায় ভগবানের সহিত অক্ষয়ভাবে এক না হইত এবং তাঁহার ভাগবতত্বের অঙ্গ ও অংশ না হইত তাহা হইলে সে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিত না; যদি সে কেবল মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতিরই জীব হইত, তাহা হইলে সে অমর হইত না বা কখনও অমর হইতে পারিত না। সমস্ত সৃষ্টিই ভাগবত সত্তার প্রকটন, এবং আমাদের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তারই অংশ। অবশ্য আমরা নিম্নতর জড়প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি এবং আমরা ইহার প্রভাবের অধীন, কিন্তু আমরা সেখানে আসিয়াছি পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে; এই অধঃস্থ অপূর্ণ অবস্থা আমাদের আপাতদৃশ্য সত্তা, কিন্তু অন্যটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা। শাশ্বত ভগবান আত্মসৃষ্টিরূপে এইসব বিশ্বধারাকে প্রকটন করিয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে এই বিশ্বের পিতা ও মাতা †; মহৎ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান, হইতেছে যোনি, তাহাতে তিনি তাঁহার আত্মসৃজনের বীজ নিক্ষেপ করেন। * অধি-আত্মা (the Over-Soul) রূপে তিনি বীজ নিক্ষেপ করেন; মাতারূপে, তাঁহার চেতনাময় তেজে পরিপূর্ণ চিৎশক্তি, প্রকৃতি-আত্মা (Nature-Soul) রূপে তিনি সেই বীজকে তাঁহার অপরিমিত অথচ আত্মপরিমিত বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই অনন্ত সারসত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন। তিনি এই মহতের গর্ভে সেই দিব্য বীজকে গ্রহণ করেন এবং সেইটিকে আদি ভাবময় সৃষ্টিতে উৎপন্ন মন ও দেহের রূপে গড়িয়া তোলেন। আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সে-সমুদয়ই ঐ সৃষ্টিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন; কিন্তু এখানে যাহা জন্মিতেছে তাহা অজাত অনন্তের কেবল সসীম ভাব ও রূপ। অধ্যাত্ম সত্তা হইতেছে শাশ্বত, তাহার সকল প্রকাশের ঊর্ধ্বে; অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে শাশ্বত অনাদি প্রকৃতি অন্তহীন সৃষ্টি এবং সমাপ্তিহীন প্রলয়ের ভিতর দিয়া চিরকাল কল্প-কল্পান্তের ছন্দে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে-পুরুষ নানা রূপ গ্রহণ করিতেছে সেও প্রকৃতি অপেক্ষা কম শাশ্বত নহে, অনাদি উভৌ অপি। এমন কি প্রকৃতির মধ্যে যখন সে অবিরাম কল্পের চক্রে ঘুরিতেছে, তখনও সে যে শাশ্বত হইতে ইহাদের মধ্যে আসিয়াছে সেই শাশ্বত সত্তায় জন্ম ও মৃত্যুর চক্রের ঊর্ধ্বে

† মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ১৪।৩

* সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪।৪

চির-বিরাজমান, এমন কি এখানে তাহার আপাতদৃশ্য চৈতন্যেও সে সেই সত্তাগত ও নিত্য লোকত্তরতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে।

তাহা হইলে এই প্রভেদটি কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া পুরুষ জন্ম, মৃত্যু ও বন্ধনের প্রতিভাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে—কারণ ইহা খুবই স্পষ্ট যে এটা শুধুই প্রতিভাস (appearance)? ইহা হইতেছে চৈতন্যের একটি নিম্নতর ক্রিয়া বা অবস্থা, এই নীচের প্রবর্তনার সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্রিয়ায় প্রকৃতির গুণসকলের সহিত, এবং মন, প্রাণ, দেহের আত্ম-পরায়ণ অহংভাবে বদ্ধ কর্মগ্রন্থির সহিত নিজেকে আত্মবিস্মৃতির বশে এক করিয়া দেখা। যদি আমরা নিম্নতর ক্রিয়ার মোহকরী-শক্তি হইতে সরিয়া আমাদের পূর্ণভাবে চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাই, এবং আত্মার মুক্ত প্রকৃতি ও তাহার শাশ্বত অমৃতত্ব লাভ করিতে চাই তাহা হইলে প্রকৃতির গুণসমূহের ঊর্ধ্বে উঠা ত্রৈগুণ্যাতীত হওয়া অপরিহার্য। সাধর্ম্যের সেই অবস্থাটিই অতঃপর গীতা পরিস্ফুট করিতে অগ্রসর হইতেছে। পূর্বেকার একটি অধ্যায়ে গীতা ইহার উল্লেখ করিয়াছে এবং একটু জোর দিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু এখন আরও যথাযথভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে এই সব গুণ কি, কেমন করিয়া তাহারা পুরুষকে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং অধ্যাত্ম মুক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে; এবং গুণসকলের অতীত হওয়ার অর্থ কি।

প্রকৃতির গুণগুলি সবই মূলত গুণাত্মক (qualitative) এবং সেই জন্যই সে-সবকে প্রকৃতির গুণ বলা হয়। বিশ্বের যে-কোন অধ্যাত্ম পরিকল্পনায় এই রকমই হইতে বাধ্য, কারণ অধ্যাত্ম সত্তা ও জড়ের মধ্যে যোগসূত্র হয় চৈত্য শক্তি (psyche or soul power) এবং মূল ক্রিয়াটি হয় চেতনাত্মক ও গুণাত্মক, ভৌতিক বা পরিমাণাত্মক নহে; কারণ গুণই বিশ্বশক্তির সকল ক্রিয়ায় অভৌতিক তত্ত্ব, অধিকতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহার আদ্যা গতিশক্তি। জড় বিজ্ঞানের প্রাধান্য আমাদিগকে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা বিভিন্ন ধারণায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কারণ সেখানে প্রথমেই যে-জিনিসটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইটি হইতেছে তাহার কর্মসমূহের পরিমাণের দিকের প্রধান্য এবং তাহার রূপসৃষ্টির জন্য পরিমাণ অনুযায়ী যোগাযোগের উপর নির্ভরতা। এমন কি সেখানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, জড় হইতেছে শক্তিরই সত্তা বা ক্রিয়া, শক্তি স্ব-প্রতিষ্ঠ জড়সত্তার সম্প্রেরণা মাত্র নহে অথবা জড়ের অন্তর্নিহিত একটা ক্রিয়া মাত্র নহে, আর এই আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যার কতকটা পুনরাবির্ভাবের সূচনা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণের বিশ্লেষণ প্রকৃতির পরিমাণাত্মক ক্রিয়া, মাত্রা, স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের মতে সেইটি প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ও স্থূল নিয়মানুগত কার্যসম্পাদন ধারারই বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যে অন্তগূঢ় ভাবাত্মক কর্মসম্পাদনশক্তি

বস্তুসকলকে তাহাদের গুণ ও স্বভাব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করে, সেইটিই প্রধান নিশ্চয়াত্মক শক্তি এবং সকল বাহ্যিক পরিমাণাত্মক বিন্যাসের মূলে রহিয়াছে। স্থূল জগতের মূলে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না এই জন্য যে, অন্তর্নিহিত চেতনাত্মক সত্তা, মহদ্ ব্রহ্ম, সেখানে জড়বস্তু ও জড়শক্তির ক্রিয়ায় আচ্ছাদিত এবং লুক্কায়িত। কিন্তু স্থূল জগতেও একই গুণসম্পন্ন বস্তুসকলের বিভিন্ন মিশ্রণ ও পরিমাণের যেরূপ আশ্চর্যজনক বিভিন্ন ফল হয়, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাই সম্ভব হইত না যদি না গুণ-পরিবর্তন সাধক এক শ্রেষ্ঠতর শক্তি না থাকিত; সেই শক্তি এই সকল স্থূল বিন্যাসকে কৌশলরূপে ব্যবহার করিতেছে। অথবা একেবারেই বলা ভাল যে, বিশ্ব-শক্তির এক নিগূঢ় চেতনাময় ক্ষমতা আছে, বিজ্ঞান, (যদিই আমরা ধরিয়া লই যে, শক্তি এবং তাহার ভাবাত্মক যন্ত্র, বুদ্ধি, উভয়েই স্বরূপত জড়, mechanical) তাহা এই সকল বাহ্যিক যোগাযোগের গাণিতিক পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয় এবং তাহাদের ক্রিয়াফল নির্ধারণ করে। অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে সেই সর্বশক্তিমান বিজ্ঞানই এই সকল কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতেছে। আর প্রাণিক ও মানসিক জীবনে গুণ একেবারেই প্রকাশ্যভাবে প্রধান শক্তিরূপে দেখা দেয়, সেখানে শক্তির পরিমাণ গৌণ। কিন্তু বস্তুত মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক সকল জীবনই গুণের সীমার অধীন, সকলেই ইহার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যদিও জীবনের ক্রমপর্যায়ে যতই আমরা নীচের দিকে যাই ততই সে-সত্য বেশী-বেশী অস্পষ্ট হইয়া যায়। কেবল অধ্যাত্ম সত্তা নিজের ভাবময় সত্তা ও ভাবময় শক্তি, মহৎ ও বিজ্ঞানের বলে এই সকল বিধান নিরূপণ করে, সে নিজে ঐ ভাবে গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, গুণ বা পরিমাণ কিছুরই সীমার অধীন নহে কারণ তাহার অপরিমেয় এবং অনির্দেশ্য আনন্ত্য এই সব গুণ ও পরিমাণের অতীত, এ-সবকে সে নিজের সৃষ্টিকার্যের জন্য বিকাশ ও ব্যবহার করে।

কিন্তু আবার প্রকৃতির যে গুণাত্মক ক্রিয়া সূক্ষ্মতায় ও বৈচিত্র্যে এইরূপ অনন্ত জটিলতাময়, সে-সমুদয়ই তিনটি সাধারণ গুণের ছাঁচে ঢালা, সে তিনটি গুণ সর্বত্র বিদ্যমান, পরস্পরের সহিত সংগ্রথিত, প্রায় অচ্ছেদ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। মানুষের চেতনার উপর এইসব গুণের যে ক্রিয়া, গীতায় কেবল তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অথবা সেই প্রসঙ্গে খাদ্য প্রভৃতি দ্রব্যে তাহাদের যে ক্রিয়ার দ্বারা তাহারা মানুষের মন বা প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহারও বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি আমরা অধিকতর ব্যাপক সংজ্ঞা চাই তাহা হইলে আমরা বোধ হয় তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইব ভারতীয় ধর্মের সেই রূপকাত্মক পরিকল্পনায় যাহা এই গুণত্রয়ের এক একটি গুণকে বিশ্ব-ত্রয়ীর এক একটি দেবতার গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর

গুণ সত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার গুণ রজঃ, সংহারকর্তা রুদ্রের গুণ তমঃ। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে এই ত্রিবিধ বিশেষণের যুক্তিবত্তার সন্ধান করিলে আমরা গুণত্রয়কে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাবরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি যে, তাহারা প্রকৃতির তিনটি নিত্য সহচারী ও অবিচ্ছেদ্য শক্তি—সাম্য (equilibrium), প্রবৃত্তি (kinesis), জাড্য (inertia)। কিন্তু উহারা ঐরূপ দৃষ্ট হয় কেবল শক্তির বাহ্যিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্য রকম দেখা যায় যদি আমরা চৈতন্য ও শক্তিকে এক অদ্বিতীয় সত্তারই যুগ্ম ভাব বলিয়া দেখি, প্রকৃত সত্তায় উভয়েই চির-সহবর্তী, যদিও জড় প্রকৃতির প্রাথমিক বাহ্য প্রপঞ্চে চৈতন্য-জ্যোতি নিশ্চেতন তমসাবৃত শক্তির বিরাট ক্রিয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়, আবার অধ্যাত্ম নিশ্চলতার বিপরীত সীমায় শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা বা সাক্ষী চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যে দুই অবস্থা ইহারা হইতেছে বাহ্যত বিচ্ছিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীত সীমা, কিন্তু কেহই আপন চরম সীমায় তাহার শাশ্বত সাথীকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয় না, বড় জোর নিজের সত্তার বিশিষ্ট ধারাটির গভীরে লুক্কায়িত করিয়া রাখে। অতএব যেহেতু অচেতনবৎ শক্তির মধ্যেও চৈতন্য নিত্য বিরাজ করিতেছে, এই তিনটি গুণের যে চৈত্য শক্তি তাহাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহার সন্ধান আমরা নিশ্চয়ই পাইব। চৈতন্যের দিক দিয়া গুণত্রয়ের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে, তমঃ প্রকৃতির নিশ্চেতনার শক্তি, রজঃ বাসনা কামনার দ্বারা সম্বুদ্ধ তাহার সক্রিয় অন্বেষু অজ্ঞানের শক্তি, সত্ত্ব তাহার সিদ্ধিপ্রদ সামঞ্জস্যসাধক জ্ঞানের শক্তি।

প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বজগতে সকল সত্তায় অচ্ছেদ্যভাবে বিমিশ্রিত। জাড্যের তত্ত্ব তমঃ হইতেছে অপ্রবর্তক ও অচেষ্ট নিশ্চৈতন্য, তাহা সকল আঘাত, সকল স্পর্শ সহ্য করিয়া যায়, সে-সবকে জয় করিতে কোনও উদ্যম করে না; কেবল মাত্র এই গুণটি থাকিলে বিশ্বশক্তির সমগ্র ক্রিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইত এবং বস্তুসত্তার পূর্ণ বিলয় হইত। কিন্তু ইহা চালিত হইতেছে রজোগুণের গতিকারক শক্তির দ্বারা এবং জড়ের নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও ইহার সহিত মিলিত ও জড়িত রহিয়াছে সঙ্গতি, সাম্য ও জ্ঞানের স্থিতিমূলক তত্ত্ব, তাহা অধিকৃত না হইলেও অন্তর্নিহিত। জড়শক্তির যে মূল ক্রিয়া তাহাতে সে তামসিক নিশ্চেতন যন্ত্রবৎ বলিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং তাহার গতিক্রিয়ায় ধ্বংসমুখী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহা মূক রাজসিক প্রবৃত্তির এক বিশাল শক্তি ও সম্প্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত, উহার বিক্ষেপ ও বিধ্বংসের মধ্যেই, এমন কি ইহাদের দ্বারাই ঐ শক্তি উহাকে গঠন ও সৃজন কার্যে চালিত করিতেছে; আবার উহার বাহ্যত নিশ্চেতন শক্তির মধ্যে একটা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে

এবং উহাকে প্রভাবিত করিতেছে, দুইটি বিরোধী প্রবৃত্তির উপরে একটা সামঞ্জস্য ও স্থিতিসাধক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে। রজঃ হইতেছে প্রকৃতিতে সৃজনমুখী প্রচেষ্টা, গতি ও সম্প্রেরণার তত্ত্ব, "প্রবৃত্তি"; জড়ের মধ্যে রজঃগুণ এই ভাবেই দেখা দেয়, কিন্তু ইহা আরও স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় প্রাণের প্রধান লক্ষণ প্রচেষ্টা ও বাসনা ও কর্মের চেতন বা অর্ধচেতন আবেগ রূপে—কারণ এই আবেগই হইতেছে সকল প্রাণময় সত্তার স্বরূপ। আর উহা যদি শুধু নিজের প্রকৃতি অনুসারেই চলিতে পায় তাহা হইলে অবিরাম কিন্তু নিত্য-পরিবর্তনশীল ও চঞ্চল জীবন ও কর্ম ও সৃষ্টির প্রবর্তন করিবে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হইবে না। কিন্তু একদিকে সে মৃত্যু ও ক্ষয় ও জড়তা সম্বলিত তমোগুণের বিধ্বংসী শক্তির সম্মুখীন হইতেছে, আবার অন্যদিকে তাহার অজ্ঞান ক্রিয়া সত্ত্বের শক্তির দ্বারা ব্যবস্থিত, সুসমঞ্জসীকৃত এবং বিধৃত হইতেছে; সত্ত্বের এই শক্তি নিম্নতর প্রাণীসকলের মধ্যে রহিয়াছে অবচেতন-রূপে, মানসিক সত্তার বিকাশের সহিত উহা ক্রমশ অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে, এবং সর্বাপেক্ষা সচেতন হইতেছে পুনর্গঠিত মানসিক সত্তায় সঙ্কল্প ও তর্কশক্তিরূপে প্রকট বিকশিত বুদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যে। সত্ত্ব হইতেছে বোধাত্মক জ্ঞানের তত্ত্ব, সুসংগতি পরিমিতি ও সাম্যের তত্ত্ব, শুধু নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলিত পারিলে সত্ত্ব সুদৃঢ় ও জ্যোতির্ময় সুসংগতি-সকলের কোনরূপ স্থায়ী সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া যাইত, কিন্তু জগতের গতি পরম্পরায় উহা চিরন্তন কর্মপ্রবৃত্তির চঞ্চল দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির শক্তিসকলের দ্বারা অভিভূত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রকৃতির গুণ-ত্রয়ের মিশ্রিত এবং পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত জগতের ইহাই হইতেছে দৃশ্যরূপ।

বিশ্বশক্তির এই যে সাধারণ বিশ্লেষণ, গীতা প্রকৃতিতে মানুষের বন্ধন এবং তাহার অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে মানবীয় মনস্তত্ত্বের উপর ইহার প্রয়োগ করিয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সত্ত্ব নির্মল গুণ বলিয়া জ্যোতি ও জ্ঞানের হেতু হয় এবং সেই নির্মলতার কল্যাণেই তাহা প্রকৃতিতে কোনরূপ রোগ, অসুস্থতা বা দুঃখের সৃষ্টি করে না।* যখন এই দেহের সকল দ্বার দিয়া জ্যোতির প্লাবন প্রবেশ করে, বোধ, প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানের জ্যোতি, যেন কোন বদ্ধ-গৃহের সমস্ত দ্বার ও জানালা সূর্যালোকের দিকে উন্মুক্ত হইয়া যায়—যখন বুদ্ধি হয় অবহিত ও প্রকাশময়, ইন্দ্রিয়গণ হয় উজ্জীবিত, সমস্ত মানস-

* তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ১৪।৬
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১৪।১১

সত্তা হয় তৃপ্ত ও উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ এবং স্নায়বীয় সত্তা হয় সুস্থির, সমুজ্জ্বল স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতায়, 'প্রসাদে', পূর্ণ তখন বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি ও অভ্যুত্থান হইয়াছে। কারণ জ্ঞান এবং একটা সুসমঞ্জস স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ হইতেছে সত্ত্বের বিশিষ্ট পরিণাম ফল। পরিতৃপ্ত সংকল্প ও বুদ্ধির আভ্যন্তরীণ প্রসাদ যে সন্তোষ আনয়ন করে, সাত্ত্বিক সুখ শুধু তাহাই নহে, পরন্তু আত্মা আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে, অথবা চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতি ও তাহার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও ভোগ্য বিষয়সকলের সহিত দ্রষ্টা পুরুষের একটা সুসংগতি বা একটা যথাযথ ও সত্য সামঞ্জস্যের দ্বারা যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির উদ্ভব হয় সেই সমস্ত লইয়াই সাত্ত্বিক সুখ।

আবার রজঃ হইতেছে রাগাত্মক, অনুরাগ ও বাসনার আকর্ষণই ইহার মূলগত লক্ষণ।* বিষয়বাসনাতে জীবের যে আসক্তি রজঃ তাহারই সন্তান; অপ্রাপ্ত ভোগের জন্য প্রকৃতির যে তৃষ্ণা তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। অতএব ইহা অস্থিরতা, দাহ, কাম, লোভ ও উত্তেজনায় পূর্ণ, লালসাময় সম্প্রেরণার জিনিস, আর মধ্যম গুণটি যখন বর্ধিত হয় তখন এই সবই আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ইহা হইতেছে বাসনার শক্তি, সকল সাধারণ ব্যক্তিগত কর্মারম্ভ এবং আমাদের প্রকৃতিতে যে চাঞ্চল্য, স্পৃহা, প্রণোদনা কর্মের দিকে আমাদিগকে পরিচালিত করে—ইহাই সে-সবের প্রবর্তক। অতএব স্পষ্টতই রজঃ হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের মধ্যে ক্রিয়াত্মক শক্তি (Kinetic force)। ইহার ফল হইতেছে কর্মের লালসা, কিন্তু শোক, বেদনা, সকল রকম দুঃখও ইহার ফল; কারণ সে নিজের বিষয়কে যথাযথ ভাবে অধিকার করিতে পারে না—বস্তুত বাসনার অর্থই হইতেছে না-পাওয়া—এমন কি সে যে-বস্তু অর্জন করে তাহারও সুখ হয় বিক্ষুব্ধ ও অনিশ্চিত, কারণ তাহার স্পষ্ট জ্ঞান নাই কেমন করিয়া অধিকার করিতে হয়, আর সুসামঞ্জস্য ও যথাযথ ভোগের প্রকৃত রহস্য কি তাহাও সে দেখিতে পায় না। জীবনের যত অজ্ঞানময় ও আবেগময় লিপ্সা সে-সবই হইতেছে প্রকৃতির রজঃ গুণের অন্তর্গত।

শেষত তমোগুণ হইতেছে জড়তা এবং অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত এবং ইহার ফলও হইতেছে জড়তা ও অজ্ঞান। তমোগুণের অন্ধকারই জ্ঞানকে আবৃত করে এবং সকল প্রমাদ ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতএব ইহা হইতেছে সত্ত্বের বিপরীত, কারণ সত্ত্বের সার হইতেছে জ্ঞান, প্রকাশ এবং তমোগুণের সার হইতেছে জ্ঞানের অভাব, অপ্রকাশ। কিন্তু তমঃ যেমন ভ্রান্তি, অমনোযোগ,

* রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ১৪।৭

ভুল বুঝা বা না বুঝা প্রভৃতি অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে, তেমনই কর্মেরও অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে; আলস্য, অবসাদ এবং নিদ্রা এই গুণের অন্তর্গত। অতএব ইহা রজোগুণের বিপরীত, কারণ রজোগুণের সার হইতেছে গতি, প্রেরণা ও প্রবৃত্তি কিন্তু তমোগুণের সারতত্ত্ব হইতেছে জড়তা, অপ্রবৃত্তি; তমঃ হইতেছে নিশ্চেতনার অপ্রবৃত্তি আবার নৈষ্কর্ম্যেরও অপ্রবৃত্তি, ইহা দুইভাবেই নেতিমূলক।

প্রকৃতির এই তিন গুণ সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে, ক্রিয়া করিতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কাহারও সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, সে সম্পূর্ণভাবে কোনও গুণ বর্জিত বা তিনটির কোনও একটি হইতে মুক্ত; অন্য গুণকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র একটি গুণের ছাঁচে কেহই গঠিত হয় নাই। যে পরিমাণেই হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে বাসনা ও কর্মের রাজসিক প্রেরণা এবং জ্যোতি ও সুখের সাত্ত্বিক অবদান, কতকটা সঙ্গতি, নিজের সহিত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুসকলের সহিত মনের কিয়ৎ-পরিমাণ সামঞ্জস্য। আবার সকলেরই আছে কিছু অসামর্থ্য ও অজ্ঞান ও নিশ্চেতনা। কিন্তু এই সকল গুণ তাহাদের শক্তির পরিমাণাত্মক ক্রিয়ায় অথবা তাহাদের উপাদানের যোগাযোগে কোনও মানুষের মধ্যেই অপরিবর্তনীয় নহে; কারণ তাহারা পরিবর্তনশীল, এবং নিরন্তর পবস্পরের সহিত সংঘাত, স্থান-বিনিময় এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত রহিয়াছে। কখনও এক গুণ অগ্রগামী হয়, কখনও আর এক গুণ বর্ধিত হয়, আধিপত্য করে এবং প্রত্যেকেই আমাদিগকে নিজ বিশিষ্ট ক্রিয়া ও পরিণামের অনুগত করে।* কেবল যখন কোন একটি গুণ সাধারণভাবে মোটের উপর প্রবল থাকে, তখনই কোন মানুষকে সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক বলা যাইতে পারে; কিন্তু এইটি হয় কেবল একটি মোটামুটি বর্ণনা, ইহা একান্ত বা সম্পূর্ণ বর্ণনা নহে। গুণ তিনটি হইতেছে এক ত্রিধা শক্তি, তাহাদের পাবস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহারা প্রাকৃত মানবের চরিত্র ও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিয়া দেয়, এবং সেই প্রকৃতি ও তাহার বিচিত্র ধারাসকলের ভিতর দিয়া তাহার কর্মও নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ত্রিধা শক্তি আবার একই সময়ে বন্ধনের ত্রিধা পাশ। গীতা বলিয়াছে, 'প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই তিন গুণ দেহস্থ অব্যয় অধিবাসীকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।'* এক অর্থে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, গুণের ক্রিয়া

* রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১৪।১০

* সত্ত্বং রজস্তমো ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১৪।৫

অনুসরণ করিয়া চলিলে এই বন্ধন অবশ্যম্ভাবী; কারণ তাহারা সকলেই তাহাদের সসীম স্বরূপ ও ক্রিয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তাহারা সীমাবন্ধনের সৃষ্টি করে। তমঃ হইতেছে উভয় দিকেই একটা অসামর্থ্য, অতএব স্পষ্টতই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রাজসিক বাসনা কর্মের প্রবর্তক বলিয়া অধিকতর প্রত্যক্ষ শক্তি, তথাপি আমরা বেশই দেখিতে পাই যে, বাসনা মানুষকে সীমার মধ্যে একান্তভাবে আসক্ত করিয়া রাখে বলিয়া ইহা সকল সময়েই একটা বন্ধন। কিন্তু জ্ঞানের ও সুখের শক্তি সত্ত্ব কেমন করিয়া বন্ধন হইয়া উঠে? এইরূপ হয় কারণ সত্ত্ব হইতেছে মানসিক প্রকৃতির তত্ত্ব, সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধকারী জ্ঞানের তত্ত্ব এবং এমন সুখের তত্ত্ব যাহা কোন বিশেষ বিষয়কে যথাযথ অনুসরণ করা বা লাভ করার উপর নির্ভর করে, অথবা মনের বিশেষ-বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে, মনের এমন আলোকের উপর নির্ভর করে যাহা অল্পাধিক স্পষ্ট সন্ধ্যার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার যে সুখ তাহা কেবল সাময়িক তীব্রতা বা পরিচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মসত্তার যে অসীম অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ তাহা ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের যে অনন্ত অব্যয় অধ্যাত্ম সত্তা তাহা প্রকৃতির মধ্যে জড়িত হইলেও কেমন করিয়া নিজেকে প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে এবং এই বন্ধন স্বীকার করিয়া লয়? সে যে পরম অধ্যাত্ম সত্তার অংশ তাহারই মত নিজের সক্রিয় বিকাশধারার স্বরচিত সীমাবন্ধন-সকল উপভোগ করিবার সময়েও কেনই বা সে নিজের আনন্ত্যে চিরমুক্ত থাকিতে পারে না? গীতা বলিতেছে যে, গুণসমূহের প্রতি এবং তাহাদের ক্রিয়ার পরিণামফলের প্রতি আমাদের আসক্তিই ইহার কারণ। সত্ত্ব সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্মে আসক্ত করে, তমঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভ্রান্তি ও নিষ্ক্রিয়তার প্রমাদে আসক্ত করে। * আবার "সত্ত্ব সুখে আসক্তি ও জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, রজঃ দেহীকে কর্মের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, তমঃ প্রমাদ ও আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে।" † অন্য কথায়, জীব গুণসকল ও তাহাদের ফলভোগে আসক্ত হইয়া নিজের চেতনাকে প্রকৃতিতে প্রাণ মন দেহের নিম্নতন ও বাহ্যিক ক্রিয়ায় নিবিষ্ট করে, এবং এই সকলের বাহ্যরূপের মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করে, এবং পশ্চাতে অধ্যাত্মসত্তায় তাহার নিজের যে মহত্তর চৈতন্য রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায়,

* সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ১৪।৯

† তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ১৪।৬

মুক্তিদায়ক পুরুষের স্বচ্ছন্দ শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে। অতএব ইহা স্পষ্ট যে, মুক্ত ও সিদ্ধ হইতে হইলে আমাদিগকে এই সকল জিনিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, গুণসমূহ হইতে সরিয়া গিয়া তাহাদের অতীত হইতে হইবে, এবং প্রকৃতির অতীত সেই মুক্ত অধ্যাত্ম চৈতন্যেরই শক্তিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু এইভাবে সকল কর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়াই মনে হইতে পারে, কারণ সকল প্রাকৃত কর্মই গুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, প্রকৃতি তাহার গুণসকলের ভিতর দিয়া কর্ম সম্পাদন করে। জীবাত্মা নিজে নিজে কর্ম করিতে পারে না, তাহাকে প্রকৃতি এবং তাহার গুণের দ্বারা কাজ করিতে হয়। অথচ গীতা যেমন গুণসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে বলিতেছে তেমনিই কর্মের প্রয়োজনের উপরেও জোর দিতেছে। গীতা যে ফলকামনা ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছে, এইখানেই তাহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ ফলকামনাই জীবের বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ এবং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীব কর্মের মধ্যেও মুক্ত থাকিতে পারে। তামসিক কর্ম হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ; অতএব এইরূপ কর্মের ফলে আসক্ত হইয়া কোনই লাভ নাই কারণ ইহাদের সহিত ঐ সকল অবাঞ্ছনীয় জিনিস জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু সুকৃত কর্মের ফল হইতেছে নির্মল ও সাত্ত্বিক,* তাহার আভ্যন্তরীণ পরিণাম জ্ঞান ও সুখ। তথাপি এই সকল সুখময় জিনিসেরও প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, কারণ প্রথমত, মনের মধ্যে তাহাদের রূপ হইতেছে সীমাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধকারী এবং দ্বিতীয়ত, সত্ত্ব সকল সময়েই রজঃ ও তমঃ গুণের সহিত জড়িত এবং তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকায় যে কোন মুহূর্তে তাহাদের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে, সেইজন্য ঐ সব সুখময় ফলের স্থায়িত্ব সর্বদাই অনিশ্চিত। কিন্তু যদিও কোন ব্যক্তি ফলে আসক্তি হইতে মুক্ত হয়, কর্মটিতেই তাহার আসক্তি থাকিতে পারে; শুধু কাজটির জন্য কাজ করাতেই তাহার আসক্তি থাকিতে পারে এবং ইহাই রাজসিক বন্ধনের মূল স্বরূপ; অথবা অবশভাবে প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইয়া কাজ করা হয়, তখন তাহা হয় তামসিক; অথবা যে কাজটি করা হইতেছে তাহার ন্যায্যতার আকর্ষণেই কাজটি করা

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ১৪।৭-৮

* কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৪।১৬

হয়, এবং সেইটি হয় সাত্ত্বিক বন্ধনের কারণ, সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর ইহার প্রভাব খুব প্রবল। আর এখানে সুস্পষ্ট পন্থা হইতেছে গীতার আর একটি উপদেশ, কর্মটিকেই কর্মেশ্বরের নিকট অর্পণ করা এবং কেবল তাঁহার ইচ্ছার নিষ্কাম এবং সমতাপূর্ণ যন্ত্র হওয়া। প্রকৃতির গুণ ভিন্ন আর কিছুকেই আমাদের কর্মের কর্তা ও কারণ বলিয়া না দেখা এবং গুণসমূহের ঊর্ধ্বে যে পরম সত্তা রহিয়াছে তদভিমুখী হওয়া, ইহাই নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার পন্থা। * কেবল এই ভাবেই আমরা ভগবানের নিজস্ব গতি ও স্থিতি লাভ করিতে পারি, মদ্‌ভাব, এবং এই ভাবে জন্ম ও মরণ এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত জীব পরিশেষে অমৃতত্ব এবং যাহা কিছু শাশ্বত সবই উপভোগ করিবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তির লক্ষণ কি, তাঁহার আচরণ কিরূপ, কেমন করিয়াই বা তিনি কর্মের মধ্যেও ত্রিগুণাতীত হইয়া থাকেন? * কৃষ্ণ বলিলেন, লক্ষণ হইতেছে সমতা, সে সম্বন্ধে আমি বার বার বলিয়াছি; লক্ষণ এই যে, তিনি ভিতরে সুখ দুঃখে সমান, সুবর্ণ মৃত্তিকা ও প্রস্তরে সমভাবাপন্ন, তাঁহার নিকট প্রিয়-অপ্রিয়, স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান, শত্রুপক্ষ-মিত্রপক্ষ সব সমান। তিনি জ্ঞানময়, অবিচল, অপরিবর্তনীয় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থৈর্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন কর্মের প্রবর্তন করেন না, পরন্তু প্রকৃতির গুণসমূহকেই সকল কর্ম করিতে দেন। তাঁহার বাহ্যিক মানস সত্তায় এবং শারীরিক গতিবিধিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং তাহাদের পরিণামস্বরূপ জ্ঞান, কর্মে প্রবৃত্তি অথবা নিষ্ক্রিয়তা এবং মন ও প্রাণের মোহ উত্থিত হইতে পারে, কিন্তু কখন কোনটা উঠিল বা যাইল তাহাতে তিনি উল্লসিত হন না, অন্যপক্ষে আবার এই সকল জিনিসের ক্রিয়ায় বা বিরতিতে তাঁহার দ্বেষও নাই, কুণ্ঠাও নাই। † তিনি

* নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৪।১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪।২০

* কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ১৪।২১

† প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ১৪।২২-২৫

গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অন্য এক তত্ত্বের সচেতন জ্যোতির মধ্যে সমাসীন; যে-ব্যক্তি এক ঊর্ধ্বতর আকাশের মধ্যে উঠিয়াছে তাহার নিকট যেমন মেঘমুক্ত সূর্য তেমনই সেই মহত্তর চৈতন্য এই সকল শক্তির ঊর্ধ্বে এবং ইহাদের গতিসকলের দ্বারা বিচলিত না হইয়া তাঁহার মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকে। সেই ঊর্ধ্বদেশ হইতে তিনি দেখেন যে, গুণসমূহই কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং তাহাদের ঝঞ্ঝা ও নিস্তব্ধতা প্রকৃতিরই প্রক্রিয়া, তিনি নিজে সে-সব নহেন, তাঁহার আত্ম-পুরুষ ঊর্ধ্বে অবিচল এবং তাঁহাব অধ্যাত্মসত্তা এই সকল সদা-চঞ্চল জিনিসের অস্থির পরিবর্তনে যোগদান করে না। ইহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির নৈর্ব্যক্তিকতা; কারণ সেই উচ্চতর তত্ত্ব, সেই মহত্তর উদার ঊর্ধ্বস্থিত চৈতন্য, কূটস্থ—তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম।

তথাপি এখানে স্পষ্টতই দ্বৈত স্থিতি রহিয়াছে, দুইটি বিপরীত ভাগে সত্তাকে ছেদ করা হইয়াছে, অক্ষর ও ক্ষর—অক্ষর পুরুষে বা ব্রহ্মে অবস্থিত মুক্ত আত্মা অ-মুক্ত ক্ষর প্রকৃতির ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি কোন মহত্তর স্থিতি নাই, পূর্ণতর পূর্ণতার তত্ত্ব নাই? অথবা এই ভেদাত্মক স্থিতি অপেক্ষা কোন উচ্চতর চৈতন্য কি শারীর ক্ষেত্রে সম্ভব নহে? যোগের লক্ষ্য কি ক্ষর প্রকৃতিকে বর্জন করা, প্রাকৃত দেহ-সম্ভূত গুণ-সকলকে বর্জন কবা এবং ব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিকতা ও শাশ্বত শান্তির মধ্যে বিলীন হওয়া? ঐরূপ লয় বা ব্যষ্টিগত পুরুষের বিলোপ সাধনই কি মহত্তম মুক্তি? মনে হয ইহা ভিন্ন আরও কিছু রহিয়াছে; কারণ গীতা পরিশেষে বলিতেছে—সকল সময় এই সুর তুলিয়াই সমাপ্ত করিতেছে—"যিনি অব্যভিচারী ভক্তি-যোগের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমাকে লাভ করিতে চান, তিনিও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন এবং তিনিও ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হন।" * এই যে "আমি" ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই নীরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভিত্তি এবং অমৃতত্ব ও অক্ষয় অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি এবং শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখের ভিত্তি। অতএব এমন এক পদ রহিয়াছে, অবিচল সাক্ষীরূপে গুণ-সমূহের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতেছে যে-অক্ষর পুরুষ, তাহারও শান্তি অপেক্ষা সে-পদ মহত্তর। ব্রহ্মের অক্ষরতারও ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কর্মের রাজসিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শাশ্বত ধর্ম রহিয়াছে, এমন এক পূর্ণতম আনন্দ রহিয়াছে যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিক সুখেরও ঊর্ধ্বে এবং এ-সব জিনিস

* মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৬-২৭

পাওয়া যায় ও অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির মধ্যে বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তির দ্বারা অর্জন করা যায়, ইহার পদ হইবে সেই দিব্য আনন্দ যাহা নিরতিশয় প্রেমের মিলনে এবং পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিতে অনুভূত হয যাহাতে ভক্তির পরম পরিণতি, নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বম্ আনন্দ-তত্ত্বম্। আর সেই আনন্দেব মধ্যে উঠা, সেই অনির্বাচনীয় ঐক্যের মধ্যে উঠা—ইহাই অধ্যাত্মসিদ্ধির পরিপূর্ণতা এবং শাশ্বত অমৃতত্বপ্রদায়ী ধর্মের চরম সার্থকতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষত্রয়

গীতার শিক্ষা প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার সকল ধারায় এবং সকল সাবলীল গতি-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাবের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবৈষম্যসকলের সাম্যতা সাধন ও সামঞ্জস্য করিয়া এবং যত্নসহকারে অধ্যাত্ম অনুভূতিসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়া সেই কেন্দ্রীয় ভাবে উপনীত হইতেছে; এই সকল অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোক অনেক সময়েই পরস্পরবিরোধী, অন্তত স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে এবং অনন্যভাবে তাহাদের বিকিরণের বাহ্যিক রেখা ধরিয়া চলিলে তাহারা বিভিন্ন দিকে লইয়া যায়, কিন্তু এখানে সে-সকলকে সংগ্রহ করিয়া এক সমন্বয়-সাধক দৃষ্টিতে এক কেন্দ্রানুগত করা হইয়াছে। এই যে কেন্দ্রীয়ভাব, ইহা হইতেছে ত্রিধা চৈতন্যের পরিকল্পনা, এই চৈতন্য তিন অথচ এক, ইহা সৃষ্টির সকল স্তর ব্যাপিয়া বর্তমান রহিয়াছে।

এই জগতের মধ্যে এমন এক অধ্যাত্মসত্তা কাজ করিতেছে যাহা অগণন বাহ্যরূপের মধ্যেও এক। ইহাই জন্ম ও কর্মের বিকাশকর্তা, জীবনের গতিদায়ক শক্তি, প্রকৃতির অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্যে অন্তর্যামী ও সহযোগী চৈতন্য, দেশ ও কালের মধ্যে এই যে-সব বিক্ষোভ উহাই এই সবের উপাদানভূত সদ্বস্তু; উহা নিজেই কাল, দেশ ও ঘটনা। উহাই জগতসমূহের মধ্যে এই সব বহুসংখ্যক আত্মা; উহাই সমুদয় দেব, মানব, জীব, বস্তু, শক্তি, গুণ, পরিমাণ, বিভূতি ও অধিষ্ঠাতা। উহাই প্রকৃতি, ঐ অধ্যাত্মসত্তার শক্তি; উহাই বিষয়-সমূহ, নাম, ভাব ও রূপের মধ্যে উহারই বাহ্যপ্রকাশ; উহাই সর্বভূত, সকলেই এই অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভূ অধ্যাত্ম বস্তুর, এই এক ও শাশ্বতের নানা অংশ, নানা জন্ম, নানা সম্ভূতি। কিন্তু আমরা চক্ষুর সম্মুখে যাহাকে স্পষ্টত ক্রিয়মাণ দেখিতেছি তাহা এই শাশ্বত এবং তাঁহার চৈতন্যময়ী শক্তি নহে; ইহা হইতেছে প্রকৃতি, সে তাহার ক্রিয়াবলীর অন্ধ আবেগে তাহার কর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান। তাহার কাজ যন্ত্রবৎচালিত কতকগুলি মূল গুণ বা শক্তিতত্ত্বের বিশৃংখল, অজ্ঞান, সীমাবদ্ধ ক্রিয়া এবং তাহাদের স্থির-নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল পরিণাম-পরম্পরা। আর তাহার ক্রিয়ার বশে যে-কোন আত্মা সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেও দৃশ্যত অজ্ঞান, দুঃখভোগী, এবং এই নিম্নতন প্রকৃতির অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ক্রিয়ায় আবদ্ধ। তথাপি এই প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্তা তাহা আপাতত যেরূপ দেখায় বস্তুত

সেরূপ নহে; কারণ ইহাই ক্ষর পুরুষ, বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও প্রকটনের যে ক্ষরভাব তাহারই অন্তরাত্মা—ইহার সত্য স্বরূপ লুক্কায়িত, বাহ্যরূপই ব্যক্ত, মূলত ইহা অক্ষর ও পরমপুরুষের সহিত অভিন্ন। ইহার ব্যক্ত বাহ্যরূপ-সমূহের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমাদিগকে সেইখানেই যাইতে হইবে; এই সকল আবরণের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম সত্তা রহিয়াছে আমাদিগকে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে এবং সবকেই এক বলিয়া দেখিতে হইবে, 'বাসুদেবঃ ইতি সর্ব্বম্,' ব্যষ্টিগত, বিশ্বগত, বিশ্বাতীত সবই সেই এক বাসুদেব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিম্নতন প্রকৃতিতে সমাহৃত হইয়া বাস করি ততক্ষণ আভ্যন্তরীণ সত্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ইহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। কারণ এই নিম্নতর ক্রিয়ায় প্রকৃতি হইতেছে এক অজ্ঞান, এক মায়া; সে নিজের অঞ্চলের অন্তরালে ভগবানকে রাখিয়াছে, নিজের নিকটে এবং নিজের জীবসকলের নিকটে তাঁহাকে গোপন করিতেছে। ভগবান নিজেরই সর্বসৃজনকারিণী যোগমায়ার দ্বারা লুক্কায়িত হইয়াছেন; নিত্য অনিত্যের রূপে প্রকট হইয়াছে, পুরুষ নিজেরই অভিব্যক্তিসমূহের দ্বারা সমাহিত ও সমাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষরপুরুষকে যদি একক স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, ক্ষর বিশ্বকে অবিভাজ্য অক্ষর এবং বিশ্বাতীত হইতে পৃথকভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না, আমাদের সত্তার পূর্ণতা হয় না, অতএব মুক্তিও হয় না।

কিন্তু অন্য আর একটি অধ্যাত্মসত্তা আমরা অবগত হই, তাহা এই সবের কোনটিই নহে, তাহা হইতেছে আত্মা, শুধু আত্মাই আর কিছুই নহে। এই অধ্যাত্মসত্তা শাশ্বত, চিরকাল একই প্রকার, তাহা কখনই অভিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয় না, তাহা এক, অবিচল, অবিভক্ত স্বয়ম্ভূসত্তা, তাহা প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিসকলের বিভাগের দ্বারা যেন বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মানও হয় না, তাহা প্রকৃতির কর্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গতির মধ্যে গতিহীন। ইহাই সর্বভূতের আত্মা অথচ অবিচল, উদাসীন, স্পর্শাতীত, যেন এই যে-সব বস্তু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে ইহারা অনাত্মা, ইহারা যেন তাহার নিজেরই ফল নহে, শক্তি নহে, পরিণাম নহে, পরন্তু এক অবিচল অসহযোগী দ্রষ্টার সম্মুখে যেন এক কর্মের অভিনয় প্রকটিত হইতেছে। কারণ যে-মন এই অভিনয়মঞ্চে নামিয়া ইহাতে যোগ দিতেছে সে আত্মা নহে, আত্মা উদাসীনভাবে এই অভিনয়কে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছে। এই অধ্যাত্মসত্তা কালের অতীত, যদিও তাহাকে কালের মধ্যেই দেখিতে পাই; তাহা দেশে পরিব্যাপ্ত নহে, যদিও আমরা দেখি তাহা যেন দেশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাকে আমরা সেই পরিমাণে জানিতে পারি যে-পরিমাণে আমরা বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হই, অথবা ক্রিয়া ও গতির পশ্চাতে যে

এক শাশ্বত ও অবিচল সত্তা রহিয়াছে তাহার সন্ধান করি, অথবা কাল এবং তাহার সৃষ্টি হইতে সরিয়া যাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই তাহাতে যাই, প্রকট প্রপঞ্চ হইতে সরিয়া মূল সত্তায় যাই, ব্যক্তি হইতে নির্ব্যক্তিকতায়, বিবর্ত হইতে অপরিবর্তনীয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় যাই। এইটিই অক্ষর পুরুষ, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চলমানের মধ্যে অবিচল, নশ্বর বস্তুসকলের মধ্যে অবিনশ্বর। অথবা যেহেতু ব্যাপ্তি কেবল প্রতিভাসমাত্র সেহেতু বলিতে পারা যায় যে, অক্ষর অবিচল ও অবিনশ্বরের মধ্যেই সকল ক্ষর ও নশ্বর বস্তুর গতিক্রিয়া চলিতেছে।

যে ক্ষর সত্তা সকল প্রাকৃত বস্তু বলিয়া এবং সর্বভূত বলিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছে তাহা ব্যাপকভাবে অবিচল ও শাশ্বত অক্ষরের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে, কর্ম করিতেছে। আত্মার এই চলিষ্ণু শক্তি আত্মার সেই মূলগত অবিচলতার মধ্যেই ক্রিয়া করিতেছে, যেমন জড় প্রকৃতির দ্বিতীয় তত্ত্ব বায়ু তাহার একীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের স্পর্শগুণাত্মক শক্তি লইয়া, তৈজস (দীপ্তিময়, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) ও অন্যান্য ভৌতিক ক্রিয়ার সৃজনাত্মক শক্তিকে বিধৃত করিয়া আকাশের সূক্ষ্ম বিরাট নিশ্চলতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচরণ করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষ হইতেছে বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মা, 'যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'—ইহা আমাদের সত্তার মধ্যে প্রকৃতির উচ্চতম আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব মুক্তিদায়ক বুদ্ধিরও অতীত, এই বুদ্ধির ভিতর দিয়াই মানুষ তাহার অস্থির চিরচঞ্চল মানসিক সত্তা হইতে তাহার স্থির শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশেষে জন্মের দৃঢ়ানুবন্ধতা ও কর্মের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই আত্মাই তাহার উচ্চতম স্থিতিতে (পরং ধাম) সেই অব্যক্ত যাহা আদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত তত্ত্ব হইতেও ঊর্ধ্বে, এবং যদি জীব এই অক্ষরের মধ্যে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে বিশ্ব ও প্রকৃতির বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়ে এবং সে জন্ম অতিক্রম করিয়া এক অপরিণামী শাশ্বত সত্তার মধ্যে চলিয়া যায়। তাহা হইলে জগতে আমরা এই দুইটি পুরুষকেই দেখিতে পাই; একটি ইহার ক্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া প্রকট হইতেছে, অপরটি রহিয়াছে পশ্চাতে, চিরনীরবতায় অচঞ্চল, তাহা হইতেই কর্ম উদ্ভূত হইতেছে, তাহার মধ্যেই সকল কর্ম কালাতীত সত্তায় বিরতি ও নির্বাণ লাভ করিতেছে। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'

যে সমস্যাটি আমাদের বুদ্ধি সমাধান করিতে পারে না সেটি হইতেছে এই যে, মনে হয় যেন এই দুইটি পুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কোন প্রকৃত সূত্র নাই অথবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছেদ সাধন না করিয়া একটি হইতে অপরটিতে যাইবার কোন পথ নাই। ক্ষর পুরুষ কর্ম করিতেছে, অন্তত কর্মের প্রেরণা দিতেছে, অক্ষরের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে; অক্ষর পুরুষ

সরিয়া রহিয়াছে, আত্ম-সমাহিত, নিজের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষর হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যদি আমরা সাংখ্যদের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির আদি ও সনাতন দ্বিত্ব মানিয়া লই (যদিও চিরন্তন বহুপুরুষ স্বীকার না করি) তাহা হইলেই সম্ভবত ভাল হয়। জিনিসটি অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত ও সহজবোধ্য হয়। তখন আমাদের অক্ষরের অনুভূতি হইবে প্রত্যেক পুরুষের নিজেরই মধ্যে প্রত্যাহার, প্রকৃতি হইতে এবং সেই জন্যই জীবনের ব্যবহারে অন্যান্য জীবের সহিত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসা; কারণ প্রত্যেক পুরুষই নিজের মূলসত্তায় স্বয়ংসিদ্ধ, অনন্ত ও পূর্ণ। কিন্তু সে যাহাই হউক, শেষ অনুভূতি হইতেছে সকল সত্তার একত্বের অনুভূতি, তাহা কেবল অনুভূতির সাম্য নহে, একই প্রাকৃত শক্তির নিকট সকলের সমান বশ্যতা নহে, কিন্তু অধ্যাত্মসত্তার একত্ব, এই সব অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে, আপেক্ষিক জীবনের এই সকল আপাতদৃশ্য ভেদবিভাগের পশ্চাতে সচেতন সত্তার বিরাট একাত্মতা। সেই উচ্চতম অনুভূতির উপরেই গীতার প্রতিষ্ঠা। বস্তুত মনে হয় বটে যে, গীতা বহু পুরুষের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা তাহাদের শাশ্বত ঐক্যের অনুগত এবং তাঁহার দ্বারা বিধৃত, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ চিরন্তন, এবং অন্তহীন যুগযুগান্তের ভিতর দিয়া প্রকটন চলিয়াছে; আর গীতা এমন কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলে নাই বা কোন বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিতও করে নাই যে, জীবাত্মা অনন্ত সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইবে, লয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও গীতা জোর দিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব বহু জীবের এক আত্মা, অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এই দুই পুরুষই হইতেছে একই শাশ্বত ও বিশ্বসত্তার দ্বৈত স্থিতি। এইটি হইতেছে একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত; উপনিষদের যে উদারতম দৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তটিই হইতেছে তাহার সমগ্র ভিত্তি; যথা, ঈশা উপনিষদ বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম অচল ও সচল দুইই, 'তদেজতি তন্নৈজতি', এক এবং বহু, আত্মা এবং সর্বভূত, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সনাতন অজাত স্থিতি এবং সর্বভূতের সম্ভূতি, এবং ইহাদের মধ্যে একটিতে বাস করিয়া তাহার নিত্য সঙ্গী অপরটিকে বাদ দেওয়াকে ঈশা অন্ধং তমঃ বলিয়া, একদেশদর্শী জ্ঞানের অন্ধকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। গীতার ন্যায় উপনিষদও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে যে, অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হইলে এবং শাশ্বতের মধ্যে বাস করিতে হইলে মানুষের পক্ষে উভয় তত্ত্বকেই জানা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক, গীতা যেমন বলিয়াছে, 'সমগ্রম্ মাম্'। গীতার শিক্ষা এবং উপনিষদ্ সমূহের এই দিকের শিক্ষা এ পর্যন্ত একই; কারণ তাহারা সম্বস্তুর দুইটি দিকই অবলোকন করে, স্বীকার করে অথচ সিদ্ধান্তরূপে এবং বিশ্বের পরম সত্য-রূপে একত্বে উপনীত হয়।

কিন্তু এই যে মহত্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি, আমাদের ঊর্ধ্বতম দৃষ্টির নিকট ইহা যতই সত্য হউক, যতই হৃদয়গ্রাহী হউক, ইহাকে এখনও একটি অতি বাস্তব ও গুরুতর সমস্যা খণ্ডন করিতে হইবে, ব্যবহারের দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও যে বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইবে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই বিরোধ অধ্যাত্ম উপলব্ধির উচ্চতম শিখর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যে সচল আভ্যন্তর ও বাহ্য উপলব্ধি, শাশ্বত পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা আছে, 'ন ইদম্ যদ্ উপাসতে' (কেন উপনিষদ); অথচ সেই সঙ্গেই এই সবই সেই শাশ্বত পুরুষ, এই সবই আত্মার চিরন্তন আত্মদর্শন, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)। শাশ্বত পুরুষই সর্বভূত হইয়াছেন, 'আত্মা অভূৎ সর্ব্বভূতানি' (ঈশা উপনিষদ)। শ্বেতাশ্বতর যেমন বলিয়াছে, "তুমিই ঐ কুমার, তুমিই ঐ কুমারী, আবার তুমিই ঐ বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে চলিতেছ," * ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই কৃষ্ণ ও অর্জুন, ব্যাস ও উশনা, তিনিই সিংহ, তিনিই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিনিই সকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, সকল গুণ ও অন্তরাত্মা। কিন্তু এই দুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয়? তাহারা যে প্রকৃতিতে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, উপলব্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন আমরা বিবর্তনের চঞ্চলতায় বাস করি, তখন আমরা কালাতীত স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারিলেও তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি কিনা সন্দেহ। আবার যখন আমরা কালাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন কাল ও দেশ ও ঘটনা আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং অনন্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, প্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা তাহা ভ্রান্তি, যতক্ষণ আমরা ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ইহা সত্য কিন্তু মূলত সত্য নহে এবং সেই জন্যই যখন আমরা আত্মার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হই, উহা আমাদের নিষ্কলঙ্ক মূল সত্তা হইতে খসিয়া পড়ে। এই ভাবেই সাধারণত এই সমস্যার সহজ সমাধান করা হয়। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'।

গীতা এই ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, ইহার নিজের মধ্যেই অত্যধিক ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া ইহা ঐ ভ্রান্তির কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে

* ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩

পারে না—কারণ ইহা শুধুই বলে যে, এসব হইতেছে এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মায়া, তাহা হইলে আমরাও ত ঠিক ঐ ভাবেই বলিতে পারি যে, ইহা এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য যুগ্ম-তত্ত্ব, আত্মা নিজেকে আত্মার নিকট হইতে লুকাইতেছে। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্তু গীতার মতে উহা হইতেছে কেবল এক ভ্রান্তি-উৎপাদক আংশিক চেতনা, তাহা পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, *চঞ্চলা* প্রকৃতির ব্যাপারসকলের মধ্যেই বাস করে, যে-পুরুষের সে সক্রিয় শক্তি (মে প্রকৃতিঃ) তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি, জগৎ লুপ্ত হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্তন হইয়া যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা দেখি না যে, এ সবের কোন অস্তিত্বই নাই পরন্তু দেখি যে, সবই আছে, কিন্তু যে অর্থে আছে তাহা বর্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত সত্তা, ভাগবত প্রকৃতি, সবই বাসুদেব। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শাশ্বতের শক্তি. পরব্রহ্মের প্রকটন, এমন কি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতর প্রকৃতি ইহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। আর আমরা একান্ত ভাবে এই প্রভেদের আশ্রয় লইতে পারি না যে, এখানে দুইটি তত্ত্ব রহিয়াছে, একটি নিম্নতর, সক্রিয় ও অনিত্য আর একটি কর্মের অতীত ঊর্ধ্বতন শান্ত স্তব্ধ শাশ্বত তত্ত্ব, এবং আমাদের মুক্তি হইতেছে এই আংশিক তত্ত্ব হইতে উঠিয়া সেই মহৎ তত্ত্বে যাওয়া, কর্ম হইতে নীরবতায় যাওয়া। কারণ গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে যে, যতদিন আমাদের জীবন ততদিন আমরা আত্মা ও তাহার নীরবতায় সচেতন হইয়া থাকিতে পারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্তব্য। এবং গীতা স্বয়ং ভগবানেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্মগ্রহণের বাধ্যতায় বদ্ধ নহেন, পরন্তু মুক্ত, বিশ্ব-প্রপঞ্চের অতীত, অথচ তিনি চিরকাল কর্মে রত রহিয়াছেন, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। অতএব সমগ্র ভাগবত প্রকৃতির সাধর্ম্য লাভ করিয়াই এই দ্বৈত উপলব্ধির সম্পূর্ণ একত্ব সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু এই একত্বের মূল সূত্র কি?

পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতার যে পরম দৃষ্টি তাহারই মধ্যে গীতা এই একত্বের সূত্র পাইয়াছে; কারণ গীতার মতে সেইটিই হইতেছে পূর্ণ ও উচ্চতম উপলব্ধির আদর্শ স্বরূপ, ইহা হইতেছে কৃৎস্নবিদ্‌গণের, সমগ্র জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণের, জ্ঞান। অক্ষর হইতেছেন "পর", বিশ্ব প্রকৃতিতে যে-সব বস্তু রহিয়াছে, যে কর্ম চলিতেছে তাহাদের সম্পর্কে অক্ষর পুরুষ হইতেছেন পরম সত্তা। ইহাই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা এবং পুরুষোত্তমই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা। প্রকৃতিতে তাঁহার নিজের শক্তি দ্বারা অস্পৃষ্ট, তাঁহার নিজেরই বিবর্ত্তনের প্রেরণা দ্বারা অক্ষুব্ধ, তাঁহার নিজেরই গুণসকলের ক্রিয়া দ্বারা অবিচলিত তাঁহার যে স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, সেই সত্তার মুক্ত অবস্থাতেই তিনি

অক্ষর। কিন্তু ইহা সমগ্র জ্ঞানের একটি প্রধান দিক হইলেও, কেবল একটি দিক মাত্র। পুরুষোত্তম আবার সেই সঙ্গেই অক্ষর পুরুষের অতীত, কারণ তিনি এই অক্ষরতা অপেক্ষা বৃহত্তর, তিনি তাঁহার সত্তার শাশ্বত পদের (পরমধামের) মধ্যেও সীমাবন্ধ নহেন। তথাপি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শাশ্বত ও অক্ষর রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা সেই পরম পদে পৌঁছিতে পারি যেখান হইতে আর পুনর্জন্মের মধ্যে আসিতে হয় না, এবং এইরূপ মুক্তিই প্রাচীন কালের মনীষীগণের সাধনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন শুধু অক্ষরের ভিতর দিয়া সন্ধান করা যায়, তখন এই মুক্তির প্রয়াস হয় অনির্দেশ্যের সন্ধান, ইহা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে কষ্টসাধ্য কারণ আমরা এখানে জড়ের মধ্যে দেহধারণ করিয়া রহিয়াছি, 'গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'। আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ সূক্ষ্ম আত্মা, অক্ষর, বৈরাগ্যের প্রেরণায় যে অনির্দেশ্যের মধ্যে উঠিয়া যায় তাহা এক 'পরো অব্যক্তঃ', সেই পরম অব্যক্ত অক্ষরও পুরুষোত্তম। সেইজন্যই গীতা বলিয়াছে, যাহারা অনির্দেশ্যের উপাসনা করে তাহারাও আমাকে, শাশ্বত ভগবানকে, লাভ করে। কিন্তু তিনি আবার পরম অব্যক্ত অক্ষর হইতেও মহত্তর, সকল পরম অসৎ হইতে, নেতি নেতি হইতে মহত্তর কারণ তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়াও জানিতে হইবে, তিনি তাঁহার নিজের সত্তায় এই সমগ্র বিশ্বকে বিস্তৃত করিয়াছেন। তিনি এক পরম রহস্যময় সর্ব, এখানকার সকল জিনিসের এক অনির্বচনীয় পরম সৎ। তিনি ক্ষরের মধ্যে ঈশ্বর, তিনি শুধু ঊর্ধ্বেই পুরুষোত্তম নহেন, পরন্তু এখানে সর্বভূতের হৃদ্দেশেই ঈশ্বর। আর সেখানে তাঁহার উচ্চতম শাশ্বত "পরঃ অব্যক্ত" পদেও তিনি পরমেশ্বর, তিনি উদাসীন ও সম্বন্ধবর্জিত অনির্দেশ্য নহেন, পরন্তু তিনি আত্মা এবং বিশ্বের মূল, পিতা ও মাতা, আদি প্রতিষ্ঠা ও শাশ্বত আশ্রয়, তিনি সকল লোকের ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্'। তাঁহাকে জানিতে হইবে যুগপৎ ক্ষরে ও অক্ষরে, তাঁহাকে জানিতে হইবে অজাত পুরুষ হইয়াও তিনি সকলের জন্মে নিজেকে আংশিকভাবে প্রকট করিতেছেন এবং নিত্য অবতাররূপে নিজেও অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার সমগ্রতায় জানিতে হইবে, 'সমগ্রম্ মাম্'—কেবল তাহা হইলেই জীব নীচের প্রকৃতির বাহ্যরূপসকল হইতে সহজেই মুক্ত হইতে পারে এবং এক বিরাট ত্বরিত বিকাশ ও প্রশস্ত অপরিমেয় ঊর্ধ্বায়নের দ্বারা ভাগবত সত্তা ও পরাপ্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ ক্ষরের সত্যও পুরুষোত্তমের সত্য। পুরুষোত্তম সর্বভূতের হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহার অগণন বিভূতির মধ্যে প্রকট হইতেছেন; পুরুষোত্তম হইতেছেন কালের মধ্যে বিশ্বপুরুষ, এবং তিনিই মুক্ত মানবাত্মাকে দিব্যকর্মের জন্য আদেশ দিতেছেন। তিনি অক্ষর ও ক্ষর

দুইই. অথচ তিনি অন্য, কারণ তিনি এই দুই বিপরীত সত্তা অপেক্ষা অধিকতর এবং মহত্তর,

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫। ১৭

"কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক হইতেছেন উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত, তিনি অক্ষয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ভরণ করিতেছেন।" গীতা আমাদের জীবনের এই দুইটি আপাতবিরোধী দিকের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে এই শ্লোকটিই তাহার মূল সূত্র।

প্রথম হইতেই পুরুষোত্তমতত্ত্বের সূচনা করা হইয়াছে, আভাস দেওয়া হইয়াছে, উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম হইতেই এইটিকে পরোক্ষভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেবল এখন এই পঞ্চদশ অধ্যায়েই ইহাকে স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করা হইতেছে এবং একটি বিশেষ নাম দিয়া প্রভেদটিকে পরিস্ফুট করা হইতেছে। পরক্ষণেই কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিকাশ করা হইয়াছে তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে হইলে, মানুষকে প্রথমে পূর্ণ অধ্যাত্ম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। এইভাবে নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমরা নির্ব্যক্তিকতায় সুদৃঢ় হই, কর্মের ঊর্ধ্বে অবিচল প্রতিষ্ঠা লাভ করি, গুণের সকল সীমা, সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হই—এবং এইটিই হইতেছে পুরুষোত্তমের প্রকট প্রকৃতির একটি দিক, আত্মার শাশ্বততা ও একত্বরূপে. অক্ষররূপে তাহার আবির্ভাব। কিন্তু আবার পুরুষোত্তমের এক অনির্বচনীয় শাশ্বত বহুত্বও রহিয়াছে, জীবের প্রকটনের আদি রহস্যের পশ্চাতে এইটিই হইতেছে উচ্চতম সত্যতম সত্য। অনন্তের আছে এক শাশ্বত শক্তি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির এক আদিহীন অন্তহীন ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ায় দৃশ্যত নির্ব্যক্তিক শক্তিসকলের খেলা হইতে জীব-ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য রহস্য আবির্ভূত হইতেছে, 'প্রকৃতিঃ জীবভূতা'। ইহা সম্ভব এই জন্য যে, ব্যক্তিত্বও ভগবানের একটি স্বরূপ এবং অনন্তের মধ্যেই ইহার উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য ও অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু অনন্তের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা নীচের প্রকৃতির অহংভাবাপন্ন ভেদাত্মক আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিত্ব নহে, তাহা হইতেছে মহিমান্বিত, বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত, অমৃত ও দিব্য। পরম পুরুষের এই রহস্যই হইতেছে প্রেম ও ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ, যে শাশ্বত জীবাত্মা রহিয়াছে সে যে শাশ্বত ভগবানের, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের একটি অংশ তাঁহার নিকটে নিজেকে, নিজের যাহা কিছু সবকেই অর্পণ করিতেছে। এই যে আত্মসমর্পণ, আমাদের ব্যক্তিস্বরূপের ও ইহার কর্মসকলের যিনি অনির্বচনীয় অধীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আমাদের

ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নয়ন ইহাতেই জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে, ইহাতেই কর্মযজ্ঞের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ সার্থকতা—অতএব এই সকল জিনিসের ভিতর দিয়াই মানবাত্মা ভাগবত প্রকৃতির এই যে অন্য শক্তিময় গতিময় রহস্য, এই যে অন্য মহান ও নিগূঢ় দিক, ইহার মধ্যে নিজেকে পূর্ণতমভাবে সিদ্ধ করিয়া তোলে এবং সেই সিদ্ধি দ্বারা অমৃতত্ব, ঐকান্তিক সুখ এবং শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই যে যুগ্ম প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় আত্মার সমতা এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, এই দুইটি যেন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের, ব্রহ্মভূয়ায়, দুইটি স্বতন্ত্র পন্থা—একটি শান্তিময় সন্ন্যাসের পথ, অপরটি দিব্য প্রেম ও দিব্য কর্মের পথ—এইভাবে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়া গীতা এখন পুরুষোত্তমের মধ্যেই ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিকের সমন্বয় করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইতেছে। কারণ গীতার লক্ষ্য হইতেছে একদেশদর্শিতা ও ভেদাত্মক অত্যুক্তি বর্জন করিয়া জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অনুভূতির দুইটি দিককে একত্র মিলিত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভের একক ও পূর্ণতম পন্থায় পরিণত করা।

প্রথমেই গীতা বেদান্তের অনুসরণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বিশ্ব-প্রপঞ্চের বর্ণনা দিয়াছে।* এই বিশ্ববৃক্ষের দেশে বা কালে আদি নাই অন্ত নাই, কারণ ইহা শাশ্বত এবং অবিনাশী, অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। দেহ-ধারী মানবের এই জড়জগতে ইহার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হয় না, আর এখানে ইহার কোন স্থায়ী ভিত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা হইতেছে এক অনন্ত গতিপ্রবাহ এবং ইহার ভিত্তি রহিয়াছে ঊর্ধ্বে অনন্তের পরম পদের মধ্যে। ইহার মূল তত্ত্ব হইতেছে পুরাণী চিরন্তনী কর্মপ্রবৃত্তি, তাহা চিরকাল সকল সৃষ্টির আদি পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহার আরম্ভ নাই শেষ নাই, আদ্যম্ পুরুষম্ যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। অতএব ইহার আদি মূল রহিয়াছে কালের ঊর্ধ্বে শাশ্বতের মধ্যে, কিন্তু ইহার শাখাসকল নীচের দিকে বিস্তৃত এবং ইহার অন্যান্য শিকড়গুলিকে ইহা এখানে নীচের দিকে মনুষ্যলোকে প্রসারিত ও অনুপ্রবিষ্ট করিতেছে, এইসব শিকড় হইতেছে সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য

*ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ১৫।১-৩

আসক্তি ও কামনা এবং তাহাদের ফলস্বরূপ আরও অধিক কামনা এবং অন্তহীন ক্রমবর্ধমান কর্মধারা। বেদের ছন্দসকল ইহার পত্রনিচয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে এবং যে মনুষ্য এই বিশ্ববৃক্ষকে জানে সেই বেদবিৎ। আমরা বেদ সম্বন্ধে অন্তত বেদবাদ সম্বন্ধে যে নিন্দাসূচক মতবাদ প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে। কারণ বেদ আমাদিগকে যে জ্ঞান দেয় তাহা হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের তত্ত্ব ও শক্তিসকলের জ্ঞান, এবং ইহার ফল হইতেছে কামনার সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহারই ফল, ত্রিভুবনে, মর্ত্যে, স্বর্গে ও মধ্যলোকে ভোগ ও ঐশ্বর্যরূপ ফল। এই বিশ্ববৃক্ষের শাখাসকল ঊর্ধ্বে ও নিম্নে উভয়দিকেই বিস্তৃত, নিম্নে জড়জগতের মধ্যে, ঊর্ধ্বে অতিভৌতিক লোকসকলের মধ্যে; তাহারা প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা বর্ধিত হয়, কারণ গুণত্রয়ই বেদের সমগ্র বিষয়বস্তু, ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ। বেদের ছন্দসকল হইতেছে পত্রনিচয় এবং বিধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা যে ভোগ্য বিষয়সকল পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা নিত্যমঞ্জরিত নবপল্লব। অতএব যতদিন মানুষ গুণসকলের ক্রিয়া উপভোগ করে এবং বাসনাতে আসক্ত থাকে, ততদিন সে প্রবৃত্তির জালে, জন্ম ও কর্মের চক্রে আবদ্ধ থাকে, অনবরত পৃথিবী ও মধ্যলোক ও স্বর্গলোক এই সবের মধ্যেই ঘুরিতে থাকে, পরন্তু তাহার পরম অধ্যাত্ম আনন্ত্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ঋষিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের জন্য তাঁহারা ধরিয়াছিলেন নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ আদি কর্মপ্রেরণার বিরতি, এবং এই নিবৃত্তিমার্গের পরিণতি হইতেছে জন্মেরই অবসান এবং শাশ্বতের উচ্চতম বিশ্বাতীত পদের মধ্যে লোকোত্তর গতি লাভ। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে, দৃঢ় অনাসক্তি অসির দ্বারা এই সকল সুদৃঢ় বাসনা-মূলকে ছেদন করা এবং তাহার পর সেই পরম পদ অন্বেষণ করা, যে পদ একবার লাভ করিতে পারিলে পুনরায় আর মর্ত্যজীবনের মধ্যে ফিরিবার কোনই বাধ্যতা থাকে না। এই নীচের মায়ার মোহ হইতে মুক্ত হওয়া, অহংভাবশূন্য হওয়া, আসক্তিরূপ মহাদোষকে জয় করা, সকল কামনাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করা, সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব বর্জন করা, শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনায় সর্বদা দৃঢ়নিষ্ঠ থাকা—এই সকল ধাপই সেই পরম অনন্তের মধ্যে যাইবার পন্থা। সেখানে আমরা পাই সেই কালাতীত সত্তাকে যাহা সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নির দ্বারা উদ্ভাসিত নহে, পরন্তু নিজেই শাশ্বত পুরুষের জ্যোতি। বেদান্তের কথা—আমি ফিরিয়া চলিয়াছি শুধু সেই আদিপুরুষের সন্ধান করিতে এবং মহান পন্থায় তাঁহাকে লাভ করিতে। ঐটিই পুরুষোত্তমের উচ্চতম পদ, তাঁহার বিশ্বাতীত স্থিতি।

কিন্তু মনে হইতে পারে যে, ইহা সন্ন্যাসের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই বেশ লাভ করা যায়, এমন কি উৎকৃষ্টভাবে, বিশিষ্টভাবে সাক্ষাৎভাবেই লাভ করা যায়।

অক্ষরের পথই ইহার নির্দিষ্ট পথ বলিয়া মনে হয়, সম্পূর্ণভাবে কর্ম ও জীবন পরিত্যাগ, সন্ন্যাসীর নির্জনতা, সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয়তা। এখানে কর্মের আদেশ দিবার স্থান কোথায়, অন্তত তাহার প্রেরণা কোথায়, প্রয়োজন কোথায়? আর এ-সবের সহিত লোকসংগ্রহ, কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত, কালপুরুষের প্রবৃত্তি, লক্ষশরীর বিশ্বপুরুষ এবং তাঁহার উদাত্ত আদেশ—"উঠ, শত্রুগণকে জয় কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ কর"—এ-সবের কি সম্বন্ধ? আর প্রকৃতির মধ্যে যে পুরুষ ইনিই বা কি? এই যে পুরুষ, এই ক্ষর, আমাদের পরিবর্তনময় জীবনের ভোক্তা—ইনিও পুরুষোত্তম; ইনি হইতেছেন তিনিই, তাঁহারই শাশ্বত বহু রূপে পুরুষোত্তম, ইহাই গীতার উত্তর। "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে আবির্ভূত হয়।" * এই কথাটি, এই বিশেষণটি সাতিশয় অর্থপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক সত্তা তাহার অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুত যতই আংশিক হউক না কেন। আর কথার যদি কোনও অর্থ থাকে তাহা হইলে ইহার দ্বারা আরও বুঝায় যে, প্রত্যেক প্রকাশশীল পুরুষ, বহু জীবের প্রত্যেক জীবই হইতেছে এক একটি শাশ্বত ব্যক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার এক শাশ্বত অজাত অমৃত শক্তি। এই প্রকাশশীল পুরুষকে আমরা জীব নামে অভিহিত করি, কারণ ইহা এখানে এই জীবজগতে একটি জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীয়মান হয় এবং মানুষের মধ্যে এই আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলিয়া থাকি এবং তাহার মানবধর্মটিই অনুধাবন করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ইহার আপাতদৃশ্য রূপ হইতে মহত্তর বস্তু এবং ইহার মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অতীতে ইহার প্রকাশ মানুষ অপেক্ষাও ন্যূন ছিল, ভবিষ্যতে ইহা মননশীল মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় কিছু হইতে পারে। আর যখন এই জীব সকল অজ্ঞানের সীমার উপরে উঠে, তখন সে তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহার মানবত্ব ঐ দিব্য প্রকৃতির কেবল সাময়িক আচ্ছাদন, উহার সার্থকতা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ব্যষ্টিগত জীব ঊর্ধ্বে শাশ্বতের মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল, কারণ উহা নিজে সনাতন। এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা কোথাও বলে নাই যাহা হইতে আদৌ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, পরন্তু গীতা বলিয়াছে, জীবের পক্ষে পরম পদ হইতেছে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করা, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতা যখন সর্বভূতের এক আত্মার কথা বলিতেছে তখন মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদের ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু শাশ্বত জীবের (মমৈ-

* মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭

বাংশঃ সনাতনঃ) নিত্য সত্য তাহাতে এমন একটি বিশেষণ যোগ করিয়া দিতেছে, মনে হয় গীতা প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকার করিতেছে,—তবে ইহা হইতেই একেবারে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ইহা পরবর্তী রামানুজ মতের সহিত এক। তথাপি এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয় ভাগবত সত্তার মধ্যেই একটি বহুত্বের তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু মায়া নহে, তাহা শাশ্বত ও সত্য।

এই সনাতন জীব ভাগবত পুরুষ হইতে অন্য কিছু নহে অথবা তাঁহা হইতে বস্তুত পৃথকও নহে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার একত্বের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বহুত্বের দ্বারা (সকল সৃষ্টিই কি অনন্তের এই সত্যেরই প্রকাশ নহে ?) আমাদের মধ্যে অমর আত্মারূপে চিরবিরাজমান রহিয়াছেন, এই দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যখন এই অস্থায়ী গৃহ পরিত্যক্ত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তখন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। মন ও ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়-সমূহ উপভোগ করিবার জন্য তিনি প্রকৃতির আন্তরিক শক্তি মন ও পঞ্চে-ন্দ্রিয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছেন, এবং তাহাদের বিকাশ করিতেছেন, * এবং যাইবার সময়েও বায়ু যেমন পুষ্পমাত্র হইতে গন্ধকে লইয়া যায় সেইরূপ সেই সবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরিবর্তনময়ী প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নতা আমাদের কাছে বাহ্যদৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং প্রকৃতির গতিশীল ভ্রান্তিসকলের ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়। আর যাহারা প্রকৃতির রূপসকলের দ্বারা, মানবতা বা অন্য কোন রূপের দ্বারা নিজেদিগকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেয়, তাহারা কখনই ইহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহারা উপেক্ষা করিবে, মানবতনু-আশ্রিত ভগবানকে অবজ্ঞা করিবে। তিনি যখন আসিতেছেন বা যাইতেছেন অথবা অবস্থান করিতেছেন, ভোগ করিতেছেন, গুণান্বিত হইতেছেন, তখন তাহাদের অজ্ঞান তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, কেবল দেখিবে সেখানে মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর কি রহিয়াছে, সেই মহত্তর সত্যকে দেখিতে পাইবে না যাহা শুধু জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই পরিলক্ষিত হইতে পারে। * তাহারা কখনও তাঁহার দর্শন পাইবে না, সেজন্য যত্ন করিলেও দর্শন

* শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ১৫।৮,৯

* উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১৫।১০,১১

পাইবে না, যতক্ষণ না তাহারা বাহ্য চৈতন্যে প্রতিবন্ধক-সকলকে দূর করিয়া দিতেছে এবং নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্মসত্তাকে গড়িয়া তুলিতেছে, নিজেদের প্রকৃতির মধ্যেই যেন তাহার জন্য রূপ সৃষ্টি করিতেছে। নিজেকে জানিতে হইলে মানুষকে হইতে হইবে কৃতাত্মা, অধ্যাত্ম ছাঁচে নির্মিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে জ্ঞানময় হইতে হইবে। আমরা স্বরূপত যে ভাগবত পুরুষ, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন যোগিগণ নিজেদের অন্তহীন সত্তার মধ্যে, নিজেদের আত্মার আনন্ত্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান। জ্ঞানালোকিত তাঁহারা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান এবং স্থূল ভৌতিক রূপের বন্ধন হইতে, মানস ব্যক্তিত্বের রূপ হইতে, অনিত্য-প্রাণের রূপ হইতে মুক্ত হন· তাঁহারা আত্মার সত্যে অমর হইয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে শুধু নিজেদের মধ্যেই দেখেন না, পরন্তু সকল বিশ্বের মধ্যে দেখেন। যে সূর্যের জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করিতেছে, তাহার মধ্যে তাঁহারা আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানেরই জ্যোতি দেখিতে পান; চন্দ্রে যে জ্যোতি, অগ্নিতে যে জ্যোতি তাহা ভগবানেরই জ্যোতি। * ভগবানই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই ইহার জড় শক্তির আত্মা এবং তাঁহার শক্তির দ্বারা যাবতীয় বস্তুসকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ভগবানই সোমদেবতা, তিনি ধরিত্রীমাতার রসের দ্বারা লতাবৃক্ষকে পুষ্ট করিতেছেন এবং তাহাকে শস্যশ্যামলা করিতে-ছেন। যে প্রাণবহ্নি প্রাণিগণের স্থূল ভৌতিক শরীরকে রক্ষা করিতেছে এবং ইহার খাদ্যকে পরিপাক করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করিতেছে, তাহা ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, বিচার বিতর্ক। তিনিই সেই বস্তু যাহাকে সকল বেদের দ্বারা এবং সর্ববিধ জ্ঞানের দ্বারা অবগত হওয়া যায়; তিনিই বেদের জ্ঞাতা, তিনিই বেদান্তের রচয়িতা। অন্য কথায়, ভগবান একই সঙ্গে জড়ের আত্মা প্রাণের আত্মা, মনের আত্মা, আবার যে অতিমানস বিজ্ঞান জ্যোতি মন ও সীমাবদ্ধ তর্কবুদ্ধির অতীত তিনি তাহারও আত্মা।

এই ভাবে ভগবান তাঁহার যুগ্ম আত্মারূপ রহস্যে, যুগ্ম শক্তিরূপে আবি-

*যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১২-১৫

ভূত, দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ; একই সঙ্গে তিনি এই পরিবর্তনময় সর্বভূতের আত্মাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, আবার যে অপরিবর্তনীয় আত্মা তাহাদের ঊর্ধ্বে তাঁহার শাশ্বত নীরবতা ও শান্তির অক্ষুব্ধ অচলতায় বিরাজ করিতেছে তাহাকেও ধরিয়া রহিয়াছেন। * মানুষের মন ও হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহারই শক্তিতে ইহারা এই দুই পুরুষের দ্বারা বিভিন্ন দিকে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়, মনে হয় যেন এই আকর্ষণ পরস্পরের বিরোধী ও বিসদৃশ, পরস্পরকে বিনষ্ট করিতেই চাহিতেছে। কিন্তু ভগবান কেবলই ক্ষর নহেন, কেবলই অক্ষরও নহেন। তিনি অক্ষর আত্মা হইতে মহত্তর আবার পরিবর্তনশীল জিনিসসকলের আত্মা হইতে আরও বেশী মহত্তর। তিনি যে একই সঙ্গে দুইই হইতে পারেন তাহার কারণ তিনি তাহাদের হইতে ভিন্ন, অন্য, তিনি সকল বিশ্বের ঊর্ধ্বে পুরুষোত্তম, অথচ তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বেদে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, আত্মজ্ঞানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্ব-উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। আর যে এইভাবে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে ও দেখে, সে আর জগতের বাহ্য দৃশ্যে বা এই দুইটি আপাতবিরোধী সত্তার পৃথক আকর্ষণে বিমূঢ় হইয়া পড়ে না। সেই জ্ঞানীর মধ্যে এই দুইটি প্রথমে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, একটি বিশ্বকর্মের প্রবৃত্তিরূপে, আর একটি আত্মার মধ্যে নিবৃত্তিরূপে, কোন কর্মের সহিত এই আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, সকল কর্ম প্রকৃতির অজ্ঞানের, অথবা শুধু এইরূপ বলিয়াই মনে হয়। অথবা তাহারা তাঁহার চৈতন্যের সম্মুখে বিরোধী দাবি লইয়া উপস্থিত হয়, একটি শুদ্ধ, অনির্দেশ্য, অবিচল, শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ সৎরূপে, আর একটি ইহার বিপরীত অসৎরূপে—ক্ষণস্থায়ী গঠন ও সম্বন্ধ, ভাব ও রূপ, নিত্য পরিবর্তনশীল সম্ভূতি ও সৃজন এবং লয়কারী কর্ম ও বিবর্তনের জাল, জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব এই সবের জগৎ রূপে। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অতিক্রম করেন, তাহাদের বিরোধের সমন্বয় করেন এবং বিশ্ববেত্তা সর্ববিদ হন। তিনি আত্মা ও ভূতসকলের সমুদয় অর্থটি দেখিতে পান; তিনি ভগবানের অখণ্ড সত্তাকে, সমগ্রম্ মাম্, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; তিনি ক্ষর ও অক্ষরকে পুরুষোত্তমের মধ্যে

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৫।১৬-১৯

মিলিত করেন। যিনি তাঁহার ও সর্বভূতের পরম আত্মা, তাঁহার ও সকল শক্তির এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর, জগতের মধ্যে ও বাহিরে নিকট ও দূর শাশ্বত সত্তা, তাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, পূজা করেন, দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করেন, ভজনা করেন। আর তিনি ইহা করেন তাঁহার শুধু কোন একটি দিক বা অংশের দ্বারা নহে, কেবল অধ্যাত্মভাবাপন্ন মনের দ্বারাই নহে, কেবল প্রগাঢ় কিন্তু অনুদার হৃদয়ের প্রখর আলোকেই নহে অথবা কেবল কর্মের ভিতর সংকল্পের অভীপ্সার দ্বারাই নহে, পরন্তু তাঁহার সত্তা ও তাঁহার সম্ভূতির, তাঁহার আত্মা ও তাঁহার প্রকৃতির সমস্ত পূর্ণ সম্বন্ধ ক্রিয়ার দ্বারা। তাঁহার অবিচল স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার সমতায় তিনি ভাগবত, এবং সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত এক: তিনি সেই সীমাহীন সমতাকে, সেই গভীর ঐক্যকে তাঁহার মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের মধ্যে নামাইয়া আনেন, এবং তাহার উপরে দিব্য প্রেম, দিব্য কর্ম, দিব্য জ্ঞান এই ত্রি-সত্যকে অবিভাজ্য সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই গীতাপ্রদর্শিত মুক্তির পন্থা।

আর বস্তুত এইটিই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে, যাহা এক অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এতটুকুও বিভেদ করে না? এই যে আত্যন্তিক ভেদশূন্য অদ্বৈতবাদ, ইহা প্রকৃতির বহুর মধ্যেই সকল ভাবে একলে এক বলিয়াই দেখে, যে পরম সত্য বিশ্বাতীত সত্তা আত্মার মূল এবং বিশ্বের সত্য তাহার মধ্যে যেমন একলে এক বলিয়া দেখে তেমনিই আত্মার সত্তার এবং বিশ্বের সত্তার মধ্যেও দেখে, এবং উহা কি বিশ্ব প্রবৃত্তি, কি বিশ্বের নিবৃত্তি বা পরম নিবৃত্তি কিছুরই দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অন্তত ইহাই হইতেছে গীতার অদ্বৈত। গুরু অর্জুনকে বলিলেন, এইটিই গুহ্যতম শাস্ত্র, এইটিই পরম শিক্ষা ও বিদ্যা, ইহাই আমাদিগকে উচ্চতম জগৎ রহস্যের অন্তঃস্থলে লইয়া যাইতে পারে।* এইটিকে পূর্ণভাবে অবগত হওয়া, জ্ঞানে অনুভবে শক্তিতে উপলব্ধিতে ইহাকে অধিকার করা—ইহাই হইতেছে রূপান্তরিত বুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করা, হৃদয়ে দিব্যভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া, এবং ইহাই হইতেছে সকল সংকল্প, ক্রিয়া ও কর্মের পরম অর্থ ও লক্ষ্যে কৃতকার্য হওয়া। অমৃতত্ব লাভ করিবার, উচ্চতম ভাগবত প্রকৃতির অভিমুখে উঠিবার, শাশ্বত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইহাই পন্থা।

* ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ১৫।২০

ষোড়শ অধ্যায়

অধ্যাত্ম কর্মের পরিপূর্ণতা

গীতার চিন্তাধারার বিকাশ এখন এমন এক স্থলে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে যে এখন কেবল একটি প্রশ্নের সমাধান বাকী রহিয়াছে—প্রশ্নটি হইতেছে আমাদের বদ্ধ অপূর্ণ প্রকৃতির, কেমন করিয়া ইহা শুধু মূলত নহে পরন্তু ইহার প্রত্যেক ক্রিয়ায় নীচের সত্তা হইতে ঊর্ধ্বের সত্তায় বিকাশ লাভ করিবে, তাহার বর্তমান ক্রিয়ার ধর্ম হইতে উঠিয়া শাশ্বত ধর্মে গড়িয়া উঠিবে। এই সমস্যাটি গীতার কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু এখন সেটিকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া আমাদের বুদ্ধির সম্মুখে ধরা আবশ্যক। তৎকালে মনস্তত্ত্বের যে-জ্ঞান পরিচিত ছিল, গীতা তাহা ধরিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহার চিন্তাধারার বিকাশ করিতে এমন অনেক কথাই সে সংক্ষেপে সারিতে পারিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে বা একেবারেই বাদ দিয়াছে যে গুলি আমাদিগকে খুব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে, সুনির্ণীত করিতে হইবে। ইহার শিক্ষা প্রথমেই আমাদের জাগতিক কর্মের জন্য এক নূতন উৎস, নূতন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছে; উহাই আরম্ভ এবং শেষও হইয়াছে উহাকে ধরিয়াই। ঠিক মোক্ষলাভের কোন পন্থা নির্দেশ করা গীতার গোড়ায় লক্ষ্য ছিল না, সে লক্ষ্য ছিল মুক্তি-সাধনার সহিত কর্মের সামঞ্জস্য দেখান এবং আধ্যাত্ম মুক্তিলাভের পরও তাহার সহিত জাগতিক কর্মের সামঞ্জস্য দেখান, মুক্তস্য কর্ম্ম। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধিলাভের একটি সমন্বয়মূলক যোগ বা অন্তর-বৃত্তি-গত সাধনার বিকাশ করা হইয়াছে, এবং এই যোগের ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের, আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির কয়েকটি সত্যের, অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটি, অর্জুনের সেই মূল বাধা ও সমস্যাটি বরাবরই স্মরণে রহিয়াছে। অর্জুনের হৃদয় মন বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি কর্মের প্রচলিত স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত ভিত্তি ও আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়া কর্মের এক নূতন ও সন্তোষজনক অধ্যাত্ম-নীতির সন্ধান চাহিয়াছেন, মানুষের গতানুগতিক যুক্তি এবং প্রকৃতির আংশিক সত্যসকল অনুসরণ করিয়া তিনি আর কর্ম করিতে পারেন না, তাই তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কেমন করিয়া আত্মার সত্যের মধ্যে বাস করা যায়, অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার উপর যে কর্মের ভার পড়িয়াছে তাহা তিনি সম্পাদন করিতে পারেন। নির্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মার নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্ত,

অনাসক্ত, নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, অথচ কর্মময়ী প্রকৃতির কর্মসকল সুসম্পন্ন করিতে হইবে এবং আরও উদার ভাবে আমাদের অন্তরস্থিত শাশ্বত ভগবানের সহিত এক হইতে হইবে এবং জগতে তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে হইবে, উন্নীত, মুক্ত বিশ্ব-প্রসারিত ব্যক্তিক প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তি ও দিব্য ঊর্ধ্ব স্থিতির ভিতর দিয়া সেই ভাগবত ইচ্ছা কার্য করিবে—ইহাই গীতার সমাধান।

এখন দেখা যাউক সরলতম, স্পষ্টতম ভাষায় ইহার অর্থ কি, অর্জুনের সংশয় ও বিদ্রোহের মূলে যে সমস্যাটি রহিয়াছে তাহার কি সমাধান এখানে পাওয়া যাইতেছে। একজন মানুষরূপে, একটি সামাজিক জীবরূপে তাঁহার কর্তব্য হইতেছে ক্ষাত্রিয়ের মহান কার্য সম্পন্ন করা, নতুবা সমাজের কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে, জাতিধর্মসকল লুপ্ত হইবে, অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের বিপ্লবী প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে ন্যায় ও সুবিচারের সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। অথচ শুধু কর্তব্যের প্রেরণাই এই যুদ্ধের প্রধান নায়ককে আর সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, কারণ কুরুক্ষেত্রে ভীষণ বাস্তবতার মধ্যে তাহা অতি রূঢ় সংশয়পূর্ণ দুর্বোধ্য রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক কর্তব্য পালনের অর্থ সহসা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাকে বিরাট পাপ, দুঃখ, যন্ত্রণারূপ পরিণামে সম্মতি দিতে হইবে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায় রক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিগুলিই সে-সবের পরিবর্তে বিষম বিশৃঙ্খলা ও সংপ্লবের সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত দাবি ও স্বার্থের যে নীতি, যাহাকে আমরা ন্যায্য অধিকার বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইতে তাঁহার আর কোন সহায্যই হইতেছে না, কারণ যুদ্ধ করিয়া নিজের জন্য, নিজের ভ্রাতা, নিজের পক্ষের জন্য তাঁহাকে যে রাজ্য জয় করিতে হইবে তাহা ন্যায়ত তাঁহাদেরই, সে অধিকার বজায় রাখার অর্থ আসুরিক অত্যাচার দমন করা, ন্যায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু সে ন্যায় ধর্ম হইতেছে রক্তাক্ত এবং সে রাজ্য হইবে দুঃখের রাজ্য, তাহার উপর এক মহাপাপের, সমাজের এক মহান অনিষ্টের, জাতির প্রতি এক গুরু অপরাধের কলঙ্ক অঙ্কিত থাকিবে। আর ধর্মের অনুশাসন, নীতির দাবি হইতেও যে তিনি বেশী কিছু সাহায্য পাইবেন তাহাও নহে কারণ এখানে ধর্মে-ধর্মে বিরোধ ঘটিতেছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাই এক নূতন, এক মহত্তর অথচ এ-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত নীতি, কিন্তু সে নীতি কি?

তাঁহার কর্ম হইতে সরিয়া দাঁড়ানো, সাধুজনোচিত নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় লওয়া, এবং এই যে অপূর্ণ জগতে কর্মের উদ্দেশ্য ও উপায়সকল সন্তোষজনক নহে ইহাকে নিজের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া—ইহা একটি সম্ভব সমাধান, সহজেই কার্যে পরিণত করা যায়, সহজেই অবধারণ করা যায়, কিন্তু ঠিক এই

সহজ সমাধানটিই গুরু পুনঃ-পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। জগতের যিনি ঈশ্বর তিনি মানুষের নিকট কর্ম চান, তিনিই তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর, তাঁহার এই জগত হইতেছে কর্মের ক্ষেত্র, সে-কর্ম মানুষ অহংভাবের বশে করিতে পারে, অথবা সীমাবদ্ধ মানবীয় বুদ্ধির অজ্ঞানে বা আংশিক আলোকে করিতে পারে, অথবা তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান ও প্রেরণার এক উচ্চতর ও ব্যাপকতর দৃষ্টি-সম্পন্ন স্তর হইতে অনুপ্রেরিত হইতে পারে। আবার এই বিশেষ কর্মটিকে অশুভ বলিয়া পরিত্যাগ করাও আর এক প্রকার সমাধান হইতে পারে, অদূর-দর্শী নীতিপরায়ণ মানুষ এইরূপ সমাধান গ্রহণ করিতেই তৎপর; কিন্তু এই-ভাবে এড়াইবার চেষ্টাও গুরু অনুমোদন করেন নাই। অর্জুন যদি বিরত হন তাহা হইলে আরও বেশী পাপ ও অশুভ সংঘটিত হইবে, তাঁহার বিরতির যদি কোন ফল হয় ত ইহাই হইবে যে, অন্যায় ও অত্যাচার জয়ী হইবে, ভাগবত-কর্মের যন্ত্ররূপে তাঁহার নিজের যাহা ব্রত তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইবে। জাতির ভাগ্য নির্ণয়ে এক দারুণ সন্ধিক্ষণ আর্বির্ভূত হইয়াছে, অন্ধ-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা নহে, অথবা কেবল মাত্র মানুষের ভাবনা, স্বার্থ, উন্মাদনা, অহঙ্কারের বিশৃঙ্খল সংঘাত দ্বারাও নহে, পরন্তু এই সকল বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যে ঐশী ইচ্ছা রহিয়াছে তাহারই দ্বারা। এই সত্যটি অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে হইবে; তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বাসনা এবং দুর্বল মানবীয় বিরাগ-সকলের যন্ত্ররূপে নহে, পরন্তু এক বিশালতর ও অধিকতর জ্যোতিষ্মান শক্তির, এক মহত্তর, সর্ববিৎ, দিব্য ও বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাব যন্ত্ররূপে নির্ব্যক্তিকভাবে, অবিচলিতভাবে কর্ম-কবা তাঁহাকে শিখিতে হইবে। আন্তর ও বাহ্য ভগবদ্ সত্তার সহিত তাঁহার অন্তর পুরুষকে মহাযোগে যুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের যে পরম আত্মা এবং বিশ্বের অনুপ্রেরক আত্মা তাহার সহিত শান্ত যোগে নির্ব্যক্তিক ভাবে এবং বিশ্বজনীন ভাবে তাঁহাকে কর্ম করিতে হইবে।

কিন্তু এই সত্যকে ঠিকমত দেখিতে পারা যায় না এবং এই প্রকার কর্ম ঠিকমত অনুষ্ঠান করা যায় না, বাস্তব হইয়া উঠে না যতক্ষণ মানুষ অহংয়ের দ্বারা, এমন কি বুদ্ধি ও মানসিক প্রজ্ঞার যে অর্ধ-প্রবুদ্ধ অজ্ঞান সাত্ত্বিক অহং তাহারই দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ এইটি হইতেছে আত্মার সত্য, এইটি হই'তছে একটা অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে কর্ম। কেবলমাত্র মানসিক বুদ্ধিগত জ্ঞান নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞান এই প্রকার কর্মের জন্য অবশ্য প্রয়োজন, একমাত্র এইরূপ জ্ঞানই ইহার আলোক, বাহন, প্রণোদক হইতে পারে। অতএব প্রথমেই গুরু দেখাইয়া দিলেন, এই যে-সব চিন্তা ও অনুভব অর্জুনকে বিব্রত বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করিতেছে, সুখ ও দুঃখ, বাসনা ও পাপ, বাহ্য ফলাফল বিবেচনা করিয়া কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে মনের প্রবৃত্তি, জগতের সহিত বিশ্বপুরুষের ব্যবহারে যাহা কিছু রুদ্র ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় সে-সবের সম্মুখে মানুষের

কাতরতা,—আমাদের চৈতন্য যে প্রাকৃত অজ্ঞানের অধীন সেই অধীনতা হইতেই এ সকলের উৎপত্তি; নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ আত্মা নিজেকে স্বতন্ত্র অহং বলিয়া দেখে, তাহার উপর বস্তুসকলের যে ক্রিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য. ন্যায়-অন্যায়, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এই সব দ্বন্দ্বের উদ্ভব করে। এই সকল প্রতিক্রিয়া এক ভ্রান্তির জটিল জাল সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে আত্মা নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে হারাইয়া ফেলে ও বিভ্রান্ত হয়। তাহাকে আংশিক ও অসম্পূর্ণ সমাধানসকল অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, সে-সবের দ্বারা সাধারণ জীবনের কাজ সাধারণত ত্রুটি বিচ্যুতির ভিতর দিয়া কোন রকমে চলিতে পারে, কিন্তু উদারতর দৃষ্টি ও গভীরতর অনুভূতির সম্মুখে তাহাদের কোনই উপযোগিতা থাকে না। কর্ম ও জীবনের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে, মানুষকে এই সকল বাহ্য দৃশ্যের পশ্চাতে আত্মার সত্যের মধ্যে যাইতে হইবে; প্রকৃত বিশ্বজ্ঞানের ভিত্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে বাসনা ও বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যকর হৃদয়াবেগ হইতে এবং মানবীয় মনের এই বিক্ষুব্ধ ও বিকৃতিকারক পরিস্থিতি হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া নির্বিকার সমতার আকাশে, নির্ব্যক্তিক শান্তির স্বর্গে, অহংশূন্য অনুভূতি ও দৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করা। কারণ কেবল সেই বিশুদ্ধ উর্ধ্বতর আকাশে, সকল ঝঞ্ঝা ও মেঘ হইতে নির্মুক্ত স্তরেই আত্মজ্ঞান আসিতে পারে এবং বিশ্বের বিধান ও প্রকৃতির সত্যকে ব্যাপক দৃষ্টিতে এবং অবিচল সর্বতোমুখী সর্বত্র প্রবেশকারী জ্যোতিতে স্থিরভাবে দেখা যাইতে পারে। এই যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির অবশ যন্ত্র, প্রকৃতির হস্তের নির্বিরোধী অক্ষম পুত্তলিকা, তাহার সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্ট রূপ—ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক নির্ব্যক্তিক আত্মা, সকলের মধ্যে এক, তাহা সব জিনিসকেই দেখিতেছে, জানিতেছে; এক সম, নিরপেক্ষ, বিশ্বব্যাপী সত্তা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে, এক সাক্ষী-চৈতন্য প্রকৃতিকে জিনিসসকলের স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ করিতে দিতেছে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মের মধ্যে বদ্ধ হইতেছে না, নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে না। অহং এবং বিক্ষোভময় ব্যক্তিত্ব হইতে সরিয়া এই শান্ত, সম, সনাতন, বিশ্বময় নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে আসাই হইতেছে দৃষ্টি-সম্পন্ন যৌগিক কর্ম করিবার প্রাথমিক সাধনা; যে ভাগবত সত্তা ও অব্যর্থ ইচ্ছা আমাদের নিকট এখন অপরিস্ফুট হইলেও বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকট করিতেছে, তাহার সহিত সজ্ঞান যোগেই এইরূপ কর্ম সম্পাদিত হয়।

যখন আমরা এই নির্ব্যক্তিক আত্মার প্রসারতার মধ্যে শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস করি, তখন আমাদের ক্ষুদ্র মিথ্যা "আমি", আমাদের কর্মের অহং, ইহার বিশালতার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় কারণ সেই আত্মা হইতেছে বিরাট, শান্ত,

নিশ্চল, নির্ব্যক্তিক; এবং আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, আমরা নহি, সকল কর্মই প্রকৃতির কর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। আর এই যে জিনিসটিকে আমরা প্রকৃতি বলি, শাশ্বত সত্তা যখন সচল হইতেছে এই প্রকৃতি তাহারই বিশ্বভূতা কার্যনির্বাহিকা শক্তি, সেই সত্তা তাহার সৃষ্ট জীবগণের প্রতি শ্রেণীর মধ্যে এবং শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে তাহার স্বভাব অনুসারে এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্ম অনুসারে বিভিন্ন আকার ও রূপ গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক জীবকেই আপন-আপন প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতে হয়, আর কিছুর দ্বারাই সে কর্ম করিতে পারে না। অহং, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বাসনা এ-সবই এক বিশ্বশক্তির জীবন্ত সচেতন রূপ ও সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে-শক্তি নিজে অরূপ ও অনন্ত এবং ইহাদের অনেক ঊর্ধ্বে; বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, দেহ, ইহাদিগকে আমরা আমাদের বলিয়া মনে করি, গর্ব করি, ইহারা সবই হইতেছে প্রকৃতির যন্ত্র, প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মা কর্ম করে না এবং প্রকৃতির অংশও নহে, সে পশ্চাৎ হইতে ও ঊর্ধ্ব হইতে কর্মকে অবলোকন করে এবং স্বরাটরূপে, মুক্ত নির্বিকার জ্ঞাতারূপে, সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। যে জীব এই নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করে, আমাদের প্রকৃতিকে যন্ত্র করিয়া যে-সব কর্ম সম্পাদিত হইতেছে সে-সবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না; সে এ-সবে সাড়া দেয় না, ইহাদের ফল স্বরূপ সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, বাসনা-বিতৃষ্ণা, এইরূপ যে সহস্র দ্বন্দ্ব আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, বিচলিত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এ-সবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না। সে সকল মনুষ্য, সকল বস্তু, সকল ঘটনাকেই সমতার সহিত দর্শন করে, লক্ষ্য করে যে প্রকৃতির গুণ-সকল গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে, সে ঐ যন্ত্রের সমগ্র রহস্যটি দেখিতে পায়, কিন্তু সে নিজে এই সকল গুণের অতীত, এক শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক মূল সত্তা, নির্বিচল, মুক্ত, শান্ত-প্রতিষ্ঠ। প্রকৃতি তাহার কর্ম করে এবং নির্ব্যক্তিক বিশ্বগত আত্মা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু মজ্জিত হয় না, আসক্ত হয় না, জড়িত হয় না, বিক্ষুব্ধ বা বিভ্রান্ত হয় না। যদি আমরা এই সমতাময় আত্মায় বাস করিতে পারি—আমরাও শান্ত-প্রতিষ্ঠ হইতে পারি; আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রে যতক্ষণ প্রকৃতি তাহার প্রেরণা চালাইতে থাকে ততক্ষণ আমাদের কর্ম চলিতে থাকে, কিন্তু ভিতরে থাকে অধ্যাত্মমুক্তি ও নিস্পন্দতা।

এই যে আত্মা ও প্রকৃতির দ্বৈত, পুরুষ নিস্পন্দ, প্রকৃতি কর্মময়ী, এইটিই আমাদের জীবনের সবখানি নহে; এ-বিষয়ে ইহারাই প্রকৃতপক্ষে দুইটি চরম কথা নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হয় আত্মার পক্ষে সকল কর্মই সমান হইত, এই কর্মটা করা হইবে, না, ঐ কর্মটা করা হইবে, না, কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে, ইহা সদা-পরিবর্তনশীল গুণসকলের কোন অনিয়ন্ত্রিত

আবর্তনের দ্বারাই নির্ধারিত হইত—অর্জুন দেহেন্দ্রিয়াদিতে রাজসিক প্রেরণার বশে যুদ্ধ করিতে চালিত হইতেন অথবা তামসিক জাড্য বা সাত্ত্বিক উদাসীনতা দ্বারা কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেন—অথবা অর্জুনের কর্ম করা এবং কেবল এইভাবে কর্ম করাই যদি অবশ্যম্ভাবী হইত তাহাও প্রকৃতির যন্ত্রবৎ অন্ধ নিয়মের দ্বারাই নির্ধারিত হইত। তাহা ছাড়া, পুরুষ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির্ব্যক্তিক নিস্পন্দ আত্মার মধ্যে বাস করিত, কর্মময়ী প্রকৃতির মধ্যে আর আদৌ বাস করিত না, এবং শেষ ফল হইত নিস্পন্দতা, নিষ্ক্রিয়তা, বিরতি, জাড্য. পরন্তু গীতা যে কর্মের নির্দেশ দিতেছে তাহা আর হইত না। আর শেষ কথা, এই দ্বৈতবাদ পুরুষ আদৌ কেন প্রকৃতি ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ হইতে আসে তাহার কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে না; কারণ এক চির-অবদ্ধ আত্মচেতন পুরুষ নিজে বন্ধনের মধ্যে পড়িবে, নিজের আত্মজ্ঞান হারাইবে এবং সেই জ্ঞানে তাহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এই শুদ্ধ পুরুষ, এই আত্মা চিরকালই রহিয়াছে, একই ভাবে রহিয়াছে, সে চিরকালই কর্মের এক আত্মচেতন নির্ব্যক্তিক স্বতন্ত্র সাক্ষী বা নিরপেক্ষ ধারণ-কর্তা। এই যে ফাঁক, এই যে অসম্ভব শূন্যতা, ইহাই আমাদিগকে বাধ্য করে দুইটি পুরুষের অথবা একই পুরুষের দুইটি সংস্থিতির পরিকল্পনা করিতে, একটি আত্মার মধ্যে নিগূঢ়,—তাহার স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা হইতে সব অবলোকন করিতেছে,—অথবা হয়ত কিছুই দেখিতেছে না, আর একটি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার কর্মে যোগ দিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টি-সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি বা মাযার যে দ্বৈতবাদ এইভাবে দুই পুরুষের দ্বৈতদ্বারা সংশোধিত হয়, এইটিও গীতার দার্শনিক তত্ত্বের সবখানি নহে। গীতা ইহার ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম পুরুষোত্তমের, পরম সর্বব্যাপী একত্বের সন্ধান দিযাছে।

গীতা বলিয়াছে যে, এক পরম রহস্য, উচ্চতম সত্য আছে যাহা এই দুই বিভিন্ন অভিব্যক্তির সত্যকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। এক পরাৎপর আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, একা তিনি ব্যক্তিক এবং নির্ব্যক্তিক উভয়ই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই অপেক্ষা অন্যতর ও মহত্তর। তিনি পুরুষ, আত্মা, আমাদের সত্তার অন্তরতম সত্তা, কিন্তু তিনিই আবার প্রকৃতি; কারণ প্রকৃতি হইতেছে সর্বাত্মার শক্তি, কর্মে ও সৃষ্টিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত শাশ্বত ও অনন্তের শক্তি। তিনি পরম অনির্বচনীয়, তিনি বিশ্ব-পুরুষ, তিনিই তাঁহার প্রকৃতি দ্বারা এই সকল জীব হইয়াছেন। তিনি পরম আত্মা ও ব্রহ্ম, তিনিই তাঁহার বিদ্যা মায়া এবং অবিদ্যা মায়ার দ্বারা বিশ্ব-রহস্যের দ্বৈত সত্য প্রকট করিতেছেন। তিনি পরম ঈশ্বর, তাঁহার শক্তির অধি-

নায়ক তিনিই এই সমগ্র প্রকৃতিকে এবং এই অগণ্য ভূত-সকলের ব্যক্তিত্ব, শক্তি ও কর্মকে সৃষ্টি করিতেছেন, চালিত করিতেছেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। প্রত্যেক জীবই এই স্বপ্রতিষ্ঠ একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তার অংশ সত্তা, এই সর্বাত্মার একটি শাশ্বত আত্মা, এই পরম ঈশ্বর ও তাঁহার বিশ্ব প্রকৃতির একটি আংশিক অভিব্যক্তি। এখানে সবই এই ভগবান, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্; কারণ প্রকৃতি দ্বারা এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষের দ্বারা তিনিই সর্বভূত হইতেছেন, এবং সব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাঁহার মধ্যে এবং তাঁহা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে, যদিও তিনি নিজে সকল বিশালতম অভিব্যক্তি, গভীরতম অধ্যাত্ম সত্তা বা বিশ্বময় রূপ অপেক্ষাও মহত্তর। এইটিই হইতেছে সৃষ্টির পূর্ণ সত্য, বিশ্বকর্মের সকল রহস্য, আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার শেষ অধ্যায়গুলিতে এই রহস্যটিই পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু এই যে মহত্তর সত্য, ইহার দ্বারা অধ্যাত্ম কর্মের নীতি কি ভাবে পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয়? ইহা প্রথমেই এই বিষয়ে পরিবর্তন করে যে, আত্মা ও জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধের সমগ্র অর্থটি পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইহা এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, যে-সব স্থান ফাঁক ছিল সেগুলি পূর্ণ করিয়া দেয়. মহত্তর প্রশস্ততা লাভ করে, সত্য এবং অধ্যাত্মভাবে প্রত্যক্ষ, নির্দোষভাবে সমগ্র সার্থকতা লাভ করে। জগৎ শুধু প্রকৃতির গুণের দ্বারা অন্ধভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আর অন্যদিকে রহিয়াছে এক নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার নিস্পন্দতা, তাহার কোন গুণ নাই, আত্মনিয়মনের শক্তি নাই. সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, প্রেরণাও নাই—জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণারও পরিবর্তন হইয়া যায়। এই অসন্তোষজনক দ্বৈতবাদের মধ্যে যে ফাঁক রহিয়াছে তাহার সমাধান হয় এবং জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক উন্নয়নকারী ঐক্য প্রকটিত হয়। নিস্পন্দ, নির্ব্যক্তিক পুরুষ সত্য,—ইহা হইতেছে ভগবানের স্থিরতার, শাশ্বতের নিশ্চল নীরবতার, পরমেশ্বরের সকল জন্ম, বিবর্তন, কর্ম ও সৃষ্টির অতীত অবস্থার সত্য, তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার শান্ত অনন্ত মুক্তি, তাহা সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না, প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি নিজেও আর দুর্বোধ্য মায়া থাকে না, কিন্তু শাশ্বতেরই একটি ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার সকল চঞ্চলতা ও কর্ম-বহুত্ব এক অক্ষর পুরুষ ও আত্মার অনাসক্ত ও সাক্ষীস্বরূপ শান্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত। প্রকৃতির যে অধীশ্বর একই সঙ্গে বিশ্বের এক এবং বহুধা আত্মা, এবং তাঁহার আংশিক প্রকাশের দ্বারা এই সব সত্তা, শক্তি, চৈতন্য, দেব, পশু, বস্তু, মনুষ্য হইতেছেন, তিনিই সেই অক্ষর পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন। গুণময়ী প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই শক্তির নিম্নতর, স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত ক্রিয়া, ইহা অপূর্ণভাবে সচেতন অভিব্যক্তির প্রকৃতি এবং

সেই জন্যই কতকটা অজ্ঞানের প্রকৃতি। তাহার যে বাহ্য শক্তি এখানে বাহ্য ক্রিয়ায় মগ্ন তাহার নিকটে আত্মার সত্য এবং ভগবানের সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে (অনেকটা যেমন মানুষের বাহ্য চেতনার নিকটে তাহার গভীরতর সত্তা লুক্কায়িত থাকে) যতক্ষণ না তাহার মধ্যে অন্তঃপুরুষ এই গুপ্ত বস্তুকে আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিজের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নিজের বাস্তব সত্য-সকলের, নিজের মহত্ত্ব ও গভীরতা সকলের সন্ধান পায়। এই জন্যই তাহাকে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিক ও অহংভাবময় সত্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার বৃহৎ, নির্ব্যক্তিক, অক্ষব, বিশ্বগত আত্মায় যাইতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর রহিয়াছেন শুধু আত্মাতেই নহে পরন্তু প্রকৃতিতেও। তিনি সর্বভূতেব হৃদ্দেশে রহিযাছেন এবং তাঁহাব অধিষ্ঠানের দ্বারা এই মহান প্রকৃতি-যন্ত্রটির আবর্তন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে বাস করিতেছে, তিনিই সব. কারণ সবই হইতেছে তাঁহার বিবর্তন, তাঁহার সত্তার বিভিন্ন অংশ বা রূপ। কিন্তু এখানে সবই চলিয়াছে এক নীচের আংশিক ক্রিয়ায়, এই ক্রিযা এক গূঢ়, এক উচ্চতর, মহত্তর ও পূর্ণতর ভাগবত প্রকৃতি হইতে, ভগবানের শাশ্বত অনন্ত প্রকৃতি বা পূর্ণ আত্মশক্তি, দেবাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত। মানুষের মধ্যে যে সিদ্ধ, সমগ্রভাবে চেতন আত্মা লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহা ভগবানের সনাতন অংশ, শাশ্বত ভাগবত সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, তাহা আমাদের মধ্যে ব্যক্ত হইতে পারে, এবং আমাদিগকেও তাহার অভিমুখে উন্মুক্ত করিতে পারে যদি আমরা তাহার ক্রিয়ার এবং আমাদের জীবনের এই সত্য সত্যের মধ্যেই সর্বদা বাস করি। যে ভগবানকে চায় তাহাকে তাহার অক্ষর ও শাশ্বত নির্ব্যক্তিক সত্তার সত্যেব মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে সর্বত্র সেই ভগবানকে দেখিতে হইবে যাঁহা হইতে সে উদ্ভূত হইয়াছে, দেখিতে হইবে যে তিনিই সব, এই পরিবর্তনশীলা প্রকৃতির সর্বত্র, তাহার প্রত্যেক অংশ ও পরিণামের মধ্যে এবং তাহার সকল কর্মের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে, এবং সেখানেও তাহাকে ভগবানের সহিত এক হইতে হইবে, সেখানেও তাঁহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, সেখানেও ভাগবত ঐক্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সে-সাধক সেই সমগ্রতায় তাঁহার গভীর মূল সত্তার দিব্যশান্তি ও মুক্তির সহিত তাঁহার দিব্যভাবাপন্ন প্রাকৃত সত্তায় যন্ত্রস্বরূপ কর্ম করিবার পরম শক্তির সমন্বয় সাধন করেন।

কিন্তু ইহা কেমন করিয়া করিতে হইবে? প্রথমত আমাদের কর্ম-সংকল্পের পশ্চাতে ভাবটি যদি ঠিক হয় তাহা হইলেই ইহা করা যাইতে পারে। সাধককে তাহার সকল কর্মকেই কর্মেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে, তিনি শাশ্বত ও বিশ্বগত সত্তা এবং তাহার নিজেরই ঊর্ধ্বতম আত্মা, এবং অন্য

সকলেরও আত্মা, তিনি বিশ্বমধ্যে সর্বত্রাধিষ্ঠিত, সর্বাধার, সর্বনিয়ন্তা পরম ভগবান। প্রকৃতির সমগ্র কর্মই এইরূপ যজ্ঞ, অবশ্য এ-যজ্ঞ প্রথমত সেই সকল দেবশক্তিকে অর্পণ করা হয় যাঁহারা তাহাকে চালিত করিতেছেন এবং তাহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু এই সকল দেবশক্তি সেই অদ্বিতীয় এক ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তারই পরিচ্ছিন্ন নাম রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ সাধারণত প্রকাশ্যভাবে অথবা কোন ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজের অহংকেই যজ্ঞ অর্পণ করে; তাহার অর্ঘ্য হইতেছে তাহার নিজেরই স্বৈরতা ও অজ্ঞানের মিথ্যাচার। সে তাহার জ্ঞান, কর্ম, অভীপ্সা, উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেবগণকে অর্পণ করে, আংশিক, সাময়িক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। অন্যপক্ষে জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ তাঁহার সমস্ত কর্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ শাশ্বত ভগবানে অর্পণ করেন, ইহাদের ফলের উপর বা তাঁহার নিম্নতর ব্যক্তিগত বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির উপর তাঁহার কোন আসক্তি থাকে না। তিনি কর্ম করেন ভগবানের জন্য, নিজের জন্য নহে, জগতের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের অন্তঃপুরুষের জন্য, তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সৃষ্টি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নহে, অথবা তাঁহার মনের ইচ্ছা বা প্রাণের কামনার কোন বস্তুর জন্য নহে, তিনি কর্ম করেন ভাগবত প্রতিনিধিরূপে, বিশ্ব-ব্যবসায় নিজেই মালিক বা স্বতন্ত্র ব্যবসাদার হিসাবে নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় কেবলমাত্র ততখানিই যতখানি মন সমতা, বিশ্বজনীনতা, নির্ব্যক্তিকতা লাভ করিতে পারে এবং বাসনাময় অহংয়ের সকল রকম ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে; কারণ এইগুলি না থাকিলে ঐরূপ কর্ম করিতেছি বলা ছলনা, না হয় ভ্রান্তিমাত্র। জগতের সমগ্র ব্যাপারটিই হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বরের কর্ম, স্ব-প্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মসত্তার কারবার, উহা তাঁহারই বিরামহীন সৃষ্টি, ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি, প্রকৃতির মধ্যে অর্থপূর্ণ প্রকাশ ও জীবন্ত প্রতীক। ফলগুলি তাঁহার, তিনি যেরূপ বিধান করেন সেইরূপই পরিণাম হয়, আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম কেবল গৌণভাবে তাহাতে সাহায্য করে, ইহার মূলে যতটা ব্যক্তিগত দাবির প্রেরণা থাকে ততটাই ইহা আমাদের অন্তরস্থিত এই আত্মা ও পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা ব্যাহত হয়, এই আত্মা ও পুরুষ সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, বস্তুসকলকে বিশ্বগত উদ্দেশ্য ও কল্যাণের জন্য পরিচালিত করিতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে। নির্ব্যক্তিক ভাবে, নিষ্কামভাবে, কর্মের ফলে আসক্তি বর্জন করিয়া কর্ম করা, ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, মহত্তর আত্মার জন্য এবং বিশ্বগত ইচ্ছা পূর্তির জন্য কর্ম করা—এইটিই হইতেছে মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে প্রথম ধাপ।

কিন্তু এই ধাপের ঊর্ধ্বে রহিয়াছে সেই মহত্তর সাধনাটি, আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানের নিকটে আমাদের সকল কর্মের আভ্যন্তরীণ সমর্পণ। কারণ

অনন্ত প্রকৃতিই আমাদের কর্ম-সকল প্ররোচিত করিতেছে—এবং তাহার মধ্যে ও ঊর্ধ্বে এক ভাগবত ইচ্ছা আমাদের নিকট হইতে কর্ম দাবি করিতেছে। আমাদের অহং কর্মটিকে যে প্রকার রূপ দেয় তাহা হইতেছে আমাদের তমঃ রজঃ, ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, তাহা নীচের প্রকৃতির মধ্যে একটা বিকৃতি। অহং নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে তাই ঐ বিকৃতির উদ্ভব হয়; কর্মটির ধারা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির রূপ ধারণ করে এবং জীব তাহার সহিত এবং তাহার সংকীর্ণ রূপগুলির সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে সেখান হইতে মুক্ত ও শুদ্ধভাবে কর্মটিকে উৎসারিত হইতে দেয় না। আর অহং কর্মে ও কর্মের ফলে শৃঙ্খলিত হয়। সে যেমন কর্মটির উৎপত্তির দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত সংকল্প নিজেরই বলিয়া দাবি করে, তেমনিই তাহাকে উহার ব্যক্তিগত পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে হয়। মুক্ত সিদ্ধ কর্মের জন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনের যিনি দিব্য অধীশ্বর তাঁহাকে কর্মটি এবং ইহার উৎপত্তি প্রথমে নিবেদন করা এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা; কারণ আমরা ক্রমশ বেশী-বেশী উপলব্ধি করি যে, কর্মটি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত এক পরম সত্তার দ্বারা গৃহীত হইতেছে, অন্তরাত্মা এক আভ্যন্তরীণ শক্তি ও ভাগবত পুরুষের সহিত গভীর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা এবং নিবিড় ঐক্যের মধ্যে আকর্ষিত হইতেছে এবং কর্মটি মহত্তর আত্মা হইতে, এক শাশ্বত সত্তার সর্বজ্ঞানময় অনন্ত বিশ্বব্যাপী শক্তি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে উৎসারিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহংয়ের অজ্ঞান হইতে নহে। কর্মটি প্রকৃতি অনুসারেই নির্বাচিত ও গঠিত হইতেছে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে ভাগবত ইচ্ছা রহিয়াছে সম্পূর্ণভাবে তাহার দ্বারাই, এবং সেই জন্যই তাহা অন্তরে মুক্ত ও সিদ্ধ, বাহিরে তাহার দৃশ্যরূপ যাহাই হউক না কেন; কর্মটি অনন্ত পুরুষের এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পরিচিতি লইয়া আইসে যে, ইহা "কর্ত্তব্য কর্ম", এইটি করিতে হইবে, সর্বদর্শী কর্মেশ্বরের আপন ধারায় কর্মটি এবং কর্মের গতিটি বিহিত হইয়াছে। মুক্ত ব্যক্তি যখন যন্ত্রস্বরূপ তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে এবং তাহার প্রকৃতির বিশেষ সংকল্প ও শক্তিকে কর্মটির সাধন ও নিমিত্তরূপে ধরিয়া দেয় তখনও তাহার আত্মা নিজের নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে মুক্ত থাকে। সেই সংকল্প ও শক্তি আর তখন স্বতন্ত্রভাবে অহংকৃতভাবে তাহার নিজের নহে, তখন তাহা অতিব্যক্তিক ভগবানেরই একটি শক্তি। ভগবান তাঁহার নিজেরই আত্মার এই অভিব্যক্তিতে, তাঁহার অগণ্য ব্যক্তিরূপের মধ্যে এই বিশেষ ব্যক্তিরূপটিতে ইহার প্রাকৃত সত্তার বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবকে ধরিয়া কর্ম করেন। এইটিই হইতেছে মুক্ত পুরুষের কর্মের মহান রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্। ইহা হইতেছে—মানবাত্মার পক্ষে ভাগবত জ্যোতিতে বিকশিত হইয়া উঠার, এক উচ্চতম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিজের প্রকৃতির যোগ সাধন করিবার ফল।

এই পরিবর্তন জ্ঞান ভিন্ন সংঘটিত হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় আত্মা ও ভগবান ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান আমাদিগকে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় তাহার মধ্যে বাস করা, তাহাতে বর্ধিত হইয়া উঠা। আমরা এখন জানি সে জ্ঞান কি। ইহা মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবীয় মানস-দৃষ্টি অপেক্ষা এক বিভিন্ন ও উদারতর দৃষ্টির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা,—এক পরিবর্তিত দৃষ্টি ও অনুভূতি যাহার দ্বারা মানুষ সর্ব প্রথমে অহঙ্কারের এবং অহংয়ের সকল সম্বন্ধের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হয় এবং সকলের মধ্যে এক আত্মাকে, ভগবানের মধ্যে সকলকে, সর্বভূতকে বাসুদেবরূপে, সকলকেই ভগবানের যন্ত্ররূপে এবং নিজ সত্তাকেও সেই এক ভগবানের সার্থকতাময় সত্তা ও অধ্যাত্ম শক্তিরূপে অনুভব করে, দর্শন করে; এক ঐক্যসাধক অধ্যাত্ম চেতনায় সে অন্যের জীবনের ঘটনাগুলিকেও দেখে যেন তাহারা তাহার নিজেরই জীবনের ঘটনা; ইহা কোনরূপ বিচ্ছেদের প্রাচীর থাকিতে দেয় না এবং সর্বভূতের সহিত বিশ্বজনীন সৌহার্দ্যে বাস করে, মানুষ যতক্ষণ বিশ্বলীলার মধ্যে আছে সর্বভূতের জন্য যে কর্ম করা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করে ভগবান কর্তৃক নির্ধারিত ধারার অনুসরণে এবং কালের অধীশ্বর বিশ্বপুরুষের আজ্ঞার দ্বারা নিরূপিত সীমার মধ্যে। এইভাবে জীবন যাপন করিয়া এবং এই জ্ঞানে কর্ম করিয়া মানবাত্মা ব্যক্তিকতায় ও নির্ব্যক্তিকতায় শাশ্বতের সহিত যুক্ত হয়, ঠিক যেমন শাশ্বত পুরুষ নিজে কর্ম করেন সেইরূপ কালের মধ্যে কর্ম করিয়াও শাশ্বতের মধ্যে বাস করে, প্রকৃতিতে সম্পাদিত কর্মের রূপ ও গতি যাহাই হউক, সে হয় মুক্ত, সিদ্ধ, আনন্দময়।

মুক্তপুরুষ কৃৎস্নবিদ্, তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ ও সমগ্র, এবং তিনি কৃৎস্নকৃৎ, মনের সৃষ্ট বাধা-সকল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরস্থিত ভাগবত ইচ্ছার তেজ, স্বাতন্ত্র্য ও অনন্ত শক্তিতে তিনি সকল কর্ম সম্পাদন করেন। আর যেহেতু তিনি শাশ্বত পুরুষের সহিত যুক্ত, তাঁহার শাশ্বত সত্তার শুদ্ধ অধ্যাত্ম ও অপরিমেয় আনন্দও তাঁহার আছে। যে পুরুষের তিনি অংশ, যিনি তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর এবং তাঁহার অন্তরাত্মা ও প্রকৃতির দিব্য প্রেমাস্পদ তাঁহাকে তিনি ভজনা করেন। তিনি শুধু নির্বিকার শান্ত দ্রষ্টা মাত্র নহেন, শাশ্বত পুরুষের দিকে তিনি শুধু তাঁহার জ্ঞান ও সংকল্পকেই উন্নীত করেন না, তাঁহার প্রেম ও ভক্তি ও আবেগপূর্ণ হৃদয়কেও তদভিমুখী করেন। কারণ হৃদয়ের ঐ উন্নয়ন না হইলে তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি সিদ্ধ ও ভগবানের সহিত যুক্ত হয় না; আত্মার শান্তির উল্লাসকে অন্তঃপুরুষের আনন্দোল্লাসের দ্বারা রূপান্তরিত করা আবশ্যক। ব্যক্তিরূপী জীবের ঊর্ধ্বে এবং নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বা আত্মার ঊর্ধ্বে তিনি বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমে উপনীত হন, সেই পুরুষোত্তম আপন নির্ব্যক্তিকতায় অক্ষর এবং ব্যক্তিকতার মধ্যে নিজেকে প্রকট

করেন এবং এই দুই বিভিন্ন দিক দিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন। মুক্ত সাধক ব্যক্তিকভাবে সেই উচ্চতম পরমপদে উঠেন ভগবানে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রেম ও প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার কর্মের অধীশ্বরের প্রতি তাঁহার অন্তরস্থিত সংকল্পের ভজনা দ্বারা; এই সর্বোত্তম ও সর্বময় ভাগবত পুরুষের স্ব-প্রতিষ্ঠ, পূর্ণ, নিগূঢ় সত্তায় তাঁহার যে আনন্দ তাহার দ্বারাই তাঁহার নির্ব্যক্তিক বিশ্বাত্মক-জ্ঞানের শান্তি ও প্রসারতা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই আনন্দ তাঁহার জ্ঞানকে গৌরবময় করিয়া তোলে এবং পরমাত্মার যে নিজ সত্তায় এবং তাহার অভিব্যক্তিতে চিরন্তন আনন্দ তাহার সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া দেয়; ইহা তাঁহার ব্যক্তিরূপকেও ভাগবত পুরুষের অতিব্যক্তি-কতার মধ্যে সংসিদ্ধ করিয়া তোলে এবং তাঁহার প্রাকৃত সত্তাকে ও কর্মকে এক করিয়া দেয়।

কিন্তু এই সব পরিবর্তনের অর্থ হইতেছে নীচের মানবীয় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বের ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। ইহা হইতেছে আমাদের সমগ্র সত্তাকে, অন্তত আমাদের যে মানস সত্তা সংকল্প করে, জ্ঞানার্জন করে, অনুভব করে, সেইটিকে আমরা যাহা আছি তাহার ঊর্ধ্বে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে, এক তুষ্টিপ্রদ পূর্ণতম অধ্যাত্ম-শক্তির মধ্যে, এক গভীর-তম উদারতম অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে সমগ্রভাবে উন্নীত করা। আর আমাদের বর্তমান প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ইহা বেশই সম্ভব, পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে কোন স্বর্লোকে কিংবা তাহাকে ছাড়াইয়াও কোন বিশ্বাতীত লোকোত্তর চৈতন্যে ইহা বেশই সম্ভব; ভগবানের কৈবল্যাত্মক এবং অনন্ত শক্তি ও স্থিতিতে উপনীত হইয়া ইহা সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এখানে এই শরীরে, এই প্রাণে, এই কর্মে রহিয়াছি, এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইলে আমাদের নীচের প্রকৃতির কি গতি হইবে? কারণ বর্তমানে আমাদের যাবতীয় কর্ম তাহাদের রূপে ও গতিতে প্রকৃতির দ্বারাই নিরূপিত হয়, আর এখানে এই প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, এবং সকল প্রাকৃত জীবে ও সকল প্রাকৃত কর্মেই রহিয়াছে গুণত্রয়,—অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি-সহ তমোগুণ, প্রবৃত্তি ও কর্ম সহ রজোগুণ, তাহার রিপু-তাড়না ও শোক ও বিকৃতি, জ্যোতি এবং সুখ সহ সত্ত্বগুণ, এবং এই সকল জিনিসের বন্ধন। আর যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে, জীব আত্মায় গুণত্রয়ের অতীত হইল, তথাপি তাহার যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতিতে কেমন করিয়া সে গুণত্রয়ের কর্ম ও ফল ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে? কারণ গীতা বলিয়াছে যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতে হয়। বাহ্য অভিব্যক্তিতে গুণত্রয়ের প্রতিক্রিয়া অনুভব করা ও সহ্য করা, কিন্তু পশ্চাতে সাক্ষিস্বরূপ চেতন সত্তায় সে-সব হইতে মুক্ত এবং তাহাদের অতীত থাকা—ইহাই যথেষ্ট নহে; কারণ ইহাতে মুক্তি ও

বন্ধনের দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়, আমরা ভিতরে যাহা এবং বাহিরে যাহা উভয়ের মধ্যে, আমাদের আত্মা এবং আমাদের শক্তি, আমর নিজেদিগকে যেরূপ জানি এবং আমরা যে সংকল্প করি, কর্ম করি—ইহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিয়া যায়। এখানে মুক্তি কোথায়, ঊর্ধ্বের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পূর্ণ উন্নয়ন ও রূপান্তর কোথায়, অমৃত ধর্ম, এক দিব্য সত্তার অনন্ত নির্মলতা ও শক্তির স্বকীয় ধর্ম কোথায়? শরীর ত্যাগের পূর্বেই যদি এই পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহা হইলে বলিতেই হয় যে, সমগ্র প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে, এবং যতক্ষণ না এই মৃত্যুধর্মী জীবন পরিত্যক্ত নির্মোকের ন্যায় আত্মা হইতে খসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ এক অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে কর্মযোগের শিক্ষা সংগত হইতে পারে না, অন্তত ঐটিই চরম তত্ত্ব হইতে পারে না। পূর্ণ নিস্পন্দতা, অন্তত যতটা পূর্ণ হওয়া সম্ভব সেইরূপ নিস্পন্দতা, ক্রমবর্ধমান সন্ন্যাস এবং কর্মত্যাগ, ইহাই হইবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—বস্তুত মায়াবাদীরা এইরূপ যুক্তিই দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, যতক্ষণ আমরা কর্মের মধ্যে রহিয়াছি ততক্ষণ গীতার পন্থা যে ঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি কর্ম হইতেছে মায়া এবং নৈষ্কর্ম্যই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভাব লইয়া কর্ম করা ভাল, কিন্তু ইহ. হইবে কর্মত্যাগের বিরতিতে, সম্পূর্ণ নিস্পন্দতায় পোঁছিবার পন্থা মাত্র।

গীতাকে এখনও এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে, তবেই অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে কর্মের উপযোগিতা সাব্যস্ত হইবে। নতুবা অর্জুনের জন্য এই উপদেশ দিতে হইবে, "উপস্থিত এই ভাবেই কর্ম কর, কিন্তু পরে কর্মত্যাগের উচ্চতর পন্থা অনুসরণ করিও।" কিন্তু তাহা না করিয়া গীতা বলিয়াছে, কর্মের বিরতি নহে, বাসনা ত্যাগই শ্রেষ্ঠতর পন্থা; গীতা মুক্ত পুরুষের কর্মের কথা বলিয়াছে, মুক্তস্য কর্ম। এমন কি গীতা সকল প্রকার কর্ম করিবার উপরেই জোর দিয়াছে, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, কৃৎস্নকৃৎ; বলিয়াছে, সিদ্ধযোগী যেভাবেই থাকুন বা যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন ও কর্ম করেন, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ইহা কেবল তখনই হইতে পারে যখন প্রকৃতি তাহার গতিশক্তি ও কর্মেও ভাগবত হইয়া উঠে, এক অবিচল, অস্পৃষ্ট, অবিকার্য, শুদ্ধ এবং নীচের প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া-সকলে অক্ষুব্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। এই দুরূহতম রূপান্তর সাধিত হইবে কিরূপে, কোন ক্রম অনুসরণে? জীবাত্মার পূর্ণ সিদ্ধিলাভের শেষ রহস্যটি কি? আমাদের এই মানবীয় পার্থিব প্রকৃতির এই দিব্য রূপান্তর সাধনের তত্ত্ব ও প্রণালীটি কি?

সপ্তদশ অধ্যায়

দেব ও অসুর

গুণত্রয়ের নিগড়িত বিঘ্নসঙ্কুল ক্রিয়া হইতে গুণত্রয়ের অতীত মুক্ত পুরুষের অনন্ত কর্মে কেমন করিয়া পৌঁছান যাইতে পারে, এই প্রশ্ন যদি আমরা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে, মানুষের অজ্ঞান ও বন্ধনময় সাধারণ প্রকৃতিকে এক ভাগবত ও অধ্যাত্ম সত্তার শক্তিপূর্ণ মুক্তিতে পরিবর্তিত করা কার্যত কত দুরূহ। এই পরিবর্তন অবশ্য-প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাহাকে গুণত্রয়েব ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত অথবা গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ। অন্য পক্ষে ইহাও সমান স্পষ্টতার সহিত, জোরের সহিত বলা হইয়াছে যে, এখানে পৃথিবীতে প্রত্যেক সত্তাতেই প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকিয়া কর্ম করিতেছে,—এমন পর্যন্তও বলা হইয়াছে যে, মানব বা প্রাণী বা শক্তির সকল কর্ম এই তিন গুণেব পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কোন একটি গুণ প্রবল হইতেছে, অন্য দুই গুণ তাহার ক্রিয়া ও ফলকে প্রভাবিত করিতেছে, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে। তাহা হইলে আবার আর একটি শক্তিময় গতিময় প্রকৃতি, আর এক প্রকার কর্ম কেমন করিয়া থাকিবে ? কর্ম করার অর্থই হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীন হওয়া; কর্মের এই বিধানের অতীত হওয়ার অর্থ হইতেছে আত্মার মধ্যে নীরব যাওয়া। অবশ্য ঈশ্বর, পরম পুরুষ, যিনি প্রকৃতির সকল কর্ম ও প্রক্রিয়ার অধীশ্বর এবং তাঁহার ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা সে সবকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি এই যন্ত্রবৎ গুণ-ক্রিয়ার অতীত, প্রকৃতির গুণসকল তাঁহাকে স্পর্শ করে না বা সীমাবদ্ধ করে না; তথাপি মনে হয় তিনি সর্বদা তাহাদের ভিতর দিয়াই কর্ম করেন, সর্বদাই স্বভাবের শক্তি দ্বারা এবং গুণক্রিয়াময় অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া গঠন করেন। এই তিনটি হইতেছে প্রকৃতির মৌলিক ধর্ম যে কার্যনির্বাহিকা প্রাকৃত শক্তি এখানে আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া; এবং জীব নিজে এই প্রকৃতিতে ভগবানের অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব মুক্তিলাভের পরও যদি মানুষ কর্ম করে, সক্রিয় অবস্থায় বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া এবং গুণসকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া এই কর্ম করিতে হইবে, এইরূপ বিচরণ করিতে হইবে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার অধীন হইতে

হইবে, পরন্তু তাহার মধ্যে প্রাকৃত অংশ যতটুকু থাকিয়া যাইবে ততটুকু সে ভাগবত মুক্তির মধ্যে কর্ম করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু গীতা বলিয়াছে ইহার ঠিক বিপরীত, বলিয়াছে যে, মুক্ত যোগী গুণসকলের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত হন এবং তিনি যাহাই করুন, এবং যে-ভাবেই থাকুন, তিনি বিচরণ করেন, কর্ম করেন, ভগবানেরই মধ্যে, তাঁহারই মুক্তি ও অমৃতত্বের শক্তিতে, পরম শাশ্বত অনন্তের ধর্মে, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। এখানে একটি বিরোধ, একটি অসমাধেয় সমস্যা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এইরূপ হয় তখনই যখন আমরা বিশ্লেষণপর মনের বিপরীত সিদ্ধান্ত সকলের মধ্যে নিজেদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি, আত্মার দিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত অধ্যাত্ম সত্তার দিকে মুক্ত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখি না। বস্তুত প্রকৃতির গুণসকলই এই জগৎকে চালিত করিতেছে না, ইহারা কেবল নিম্নতন প্রকাশ, আমাদের সাধারণ প্রকৃতির কর্ম-যন্ত্র। প্রকৃত পরিচালক শক্তি হইতেছে এক ভাগবত অধ্যাত্ম ইচ্ছা, তাহা বর্তমানে এই অধঃস্তন বিধানগুলি ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু নিজে মানবীয় ইচ্ছার ন্যায় গুণসকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, প্রভাবিত বা যন্ত্ররূপে পরিণত হয় না। অবশ্য যখন এই গুণসকল তাহাদের ক্রিয়ায় এইরূপ বিশ্বব্যাপী, তখন তাহারা যে আত্মার শক্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ নিম্নতন সাধারণ প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিসই পুরুষোত্তমের সত্তার ঊর্ধ্বতন অধ্যাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত, মত্তঃ প্রবর্ততে; তাহা অধ্যাত্ম কারণহীন বা নবোদ্ভূত কিছু নহে। আত্মার মূল শক্তির মধ্যে এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই আছে যাহা হইতে আমাদের প্রকৃতির সাত্ত্বিক জ্যোতি ও তৃপ্তি, রাজসিক প্রবৃত্তি এবং তামসিক জাড্য উদ্ভূত হইয়াছে, এ-সব হইতেছে তাহারই অপূর্ণ এবং বিকৃত রূপ। কিন্তু আমরা এই যে তাহার অপূর্ণতা ও বিকৃতির মধ্যে বাস করিতেছি, যখন আমরা ইহার ঊর্ধ্বে ঐ সকল মূল উৎসের শুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা আত্মার মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিবামাত্রই এই সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। সত্তা ও কর্ম এবং সত্তা ও কর্মের বৃত্তিগুলি তাহাদের বর্তমান সীমাবদ্ধ রূপের বহু ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে।

কারণ সংঘর্ষময় ও দ্বন্দ্বময় বিশ্বের এই বিক্ষুব্ধ কর্মধারার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? সেই বস্তুটি কি যাহা মনকে স্পর্শ করিলে, মানস সত্তায় প্রকট হইলে, বাসনা, চেষ্টা, কষ্টকর প্রয়াস, ভ্রান্ত সংকল্প, দুঃখ, পাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাহা হইতেছে গতিতে প্রবৃত্ত আত্মার সংকল্প, তাহা হইতেছে কর্মে প্রবৃত্ত এক উদার ভাগবত ইচ্ছা, এই সব জিনিস তাহাকে স্পর্শ করে না; তাহা হইতেছে মুক্ত ও অনন্ত চৈতন্যময় ভগবানের তপঃ, চিৎশক্তি,

তাহার বাসনা নাই কারণ তাহার অধিকার হইতেছে বিশ্বব্যাপী, তাহা আপন গতিতে আপনি আনন্দময়। তাহা কষ্টকর প্রয়াস ও উৎকট শ্রমের দ্বারা ক্লান্ত হয় না, পরন্তু নিজের লক্ষ্য ও উপায়ের উপর তাহার অবাধ প্রভুত্ব; তাহা সংকল্পের কোন ভ্রান্তির দ্বারা বিপথগ্রস্ত হয় না, পরন্তু আত্মা ও বস্তু-সকল সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তাহার প্রভুত্ব ও আনন্দের উৎস; তাহা কোন দুঃখ, পাপ বা বেদনা দ্বারা অভিভূত হয় না, পরন্তু তাহার আছে নিজ সত্তার সুখ ও নির্মলতা এবং নিজ শক্তির সুখ ও নির্মলতা। যে জীব ভগবানের মধ্যে বাস করে সে অধ্যাত্ম সংকল্প লইয়া কর্ম করে, অমুক্ত মনেব সাধারণ সংকল্প লইয়া নহে; তাহার কর্মপ্রবৃত্তি সংঘটিত হয় এই অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা, প্রকৃতির রজোগুণের দ্বারা নহে এবং তাহার হেতু ঠিক এই যে, যেখানে ঐ বিকৃতি আছে সেই নিম্নতন ক্রিয়ার মধ্যে আর সে বাস করে না, পরন্তু দিব্যপ্রকৃতির মধ্যে প্রবৃত্তির যে শুদ্ধ ও সিদ্ধ স্বরূপ তাহাতে সে ফিরিয়া গিয়াছে।

আবার এই যে প্রকৃতির জাড্য, এই তমঃ, যাহার মাত্রা পূর্ণ হইলে প্রকৃতির কর্মকে যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়ার ন্যায় করিয়া তোলে, তাহা হয় যন্ত্রবৎ প্রেরণা, যে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে ঘুরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া সে আব কিছুই দেখিতে পায় না, এমন কি সেই গতির নিয়মটি সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না—এই তমঃ যাহা অভ্যস্ত কর্মের বিরতিকে মৃত্যু ও ধ্বংসে পরিণত করে এবং মনের মধ্যে অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের শক্তি হইয়া দাঁড়ায়, ইহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? এই তমঃ হইতেছে একটা মোহ, বলিতে পাবা যায় যে তাহা আত্মার শান্তি ও স্থিরতার চিরন্তন তত্ত্বকে শক্তির অপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানের অপ্রবৃত্তি রূপে বিকৃত করিয়া প্রকট করে—ভগবান সে শান্তি কখনও হারান না, এমন কি কর্ম করিবার সময়েও নহে, সেই শাশ্বত শান্তি তাঁহার জ্ঞানেব সমগ্র কর্মকে এবং তাঁহার সৃজনাত্মক সংকল্পের শক্তিকে যেমন ঊর্ধ্বে তাঁহার নিজেব যাবতীয় আনন্ত্যের মধ্যে তেমনই এখানে তাঁহার কর্ম ও আত্মচেতনার আপাত-দৃশ্য অপূর্ণতার মধ্যেও ধারণ করিয়া থাকে। ভগবানের যে শান্তি তাহা শক্তির ধ্বংস নহে অথবা শূন্যগর্ভ জড়তা নহে; যদি ভাগবত শক্তি কিছুকালের জন্য সর্বত্র সক্রিয়ভাবে জানিতে ও সৃষ্টি করিতে বিরত হয় তাহা হইলেও সেই শান্তি অনন্ত পুরুষ যাহা কিছু জানিয়াছেন বা করিয়াছেন সেসবকে এক সর্বশক্তিময় নীরবতার মধ্যে সংগৃহীত ও নিবিড় চৈতন্যময় করিয়া রাখে। শাশ্বত পুরুষের নিদ্রা বা বিশ্রামের প্রয়োজন নাই; তিনি ক্লান্ত বা অবসন্ন হন না, তাঁহার নিঃশেষিত শক্তিসকলকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্গঠিত করিবার জন্য তাঁহার বিরতি আবশ্যক হয় না; কারণ তাঁহার শক্তি চিরকাল একই ভাবে অফুরন্ত, অপরিশ্রান্ত, অনন্ত। ভগবান তাঁহার কর্মের মধ্যেও শান্ত এবং

সুস্থির; অন্য পক্ষে তাঁহার কর্ম-বিরতির মধ্যেও তাঁহার সক্রিয়তার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সকল সম্ভাবনীয়তা বর্তমান থাকে। মুক্ত পুরুষ এই শান্তির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আত্মার এই চির বিশ্রান্তির অংশভাগী হন। মুক্তির আনন্দের কোনরূপ আস্বাদন যিনি পাইয়াছেন, তিনিই জানেন যে, ইহার মধ্যে শান্তিরই এক চিরন্তন শক্তি নিহিত আছে। আর সেই গভীর প্রশান্তি কর্মের মর্মস্থলেও থাকিতে পারে, শক্তিসকলের প্রচণ্ডতম গতির মধ্যেও অব্যাহত থাকিতে পারে। চিন্তা, কর্ম, সংকল্প, গতির প্রবল বন্যা, প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগ, স্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম আনন্দের তীব্রতম উল্লাস থাকিতে পারে এবং সেই উল্লাস প্রসারিত হইয়া প্রকৃতির ধারায় জগতের বস্তু ও সত্তা-সকলের দীপ্ত ও শক্তিময় অধ্যাত্ম উপভোগে ব্যাপ্ত হইতে পারে, অথচ এই প্রশান্তি ও স্থিরতা ঐ আবেগের পশ্চাতে এবং উহার মধ্যে থাকিবে, নিজ গভীরতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে, সর্বদা একই থাকিবে। মুক্ত ব্যক্তির যে স্থিরতা তাহা আলস্য, অক্ষমতা, অসাড়তা, জাড্য নহে; ইহা অমর শক্তিতে পূর্ণ, সকল কর্মে সক্ষম, গভীরতম আনন্দের সহিত এক সুরে বাঁধা, পূর্ণতম প্রেম ও করুণা এবং সকল প্রকার তীব্রতম আনন্দের দিকে উন্মুক্ত।

প্রকৃতির যে শুদ্ধতম গুণ, সত্ত্বগুণ, যে-শক্তি স্বায়ত্তীকরণ ও সামঞ্জস্য সাধনের দিকে, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ব্যবহারের দিকে সুষ্ঠু সুসংগতি, দৃঢ় সাম্য, যথার্থ কর্ম-নীতি ও যথার্থ পরিগ্রহের দিকে অগ্রসর হয় এবং মনে এই-রূপ পূর্ণ পরিতৃপ্তি আনয়ন করে, এই সত্ত্বগুণের নিম্নতন জ্যোতি ও প্রসন্নতার ঊর্ধ্বে, সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে এই যে উচ্চতম বস্তু, যাহা আপনার গণ্ডীতে এবং স্থিতিকালে খুবই সুন্দর কিন্তু অনিশ্চিত, সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, বিধি ও বিধান সাপেক্ষ,—ইহার ঊর্ধ্বে ইহার উচ্চ ও সুদূর উৎসে রহিয়াছে এক মহত্তর জ্যোতি ও আনন্দ, তাহা মুক্ত আত্মার মধ্যে মুক্ত। তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন সীমা, বিধি বা বিধানের উপর নির্ভর করে না পরন্তু আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয়, আমাদের প্রকৃতির বিরোধসকলের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সুসংগতির ফল নহে, পরন্তু তাহা নিজেই সুসংগতির উৎস এবং ইচ্ছামত যে-কোন সুসংগতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাহা হইতেছে জ্যোতি—জ্ঞানের ভাস্বর অধ্যাত্মশক্তি এবং নিজস্ব ক্রিয়ায় তাহা জ্ঞানের সাক্ষাৎ অতিমানস শক্তি, তাহা আমাদের বিকৃত ও পরোক্ষ মানস জ্ঞান বা প্রকাশ নহে। তাহা হইতেছে প্রশস্ততম আত্ম-সত্তার জ্যোতি ও সুখ, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মজ্ঞান, অন্তরঙ্গ বিশ্বগত তাদাত্ম্য, গভীরতম আত্ম-বিনিময়, তাহা অর্জন, সায়ত্তীকরণ, সামঞ্জস্যসাধন বা কষ্টসাধ্য সাম্যস্থাপনের বস্তু নহে। সেই জ্যোতি এক ভাস্বর অধ্যাত্ম সঙ্কল্পে পূর্ণ এবং তাহার জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোন ব্যবধান বা অসামঞ্জস্য নাই। সেই আনন্দ আমাদের মলিনতর মানসিক সুখ নহে, পরন্তু

তাহা হইতেছে এক গভীর ঘনীভূত তীব্র স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, আমাদের সত্তা যাহা অনুষ্ঠান করে, যাহা অবধারণ করে এবং যাহা সৃষ্টি করে সে-সবে পরিব্যাপ্ত, তাহা এক স্থায়ী দিব্য উল্লাস। মুক্ত পুরুষ গভীর হইতে গভীরতর ভাবে এই জ্যোতি ও আনন্দের অংশ গ্রহণ করেন, এবং তিনি যতই নিজেকে সমগ্রভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত করেন ততই পূর্ণতর ভাবে ইহাতে বিকশিত হইয়া উঠেন। আবার নীচের প্রকৃতির গুণ-সকলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে রহিয়াছে একটা অসাম্যাবস্থা, মাত্রার পরিবর্তনশীল অনবস্থিততা এবং প্রাধান্যের জন্য অবিরত দ্বন্দ্ব, অন্যপক্ষে আত্মার যে মহত্তর জ্যোতি ও আনন্দ, স্থিরতা এবং প্রবৃত্তিমূলক সংকল্প তাহারা পরস্পরকে বর্জন করে না, দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না এমন কি কেবল মাত্র সাম্যাবস্থাতেই থাকে না, পরন্তু প্রত্যেকটিই হইতেছে অপর দুইটির একটি রূপ এবং তাহাদের পূর্ণ অবস্থায় তাহারা সকলে হইতেছে অবিচ্ছেদ্য এবং এক। আমাদের মন যখন ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় তখন হয়ত একটিকে বর্জন করিয়া আর একটিতে প্রবেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, হয়ত কর্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এরূপ যে হয় তাহার কারণ মনের মধ্যে নির্বাচন করিবার যে ভাব রহিয়াছে আমরা প্রথমে সেইটিকে ধরিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই। পরে যখন আমরা অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন মনেরও উপরে উঠিতে সক্ষম হই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক দিব্য শক্তিটির মধ্যেই বাকী সবগুলি নিহিত রহিয়াছে এবং প্রথম অবস্থার এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি। *

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতির গুণসকলের সাধারণ অপকৃষ্ট ক্রিয়ার অধীন না হইয়াও কর্ম করা সম্ভব; যে মন প্রাণ দেহে আমরা গঠিত তাহাদের অপূর্ণতার উপরেই ঐ ক্রিয়া নির্ভর করে; ইহা হইতেছে একটা বিকৃতি, একটা অক্ষমতা. একটা ভ্রষ্ট ও মন্দীভূত অবস্থা, জড়াশ্রয়ী মন ও প্রাণ এইটিকেই আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। যখন আমরা অধ্যাত্ম সত্তায় বিকশিত হই, তখন প্রকৃতির এই ধর্ম বা নিম্নতন ধারার পরিবর্তে আসে আত্মার অমৃত ধর্ম; সেখানে উপলব্ধ হয় এক মুক্ত অমৃতময় ক্রিয়া, এক অপরিসীম জ্ঞান, এক লোকোত্তর শক্তি, এক অতলস্পর্শ শান্তি। তথাপি কেমন

* উর্ধ্বতম প্রকৃতির ক্রিয়াব যে-সব পবম অধ্যাত্ম ও অতিমানস রূপ নীচেব প্রকৃতির গুণ-সকলের অনুরূপ তাহাদেব যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল তাহা গীতা হইতে গৃহীত নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম অনুভূতি হইতেই লওয়া হইয়াছে। উর্ধ্বতম প্রকৃতির যে ক্রিয়া, উত্তমম্ রহস্যম, গীতা তাহার কোন বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নাই; সাধককে তাহার নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারাই তাহা আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যে উচ্চ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ক্রিয়ার ভিতর দিয়া পরম রহস্যে পৌঁছিতে হইবে, গীতা শুধু তাহার স্বরূপটি নির্দেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গেই সত্ত্বকে অতিক্রম করিবার এবং গুণত্রয়ের অতীত হইবার উপরে জোর দিয়াছে।

করিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হইবে সে-প্রশ্নটি থাকিয়া যায়; কারণ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা এবং ক্রমে-ক্রমে পরিবর্তন অপরিহার্য; কেননা জগতে ভগবানের কার্যপরম্পরায় কোন জিনিসই একটা পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠা ব্যতীত হঠাৎ সম্পন্ন হয় না। আমরা যে-জিনিসটি খুঁজিতেছি সেটি আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু কার্যত আমাদের পক্ষে সেইটিকে আমাদের প্রকৃতির নীচের রূপসকল হইতে বিকাশ করিয়া লইতে হইবে।‡ অতএব গুণ-সকলের ক্রিয়ার মধ্যেই এমন কোন উপায় থাকা আবশ্যক, এমন কোন সুবিধাজনক যন্ত্র, যাহা দ্বারা আমরা এই পরিবর্তন সাধন করিতে পারি। গীতা এই উপায় পাইয়াছে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশে, সত্ত্বগুণ শক্তিময় আত্ম-বিস্তারের দ্বারা এমন স্থলে উপনীত হয় যখন সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজের উৎসে বিলীন হইতে পারে। ইহার কারণ স্পষ্ট, কেননা সত্ত্ব হইতেছে জ্যোতি ও প্রসন্নতার শক্তি, এই শক্তি স্থিরতা ও জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, এবং তাহার উচ্চতম শিখরে, সে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই অধ্যাত্ম জ্যোতি ও আনন্দকে কতকটা প্রতিফলিত করিতে পারে, প্রায় তাহার সহিত মানস ঐক্য লাভ করিতে পারে। অন্য দুইটি গুণ এই রূপান্তর লাভ করিতে পারে না, রজঃ দিব্য সংকল্পের প্রবৃত্তিতে এবং তমঃ দিব্য স্থিরতা ও শান্তিতে পরিণত হইতে পারে না যদি প্রকৃতিতে যে সাত্ত্বিক শক্তি রহিয়াছে তাহার সাহায্য না পাওয়া যায়। জাড্যের তত্ত্বটি চিরকালই শক্তির জড় নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের অক্ষমতা হইয়া থাকিবে যতক্ষণ না জ্যোতির মধ্যে তাহার অজ্ঞান লয় পাইতেছে এবং তাহার অসাড় অক্ষমতা শান্তিময় সর্বশক্তিমান ভাগবত সংকল্পের দীপ্তি ও শক্তির মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। কেবল তাহা হইলেই আমরা পরম শান্তি পাইতে পারি। অতএব তমঃকে সত্ত্বের দ্বারা অনুশাসিত হইতে হইবে। ঐ একই কারণে রজঃ-গুণ চিরকালই থাকিবে অস্থির বিক্ষুব্ধ উগ্র বা দুঃখময় ক্রিয়া কারণ ইহার যথার্থ জ্ঞান নাই; ইহার স্বাভাবিক গতিটি হইতেছে ভ্রান্ত ও বিকৃত ক্রিয়া, অজ্ঞানের দ্বারা বিকৃত। অতএব আমাদের সংকল্পকে জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইবে, ইহাকে ক্রমশ বেশী-বেশী যথার্থ ও জ্ঞানদীপ্ত ক্রিয়ায় পরিণত হইতে হইবে, তবেই ইহা সক্রিয় ভাগবত সংকল্পে রূপান্তরিত হইতে পারিবে। ইহারও অর্থ হইতেছে এই যে, সত্ত্বের সাহায্য প্রয়োজন। সত্ত্বগুণই হইতেছে ঊর্ধ্বের প্রকৃতির ও নিম্নের প্রকৃতির মধ্যে প্রথম যোগসূত্র। অবশ্য ইহাকে এক স্থানে

‡ আমাদের প্রকৃতি যে আত্মজয়, প্রয়াস ও সংযমের দ্বারা ঊর্ধ্বদিকে উঠে, সেইদিক হইতে বিবেচনা করিয়াই এ-কথা বলা হইল। ইহা ছাড়াও সত্তাকে রূপান্তরিত করিবার জন্য তাহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, প্রতিষ্ঠা ও শক্তির ক্রমশ বেশী অবতরণ আবশ্যক হয়, নতুবা সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়া এবং তাহার ঊর্ধ্বে রূপান্তরটি সংসাধিত হইতে পারে না। সেইজন্যই রহিয়াছে শেষ ক্রিয়াস্বরূপ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আবশ্যকতা।

গিয়া রূপান্তরিত হইতে হইবে অথবা নিজেকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং ভাঙিগয়া গিয়া নিজের উৎসের মধ্যে বিলীন হইতে হইবে; ইহার আপেক্ষিক, পরোক্ষ, অনুসন্ধানপরায়ণ জ্ঞানকে এবং যত্ন সহকারে বিরচিত কর্মকে আত্মার মুক্ত সাক্ষাৎ কর্মশক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিতে পরিণত হইতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সত্ত্বশক্তির সমুচ্চ বৃদ্ধি আমাদিগকে তামসিক ও রাজসিক অযোগ্যতা হইতে উদ্ধার করে; আর ইহার নিজের যে অযোগ্যতা তাহা অধিকতর সহজে অতিক্রম করা যায় যদি আমরা রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অত্যধিক ভাবে নীচের দিকে আকর্ষিত না হই। সত্ত্বকে এমন ভাবে বিকাশ করা যাহাতে তাহা অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শান্তি ও প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহাই হইতেছে প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিবার সাধনায় প্রথম বিধান।

আমরা দেখিব যে, এইটিই গীতার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কিন্তু এই দীপ্তিময় ক্রিয়াটি বিবেচনা করিবার পূর্বে গীতা উপক্রমণিকা স্বরূপ দেব ও অসুর এই দুই প্রকার সত্তার প্রভেদ করিতেছে; কারণ দেব মহান আত্মরূপান্তর-সাধক সাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সমর্থ, অসুর অসমর্থ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য কি এবং এই প্রভেদের যথার্থ উপযোগিতা কি। সকল মানুষেরই সাধারণ প্রকৃতি এক, ইহা গুণ-ত্রয়ের মিশ্রণ; ইহা হইতেই মনে হয় যে, সাত্ত্বিক অংশটিকে বিকশিত ও সুদৃঢ় করিবার এবং ইহাকে ঊর্ধ্বে দিব্য রূপান্তরের শিখরের দিকে উন্নীত করিবার সামর্থ্য সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে আমাদের রাজসিক ও তামসিক অহমিকার অনুবর্তী করা, আমাদের অস্থির ও অব্যস্থিত কর্মৈষণা বা আত্মবিলাসী আলস্য বা নিষ্ক্রিয় জাড্যের অনুবর্তী করা— ইহাকে কেবল আমাদের অপরিণত অধ্যাত্ম সত্তার একটা সাময়িক লক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, ইহা আমাদের অসম্পূর্ণ বিকাশের অপরিপক্বতা যখন আমাদের চৈতন্য অধ্যাত্ম ক্রমবিকাশে ঊর্ধ্বে উঠিবে তখন ইহা থাকিতে পারে না। কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাই যে মানুষ, অন্তত একটা বিশেষ স্তরের উপরে মানুষ, প্রধানত দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে :—যাহাদের আছে জ্ঞান, আত্ম-সংযম, পরহিতৈষণা, পরিপূর্ণতার দিকে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, আর যাহাদের মধ্যে আছে রাজসিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, তাহারা চায় অহংমন্য প্রতিষ্ঠা, ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি, নিজেদের প্রবল ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের চরিতার্থতা, তাহা তাহারা মানুষের বা ভগবানের সেবার জন্য নহে পরন্তু নিজেদেরই গর্ব, যশ ও সুখের জন্য জগতের উপর আরোপ করিতে চায়। ইহারা হইতেছে মানুষের মধ্যে দেবতা ও দানব বা অসুরের প্রতিনিধি। ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতীকতন্ত্রে এই প্রভেদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের মূলগত পরিকল্পনা হইতেছে দেবগণ এবং তাঁহাদের তমোময় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে

যুদ্ধ, একদিকে সব জ্যোতির অধিপতি অনন্তের সন্তান, অন্যদিকে ভেদ ও রাত্রির সন্তান-সকল, এই যুদ্ধে মানবও যোগদান করে এবং তাহা তাহার সকল আভ্যন্তরীণ জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। জোরোস্টারের ধর্মেও এইটিই ছিল মূল নীতি। পরবর্তী সাহিত্যে ঐ একই পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। নৈতিক অর্থের দিক দিয়া রামায়ণ হইতেছে নররূপী দেব এবং মূর্তিমান রাক্ষসের মধ্যে, ধর্ম ও উচ্চসংস্কৃতির প্রতিনিধি এবং অতিবর্ধিত অহমিকার উচ্ছৃংখল শক্তি ও দানবীয় সভ্যতার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্বের রূপকাত্মক কাহিনী। গীতা যে মহাভারতের অংশ, সেই মহাভারতের বিষয়বস্তু হইতেছে নররূপী দেব ও অসুরগণের মধ্যে আজীবন দ্বন্দ্ব, এক পক্ষে শক্তিমান পুরুষগণ, তাঁহারা দেবতার সন্তান, তাঁহারা এক উচ্চ নৈতিক ধর্মের জ্যোতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্য পক্ষে মূর্তিমান দানবগণ, এই সব শক্তিমান পুরুষ মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক অহমিকার সেবা করিতে অগ্রসর। প্রাচীন মানবের মন জড়-আবরণের পশ্চাতে বস্তু-সকলের সত্য দর্শন করিতে আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্মুক্ত ছিল, তাহা মানব-জীবনের পশ্চাতে অসামান্য জাগতিক শক্তি-সকলের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারা বিশ্বময়ী মহাশক্তির বিশিষ্ট ভাব বা ক্রমের প্রতিভূ দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ; আর যে-সকল মনুষ্যের মধ্যে ইহাদের গুণ বিশেষ ভাবে দেখা যাইত তাহাদিগকেও দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ বলিয়া অভিহিত করা হইত। গীতা নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে এই প্রভেদটি গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দুই প্রকারের সত্তার মধ্যে, দ্বৌ ভূতসর্গৌ, পার্থক্যটি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছে। গীতা ইতিপূর্বেই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির কথা বলিয়াছে, তাহা ভগবদ্‌জ্ঞান, মুক্তি ও সিদ্ধির পরিপন্থী; যে দৈবী প্রকৃতি এই সবের অভিমুখী, গীতা এখন তাহার পার্থক্য দেখাইতেছে।

গুরু বলিলেন যে, অর্জুন হইতেছেন দৈবী প্রকৃতির, যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করিলে তিনি আসুরিক প্রেরণার অধীন হইয়া পড়িবেন এইরূপ আশংকায় তাঁহার শোক করিবার কারণ নাই, মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব! যে কর্মটির উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে, কালপুরুষরূপে প্রকট জগদ্‌-প্রভুর আজ্ঞায় অর্জুনকে দেহধারী ভগবানকে সারথিরূপে লইয়া যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা হইতেছে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। তিনি নিজে দেব শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; নিজের মধ্যে তিনি সাত্ত্বিক সত্তার বিকাশ করিয়াছেন, এখন তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যেখানে তিনি এক উচ্চ রূপান্তরে সমর্থ এবং ত্রৈগুণ্য হইতে মুক্তিলাভে, অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইতেও মুক্তিলাভে সমর্থ। দেব ও অসুর এই বিভাগ সমগ্র মানবজাতিতে ব্যাপ্ত নহে, সকল ব্যক্তির পক্ষেই নির্বিশেষে প্রয়োজ্য নহে, মানবজাতির নৈতিক ও অধ্যাত্মিক বিকাশের সকল স্তরে কিংবা ব্যষ্টিসত্তার

বিকাশেরও সকল অবস্থায় এই বিভাগ খুব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে। সমগ্র জাতির অনেকখানি অংশ হইল তামসিক মনুষ্য, কিন্তু সে এখানে যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার কোনটির মধ্যেই পড়ে না, যদিও তাহার মধ্যে স্বল্প মাত্রায় উভয়েরই ধর্ম থাকিতে পারে, এবং প্রধানত সে ক্ষীণভাবে নিম্নতর গুণগুলিরই অনুবর্তন করে। সাধারণ মানুষ সচরাচর একটি মিশ্র বস্তু, কিন্তু দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটি তাহার মধ্যে অধিকতর প্রবল হয়, তাহাকে প্রধানত রজো-তামসিক কিংবা সত্ত্ব-রাজসিক করিয়া দিতে চায় এবং তাহাকে দিব্য অনাবিলতা বা আসুরিক বিক্ষুব্ধতা এই দুইটি পরিণতির কোন একটির জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, এমনও বলিতে পারা যায়। কারণ এখানে গুণাত্মিকা প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনে একটা পরিণতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এখানে গীতায় যে-সকল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা বুঝা যায়। একদিকে হইতে পারে সত্ত্বগুণের উন্নয়ন, অজাত দেবতার আবির্ভাব বা প্রকাশ, অন্যদিকে হইতে পারে প্রকৃতিস্থ জীবের মধ্যে রজোগুণের উন্নয়ন, অসুরের পূর্ণ আবির্ভাব। একটি লইয়া যায় মুক্তির সাধনার দিকে, গীতা এইটির উপরেই জোর দিতে যাইতেছে; ইহার দ্বারা সত্ত্বগুণের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করা, ভাগবত সত্তার সাধর্ম্যে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয়, বিমোক্ষায়। অপরটি সেই বিশ্বগত সম্ভাবনা হইতে দূরে লইয়া যায় এবং আমাদের অহং-বন্ধনের অতিবৃদ্ধি দ্রুততর করিয়া তোলে। এইটিই হইতেছে পার্থক্যটির মূল সূত্র।

দৈবী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে সাত্ত্বিক সংস্কার ও গুণসকলের পরাকাষ্ঠা; * আত্মসংযম, যজ্ঞ, ধর্মভাব, শুচিতা ও নির্মলতা, সারল্য ও অকপটতা, সত্য, শান্তি, আত্মত্যাগ, সর্বভূতে দয়া, নিরভিমানতা, কোমলতা, ক্ষমা, ধৈর্য, নিষ্ঠা, সকল রকম চাঞ্চল্য, লঘুতা ও অস্থিরচিত্ততা হইতে গভীর ও মধুর ও গম্ভীর মুক্তি, এই সব হইতেছে তাহার স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহার গঠনে ক্রোধ, লোভ, ধূর্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাকৃত হিংসা, দম্ভ, দর্প এবং অত্যধিক স্বাভিমানতা স্থান পায় না। কিন্তু ইহার যে কোমলতা ও আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম সে-সবও দুর্বলতা হইতে মুক্ত; ইহার আছে তেজ ও আত্মশক্তি, দৃঢ় সঙ্কল্প, ন্যায় ও সত্য অনুসারে জীবনযাপনের নির্ভয়তা এবং অহিংসা।

* অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ১৬।১-৪

সমগ্র সত্তা সমগ্র প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ; আছে জ্ঞানের সন্ধান এবং জ্ঞান-যোগে স্থির ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। যে ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাহার সম্পদ, তাহার সমৃদ্ধি।

আসুরী প্রকৃতিরও সম্পদ আছে, শক্তির সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলশালী ও অশুভ। আসুরিক মনুষ্যদের কর্মে প্রবৃত্তি বা কর্মের নিবৃত্তি সম্বন্ধে, প্রকৃতির পরিপূরণ বা প্রত্যাহার সম্বন্ধে কোন সত্য জ্ঞান নাই (১)।* তাহাদের সত্য, শৌচ, আচার কিছুই নাই। তাহারা স্বভাবত দেখে যে, জগৎ আত্মতৃপ্তির এক বিরাট খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদের যে জগৎ তাহার হেতু এবং বীজ এবং নিয়ামক শক্তি হইতেছে কামনা, তাহা অনিয়মের জগৎ, সে-জগতের কোন সংগত বিধান নাই, নির্দিষ্ট কার্যকারণ শৃংখলা নাই, সে-জগৎ ঈশ্বর-হীন, সত্যহীন, প্রতিষ্ঠাহীন (২)। তাহাদের বুদ্ধিসম্মত বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় অন্য উৎকৃষ্টতর বা উচ্চতর মতবাদ যাহাই থাকুক না কেন, কর্মক্ষেত্রে তাহাদের মন-বুদ্ধির এইটিই হয় যথার্থ নীতি; তাহারা সর্বদা কামনা ও অহংয়েরই উপাসনা করে। বাস্তব জীবনকে এই দৃষ্টিতে দেখার উপরেই তাহারা নির্ভর করে এবং এই মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা তাহারা তাহাদের আত্মা ও বুদ্ধির সর্বনাশ সাধন করে (৩)। আসুরিক মানব প্রচণ্ড, আসুরিক, ঘোর হিংসাত্মক কর্মের কেন্দ্র বা যন্ত্র হয়, জগতে ধ্বংসশক্তি-রূপে আবির্ভূত হয়, অনিষ্ট ও অশুভের উৎস হইয়া উঠে। এই সকল দম্ভ-মানমদান্বিত পথভ্রষ্ট জীব নিজদিগকে মোহগ্রস্ত করিয়া তোলে, মিথ্যা ও অন্ধ লক্ষ্য-সকলে লাগিয়া থাকে, নিজেদের কামনাতৃপ্তির অশুচি সংকল্প দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করে (৪)। কামোপভোগ ব্যতীত জীবনের যে আর অন্য কোন লক্ষ্য আছে তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না এবং দুষ্পূরণীয় কামনার অনুসরণ করিয়া তাহারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বগ্রাসী অপরিমেয় চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ও প্রয়াসের কবলিত হইয়া থাকে (৫)। শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, কাম ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া, নিজেদের ভোগ, নিজেদের লালসা তৃপ্তির জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা মনে করে—"অদ্য আমার এই লাভ হইল, পরে

(১) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ১৬।৭

(২) অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ১৬।৮

(৩) এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ১৬।৯

(৪) কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ১৬।১০

(৫) চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১৬।১১

আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে আজ আমার এত ধন আছে, কালআমি আরও পাইব (১)। আমি এই শত্রুকে নিহত করিয়াছি, অবশিষ্টগুলিকেও আমি নিহত করিব (২)। আমিই মানুষের রাজা ও বিধাতা, আমি শুদ্ধ, পূর্ণ, বলবান, সুখী, ভাগ্যবান, সকল ভোগের আমিই অধিকারী, আমি ধনবান, আমি কুলীন; আমার তুল্য আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, উপভোগ করিব" (৩)। এইরূপে বহু অহঙ্কৃতভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হইয়া, কর্ম করিয়া কিন্তু অসঙ্গতভাবে কর্ম করিয়া, তাহাদের নিজেদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে নহে পরন্তু নিজেদের জন্য, বাসনাতৃপ্তির জন্য, ভোগের জন্য বিরাট কর্ম করিয়া, তাহারা নিজেদেরই পাপের অশুচি নরকে পতিত হয় (৪)। তাহারা যজ্ঞ করে, দান করে কিন্তু আত্মশ্লাঘার বশে, ধনমানের গর্বে, অনম্র ও অবোধ দম্ভ লইয়া। তাহাদের শক্তি ও বলের অহঙ্কারে, তাহাদের ক্রোধ ও দম্ভের প্রচণ্ডতায়, তাহারা তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে, মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে দ্বেষ ও তাচ্ছিল্য করে (৫)। আর যেহেতু শুভের প্রতি, ভগবানের প্রতি, তাহাদের এইরূপ গর্বিত দ্বেষ ও অবজ্ঞা আছে, যেহেতু তাহারা ক্রূর ও পাপময়, সেইজন্য ভগবান তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন (৬)। তাঁহাকে ভজনা না করায় তাঁহাকে তাহারা পায় না এবং অবশেষে তাঁহাকে পাইবার পথ সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া অন্তপ্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পতিত হয়, যান্ত্যধমাং গতিং (৭)।

এই যে জীবত বর্ণনা, ইহার দ্বারা যে পার্থক্যটি সূচিত হইতেছে তাহার

(১) আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১৬।১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৬।১৩

(২) অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৬।১৪

(৩) আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬।১৫

(৪) অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬।১৬

(৫) আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬।১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৬।১৮

(৬) তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৬।১৯

(৭) আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৬।২০

পূর্ণ উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার মধ্যে যে অর্থ নাই তাহা টানিয়া বাহির করিলে চলিবে না। যখন বলা হয় যে, এই জড়জগতে দুই প্রকারের সৃষ্ট জীব আছে, দৈবো ভূতসর্গো, দেব ও অসুর,* তাহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রকৃতিতে প্রত্যেক মানুষের অবশ্যম্ভাবী জীবনগতি কোন্‌টি হইবে ভগবান তাহা প্রথম হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সৃজন করিয়াছেন; আর ইহাও ঠিক নহে যে, এক অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক ভবিতব্য আছে, এবং ভগবান প্রথম হইতেই যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাদিগকে এমনভাবে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা অনন্ত শাস্তি ও অশুচি নরকে পতিত হয়। সকল জীবই ভগবানের সনাতন অংশ, যেমন দেব তেমনই অসুরও, সকলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারে; অধমতম পাপীও ভগবানের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে জীবের যে ক্রমবিবর্তন তাহা হইতেছে একটা সংকটসঙ্কুল অভিযান, তাহাতে সর্বদা স্বভাব এবং স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মই হইতেছে দুইটি প্রধান শক্তি, আর যদি স্বভাবের প্রকটনে, জীবের আত্মঅভিব্যক্তিতে, কোন আতিশয্য, ইহার লীলায় কোন বিশৃঙ্খলা সত্তার ধর্মকে কুটিল পথে চালিত করে, যদি রাজসিক গুণ-সকলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সত্ত্বকে হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে কর্ম ও তাহার ফল-সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় মুক্তির অনুকূল সত্ত্বের উৎকর্ষ নহে, পরন্তু নীচের প্রকৃতির বিকৃতি-সকলের অত্যধিক আতিশয্য। মানুষটি যদি তখনও বিরত না হয়, তাহার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে তাহার মধ্যে অসুরের পূর্ণ জন্ম হয় এবং একবার যদি সে জ্যোতি ও সত্যের বিপরীত দিকে ঐরূপ অত্যধিক ভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে ভাগবত শক্তির অপপ্রয়োগ হইতেছে তাহার বিপুলতার জন্যই সে আর তাহার ধ্বংসমুখী গতিবেগকে ফিরাইতে সক্ষম হয় না যতক্ষণ না সে অধঃপতনের গভীরতার শেষ সীমায় উপনীত হয় এবং তল স্পর্শ করে, এবং দেখে যে সেই পথ তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, শক্তিটি অপব্যবহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে নিজে জীবপ্রকৃতির অধস্তন স্তরে নামিয়াছে, তাহাই নরক। যখন সে বুঝিতে পারে এবং জ্যোতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় তখনই গীতার অন্য সত্যটি আইসে যে, অধমতম পাপী, অশুদ্ধতম ও প্রচণ্ডতম দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অন্তরস্থ ভগবানকে ভজনা করিতে ও অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই সে রক্ষা পায়। তখন

*দুই প্রকার সৃষ্ট জীবের পার্থক্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য জড়াতীত লোক-সকলে, সেখানকার গতিধারা অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্তনের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেমন দেবতাদের জগৎ আছে, তেমনি অসুরদেরও জগৎ আছে; আর আমাদের পশ্চাতের এই সব জগতে এমন সব অপরিবর্তনীয় রূপের জীব আছে যাহারা বিশ্বের প্রগতির জন্য অপরিহার্য পূর্ণ দিব্য সৃষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং পৃথিবীর উপরে এবং ভৌতিক স্তরে অবস্থিত মানুষের জীবন ও প্রকৃতির উপরেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে।

কেবল সেই ফিরিয়া দাঁড়ানোর জন্যই সে শীঘ্র সাত্ত্বিক পথটি ধরিতে পারে এবং তাহা সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়।

আসুরিক প্রকৃতি হইতেছে রাজসিক প্রকৃতিরই চরম মাত্রা; ইহা জীবকে প্রকৃতির দাসত্বের মধ্যে লইয়া যায়, কাম ক্রোধ ও লোভের মধ্যে লইয়া যায়, এই তিনটি হইতেছে রাজসিক অহংয়ের তিনটি শক্তি এবং ইহারাই নরকের দ্বার। এই নরকের মধ্যেই প্রাকৃত জীব পতিত হয় যখন সে তাহার নিম্নতর ও বিকৃত সংস্কার-সকলের অশুচিতা, অশুভ ও ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়। এই তিনটিই অন্যদিকে আবার এক বিশাল তমিস্রার দ্বার, তাহারা আদি অজ্ঞানেব স্বভাব-সিদ্ধ যে তামস তাহার মধ্যে লইয়া যায়; কারণ রাজসিক প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা পুনরায় আত্মার অধমতম তামসিক পরি-স্থিতির দৌর্বল্য, অবসাদ, অন্ধকার, অক্ষমতার মধ্যে পতিত হয়। এই অধঃ-পতন হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, মানুষকে এই তিনটি অশুভ শক্তি পরি-হার করিতে হইবে এবং সত্ত্বগুণের জ্যোতির দিকে ফিরিতে হইবে, যথাযথভাবে, যথার্থ সম্বন্ধে. সত্য ও ধর্ম অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে; তাহা হইলেই সে তাহার মহত্তর কল্যাণের অনুসরণ করিবে এবং মহত্তম আত্ম-স্থিতিতে উপনীত হইতে পারিবে। কামনার ধর্ম অনুসবণ করা আমাদের প্রকৃতির সত্য নীতি নহে. ইহার কর্মের এক উচ্চতর ও যোগ্যতর আদর্শ আছে। কিন্তু কোথায় তাহা নিহিত, কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? প্রথমত মানবজাতি সর্বদাই এই ন্যায্য ও মহতী নীতির সন্ধান করিয়াছে, এবং যাহা কিছু সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে সেসব তাহার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ঐ শাস্ত্র হইতেছে বিদ্যা ও জ্ঞানের বিধান, নৈতিকতার বিধান, ধর্মের বিধান, শ্রেষ্ঠ সামা-জিক আচারের বিধান, মানুষের সহিত, ভগবানের সহিত ও প্রকৃতির সহিত আমাদের যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনের বিধান। তামসিক মানবের গতানুগতিক অভ্যাসের বশ মন অজ্ঞভাবে যে-সব প্রথা অনুসরণ করে, তাহাদের কোনটি হয়ত ভাল, কোনটি মন্দ,—এ-সবের সমষ্টিই শাস্ত্র নহে। অন্তর্বোধ, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা যে জ্ঞান ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শাস্ত্র, তাহা হইতেছে জীবনের বিজ্ঞান, জীবনের শিল্প, জীবনের নৈতিক বিধান, জাতির পক্ষে যাহা তৎকালিক শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তাহাই শাস্ত্র। অর্ধ-প্রবুদ্ধ যে মানুষ শাস্ত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহার কামনা ও সহজাত সংস্কারের অনুসরণ করে, সে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি পাইতে পারে কিন্তু সুখ পাইবে না, কারণ আভ্যন্তরীণ যে সুখ তাহা কেবল যথাযথভাবে জীবনযাপন করিয়াই লাভ করা যায়।* সে সিদ্ধির

* যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬।২৩

দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, উচ্চতম আধ্যাত্মিক গতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সংস্কার ও কামনা পাশব জগতেই সর্বপ্রথম নীতি বলিয়া মনে হয় কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় সত্য ও ধর্ম ও জ্ঞান ও যথাযথ জীবন-ধারার অনুসরণে। অতএব মানুষ তাহার সত্তার নিম্নতর অংগ-সকলকে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে শাস্ত্র যে সর্বসম্মত বিধি দাঁড় করাইয়াছে প্রথমত তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে, তাহাকেই আচরণ ও কর্মের, কর্তব্যাকর্তব্যের প্রামাণ্য করিতে হইবে যতক্ষণ না সংস্কারমূলক বাসনাময়ী প্রকৃতি নিয়মিত ও প্রশমিত হইতেছে, আত্ম-সংযমের অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত হইতেছে এবং মানুষ প্রথমে আরও মুক্ততর বুদ্ধিসম্মত আত্ম-পরিচালনার জন্য এবং পরে অধ্যাত্ম প্রকৃতির উচ্চতম নীতি ও পরম মুক্তির জন্য যোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

কারণ শাস্ত্র বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় তাহা সেই অধ্যাত্ম নীতি নহে, যদিও ইহার উচ্চতম স্তরে যেখানে ইহা অধ্যাত্মভাবে জীবনযাপন করিবার বিদ্যা ও প্রয়োগনীতি (গীতা নিজের শিক্ষাকেই উচ্চতম ও গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়াছে, ১৫।২০) সেখানে ইহা সাত্ত্বিক প্রকৃতি কেমন করিয়া নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে তাহার বিধি নিরূপণ করিয়া দেয় এবং যে-সাধনার দ্বারা অধ্যাত্ম রূপান্তর সাধিত হইবে তাহার বিকাশ করে। তথাপি সকল শাস্ত্রই কতকগুলি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা বা ধর্ম লইয়া গঠিত, উহা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। পরম লক্ষ্য হইতেছে আত্মার মুক্তি, তখন জীব সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার কর্মের একমাত্র নীতির জন্য ভগবানের অভিমুখী হয়, সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ ইচ্ছা হইতেই কর্ম করে, ধর্মের মধ্যে নহে, আত্মার মধ্যেই বাস করে। অর্জুনের পরবর্তী প্রশ্নে শিক্ষাটির এইরূপ বিকাশই সূচিত হইতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গুণ, শ্রদ্ধা ও কর্ম

গীতা দুই প্রকার কর্মের প্রভেদ করিয়াছে, ব্যক্তিগত কামনার স্বৈরতা অনুসরণে কর্ম, কামচারতঃ, এবং শাস্ত্রের অনুসরণে কর্ম। শাস্ত্র বলিতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে জীবন-যাত্রার সর্বসম্মত বিদ্যা এবং প্রয়োগকৌশল, তাহা মানব-জাতির সমষ্টিগত জীবনের ফল, তাহার সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম, তাহার বিজ্ঞান, জীবনের শ্রেষ্ঠ বিধি সম্বন্ধে তাহার প্রগতিশীল আবিষ্কার,—কিন্তু সে মানবজাতি এখনও অজ্ঞানের মধ্যে চলিতেছে এবং অর্ধালোকে জ্ঞানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্যক্তিগত কামনার বশে কর্ম আমাদের প্রকৃতির অসংস্কৃত অবস্থার জিনিস, তাহা অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা এবং অনিয়ন্ত্রিত বা কুনিয়ন্ত্রিত রাজসিক অহমিকার দ্বারা অনুপ্রেরিত। শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম হইতেছে বুদ্ধিগত, নীতিগত, সৌন্দর্যবোধগত, সমাজগত, ধর্মগত কৃষ্টির ফল; ইহাতে আছে কোনরূপ যথাযথ জীবনধারণ সুসঙ্গতি এবং যথাযথ ব্যবস্থার প্রয়াস, এবং সে-প্রয়াস স্পষ্টতই হইতেছে মানুষের সাত্ত্বিক অংশের পক্ষে তাহার রাজসিক ও তামসিক অহমিকাকে অতিক্রম করা, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা অথবা যেখানে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে সেখানে তাহাদিগকে পরিচালিত করার প্রযাস, সে প্রয়াস কতটা অগ্রসর হইবে তাহা ঘটনাচক্রের উপরই নির্ভর করে। সম্মুখে অগ্রসর হইবার পক্ষে এইটি উপায় স্বরূপ, অতএব মানুষকে প্রথমত ইহার ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে এবং তাহার ব্যক্তিগত কামনার প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া এই শাস্ত্রকেই তাহাব কর্মের বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানেই মানবজাতি কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেইখানেই সে এই সাধারণ নীতিটি সর্বদাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা ধারণা, একটা নীতি, নিজের পূর্ণতার একটা আদর্শ তাহার আছে, তাহা তাহার কামনার নির্দেশ বা অসংস্কৃত প্রেরণা-সকলের স্থূল নির্দেশ হইতে বিভিন্ন। এই মহত্তর নীতিটি মানুষ সাধারণত পায় নিজের বাহিরে জাতির ভূয়োদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার কোন অল্পাধিক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে, সেইটি সে গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহার মন এবং তাহার সত্তার প্রধান-প্রধান অংশগুলি সম্মতি দেয়,

অথবা অনুমতি দেয়, এবং তাহার মন, সংকল্প ও কর্মে তদনুসারে জীবনযাপন করিয়া সেইটিকেই সে নিজের করিয়া লয়। আর সত্তার এই যে সম্মতি, বিশ্বাস করিবার, সংসিদ্ধ করিবার এই যে সজ্ঞান স্বীকৃতি ও সংকল্প, ইহাকে তাহার শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে, গীতা এই নামটি ব্যবহার করিয়াছে। যে ধর্ম, দর্শন-শাস্ত্র, সামাজিক আদর্শ বা কৃষ্টিগত আদর্শে আমি শ্রদ্ধাবান, তাহা আমাকে আমার প্রকৃতির জন্য এবং ইহার কর্মের জন্য একটা নীতি দেয়, আপেক্ষিক যাথার্থ্যের, আপেক্ষিক বা পূর্ণতম সিদ্ধির একটা ধারণা দেয়, এবং তাহাতে আমার শ্রদ্ধা যে অনুপাতে ঐকান্তিক ও সম্পূর্ণ হয়, সেই শ্রদ্ধা অনুসারে জীবনযাপন করিবার সংকল্প যে অনুপাতে প্রগাঢ় হয়, সেই অনুপাতে আমি উহার অনুরূপ হইতে পারি; আমি নিজেকে সেই যাথার্থ্যের প্রতিমূর্তিরূপে, সেই সিদ্ধির আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি।

কিন্তু আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, মানুষের মধ্যে তাহার বাসনার নির্দেশ ছাড়া এবং ধর্ম, নির্দিষ্ট আদর্শ, শাস্ত্রের নিরাপদ নিয়ামক বিধি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ছাড়াও একটা মুক্ততর প্রবৃত্তি রহিয়াছে। দেখা যায় যে, ব্যক্তি অনেক সময়েই এবং সমাজেও তাহার জীবনের যে-কোন মুহূর্তে শাস্ত্রকে পরিহার করিতেছে, তাহাতে অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহার সংকল্প ও শ্রদ্ধার সেই রূপটিকে হারাইতেছে এবং অন্য কোন নীতির সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে, সেইটিকেই সে এখন কর্মের যথার্থ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং জীবনের অধিকতর প্রাণবন্ত ও উচ্চতর সত্য বলিয়া মান্য করিতে বেশী ইচ্ছুক হইতেছে। এইরূপ ঘটিতে পারে যখন প্রচলিত শাস্ত্র আর জীবন্ত বস্তু থাকে না, পরন্তু অপকৃষ্ট ও আড়ষ্ট হইয়া কেবল গতানুগতিক প্রথা ও আচারের স্তূপে পরিণত হয়। অথবা ইহা আসিতে পারে যদি দেখা যায় যে, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ অথবা প্রয়োজনীয় প্রগতির পক্ষে আর উপযোগী নহে; একটা নূতন সত্য জীবনের একটা পূর্ণতর ধর্ম অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে জাতির চেষ্টার দ্বারা অথবা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ কোন মহৎ ও জ্ঞানালোকিত ব্যক্তিগত মনীষা দ্বারা। বৈদিক ধর্ম লোকাচারে পরিণত হইল, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন তাঁহার অষ্টাঙ্গ মার্গের নূতন বিধান এবং নির্বাণের আদর্শ লইয়া; আর এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিলেন না, বলিলেন যে, ইহা আর্য জীবনের সত্য নীতি, জ্ঞানোদ্ভাসিত মনীষা ও প্রবুদ্ধ আত্মার দ্বারা, বুদ্ধের দ্বারা ইহা বার-বার পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্যত ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, একটি আদর্শ, একটি শাশ্বত ধর্ম আছে যাহাকে ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং মানুষের মধ্যে আর যে-সব শক্তি সত্য ও পূর্ণতার জন্য প্রয়াস

করে সকলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের বিদ্যা ও প্রয়োগ নীতির নবতম বিবৃতিতে, নূতন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। মুশা-প্রবর্তিত ধর্ম, নীতি সামাজিক সদাচারের বিধান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া নিন্দিত হইল, তাহা ছাড়া এখন উহা লোকাচার মাত্র হইয়া দাঁড়াইল; এখন খৃীস্টের ধর্ম উহার স্থান গ্রহণ করিতে আসিল, একই সঙ্গে উহাকে উচ্ছেদ ও সার্থক করিতে চাহিল, তাহার অসম্পূর্ণ বাহ্য রূপকে উচ্ছেদ করিতে চাহিল এবং জীবনের যে দিব্য বিধান উহার লক্ষ্য ছিল সেইটিকে আত্মার গভীরতর ও প্রশস্ততর জ্যোতি ও শক্তিতে সার্থক করিতে চাহিল। আর মানুষের অনুসন্ধান ঐখানেই থামিয়া যায় নাই, পরন্তু এই সকল বিধানকেও পরিহার করিয়াছে, যে-সত্যকে সে এককালে বর্জন করিয়াছিল তাহাতেই পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে অথবা কোন নূতন সত্য ও শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সকল সময়ে সে একটি জিনিসই সন্ধান করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গসিদ্ধির নীতি, তাহার যথাযথ জীবনযাপনের বিধান, তাহার পূর্ণ, উচ্চতম ও মূলগত আত্মা ও প্রকৃতি।

এই প্রয়াসটি ব্যক্তি হইতেই আরম্ভ হয়, সে আর প্রচলিত ধর্মে সন্তুষ্ট থাকে না। কারণ সে দেখিতে পায় যে, তাহার নিজের এবং জীবনের সম্বন্ধে তাহার যে ধরণা, তাহার যে উদারতম ও গভীরতম অনুভূতি তাহার সহিত ঐ ধর্মের আর সঙ্গতি নাই, অতএব তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার, তাহার অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প সে আর আনিতে পারে না। ইহা আর তাহার সত্তার আভ্যন্তরীণ ধারার অনুযায়ী হয় না, তাহার পক্ষে আর সৎ নহে, যথার্থ নহে, উচ্চতম বা উৎকৃষ্টতম বা বাস্তব কল্যাণ নহে; ইহা তাহার নিজের সত্তার বা বিশ্ব-সত্তার সত্য বা ধর্ম নহে। ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্র হইতেছে একটা নির্ব্যক্তিক জিনিস, এবং সেই জন্যই তাহা তাহার দেহ, প্রাণ, মনের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর মান্য; কিন্তু সেই সঙ্গেই সমষ্টির পক্ষে উহা হইতেছে ব্যক্তিক জিনিস, উহা তাহার অভিজ্ঞতার, তাহার কৃষ্টির, তাহার প্রকৃতির পরিণাম। শাস্ত্র তাহার সকল রূপ ও আভ্যন্তরীণ ভাবে আত্মার পরিপূর্ণতার আদর্শ বিধি নহে, আমাদের প্রকৃতির অধীশ্বরের শাশ্বত বিধান নহে, যদিও ইহার মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সেই অতি-মহত্তর বস্তুর ইঙ্গিত, সূচনা, দীপ্তিপ্রদ আভাস-সকল নিহিত রহিয়াছে। আর ব্যক্তিটি সমষ্টিকে ছাড়াইয়া অগ্রগামী হইয়া থাকিতে পারে; এক মহত্তর সত্য, প্রশস্ততর পন্থার, প্রাণ-পুরুষের এক গভীরতর উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার মধ্যে যে নির্দেশ শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া যায় তাহা অবশ্য সকল সময়েই একটা উচ্চতর জিনিস না হইতে পারে; তাহা অহং-ভাবাপন্ন বা রাজসিক প্রকৃতির বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, সে-প্রকৃতি আত্মচরিতার্থতা ও আত্মপ্রতি-

ষ্ঠার স্বাধীনতার সংকোচক বলিয়া অনুভূত কোন কিছুর অনুশাসন হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রের সংকীর্ণতা বা ত্রুটির জন্য অথবা জীবনযাত্রার প্রচলিত বিধান কেবল বাধাপ্রদ বা প্রাণহীন লোকাচারে পরিণত হওয়ার জন্য ঐরূপ বিদ্রোহ অনেক সময়েই ন্যায়সংগত হয়। আর এই পর্যন্ত ইহা বৈধ, ইহার মধ্যে একটা সত্য থাকে, ইহার অস্তিত্বের উপযুক্ত ন্যায্য কারণ থাকে; কারণ যদিও ইহা যথাযথ পন্থাটিকে ধরিতে পারে না তথাপি রাজসিক অহংয়ের যে অবাধ ক্রিয়া, তাহাতে অধিকতর স্বাধীনতা ও প্রাণ থাকায়, তাহা লোকাচারের প্রাণহীন ও গতানুগতিক তামসিক অনুসরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজসিক প্রকৃতি সকল সময়েই তামসিক প্রকৃতি অপেক্ষা প্রবল সকল সময়েই অধিকতর শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাহার মধ্যে অধিকতর সম্ভাবনা-সকল নিহিত থাকে। কিন্তু এই নির্দেশ মূলত সাত্ত্বিকও হইতে পারে; ইহা এক বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের অভিমুখ হইতে পারে, সে আদর্শ আমাদিগকে আমাদের আত্মার এবং বিশ্ব-জীবনের অধিকতর পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সত্যের দিকে লইয়া যায় এবং সেই জন্যই যে-উচ্চতম ধর্ম ভাগবত মুক্তির সহিত এক, তাহার দিকে লইয়া যায়। আর কার্যত এই গতি হইতেছে সাধারণত এক বিস্মৃত সত্যকে ধরিবার প্রয়াস অথবা আমাদের সত্তার কোন অনাবিষ্কৃত বা অনধিগত সত্যের দিকে অগ্রগমন। ইহা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির স্বৈরাচার মাত্র নহে· ইহার আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে, ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্যই প্রয়োজনীয়। আর যদিই বা শাস্ত্রটি এখনও একটা জীবন্ত বস্তু থাকে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিধান হয়, তথাপি যাঁহারা অসাধারণ মানব, আধ্যাত্মিক যাঁহাদের অন্তর্জীবন বিকশিত হইয়াছে তাঁহারা ঐ আদর্শের দ্বারা বাধ্য নহেন। তাঁহাকে শাস্ত্রের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কারণ এই বিধান হইতেছে সাধারণ অপূর্ণ মানবের জন্য, তাহার পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও আপেক্ষিক পূর্ণতার জন্য, কিন্তু তাঁহাকে এক পূর্ণতর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; ইহা হইতেছে কতকগুলি স্থির-নির্দিষ্ট ধর্মের সংবিধান, কিন্তু তাঁহাকে শিখিতে হইবে আত্মার মুক্তির মধ্যে বাস করিতে।

কিন্তু কর্ম যদি বাসনার নির্দেশ এবং প্রচলিত শাস্ত্র এই দুইটিই বর্জন করে, তাহা হইলে তাহার দৃঢ় ভিত্তিটি কি হইবে? কারণ বাসনার যে নীতি তাহার একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, তাহা যেমন পশুর পক্ষে এবং হয়ত মানবজাতিরও আদিম অবস্থাতে নিরাপদ ও উপযোগী ছিল, আমাদের পক্ষে সেরূপ উপযোগী না হইতে পারে, তথাপি তাহার সীমানার মধ্যে উহা আমাদের প্রকৃতির এক অতি জীবন্ত অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশের দ্বারা সমর্থিত; আর শাস্ত্রেরও পিছনে রহিয়াছে বহুদিনের প্রতি-

ষ্ঠিত বিধানের প্রামাণিকতা, প্রাচীন সাফল্যের সমর্থন এবং অতীতের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই নূতন প্রয়াস হইতেছে অজানা বা আংশিক জানা দেশে শক্তিময় অভিযানের ন্যায়, ইহা একটি দুঃসাহসিক বিকাশ, এক নূতন বিজয়, এখানে কোন্ মূল সূত্র ধরিয়া চলিতে হইবে, কোন্ দিশারী আলোকের উপর নির্ভর করিতে হইবে, আমাদের সত্তার মধ্যে ইহার কি দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যাইবে? উত্তর হইতেছে এই যে, এই সূত্র এই ভিত্তি মিলিবে মানুষের শ্রদ্ধায়, তাহার বিশ্বাস করিবার সংকল্পে, সে নিজের এবং জীবনের সত্য বলিয়া যেটিকে দেখিতেছে বা মনে করিতেছে তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিবার সংকল্পে। অন্য কথায় এই প্রয়াস হইতেছে মানুষের পক্ষে তাহার সত্য, তাহার জীবনের ধর্ম, তাহার পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভের পন্থা আবিষ্কারের জন্য তাহার নিজের নিকটেই আবেদন, অথবা তাহার মধ্যে বা বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে কোন শক্তিময় অবশ্য-মান্য বস্তুর নিকটে আবেদন। আর সব কিছু নির্ভর করে তাহার শ্রদ্ধার স্বরূপের উপর, তাহার নিজের মধ্যে (অথবা যে বিশ্বগত সত্তার সে অংশ বা অভিব্যক্তি তাহার মধ্যে) যে বস্তুটিকে সে শ্রদ্ধা করিতেছে তাহার উপর. এবং ইহার দ্বারা সে তাহার প্রকৃত আত্মার দিকে এবং বিশ্বের আত্মা বা প্রকৃত সত্তার দিকে কতখানি অগ্রসর হইতেছে তাহার উপর। যদি সে হয় তামসিক, মূঢ়, মোহাচ্ছন্ন, যদি তাহার শ্রদ্ধা হয় জ্ঞানহীন, তাহার সংকল্প হয় অনুপযোগী, তাহা হইলে সে কোন সত্য বস্তুতে পৌঁছিতে পারিবে না এবং তাহার নীচের প্রকৃতির মধ্যেই পতিত হইবে। যদি সে রাজসিক মিথ্যা দীপ্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, সে স্বৈর সংকল্পের দ্বারা অপথে পরিচালিত হইতে পারে এবং তাহা তাহাকে দুর্গম জলাভূমি বা গিরিপ্রপাতে লইয়া যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে তাহার উপর পুনরায় সত্ত্বের প্রভাব, সত্ত্ব তাহার অঙ্গ-সকলের উপর এক নূতন দীপ্ত শৃংখলা আনিয়া দিবে, তাহা তাহার স্বৈর ইচ্ছার বিক্ষোভময় ভ্রান্তি হইতে অথবা তাহার মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের জড়তাময় ভ্রান্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে। অন্য-পক্ষে যদি তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতি থাকে, তাহার অগ্রগমনের জন্য সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্দেশ থাকে, তাহা হইলে এক মহত্তর এবং এখনও অনধিগত আদর্শ বিধান তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা তাহাকে ক্বচিদ্ কখনও সাত্ত্বিক জোতির ঊর্ধ্বে সত্তা ও জীবনের এক উচ্চতম দিব্য আলোক দিব্য ধর্মের দিকে অন্তত কতক দূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কারণ তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক জ্যোতিটি যদি এমন প্রবল হয় যে নিজের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে সেই স্থান হইতেই অগ্রসর হইয়া ভাগবত লোকোত্তর কৈবল্যাত্মক সত্তার কোন প্রথম আভার মধ্যে প্রবেশ করিবার মত একটা পথ করিয়া লইতে পারে। আত্মলাভের সকল প্রয়াসে এই সব সম্ভাবনাই রহি-

য়াছে; এই আধ্যাত্মিক অভিযানের এই সবই হইতেছে বিভিন্ন বিধান।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, গীতা নিজস্ব অধ্যাত্ম শিক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারায় এই সমস্যাটির কিরূপ সমাধান করিয়াছে। কারণ অর্জুন তখনই এক ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইতেই সমস্যাটি কিংবা তাহার একটা দিক প্রকাশ পায়। তিনি বলিলেন * যাহারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবান বা দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা, সেই অনুরাগের একাগ্র সংকল্প কি যাহা তাহাদিগকে এই শ্রদ্ধা প্রদান করে এবং এই প্রকার কর্মে চালিত করে? তাহা কি সাত্ত্বিক রাজসিক না তামসিক? তাহা আমাদের প্রকৃতির কোন স্তরের অন্তর্গত? গীতার উত্তর প্রথমেই এই নীতিটি বিবৃত করিতেছে যে, সকল বস্তুর ন্যায় আমাদের শ্রদ্ধা হইতেছে ত্রিবিধ, আমাদের প্রকৃতির প্রধান গুণ অনুযায়ী তাহা বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোন মানুষের সত্তার মূল উপাদান, তাহার ধাতুগত প্রকৃতি, তাহার স্বভাবজাত শক্তি যেরূপ, তদনুযায়ী তাহার শ্রদ্ধার রূপ রং ও গুণ নির্ধারিত হয়, সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা। * আর তাহার পরেই আসি- তেছে একটি বিশিষ্ট ছত্র, তাহাতে গীতা বলিতেছে যে, এই পুরুষ, এই যে মানুষের অন্তরাত্মা, ইনি যেন শ্রদ্ধার দ্বারাই গঠিত; শ্রদ্ধা অর্থাৎ একটা কিছু হইবার সংকল্প, নিজের উপর, জীবনের উপর একটা বিশ্বাস, আর তাঁহার ঐ সংকল্প, শ্রদ্ধা বা সত্তাগত বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহাই এবং তাহাই তিনি, শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এই অর্থপূর্ণ বাক্যটির মধ্যে যদি আমরা একটুখানি নিবেশ সহকারে দৃষ্টি- পাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এই একটি ছত্রে কয়েকটি ওজঃপূর্ণ শব্দের মধ্যে আধুনিক প্রয়োগবাদের (Pragmatism) সমগ্র পরিকল্পনাটি নিহিত রহিয়াছে। কারণ যদি মানুষ বা তাহার অন্তরাত্মা তাহার অন্তঃস্থিত শ্রদ্ধার দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে সে যে-সত্যকে দর্শন করে, যে-সত্যকে জীবনে অনুসরণ করিতে চায়, তাহার পক্ষে সেইটিই হইতেছে তাহার সত্তার সত্য। তাহার সেই সত্য সে নিজে সৃষ্টি করিয়াছে বা করিতেছে এবং তাহার পক্ষে আর কোনও বাস্তব সত্য থাকিতে পারে না। এই সত্য হইতেছে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কর্মের জিনিস, তাহার বিবর্তনের, আত্মার ক্রিয়াশীলতার

* অর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥
শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ১৭।১,২

* সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ১৭।৩

জিনিস, তাহার মধ্যে যাহা কখনও পরিবর্তিত হয় না তাহার জিনিস নহে। তাহার জানিবার, বিশ্বাস করিবার, বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিতে হইয়া উঠিবার জন্য যে-একটা বর্তমান সংকল্প তাহার কোন অতীত সংকল্পকে সমর্থন করিতেছে, বর্তাইয়া রাখিয়াছে, তাহার দ্বারাই সে আজ যাহা তাহা নির্ণীত হইয়াছে; আর তাহার মূল সত্তার মধ্যে সক্রিয় এই সংকল্প ও শ্রদ্ধা যে নূতন দিকেই ফিরুক না কেন, সে ভবিষ্যতে তাহাতেই পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদের নিজেদের মন ও প্রাণের কর্মের দ্বারাই আমরা নিজেদের জীবনের সত্য সৃষ্টি করি, অন্য কথায় আমরা নিজেরাই নিজেদিগকে সৃষ্টি করি, নিজেরাই নিজেদের বিধাতা।

কিন্তু ইহা যে কেবল সত্যের একটা দিক মাত্র, তাহা খুবই স্পষ্ট, আর চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট সকল একদেশদর্শী উক্তিই সন্দেহের বিষয়। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিক সত্তা যাহা বা সে যাহা কিছু সৃষ্টি করে, সত্য কেবল তাহাই নহে; তাহা কেবল আমাদের বিবর্তনের সত্য, এক বৃহত্তম আয়তনব্যাপী ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট বিন্দু বা রেখা। আমাদের ব্যক্তিকতার ঊর্ধ্বে প্রথমেই রহিয়াছে এক বিশ্ব সত্তা এবং এক বিশ্ব বিবর্তন, আমাদের বিবর্তন তাহারই অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র ক্রিয়া। এবং তাহারও ঊর্ধ্বে রহিয়াছে শাশ্বত পুরুষ, তাঁহা হইতেই সকল বিবর্তন উৎপন্ন, ইহার সমস্ত সম্ভাবনা, উপাদান, মূল প্রেরণা ও শেষ উদ্দেশ্য সবই তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। আমরা অবশ্য বলিতে পারি যে, সকল বিবর্তনই হইতেছে বিশ্ব-চৈতন্যের একটি ক্রিয়া, সবই মায়া, বিবর্তিত হইবার সংকল্পের দ্বারা সৃষ্ট, আর অপর একমাত্র সত্য বস্তু (যদি তেমন কিছু থাকে) হইতেছে এক শুদ্ধ শাশ্বত সত্তা, তাহা চৈতন্যের ঊর্ধ্বে নির্বিশেষ, অপ্রকটিত এবং অনির্বচনীয়। কার্যত এইটিই হইতেছে মায়াবাদীগণের অদ্বৈত মত; তাঁহারা ব্যবহারিক সত্য, এবং সৃজনাত্মিকা মায়ার অন্যদিকে যে অনির্দেশ্য ও অনির্বচনীয় একক কৈবল্যাত্মক সত্তা রহিয়াছে—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদটি এইভাবেই বুঝিয়াছেন; তাঁহাদের মনের কাছে ঐ ব্যবহারিক সত্য হইতেছে বিভ্রমাত্মক, অন্তত কেবল সাময়িক এবং আংশিক ভাবেই সত্য, অন্য পক্ষে আধুনিক প্রয়োগবাদ (Pragmatism) এইটিকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করে অন্তত এইটিই তাহার মতে একমাত্র অভিজ্ঞেয় সত্য, কারণ কেবলমাত্র এই সত্যটিই আমরা কার্যত অনুসরণ করিতে পারি। কিন্তু গীতার পক্ষে কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মই পরম পুরুষ, এবং পুরুষ সকল সময়েই হইতেছেন চৈতন্যময় আত্মা, যদিও তাঁহার যে ঊর্ধ্বতম চৈতন্য, অতিচৈতন্য বলা যাইতে পারে (তাঁহার নিম্নতন চৈতন্যও, সেটিকে আমরা অচেতন নামে অভিহিত করিয়া থাকি), তাহা আমরা যে মানসিক চৈতন্যকে চেতনা নাম দিতে অভ্যস্ত, তাহা হইতে অতিশয় বিভিন্ন বস্তু। ঊর্ধ্বতম

অতিচৈতন্যে আছে অমৃতত্বের এক ঊর্ধ্বতম সত্য ও ধর্ম, সত্তার মহত্তম দিব্য ধারা, শাশ্বত ও অনন্তের ধারা। সত্তার সেই শাশ্বত ধারা ও দিব্যভাব ইতি-পূর্বেই পুরুষোত্তমের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এখন চেষ্টা করিতেছি সেইটিকে যোগের দ্বারা এখানে আমাদের বিবর্তনের মধ্যেই সৃষ্টি করিতে; আমাদের প্রয়াস হইতেছে ভাগবত হওয়া, তাঁহার সদৃশ হওয়া, মদ্ভাব। তাহাও নির্ভর করে শ্রদ্ধার উপর। আমাদের সচেতন মূল সত্তার একটা ক্রিয়ার দ্বারা এবং ইহার সত্যে বিশ্বাসের দ্বারা, জীবনে ইহার অনুসরণ করিবার, ইহাই হইয়া উঠিবার একটা অন্তরতম সংকল্পের দ্বারা আমরা ইহাকে প্রাপ্ত হই; কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝায় না যে, পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান নাই। যতক্ষণ না আমরা ইহাকে দেখিতেছি, নূতন করিয়া ইহার সত্তায় গড়িয়া উঠিতেছি, ততক্ষণ আমাদের বহির্মুখী মনের পক্ষে ইহা বর্তমান না থাকিলেও, ইহা শাশ্বতের মধ্যে আছেই, আর আমরা এমনও বলিতে পারি যে, ইহা পূর্ব হইতেই আমাদের নিজেদের নিগূঢ় সত্তার মধ্যে রহিয়াছে; কারণ আমাদেরও মধ্য, আমাদেরও গভীরে পুরুষোত্তম সকল সময়েই রহিয়াছেন। আমাদের পক্ষে সেই দিব্য ধর্মে গড়িয়া উঠা, আমাদের দ্বারা ইহার সৃষ্টির অর্থ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহার ও ইহার প্রকটন। সকল সৃষ্টিই শাশ্বত পুরুষের সচেতন মূল সত্তা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বস্তুত তাঁহারই প্রকটন; মূল সৃজনী চৈতন্য চিৎশক্তিতে একটা শ্রদ্ধা, একটা সম্মতি, বিবর্তিত হইবার একটা সংকল্প হইতেই ইহা উদ্ভূত হয়।

তবে দার্শনিক প্রশ্নটিই উপস্থিত আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের সত্তার মধ্যে এই যে সংকল্প বা শ্রদ্ধা, ইহার সহিত ভাগবত প্রকৃতির সিদ্ধিতে গড়িয়া উঠিবার আমাদের যে-সম্ভাবনা তাহার কি সম্বন্ধ তাহাই আমাদিগকে এখানে দেখিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, এই শক্তি, এই শ্রদ্ধাই আমাদের ভিত্তি, যখন আমরা আমাদের কামনা অনুযায়ী জীবনযাপন করি, তাহার অনুযায়ী হই, তদনুসারে কর্ম করি, তাহা হইতেছে যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়া, তাহা প্রধানত আমাদের প্রাণিক ও দৈহিক, আমাদের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আর যখন আমরা শাস্ত্রানুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়ার দ্বারা অগ্রসর হই তাহা (যদি তাহা গতানুগতিক বিশ্বাস মাত্র না হয়) সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত, সে প্রবৃত্তি সর্বদা আমাদের রাজসিক ও তামসিক অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার প্রয়াস করিতেছে। যখন আমরা এই দুইটিকেই বর্জন করি, এবং আমাদের নিজেদের আবিষ্কৃত বা ব্যক্তিগত ভাবে গৃহীত কোন আদর্শ বা সত্যের কোন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী হই, তদনুযায়ী জীবনযাপন করি, কর্ম করি, সেইটিও শ্রদ্ধার

এক নির্বন্ধপর ক্রিয়া, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, সংকল্প, অনুভব ও কর্মকে যে তিনটি গুণ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ঐ শ্রদ্ধা তাহাদের কোন একটিব অধীন হইতে পারে। আবার যখন আমরা দিব্য প্রকৃতির অনুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে কর্ম করিতে চেষ্টা করি, তখনও আমাদিগকে শ্রদ্ধার কোন নির্বন্ধপর ক্রিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, গীতার মতে সে-শ্রদ্ধা হইবে সাত্ত্বিক প্রকৃতির সেই অবস্থার যখন সে-প্রকৃতি তাহার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিতেছে এবং নিজের সুনির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সব জিনিসের সবগুলি এবং প্রত্যেকটিই বুঝায় প্রকৃতির কোন গতি বা অবস্থান্তর, সকলগুলিরই অর্থ হইতেছে একটা আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য ক্রিয়া অথবা সাধারণত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার ক্রিয়া। আর তাহা হইলে এই ক্রিয়ার স্বরূপ কি হইবে? আমাদিগকে যে কর্ম করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম, গীতা তাহার তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছে, এই তিনটি হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপঃ। কারণ অর্জুন যখন "সন্ন্যাস" (বাহ্য ত্যাগ) ও "ত্যাগ" (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) এই দুইটির প্রভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন (১৮। ১), কৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে এই তিনটি আদৌ বর্জন করা চলিবে না, এইগুলি সম্পাদন করিতেই হইবে, কারণ এইগুলি হইতেছে আমাদের "কর্তব্য কর্ম" এবং ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ করিয়া তোলে। অন্য কথায় এই সকল কর্ম হইতেছে আমাদের সিদ্ধিলাভের উপায়। কিন্তু আবার এই সব কাজই অজ্ঞানীদের দ্বারা অজ্ঞানে কিংবা অসম্পূর্ণ জ্ঞানে সম্পাদিত হইতে পারে। সকল গতিময় ক্রিয়াকে মূলত এই তিনটি অঙ্গে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কারণ সকল গতিময় ক্রিয়া, প্রকৃতির সকল গতিশীলতার মধ্যে রহিয়াছে একটা ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক তপস্যা, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যসমূহের অথবা কোন বিশেষ সামর্থ্যের তেজস্বিতা ও একাগ্রতা, তাহা আমাদিগকে কোন কিছু সিদ্ধ করিতে অথবা অর্জন করিতে অথবা কোন কিছুতে বিবর্তিত হইতে সাহায্য করে, এবং ইহাই "তপঃ"। সকল কর্মের মধ্যেই রহিয়াছে ঐ সিদ্ধি, অর্জন বা বিবর্তনের মূল্য স্বরূপ একটা ব্যয় আমরা যাহা, আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা অর্পণ করা, এবং ইহাই "দান"। সকল কর্মের মধ্যে আরও রহিয়াছে আধিভৌতিক শক্তি বা বিশ্ব-শক্তি-সকলের উদ্দেশে অথবা আমাদের সকল কর্মের পরম অধীশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ। প্রশ্ন হইতেছে, আমরা এই সকল কর্ম কি অচেতন ভাবে, জড়ভাবে বা বড়জোর একটা অবোধ, অজ্ঞান, অর্ধচেতন সংকল্প লইয়া করি, না অবিজ্ঞ বা বিকৃতভাবে চেতন-শক্তি সহিত করি, না জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞভাবে চেতন-সংকল্প লইয়া করি; অন্য কথায় আমাদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কি তামসিক, রাজসিক না সাত্ত্বিক?

কারণ এখানে প্রত্যেক বস্তু, স্থূল জিনিসসকলও হইতেছে ত্রিবিধ।* দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতা বলিতেছে, আমাদের আহার তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী এবং দেহের উপর তাহার ক্রিয়া অনুযায়ী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। মানসিক ও স্থূল শরীরে যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাহা স্বভাবত সেইরূপ জিনিস চায় যাহা আয়ু বৃদ্ধি করে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তি বৃদ্ধি করে, এক সঙ্গেই মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক বল বৃদ্ধি করে এবং মন, প্রাণ, দেহের সুখ, প্রীতি ও আরোগ্য বর্ধন করে, সে-সব জিনিস রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির ও তৃপ্তিকর। রাজসিক প্রকৃতি স্বভাবত এমন খাদ্য চায় যাহা অম্ল, ঝাল, উষ্ণ, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী, সে সব খাদ্য অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের দুঃস্থতা বৃদ্ধি করে। তামসিক প্রকৃতি ঠাণ্ডা, অশুদ্ধ, বাসি পচা বা স্বাদহীন খাদ্যে একরকম বিকৃত তৃপ্তি লাভ করে, এমন কি, পশুর ন্যায় অপরের অর্ধভুক্ত খাদ্যও গ্রহণ করে। গুণত্রয়ের ক্রিয়া সর্বব্যাপী। অন্য প্রান্তে মন ও আত্মার জিনিসসকলেও, যজ্ঞ, দান, তপস্যাতেও গুণত্রয় এই-ভাবেই কার্যকরী হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকতন্ত্রে এইসকলের যেরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল তদনুসারে গীতা প্রত্যেকটিরই তিন প্রকার বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু গীতা নিজেই যজ্ঞতত্ত্বের যে অতি ব্যাপক অর্থ প্রদান করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিয়া আমরা এই সকল সঙ্কেতের বাহ্য অর্থটিকে প্রসারিত করিতে পারি এবং তাহাদের মধ্য হইতে উদারতর অর্থ বাহির করিতে পারি। আর এইগুলিকে বিপরীত ক্রমে গ্রহণ করা, তমঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্ত্বে যাওয়াই সুবিধাজনক, কারণ আমরা আলোচনা করিতেছি যে, কেমন করিয়া আমরা আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি হইতে একটা সাত্ত্বিক পরিণতি ও আত্মসীমালঙ্ঘনের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত এক দিব্য প্রকৃতি ও কর্মের দিকে উঠিতে পারি।

শ্রদ্ধাবিরহিত * হইয়া যে কর্ম করা যায়, অর্থাৎ, যে-জিনিস সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণভাবে সচেতন ধারণা নাই, সম্মতি নাই, ইচ্ছা নাই, অথচ প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহাই হইতেছে তামসিক যজ্ঞ। তাহা যন্ত্রবৎ সম্পন্ন করা হয়, কারণ বাঁচিতে হইলে উহা করিতেই হয়, কারণ উহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, কারণ অন্য লোকে উহা করে, উহা না করিলে অন্য কোন বৃহত্তর অসুবিধা হইতে পারে, কিংবা এইরকম অন্য কোন তামসিক

---

* আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ১৭।৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ১৭।৮
* বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৭।১৩

প্রেরণার বশে করা হয়। আর যদি আমাদের প্রকৃতি পূর্ণভাবে তমোগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে উহা করা হয় অযত্নের সহিত, অবহেলা পূর্বক, ভ্রান্ত পদ্ধতিতে। তাহা বিধি অনুসারে অর্থাৎ শাস্ত্রের যথাযথ নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইবে না, জীবনের ব্যবহার ও তত্ত্ব অনুযায়ী এবং যে জিনিসটি করা হইতেছে তাহার সত্য তত্ত্ব অনুযায়ী যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবে না। সেই যজ্ঞে অন্নদান করা হইবে না—ভারতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে এই অন্নদান হইতেছে সাহায্যপ্রদ দানের প্রতীক, প্রকৃত যজ্ঞস্বরূপ প্রত্যেক ক্রিয়াতেই উহা অন্তর্নিহিত থাকে, অপরকে এই দান অপরিহার্য, অপরকে জগৎকে ফলপ্রদ দান, ইহা ব্যতীত আমাদের কর্ম হয় সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর এবং যে সংহতি ও আদানপ্রদান বিশ্বের সত্য নীতি, ঐরূপ কর্ম হয় তাহার উল্লঙ্ঘন। আমাদের কর্মের বাহ্য দিশাবী বা সাহায্যদাতাকেই হউক বা আমাদের অন্তরস্থিত অপ্রকট বা প্রকট ভগবানকেই হউক, যজ্ঞীয় কর্মের নেতৃবৃন্দকে যে দক্ষিণা দেওয়া, দান বা আত্মদান করা অতি প্রয়োজনীয়, এই কর্ম সেই দক্ষিণা বিনা করা হইবে। উহা মন্ত্র বিনা করা হইবে, আমরা যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণের সেবা করি, তাঁহাদের অভিমুখে উন্নীত আমাদের সঙ্কল্প ও জ্ঞানের পূত দেহস্বরূপ যে নিবেদনপরায়ণ চিন্তা, তাহাই মন্ত্র। তামসিক মানব দেবতাগণের উদ্দেশে তাহার যজ্ঞ অর্পণ করে না, পরন্তু ভূত ও প্রেতগণের উদ্দেশে অথবা যে সকল অশুদ্ধ শক্তি অন্তরালে থাকিয়া তাহাব কর্ম নিজেদের ভোগে লাগায় এবং তাহাদের অন্ধকারের দ্বারা তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে। *

রাজসিক মানব তাহার যজ্ঞ অর্পণ করে নিম্নতর দেবগণের উদ্দেশে অথবা ধনের রক্ষক যক্ষগণ কিংবা অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি বিভ্রষ্ট শক্তিসকলের উদ্দেশে। তাহার যজ্ঞ বাহ্যত শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রেরণা হয় আড়ম্বর প্রদর্শন বা দম্ভ অথবা তাহার কর্মের ফলের জন্য তীব্র কামনা, পুরস্কারের জন্য প্রচণ্ড দাবি (১)। অতএব যে-কর্ম প্রচণ্ড অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিগত বাসনা হইতে উদ্ভূত হয় অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জগতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত দাম্ভিক সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত হয়, সে সবই হইতেছে রাজসিক প্রকৃতির, যদিও তাহা জ্যোতির চিহ্ন ধারণ করিয়া আত্মগোপন করে, যদিও তাহা বাহ্যত যজ্ঞরূপে সম্পাদিত হয়, যদিও লোক দেখান ভাবে তাহা ভগবানকে বা দেবগণকে অর্পণ করা হয়, মূলত তাহা

* যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭।৪

(১) অভিসন্ধায় তু ফলম্ দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৭।১২

একটা আসুরিক ক্রিয়াই থাকিয়া যায়। আমাদের কর্মের যে দৃশ্যমান অভিসন্ধান, যে দেবতার নাম লইয়া আমরা সে কর্ম সমর্থন করি, এমন কি যে বুদ্ধিগত ঐকান্তিক বিশ্বাসের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, সে-সবের দ্বারা আমাদের কর্মের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হয় না, সে মূল্য নির্ধারিত হয় কেবল আভ্যন্তরীণ ভাব, প্রেরণা ও অভিসন্ধানের দ্বারা। যেখানেই আমাদের কর্মে অহংভাবের প্রাধান্য থাকে সেখানেই তাহা হয় রাজসিক যজ্ঞ। অন্যপক্ষে প্রকৃত সাত্ত্বিক যজ্ঞ তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা চেনা যায় (১)। প্রথমত উহা সাফল্যপ্রদ সত্যের দ্বারা প্রেরিত যথার্থ নীতি, সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম, আমাদের কর্মের যথাযথ ছন্দ ও ধারা অনুসারে, তাহাদের সত্য পদ্ধতি অনুসারে, ধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত, বিধিদিষ্টঃ, ইহার অর্থ এই যে, বুদ্ধি ও প্রবুদ্ধ সঙ্কল্প ঐ সকল কর্মের গতি ক্রম ও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বিতীয়ত, যে দিব্য নিয়ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার দ্বারাই নির্ধারিত প্রকৃত যজ্ঞরূপে উহা আমাদের কর্তব্য, যষ্টব্যম্, এই চিন্তায় মনকে একাগ্র ও নিবদ্ধ করিয়া ঐ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই জন্যই তাহা এক সমুচ্চ আভ্যন্তরীণ বাধ্যতা ও অবশ্যপালনীয় সত্য অনুসারে করা হয়, তাহাতে ব্যক্তিগত ফল লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না—কর্মটির প্রেরণা এবং যে শক্তি উহাতে নিয়োজিত হয় তাহার ভাব যত নির্ব্যক্তিক হয় ততই উহা সাত্ত্বিক প্রকৃতিব হয়। আর শেষত, উহা সম্পূর্ণভাবে দেবগণকে উৎসর্গ করা হয়, বিশ্বের অধীশ্বর যে দেবশক্তিসকলের দ্বারা বিশ্ব পরিচালন করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহারই ছদ্মবেশ ও বিভিন্ন রূপ, তাঁহাদের দ্বারা উহা পরিগৃহীত হয়।

অতএব গীতা যে রকম কর্ম চায় সাত্ত্বিক যজ্ঞ হইতেছে সেই আদর্শের খুবই নিকটবর্তী এবং সাক্ষাৎভাবে সেই দিকেই লইয়া যায়; এইটি চরম বা উচ্চতম আদর্শ নহে, এইটি এখনও সেই সিদ্ধপুরুষের কর্ম নহে যিনি দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন। কারণ ইহা একটি স্থিরনির্দিষ্ট ধর্মরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এবং ইহা সেবা বা যজ্ঞরূপে দেবগণের উদ্দেশে অর্পিত হয়, যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্, আমাদের মধ্যে, জগতের মধ্যে প্রকট ভগবানের কোন আংশিক শক্তি বা বিভাবের উদ্দেশে অর্পিত হয়। নিঃস্বার্থ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম, মানবজাতির জন্য অনুষ্ঠিত স্বার্থহীন কর্ম, ন্যায় বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য নির্ব্যক্তিকভাবে সম্পন্ন কর্ম—এই সব হইতেছে এইরূপ কর্ম এবং এইরূপ কর্ম আমাদের পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়; কারণ ইহা আমাদের চিন্তা, সঙ্কল্প ও প্রাকৃত মূল সত্তাকে বিশুদ্ধ করে। সাত্ত্বিক কর্মের যে চূড়ান্ত

(১) অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১৭।১১

পরিণতিতে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা আরও উদারতর ও মুক্ত-তর: তাহা হইতেছে সমুচ্চ শেষ যজ্ঞ, আমাদের দ্বারা পরম সমগ্র ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত; তাহার সহিত থাকে পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথবা যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে বাসুদেব দর্শন; সে-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নির্ব্যক্তিক ভাবে, বিশ্বজনীন ভাবে, জগতের হিতের জন্য বিশ্বমাঝে ভগবৎ ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য। ঐ পরিণতি উহাকে নিজের ঊর্ধ্বে, অমৃত ধর্মে লইয়া যায়। কারণ তখন আইসে একটা মুক্তি, সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্মই নাই, কোন সাত্ত্বিক ধর্মবিধি, কোন শাস্ত্রবিধানের গণ্ডী নাই; নীচের বুদ্ধি ও সংকল্পকেও ছাড়াইয়া উঠা হয়, তাহাদের পরিবর্তে এক উচ্চতর প্রজ্ঞা কর্মটিকে নির্দেশ করে, পরিচালন করে, এবং নিশ্চিতভাবে উহার লক্ষ্যে লইয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিগত ফলের কোন কথাই নাই; কারণ যে সংকল্পটি কার্য করে তাহা আমাদের নিজেদের নহে, তাহা হইতেছে এক পরমতম সংকল্প, জীব তাহার যন্ত্রস্বরূপ। সেখানে আত্মপরতা বা আত্মত্যাগ কিছুই নাই; কারণ জীব ভগবানের সনাতন অংশ, জীব তাহার অস্তিত্বের উচ্চতম সত্তার সহিত যুক্ত হয়, আর সেই সত্তায়, সেই আত্মায় সে এবং সকলে এক। সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্ম নাই কারণ সকল কর্মই আমাদের কর্মের অধীশ্বরকে সমর্পিত হয় এবং তিনি নিজেই রূপান্তরিত প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্মটি সম্পাদন করেন। সেখানে কোন যজ্ঞ নাই—অবশ্য আমরা বলিতে পারি যে, যজ্ঞের অধীশ্বর জীবের মধ্যে তাঁহার শক্তিব কর্মকে তাঁহার নিজেরই বিশ্বরূপের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছেন। যজ্ঞরূপে কর্ম নিজেকে অতিক্রম করিয়া এই উচ্চতম স্তরেই উপনীত হয়। যে-জীব ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে তাহার পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়াছে ইহাই তাহার সিদ্ধ অবস্থা।

তামসিক * তপস্যা অনুসৃত হয় আজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণার বশে, নিজের ভ্রান্তিতে তাহা দৃঢ় ও অবিচল, কোন আদৃত মিথ্যায় অজ্ঞান বিশ্বাসের দ্বারা তাহা সমর্থিত, কোন সত্য বা মহান লক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য একটা ক্ষুদ্র ও নীচ স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া ও আত্মপীড়নের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় অথবা তাহা অপরের অনিষ্ট সাধনের সংকল্পে শক্তিকে একাগ্র করিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার শক্তি প্রয়োগ তামসিক হয় কোন জড়তার ধর্মের দ্বারা নহে, কারণ তপস্যার সহিত জড়তার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু মন ও প্রকৃতিতে একটা তমিস্রা, ক্রিয়াটিতে একটা নীচ সংকীর্ণতা ও কদর্যতা অথবা লক্ষ্য বা প্রেরণায় একটা পাশব প্রবৃত্তি বা বাসনার জন্যই ঐ তপস্যা তামসিক হয়। রাজসিক তপস্যা *

* মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম॥ ১৭।১৯
* সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৭।১৮

হইতেছে সেই সব প্রক্রিয়া যাহা মানুষের নিকট হইতে মান ও পূজা লাভ করিবার নিমিত্ত, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও বাহ্যিক যশ ও মহত্ত্ব লাভের নিমিত্ত অথবা ঐরূপ অন্য কোন অহংভাবময় সংকল্প ও গর্বের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার তপস্যা ক্ষণস্থায়ী বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ সবের দ্বারা আত্মার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ ও সর্বাঙ্গসিদ্ধিতে কোনই সহায়তা হয় না; ইহার কোন নির্দিষ্ট শ্রেয়স্কর নীতি নাই, ইহা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী উপলক্ষ্যের সহিত জড়িত এবং ইহার নিজেরও ঐ রূপ, চলমধ্রুবম্। আর যদিও বা দৃশ্যত কোন অধিকতর অন্তর্মুখী ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং শ্রদ্ধা ও সংকল্পটি উচ্চতর ধরনের হয়, তথাপি যদি কোনরূপ ঔদ্ধত্য বা গর্ব বা প্রচণ্ড স্বৈরসংকল্পের বা বাসনার তীব্রবেগ ঐ তপস্যায় প্রবেশ করে অথবা যদি উহা অশাস্ত্রবিহিত, জীবন ও কর্মের যথাযথ নীতির বিরোধী, নিজের ও অপরের অনিষ্টকারক কোন প্রচণ্ড, উচ্ছৃংখল বা ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত করায় অথবা যদি উহা আত্মপীড়নমূলক হয় এবং মন প্রাণ ও শরীরকে ক্লিষ্ট করে অথবা আমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত ভগবানকে উৎপীড়ন করে তাহা হইলেও ইহা হয় অবিমৃষ্য রাজসিক বা রজোতামসিক তপস্যা।†

সাত্ত্বিক তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় উচ্চতম সম্বুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত, গভীরতমভাবে গৃহীত কর্তব্যরূপে অথবা কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বা অন্য উচ্চতর কারণের জন্য, সেখানে কোন বাহ্যিক বা সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহার স্বরূপ হইতেছে আত্মসংযম, তাহার জন্য চাই আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজের প্রকৃতিতে একটা সুসামঞ্জস্য। গীতা তিন প্রকার সাত্ত্বিক তপস্যা বর্ণনা করিয়াছে।* প্রথমটি হইতেছে শারীরিক, তাহা বাহ্য কর্মের তপস্যা; এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের সম্মান ও পূজা, দেহ, কর্ম ও জীবনের শুচিতা, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা। তাহার পর হইতেছে বাঙ্ময় তপস্যা,—শাস্ত্রপাঠ, সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য এবং যত্ন সহকারে সেইসকল বাক্য পরিহার যাহা অপরের ভয়,

† অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ১৭।৫, ৬

* দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭।১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৭।১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৭।১৬

দুঃখ বা উদ্বেগ জন্মায়। শেষত হইতেছে মানসিক ও নৈতিক সিদ্ধির তপস্যা,—ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিকে নির্মল করা, মৃদুতা এবং মনের স্বচ্ছ ও শান্ত প্রসন্নতা, আত্মসংযম ও মৌন। যাঁহা কিছু রাজসিক ও অহঙ্কৃত প্রকৃতিকে স্থির ও সংযত করে এবং ইহার পরিবর্তে শুভ ও পুণ্যের প্রসন্ন ও শান্ত নীতি প্রতিষ্ঠিত করে সেই সবই এখানে রহিয়াছে। ইহাই সেই সাত্ত্বিক ধর্মের তপস্যা যাহাকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হইত। ইহার মহত্তর পরিণতি হইবে বুদ্ধি ও সংকল্পের সমুচ্চ বিশুদ্ধি, আত্মার সমতা, গভীর শান্তি ও অচঞ্চলতা, উদার সহানুভূতি এবং একত্বের সাধনা, মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে অন্তপুরুষের দিব্য প্রসন্নতার প্রতিচ্ছায়া। সেই সমুচ্চ শিখরে নৈতিক রূপ ও প্রকৃতি ইতিমধ্যেই আধ্যাত্মিক রূপ ও প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া যাইতেছে। আর এই পরিণতিটি নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে, এক উচ্চতর ও মুক্ততর জ্যোতির মধ্যে ইহাকে উন্নীত করা যাইতে পারে, ইহা পরমা প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠ দিব্য শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। আর তখন যাহা থাকিবে তাহা হইবে আত্মারই নিষ্কলুষ তপঃ, সকল অঙ্গে এক উচ্চতম সংকল্প ও জ্যোতির্ময় শক্তি, তাহারা কর্ম করিবে এক উদার ও জমাট শান্তি এবং এক গভীর ও বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে। অতএব তখন আর তপস্যার কোন প্রয়োজন থাকিবে না, তপস্যা থাকিবে না, কারণ তখন সবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে হইবে দিব্য, সবই হইবে সেই তপঃ। সেখানে নীচের শক্তির কোন স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা থাকিবে না, কারণ প্রকৃতির শক্তি পুরুষোত্তমের লোকোত্তর সংকল্পের মধ্যে তাহার প্রকৃত উৎস ও ভিত্তির সন্ধান পাইবে। তখন এই শক্তির ক্রিয়াগুলি এই ভাবে উচ্চস্তর হইতে প্রবর্তিত হওয়ায় নিম্নতর স্তর-সকলেও তাহারা এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম সংকল্প হইতে এবং এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম পরিচালনায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলিতে থাকিবে। বর্তমান ধর্মসকলের কোন বাধাই আর তখন থাকিবে না, কারণ তখন কর্ম হইবে মুক্ত, তাহা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বহু ঊর্ধ্বে, কিন্তু সাত্ত্বিক কর্মবিধির অতি-সতর্ক ও সংকীর্ণ গণ্ডীরও বহু ঊর্ধ্বে।

যেমন তপস্যা সম্বন্ধে তেমনই সকল দানও হইতেছে জ্ঞানহীন তামসিক অথবা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক অথবা নিঃস্বার্থ ও জ্ঞানোদ্ভাসিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির।* তামসিক দান অর্পিত হয় অজ্ঞভাবে, তাহাতে যথাযথ দেশ কাল

* দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম॥ ১৭।২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম॥ ১৭।২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতম্ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭।২২

ও পাত্রের কোন বিবেচনা থাকে না; ইহা নির্বোধ ও বিবেচনাশূন্য এবং বস্তুত স্বার্থপর ক্রিয়া, অনুদার ও হেয় বদান্যতা, সে-দানে সহানুভূতি থাকে না, প্রকৃত ঔদার্য থাকে না, গ্রহীতার হৃদ্‌গত ভাবের কোন হিসাব লওয়া হয় না, তাহা গৃহীত হইলেও অবজ্ঞার সহিত গৃহীত হয়। রাজসিক দান হইতেছে যাহা অপ্রসন্নচিত্তে অনিচ্ছার সহিত অথবা নিজেকে পরিক্লিষ্ট করিয়া অথবা ব্যক্তিগত বা অহংমন্য উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কোন দিক হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা বা গ্রহীতার নিকট হইতে অনুরূপ বা অধিকতর লাভের আশা লইয়া সম্পাদিত হয়। সাত্ত্বিক দান হইতেছে যথাযথ যুক্তি ও সদিচ্ছা ও সহানুভূতির সহিত যথাযথ দেশ ও কালে এমন যথাযথ পাত্রকে দান করা যে যোগ্য অথবা যাহার পক্ষে দানটি প্রকৃতই সাহায্যপ্রদ হয়। কর্তব্যবোধে ঐ দান ও উপকার করা হয়, গ্রহীতার নিকট হইতে কোন পূর্বকৃত উপকার বা ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য নহে, সে কর্মের কোনরূপ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। সাত্ত্বিক দানের পরিণতি কর্মের মধ্যে ক্রমশ বেশী-বেশী লইয়া আসিবে অপরের প্রতি, জগতের প্রতি এবং ভগবানের প্রতি উদার আত্মদান, আত্মসমর্পণ—কর্ম-যজ্ঞের এই সমুচ্চ উৎসর্গই গীতার বিধান। আর দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নয়ন হইবে আত্ম-নিবেদনের মহত্তম পরিপূর্ণতা, জীবনের উদারতম অর্থের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান নিজেকে এবং নিজের শক্তিসকলকে দান করিতেছেন, এই সর্বভূতের মধ্যে তাঁহার সত্তা ও আত্মাকে অমিতভাবে ঢালিয়া দিতেছেন, ইহার দ্বারাই এই সমগ্র বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে এবং নিরন্তর সংরক্ষিত হইতেছে; বেদ বলিয়াছে, বিশ্বজীবন হইতেছে পুরুষের আত্মবলিদান, পুরুষ-যজ্ঞ। সিদ্ধ জীবেরও সকল কর্ম হইবে ঠিক এইরূপই নিজেকে এবং নিজের শক্তিসকলকে নিরন্তর দিব্যভাবে দান করা, ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার প্রভাব ও প্রেরণা হইতে সে যে জ্ঞান, জ্যোতি, বল, প্রেম, আনন্দ, সাহায্যপ্রদ শক্তি লাভ করিয়াছে সেই সমুদয় তাহার চতুর্দিকে সকলের উপরে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অথবা এই সমগ্র জগৎ ও ইহার জীবসমুদয়ের উপর ঢালিয়া দেওয়া। আমাদের জীবনের যিনি অধীশ্বর, তাঁহার নিকট জীবের সমগ্র আত্মদানের উহাই হইবে সমগ্র ফল।

গীতা যে-কথা বলিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতে সেটি দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়।* গীতা বলিয়াছে ওঁ তৎ সৎ এই বাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের ত্রিবৃৎ সংজ্ঞা, পুরাকালে ব্রহ্মেরই দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ যজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বাক্যের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। তৎ

* ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭।২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৭।২৪

শব্দে বুঝায় কৈবল্যাত্মক সত্তা (the Absolute)? সৎ শব্দে বুঝায় পরম বিশ্বময় সত্তার মূল তত্ত্ব। ওঁ হইতেছে ত্রিবৃৎ ব্রহ্মের প্রতীক; বহির্মুখী, অন্তর্মুখী বা সূক্ষ্ম এবং অতিচেতন কারণ পুরুষ। এই তিনটি যথাক্রমে অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা বুঝায় এবং সমগ্র ওঁ শব্দটির দ্বারা চতুর্থ অবস্থা তুরীয় বুঝায়, তাহাই কৈবল্যাত্মক সত্তায় উঠিয়া যায়। প্রারম্ভে প্রশস্তি স্বরূপ ওঁ এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া সকল যজ্ঞ দান ও তপস্যা ক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়, ইহার দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, আমাদের কর্মকে করিতে হইবে আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তায় ত্রিবৃৎ ভগবানের প্রকাশ এবং পরিকল্পনা ও লক্ষ্যে তাহাকে ভগবদ্‌মুখী করিতে হইবে। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ ফল-কামনারহিত হইয়া এবং কেবল তাঁহাদের প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত পরম ভগবানের ধারণা অনুভূতি ও আনন্দ লইয়া এইসকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।*

তাঁহারা তাঁহাদের কর্মে এই বিশুদ্ধতা ও নির্ব্যক্তিকতার দ্বারা, এই সমুচ্চ নিষ্কামতা, এই উদার অহমিকাশূন্যতা ও অধ্যাত্ম সমৃদ্ধির দ্বারা ঐ ভগবানেরই সন্ধান করেন। সৎ শব্দে শ্রেয় বুঝায়, অস্তিত্বও বুঝায়। শ্রেয়ের নীতি এবং সত্যের নীতি এই দুইটিই ঐ তিন প্রকার কর্মের মধ্যে থাকা চাই। সকল শুভ-কর্মই সৎ, কারণ তাহারা জীবাত্মাকে আমাদের জীবনের উচ্চতর সত্তার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে; যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে সুদৃঢ় নিষ্ঠা এবং উহাকেই মূল লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞরূপে, দানরূপে, তপস্যারূপে যে-সব কর্ম করা যায় সে সমুদয়ই হইতেছে সৎ, কারণ তাহারা আমাদের আত্মার উচ্চতম সত্যের ভিত্তি গড়িয়া দেয়। আর যেহেতু শ্রদ্ধাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল নীতি, এই সবের যে-কোনটি অশ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদন করা যায় সেইটিই হয় মিথ্যা, পৃথিবীতে বা পরকালে তাহার কোন প্রকৃত অর্থ বা সত্য সারবত্তা থাকে না, ইহজীবনে অথবা মর-জীবনের পরে আমাদের চেতন আত্মার মহত্তর লোকসমূহে কোন বাস্তব সত্তা থাকে না, স্থিতি বা সৃষ্টির কোন শক্তিই থাকে না। অন্তঃপুরুষের যে শ্রদ্ধা, কেবল বুদ্ধিগত বিশ্বাস নহে, পরন্তু জানিবার দেখিবার, বিশ্বাস করি-বার এবং নিজ দৃষ্টি ও জ্ঞান অনুসারে কর্ম করিবার, নিজেকে গড়িয়া তুলিবার

* তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ১৭।২৫-২৮

যে একাগ্র সংকল্প তাহাই তাহার শক্তির শ্বারা আমাদের বিবর্তনের সম্ভাবনা-সকল নির্দেশ করিয়া দেয়, আর আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সত্তা, প্রকৃতি ও কর্মে এই শ্রদ্ধা ও সংকল্পকে যাহা কিছু উচ্চতম, দিব্যতম ও শাশ্বত, সেই সমুদয়ের অভিমুখী করিয়াই আমরা পরমতম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারি।

ঊনবিংশ অধ্যায়

গুণ, মন ও কর্ম*

গুণত্রয় সম্বন্ধে এবং উচ্চতম সাত্ত্বিক সাধনা তাহার পরিণতিতে যে নিজেকে অতিক্রম করিয়া গুণত্রয়ের অতীতে লইয়া যায় সেই সম্বন্ধে এই মূল পরিকল্পনার আলোকে গীতা কর্মের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আত্মবিকাশশীল কর্মের পশ্চাতে, বিশেষত জীবেব পক্ষে কর্মের দ্বারা তাহার পূর্ণ অধ্যাত্মবিকাশ সাধনের পশ্চাতে প্রধান ও অপরিহার্য শক্তি হইতেছে শ্রদ্ধা—যে সত্য আমরা দর্শন করিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিবার এবং সেই সত্য হইবার, জানিবার, জীবনে ও কর্মে বাস্তবে পরিণত করিবার সংকল্প। কিন্তু মানসিক শক্তিগুলিও রহিয়াছে, তাহারা যন্ত্র ও আবশ্যকীয় বিধানরূপে কর্মের বেগ, গতি ও স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং সেই হেতু এই আভ্যন্তরীণ সাধনা সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাহারাও প্রয়োজনীয়। গীতা তাহার মহান চরম সিদ্ধান্ত দিবার পূর্বে ইহাদের সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই সিদ্ধান্তেই তাহার সকল শিক্ষার পরিণতি, তাহাই হইতেছে উচ্চতম রহস্য, অধ্যাত্মভাবে সকল ধর্মের উপরে উঠিয়া যাওয়া, দিব্য ঊর্ধ্বায়ন। প্রধান ভাবটিকে পূর্ণভাবে ধরিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে সংক্ষেপে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুসরণ করিতে হইবে; কারণ এইগুলি হইতেছে গৌণ জিনিস অথচ প্রত্যেকেই আপন বিশিষ্ট স্থানে এবং বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। গুণত্রয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাহাদের যে নির্দিষ্ট ক্রিয়া তাহাই আমরা গীতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে প্রকট করিব; গুণত্রয়ের অতীতে তাহাদের প্রত্যেকের পরিণতির যাহা স্বরূপ তাহা ঊর্ধ্বায়নের সাধারণ স্বরূপ হইতে আপনা হইতেই আসিবে।

অর্জুনের এক শেষ প্রশ্নের দ্বারা বিষয়টির এই অংশটি আরম্ভ করা হইয়াছে, সে প্রশ্ন হইতেছে সন্ন্যাসের তত্ত্ব, ত্যাগের তত্ত্ব এবং তাহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে।* গীতা এই বিশিষ্ট প্রভেদটি পুনঃ-পুনঃ উল্লেখ করিয়াছে, ইহার উপর জোর দিয়াছে, এবং এরূপ করা যে ঠিকই হইয়াছিল ভারতীয় মনের

* গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় ১—৩৯

* সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদন॥ ১৮।১

পরবর্তী ইতিহাসই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; পরবর্তী চিন্তাধারায় এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিসকে সেবলই গোলমাল করা হইয়াছে, এবং গীতা যে-কর্মের শিক্ষা দিয়াছে সেরূপ কর্মকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, বড় জোর সন্ন্যাসের পরম নিষ্ক্রিয়তার উপক্রমণিকা-রূপেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুত লোকে যখন ত্যাগের কথা, বৈরাগ্যের কথা বলে তখন এই কথার দ্বারা তাহারা সংসারত্যাগই বুঝে, অন্তত ইহারই উপরে তাহারা জোর দেয়; কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তদনুসারে ত্যাগের ভিত্তি হইতেছে কর্ম এবং সাংসারিক জীবন, মঠে, গুহায় বা শৈলশিখরে পলায়ন করা নহে। প্রকৃত ত্যাগ হইতেছে কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করা এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

সাত্ত্বিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া সেটিকে ত্যাগের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই—ঐটি হইতেছে অপরিহার্য; কিন্তু কি ত্যাগ এবং কিরূপ ভাবে? সংসারের কর্ম ত্যাগ নহে, কোন বাহ্যিক কৃচ্ছ্রতা বা ভোগবর্জনের বাহ্য আড়ম্বর নহে, পরন্তু রাজসিক বাসনা ও অহংয়ের ত্যাগ, বর্জন, বাসনাত্মক আত্মার, অহংমন্য মনের এবং রাজসিক প্রাণপ্রকৃতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনের সন্ন্যাস বা সম্যক পরিত্যাগ। যোগশিখরে আরোহণ করিবার পক্ষে ঐটিই হইতেছে সত্য প্রয়োজন, সে আরোহণ নির্ব্যক্তিক আত্মা ও ব্রাহ্মী একত্বের ভিতর দিয়াই হউক অথবা বিশ্বগত বাসুদেবের ভিতর দিয়াই হউক অথবা আভ্যন্তরীণ ভাবে পরম পুরুষোত্তমের মধ্যেই হউক। আর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা হিসাবে. পণ্ডিতদের প্রচলিত ভাষায় সন্ন্যাস হইতেছে কাম্যকর্মসমূহের বাহ্যিক ন্যাস বা পরিহার; জ্ঞানীগণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ত্যাগকেই ত্যাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন আমাদের কর্মসকলের ফলের প্রতি, কর্মটিরই প্রতি অথবা ইহার ব্যক্তিগত প্রবর্তনা বা রাজসিক প্রেরণার প্রতি সকল আসক্তি সম্পূর্ণভবে বর্জন করা—ইহাই ত্যাগ, এবং গীতা সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে এই প্রভেদই করিয়াছে।* ঐ অর্থে ত্যাগই উৎকৃষ্টতর পন্থা, সন্ন্যাস নহে। কাম্য কর্মসকলকে যে বর্জন করিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু যে কামনার জন্য উহারা কাম্য কর্ম হয় সেইটিকেই আমাদের মধ্য হইতে দূর করিতে হইবে। কর্মের অধীশ্বরের বিধানে কর্মের ফল আসিতে পারে কিন্তু কর্ম করিয়া পুরস্কার স্বরূপ বা শর্ত স্বরূপ ঐ ফলের কোনরূপ অহমিকাপূর্ণ দাবি থাকিলে চলিবে না। অথবা ফলটি আদৌ না আসিতে পারে তথাপি কর্মটি করিতে হইবে এইজন্য যে উহা কর্তব্য, আমাদের অন্তর্যামী ভগবান ঐ কর্ম আমাদের নিকট হইতে দাবি করিতেছেন। সফলতা বা বিফলতা তাঁহারই

* কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮।২

হস্তে এবং তিনি তাঁহার সর্বদর্শী সঙ্কল্প ও দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য অনুসারেই তাহা নির্ধারিত করিবেন। অবশ্য কর্ম, সকল প্রকার কর্মই শেষ পর্যন্ত সংন্যস্ত করিতে হইবে, বাহ্যিক ভাবে কর্ম হইতে বিরত থাকিয়া নহে, নিশ্চলতা বা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, পরন্তু সকল কর্ম অধ্যাত্মভাবে সমর্পণ করিতে হইবে আমাদের জীবনের অধীশ্বরকে যাঁহার শক্তি ভিন্ন কোন কর্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। নিজদিগকে কর্তা বলিয়া আমাদের যে মিথ্যা ধারণা আছে তাহা ত্যাগ করা চাই; কারণ বস্তুত বিশ্বশক্তিই আমাদের ব্যক্তিত্ব ও আমাদের অহংয়ের মধ্য দিয়া কর্ম করে। আমাদের সকল কর্ম ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তির নিকটে অধ্যাত্মভাবে অর্পণ করা, গীতার শিক্ষায় ইহাই হইতেছে প্রকৃত সন্ন্যাস।

কোন্‌-কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে, এই প্রশ্নটি তখনও উঠে। যাঁহারা বলেন বাহ্যিক কর্ম পরিত্যাগই চরম লক্ষ্য তাঁহারাও এই দুরূহ বিষয়টিতে একমত নহেন। কেহ-কেহ বলেন আমাদের জীবন হইতে সকল কর্ম ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে, যেন তাহা আদৌ সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই দেহে জীবিত রহিয়াছি ততক্ষণ ইহা সম্ভব নহে * ; আর আমাদের কর্মশীল সত্তাকে সমাধির দ্বারা মৃৎপিন্ড বা পাথরের প্রাণহীন নিশ্চলতায় পরিণত করাই মোক্ষের অর্থ হইতে পারে না। সমাধির যে নিশ্চল নীরবতা তাহাতেও সমস্যাটির সমাধান হয় না, কারণ যখনই দেহের মধ্যে আবার শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়া আসিবে তখনই আবার আমাদের কর্ম আরম্ভ হইবে, আধ্যাত্মিক নিদ্রার দ্বারা আমরা যে-মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার শিখর হইতে আমরা পড়িয়া যাইব। কিন্তু প্রকৃত যে-মোক্ষ, আভ্যন্তরীণভাবে অহং বর্জনের দ্বারা মুক্তি এবং পুরুষোত্তমের সহিত যোগ, তাহা সকল অবস্থাতেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকে, এই জগতে বা ইহার বাহিরে যে জগতেই হউক বা সকল জগতের বাহিরেই হউক, তাহা স্ব-প্রতিষ্ঠ থাকে, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি, এবং তাহা নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে কোন্‌-কোন্‌ কর্ম করিতে হইবে? পূর্ণ সন্ন্যাসমতাবলম্বীদের উত্তর (গীতা ইহার উল্লেখ করে নাই, সম্ভবত গীতার যুগে ইহা তেমন প্রচলিত হয় নাই) এইরূপ হইতে পারে যে, ইচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে কেবল ভিক্ষা, আহার এবং ধ্যান এই সবই করা চলিবে, তাহা ছাড়া কেবল শরীরের অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়াগুলি চলিবে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, অধিকতর উদার ও ব্যাপক সমাধান হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি সর্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম করিয়া যাওয়া। আর গীতা

* ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তুকর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১৮।১১

বলিয়াছে, এইগুলি অবশ্যকর্তব্য, কারণ ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ করে। * কিন্তু আরও সাধারণভাবে, এবং এই তিনটি কর্মকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে, নিয়তং কর্মই করিতে হইবে, শাস্ত্র অর্থাৎ যথাযথ জ্ঞান, যথাযথ কর্ম, যথাযথ জীবনপ্রণালীর বিদ্যা ও প্রয়োগনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, অথবা মূল প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, স্বভাব-নিয়তং কর্ম, অথবা শেষত ও শ্রেষ্ঠত হইতেছে আমাদের মধ্যে ও ঊর্ধ্বে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম। শেষোক্তটি হইতেছে মুক্তপুরুষের যথার্থ এবং একমাত্র কর্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম। এই সকল কর্ম পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে, গীতা ইহা অতি স্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে নির্দেশ করিয়াছে, নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। † মুক্তির জন্য ঐরূপ পরিত্যাগই যথেষ্ট এই অজ্ঞান বিশ্বাসের বশে ঐ সকল কর্ম ত্যাগ করা হইতেছে তামসিক ত্যাগ। আমরা দেখিতে পাই যে, যেমন কর্মের মধ্যে তেমনিই কর্মত্যাগের মধ্যেও গুণসকল আমাদিগকে অনুসরণ করে। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি আসক্তির বশে, সঙ্গ অকর্ম্মণি, কর্ম পরিত্যাগ করিলে তাহা সমানভাবেই তামসিক ত্যাগ হইবে। আর তাহারা দুঃখ আনয়ন করে, অথবা দেহের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়, মনের পক্ষে ক্লান্তিকর হয় বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ করা অথবা সবই তুচ্ছ এবং আত্মার পক্ষে বিরক্তিকর এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম পরিত্যাগ করা হইতেছে রাজসিক * এবং তাহা উচ্চ অধ্যাত্ম ফল আনয়ন করিতে পারে না, নৈব ত্যাগফলং লভেৎ; সেইটিও প্রকৃত ত্যাগ নহে। ইহা মানসিক দুঃখবাদ বা প্রাণিক ক্লান্তি হইতে উদ্ভূত, অহংয়ের মধ্যেই ইহার মূল। এই অহংমুখী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ত্যাগ হইতে কোনরূপ মুক্তি লাভ হয় না।

ত্যাগের সাত্ত্বিক নীতি হইতেছে কর্ম হইতে সরিয়া থাকা নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত দাবি হইতে, কর্মের পিছনে যে অহং থাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া। † ইহা হইতেছে এমন কর্ম করা যাহা কামনার দ্বারা প্ররোচিত নহে পরন্তু যথাযথ জীবনধারার বিধানের দ্বারা প্ররোচিত অথবা মূল প্রকৃতি, তাহার জ্ঞান, তাহার আদর্শ, নিজের উপর এবং যে-সত্য সে দর্শন করে তাহার উপর তাহার বিশ্বাস, তাহার শ্রদ্ধার দ্বারা প্ররোচিত। অথবা, উচ্চতর অধ্যাত্ম

* যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮।৫

† নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮।৭

* দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ১৮।৮

† কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

স্তরে, সে-সব কর্ম আদিষ্ট হয় ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা এবং যোগস্থ মনের দ্বারা তাহারা সম্পাদিত হয়, কর্মটিতে বা কর্মের ফলটিতে কোনও ব্যক্তিগত আসক্তি থাকে না। সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিতে হইবে সমস্ত কামনা, সকল আত্মপর অহংমুখী মনোনয়ন ও প্রেরণা এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পের সেই সূক্ষ্ম অহংভাব যাহা বলে, "কর্মটি আমার, আমিই কর্মী।" অথবা "কর্মটি ভগবানের, কিন্তু আমিই কর্মী"। সুখকর, বাঞ্ছনীয়, লাভজনক বা সাফল্যময় কর্মে কোনরূপ আসক্তি রাখা চলিবে না অথবা কোন কর্ম এইরূপ বলিয়াই করা চলিবে না; কিন্তু ঐরূপ কর্মও করিতে হইবে—সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থ-ভাবে, অন্তরাত্মার সম্মতির সহিত—যখন সে-কর্ম ঊর্ধ্ব হইতে এবং আমাদের মধ্য হইতে আদিষ্ট হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম। অসুখকর, অবাঞ্ছনীয় বা অতৃপ্তিকর কর্ম অথবা যে-কর্ম ক্লেশ, বিপদ, কঠোর অবস্থা বা অশুভ পরিণাম আনে বা আনিতে পারে, সেরূপ কর্মের প্রতি কোন বিরাগ থাকিলে চলিবে না, কারণ সেরূপ কর্মও যখন কর্ত্তব্যম্ হইবে তখন তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতার গভীর উপ-লব্ধির সহিত। জ্ঞানী ব্যক্তি কামনাত্মক সত্তার বিরাগ ও কুণ্ঠাসকল বর্জন করেন এবং যে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত, সংস্কারগত অথবা অন্যভাবে সীমাবদ্ধ আদর্শসকলের দ্বারাই বিচার করে তাহার সংশয়সকলকে বর্জন করেন। তিনি পরিপূর্ণ সাত্ত্বিক মনের জ্যোতিতে এবং যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ আত্মাকে নির্ব্যক্তিকতায়, ভগবানের দিকে, বিশ্বময় ও শাশ্বতময় সত্তার দিকে উন্নীত করে তাহার শক্তি লইয়া তাঁহার প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শ নীতি অনুসরণ করেন অথবা তাঁহার নিগূঢ় অন্তরাত্মায় কর্মের অধীশ্বরের সঙ্কল্প অনুসরণ করেন। কোন ব্যক্তিগত ফলের জন্য অথবা ইহজীবনে কোন পুরস্কারের জন্য অথবা সাফল্য, লাভ বা পরিণামের প্রতি কোনরূপ আসক্তি লইয়া তিনি কর্ম করিবেন না, অদৃশ্য পরলোকে কোন ফলের জন্যও তিনি কর্মে ব্রতী হইবেন না অথবা অন্য জন্মে বা আমাদের ঊর্ধ্বে কোন জগতে যে পুরস্কারের জন্য অপরিপক্ক ধর্মবুদ্ধি লালায়িত হয় তিনি সে-সবও চাহিবেন না। এ-জগতে বা অন্য কোন জগতে, এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই যে ত্রিবিধ কর্মফল, এ-সব হইতেছে যাহারা কামনা ও অহংয়ের দাস কেবল তাহাদেরই জন্য, এ-সব জিনিস মুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করে না।* যে মুক্ত কর্মী আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা তাঁহার কর্ম-সকল এক মহত্তর শক্তিকে অর্পণ করিয়াছেন তিনি কর্ম হইতে মুক্ত। কর্ম

*অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১৮।১২

তিনি করিবেন, কারণ অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, কোন না কোন কর্ম করা দেহধারী জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক, সমীচীন—কর্ম হইতেছে জীবনের দিব্য ধর্মের অংগ, ইহা আত্মার সমুচ্চ শক্তির দিক। ত্যাগের যাহা মূল তত্ত্ব, সত্য ত্যাগ, সত্য সন্ন্যাস তাহা কোন গতানুগতিক নীতি অনুযায়ী কর্মত্যাগ নহে। পরন্তু তাহা হইতেছে নিঃস্বার্থ আত্মা, অহংশূন্য মন, অহংভাব ছাড়াইয়া মুক্ত নির্ব্যক্তিক ও অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগের ভাব, ইহাই হইতেছে সাত্ত্বিক সাধনার উচ্চতম পরিণতির জন্য প্রথম মানসিক প্রয়োজন।

গীতা তাহার পর সাংখ্যদর্শন অনুসারে কর্ম সিদ্ধির পাঁচটি কারণ বা অপরিহার্য প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছে। * এই পাঁচটি হইতেছে, প্রথম, অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও মনের কাঠাম, এইটিই হইতেছে প্রকৃতি-স্থ আত্মার আধার বা অবস্থানভূমি; তাহার পর, কর্তা; তৃতীয়, প্রকৃতির চক্ষু আদি বিবিধ করণ বা যন্ত্রসকল; চতুর্থ, নানাপ্রকার পৃথক-পৃথক চেষ্টা, তাহারই কর্মের শক্তি; এবং শেষত, দৈব (Fate) অদৃষ্ট অর্থাৎ মানুষের কর্তৃকত্ব ছাড়া, প্রকৃতির দৃষ্ট কর্মপদ্ধতি ছাড়া যে-শক্তি বা শক্তিসকল এই সবের পশ্চাতে থাকিয়া কর্মটিকে পরিবর্তিত করিয়া দেয় এবং কর্ম ও কর্মফলের নীতি অনুসারে ফলাফল বিধান করে তাহাদের প্রভাব। এই পাঁচটিকে লইয়াই কর্মের নিমিত্ত কারণ গঠিত, মানুষ কায়, মন বা বাক্যের দ্বারা যে-কোন কর্মই করুক না কেন, তাহার গঠন ও ফল ইহাদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।*

আমাদের বহির্ভাগস্থ ব্যক্তিগত অহংকেই সাধারণত কর্তা বলিয়া মনে করা হয় কিন্তু ইহা হইতেছে যে-বুদ্ধি এখনও জ্ঞানলাভ করে নাই তাহারই মিথ্যা ধারণা। † দৃশ্যত অহংই কর্তা, কিন্তু অহং এবং ইহার সংকল্প হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি ও যন্ত্র, অজ্ঞ বুদ্ধি ইহাদের সহিতই আমাদের আত্মাকে ভ্রান্তভাবে এক করিয়া দেখে, এমন কি মানবীয় কর্মও কেবল ইহাদের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, ঐ কর্মের গতি ও ফল ত দূরের কথা। যখন আমরা অহং হইতে মুক্ত হই তখন আমাদের প্রকৃত আত্মা, নির্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মা,

* পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৮।১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৮।১৪
* শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৮।১৫
† তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮।১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৮।১৭

পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আইসে এবং যে আত্মদৃষ্টিতে সে বিশ্বপুরুষের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করে তাহাতে সে দেখিতে পায়, বিশ্বপ্রকৃতিই কর্মটির কর্তা এবং তাহার পিছনে ভগবানের ইচ্ছাই হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির অধীশ্বর। কেবল যতক্ষণ আমাদের এই জ্ঞান না হইতেছে ততক্ষণই আমরা অহংএর এবং অহংএর সংকল্পের কর্তৃত্বভাবে আবদ্ধ থাকি, যত শুভাশুভ কর্ম করি এবং আমাদের তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির তৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু একবার এই মহত্তর জ্ঞানের মধ্যে বাস করিলে, কর্মের স্বরূপ বা ফল আত্মার মুক্তির কোনই ব্যতিক্রম ঘটায় না। বাহ্যিকভাবে কমটি এই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও রক্তপাতের ন্যায়ই ভীষণ কর্ম হইতে পারে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ যদিও এই সংগ্রামে যোগদান করেন এবং যদিও তিনি এই সমস্ত লোককে হনন করেন, তথাপি তিনি কাহাকেও হনন করেন না, কারণ কর্মটি হইতেছে জগৎসমূহের অধীশ্বরের এবং তিনিই তাঁহার অদৃশ্য সর্বশক্তিমান ইচ্ছায় এই সব সৈন্যকে ইতিপূর্বেই নিহত করিয়াছেন। মানবজাতি যাহাতে নূতন সৃষ্টি, নূতন উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার অতীতের অন্যায়, অত্যাচাব, অধর্ম কর্মের ফল যেন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মুক্ত হইতে পারে সেই জন্যই এই ধ্বংসকাণ্ড প্রয়োজন হইয়াছিল। মুক্তপুরুষের উপর যে-কর্মের ভার অর্পিত হয়, তিনি বিশ্বপুরুষের সহিত আত্মায় এক হইয়া জীবন্ত যন্ত্ররূপে তাহা সম্পাদন করেন। আর এইসব যে অবশ্যম্ভাবী তাহা জানিয়া এবং বাহ্য দৃশ্যের ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কর্ম করেন নিজের জন্য নহে পরন্তু ভগবানের জন্য, মানবের জন্য এবং মানবীয় ও বিশ্বগত শৃঙ্খলার জন্য * ; বস্তুত তিনি নিজে কর্ম করেন না পরন্তু তাঁহার কর্মসকল এবং তাহাদের পরিণতিতে ভাগবত শক্তিরই আবির্ভাব ও প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হন। তিনি জানেন যে, তাঁহার মানসিক, প্রাণিক, ভৌতিক শরীরে—তাঁহার অধিষ্ঠানে— পরাশক্তিই একমাত্র কর্তারূপে অদৃষ্ট কর্তৃক নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, সে অদৃষ্ট বস্তুত অদৃষ্ট নহে, তাহা একটা অন্ধ যন্ত্রবৎ বিধান নহে. পরন্তু তাহা হইতেছে মানুষের কর্মচক্রের পশ্চাতে ক্রিয়মাণ জ্ঞানময় ও সর্বদর্শী ইচ্ছা। এই যে ঘোর কর্ম গীতার সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ, ইহা হইতেছে এমন এক কর্মের চরম দৃষ্টান্ত যাহা দৃশ্যত অশুভ কিন্তু সেই দৃশ্যের অতীতে এক পরম শুভ নিহিত রহিয়াছে। ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত মনুষ্যটিকে সেই কর্ম করিতে হইবে নির্ব্যক্তিকভাবে, লোকসংগ্রহার্থম্, জগৎকে তাহার লক্ষ্যের দিকে ঠিক রাখিবার জন্য, কোন ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা কামনা লইয়া নহে পরন্তু এই জন্য যে, কর্মটি ভগবৎ নির্দিষ্ট।

---

* বিশ্বগত শৃঙ্খলার কথা উঠিতেছে, কারণ মানবসমাজের মধ্যে অসুরের জয়ের অর্থ হইতেছে বিশ্বশক্তি সমূহের দ্বন্দ্বে ততখানি অসুরের জয়।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, কর্মটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে, যে-জ্ঞান লইয়া আমরা কর্ম করি তাহাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া একটা বিপুল পার্থক্য আনিয়া দেয়। গীতা বলিয়াছে, তিনটি জিনিস লইয়া কর্মের মানসিক প্রবর্তনা গঠিত, সেইগুলি হইতেছে, আমাদের সংকল্পের মধ্যে যে-জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতা; আর জ্ঞানের মধ্যে সকল সময়েই আইসে গুণত্রয়ের ক্রিয়া। * এই গুণত্রয়ের ক্রিয়ার জন্যই আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞাত জিনিসের পার্থক্য হয় এবং জ্ঞাতা যে-ভাব লইয়া কর্ম করে তাহারও পার্থক্য হয়।

তামসিক জ্ঞানহীন জ্ঞান (*) হইতেছে বস্তুসকলকে দেখিবার এমন ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ, এমন একটা অলস ও মূঢ় আসক্তিময় ধারা যাহা জগতের বা কৃত কর্মটির বা ইহার ক্ষেত্রটির অথবা কর্ম বা ইহার পরিস্থিতিসকলের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় না। তামসিক মন প্রকৃত কার্য ও কারণ খুঁজিয়া দেখে না, পরন্তু একটি ক্রিয়ায় বা একটি গতানুগতিক কর্মধারায় তীব্র আসক্তির সহিত মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে ব্যক্তিগত কর্মটির সামান্য অংশটুকু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, বস্তুত সে কি করিতেছে তাহা জানে না পরন্তু অন্ধভাবে প্রাকৃত প্রেরণাকেই তাহার কর্মের ভিতর দিয়া এমন সব ফল উৎপাদন করিতে দেয় যে-সব সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বা ব্যাপক জ্ঞান নাই। রাজসিক জ্ঞান (†) হইতেছে তাহাই যাহা এই সর্বভূতের মধ্যে বস্তুসকলকে কেবল তাহাদের পার্থক্য ও কর্ম-বৈচিত্র্যের দিক দিয়াই দর্শন করে, ঐক্যের সত্য নীতি আবিষ্কার করিতে পারে না বা আপন সংকল্প ও কর্মের যথাযথ সমন্বয় করিতে পারে না, পরন্তু অহং ও কামনার নির্দেশই অনুসরণ করে, আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক প্ররোচনা ও শক্তিসকলের আহ্বানে সাড়া দিয়া বহুমুখী অহংমূলক সংকল্প এবং বিচিত্র ও মিশ্র প্রেরণার ক্রিয়া অনুসরণ করে। এই জ্ঞান হইতেছে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের, অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী জ্ঞানেরই মিশ্রণ, আমাদের অর্ধ-জ্ঞান অর্ধ-অজ্ঞানের বিভ্রান্তির ভিতর দিয়া কোন রকম একটা পথ করিবার জন্য মন সে-সবকে জোর করিয়া একত্র জুড়িয়া দেয়। অথবা তাহা একটি অস্থির চঞ্চল নানামুখী ক্রিয়া, তাহার মধ্যে কোন সুদৃঢ় নিয়ামক উচ্চতর

* জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮।১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৮।১৯
(১) যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮।২২
† পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৮।২১

আদর্শ ও সত্য জ্যোতি ও শক্তির স্বপ্রতিষ্ঠ নীতি থাকে না। অন্যপক্ষে সাত্ত্বিক জ্ঞান * এই সব বিভাগের মধ্যে জগৎকে এক অবিভাজ্য সমগ্রতা রূপে দেখে, সকল বিবর্তনের মধ্যে এক অব্যয় সত্তা দেখে; তাহা আপন কর্মের নীতিকে এবং জীবনের সমগ্র লক্ষ্যের সহিত বিশেষ-বিশেষ কর্মের সম্বন্ধকে আয়ত্তাধীন করে; তাহা সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পৈঠাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে এই দৃষ্টি হয় জগতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে, এই সব বিচিত্র সৃষ্টির এক আত্মা, তাহার জ্ঞান; সে দৃষ্টি হয় সকল কর্মের এক অধীশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের সকল শক্তি ভগবানের অভিব্যক্তি বলিয়া এবং কর্মটিও মানুষের মধ্যে এবং তাহার জীবন ও মূল স্বভাবের মধ্যে ভগবানেরই পরম সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞার ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান। ব্যক্তিগত ইচ্ছাটি হয় সম্পূর্ণভাবে সচেতন, জ্ঞানময়, অধ্যাত্মভাবে জাগ্রত, এবং তাহা অদ্বিতীয় একেব মধ্যে বাস করে, কর্ম করে, তাঁহার পরমতম আদেশ অধিকতর সম্পূর্ণতার সহিত পালন করে এবং মানবীয় ব্যক্তির মধ্যে তাঁহার জ্যোতি ও শক্তির ক্রমশ অধিকতর নিখুঁত যন্ত্র হইয়া উঠে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের এই চরম পরিণতির ভিতর দিয়াই আইসে শ্রেষ্ঠতম মুক্ত কর্ম।

আবার কর্মকে ধারণ করিয়া আছে, সম্ভব করিতেছে তিনটি জিনিস, কর্তা, করণ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম।* আর এখানেও গুণগুলির পার্থক্যই ইহাদের প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দেয়। যে-সাত্ত্বিক মন সর্বদাই চায় যথাযথ সুসঙ্গতি এবং যথাযথ জ্ঞান তাহাই হইতেছে সাত্ত্বিক মানবের মধ্যে নিয়ামক করণ এবং তাহাই যন্ত্রটির অন্যান্য অংশকে চালিত করে। কামনাময় আত্মার দ্বারা সমর্থিত অহংমূলক কামসঙ্কল্প হইতেছে রাজসিক কর্মীর মধ্যে প্রধান করণ। দেহগত মন ও অসংস্কৃত প্রাণ-প্রকৃতির অজ্ঞান প্রবৃত্তি বা মোহান্ধ প্রেরণা—ইহাই হইতেছে তামসিক কর্মীর প্রধান করণ শক্তি। মুক্ত পুরুষের করণ হইতেছে একটা মহত্তর অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি, তাহা উচ্চতম সাত্ত্বিক বুদ্ধি হইতেও অনেক উচ্চতর, তাহা এক অতিভৌতিক কেন্দ্র হইতে ব্যাপক অবতরণের দ্বারা তাঁহার মধ্যে কার্য করে এবং তাহার শক্তির স্বচ্ছ আধার-রূপে শুদ্ধ ও গ্রহণ-সমর্থ মন, প্রাণ ও দেহকে ব্যবহার করে।

সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেরণা এবং দৃষ্টিহীন পরিকল্পনাসকলকে যন্ত্রবৎ অনুসরণ করিয়া যে-কর্ম বিভ্রান্ত মূঢ় অজ্ঞান মনের সহিত করা হয়, যাহাতে শক্তি বা সামর্থ্যের বিচার করা হয় না, অন্ধ অপপ্রযুক্ত চেষ্টার ফলে

* সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ১৮।২০

* করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ॥ ১৮।১৮, ১৯

যে ক্ষতি ও অপব্যয় হয় তাহার হিসাব করা হয় না, প্রেরণা, প্রয়াস বা পরিশ্রমটির পূর্ববর্তী অবস্থা, ভাবী ফল এবং যথাযথ বিধানের বিবেচনা করা হয় না তাহাই তামসিক কর্ম।* মানুষ কামনার বশ্যতায় যে-কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দৃষ্টি কর্মটির উপর এবং আকাঙ্ক্ষিত ফলটির উপর নিবদ্ধ থাকে, আর কিছুরই উপর নহে, অথবা কর্মের মধ্যে নিজ ব্যক্তিত্বের অহংবোধ থাকে এবং সে-কর্ম করা হয় অনুচিত ক্লেশ ও তীব্র পরিশ্রম সহকারে, আকাঙ্ক্ষিত ফলটি লাভের জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকে অতিমাত্রায় উদ্বেলিত ও উৎপীড়িত করা হয়, তাহাই রাজসিক কর্ম।† মানুষ যে-কর্ম শান্তভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে এবং ন্যায্যতা বা কর্তব্য বা কোন আদর্শের দাবি সম্বন্ধে নির্ব্যক্তিক অনুভূতি লইয়া সম্পন্ন করে, ইহলোকে বা পরলোকে নিজের উপর যে ফলই আসুক তাহা বিবেচনা না করিয়া এই কর্মটি করা উচিত শুধু এই বোধ লইয়া যে-কর্ম সম্পন্ন করে, আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্মটির উৎসাহজনকতা বা বিরক্তিজনকতার প্রতি রাগদ্বেষশূন্য হইয়া, কেবলমাত্র তাহার যুক্তি ও ন্যায়বোধের তৃপ্তির জন্য, স্বচ্ছ বুদ্ধি ও সম্বুদ্ধ সংকল্প ও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ মন ও সমুচ্চ সন্তুষ্ট আত্মার তৃপ্তির জন্য যে-কর্ম করে তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম।‡ সত্ত্বে চূড়ান্ত পরিণতির সীমায় ইহা রূপান্তরিত হইবে এবং উচ্চতম নির্ব্যক্তিক কর্মে পরিণত হইবে, তখন আর তাহা বুদ্ধির দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া আমাদের অন্তরস্থিত আত্মার দ্বারা আদিষ্ট হইবে, সে-কর্ম হইবে প্রকৃতির উচ্চতম ধর্মের দ্বারা পরিচালিত, নিম্নতন অহংভাব হইতে এবং তাহার গুরু বা লঘু বোঝা হইতে মুক্ত, এমন কি শ্রেষ্ঠতম অভিমত, উদারতম আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধতম ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং উচ্চতম মানসিক আদর্শবাদেরও সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত, এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোনটিই আর থাকিবে না; তাহাদের পরিবর্তে রহিবে এক স্বচ্ছ অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান ও জ্যোতি-প্রকাশ, এবং যে অমোঘ শক্তি কর্ম করে ও জগতের জন্য, জগতের অধীশ্বরের জন্য যে কর্ম করিতে হয় এতদুভয় সম্বন্ধে এক অলঙ্ঘ্য অন্তরতম অনুভূতি।

তামসিক কর্তা বস্তুত নিজেকে কর্মের মধ্যে দেয় না পরন্তু যান্ত্রিক মনের দ্বারা কর্ম করে অথবা দলের ইতরতম মনোবৃত্তি অনুসরণ করে, সাধারণ

* অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ১৮।২৫

† যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌রাজসমুদাহৃতম্॥ ১৮।২৪

‡ নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ১৮।২৩

গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে অথবা ভ্রান্তি বা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়। সে তাহার নির্বুদ্ধিতা ছাড়িতে পারে না, ভ্রান্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজের অজ্ঞান কর্মে মূঢ় গর্ব অনুভব করে; সংকীর্ণ ও কুটিল শঠতা প্রকৃত বুদ্ধির স্থান গ্রহণ করে; যাহাদের সহিত তাহার ব্যবহার তাহাদের প্রতি, বিশেষত তাহা অপেক্ষা জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার নির্বোধ ও উদ্ধত তাচ্ছিল্য থাকে। তাহার কর্মের লক্ষণ হয় জড়তাময় আলস্য, মন্দগতি, দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য, এবং উৎসাহ ও আন্তরিকতার অভাব। তামসিক মানুষ সাধারণত হয় কর্মে মন্থর, চলনে শ্লথ, সহজেই অবসন্ন, তাহার শক্তির, তাহার শ্রম বা ধৈর্যের উপর চাপ পড়িলে শীঘ্রই কর্মভার ত্যাগ করিতে তৎপর। অন্যপক্ষে রাজসিক কর্তা হয় কর্মের উপর ব্যগ্রতার সহিত আসক্ত, তাহার দ্রুত সম্পাদনের জন্য উৎসুক, ফল ও পুরস্কারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, হৃদয়ে লোভী, মনে অশুচি, সে কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য অনেক সময়ে এমন সব উপায় অবলম্বন করে যাহা হয় হিংসাত্মক, নিষ্ঠুর, পাশবিক; যদি সে যাহা চায় তাহা পায়, নিজের রিপু ও সংকল্পসকলকে তৃপ্ত করিতে পারে, নিজের অহংয়ের দাবিসকলকে পূর্ণ করিতে পারে তাহা হইলে কাহার অনিষ্ট করা হইল, অপরের কত ক্ষতি হইল সে-সব সে গ্রাহ্যই করে না। সাফল্যে সে অতিমাত্রায় হর্ষান্বিত হইয়া উঠে অসাফল্যে তীব্রভাবে শোকাচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়ে।* সাত্ত্বিক কর্মী এই সকল আসক্তি, অহংপরতা হইতে মুক্ত, তাহার মন ও ইচ্ছাশক্তি সাফল্যে স্ফীত হইয়া উঠে না, অসাফল্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে না, তাহারা নির্ব্যক্তিক দৃঢ় সংকল্প, শান্ত ঐকান্তিক উদ্যম অথবা যে-কর্মটি করিতে হইবে তাহাতে সম্বুদ্ধ ও শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ উৎসাহে পরিপূর্ণ।† সত্ত্ব যেখানে চরম পরিণতি লাভ করে সেখানে এবং তাহার ঊর্ধ্বে এই দৃঢ় সংকল্প, উদ্যম ও উৎসাহ হয় অধ্যাত্ম তপঃশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া এবং শেষকালে হয় উচ্চতম আত্মশক্তি, সাক্ষাৎ ভগবদ্‌শক্তি, মানবীয় যন্ত্রের মধ্যে এক দিব্য তেজের মহান ও অবিচল ধারা, সত্যসন্ধ সুনিশ্চিত পদক্ষেপ, দিব্যজ্ঞানময় বুদ্ধি এবং তাহার সহিত মুক্ত প্রকৃতির কর্মে মুক্ত আত্মার উদার আনন্দ।

সজ্ঞান সংকল্প সহ বুদ্ধি হইতেছে মানবীয় সম্পদ, ইহারা মানুষের মধ্যে যেরূপ এবং যে-পরিমাণে থাকে তদনুযায়ী তাহার মধ্যে কাজ করে এবং তদনুযায়ী তাহারা ঐ মানুষের মনেরই ন্যায় যথাযথ কিংবা বিকৃত,

* রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৮।২৭

† মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ১৮।২৬

আচ্ছন্ন কিংবা প্রোজ্জ্বল, সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ ও উদার হয়। মানুষের প্রকৃতিতে যে বুদ্ধি বা বুঝিবার শক্তি রহিয়াছে তাহাই তাহার কর্ম নির্বাচন করে অথবা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেরূপ হয়, তাহার জটিল সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেরণা, পরিকল্পনা ও বাসনাসমূহ যে বহু প্ররোচনা উপস্থিত করিতেছে তাহাদের মধ্য হইতেই কোন একটিকে অনুমোদন করে, তাহাতেই তাহারা সায় দেয়। তাহার পক্ষে কোনটা ন্যায় বা অন্যায়, কর্তব্য বা অকর্তব্য, ধর্ম বা অধর্ম, উহাই তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। আর সংকল্পের স্থৈর্য (ধৃতি) হইতেছে মানস প্রকৃতির সেই নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যাহা কর্মটিকে ধরিয়া থাকে, তাহাকে সংগতি ও স্থিতি প্রদান করে। এখানেও আবার গুণত্রয়ের প্রভাব রহিয়াছে।* তামসিক বুদ্ধি হইতেছে মিথ্যা, অজ্ঞান এবং তমসাচ্ছন্ন যন্ত্র, তাহা আমাদিগকে মলিন ও ভ্রান্ত আলোকে, বিকৃত ধারণা-সমূহের কুহেলিকায় সকল জিনিস দেখিতে বাধ্য করে, বস্তু ও ব্যক্তিসকলের মর্যাদা মূঢ়ের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।† এই বুদ্ধি আলোককে বলে অন্ধকার, অন্ধকারকে বলে আলো, যাহা অধর্ম সেইটিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, যে জিনিসটি করা উচিৎ নয় সেইটিতেই লাগিয়া থাকে এবং সেইটিকেই একমাত্র যথাকর্তব্য জিনিস বলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরে। তাহার অজ্ঞান অপরাজেয়, আর তাহার সংকল্পে স্থৈর্য বা ধৃতি হইতেছে তাহার সেই অজ্ঞানেই যে তৃপ্তি ও নির্বোধ গর্ব সেইটিকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা। ঐটি হইতেছে উহার অন্ধ কর্মের দিক; কিন্তু অন্যদিকেও ইহার সঙ্গে আসে জড়তা ও অক্ষমতার গুরুভার, নির্জীবতা ও নিদ্রায় আসক্তি, মানসিক পরিবর্তন ও উন্নতিতে বিতৃষ্ণা, মনের সেই সকল ভয় ও শোক ও বিষাদের বিষয় চিন্তা করা যাহারা আমাদের গতি রুদ্ধ করে অথবা আমাদিগকে হীন, দুর্বল, কাপুরুষোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে।* ভীরুতা, ওজর, ফাঁকি, আলস্য, মনের ভয় ও মিথ্যা সংশয় ও সাবধানতা ও কর্তব্যে পরাঙ্মুখতাকে, আমাদের উর্ধ্বতন প্রকৃতির দাবি হইতে চ্যুতি ও বিমুখতাকে মনের দ্বারা সমর্থন করা, সর্বাপেক্ষা নিরুপদ্রব পথ ধরিয়া নিরাপদে চলা যেন সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট ও প্রয়াস ও বিপদেই আমাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করা যায়—সে বলে যে, বরং কোন ফলই না হউক কিংবা অতি সামান্যই ফল লাভ হউক

* বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ১৮।২৯

‡ অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ১৮।৩২

* যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ১৮।৩৫

তাহাই ভাল তবু কোন বৃহৎ ও মহান প্রয়াস বা বিপজ্জনক ও কঠোর প্রযত্ন ও ভাগ্যপরীক্ষা নয়—এই সমুদয়ই হইতেছে তামসিক সংকল্প ও বুদ্ধির লক্ষণ।

রাজসিক বুদ্ধি যখন ইচ্ছা করিয়া ভুল ও অশুভের জন্যই ভুল ও অশুভকে বরণ করিয়া না লয়, তখন ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে, কিন্তু যথাযথভাবে নহে, তাহাদের যথাযথ পরিমাপকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, যথার্থ মূল্যকে অনবরত বিকৃত করা হয়।‡ আর এরকম যে হয় তাহার কারণ ইহার বুদ্ধি ও সংকল্প হইতেছে অহংয়ের বুদ্ধি এবং কামনার সংকল্প, আর এই সকল শক্তি নিজেদের অহংমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সত্যকে ও ধর্মকে ভ্রান্তভাবে দেখায় এবং বিকৃত করিয়া দেয়। যখন আমরা অহং ও কামনা হইতে মুক্ত হই এবং শুধু সত্য এবং তাহার পরিণাম দেখিতে উৎসুক শান্ত, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ মন লইয়া ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, কেবল তখনই আমরা বস্তুসকলকে যথাযথভাবে দেখিবার এবং তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করিবার আশা করিতে পারি। কিন্তু রাজসিক সংকল্প স্বার্থ ও সুখের সন্ধানে, এবং নিজে যেটিকে ন্যায় ও ধর্ম বলিয়া মনে করে বা মনে করিতে চায় তাহার সন্ধানে নিজের আসক্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও কামনাসকলের তৃপ্তির উপরেই মনোযোগ দৃঢ়সন্নিবিষ্ট করে।* সকল সময়েই সে এই সব জিনিসের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যাহা তাহার কামনাসকলকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোৎসাহিত করিবে, সমর্থন করিবে, অথবা তাহার কর্ম ও প্রয়াসসকলের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে যে-সকল পন্থা সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী সেইগুলিকেই ন্যায়সংগত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। মানবীয় বুদ্ধি ও সংকল্পের যত মিথ্যা ও অনাচার তাহার চার ভাগের এক ভাগ এই ভাবেই উৎপন্ন হয়। প্রাণিক অহংয়ের উপর প্রচণ্ড আধিপত্য লইয়া রজোগুণ হয় মূর্ত মহাপাপ এবং সাক্ষাৎ বিপথচালক।

জগতের গতি, কর্ম ও কর্মত্যাগের নীতি, কোন্ জিনিসটি করিতে হইবে, কোনটি করিতে হইবে না, আত্মার পক্ষে কোন্‌টি নিরাপদ কোন্‌টি বিপজ্জনক, কোন্ জিনিসকে ভয় করিতে হইবে, দূরে রাখিতে হইবে, কোন্ জিনিসকে সংকল্পের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে হইবে, কোন জিনিস মানবাত্মাকে বন্ধন করে, কোন্ জিনিস তাহাকে মুক্তি দেয় এই সবকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি দেখে

‡ যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮।৩১

* যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮।৩৪

তাহাদের যথাস্থানে, যথারূপে এবং যথামাত্রায়। † উচ্চতম আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার দিকে ঊর্ধ্বমুখী আরোহণে তাহার জাগ্রত সংকল্পের ধৃতি দ্বারা সে এই সব জিনিসই গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে, ক্রমবিকাশের যে-স্তরে সে উঠিয়াছে তদনুসারে। ঊর্ধ্বাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধি যখন সাধারণ যৌক্তিক বুদ্ধি ও মানস সংকল্পের ঊর্ধ্বে যে-সত্য রহিয়াছে তাহাতে নিবদ্ধ হয়, উত্তুঙ্গ শিখর সকলের দিকে উন্মুখ হয়, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে দৃঢ়ভাবে সংযত করিতে এবং মানুষের উচ্চতম সত্তা, বিশ্বগত ভাগবত সত্তা ও বিশ্বাতীত পুরুষের সহিত যোগের দ্বারা যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় তখন ইহার সমুচ্চ ধৃতির দ্বারাই এই সাত্ত্বিক বুদ্ধি চরম পরিণতি লাভ করে। * সাত্ত্বিক গুণের ভিতর দিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াই মানুষ গুণ-সকলের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতে পারে, মন এবং তাহার সংকল্প ও বুদ্ধির অক্ষমতাসকলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং সত্ত্ব নিজেই সেই সত্তার মধ্যে বিলীন হইতে পারে যাহা গুণসকলের অতীত এবং এই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। সেখানে জীব জ্যোতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মার সহিত ভগবানের সহিত অবিচলিত যোগে অধিরূঢ় হয়। সেই শিখরে সমুপস্থিত হইয়া আমরা আমাদের আধারে দিব্য কর্মের মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবার ভার পরমতমের উপরেই ছাড়িয়া দিতে পারি : কারণ সেখানে কোন ভ্রান্ত বা বিশৃংখল ক্রিয়া নাই, আত্মার জ্যোতির্ময় সিদ্ধি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করিবার মত কোন ভুল বা অক্ষমতা নাই। নিম্নতর স্তরের এই সব বিধান, নীতি, ধর্মের আর কোনও প্রভাব আমাদের উপর থাকে না; মুক্ত মানবের মধ্যে অনন্ত পুরুষ কর্ম করেন, সেখানে মুক্ত আত্মার অবিনাশী সত্য ও ধর্ম ব্যতীত আর কোনও ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কোন প্রকারেরই বন্ধন নাই।

সুসংগতি ও শৃংখলা হইতেছে সাত্ত্বিক মন ও প্রকৃতির বিশিষ্ট গুণ—অচঞ্চল সুখ, স্বচ্ছ ও স্থির সন্তোষ এবং একটা আভ্যন্তরীণ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। বস্তুত সুখই হইতেছে একটি মাত্র জিনিস যাহা প্রকাশ্যেই হউক বা গৌণভাবেই হউক আমাদের মানবীয় প্রকৃতির সার্বজনীন লক্ষ্য—সুখ, অথবা সুখের আভাস অথবা তাহার কোনরূপ নকল, কোন বিলাস, কোন ভোগ, মন, সংকল্প, প্রাণিক বাসনা বা দেহের কোনরূপ তৃপ্তি। দুঃখ হইতেছে এমন অনুভূতি যাহা আমাদের প্রকৃতি অনিচ্ছার সহিত, বিশ্বপ্রকৃতির একটা প্রয়োজন, একটা অপরিহার্য ঘটনা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়;

† প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ১৮।৩০

* ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ১৮।৩৩

অথবা আমরা যাহা চাই তাহার উপায়স্বরূপ স্বেচ্ছায় আমরা দুঃখকে বরণ করিয়া লই, কিন্তু শুধু দুঃখের জন্যই দুঃখ কেহ চাহে না—যদি না চিত্ত-বিকারে তাহা চাওয়া হয় অথবা দুঃখের মধ্যেই যে একটা ভীষণ সুখের স্পর্শ আছে বা তাহা হইতে যে সুতীব্র শক্তির উদ্ভব হয় তাহার জন্যই উৎসাহের আবেগে তাহা চাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে যে-গুণের প্রাধান্য হয় তদনুযায়ী আমাদের সুখ ও ভোগবিলাসও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এইভাবে তামসিক মন তাহার আলস্য ও জড়তায়, নিদ্রা ও তন্দ্রায়, অন্ধতা ও প্রমাদে বেশ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। * প্রকৃতি তাহাকে তাহার নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানে, তাহার গুহাগত ম্লান আলোকে, তাহার জড়তাময় তৃপ্তিতে, তাহার ক্ষুদ্র ও নীচ সুখে এবং তাহার ইতর ভোগবিলাসে পরিতৃপ্ত থাকিবার বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছে। এই তৃপ্তির অগ্রে মোহ, পরিণামেও মোহ; তথাপি গুহার অধিবাসীকে তাহার মোহসকলেই একটা তামসিক সুখ দেওয়া হইয়াছে, সে সুখ খুব প্রশংসনীয় না হইলেও তাহার পক্ষে যথেষ্ট। জড়তা ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা তামসিক সুখও আছে।

রাজসিক মানুষের মন অধিকতর উগ্র ও উন্মাদনাময় পাত্র হইতে পান করে; ইন্দ্রিয়ের, শরীরের, ইন্দ্রিয়জালে বদ্ধ অথবা প্রচণ্ডভাবে কর্মময় সংকল্প ও বুদ্ধির যে তীব্র, চঞ্চল, সক্রিয় উপভোগ সেইটিকেই সে জীবনের সব আনন্দ বলিয়া, জীবনের নিগূঢ় অর্থ বলিয়া গ্রহণ করে। * এই সুখ প্রথম স্পর্শে অমৃতোপম, কিন্তু পাত্রের তলদেশে থাকে প্রচ্ছন্ন বিষ, এবং পরে আসে আশা-ভঙ্গের তিক্ততা, ভোগক্লান্তি, অবসন্নতা, বিদ্রোহ, বিরাগ, পাপ, যন্ত্রণা, হানি, অনিত্যতা। আর এইরূপ হইবেই কারণ আমাদের আত্মা যে সব জিনিস জীবন হইতে সত্য সত্যই দাবি করে এই সব ভোগ তাহাদের বাহ্য রূপে সেই জিনিস নহে; রূপের অনিত্যতার পশ্চাতে ও ঊর্ধ্বে একটা জিনিস আছে যাহা স্থায়ী, তৃপ্তিকর, আপনাতেই আপনি পূর্ণ। অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতি যাহা চায় তাহা হইতেছে ঊর্ধ্বতন মানস ও আত্মার পরিতৃপ্তি এবং যখন সে তাহার এই সুবৃহৎ কাম্যটি লাভ করে তখন আইসে আত্মার এক স্বচ্ছ শুদ্ধ সুখ, এক পূর্ণতার অবস্থা, এক স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। † এই সুখ কোন বাহ্যিক জিনিসের উপর নির্ভর করে না, আমাদের মধ্যে যাহা

* যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৮।৩৯

* বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৮।৩৮

† অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ১৮।৩৬, ৩৭

কিছু উৎকৃষ্টতম আছে, নিগূঢ়তম আছে, তাহারই স্ফুরণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার নহে, ইহাকে জয় করিতে হয় আত্মসংযমের দ্বারা, আত্মার প্রয়াসের দ্বারা, সমুচ্চ ও কঠোর অভ্যাসের দ্বারা। ইহার অর্থ প্রথমে অভ্যস্ত ভোগ অনেক হারানো, অনেক দুঃখ ও দ্বন্দ্ব, আমাদের প্রকৃতির মন্থন হইতে, শক্তিসকলের বেদনাপূর্ণ সংঘর্ষ হইতে সমুত্থিত হলাহল, আধারের বিভিন্ন অংশের দুষ্প্রবৃত্তির জন্য অথবা প্রাণিক প্রবৃত্তিসকলের আপন পথেই চলিবার জিদের জন্য অনেক বিদ্রোহ ও বাধা. কিন্তু পরিণামে এই তিক্ততার স্থলে উত্থিত হয় অমৃত, আর আমরা যেমন ঊর্ধ্বতন অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে থাকি তেমনিই হয় সকল দুঃখের অন্ত, সকল শোক ও বেদনার সহজ অবসান। এইটিই হইতেছে সেই সর্বোত্তম সুখ যাহা সাত্ত্বিক সাধনার চরম সীমায় আমাদের মধ্যে নামিয়া আইসে।

সাত্ত্বিক প্রকৃতির আত্ম-অতিক্রমণ তখনই হয় যখন মহান হইলেও নিম্নতর যে সাত্ত্বিক সুখ, আমরা তাহার ঊর্ধ্বে যাই, মানসিক জ্ঞান ও পুণ্য ও শান্তিতে যে-সুখ তাহার ঊর্ধ্বে যাই, আত্মার চিরন্তন শান্তি ও ভাগবত ঐক্যের অধ্যাত্ম পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই অধ্যাত্ম সুখ তখন আর শুধুই সাত্ত্বিক সুখ নহে, তাহা পূর্ণতম আনন্দ। প্রচ্ছন্ন আনন্দ হইতেই সর্বভূত উৎপন্ন হয়, সেই আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে এবং অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্বারা সকলেই সেই আনন্দের মধ্যে উঠিতে পারে। কেবল তখনই তাহা অধিকার করা যায় যখন মুক্ত পুরুষ অহং ও ইহার কামনাসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার ঊর্ধ্বতম আত্মার সহিত ঐক্যে, সর্বভূতের সহিত ঐক্যে এবং ভগবানের সহিত ঐক্যে অধ্যাত্ম সত্তার পূর্ণতম আনন্দের মধ্যে বাস করেন।

বিংশ অধ্যায়

স্বভাব ও স্বধর্ম

অতএব ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতির মধ্য হইতে গুণত্রয়ের অতীত পরম দিব্য প্রকৃতিতে আত্মার যে মুক্তিপ্রদ বিকাশ তাহাই হইতেছে আমাদের অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তিতে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাও উৎকৃষ্টভাবে সংসাধিত হইতে পারে যদি ইতিপূর্বে উচ্চতম সাত্ত্বিক গুণের প্রাধান্যের এমন বিকাশ হয় যাহা দ্বারা সত্ত্বও অতিক্রান্ত হয়, নিজের অপূর্ণতাসকলের ঊর্ধ্বে চলিয়া যায় এবং গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের অতীত এক ঊর্ধ্বতম মুক্তি, পরমতম জ্যোতি, আত্মার শান্ত শক্তির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। মুক্ত বুদ্ধিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসকল সম্বন্ধে যে উচ্চতম মানসিক ধারণা করিতে পারি তদনুযায়ী এক উচ্চতম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য আমাদের সত্তাকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া দেয় এবং সেই শ্রদ্ধাই উক্ত পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের নিজ সত্য সত্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিতে, অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্মের আদর্শ ও নীতি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের যথাযথ বিধির অনুসরণ এক মুক্ত সুদৃঢ় স্ব-প্রতিষ্ঠ সিদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে সকল নীতির আবশ্যকতাকে অতিক্রম করা হয় এবং অমৃত আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম দেহ প্রাণ মনের নিম্নতন নীতির স্থান গ্রহণ করে। সাত্ত্বিক মন ও সংকল্প সেই ঐক্যাত্মক জীবনের জ্ঞান ও তপঃ শক্তিতে পরিবর্তিত হইবে যেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ পরিহার করে এবং তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের মুক্ত আত্ম-অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক কর্মী তাহার উৎসের সহিত মিলিত, পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত জীবাত্মা হইয়া উঠে, সে নিজে আর কর্মটির কর্তা থাকে না, পরন্তু বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের কর্মের অধ্যাত্ম যন্ত্রস্বরূপ হয়। তাহার রূপান্তরিত ও জ্ঞানালোকিত প্রাকৃত সত্তা এক বিশ্বগত ও নির্ব্যক্তিক কর্মের নিমিত্তস্বরূপ দিব্য যোদ্ধার ধনু স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য বর্তিয়া থাকে। যাহা ছিল সাত্ত্বিক কর্ম তাহাই হয় সিদ্ধ প্রকৃতির মুক্ত ক্রিয়া, সেখানে আর ব্যক্তিগত কোন খণ্ডতা থাকিতে পায় না, এই গুণ বা ঐ গুণটিতে কোনরূপ আসক্তি থাকে না, থাকে শুধু এক পরমতম অধ্যাত্ম আত্মরূপায়ণ। ভগবৎ-সন্ধানী ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা একমাত্র দিব্য কর্মী ভগবানে সমর্পিত কর্মসকলের ইহাই হয় চরম পরিণতি।

এখনও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন আছে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে

সেটির খুবই গুরুত্ব ছিল, আর সেই প্রাচীন মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী, গীতা ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়াছে, এখন তাহা যথাস্থানে উত্থাপিত হইতেছে। সাধারণ স্তরে সকল কর্মই গুণত্রয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়; যে-কর্মটি করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, তাহার তিনটি রূপ—দান, তপঃ ও যজ্ঞ, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কিংবা সবগুলিই যে-কোন একটি গুণের প্রকৃতি অনুযায়ী হইতে পারে। অতএব এইগুলিকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতম সাত্ত্বিক স্তরে তুলিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া এমন এক প্রসারতায় উপনীত হইতে হইবে যেখানে সকল কর্মই হইবে অবাধ আত্মদান, দিব্য তপের শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের নিত্য যজ্ঞ। কিন্তু ইহা হইতেছে একটি সাধারণ নিয়ম, আর এই সকল আলোচনা দ্বারা কেবল সাধারণ তত্ত্বগুলিই বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি নির্বিশেষে সকল কর্ম এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। সকলেই কালক্রমে অধ্যাত্মবিকাশের দ্বারা এই দৃঢ় সংযম, এই উদার সিদ্ধি, এই উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। কিন্তু যদিও মন ও কর্মের সাধারণ বিধি সকল মনুষ্যের পক্ষে সমান তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বদা বৈচিত্র্যেরও একটা নীতি রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল মানবীয় আত্মা, মন, সংকল্প, প্রাণের সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তাহাই নহে, পরন্তু নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিরও অনুসরণ করে; প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম সম্পাদন করে অথবা বিভিন্ন ধারার অনুসরণ করিয়া চলে। এই যে বৈচিত্র্য, প্রকৃতির এই ব্যষ্টিগত নীতি, ইহাকে অধ্যাত্ম সাধনায় কোন্ স্থান দিতে হইবে?

এই জিনিসটার উপর গীতা কতকটা জোর দিয়াছে, এমনকি প্রারম্ভে যে ইহার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথমেই গীতা অর্জুনের স্বধর্মের কথা, ক্ষত্রিয় হিসাবে তাহার প্রকৃতি, নীতি ও কর্মের কথা বলিয়াছে; বিশেষ জোরের সহিতই বিধান দিয়াছে যে, যাহার যাহা নিজস্ব প্রকৃতি, নীতি, কর্ম, তাহা পালন ও অনুসরণ করা কর্তব্য,—ইহা দোষযুক্ত হইলেও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয় * ; পরের ধর্ম অনুসরণ করিয়া বিজয় লাভ করা অপেক্ষা নিজের ধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়। পরের ধর্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক, অর্থাৎ তাহার বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী, সেটি হয় যন্ত্রবৎ আরোপিত অতএব বাহির হইতে

* শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

আরোপিত, কৃত্রিম, এবং আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব সেই দিকে ক্রমবর্ধনের পক্ষে বিনাষ্টকর। সত্তার ভিতর হইতে যাহা আইসে তাহাই যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিস, তাহাই অকৃত্রিম কর্মধারা, বাহির হইতে ইহার উপর যাহা জোর করিয়া আরোপ করা হয় অথবা প্রাণের তাড়না বা মনের ভ্রান্তির দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয় সেইটি নহে। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্বর্ণ্যের কর্মে এই স্বধর্মের বাহ্যিক মোটামুটি চারি বিভাগ করা হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানের অনুযায়ী, ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ, "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্ব-বিধাতা কর্তৃক প্রথম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কথায়, সক্রিয় প্রকৃতির চারটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষের চারিটি মূল রূপ বা স্বভাব আছে, আর প্রত্যেক মানুষের উপযোগী কর্ম হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপের অনুযায়ী। এইটিই এখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। গীতা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিজ-নিজ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাব, মূলস্বরূপ (স্বভাব) হইতে জাত গুণানুসারে তাহাদের কর্মসকল ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে।* শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের কর্ম তাঁহার স্বভাব হইতে জাত। শৌর্য, তেজ, দৃঢ় সংকল্প, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, এবং ঈশ্বরভাব (শাসনকর্তা ও নেতার ভাব), এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম। কৃষিকর্ম, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম, এই সকল বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম।* সকল প্রকার পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর গীতা বলিতেছে, † যে-ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাবানুরূপ কর্ম করে সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ করে; অবশ্য ঐ সিদ্ধিলাভ কেবল কর্মটির দ্বারাই হয় না পরন্তু যদি সে যথাযথ জ্ঞান ও যথাযথ প্ররোচনা লইয়া ঐ কর্ম করে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার অর্চনারূপে যদি

* ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮।৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮।৪৩
* কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ১৮।৪৪
† স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৫-৪৬

সে ঐ কর্ম করিতে পারে, যে বিশ্বেশ্বর হইতে জীবগণের সকল কর্মপ্রচেষ্টা উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিকভাবে ঐ কর্ম নিবেদন করিতে পারে, কেবল তাহা হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে প্রচেষ্টা, যে ক্রিয়া ও কর্মই হউক না কেন, সবই এইরূপ কর্মার্পণের দ্বারা উৎসগীকৃত করা যায়, তাহার দ্বারা সমস্ত জীবন আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে আত্মনিবেদনে পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্মসিদ্ধিলাভের উপায়ে পরিণত হয়। কিন্তু যে-কর্ম কোন ব্যক্তির নিজ স্বভাবের অনুযায়ী নহে, যদিও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম নীতি অনুসারে বিচার করিলে যদিও তাহা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হয় অথবা জীবনে অধিকতর সাফল্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহা আভ্যন্তরীণ বিকাশের পক্ষে নিকৃষ্টতর ‡ ঠিক এই কারণেই যে তাহার প্ররোচনা বাহ্যিক, তাহার প্রেরণা যন্ত্রবৎ। নিজের স্বভাব অনুযায়ী কর্মই শ্রেয়, যদিও অন্য কোন দিক দিয়া দেখিলে সেইটি দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজের প্রকৃতির ধর্ম অনুসরণ করিয়া কর্ম করে তখন সে কোনরূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয় না। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে সকল ক্রিয়াই ত্রুটিযুক্ত, সকল মানবীয় কর্মই দোষ, চ্যুতি ও অপূর্ণতার অধীন; কিন্তু সে-জন্য আমাদের নিজ-নিজ কর্ম এবং স্বাভাবিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত হয় না।* কর্ম হওয়া চাই সুনিয়ন্ত্রিত, নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষের স্বরূপত নিজস্ব, ভিতর হইতেই বিবর্তিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস, স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম।

গীতার সঠিক তাৎপর্যটি এখানে কি? ইহার যে যে বাহ্যিক অর্থ সেইটিকেই প্রথমে ধরা যাউক, গীতা যে নীতিটি বিবৃত করিয়াছে ভারতীয় জাতি ও সেই যুগের ধ্যানধারণার দ্বারা ইহা কিরূপ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইহার কি অর্থ ছিল প্রথমে সেইটিই বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষয়ে গীতা পূর্বে যাহা বলিয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্তমান বাক্‌বিতণ্ডায় তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ-কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত প্রথার সমর্থন করিতেছে আবার কেহ-কেহ জাতিভেদের বংশানুক্রমিকতা অপ্রমাণ করিতেই ইহার সাহায্য লইতেছে। বস্তুত গীতার শ্লোকগুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রাচীন সামাজিক চাতুর্বর্ণ্যের আদর্শ আর্য সমাজের চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ হইতে

‡ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ১৮।৪৭
* সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ১৮।৪৮

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোন মিলই নাই। কৃষি, গোরক্ষা এবং সকল প্রকার বাণিজ্যকে এখানে বৈশ্যের কর্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু পরবর্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা কৃষি এবং গোরক্ষায় ব্যাপৃত, শিল্পী, ক্ষুদ্র কারিগর এবং অন্যান্য অনেকেই বস্তুত শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কোথাও বা তাহারা সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িয়াছে; আর কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল বণিক শ্রেণীই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও সর্বত্র নহে। কৃষি, রাজকার্য, চাকুরী, এই সব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এইভাবে অর্থনীতিক কর্মবিভাগ এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহার আর সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নাই; আর গুণানুসারে কর্মের নীতির স্থান ত জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্মের দিক হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি না যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে, মুচির বংশধরগণ আবহমান কাল পর্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবে—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম; আর নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্বোধ ও গতানুগতিকভাবে পরধর্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা করা ত আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথা আদর্শ বিশুদ্ধ অবস্থায় যেমনটি ছিল অথবা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কখনই একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অথবা ইহা ছিল একটা সাধারণ নিয়ম, বাস্তবজীবনে লোকে অল্পাধিক শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত) সেইটিই হইতেছে এখানে গীতার কথাগুলির প্রকৃত লক্ষ্য এবং কেবল সেই প্রথার সম্বন্ধেই গীতার কথাগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আবার এখানেও বাহ্যিক অর্থটি যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টি জীবনে সামাজিক মানুষের চারি প্রকার কর্ম ঠিক করিয়াছিল, ধর্মসম্বন্ধীয় ও বুদ্ধিবিষয়ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম। অতএব কর্ম চারি প্রকারের,—পৌরহিত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কর্ম, রাজ্যশাসন,

রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন ও যুদ্ধের কর্ম, উৎপাদন, অর্থোপার্জন এবং বাণিজ্যের কর্ম, মজুর ও পরিচারকের কর্ম। চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা শুধু যে ভারতেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে সামাজিক ক্রমবিবর্তনের একটা বিশেষ অবস্থায় কিছু বৈষম্যের সহিত এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও প্রধান লক্ষণ ছিল। এখনও সাধারণত সকল সমাজের জীবনেই এই চারি প্রকার কর্ম অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্বত্রই ভাঙিগয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে আসিয়াছিল একটা অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা, অথবা যেমন ভারতে হইয়াছে একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থনৈতিক অচলতার উদ্ভব এবং তাহা শেষ পর্যন্ত জাতিভেদের বিষম গোলমালে পর্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক কর্মবিভাগের সঙ্গে-সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্য, তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার ধর্মবিষয়ক আচার, তাহার মর্যাদার ধারা, নৈতিক বিধিবিধান, উপযোগী শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশিষ্ট চরিত্র, বংশগত আদর্শ ও সাধনা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবজীবনের সত্য সকল সময়েই যে পরিকল্পনাটির অনুরূপ ছিল তাহা নহে (মানসিক আদর্শ এবং প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এই দুয়ের মধ্যে সকল সময়েই কতকটা ব্যবধান থাকে), কিন্তু যতদূর সম্ভব আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটা অবিশ্রান্ত ও অদম্য প্রয়াস চলিয়াছিল। এই প্রয়াসের, এবং অতীতে সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও সাধনায় ইহা যে কৃষ্টিগত আদর্শ ও পাবিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল; কিন্তু অতীতের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার আর কোন সার্থকতাই নাই। শেষত, যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল (প্রাচ্যদেশে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক অর্থটিই হইতেছে গীতার শিক্ষার যথার্থ মর্ম কথা।

গীতা যখন রচিত হয় তখনই এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়া ছিল; গীতা এই আদর্শ এবং ইহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে" (৪।১৩)। কেবল এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না যে, গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ এইরূপ স্বীকার করে নাই; বরং

তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, আদিতে ইহা ছিল না এবং যুগবিবর্তনে পরবর্তী কালেও ইহা থাকিবে না। তথাপি এই উক্তিটি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে যে, সামাজিক মানুষের যে চতুর্বিধ কর্মবিভাগ ইহা সাধারণত প্রত্যেক সমাজেরই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অন্তর্নিহিত, অতএব যে বিশ্বপুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানবজীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুত গীতার এই পদটি হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষসূক্তের বিখ্যাত রূপকটিরই * বিবৃতি। কিন্তু তাহা হইলে এই সকল কর্মবিভাগের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপ কি হইবে? প্রাচীনকালে বংশানুক্রমিক নীতিটিই কার্যত ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম-প্রথম মানুষের সামাজিক কর্ম ও পদমর্যাদা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ, জন্ম ও সামর্থ্যের দ্বারাই নির্ধারিত হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখনও মুক্ততর এবং অপেক্ষাকৃত শিথিলবন্ধ সমাজে এইরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু সামাজিক স্তরবিভাগ যেমন বেশী-বেশী বাঁধাধরা হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্যাদাও কার্যত জন্মের দ্বারাই প্রধানত কিংবা কেবল তাহারই দ্বারা নির্ধারিত হইল, এবং পরবর্তী জাতিভেদ প্রথায় জন্মই পদমর্যাদার একমাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের ছেলে পদমর্যাদায় সকল সময়েই ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও চরিত্রের কিছুই তাহার মধ্যে না থাকে, বুদ্ধিগত শিক্ষা বা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা ধর্মসম্বন্ধীয় যোগ্যতা বা জ্ঞান না থাকে, তাহার আপন শ্রেণীর যথার্থ কর্মের সহিত কেন সম্বন্ধই না থাকে, তাহার কর্মে বা তাহার প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণত্বের কিছুই না থাকে।

এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলিই সহজে এবং সুবিধামত নির্ণয় করা সম্ভব এবং ক্রমশ বেশী-বেশী যন্ত্রভাবাপন্ন জটিল ও গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় জন্মই ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষণ। কল্পিত বংশানুক্রমিক গুণের সহিত মানুষের প্রকৃত সহজাত চরিত্র ও সামর্থ্যের যে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তাহা শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা পূরণ করিবার বা যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা কিছুকাল হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে এই প্রয়াস বন্ধ হইয়া যায় এবং বংশানুক্রমিক প্রথাই অনতিক্রমণীয় বিধান হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বংশানুক্রমিক প্রথা স্বীকার করিলেও বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, গুণ, চরিত্র এবং সামর্থ্যই হইতেছে একমাত্র সুদৃঢ় ও যথার্থ ভিত্তি, এইগুলি না থাকিলে বংশগত সামাজিক পদমর্যাদা আধ্যাত্মিক মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় কারণ তাহার প্রকৃত সার্থকতা নষ্ট

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥

হইয়া যায়। গীতাও যেমন সর্বত্র তেমনিই এখানে আভ্যন্তরীণ সত্যটির উপরেই তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জাত কর্মের কথা বলিয়াছে বটে, সহজম্ কর্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায় না। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ভারতীয় তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুসারে মানুষের সহজাত প্রকৃতি এবং জীবনের ধারা মূলত তাহার অতীত জন্মসকলের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এ-সব হইতেছে তাহার অতীতের কর্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের দ্বারা ইতিপূর্বেই সম্পাদিত আত্মবিকাশ, এ-সব কেবল তাহার বংশ, পিতামাতা, শারীরিক জন্ম-রূপ স্থূল ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না, এইগুলি কেবল একটা পরিচায়ক লক্ষণ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য শক্তি নহে। 'সহজ' শব্দটির অর্থ যাহা আমাদের সহিত জন্মিয়াছে, যাহা কিছু স্বাভাবিক, সহজাত, অন্তর্নিহিত, গীতা অন্য সকল স্থানে ইহার পরিবর্তে "স্বভাবজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। মানুষের কর্ম বা বৃত্তি তাহার গুণের দ্বারাই নির্ধারিত; ইহা হইতেছে তাহার স্বভাব হইতে জাত কর্ম, স্বভাবজম্ কর্ম্ম, এবং তাহার স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম। কর্ম ও বৃত্তির ভিতর দিয়া যে আভ্যন্তরীণ গুণ ও ধর্ম প্রকট হইতেছে তাহার উপর জোর দেওয়াই হইতেছে গীতার কর্ম-বাদের সমগ্র তত্ত্ব।

আর গীতা স্বধর্মের অনুসরণের যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও শক্তি দেখাইয়াছে, বাহ্যিক রূপটির উপর জোর না দিয়া আভ্যন্তরীণ সত্যের উপর এই জোর দেওয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। এইটিই হইতেছে গীতার এই অংশটির বাস্তবিক প্রয়োজনীয় মর্মকথা। বাহ্যিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্বন্ধের উপর সাধারণত অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, যেন ঐ বাহ্যিক ব্যবস্থাটিকে তাহার উৎকর্ষতার জন্যই সমর্থন করা কিংবা দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের দ্বারা উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাই ছিল গীতার লক্ষ্য। বস্তুত বাহ্যিক ব্যবস্থাটির উপর গীতা খুবই কম ঝোঁক দিয়াছে, পরন্তু বর্ণব্যবস্থা যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে বাহ্যিক ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল গীতা তাহারই উপর খুব বেশী ঝোঁক দিয়াছে। আর ব্যষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীতিটির যে উপযোগিতা এখানে সেইটিরই উপরে রহিয়াছে গীতার দৃষ্টি, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবনে অথবা অন্য কোন সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনে ইহার যে উপযোগিতা আছে তাহার উপরে নহে। গীতা বৈদিক যজ্ঞের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে গভীর ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহার এমন এক আভ্যন্তরীণ অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, এমন একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য দিয়াছে যাহাতে ইহার সমস্ত মূল্যের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এখানেও ঠিক ঐ ভাবে গীতা

মানুষের চারি বর্ণ বিভাগকে গ্রহণ করিয়াছে, তবে ইহাকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহার এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ভাবটির মূল্য অন্যরূপ হইয়াছে এবং তাহা এক স্থায়ী ও জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর কোন বিশেষ অস্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে আর্য-সমাজব্যবস্থা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে তাহার বৈধতা প্রতিপাদন করাই গীতার লক্ষ্য নহে,—যদি শুধু তাহাই হইত তাহা হইলে গীতার স্বভাব ও স্বধর্মের নীতিতে কোন চিরন্তন সত্য বা মূল্য থাকিত না—গীতার লক্ষ্য হইতেছে মানুষের বাহিরের জীবনের সহিত তাহার অন্তর্জীবনের সম্বন্ধ, তাহার অন্তরাত্মা হইতে, তাহার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহার কর্মের বিবর্তন।

আর আমরা বস্তুত দেখি যে, গীতা নিজেই তাহার উদ্দেশ্যটি খুবই স্পষ্ট করিয়াছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম বাহ্যিক বৃত্তির দিক দিয়া বর্ণনা না করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং শাস্ত্রচর্চা বা শাসনকার্য, যুদ্ধ এবং রাজনীতি এইরূপ নির্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দিক দিয়াই বর্ণনা করিয়াছে। এখানে গীতার ভাষাটি আমাদের কাছে কেমন একটু বিচিত্রই লাগে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, জ্ঞান, অধ্যাত্মসত্য গ্রহণ ও অনুশীলন—সাধারণত এইগুলি মানুষের বৃত্তি, কর্ম বা পেশা বলিয়া কথিত হয় না। অথচ গীতা ঠিক এইটিই বুঝিয়াছে এবং বলিয়াছে—বলিয়াছে যে, এই সব জিনিস, ইহাদের বিকাশ, ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইহাদের অভিব্যক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্মকে রূপ দিবার পক্ষে ইহাদের ক্ষমতা—এই সবই হইতেছে ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্ম; শিক্ষা, পৌরহিত্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক কর্মগুলি হইতেছে কেবল ইহার সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র, এই আভ্যন্তরীণ বিকাশের অনুকূল উপায়স্বরূপ, ইহার যথাযথ আত্ম-অভিব্যক্তি; সুনির্দিষ্ট বর্ণগত আদর্শে এবং বাহ্যিক চরিত্রের সুদৃঢ়তায় ইহার স্থায়ী রূপলাভের পন্থাস্বরূপ। যুদ্ধ, রাজধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব ও শাসন হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্র এবং উপায়; কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ম হইতেছে সক্রিয় যুযুধান রাজোচিত বা বীরোচিত প্রকৃতির ধর্মকে বিকাশ করা, ব্যবহারে অভিব্যক্ত করা, বাহ্য রূপে এবং গতির ওজস্বান ছন্দে প্রকট করা। বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম বাহ্যবৃত্তির দিক দিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, আর এই যে বৈপরীত্য ইহারও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কারণ যে প্রকৃতি উৎপাদন ও উপার্জনের দিকে চলে কিংবা শ্রম ও পরিচর্যার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বণিকের ও দাসের মনোবৃত্তি—ইহারা সাধারণত হয় বহির্মুখী, কর্মের চরিত্র-

গঠন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক মূল্য লইয়াই অধিক ব্যাপৃত থাকে; আর প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রবৃত্তি তেমন অনুকূল নহে। আর এই কারণেই ব্যবসা ও যন্ত্রশিল্পের যুগ অথবা কর্ম ও উৎপাদনের চিন্তায় ব্যাপৃত সমাজ নিজের চারিদিকে এমন একটা আবেষ্টনের সৃষ্টি করে যাহা অধ্যাত্ম জীবন অপেক্ষা ঐহিক জীবনেরই অনুকূল, ঊর্ধ্ব-গামী মন ও আত্মার সূক্ষ্মতর সিদ্ধি অপেক্ষা স্থূল জীবনে দক্ষতার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তথাপি এই ধরনের প্রকৃতি এবং ইহার কর্মেরও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং তাহাদিগকেও সিদ্ধিলাভের উপায় ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। অন্যত্র যেরূপ বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ এবং মহানুভবতা, শৌর্য ও মহৎ চরিত্রশক্তির আদর্শ লইয়া ক্ষত্রিয়, শুধু ইহারাই নহে পরন্তু ধনোপার্জনে ব্রতী বৈশ্য, শ্রমপাশে বদ্ধ শূদ্র, সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ও পরাধীন জীবন লইয়া নারী, এমন কি পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডাল, ইহারাও এই পথ ধরিয়া অচিরাৎ উচ্চতম আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম স্বাধীনতার দিকে, সিদ্ধির দিকে, মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা রহিয়াছে তাহার মুক্তি ও পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তিনটি কথা প্রথমেই মনে উঠে, গীতা এই স্থলে যাহা বলিয়াছে সেই সবের মধ্যেই ঐ তিনটি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমত, সকল কর্মই ভিতর হইতে নির্ধারিত হওয়া চাই কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই তাহার নিজস্ব কিছু রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট ধর্ম ও সহজাত শক্তি রহিয়াছে। সেইটিই হইতেছে তাহার আত্মার সিদ্ধিপ্রদ শক্তি, সেইটিই প্রকৃতিতে তাহার অন্তপুরুষের ক্রিয়াত্মক রূপ সৃষ্টি করিয়া দেয়, এবং কার্যের ভিতর দিয়া সেইটিকে বিকশিত ও সিদ্ধ করিয়া তোলা, সামর্থ্যে ও ব্যবহারে ও জীবনে সেইটিকে কার্যকরী করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার প্রকৃত কর্ম; সেইটিই তাহাকে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনের সত্য ধারাটি নির্দেশ করিয়া দেয়, সেইটিকে ধরিয়াই তাহার উচ্চতর বিকাশের সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি চারি শ্রেণীর প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক শ্রেণীরই আছে বিশিষ্ট কর্মধারা এবং কর্ম ও চরিত্রের আদর্শ বিধি, শ্রেণীই মানুষের উপযোগী ক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া দেয়, এবং তাহার বাহ্য সামাজিক জীবনে তাহার কর্মের যথাযথ সীমারেখা তাহার শ্রেণী অনুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। শেষত, মানুষ যে-কোন কর্মই করুক না কেন, যদি তাহা তাহার সত্তার ধর্ম অনুযায়ী, তাহার প্রকৃতির সত্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সেইটিকেই ভগবদ্‌মুখী করা যায়, অধ্যাত্মমুক্তি ও সংসিদ্ধি-লাভের সাফল্যপ্রদ উপায়ে পরিণত করা যায়। এই তিনটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি যে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা সুস্পষ্ট। মানুষের ব্যষ্টিগত ও

সামাজিক জীবনের যে সাধারণ ধারা তাহা এই সকল নীতির বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমাদিগকে যে বাহ্য প্রয়োজন, বিধান ও আইনের ভীষণ বোঝা বহন করিতে হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, আর আমাদের আত্ম-প্রকাশের যে প্রয়োজন, আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের সত্য আত্মা, আমাদের অন্তরতম স্বভাবগত জীবনধারার বিকাশের যে-প্রয়োজন তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সমূহের দ্বারা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যাহত হয়, আপন গতি-পথ হইতে চ্যুত হইতে বাধ্য হয়, যৎসামান্যই সুযোগ বা ক্ষেত্র লাভ করে। জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পারিপার্শ্বিক শক্তি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে আমাদের আত্মার উপর তাহাদের শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে, আমাদিগকে বলপূর্বক তাহাদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে, তাহাদের গতানুগতিক স্বার্থ এবং স্থূল সাময়িক সুবিধার বাহন করিতে। আমরা একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়ি, আমরা যে মনুষ্য, পুরুষ, আত্মা, মন, আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট সিদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ করিতে এবং ইহাকে সমস্ত জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে সমর্থ, আমরা আর প্রকৃত পক্ষে তাহা থাকি না, আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজদিগকে গড়িয়া তুলি না, আমাদিগকে গড়িয়া দেওয়া হয়। অথচ যতই আমরা জ্ঞানে অগ্রসর হইব ততই গীতার সূত্রটির সত্যতা প্রকট হইতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও প্রাণময় যাহা কিছু আছে তাহা প্রকট হইতে পারে, মানুষের কর্ম ও বিকাশধারা যে ছাঁচে গঠিত হইবে তাহা যেন হয় তাহার সহজাত গুণ ও শক্তিরই ছাঁচ। তাহাকে নূতন জিনিস অর্জন করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিকশিত স্বরূপ ও সহজাত শক্তির ভিত্তিতেই উৎকৃষ্টভাবে, জীবন্ত-ভাবে সে-সব জিনিস সে অর্জন করিতে পারিবে। আর সেইভাবেই মানুষের কর্মও তাহার স্বভাবের গতি ও শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত। যে-ব্যক্তি এইরূপ স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করিতে পাইবে সেই জীবন্ত "পুরুষ" ও "মনুষ্য" হইয়া উঠিবে এবং জাতির সেবার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। আর এখন আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নীতি কেবল ব্যষ্টি বা ব্যক্তির পক্ষেই নহে পরন্তু সমাজ ও জাতির পক্ষে, সমষ্টিগত আত্মা, সমষ্টিগত মানবের পক্ষেও সত্য। চারি শ্রেণী এবং তাহাদের কর্মধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্যটি আরও বেশী তর্কের বিষয়। বলা যাইতে পারে যে, ইহা অতিমাত্রায় সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনের বহুমুখীনতা এবং মানব-প্রকৃতির নমনীয়তার যথেষ্ট হিসাব ইহাতে লওয়া হয় নাই, আর ইহার তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক সমাজব্যবস্থায় ইহা স্বধর্মের সমুদয় নীতিরই যাহা বিরোধী ঠিক সেই গতানুগতিক আচারের

অত্যাচারে পরিণত হইবে। কিন্তু বাহিরে যতটুকু দেখা যায় তাহার অন্তরালে ইহার এমন একটা গভীরতর অর্থ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উপযোগিতা আর ততটা সন্দেহের বিষয় থাকে না। আর যদিই আমরা এইটি বর্জন করি, তৃতীয় মন্তব্যটির সাধারণ সার্থকতা অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। জীবনে মানুষের কর্ম ও বৃত্তি যাহাই হউক না কেন, যদি তাহা ভিতর হইতে নির্ধারিত হয় অথবা যদি সেইটিকে সে তাহার প্রকৃতির আত্ম-অভিব্যক্তি করিতে পায়, তাহা হইলে সেইটিকে সে বিকাশ ও মহত্তর আভ্যন্তরীণ সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করিতে পারে। আর ইহা যাহাই হউক না কেন, যদি সে তাহার স্বাভাবিক কর্ম যথাযথ মনোভাব লইয়া সম্পাদন করে, যদি ইহাকে সে জ্ঞানদীপ্ত মনের দ্বারা পরিচালিত করে, ইহার ক্রিয়াকে অন্তরস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে, বিশ্বমাঝে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে ইহার দ্বারা সেবা করে, অথবা ইহাকে মানব-সমাজের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায়ের সজ্ঞান যন্ত্রে পরিণত করে, তাহা হইলে সে ইহাকে উচ্চতম অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবার উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারে।

কিন্তু যদি আমরা এইটিকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলিয়া ধরিয়া না লই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই করা হয়) পরন্তু, যেরূপ করা উচিত, সমস্ত গ্রন্থটিতে বিশেষত শেষ দ্বাদশ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া ইহাকে গ্রহণ করি তাহা হইলে এখানে গীতার শিক্ষার আরও গভীরতর অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে গীতার দার্শনিক মত হইতেছে এই যে, সমস্তই ভাগবত সত্তা হইতে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় অধ্যাত্ম সত্তা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সবই হইতেছে ভগবানের, বাসুদেবের, প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্, আর অন্তরে ও জগতে যে অবিনশ্বর রহিয়াছে তাহাকে প্রকট করা, বিশ্বের আত্মার সহিত ঐক্যে বাস করা, চৈতন্যে, জ্ঞানে, সংকল্পে, প্রেমে, অধ্যাত্ম আনন্দে উন্নীত হইয়া পরমতম ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করা, ব্যষ্টিগত ও প্রাকৃত সত্তাকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া এবং ভাগবত শক্তির কর্মসাধনের সচেতন যন্ত্রে পরিণত করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই সিদ্ধিটিই মানুষের অধিগম্য এবং অমৃতত্ব ও মুক্তি লাভের জন্য এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় বিধান। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বস্তুত প্রাকৃত অজ্ঞানে সমাবৃত রহিয়াছি, আত্মা অহংয়ের কারাগারে বন্দী, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অভিভূত, অবরুদ্ধ, মথিত এবং গঠিত হইতেছে, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবশে চালিত হইতেছে, আমাদের নিজ নিগূঢ় অধ্যাত্ম শক্তির সত্তায় আমাদের যে-প্রতিষ্ঠা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে—ততক্ষণ ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, এই সব প্রাকৃত ক্রিয়া এখন

সমাচ্ছন্ন ও বিপরীত ক্রিয়া-পরম্পরায় যতই পরিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি ইহা নিজের বিকাশশীল মুক্তি ও সিদ্ধির তত্ত্বটি নিজের মধ্যেই ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতির এই আশ্চর্য কর্মধারার অধীশ্বর। আর এই বিশ্ব-আত্মা, এই যে অদ্বিতীয় সত্তা এক হইয়াও সব, যদিও ইহা মায়াশক্তির দ্বারা যন্ত্রা-রূঢ়ের ন্যায় আমাদিগকে জগৎচক্রে ঘুরাইতেছে, কুম্ভকার যেমন কুম্ভ তৈয়ারী করে, তন্তুবায় যেমন তন্তু বয়ন করে সেইরূপ এক যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা আমাদের অজ্ঞানে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, তথাপি এই আত্মা হইতেছে আমাদের নিজেদেরই মহত্তম সত্তা, আর আমাদের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, আমাদের সত্তার সত্য, যাহা জন্মে-জন্মে পশুজীবন, মানবজীবন ও দিব্য-জীবনে, আমরা যাহা ছিলাম যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইব তাহাতে আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং সর্বদা নূতন ও অধিকতর উপযোগী রূপ গ্রহণ করিতেছে —এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য অনুসারেই আমাদের এই অন্তর্বাসী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে ক্রমশ গড়িয়া তুলিতেছেন, যখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে তখনই আমরা ইহা দেখিতে পাইব। এই যে যন্ত্রস্বরূপ অহং, গুণত্রয়, মন, দেহ, প্রাণ, ভাবাবেগ, বাসনা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, অভীপ্সা, প্রচেষ্টার গ্রন্থিল জটিলতা, দুঃখ ও সুখের, পুণ্য ও পাপের, চেষ্টা ও সাফল্য ও বিফলতার, আত্মা ও পারিপার্শ্বিকের, আমি ও অপরের পারস্পরিক বিজড়িত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—ইহা হইতেছে আমার মধ্যে এক উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তি কর্তৃক গৃহীত বাহ্য, অপূর্ণ রূপ মাত্র, আমি আমার আত্মার নিগূঢ়তায় যে দিব্য ও মহান সত্তা এবং প্রকৃতিতে প্রকাশ্যভাবে আমাকে যাহা হইতে হইবে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহার সকল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ক্রমবর্ধমান ভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই ক্রিয়ার মধ্যেই ইহার নিজের সাফল্যের নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাই হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্মের নীতি।

জীব আত্ম-অভিব্যক্তিতে পুরুষোত্তমেরই একটি অংশ বিশেষ। প্রকৃতিতে সে পরমাত্মার শক্তির প্রতিভূস্বরূপ, তাহার ব্যক্তিত্বে সে সেই শক্তিই; সে ব্যষ্টিগত জীবনে বিশ্বপুরুষের সম্ভাবনাগুলিকেই প্রকট করে। এই জীব নিজেও আত্মা, প্রাকৃত অহং নহে; অহংরূপ নহে পরন্তু আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা এবং আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। আমরা বস্তুত যাহা এবং আমরা যাহা হইতে পারি তাহার প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে ঐ ঊর্ধ্বতন অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে, আর ইহার কর্মধারার যে অন্তরতম ও মূলগত সত্য তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে; এই মায়া হইতেছে কেবল বর্তমান কার্যকরী শক্তি, নীচের স্তরে সুবিধার জন্য একটা সরঞ্জাম, বাহ্যিক অনুশীলন ও অভ্যাসের

একটা ব্যবস্থা। যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি বিশ্বমাঝে এই বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছে, পরা প্রকৃতিজীবভূতা, তাহাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল উপাদান; বাকী আর সব কিছুই হইতেছে অধ্যাত্মের এক উচ্চতম প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া হইতে নিম্নতর সৃষ্টি এবং বাহ্যতর রূপ। আর প্রকৃতিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ-নিজ বিবর্তনের একটা মূল নীতি ও সংকল্প; প্রত্যেক জীবই হইতেছে একটি আত্মচৈতন্যের শক্তি, সে নিজের মধ্যে ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করে এবং তাহার দ্বারা নিজের কর্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের ক্রমবর্ধমান আত্মোপলব্ধি, নিজের নিত্য বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশ, পূর্ণ সংসিদ্ধির দিকে নিজর দৃশ্যত অনিশ্চিত কিন্তু নিগূঢ়ভাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইটিই হইতেছে আমাদের স্বভাব, আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি, সেইটিই হইতেছে আমাদের সত্তার সত্য, তাহা জগতে আমাদের বিচিত্র বিবর্তনে এখন কেবল নিরন্তর আংশিক ভাবেই প্রকট হইতেছে। কর্মের যে-নীতি এই স্বভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহাই হইতেছে আমাদের আত্ম-সংগঠন, কর্তব্য ও কর্মধারার যথার্থ ধর্ম, আমাদের স্বধর্ম।

সমস্ত বিশ্বেই এই নীতি পরিব্যাপ্ত, সর্বত্রই কাজ করিতেছে এক অদ্বিতীয় দিব্য শক্তি, এক সাধারণ বিশ্ব প্রকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক স্তর, রূপ, শক্তি, গণ, জাতি, ব্যষ্টিগত জীবের মধ্যে সে একটি প্রধান ভাব এবং নিত্য ও জটিল পরিবর্তনের কয়েকটি অপ্রধান ভাব ও নীতি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেকের স্থায়ী ধর্ম এবং অস্থায়ী ধর্ম দুই-ই ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় বিবর্তনের মধ্যে প্রত্যেকের সত্তার ধারা, তাহার উদ্ভব, স্থিতি ও পরিবর্তনের মার্গ, তাহার আত্মরক্ষা ও আত্মবিবর্ধনের শক্তি, তাহার সুপ্রতিষ্ঠ ও ক্রমবিকাশশীল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির গতি, বিশ্বমাঝে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অবশিষ্ট অংশের সহিত তাহার সম্বন্ধের বিধি। নিজ সত্তার ধর্ম, স্বধর্ম, অনুসরণ করা, নিজ সত্তায় নিহিত ভাবের, স্বভাবের, বিকাশ করা—ইহাই হইতেছে তাহার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা, তাহার যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি। পরিশেষে তাহা জীবকে কোন বর্তমান রূপায়ণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না, পরন্তু বিকাশের এই পথ অনুসরণ করিয়া জীব নিজ ধর্ম ও নীতির সহিত সমঞ্জসীভূত নূতন-নূতন অভিজ্ঞতায় নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং প্রবলতম শক্তিতে বর্ধিত হইয়া যথাসময়ে বর্তমান অবয়বসকলকে ভেদ করিয়া উচ্চতর আত্ম-প্রকাশে উপনীত হইতে পারে। নিজ ধর্ম ও নীতিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া, যাহাতে পারিপার্শ্বিককে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাকে নিজ প্রকৃতির উপযোগী করিয়া তোলা যায় এই ভাবে পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে মিলাইতে না পারা—ইহা হইতেছে নিজেকে হারাইয়া ফেলা, আত্ম

অধিকারে বঞ্চিত হওয়া, আত্মার পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া, বিনষ্টি, মিথ্যা, মৃত্যু, ক্ষয় ও ধ্বংসের বেদনা, অনেক সময়েই এইভাবে নির্বাণ ও বিলুপ্তির পর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করিবার কষ্টকর সাধনা আবশ্যক হয়, ইহা ভ্রান্ত পথে বৃথা পরিভ্রমণ, আমাদের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী। এই নীতি প্রকৃতির সর্বত্র কোন-না-কোন আকারে প্রচলিত রহিয়াছে; যে সাধারণত্বের নীতি ও বৈচিত্র্যের নীতির ক্রিয়া বিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সে-সবেরই মূলে ইহা রহিয়াছে। মানুষের জীবনে, তাহার বহু মানবীয় শরীরে বহু জন্মে ঐ একই নীতি কার্য করিতেছে। এখানে ইহার একটি বাহ্যিক ক্রিয়া রহিয়াছে এবং একটা আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে; আর যখন আমরা ঐ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যটি লাভ করি এবং আমাদের সমুদয় কর্মকে আধ্যাত্মিক সার্থকতায় উদ্ভাসিত করি তখনই ঐ বাহ্যিক ক্রিয়া তাহার পূর্ণ ও সমগ্র অর্থ লাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞানে আমাদের প্রগতির অনুপাতে এই মহান ও বাঞ্ছনীয় রূপান্তর দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আর প্রথমেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বভাব বলিতে উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক জিনিস বুঝায়, আর ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও অর্থ গ্রহণ করে। এখানেও উহা কর্ম করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পায় না, যেন অর্ধ আলোকে বা অন্ধকারে তাহার নিজস্ব সত্য ধর্মটির সন্ধান করে এবং বহু নিম্নতন রূপ, বহু মিথ্যা রূপ, অন্তহীন ত্রুটি, বিকৃতি, আত্মহানি, আত্মলাভের ভিতর দিয়া নিজের পথে চলিতে থাকে, অবশেষে সে আত্ম-দর্শন ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায় ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতির, পাপ ও পুণ্যের মিশ্রিত রচনা। এই সবের ভিতর দিয়া স্বভাবই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে—এই সত্য হইতে আমাদের সর্বতোমুখী ঔদার্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন। এই সব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন তিনি ঊর্ধ্ব হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবকে তাহার সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অক্ষর আত্মা এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার অলক্ষ্য শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে ক্ষর প্রকৃতিকে তাহার বিপর্যয়সকলের মধ্যে দর্শন করে, ধরিয়া থাকে। ব্যষ্টিগত জীবের যাহা প্রকৃত আত্মা, আমাদের মধ্যে যাহা কেন্দ্রীয় সত্তা, তাহা এই সকল জিনিস হইতে মহত্তর, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার বাহ্যিক ক্রমবিকাশে এই সকলকে স্বীকার করিয়া লয়। আর যখন আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে লাভ করি, যে অপরিবর্তনীয় সর্বগত আত্মা আমাদিগকে ধরিয়া

রহিয়াছে তাহাকে লাভ করি এবং যে পুরুষোত্তম—আমাদের যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয় কর্মের উপর অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিয়া সব কিছু পরিচালন করিতেছেন তাঁহাকে লাভ করি তখনই আমরা আমাদের জীবনের ধর্মের সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কারণ যে জগদীশ্বর অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার অনন্ত গুণে সর্বভূতের মধ্যে নিজকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। আমরা ভগবানের চতুর্ব্যূহ সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আত্মজ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞানের সত্তা; বল ও শক্তির যে-সত্তা নিজের শক্তিসকলের সন্ধান করিতেছে, আবিষ্কার করিতেছে, প্রয়োগ করিতেছে, অন্যোন্যাশ্রয় ও সৃষ্টি ও সম্বন্ধ ও জীবে-জীবে আদান-প্রদানের সত্তা; কর্মের যে-সত্তা বিশ্বে শ্রম করিতেছে, প্রত্যেকের মধ্যে সকলের সেবা করিতেছে এবং প্রত্যেকের শ্রমকে অন্য সকলের সেবায় প্রযুক্ত করিতেছে। আবার আমাদের মধ্যে ভগবানের যে ব্যষ্টিগত শক্তি রহিয়াছে সে-সম্বন্ধেও আমরা সজ্ঞান হইয়া উঠি, তাহা এই চতুর্বিধ শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করিতেছে আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারা নির্দেশ করিতেছে, আমাদের দিব্য কর্ম ও দিব্য পদ নির্ধারণ করিতেছে এবং এই সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার বৈচিত্র্যময় সার্বিকতার মধ্যে আমাদিগকে উত্তোলন করিতেছে যেন ইহার দ্বারা শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

মানুষের মধ্যে চারি বর্ণের যে বাহ্যিক পরিকল্পনা তাহা দিব্য কর্ম-ধারার এই সত্যের কেবল অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট; গুণত্রয়ের ক্রিয়ার মধ্যে ইহার কার্যপ্রণালীর কেবল একটি মাত্র দিকেই উহা সীমাবদ্ধ। ইহা সত্য যে, এই জীবনে মানুষ মোটামুটি চারি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—জ্ঞানের মানুষ কর্মের মানুষ, উৎপাদনশীল প্রাণিক (vital) মানুষ এবং রূঢ় শ্রম ও সেবার মানুষ। এই শ্রেণীবিভাগগুলি মূলপ্রকৃতিগত নহে, পরন্তু ইহারা আমাদের মানবত্বের আত্মবিকাশে বিভিন্ন স্তর। মানুষ যথেষ্ট অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বোঝা লইয়া যাত্রারম্ভ করে, তাহার প্রথম দশা হইতেছে রূঢ় শ্রমের; শরীরের প্রয়োজন, প্রাণের সম্প্রেরণা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার পশুসুলভ আলস্যকে এই শ্রমে বাধ্য করে, আর প্রয়োজনের একটা সীমা ছাড়াইয়াও সমাজ সাক্ষাৎভাবে অথবা গৌণভাবে তাহাকে এই শ্রমে বাধ্য করে; যাহারা এখনও এই তামসিকতার অধীনে তাহারাই শূদ্র, সমাজের দাস শ্রেণী, তাহারা সমাজকে তাহাদের শারীরিক শ্রম দেয়, তাহা ছাড়া সামাজিক জীবনের বহুমুখী খেলায় তাহারা অন্যান্য অধিকতর উন্নত মানুষের তুলনায় আর কিছুই দিতে পারে না অথবা খুব কমই দিয়া থাকে। ক্রিয়াশীলতার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে রজঃগুণের বিকাশ করে, এবং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর

মানুষ পাই, সে প্রয়োজনীয় সৃষ্টি, উৎপাদন, সঞ্চয়, অর্জন, অধিকার ও ভোগের নিরন্তর প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, সে হইতেছে মধ্যবিত্ত আর্থিক ও প্রাণিক মানব, বৈশ্য। আমাদের সাধারণ প্রকৃতির রাজসিকতা বা সক্রিয়তার আরও উচ্চতর স্তরে আমরা পাই এমন কর্মশীল মানব যাহার আছে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্পর্ধিততর উচ্চাশা, কর্ম করিবার, যুদ্ধ করিবার, নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা, এবং উচ্চতম স্তরে নেতৃত্ব করিবার, প্রভুত্ব করিবার, শাসন করিবার, নিজের পথে জনমণ্ডলীকে চালিত করিবার প্রেরণা—সে যোদ্ধা, নেতা, শাসক, সামন্ত, রাজা, সে-ই ক্ষত্রিয়। আর যেখানে সাত্ত্বিক মনেরই প্রাধান্য সেখানে আমরা পাই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানের দিকে, সে জীবনে লইয়া আইসে চিন্তা, বিচার, সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং একটা বুদ্ধিসঙ্গত বিধান, অথবা উচ্চতম স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বিধান এবং ইহার আলোকে সে জীবনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মানব-প্রকৃতিতে সকল সময়েই বিকশিত অবস্থাতেই হউক কিংবা অবিকশিত অবস্থাতেই হউক, উদার হউক কিংবা সঙ্কীর্ণ হউক, দমিত থাকুক কিংবা বাহিরে প্রকট হউক, এই চারিটি চরিত্রেরই কিছু না কিছু রহিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষে এই চারিটির কোন একটিই প্রাধান্য লাভ করিতে চায় এবং কখনও-কখনও প্রকৃতির ক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রটিকেই অধিকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর, সকল সমাজেই আমরা এই চারি শ্রেণী পাইব—এমন কি বর্তমান যুগে যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, আমরা যদি সমাজকে কেবলই উৎপাদনশীল ও ব্যবসামূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, অথবা আধুনিকতম মন যে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইউরোপের এক অংশে যে-বিষয়ে এখন পরীক্ষা চলিতেছে এবং অন্যত্র সমর্থিত হইতেছে, যদি একটা শ্রমিক সমাজ, জনসাধারণকে লইয়া একটা শূদ্র সমাজই গড়িয়া তুলি, তাহা হইলেও সেখানে এই চারি শ্রেণী থাকিবে। তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রয়াসটির নীতি, সত্য ও নিয়ামক বিধির অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইবে; শ্রমশিল্পের অধ্যক্ষ ও নেতা থাকিবে, তাহারা এই সব উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকে নিমিত্ত করিয়া নিজেদের সাহসিকতা ও সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে; শুধুই উৎপাদন ও ধনোপার্জনে যাহারা ব্রতী এইরূপ সাধারণ ধরনের বহু লোক থাকিবে, আবার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সামান্য কিছু শ্রমমূলক কর্ম এবং তাহাদের শ্রমের পুরস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিন্তু এ-সমস্তই হইতেছে বাহিরের জিনিস, আর ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে মানবজাতির এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কোনই আধ্যাত্মিক উপযোগিতা থাকিত না। বড় জোর ইহার কেবল এই অর্থ হইতে পারে যে, আমাদিগকে জন্মে

জন্মে ক্রমবিকাশের এই সকল স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ভারতে কখনও-কখনও এইরূপ মতই দেখা গিয়াছে; কারণ আমাদিগকে ক্রমে-ক্রমে তামসিক, রজোতামসিক, রাজসিক বা রজোসাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে উঠিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় এবং তাহার পর সেই ভিত্তি হইতে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতা যে বলিয়াছে, শূদ্র ও চণ্ডালও তাহার জীবনকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া সোজা অধ্যাত্ম মুক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে উঠিতে পারে, এই কথার আর কোনই যুক্তিযুক্ততা থাকে না।

মূল যে সত্য সেটি এই বাহিরের জিনিস নহে, তাহা হইতেছে আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি. অধ্যাত্ম প্রকৃতির চতুর্বিধ সক্রিয় শক্তির সত্য। প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এই চারিটি দিক লইয়া আছে, সে হইতেছে জ্ঞানের সত্তা, বল ও শক্তির সত্তা, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও আদান প্রদানের সত্তা এবং কর্ম ও সেবার সত্তা, কিন্তু কর্মে এবং অভিব্যক্তির ধারায় কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবাত্মার সহিত তাহার আধারভূত প্রকৃতির সম্বন্ধকে বিশিষ্টতা প্রদান করে; সেইটিই পথ দেখায় এবং অন্য শক্তিগুলির উপর নিজের ছাপ মারিয়া দেয়, সে-সবকে কর্ম, প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রধান ধারাটির প্রয়োজনে নিয়োগ করে। তখন স্বভাব এই ধারাটির ধর্মই অনুসরণ করে, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থূল ও বাঁধাধরা ভাবে নহে, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে, নমনীয়ভাবে, এবং ইহাকে বিকশিত করিতে গিয়াই অন্য তিনটি শক্তিকেও বিকশিত করিয়া তোলে। এইরূপে কর্ম ও সেবার প্রেরণাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে তাহা জ্ঞানকে পুষ্ট করে, শক্তিকে বর্ধিত করে, অন্যোন্যপরতার ঘনিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্যকে এবং সম্বন্ধের কৌশল ও পারম্পর্যকে সুষ্ঠু করিয়া তোলে। চতুর্মুখী দেবতার প্রত্যেকটি দিকের মুখ্য স্বাভাবিক তত্ত্বটি অন্য তিনটির দ্বারা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়, এই ভাবেই তাহা সমগ্র সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যে ক্রমবিকাশ, ইহা গুণত্রয়ের ধর্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানময় সত্তার যে ধর্ম সেইটিকেও তামসিকভাবে অথবা রাজসিকভাবে অনুসরণ করা যায়। শক্তির যে ধর্ম সেইটিকেও পাশবিক ও তামসিকভাবে অথবা সমুচ্চ সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়, সেইরূপ কর্ম ও সেবার ধর্মকেও প্রবল রাজসিকভাবে অথবা সুন্দর ও উদার সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ব্যষ্টিগত স্বধর্মের যে ধারা তাহাতে উপনীত হওয়া এবং জীবনের পথে সেই ধারা আমাদিগকে যে-কর্মে অনুপ্রাণিত করে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহাই হইতেছে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আর এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ আভ্যন্তরীণ স্বধর্ম কোন বাহ্য সামাজিক বা অন্য প্রকার কর্ম, বৃত্তি বা

অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কর্মশীল সত্তা সেবাতেই তৃপ্তি পায় অথবা আমাদের মধ্যে এইরূপ যে কর্মীর ভাব রহিয়াছে তাহা তাহার শ্রমের দিকে, সেবার দিকে ভাগবত প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায়রূপে জ্ঞানচর্চার জীবন, সংঘর্ষ ও শক্তির জীবন অথবা অন্যোন্যপরতা, উৎপাদন ও আদান-প্রদানের জীবন গ্রহণ করিতে পারে। আর পরিশেষে এই চতুর্বিধ ক্রিয়ার দিব্যতম রূপায়ণে এবং সর্বাপেক্ষা ওজস্বান অধ্যাত্ম শক্তিতে উপনীত হওয়াই হইতেছে সর্বাপেক্ষা সমুচ্চ অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্রুততম ও উদারতম সত্যে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত দ্বার। আমরা ইহা করিতে পারি যদি আমরা স্বধর্মের ক্রিয়াকে আভ্যন্তরীণ ভগবানের, বিশ্বপুরুষের এবং বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের পূজায় পরিণত করি এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র কর্মটিকেই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি। তখন যেমন আমরা গুণত্রয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাই, তেমনিই আমরা চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ-বিশেষ ধর্মের সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই, সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত জীবকে বিশ্বগত স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া লন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে চতুর্মুখী সত্তা রহিয়াছে সেইটিকে সর্বাঙ্গসিদ্ধ ও একীভূত করিয়া দেন এবং তাহার স্ব-নিয়ন্ত্রিত কার্যাবলী ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে এবং জীবের মধ্যে ভাগবতের যে-শক্তি সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তদনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন।

গীতার আদেশ হইতেছে আমাদের নিজ কর্মের দ্বারা, স্ব-কর্ম্মণা, ভগবানের উপাসনা করা, আমাদের অর্পণ যেন হয় আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির নিজস্ব ধর্মের দ্বারা নির্ধারিত কর্ম।* কারণ ভগবান হইতেই সকল সৃষ্টির ধারা ও কর্মের প্রেরণা উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার দ্বারাই এই সমুদয় বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগৎসমূহকে সংগ্রথিত রাখিবার জন্য তিনি স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম পরিচালন করিতেছেন, তাহাদের রূপ গড়িয়া দিতেছেন। আমাদের আন্তর ও বাহ্য কার্যাবলীর দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করা, আমাদের সমগ্র জীবনকে পরমতমের উদ্দেশে কর্মযজ্ঞে পরিণত করা—ইহা হইতেছে আমাদের সকল সংকল্প ও সত্তা ও প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত এক হইয়া উঠিবার জন্য নিজদিগকে প্রস্তুত করিবার সাধনা। আমাদের কর্ম হওয়া চাই আমাদের ভিতরের সত্য অনুযায়ী, তাহা যেন কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ না হয়, তাহা যেন হয় অন্তরাত্মার ও তাহার সহজাত শক্তিসকলের জীবন্ত ও যথার্থ অভিব্যক্তি। কারণ আমাদের বর্তমান প্রকৃতিতে এই

* যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

অন্তঃপুরুষের যে জীবন্ত অন্তরতম সত্য তাহার অনুসরণ করিলে তাহা যথাকালে আপাত অতিচেতন পরা প্রকৃতির মধ্যে ঐ অন্তর্পুরুষেরই যে অমৃত সত্য তাহাতে উপনীত হইতে সাহায্য করে। সেখানে আমরা ভগবানের সহিত এবং আমাদের সত্য সত্তার সহিত এবং সর্বভূতের সহিত একত্বে বাস করিতে পারি এবং সর্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্মের মুক্তির মধ্যে দিব্য কর্মের অনবদ্য যন্ত্র হইয়া উঠি।

একবিংশ অধ্যায়

পরম রহস্যের পথে

আর যাহা কিছু বলিবার ছিল গুরু সে-সমুদয়ই শেষ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাণীর সকল মূল তত্ত্ব এবং তাহাদের পরিপোষক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা-সমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাণী সম্বন্ধে যে-সব সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠিতে পারে সে-সবেরও সমাধান করিয়াছেন, এখন শুধু বাকী রহিয়াছে একমাত্র শেষ কথাটিকে, বাণীর অন্তরতম মর্মটিকে, তাঁহার শিক্ষার সার তত্ত্বটিকে অসন্দিগ্ধ এবং অন্তর্ভেদী সূত্রের মধ্যে ধরিয়া দেওয়া। আর আমরা দেখিতে পাই যে, এই অসন্দিগ্ধ, শেষ ও চূড়ান্ত কথাটি এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে কেবল তাহারই সারসংগ্রহ নহে, কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় সাধনাটির এবং এই সমস্ত প্রযত্ন ও তপস্যার ফলে যে মহত্তর অধ্যাত্ম চৈতন্য অধিগত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নহে; ইহা যেন আরও দূরে প্রসারিত হইয়া যায়, প্রত্যেক সীমা ও বিধি, নীতি সূত্র লঙ্ঘন করে, এবং এমন এক উদার ও সীমাহীন অধ্যাত্ম সত্যের দ্বার খুলিয়া দেয় যাহার মধ্যে অনন্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। আর এইটি হইতেছে গীতার শিক্ষার গভীরতার, সুদূরপ্রসারতার এবং ভাব-মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যের কতকগুলি মহান ও প্রয়োজনীয় দিককে ধরিতে পারিলে এবং সে-সবকে ব্যবহারোপযোগী মতবাদ ও উপদেশ, পদ্ধতি ও সাধনায় পরিণত করিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালনায় সাহায্য করিতে পারিলে এবং তাহার কর্মের নীতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিলেই সাধারণ ধর্মশিক্ষা বা দর্শনশাস্ত্র সন্তুষ্ট হয়; তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় না, নিজের পদ্ধতির বাহিরে কোন দ্বার খুলিয়া দেয় না, আমাদিগকে কোন প্রশস্ততম মুক্তি এবং উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে লইয়া যায় না। এইরূপ সীমাবধারণ লাভজনক, বস্তুত কিছুকাল পর্যন্ত ইহা অপরিহার্য। মানুষ তাহার মন ও ইচ্ছার দ্বারা আবদ্ধ, তাহার চিন্তা ও কর্ম নির্বাচনের জন্য তাহার পক্ষে একটা নীতি ও বিধান, একটা বাঁধাধরা পদ্ধতি, একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসক্রমের প্রয়োজন আছে; সে চায় একটি মাত্র অভ্রান্ত সুনির্মিত পথ, বেড়া দিয়া ঘেরা, সুদৃঢ়, তাহার উপর যেন নিরাপদে পা ফেলিয়া চলা যায়, সে চায় সীমাবদ্ধ দিক্‌চক্র এবং পরিবৃত বিশ্রামস্থল। অতি অল্পসংখ্যক শক্তিমান ব্যক্তিই মুক্তির ভিতর দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অথচ মন যে-সব ধারণা ও সংস্কার,

বিধি ও ব্যবস্থা লইয়া তৃপ্ত রহিয়াছে, পরিচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতেছে, মুক্ত জীবকে পরিশেষে তাহাদের বাহিরে যাইতেই হইবে। যে সরণী বাহিয়া আমরা ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতেছি সেইটিকে ছাড়াইয়া উঠা, উচ্চতম ধাপে গিয়াও থামিয়া না যাওয়া, পরন্তু আত্মার উদার প্রসারতার মধ্যে মুক্ত পদে অবাধে বিচরণ করা—আমাদের সংসিদ্ধি লাভের জন্য এইরূপ বিমুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; আত্মার পূর্ণতম স্বাধীনতাই হইতেছে আমাদের সিদ্ধতম অবস্থা। আর গীতা এইভাবেই আমাদিগকে পথ দেখাইয়াছে, উহা এক মহান ধর্ম দিয়াছে, ঊর্ধ্বে উঠিবার এক সুদৃঢ় ও নিশ্চিত অথচ সেই সঙ্গেই অতিপ্রশস্ত সিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে এবং তাহার পর আমাদিগকে সকল ধর্মের উপরে, যাহা কিছু নির্ধারিত করা হইয়াছে সে-সবের উপরে অসীম-উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছে, আমাদের সম্মুখে পরমতম অধ্যাত্ম মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরমতম সিদ্ধির আশা প্রকট করিয়াছে, তাহার রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে, এবং সেই রহস্যই হইতেছে গীতা যাহাকে তাহার পরমতম বাক্য বলিয়াছে তাহার সারবস্তু, সেইটিই হইতেছে গুহ্যতমম্, সেইটিই অন্তরতম জ্ঞান।

আর প্রথমেই গীতা তাহার বাণীটি মোটামুটি পুনরায় বিবৃত করিয়াছে। পনেরোটি শ্লোকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা ও মর্মটি সংক্ষেপে ধরিয়া দিয়াছে, এই ছত্রগুলির বাক্য ও অর্থ হইতেছে সংক্ষিপ্ত ও সংহত, বিষয়বস্তুর কোন সার অংশ এখানে বাদ যায় নাই, সবই অতি স্বচ্ছ যথার্থ্য ও প্রাঞ্জলতার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব সেগুলিকে যত্নের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে, পূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে সেই সবের আলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, গীতার নিজের মতে যেটি হইতেছে তাহার শিক্ষার মূল অর্থ এখানে সেইটিরই সারোদ্ধার করা হইয়াছে। যে কথাটি লইয়া গীতা প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের কর্মের প্রহেলিকা, সংসারে কাজ করিতে থাকা অথচ সেই সময়েই উচ্চতম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়—এখানেও সেই সমস্যাটি লইয়াই বিবৃতিটি আরম্ভ হইয়াছে। সহজতম পন্থা হইতেছে ঐ সমস্যাটিকে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, যখনই আমরা সংসাররূপ ফাঁদের মধ্য হইতে অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে উঠিতে পারি তখনই জীবন ও কর্মকে মিথ্যা মায়া বলিয়া অথবা সৃষ্টির একটা নিম্নতন প্রক্রিয়া বলিয়া পরিত্যাগ করা। এইটিই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সমাধান, তবে ইহাকে সমাধান বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য; যাহাই হউক এইটিই ঐ প্রহেলিকা হইতে উদ্ধার হইবার একটি নিশ্চিত ও সফল পন্থা, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার যেটি উচ্চতম ও সমধিক ধ্যানশীল ধারা সেইটি যখন তাহার প্রথম উদার ও মুক্ত সমন্বয় ছাড়িয়া

একদিকে তীব্রভাবে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে উহা এই পন্থাটির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে এবং সর্বদা উত্তরোত্তব এইটিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। গীতা তন্ত্র এবং কোন-কোন দিকে পরবর্তী ধর্ম আন্দোলনগুলির মত প্রাচীন সমন্বয়টি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে; সেই আদি সমন্বয়ের সার ও ভিত্তিটি গীতা বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার বাহ্য আকার পরিবর্তিত হইয়াছে, ক্রমবিকশিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। উচ্চতম সত্তা ও আত্মায় মানুষের যে আভ্যন্তরীণ জীবন তাহার সহিত পূর্ণ কর্মজীবনের সামঞ্জস্য করার কঠিন সমস্যা গীতার শিক্ষা এড়াইয়া যায় নাই; ইহার মতে যেটি প্রকৃত সমাধান সেইটিই উপস্থাপিত করিয়াছে। জীবন-সন্ন্যাসের দ্বারা সন্ন্যাসের নিজ উদ্দেশ্যটি যে বেশই সাধিত হইতে পারে, গীতা তাহা আদৌ অস্বীকার কবে নাই, কিন্তু গীতা দেখিয়াছে যে, উহা সমস্যাটির গ্রন্থিটিকে খুলিয়া না দিয়া কাটিয়া ফেলে, অতএব গীতা এই প্রণালীটিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াছে এবং নিজেরটিকেই উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়াছে। দুইটি পন্থাই আমাদিগকে মানুষের নিম্নতন অজ্ঞান সাধারণ প্রকৃতি হইতে তুলিয়া শুদ্ধ অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় এবং এই পর্যন্ত দুইটিকেই ন্যায়সংগত, এমন কি মূলত এক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে একটি থামিয়া গিয়াছে, পশ্চাদ্বর্তন করিয়াছে, অপরটি সেখানে অবিচল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সমুচ্চ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছে, অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে একটা দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যে ভগবানকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং আত্মার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

আর সেই জন্যই প্রথম পাঁচটি শ্লোকে গীতা তাহার বক্তব্যটিকে এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে যাহা আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পন্থা এবং বাহ্য ত্যাগের পন্থা উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ এমন ভাবে উহা করিয়াছে যে, উহাদের কয়েকটি সাধারণ কথার একটা গভীবতর এবং অধিকতর অন্তর্মুখী অর্থ গ্রহণ করিলেই গীতা যে প্রণালীটি অনুমোদন করিয়াছে তাহারই ভাব ও মর্মটি পাওয়া যায়। মানবীয় কর্মের সমস্যাটি হইতেছে এই যে, মনে হয় মানুষের অন্তর্পুরুষ ও প্রকৃতির নিয়তিই হইতেছে নানা প্রকার বন্ধনের অধীন থাকা—অজ্ঞানের কারা, অহংয়ের জটিল পাশ, রিপুগণের শৃংখল, উপস্থিত জীবনের নির্বন্ধপর দাবি, এমন একটা অন্ধকার ও সীমা-বন্ধ গণ্ডী যাহা হইতে বাহির হইবার কোন পথই নাই। কর্মের এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবের কোনই স্বাধীনতা নাই, তাহার আত্মাকে আবিষ্কার করিবার এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য, সংসারের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিবার উপযোগী কোন অবসর বা আত্মজ্ঞানের আলোক নাই। তাহার কর্মপর

ব্যক্তিত্ব এবং ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে সে তাহার সত্তা সম্বন্ধে কিছু-কিছু ইঙ্গিত পাইতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে সে পূর্ণতার যে-সব আদর্শ দাঁড় করাইতে পারে সে-সব এত বেশী সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক যে তাহাদের সাহায্যে তাহার নিজস্ব সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় না। তাহার সক্রিয় প্রকৃতির সনির্বন্ধ আহ্বানে তন্ময় হইয়া যখন সে পুনঃ-পুনঃ বাহিরের দিকেই যাইতে বাধ্য হইবে তখন সে কেমন করিয়া তাহার প্রকৃত সত্তা ও অধ্যাত্ম জীবনে ফিরিয়া যাইবে? সন্ন্যাসীর ত্যাগের পন্থা এবং গীতার পন্থা উভয়েই এ-বিষয়ে এক যে, প্রথমেই তাহাকে এই তন্ময়তা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার বাহ্য জিনিসের জন্য বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সক্রিয় প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে; তাহাকে নিশ্চল আত্মার সহিত একাত্ম হইতে হইবে এবং নীরবতার মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাহাকে এক আভ্যন্তরীণ কর্মশূন্যতায় নৈষ্কর্ম্যে উপনীত হইতে হইবে। এই জন্য এই যে মুক্তিপ্রদ আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা এইটিকেই গীতা এখানে তাহার যোগের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এইটিই হইতেছে সেই যোগের প্রথম প্রয়োজনীয় সিদ্ধি। "যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে আসক্তিরহিত, আত্মা স্ববশ এবং বাসনাশূন্য, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।" *

এই যে সন্ন্যাসের আদর্শ, আত্মজয় হইতে লব্ধ নীরবতা, অধ্যাত্ম নিশ্চেষ্টতা এবং কামনাশূন্যতার আদর্শ—ইহা সকল প্রাচীন জ্ঞানেই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা আমাদিগকে ইহার মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিটি অতুলনীয় পূর্ণতা ও স্পষ্টতার সহিত প্রদান করিয়াছে। আর ইহা নির্ভর করিতেছে আত্মজ্ঞান-সন্ধিৎসু সকল সাধকের এই সাধারণ অনুভূতির উপর যে, আমাদের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি রহিয়াছে, যেন দুইটি বিভিন্ন আত্মাই রহিয়াছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নিম্নতন আত্মা, ইহার চৈতন্যের মূল উপাদান, বিশেষত জড়পদার্থ লইয়া ইহার যে আধার তাহা অজ্ঞান ও জড়তার অধীন; জীবনের শক্তিতে ইহা অবশ্য কর্মিষ্ঠ ও প্রাণময়, কিন্তু ইহার কর্মে স্বাভাবিক আত্মবশ্যতা ও আত্মজ্ঞান নাই; মনের মধ্যে আসিয়া ইহা কিছু জ্ঞান ও সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও কষ্টকর প্রয়াসের দ্বারা, নিজেরই অক্ষমতাসমূহের সহিত নিত্য দ্বন্দ্বের দ্বারা। আর রহিয়াছে আমাদের অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া উচ্চতর প্রকৃতি ও আত্মা, তাহা আত্মবশ এবং স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানসক্ষেত্রে তাহা আমাদের

* অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ১৮।৪৯

অনুভূতির অতীত। কখন-কখনও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত এই মহত্তর বস্তুটির ইঙ্গিত পাই, কিন্তু আমরা সজ্ঞানে ইহার মধ্যে বাস করি না, ইহার জ্ঞান এবং শান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন জ্যোতির মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি না। এই দুইটি অতি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রথমটি হইতেছে গীতার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। ইহা নিজেকে দেখে অহংভাবের কেন্দ্র হইতে, ইহার কর্মের নীতি হইতেছে অহং হইতে জাত বাসনা, এবং অহংয়ের গ্রন্থি হইতেছে মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তি, এবং প্রাণের বাসনার প্রতি আসক্তি। এই সকল জিনিসের অপরিহার্য পরিণাম হইতেছে বন্ধন, নীচের প্রকৃতির স্থায়ী দাসত্ব, আত্মজয়ের অভাব, আত্মজ্ঞানের অভাব। অন্য মহত্তর শক্তি ও সত্তাটি হইতেছে অহংয়ের অতীত শুদ্ধ আত্মার প্রকৃতি ও সত্তা, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শুদ্ধ আত্মাকেই নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূলত ইহা হইতেছে এক অনন্ত ও নির্ব্যক্তিক সত্তা, তাহা সকলের মধ্যেই এক ও অভিন্ন; আর যেহেতু এই নির্ব্যক্তিক সত্তা অহংবর্জিত, গুণ-উপাধিবর্জিত, বাসনা, প্রয়োজন ও অনুপ্রেরণা বর্জিত, সেহেতু ইহা নিশ্চল ও অক্ষর; চিরকাল একই—ইহা বিশ্বকর্মের উপদ্রষ্টা, অনুমন্ত ও ভর্তা, কিন্তু তাহাতে যোগ দেয় না, প্রবর্তক হয় না। জীব যখন নিজেকে সক্রিয় প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দেয় তখন সে হয় গীতার ক্ষর, গীতার সচল ও পরিবর্তনশীল পুরুষ; সেই একই জীব যখন নিজেকে সংবৃত করিয়া শুদ্ধ নীরব নিশ্চল আত্মা ও মূল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হয় গীতার অক্ষর, গীতার নিশ্চল ও অপরিবর্তনীয় পুরুষ।

তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, সক্রিয় প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন হইতে উদ্ধার হইবার আধ্যাত্ম মুক্তিতে ফিরিয়া যাইবার সরল ও সহজতম পন্থা হইতেছে অজ্ঞানের কর্মপরতার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ রহিয়াছে সে-সবকে বর্জন করা এবং অন্তর্পুরুষকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তায় পরিণত করা। এইটিকে বলা হয়, ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্ম-ভূয় *। ইহা হইতেছে, মন প্রাণ ও দেহ লইয়া যে নিম্নতন জীবন তাহা বর্জন করা এবং শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা হইয়া উঠা। ইহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে বুদ্ধির দ্বারা, এই বুদ্ধিই হইতেছে বর্তমানে আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব। ইহাকে নিম্নতন জীবনের সকল জিনিস হইতে প্রত্যাবৃত হইতে হইবে, আর প্রথমে ও মুখ্যত জীবনের মূল গ্রন্থি স্বরূপ বাসনা হইতে, মন ইন্দ্রিয় যে-সকল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদের প্রতি আসক্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। * মানুষকে হইতে হইবে সর্বত্র

---

* অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮।৫৩

* বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮।৫১

অসক্তবুদ্ধি।† তখন নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মা হইতে সমস্ত বাসনা দূর হইয়া যায়, আত্মা হয় বিগতস্পৃহ। তাহার ফলে আমাদের নিম্নতন সত্তার উপর আধিপত্য এবং আমাদের ঊর্ধ্বতন সত্তায় প্রতিষ্ঠা আইসে বা সম্ভব হয়। সে-প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আত্মজয়ের উপর, তাহা সুদৃঢ় হয় আমাদের সচল প্রকৃতির উপর পূর্ণ জয় ও আধিপত্য হইতে। আর এই সবেরই অর্থ হইতেছে, অন্তর হইতে বিষয়বাসনা নিঃশেষে বর্জন, সন্ন্যাস। বর্জন হইতেছে এই সিদ্ধিলাভের পন্থা, আর যে-মানব এইরূপ আভ্যন্তরীণ ভাবে সব কিছু বর্জন করিয়াছে, গীতা তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু যে হেতু ঐ কথাটি সাধারণত বাহ্য সন্ন্যাসও বুঝায়, অথবা কখনো-কখনো শুধু তাহাই বুঝায়, সেই জন্য গুরু আভ্যন্তরীণ বর্জনের সহিত বাহ্য বর্জনের প্রভেদ করিতে "ত্যাগ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা ত্যাগ উৎকৃষ্টতর। সন্ন্যাসমার্গ ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে প্রত্যাহারে আরও অনেক বেশী দূর অগ্রসর হয়। ইহা বর্জনের জন্যই বর্জন করিতে আনন্দ পায় এবং বাহ্যভাবে জীবন ও কর্মত্যাগের উপর জোর দেয়, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার উপর জোর দেয়। ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, যতদিন আমরা শরীরের মধ্যে বাস করিতেছি ততদিন ইহা সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব নহে। যতদূর সম্ভব ইহা করা যাইতে পারে, কিন্তু এইভাবে জোর করিয়া কর্মকে খুব কমাইয়া দেওয়া অপরিহার্য নহে, এমন কি ইহা বস্তুতপক্ষে, অন্তত সাধারণত, সমীচীনও নহে। একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা, গীতা নৈষ্কর্ম্য বলিতে ইহার অধিক আর কিছুই বুঝে নাই।

যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন এই অবশেষ রাখা, যখন শুদ্ধ আত্মা হওয়াই আমাদের লক্ষ্য এবং শুদ্ধ আত্মাকে নিষ্ক্রিয় অকর্তা বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে তখন সক্রিয়তার উপর এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য, তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদই আমাদের অধ্যাত্মমুক্তির সমগ্র তত্ত্ব নহে। পুরুষ এবং প্রকৃতি পরিশেষে একই বস্তু; পূর্ণ ও সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পুরুষের মধ্যে ভগবান এবং প্রকৃতির মধ্যে ভগবান—সবেরই সহিত এক করিয়া দেয়। বস্তুত এই যে ব্রহ্ম হওয়া, চির নৈঃশব্দ্যময় আত্মার মধ্যে গৃহীত হওয়া, ব্রহ্মভূয়—ইহাই অমাদের সমগ্র লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে কেবল আরও মহত্তর ও আশ্চর্যতর ভাগবত জীবনের (মদ্‌ভাব) জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল ভিত্তি।

† অসক্তবুদ্ধি সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ১৮।৪৯

আর সেই মহত্তম অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মায় নিশ্চল হইতে হইবে, আমাদের সকল অংশে নিস্তব্ধ হইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদিগকে প্রকৃতিতে, আত্মার সত্য ও সমুচ্চ শক্তিতে কর্ম করিতে হইবে। আর যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বিপরীত বলিয়া মনে হয় এমন দুইটি জিনিস যুগপৎ কেমন করিয়া সম্ভব, তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম সত্তার ঐটিই হইতেছে প্রকৃত স্বরূপ; সকল সময়ে তাহার মধ্যে অনন্তের এই দুইমুখী ভাব রহিয়াছে। নির্ব্যক্তিক সত্তা নিঃশব্দ; আমাদিগকেও হইতে হইবে আভ্যন্তরীণ ভাবে নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক—আত্মার মধ্যে সমাহিত। নির্ব্যক্তিক সত্তা সকল কর্মকে দেখে তাহার দ্বারা কৃত নহে পরন্তু প্রকৃতির দ্বারা কৃত; প্রকৃতির সকল গুণ ও শক্তির ক্রিয়াকে সে শুদ্ধ সমতার সহিত দেখে; যে-জীব আত্মায় নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছে তাহাকেও সেইরূপ দেখিতে হইবে যে, আমাদের সকল কর্মই প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহার নিজের দ্বারা নহে; তাহকে সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।* আর সেই সঙ্গেই যাহাতে আমরা এইখানেই থামিয়া না যাই, যাহাতে অমরা যথাকালে সম্মুখে অগ্রসর হই এবং আমাদের কর্মের একটা আধ্যাত্মিক নীতি ও নির্দেশ লাভ করি, শুধু আভ্যন্তরীণ নিশ্চলতা ও নৈঃশব্দ্যেরই নীতি নহে, সেই জন্য আমাদিগকে বলা হইয়াছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের উপর যজ্ঞের ভাব আরোপ করিতে, যেন আমাদের সমস্ত কর্ম আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রকৃতির অধীশ্বরের উদ্দেশে, যে পরম পুরুষের সে আত্ম-শক্তি, স্বা প্রকৃতি, তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গে পরিণত হয়। এমন কি আমাদিগকে যথাকালে তাঁহার হস্তে সব সংন্যস্ত করিতে হইবে, সমস্ত ব্যক্তিগত কর্মের প্রবর্তন সর্ব্বারম্ভাঃ, বর্জন করিতে হইবে, আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে কেবল তাঁহার কর্মের এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের যন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে। এই সব জিনিস ইতিপূর্বে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখানে গীতা আর এ-সবের উপর জোর দেয় নাই, কেবল দুইটি সাধারণ শব্দ, "সন্ন্যাস" ও "নৈষ্কর্ম্য", অন্য কোন বিশেষণ না দিয়াই প্রয়োগ করিয়াছে।

শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে বাস করিবার জন্য আবশ্যকীয় সাধনা হইতেছে পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ স্তব্ধতা—ইহা একবার স্বীকৃত হইলে তাহার পরই প্রশ্ন উঠে, কেমন করিয়া কার্যত ঐ সাধনার দ্বারা ঐ ফলটি লাভ করা যাইতে পারে। "এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেমন করিয়া মানুষ

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ১৮।৫৪

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, হে কুন্তিনন্দন, তাহা শ্রবণ কর,—সেইটিই হইতেছে জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা"।* এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা হইতেছে সাংখ্যযোগ, গীতার নিজের যোগের সহিত ইহার যতখানি মিল আছে ততখানিই গীতা এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগকে মানিয়া লইয়াছে, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্‌; গীতার যোগের মধ্যে কর্মের পন্থাও রহিয়াছে, কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্‌। কিন্তু এখানে আপাতত কর্মের সমস্ত কথা উহ্য রাখা হইয়াছে। কারণ এখানে ব্রহ্ম বলিতে প্রথমত নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর সত্তাকেই বুঝাইতেছে। অবশ্য উপনিষদের ন্যায় গীতার মতেও যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু জীবন্ত ও গতিশীল সবই হইতেছে ব্রহ্ম; ইহা কেবলই নির্ব্যক্তিক অনন্ত নহে, কেবলই এক অচিন্ত্য অব্যবহার্য কৈবল্যাত্মক সত্তা নহে। উপনিষদ বলিয়াছে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম; গীতা বলিয়াছে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্‌—স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে পরম ব্রহ্মই সেই সব, এবং তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক এবং মুখ আমাদের সর্বদিকে রহিয়াছে।† তথাপি এই "সর্বের" দুইটি দিক আছে, তাঁহার অক্ষর শাশ্বত সত্তা যাহা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সক্রিয় শক্তির সত্তা তাহা জগতের কর্মের মধ্যে কর্ম করিতে বাহির হইয়াছে। যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে আত্মার নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে লয় করিয়া দিই. কেবল তখনই আমরা শান্ত ও মুক্ত একত্বে উপনীত হই, এবং তাহার দ্বারা আমরা ভগবানের জগৎরূপ কর্মধারায় যে বিশ্ব-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার সহিত সত্য ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। নির্ব্যক্তিকতা হইতেছে সীমা ও ভেদের খণ্ডন এবং নির্ব্যক্তিকতার সাধনা হইতেছে সত্য সত্তার স্বাভাবিক অবস্থা, সত্য জ্ঞানের অপরিহার্য উপক্রমণিকা এবং সেই হেতু সত্য কর্মের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। ইহা খুবই স্পষ্ট যে, আমাদের সীমাবদ্ধ অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া থাকিলে আমরা সকলের সহিত এক আত্মা হইতে পারি না অথবা বিশ্বপুরুষের সহিত এবং তাঁহার বিশাল আত্মজ্ঞান, তাঁহার বহুমুখী ইচ্ছা ও তাঁহার সুদূর-প্রসারী বিশ্ব-উদ্দেশ্যের সহিত এক হইতে পারি না। কারণ উহা আমাদিগকে অন্যের সহিত পৃথক করিয়া দেয় এবং আমাদিগকে আমাদের দৃষ্টিতে ও আমাদের কর্ম-প্রবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ ও অহংমুখী করিয়া তোলে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অন্যের দৃষ্টি ও অনুভব ও সঙ্কল্পের সহিত কোন রকম একটা আপেক্ষিক সামঞ্জস্য করিয়া কেবল একটা সীমাবদ্ধ ঐক্যেই উপনীত হইতে পারি। সকলের

* সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ১৮।৫০

† সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্‌।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৩

সহিত এক হইতে হইলে এবং ভগবান ও তাঁহার বিশ্বগত ইচ্ছার সহিত এক হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই নির্ব্যক্তিক হইতে হইবে, অহং ও তাহার তাহার দাবিসকল হইতে এবং নিজেদের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে ও অন্যের সম্বন্ধে অহংভাবমূলক দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আর আমরা ইহা করিতে পারি না যদি না আমাদের সত্তায় এমন একটা কিছু থাকে যাহা ব্যক্তিত্ব হইতে ভিন্ন, অহং হইতে ভিন্ন, যাহা সর্বভূতের সহিত এক নর্ব্যক্তিক আত্মা। অতএব অহংকে লয় করিয়া এই নির্ব্যক্তিক আত্মা হওয়া, আমাদের চৈতন্যে এই নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম সাধনা।

তাহা হইলে ইহা কেমন করিয়া করিতে হইবে? গীতা বলিয়াছে, প্রথমত বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।* এই যে বুদ্ধিকে বহির্মুখী ও নিম্নমুখী দৃষ্টি হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী ও ঊর্ধ্বমুখী করা, বুদ্ধির এই আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনই হইতেছে জ্ঞানযোগের সারতত্ত্ব। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা সমগ্র সত্তাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, আত্মানং নিয়ম্য; বুদ্ধি দৃঢ় ও অবিচল সংকল্পের দ্বারা, ধৃত্যা, আমাদিগকে নিম্নতন প্রকৃতিব বহির্মুখী বাসনার প্রতি আসক্তি হইতে ফিরাইয়া লইবে, সেই সংকল্প একাগ্র হইয়া শুদ্ধ আত্মার নির্ব্যক্তিকতার সম্পূর্ণ অভিমুখী হইবে। ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিবে, এই সকল বিষয় আমাদের মনের মধ্যে যে রাগ ও দ্বেষের সৃষ্টি করে মন তাহা পরিহার করিবে—কারণ নির্ব্যক্তিক আত্মার কোন বাসনা নাই, কোন বিদ্বেষ নাই; এই সব হইতেছে বস্তুসকলের স্পর্শে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের প্রাণগত প্রতিক্রিয়া, আর বিষয়ের সংস্পর্শে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে উদ্দীপনা তাহাই হইতেছে ঐ সকল প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন ও তাহাদের ভিত্তি। মন, বাক্য ও শরীরের উপর, এমন কি ক্ষুধা, শীত ও উষ্ণবোধ এবং শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতি প্রাণিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার উপরেও পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করিতে হইবে; আমাদের সমগ্র সত্তা হওয়া চাই উদাসীন, এই সকল জিনিসে অবিচলিত, সকল বাহ্যস্পর্শে এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় সমভাবাপন্ন। এইটিই হইতেছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রণালী, যোগের সোজা ও খাড়া পথ। চাই বাসনা ও আসক্তির সম্পূর্ণ বিরতি, বৈরাগ্য; সাধককে দৃঢ়তার সহিত নির্ব্যক্তিক নির্জনতায় বাস করিতে হইবে, ধ্যানের দ্বারা সর্বদা অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।*

* বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিযম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮।৫১
* বিবিক্তসেবীলঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ১৮।৫২

অথচ এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য নহে জাগতিক কর্মে যোগ দিবার দুঃখ সহনে বিমুখ মুনি বা দার্শনিকের ন্যায় একান্তভাবে নিজেকে লইয়াই নির্জনতা ও নিরুদ্বেগের মধ্যে বাস করা; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকল প্রকার অহংভাবকে দূর করা। প্রথমেই রাজসিক অহংভাব, অহঙ্কারপূর্ণ তেজ ও উগ্রতা, দর্প, বাসনা, ক্রোধ, পরিগ্রহ, রিপুসমূহের উদ্দীপনা এবং জীবনের প্রচণ্ড ভোগ-লালসা-সকল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।* কিন্তু তাহার পর সকল প্রকার অহংভাব, এমন কি সাত্ত্বিক অহংভাবও ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ লক্ষ্য হইতেছে আত্মা ও মন ও প্রাণকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকাব সীমাবদ্ধকর "আমি", "আমার" ভাব হইতে মুক্ত করা, নির্ম্মম। অহং এবং অহংয়ের সকল প্রকার দাবি নির্মূল করা—আমাদের সম্মুখে এই সাধনপদ্ধতিই দেওয়া হইয়াছে। কারণ যে শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মা অবিচল থাকিয়া এই বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার কোনরূপ অহংভাব নাই, তাহা কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু কামনা করে না; তাহা শান্ত, জ্যোতিঃপূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, তাহা নিঃশব্দে সকল বস্তু, সকল ব্যক্তিকে দেখে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানেব সমতাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া। তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, অন্তরে অনুরূপ কিংবা ঐ একই নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করিয়াই অন্তর্বাসী আত্মা বস্তু-সকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুষ্ঠু ভাবে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারে যাহা বিশ্বের নামরূপ ও পরিবর্তনসকলের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, কিন্তু সে-সব তাহাকে স্পর্শ বা বিচলিত করিতে পারে না।

গীতা এই যে প্রথমেই নির্ব্যক্তিকতার সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছে, ইহা স্পষ্টত একটা পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা লইয়া আইসে এবং ইহা ইহার গূঢ়তম অংশে এবং সাধন তত্ত্বে সন্ন্যাসের প্রণালীর সহিত অভিন্ন। তত্রাচ এমন একটা স্থান আছে যেখানে ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি এবং বাহ্য জগতের দাবি পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে রোধ করা হইয়াছে এবং যাহাতে আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া কর্মত্যাগ ও বাহ্য সন্ন্যাসে পরিণত না হয় সে জন্য একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইযাছে। ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক তাহাদের বিষয়-সমূহের যে পরিবর্জন তাহার স্বরূপ যেন হয় ত্যাগ; ইহা হইবে সকল রস বা ভোগাসক্তি ত্যাগ, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের যে মূল প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া তাহার বর্জন নহে। মানুষকে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুসকলের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রের বিষয়সমূহের উপর শুদ্ধ, সত্য ও প্রগাঢ়, সহজ ও নিরালম্ব ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া লইয়া কর্ম করিতে হইবে দিব্য কর্মে আত্মার

* অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮।৫৩

প্রয়োজন মিটাইতে তাহাদের উপযোগিতার জন্য, পরন্তু আদৌ বাসনা চরিতার্থতাব জন্য নহে। বৈরাগ্য চাই, সাধারণ অর্থে জীবনের প্রতি বিরাগ বা সাংসারিক কর্মের উপর বিতৃষ্ণা নহে, পরন্তু "রাগ" বর্জন এবং তাহার বিপরীত "দ্বেষ" বর্জন। মন ও প্রাণের সকল প্রকার অনুরাগ বর্জন করিতে হইবে, তেমনি মন ও প্রাণের সকল প্রকার বিদ্বেষও বর্জন করিতে হইবে। আর এইরূপ করিতে বলা হইতেছে নির্বাণের জন্য নহে পরন্তু এমন সিদ্ধতম ও সামর্থ্যপ্রদ সমতার জন্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মা বস্তুসকল সম্বন্ধে সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টি এবং প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র দিব্য কর্ম উভযেবই প্রতি অবাধ ও অপরিমেয় সম্মতি প্রদান করিতে পারে। ধ্যানযোগপরোনিত্যং, সর্বদা ধ্যানে রত থাকা হইতেছে সুদৃঢ় পন্থা যাহার দ্বারা মানুষের অন্তর্পুরুষ তাহার শক্তিময় সত্তা এবং তাহার নৈঃশব্দ্যময় সত্তা সিদ্ধ করিতে পারে। অথচ শুধুই ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কর্মময় জীবন পরিত্যাগ করা চলিবে না; পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সকল কর্মই করিতে হইবে। সন্ন্যাস মার্গে এই বৈরাগ্যের সাধনা ব্যষ্টিগত জীবকে শাশ্বত সত্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া নিজেকে লয় করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, আব সাংসারিক জীবন ও কর্মেব পরিত্যাগ হইতেছে এই প্রণালীতে একটি অপরিহার্য সোপান। কিন্তু গীতার যে ত্যাগ-পন্থা, তাহাতে একটি হইতেছে আমাদের সমস্ত জীবন ও সত্তাকে এবং সমস্ত কর্মকে ভগবানের শান্ততম ও অপরিমেয় সত্তা ও চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সর্বোতোমুখী ঐক্যে পরিণত করার আয়োজন, এবং ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইযা জীবের পক্ষে নীচের অহং হইতে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি পরা প্রকৃতির অনির্বচনীয় সিদ্ধির মধ্যে প্রশস্ত ও সমগ্রভাবে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

গীতার চিন্তার এই সুস্পষ্ট নূতন ধারাটি পরের দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির পারম্পর্য বিশেষ অর্থসূচক। "যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, যিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার উপর তাঁহার হয় পরম প্রেম ও ভক্তি"।* কিন্তু জ্ঞানযোগের যে সংকীর্ণ পন্থা তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপর ভক্তি কেবল একটি নিম্নতন ও প্রথম প্রক্রিয়া হইতে পারে; শেষ, চূড়ান্ত পরিণতি হইতেছে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মের সহিত নির্বিশেষ ঐক্যে ব্যক্তিক সত্তার বিলয়, সেখানে ভক্তির কোন স্থান থাকিতে পারে না; কারণ সেখানে কাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, কেই বা ভক্তি করিবে? সেখানে আর সব কিছুই আত্মার সহিত জীবের নীরব

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

নিশ্চল তাদাত্ম্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীতায় আমাদিগকে নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইতেও বড় কিছু দেওয়া হইয়াছে,—এখানে রহিয়াছেন পরম আত্মা, তিনিই পরম ঈশ্বর, এখানে রহিয়াছেন পরম পুরুষ এবং তাঁহার পরমা প্রকৃতি, এখানে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়েরই ঊর্ধ্বে এবং তাঁহার শাশ্বত সমুচ্চ পদে তাহাদের সমন্বয় করিয়াছেন। অহং সত্তা এখানেও নির্ব্যক্তিক নীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চাতে এই নিশ্চল নীরবতাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে পরম পুরুষের কর্ম, তিনি নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম অপেক্ষা মহত্তর। তখন আর অহং এবং গুণত্রয়ের নিম্নতন অন্ধ ও পঙ্গু ক্রিয়া থাকে না, পরন্তু তাহার পরিবর্তে আইসে এক অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির, এক মুক্ত অপরিমেয় শক্তির বিশাল স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল ক্রিয়া। সকল প্রকৃতি হয় এক অদ্বিতীয় ভগবানের শক্তি, সকল কর্ম হয় আধার ও নিমিত্তস্বরূপ ব্যষ্টিসত্তার ভিতর দিয়া ভগবানের কর্ম। অহংয়ের স্থলে সত্য অধ্যাত্ম ব্যক্তি সত্তাটি সচেতন ও প্রকট হইয়া সম্মুখে আইসে তাহার প্রকৃত স্বরূপের স্বাধীনতায়, তাহার স্থিতির শক্তিতে, ভগবানের সহিত তাহার চিরন্তন সম্বন্ধের মহিমা ও জ্যোতিতে, তাহা পরম ঈশ্বরের অক্ষয় অংশ, পরা প্রকৃতির অবিনশ্বর শক্তি, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা। মানুষের অন্তর্পুরুষ তখন এক পরম আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতায় নিজেকে পুরুষোত্তমের সহিত এক বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার বিশ্বপ্রসারিত ব্যক্তিত্বে নিজেকে ভগবানের একটি প্রকট শক্তি রূপে অনুভব করে। তাহার জ্ঞান হয় ভগবানেরই জ্ঞানের একটা জ্যোতি; তাহার ইচ্ছা হয় ভগবানেরই ইচ্ছার একটা শক্তি; বিশ্বের সব কিছুর সহিত তাহার ঐক্য হয় ভগবানেরই শাশ্বত ঐক্যের একটি লীলা। এই যে যুগ্ম সিদ্ধি, এই যে এক অনির্বচনীয় সত্যের দুইটি দিকের মিলন (এই দুইটির যে-কোনটি অথবা দুইটিরই দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অনন্ত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে),—ইহার মধ্যেই মুক্ত মানবকে বাস করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, সকলের সহিত এবং তাহার আত্মার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্রিয়াসমূহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ধারিত করিতে হইবে অথবা তাহার হইয়া তাহার শ্রেষ্ঠতম সত্তার মহত্তম শক্তিই তাহা নির্ধারিত করিয়া দিবে। আর সেই ঐক্যসাধক সিদ্ধিতে উপাসনা, প্রেম, ভক্তি যে তখনও সম্ভব হয় শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাহারা হয় উচ্চতম উপলব্ধির উদার, অবশ্যম্ভাবী ও কিরীটস্বরূপ অংশ। এক অদ্বিতীয় সত্তা অনন্তকাল ধরিয়া বহু হইতেছে, বহু তাহাদের দৃশ্য বিভেদের মধ্যেও চিরকাল এক, পরমতম পুরুষ আমাদের মধ্যে জগতের এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য প্রকট করিতেছেন, তিনি তাঁহার বহুত্বের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন না, তাঁহার একত্বের দ্বারাও

সীমাবন্ধ নহেন,—এই যে সমগ্র জ্ঞান, এই যে সমন্বয়-সাধক উপলব্ধি, ইহাই মানুষকে মুক্তস্য কর্ম্ম, মুক্ত কর্মে সমর্থ করিয়া তোলে।

গীতা বলিয়াছে, এই জ্ঞান আইসে পরমতম ভক্তি হইতে। ইহা লব্ধ হয় যখন মন বস্তু-সকল সম্বন্ধে অতিমানস ও সমুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টির দ্বারা নিজেকে অতিক্রম করে, যখন সেই সঙ্গে হৃদয়ও আমাদের প্রেম ও ভক্তির অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও মানসিক রূপকে ছাড়াইয়া এমন প্রেমে উন্নীত হয় যাহা শান্ত গভীর এবং প্রশান্ততম জ্ঞানে জ্যোতির্ময়, ভগবানে পরম প্রীতি এবং অপরিমেয় ভক্তি লাভ করে, অবিচল পুলক, অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ করে। জীব যখন তাহার ভেদাত্মক ব্যক্তিকতাকে লয় করিয়াছে, ব্রহ্ম হইয়াছে, তখনই সে সত্য পুরুষের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং পুরুষোত্তমের প্রতি পরম দৃষ্টি-প্রদ ভক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহার গভীর ভক্তির, তাহার হৃদয়ের জ্ঞানের শক্তি দ্বারা পুরুষোত্তমকে পূর্ণতমভাবে জানিতে পারে। সেইটিই হইতেছে সমগ্র জ্ঞান, যখন হৃদয়ের অতলস্পর্শ দৃষ্টি মনের চরমতম উপ-লব্ধিকে পূর্ণ করিয়া তোলে,—সমগ্রং মাং জ্ঞাত্বা। গীতা বলিযাছে, "আমি কি এবং কতখানি তাহা তিনি জানিতে পারেন, আমার সত্তাব সকল সত্যে ও তত্ত্বে তিনি আমাকে জানিতে পারেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"।* এই যে সমগ্র জ্ঞান, ইহা হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে অবস্থিত ভগবানেব জ্ঞান; ইহা মানুষের হৃদয়ে গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি, তিনি এখন প্রকাশিত হন তাহার জীবনের পরমতম সত্তারূপে, তাহার সকল জ্ঞানা-লোকিত চৈতন্যের সূর্যরূপে, তাহার সকল কর্মের অধীশ্বর ও শক্তি রূপে, তাহার অন্তরাত্মার সকল প্রেম ও প্রীতির দিব্য উৎসরূপে, তাহার পূজা ও উপাসনার দিব্য প্রেমিক ও প্রিয়রূপে। এই জ্ঞান বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত ভগবানেরও জ্ঞান, এই জ্ঞান সেই শাশ্বত পুরুষের যাঁহা হইতে সব কিছুর প্রবৃত্তি এবং যাঁহার মধ্যে সব কিছু বাস করিতেছে, সকলের সত্তা বিধৃত বহিয়াছে, এই জ্ঞান বিশ্বের অন্তর্পুরুষ ও আত্মার, এই জ্ঞান বাসুদেবের যিনি যাহা কিছু আছে সবই হইয়াছেন, এই জ্ঞান বিশ্বের অধীশ্বরের যিনি প্রকৃতির সকল কর্মের উপর অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এই জ্ঞান আপন বিশ্বাতীত শাশ্বত পদে জ্যোতিষ্মান দিব্য পুরুষের জ্ঞান, তাঁহার সত্তার রূপ মনের চিন্তার অগোচর কিন্তু মনের নৈঃশব্দ্যের অগোচর নহে; ইহা হইতেছে কৈবল্যাত্মক সত্তারূপে, পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ পরম ভগবান রূপে পূর্ণভাবে, জীবন্তভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা; কারণ সেই আপাত-অজ্ঞেয় কৈবল্যাত্মক সত্তা সেই

* ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতি তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫

সঙ্গেই এবং সেই উচ্চতম পদেই হইতেছেন বিশ্বকর্মধারার উৎপত্তিস্বরূপ আত্মা এবং এই সর্বভূতের ঈশ্বর। মুক্ত পুরুষের অন্তরাত্মা এইভাবে পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবেশ করে সমন্বয়সাধক জ্ঞানের দ্বারা এবং তাঁহার অন্তঃস্থলে স্থান পায় বিশ্বাতীত ভগবানে, ব্যষ্টিগত ভগবানে এবং বিশ্বগত ভগবানে পূর্ণতম যুগপৎ প্রীতির দ্বারা। সে তাহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মোপলব্ধিতে তাঁহার সহিত এক হয়, তাহার সত্তায়, চৈতন্যে, ইচ্ছায়, জগৎজ্ঞানে ও জগৎ-প্রেরণায় তাঁহার সহিত এক হয়, বিশ্বে এবং বিশ্ববাসী সকল জীবের সহিত তাহার ঐক্যে সে তাঁহার সহিত এক হয়, এবং জগতের ও ব্যষ্টির অতীতে অব্যয় শাশ্বত পদে তাঁহার সহিত এক হয়। যে পরম ভক্তি পরম জ্ঞানের অন্তরতম, ইহাই হইতেছে তাহার চরম পরিণতি।

আর এখন ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় কেমন করিয়া কর্ম, জীবনের কর্মরাজির কোন অংশের হ্রাস বা বর্জন না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম ও সকল প্রকার কর্ম পরমতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ অবিরুদ্ধ হইতে পারে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ভক্তি বা জ্ঞানের ন্যায়ই এই উচ্চতম অধ্যাত্ম স্থিতিতে পৌঁছিবার একটি শক্তিশালী সাধন হইতে পারে। এ-বিষয়ে গীতার উক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। "আর আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।" * এই যে মুক্তিপ্রদ কর্ম ইহা স্বরূপত হইতেছে আমাদের মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত আমাদের সংকল্পের এবং আমাদের প্রকৃতির সকল কর্মপ্রবণ অংশের গভীরতম যোগে সম্পাদিত কর্ম। প্রথমে ইহা করা হয় যজ্ঞরূপে, তখন আমাদের "আমি কর্তা" এইরূপ ভাব থাকে। তাহার পর ইহা করা হয় ঐ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া এবং প্রকৃতিই সব করিতেছে এই উপলব্ধি লইয়া। শেষকালে প্রকৃতি ভগবানের পরা শক্তি এই জ্ঞান লইয়া এবং আমাদের সকল কর্ম তাঁহাতে সন্ন্যাস করিয়া, সমর্পণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তাকে কেবল মাত্র যন্ত্র করিয়া, আধার করিয়া কর্ম করা হয়। আমাদের কর্ম তখন সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা ও ভগবান হইতে প্রবর্তিত হয়, তাহা হয় অবিভক্ত বিশ্বকর্মেরই একটি অংশ, তাহা আরব্ধ হয়, সম্পাদিত হয় আমাদের দ্বারা নহে পরন্তু এক বিশাল বিশ্বাতীত শক্তির দ্বারা। আমরা যাহা কিছু করি সে-সবই করা হয় আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের জন্য, ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, জগতের মধ্যে ভগবানের জন্য, সর্বভূতের কল্যাণের জন্য, বিশ্ব-কর্ম এবং বিশ্ব-উদ্দেশ্য

* সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮।৫৬

সম্পন্ন করিবার জন্য, অথবা এক কথায় পুরুষোত্তমের জন্য এবং তাহা বস্তুত তাঁহারই দ্বারা তাঁহার বিশ্ব-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পাদিত হয়। এই সকল দিব্য কর্ম, তাহাদের রূপ বা বাহ্য স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, বন্ধ করিতে পারে না, পরন্তু তাহারাই হয় এই ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি হইতে পরমা, দিব্য ও অধ্যাত্ম প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্যে উঠিবার শক্তিশালী সাধন। এই সকল মিশ্রিত ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা অমৃত ধর্মে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা আমাদিগকে অধিকার করে যখন আমরা আমাদের সকল চৈতন্যে ও কর্মে নিজেদিগকে পুরুষোত্তমের সহিত এক করিয়া দিই। এখানে সেই ঐক্য সেখানে কালের অতীতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিবার শক্তি লইয়া আইসে। সেখানে আমরা তাঁহার শাশ্বত অব্যয় পদে বাস করিব।

অতএব গুরু ইতিপূর্বেই যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহার আলোকে এই সাতটি শ্লোক অভিনিবেশ সহকারে পঠিত হইলে এইগুলির মধ্যেই আমরা গীতার যোগের সমগ্র তত্ত্বটি, সম্পূর্ণ মূল পদ্ধতিটি, সমস্ত সার মর্মটি সংক্ষেপে অথচ ব্যাপকভাবে প্রাপ্ত হই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরম রহস্য

দিব্য গুরু শিষ্যকে তাহার কর্ম ও যুদ্ধের ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষা ও যোগের সার তত্ত্বটি এইভাবে প্রদান করিয়াছেন, এখন তিনি সেইটি তাহার কর্ম সমস্যার মীমাংসায় প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু এমন ভাবে যেন উহা সকল কর্মের মীমাংসাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের সহিত সংশিলষ্ট, কুরুক্ষেত্রের নায়কের প্রতি উক্ত এই কথাগুলির সার্থকতা অনেক বেশী ব্যাপক এবং যাহারা সাধারণ মানসপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে এবং উচ্চতম অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে বাস করিতে, কর্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে এইগুলি হইতেছে একটি সার্বভৌমিক সাধারণ বিধান। অহং এবং ব্যক্তিগত মনের গন্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং সব কিছুকেই আত্মার প্রসারতার মধ্যে দর্শন করা, ভগবানকে জানা এবং তাঁহাকে তাঁহার সমগ্র সত্যে এবং তাঁহার সকল ভাবে উপাসনা করা, প্রকৃতি ও বিশ্বসত্তার বিশ্বাতীত অন্তর্পুরুষের নিকট নিজেকে সমগ্রভাবে সমর্পণ করা, দিব্য চৈতন্যকে অধিকার করা এবং তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া, প্রেম, আনন্দ, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের সর্বব্যাপকতায় অদ্বিতীয় একের সহিত এক হওয়া, তাঁহার মধ্যে সকল জীবের সহিত এক হওয়া, যেখানে সবই ভগবান সেই জগতের দিব্য ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এবং মুক্ত আত্মার দিব্য স্থিতি লাভ করিয়া উপাসনা ও যজ্ঞরূপে কর্ম করা—ইহাই হইতেছে গীতার যোগের মর্মকথা। ইহা হইতেছে আমাদের সত্তার আপাতদৃষ্ট সত্য হইতে পরম অধ্যাত্ম ও প্রকৃত সত্যে সংক্রমণ, এবং সাধক ইহার মধ্যে প্রবেশ করে ভেদাত্মক চৈতন্যের বহু খন্ডতা বর্জন করিয়া এবং রিপুর বিক্ষোভ ও অস্থিরতা ও অজ্ঞানের প্রতি, ন্যূনতর জ্যোতি ও জ্ঞানের প্রতি, পাপ ও পুণ্যের প্রতি, নিম্নতন প্রকৃতির দ্বৈধ ধর্ম ও আদর্শের প্রতি মনের আসক্তি বর্জন করিয়া। অতএব গুরু বলিলেন, "নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিয়া, তোমার সচেতন মনে তোমার সকল কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্বদা হৃদয়ে ও চৈতন্যে আমার সহিত এক হইয়া থাক।* যদি তুমি সকল সময়ে ঐ ভাবে থাক,

* চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ১৮।৫৭-৫৮

তাহা হইলে আমার প্রসাদে তুমি সকল দুর্গম ও সংকটময় পথ নিরাপদে অতিক্রম করিবে; কিন্তু অহংভাবের বশে যদি না শুন, তুমি বিনষ্ট হইবে। অহংভাবের বশে তুমি যে মনে করিতেছ "আমি যুদ্ধ করিব না", তোমার এ সংকল্প বৃথা, তোমার প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্মে নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা না করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার স্বভাবজাত নিজ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে। হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং নিজ মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় সর্বভূতকে ঘুরাইতেছেন। তোমার সত্তার সকল ভাবে তাঁহারই শরণাগত হও তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে।"

এই পংক্তিগুলির মধ্যেই এই যোগের অন্তরতম মর্মটি নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার চূড়ান্ত উপলব্ধির নির্দেশও এখানে রহিয়াছে এবং আমাদিগকে এইগুলিকে ইহাদের অন্তরতম অর্থে ও সেই সমুচ্চ উপলব্ধির সমগ্র ব্যাপকতায় হৃদয়ংগম করিতে হইবে। এই কথাগুলির দ্বারা ভগবানের সহিত মানবের পূর্ণতম, ঘনিষ্ঠতম ও জীবন্ত সম্বন্ধটি অভিব্যক্ত হইয়াছে; এইগুলি সেই হৃদ্গত ধর্মভাবের সংহত শক্তিতে নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত যাহা মানুষের পরা অনুরক্তি হইতে—যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ভগবান হইতে সে আসিয়াছে এবং যাঁহার মধ্যে সে বাস করিতেছে তাঁহার প্রতি তাহার সমগ্র জীবনের ঊর্ধ্বমুখী সমর্পণ ও পূর্ণতম আত্মনিবেদন হইতে উদ্ভূত হয়। গীতা শ্রেষ্ঠতম কর্মের অন্তরতম ভাব ও প্রেরণারূপে এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের চূড়া ও সারবস্তুরূপে ভক্তিকে, ভগবানের প্রতি প্রেমকে, পরমতমের উপাসনাকে যে সমুচ্চ ও স্থায়ী স্থান দিয়াছে তাহার সহিত এই হৃদয়াবেগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যে-সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সেগুলি যে অধ্যাত্ম ভাবাবেগে স্পন্দিত তাহারা ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সত্য এবং ব্যক্তিগত সত্তাকেই প্রগাঢ়তম ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে এবং উচ্চতম সার্থকতা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দার্শনিকদের পরিকল্পিত কোন নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা কোন উদাসীন নির্ব্যক্তিক সত্তা অথবা সকল প্রকার সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করে এমন কোন অনির্বচনীয় নৈঃশব্দ্যের নিকট আমাদের সকল কর্মের এইরূপ পরিপূর্ণ

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮।৫৯-৬২

সমর্পণ করা যায় না এবং আমাদের সচেতন সত্তার সকল অংশে তাহার সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠতা এবং একত্বের অন্তরঙ্গতাকে আমাদের পূর্ণতালাভের শর্ত ও বিধান করা যায় না অথবা তাহার নিকট হইতে এইরূপ দিব্য সাহায্য ও অভয়দান ও উদ্ধারসাধনের প্রতিজ্ঞাবাণী আশা করা যায় না। যিনি আমাদের সকল কর্মের অধিনেতা, আমাদের অন্তরাত্মার সুহৃদ ও প্রিয়, আমাদের জীবনের অন্তরস্থ অধ্যাত্ম সত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্বাসী ও ঊর্ধ্ববাসী অধীশ্বর কেবল তিনিই আমাদিগকে এই অন্তরঙ্গ ও মর্মস্পর্শী আশার বাণী শুনাইতে পারেন। অথচ সাত্ত্বিক কিংবা অন্যরূপে অহংভাবাপন্ন মনের মধ্যে যে মানুষ রহিয়াছে তাহার সহিত ইষ্টদেবতার যে-সম্বন্ধ লৌকিক ধর্মসকল স্থাপন করে ইহা সেই সাধারণ সম্বন্ধ হইতে বিভিন্ন বস্তু; ভগবানের কোন বিশেষ রূপ ও ভাবকে ইষ্টদেবতারূপে ঐ মনের দ্বারাই সৃষ্ট করা হয় অথবা তাহার সীমাবদ্ধ আদর্শ, অভীপ্সা বা বাসনাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়। সাধারণ মানস-ধর্মী মানবের যে ভগবদ্‌ভক্তি ইহাই হইতেছে তাহার সাধারণ অর্থ ও বাস্তব রূপ; কিন্তু এখানে রহিয়াছে একটি ব্যাপকতর জিনিস, তাহা মন এবং তাহার সীমা ও ধর্ম-সকলের অতীত। যে মন অর্পণ করে তাহা অপেক্ষা ইহা গভীরতর এবং যে ইষ্ট দেবতা এই সমর্পণ গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষাও ইহা মহত্তর।

এখানে আত্ম-সমর্পণ করে জীব, মানুষের মূল আত্মা, তাহার আদি, কেন্দ্রীয় ও অধ্যাত্ম সত্তা, ব্যষ্টি পুরুষ। খণ্ডতাসাধক ও অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত জীবই এই আত্মসমর্পণ করে, সে নিজেকে জানিতে পারে পৃথক ব্যক্তিসত্তা নহে পরন্তু ভগবানের সনাতন অংশ ও শক্তি ও অধ্যাত্ম বিবর্তন, অংশঃ সনাতনঃ, এইরূপ জীব অজ্ঞানের অপসারণের ফলে মুক্ত ও উন্নীত, তাহার যে নিজ সত্য ও পরম প্রকৃতি শাশ্বতের প্রকৃতির সহিত এক তাহারই জ্যোতি ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে এই কেন্দ্রীয় অধ্যাত্ম সত্তাই এইভাবে আমাদের জীবনের মূল ও আধার ও নিয়ন্তা আত্মা ও শক্তির সহিত আনন্দ ও মিলনের পূর্ণ ও নিবিড়ভাবে সত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। আর যিনি আমাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন তিনি কোন খণ্ড দেবতা নহেন, পরন্তু তিনি পুরুষোত্তম, এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ভগবান, যাহা কিছু আছে সে-সবের এবং সকল প্রকৃতির পরাৎপর আত্মা, জগতের আদি, বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা। আমাদের বিমুক্ত জ্ঞানের উপলব্ধির সম্মুখে তাঁহার প্রথম স্পষ্ট অধ্যাত্ম প্রকটন হইতেছে এক অক্ষর নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, ইহাই তাঁহার উপস্থিতির প্রথম লক্ষণ, তাঁহার সারসত্তার প্রথম স্পর্শ ও চিহ্ন। তাঁহার নিজ সত্তার দুর্জ্ঞেয় গুপ্ত রহস্য হইতেছে এক বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত অনন্ত ব্যক্তি বা পুরুষ, মনের সৃষ্ট রূপে তাঁহাকে

চিন্তা করা যায় না, অচিন্ত্য-রূপ, কিন্তু তিনি আমাদের চৈতন্যের শক্তিরাজি, ভাবাবেগ, সংকল্প ও জ্ঞানের নিকট অন্তরঙ্গ ও প্রত্যক্ষ হন যখন এই-গুলি নিজদিগকে অতিক্রম করিয়া, তাহাদের অন্ধ ও ক্ষুদ্র রূপ-সকলকে অতিক্রম করিয়া এক ভাস্বর অধ্যাত্ম, এক অপরিমেয় অতিমানস আনন্দ ও শক্তি ও দৃষ্টির মধ্যে উন্নীত হয়। যিনি অনির্বচনীয় কৈবল্যাত্মক সত্তা, অথচ সুহৃদ, ঈশ্বর, জ্ঞানদাতা, প্রেমিক, তিনিই এই পূর্ণতম ভক্তি ও উপাসনার, এই ঘনিষ্ঠতম আভ্যন্তরীণ বিবর্তন ও সমর্পণের পাত্র। এই মিলন, এই সম্বন্ধ,—ইহা খণ্ডতাসাধক মনের রূপ ও নিয়ম-সকলেব ঊর্ধ্বে উন্নীত বস্তু, এই সব নিম্নতন ধর্মের অতি উচ্চে; ইহা হইতেছে আমাদের আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার সত্য। অথচ, অথবা সেই জন্যই, যাহা কিছু মন এবং প্রাণের লক্ষ্যের বিষয়, যাহা কিছু তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং অপূর্ণ সার্থকতারূপে বহন করে, এই সত্য সে-সবের বিরোধী নহে, পরন্তু এইটিই হইতেছে তাহাদের সংসিদ্ধি, কারণ ইহা আমাদের আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার সত্য, যে-পরমাত্মা হইতে সব কিছু আসিয়াছে, যাঁহার দ্বারা এবং যাঁহার সম্ভূতি ও আভাসরূপে সব কিছু বর্তিয়া রহিয়াছে, কর্ম ও আয়াস করিতেছে তাঁহাব সহিত ইহার একত্বের সত্য। অতএব আমরা এখন যাহা কিছু হইয়াছি সে-সবের নির্বাণের দ্বারা নহে, বর্জন ও প্রত্যাখ্যানের দ্বারা নহে, পবন্তু অজ্ঞান ও অহংয়েরই নির্বাণের দ্বারা, বর্জন ও প্রত্যাখানের দ্বারা, এবং তাহারই পরিণাম স্ববূপ আমাদের জ্ঞান ও সংকল্প ও হৃদয়াকাঙ্ক্ষার অনির্বচনীয় সংসিদ্ধির দ্বারা আমাদের সবকিছু লইয়া ভগবানের মধ্যে, শাশ্বতের মধ্যে উন্নত ও সীমাহীন ভাবে বাস করিয়া, নিবসিষ্যসি ময্যেব, এক মহত্তর আভ্যন্তরীণ স্থিতিতে আমাদের সকল চৈতন্যের রূপান্তর ও প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই পরম সিদ্ধি এবং আত্মার মধ্যে এই বিমুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিম্নতন প্রকৃতিতে অহংয়ের যে অজ্ঞান জীবন এবং বিমুক্ত জীবের তাহার নিজ সত্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে যে উদার ও জ্যোতির্ময় জীবন, এতদুভয়ের মধ্যে নিরতিশয় পার্থক্যটিকে ধরিয়াই হইতেছে অধ্যাত্ম সমস্যাটির নিগূঢ়তা এবং ইহার জন্যই এই রূপান্তরের প্রকৃত স্বরূপটি সাধারণ মানবমনের পক্ষে ধারণা করা এত কঠিন হয়। প্রথমটির পরিবর্জন সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ চূড়ান্ত হওয়া চাই। এই পার্থক্যটির উপরেই গীতা এখানে যতদূর সম্ভব জোর দিয়াছে। একদিকে রহিয়াছে চৈতন্যের এই ক্ষুদ্র ত্রস্ত দাম্ভিক অহমিকা, অহঙ্কৃত ভাব, এই ক্ষুদ্র নিঃসহায় ভেদাত্মক ব্যক্তি-সত্তার পঙ্গুকর সঙ্কীর্ণতা, ইহারই দৃষ্টি লইয়া আমরা সাধারণত চিন্তা করি, কর্ম করি, অনুভব করি, জীবনের স্পর্শসমূহে সাড়া দিই। আর অপর দিকে রহিয়াছে মৃত্যুহীন পূর্ণতা, আনন্দ ও জ্ঞানের বিশাল অধ্যাত্ম

ভূমি, সেখানে আমরা প্রবেশলাভ করিতে পাই ভগবানের সহিত মিলনের ভিতর দিয়া, তখন আমরা হই শাশ্বত জ্যোতির মধ্যে তাঁহারই প্রকটন ও অভিব্যক্তি, তখন আর আমরা অহং-প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নহি। গীতায় সততম্ মচ্চিত্তঃ বলিতে এই মিলনের সম্পূর্ণতাই বুঝান হইয়াছে। অহংয়ের জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতেছে মন প্রাণ দেহ লইয়া গঠিত বাহ্য সত্যের উপর, প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত আত্মার ব্যবহারিক সম্বন্ধসমূহের গ্রন্থির উপর, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ "আমি" বিশ্বের বিরাট কর্মধারার মধ্যে তাহার সংকীর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার ধারণা ও বাসনা-সকলকে রক্ষা করিবার জন্য, তৃপ্ত করিবার জন্য বস্তুসকলের যে বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত অর্থ করে তাহারই উপর। আমাদের সকল ধর্মরাজি, যে-সব সাধারণ প্রতি-মানের দ্বারা আমরা বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি এবং আমাদের জ্ঞান এবং আমাদের কর্ম নির্ধারণ করি, সে-সবই চলে এই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভিত্তির উপর, আর তাহাদের অনুসরণে আমাদের অহংকে কেন্দ্র করিয়া আমরা যত বিস্তৃত ভাবেই ঘুরি না কেন, আমরা কিছুতেই এই ক্ষুদ্র গন্ডীর বাহিরে যাইতে পারি না। এই গন্ডীর মধ্যেই জীবাত্মা হইতেছে চিরকাল প্রকৃতির মিশ্র প্রেরণাসমূহের অধীন, সে সন্তুষ্টভাবে বন্দী হইয়া থাকে অথবা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে।

কারণ এই চক্রে পুরুষ নিজকে আবৃত রাখে, নিজের দিব্য ও অমৃত সত্তাকে অজ্ঞানে আবৃত রাখে, এক নির্বন্ধপরা সীমাবদ্ধকরণী প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়। সেই নিয়ম হইতেছে গুণত্রয়ের দুর্লঙ্ঘ্য নীতি। ইহা হইতেছে ত্রিধা সোপান, দিব্য জ্যোতির দিকে উঠিতে অক্ষম প্রয়াস করে কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে পারে না। ইহার ভিত্তিতে রহিয়াছে জড়ত্বের নিয়ম বা ধর্ম; তামসিক মানব আচারমূলক গতানুগতিক ক্রিয়ায় তাহার জড় প্রকৃতির এবং তাহার আংশিক মানস-ধর্মী প্রাণিক ও ঐন্দ্রিয় প্রকৃতির ইঙ্গিত ও প্রেরণা-সকল এবং প্রবৃত্তি-চক্র জড়ের মত অনুসরণ করে। মধ্য-স্থলে গতির ধর্ম আসিয়া কাজ করে; রাজসিক মানব হইতেছে প্রাণগত, বেগময়, সক্রিয়—সে নিজেকে তাহার জগৎ ও পরিবেষ্টনীর উপর চাপাইয়া দিতে প্রয়াস করে, পরন্তু কেবল তাহার দুরন্ত রিপু, বাসনা এবং অহমিকা-সকলের পীড়াদায়ক ভার এবং দুঃসহ প্রভুত্ব বাড়াইয়া তোলে, তাহার অস্থির স্বৈর ইচ্ছার বোঝা, তাহার রাজসিক প্রবৃতির প্রভুত্ব বাড়াইয়া তোলে। ঊর্ধ্বস্তরে সুসমঞ্জস নিয়ন্ত্রণের ধর্ম জীবনের উপর চাপ দেয়; সাত্ত্বিক মানব তাহার যুক্তিমূলক জ্ঞান, উদার হিতকারিতা বা গতানুগতিক পুণ্যের আদর্শ-সকল স্থাপন করিতে ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহার ধর্মশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, মনের দ্বারা সৃষ্ট বিধিবিধান, চিন্তা ও আচরণের বাঁধাধরা পথ অনুসরণ

করিতে চেষ্টা করে—জীবনের সমগ্র অর্থের সহিত এ-সবের মিল হয় না, সেজন্য বৃহত্তর বিশ্ব উদ্দেশ্যের গতি-ধারায় তাহারা পুনঃ-পুনঃ ভাঙিয়া পড়ে। গুণত্রয়ের পরিধির মধ্যে সাত্ত্বিক মানবের ধর্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠতম; কিন্তু উহাও হইতেছে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টি, একটা খর্বিত আদর্শ। ইহার অপূর্ণ ইঙ্গিতগুলি কেবল একটা ক্ষুদ্র ও আপেক্ষিক পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইতে পারে; উদারভাবাপন্ন ব্যক্তিগত অহং সাময়িক ভাবে ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা আত্মার সমগ্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রকৃতিরও সমগ্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

আর প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে বাস্তব জীবন তাহা কখনও এই জিনিস-গুলির কেবল কোন একটিই নহে, তাহা প্রকৃতির প্রথম স্থূল নিয়মের যন্ত্রবৎ গতানুগতিক অনুসরণ নহে, অথবা কর্মিষ্ঠ সত্তার দ্বন্দ্বময় প্রয়াসও নহে অথবা সচেতন জ্যোতি, বুদ্ধি, শুভ ও জ্ঞানের বিজয়ী অভ্যুদয়ও নহে। সেখানে রহিয়াছে এই সব ধর্মগুলিরই একটা মিশ্রণ, ইহার মধ্য হইতে আমাদের সংকল্প ও বুদ্ধি অল্পাধিক যথেচ্ছভাবেই একটা আদর্শ রচনা করিয়া সেইটিকে কার্যত সিদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির অন্যান্য অনিবার্য জিনিস-সকলের সহিত একটা আপোষ না করিলে তাহা বস্তুত কখন সিদ্ধ হয় না। আমাদের জ্ঞানদীপ্ত সংকল্প ও বুদ্ধির যে-সব সাত্ত্বিক আদর্শ সে-গুলি হয়ত নিজেরাই অসম্পূর্ণ, বড় জোর ক্রমশ সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, অনবরত তাহাদের ত্রুটি বাহির হয়, তাহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া চলিতে হয়, নতুবা যদিই তাহারা স্বরূপত পূর্ণ হয়, সেগুলিকে কেবল অনধিগম্য আদর্শরূপেই অনুসরণ করা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত তাহারা অবহেলিত হয় অথবা কেবলমাত্র আংশিক প্রভাব বিস্তার করিতেই কৃতকার্য হয়। আর কখনো-কখনো আমরা যে মনে করি আমরা সে-সব সম্পূর্ণভাবেই অধিগত করিয়াছি, তাহার কারণ আমরা আমাদের মধ্যে অন্যান্য শক্তি ও প্রেরণাসকলের অবচেতন ও অর্ধচেতন মিশ্রণকে দেখি না, আমাদের কার্যের পশ্চাতে এইগুলি হইতেছে আদর্শেরই সমান বাস্তব শক্তি, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। সেই আত্ম-অজ্ঞান হইতেই আইসে মানবীয় বুদ্ধি ও পুণ্যাভিমানের ব্যর্থতা; মানুষের সাধুতার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবেশের পশ্চাতে থাকে এই প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ আবরণ এবং ইহার দ্বারাই জ্ঞান ও সুকৃতির ভ্রান্ত অহমিকা সম্ভব হয়। মানুষের যে সর্বোত্তম জ্ঞান তাহাও অর্ধজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর মানুষের যে উচ্চতম সুকৃতি তাহাও হয় একটি মিশ্রিত জিনিস, এমন কি আদর্শ হিসাবে যখন তাহাতে কোন ত্রুটিই রাখা হয় না তখনও কার্যত ব্যবহারে তাহা হয় খুবই আপেক্ষিক ও অপূর্ণ। জীবনের সাধারণ নীতি হিসাবে চরম সাত্ত্বিক আদর্শসকল কার্যত ব্যবহারে অনুসৃত হইতে পারে

না, ব্যক্তিগত অভীপ্সা ও আচরণের সংস্কার ও উন্নতির জন্য তাহারা অপরিহার্য হইলেও তাহাদের প্রতি নিষ্ঠা জীবনকে কেবল কতকটা পরিবর্তিত করিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিতে পারে না, আর তাহাদের পূর্ণতম সিদ্ধি কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নরূপেই থাকিয়া যায় অথবা তাহার কল্পনা করা যায় এমন এক স্বর্গীয় প্রকৃতির জগতে যাহা আমাদের এই পার্থিব প্রকৃতির মিশ্রিত ধাবা হইতে মুক্ত। আর এইরূপ না হইয়াই পারে না কারণ, কি এই জগতেব প্রকৃতি আর কি মানুষের প্রকৃতি কিছুই বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাদানে এক অখণ্ড সত্তা রূপে গঠিত নহে, হইতেও পারে না।

আমাদের সম্ভাবনা-সকলের এই প্রতিবন্ধক হইতে, ধর্ম-সকলের এই বিশৃঙ্খল মিশ্রণ হইতে মুক্তি পাইবার প্রথম পথ আমরা দেখিতে পাই নির্ব্যক্তিকতার দিকে একটা সমুচ্চ প্রবৃত্তিরূপে, যে একটি উদার, বিশ্বগত শান্ত, মুক্ত, সত্য ও শুদ্ধ সত্তা এখন অহংয়ের সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার দিকে অন্তর্মুখী গতিরূপে। সমস্যা হইতেছে এইটিই যে, যদিও আমরা আমাদের সত্তার স্থিরতা ও নৈঃশব্দ্যের মুহূর্তে এই নির্ব্যক্তিকতাব মুক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, তথাপি নির্ব্যক্তিক সক্রিয়তা আদৌ সহজে আয়ত্ত করা যায় না। নির্ব্যক্তিক সত্যের অনুসরণ বা আমাদের কর্মে নির্ব্যক্তিক সংকল্পের অনুসরণ ততক্ষণ খাঁটি হয় না যতক্ষণ আমরা আদৌ সাধারণ মনের মধ্যে বাস করি এবং সেই মনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য—আমাদের ব্যক্তিকতার নীতি, আমাদের প্রাণিক প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রেরণা, অহংয়ের রং, এই সমুদয়ের অধীন থাকি। নির্ব্যক্তিক সত্যের অনুসরণ ঐ সকল প্রভাবের দ্বারা একটা ছলনায় পরিণত হয়, তাহার অন্তরালে আমরা আমাদের বুদ্ধির প্রিয় ধারণাগুলিকেই পোষণ করি, আমাদের মনের সঙ্কীর্ণ নির্বন্ধপরতা দ্বারা সে-সব সমর্থিত হয়; নিঃস্বার্থ নির্ব্যক্তিক কর্ম অনুসরণের সমুচ্চ দোহাই দিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বার্থপর নির্বাচন ও অন্ধ খেয়ালসকলই সমর্থন করি। অন্যপক্ষে পূর্ণতম নির্ব্যক্তিকতা পূর্ণতম নিষ্ক্রিয়তাকেই অবশ্যম্ভাবী করে বলিয়া মনে হয়, এবং ইহার অর্থ হয় এই যে, সকল কর্মই হইতেছে অহং এবং গুণত্রয়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই চক্র হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র পন্থা হইতেছে জীবন ও তাহার কর্ম হইতে সরিয়া যাওয়া। কিন্তু এই নির্ব্যক্তিক নীরবতাই এ-বিষয়ে জ্ঞানের চরম কথা নহে, কারণ আমাদের সাধনার অধিগম্য আত্ম-সিদ্ধির এইটিই একমাত্র পথ ও চূড়া নহে অথবা সব পথ এবং শেষ চূড়া নহে। ইহা অপেক্ষা মহত্তর, পূর্ণতর এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতি আছে, তাহাতে আমাদের অহংভাবাত্মক ব্যক্তিত্বের গণ্ডী এবং মনের অপূর্ণতা-সকলের চক্র মহত্তম আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তার বাধাহীন আনন্ত্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথচ জীবন

ও কর্ম যে তখনও গ্রহণীয় ও সম্ভাব্য থাকে শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাহাদের প্রশস্ততম অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতায় উপনীত ও প্রসারিত হয় এবং এক সুমহান ঊর্ধ্বমুখী সার্থকতা লাভ করে।

পূর্ণতম নির্ব্যক্তিকতা এবং আমাদের প্রকৃতির ক্রিয়াত্মক সম্ভাবনাসমূহ—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য স্তরে-স্তরে সাধিত হইয়াছে। চিন্তায় ও ব্যবহারে মহাযান এই দুরূহ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস এইভাবে করিয়াছে,—একদিকে গভীর নিষ্কামতা এবং মানসিক ও প্রাণিক আসক্তি ও সংস্কারসমূহ হইতে উদার বিলয়কারী মুক্তি এবং অন্য দিকে জগৎ ও তাহাব জীবনসমূহেব প্রতি বিশ্বজনীন হিতকারিতা এবং অতলস্পর্শ করুণা, ইহা যেন জীবন ও কর্মের উপর সমুচ্চ নির্বাণের উচ্ছ্বসিত পরিপ্লাবন। ঐরূপ সামঞ্জস্য-সাধন আরও একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিগূঢ় অর্থ ছিল, তাহা বিশ্বলীলার সার্থকতা সম্বন্ধে অধিকতর সজ্ঞান ছিল, তাহা অধিকতর গভীর, প্রেরণাময়, কর্মে বহুমুখী ও ব্যাপক ছিল, গীতার চিন্তাধারার আরও এক পদ নিকটবর্তী ছিল। এই উপলব্ধিব পরিচয় আমরা তাওপন্থী (Taoist) মনীষীগণের বাক্যে পাই, অন্তত তাহাদের বাক্যের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। সেখানে দেখা যায়—এক নির্ব্যক্তিক অনির্বচনীয় শাশ্বত, তাহা আত্মা এবং সেই সঙ্গে তাহাই বিশ্বের প্রাণ; তাহা নিরপেক্ষভাবে সকল জিনিসকে ধরিয়া রহিয়াছে, সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সমম্ ব্রহ্ম; তাহা অদ্বিতীয় এক, তাহা অসৎ, কারণ আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি তাহা সে-সমুদয় হইতে ভিন্ন অথচ তাহা হইতেছে এই সর্বভূতের সমষ্টি। এই অনন্তের উপর ফেনের ন্যায় সৃষ্ট হইয়াছে যে অন্ধ ব্যক্তিত্ব, যে পরিবর্তনশীল অহং তাহা হইতেছে তাহার আসক্তি ও বিতৃষ্ণা, তাহার রাগ ও দ্বেষ, তাহার বদ্ধমূল মানসিক ভেদজ্ঞান-সমূহকে লইয়া একটি শক্তিশালী রূপায়ণ—ইহা আমাদের নিকট একমাত্র সত্য বস্তুটিকে আবৃত করিয়া রাখে, বিকৃত করিয়া দেখায়, সেই সত্য বস্তু হইতেছে "তাও" (Tao), তাহা পরম সর্ব এবং পরম শূন্য। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় কেবল অনধিগম্য বিশ্বব্যাপী ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং ইহার ক্ষুদ্র রূপায়ণগুলিকে বিলীন করিয়া এবং একবার এইটি সিদ্ধ হইলে আমরা তাহার মধ্যে সত্য জীবন যাপন করি এবং অন্য এক মহত্তর চৈতন্য লাভ করি, তাহা আমাদিগকে সর্বভূতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করায়, আমাদিগকে সকল শাশ্বত প্রভাবের দিকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। গীতার ন্যায় এখানেও মনে হয় যে, উচ্চতম পন্থা হইতেছে শাশ্বতের নিকট সম্পূর্ণ উন্মুক্ততা ও আত্মসমর্পণ। তাও-পন্থী মনীষী বলেন, তোমার শরীর নিজের নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বিগ্রহ; তোমার প্রাণ তোমার নিজের নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত সুসঙ্গতি, তোমার ব্যক্তিত্ব

তোমার নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বৈচিত্র্য। আর এই শিক্ষাতেও এক বিরাট সংসিদ্ধি ও মুক্ত কর্ম হইতেছে জীবের আত্ম-সমর্পণের ওজস্বান পরিণতি। অহংময় ব্যক্তিত্বের কর্ম হইতেছে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপরীত দিকে বিচ্ছেদের অভিযান। এই মিথ্যার খেলাকে বন্ধ করিয়া ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বিশ্বগত ও শাশ্বত শক্তির অধীনে জ্ঞানময় ও শান্ত নিশ্চেষ্টতা—এমন নিশ্চেষ্টতা যাহা আমাদিগকে অনন্ত কর্মধারার সহিত মিলনক্ষম করিবে, ইহার সত্যের সহিত সুসংগত করিবে, ভগবানের সংগঠনী ক্রিয়ার নিকট নমনীয় করিয়া দিবে। এই সুসঙ্গতি যে-মানুষের আছে, তিনি ভিতরে নিশ্চল এবং নৈঃশব্দ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা সকল ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকট হইবে, তাঁহার মধ্যে ভাগবত প্রভাব কার্য করিবে, এবং তিনি স্থিরতা ও আভ্যন্তরীণ নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে বাস করিয়াও অদম্য শক্তিতে কর্ম করিবেন এবং লক্ষ-লক্ষ বস্তু ও জীব তাঁহার প্রভাবের অধীনে চালিত হইবে, সম্মিলিত হইবে। আত্মার নির্ব্যক্তিক শক্তি তাঁহার সকল কর্মের ভার গ্রহণ করিবে (সে-সব আর তখন অহংয়ের বিকৃত ক্রিয়া থাকিবে না) এবং তাঁহার ভিতর দিয়া অপ্রতিহতভাবে কার্য করিবে জগত ও তাহার লোক-সকলকে সংহত রাখিবার জন্য, নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, লোক সংগ্রহার্থায়।

গীতা যে প্রথম নির্ব্যক্তিক কর্মের শিক্ষা দিয়াছে তাহার সহিত এই সকল অনুভূতির প্রভেদ খুবই কম। গীতাও আমাদিগকে বলে, আসক্তি ও অহং ত্যাগ করিতে হইবে, নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব ও তাহার ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিকে ভাঙিয়া দিতে হইবে। গীতাও আমাদিগকে বলে, আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতে হইবে, সকলের মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মকে এবং আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সকলকে দেখিতে হইবে এবং সকলকেই আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া দেখিতে হইবে। তাওপন্থী মনীষীর ন্যায়ই গীতা আমাদিগকে বলে আত্মার মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে, শাশ্বতের মধ্যে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও তাহার কর্মসমূহ সন্ন্যাস করিতে হইবে, আত্মনি সন্নস্য ব্রহ্মণি। আর এইরূপ মিল রহিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে এই যে, গতিময়, ক্রিয়াময় জীবনের সহিত অবিরোধী শান্তিময় আভ্যন্তরীণ উদারতা ও নীরবতার এইটিই হইতেছে মানুষের পক্ষে যথা-সম্ভব উচ্চতম ও মুক্ততম উপলব্ধি,—এক অব্যয় শক্তি ও অদ্বিতীয় শাশ্বত সত্তার নির্ব্যক্তিক অনন্ত সত্য ও অপরিমেয় কর্মের মধ্যে দুইটিই যুগপৎ অবস্থিত অথবা একত্র মিশ্রিত। কিন্তু গীতা ইহার সহিত এমন আর একটি অতীব অর্থপূর্ণ কথা যোগ করিয়া দিয়াছে যাহাতে সবই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে,—আত্মনি অথো ময়ি। গীতা চায়, সকল জিনিসকে আত্মার মধ্যে,

তাহার পর "আমার" মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে হইবে, সকল কর্ম আত্মার মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে এবং সেখান হইতে পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে। এখানে রহিয়াছে অধ্যাত্ম অনুভূতির আরও মহত্তর ও গভীরতর পূর্ণতা, মানব-জীবনের অর্থের এক বৃহত্তর রূপান্তর, সমুদ্রের মধ্যে স্রোতস্বতীর প্রত্যাবর্তনের ন্যায় এক রহস্যময় ও প্রগাঢ় আবেগ, অনাদি শাশ্বত কর্মীর নিকট সকল ব্যক্তিগত কর্ম ও বিশ্ব-কর্মের প্রত্যর্পণ। স্তব্ধ নির্ব্যক্তিকতার উপরেই জোর দিলে আমাদের পক্ষে এই সংকট ও ত্রুটি হয় যে, ইহা অন্তর্পুরুষটিকে, অধ্যাত্ম ব্যক্তিটিকে, আমাদের আশ্চর্যরূপে চিরস্থায়ী অন্তরতম সত্তাটিকে অনন্তের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী, ভ্রান্তিময় এবং পরিবর্তনশীল রূপে পরিণত করে। একমাত্র অনন্তই রহিয়াছে, আর সাময়িক একটা খেলা ব্যতীত জীবের অন্তরাত্মার অন্য কোন মূল্যই তাহার নিকটে নাই। মানুষের অন্তরাত্মার সহিত শাশ্বতের কোন সত্য ও স্থায়ী সম্বন্ধ হইতে পারে না, যদি সেই আত্মা পুনঃ-পুনঃ পরিবর্তনশীল দেহেরই ন্যায় অনন্তের মধ্যে কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারমাত্র হয়।

ইহা সত্য যে অহং এবং তাহার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব হইতেছে প্রকৃতির এইরূপই একটি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল রূপ এবং সেইজন্য ইহাকে ভাঙিয়া ফেলিতেই হইবে এবং আমাদিগকে সকলের সহিত এবং অনন্তের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিতেই হইবে। কিন্তু অহংই প্রকৃত ব্যক্তি নহে; যখন ইহা লয়প্রাপ্ত হইবে তখনও অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকিবে, তখনও সনাতন জীবটি থাকিবে। অহংয়ের সীমাবন্ধন লুপ্ত হইবে এবং জীবাত্মা অদ্বিতীয় একের সহিত গভীর ঐক্যে বাস করিবে এবং সর্বভূতের সহিত তাহার বিশ্বগত ঐক্য উপলব্ধি করিবে। অথচ এই বিস্তারতা ও ঐক্য যে উপভোগ করিবে সে হইতেছে আমাদের নিজেদেরই অন্তর্পুরুষ। যদিও বিশ্ব কর্মধারা সকলের মধ্যে একই শক্তির ক্রিয়া বলিয়া অনুভূত হয়, উহা ঈশ্বরেরই প্রবর্তন ও গতি বলিয়া উপলব্ধি হয়, তথাপি উহা বিভিন্ন মানবাত্মায় (অংশঃ সনাতনঃ) বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, তাহাদের প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে। অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যোতি, বিচিত্র বিশ্ব-শক্তি, সত্তার শাশ্বত আনন্দ আমাদের মধ্যে এবং চতুর্দিকে প্রবাহিত হইয়া আইসে, অন্তরাত্মায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং প্রত্যেকের মধ্য হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতে ছড়াইয়া পড়ে, যেন প্রত্যেকেই জীবন্ত অধ্যাত্মচৈতন্যের কেন্দ্র—তাহার পরিধি অনন্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকে দিব্য জীবনের একটি ক্ষুদ্র জগৎ স্বরূপ, তাহা একই সঙ্গে স্বতন্ত্র অথচ ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির যে সমগ্র অনন্ত জগতের ক্ষুদ্র অংশ আমরা আমাদের চতুর্দিকে

দেখিতে পাই তাহা হইতেও অচ্ছেদ্য। বিশ্বাতীত সত্তার একটি অংশ সে, সে সৃজনশীল, সে নিজেই নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সৃষ্টি করে অথচ এই যে বিশ্ব-চৈতন্যের মধ্যে অন্য সকলেই রহিয়াছে সে চেতনাও তাহার থাকে। আপত্তি করা যাইতে পারে যে, ইহা একটা ভ্রান্তি মাত্র, যখন আমরা বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্তায় ফিরিয়া যাইব তখন ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবেই; কিন্তু এ-বিষয়েও যে বেশী নিশ্চিত নিশ্চয়তা আছে তাহা নহে। কারণ তখনও মানুষের অন্তরাত্মাই সেই মুক্তি উপভোগ করে, যে-অন্তরাত্মা ভাগবত কর্ম-ও অভিব্যক্তির জীবন্ত কেন্দ্র ছিল সে-ই ঐ মুক্তির ভোক্তা হয়। উহা শুধুই এরূপ নহে যে ব্যক্তিত্ব-রূপ একটা মিথ্যা আকার অনন্তের মধ্যে আপনি ভাঙিগয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—উহা আরও কিছু বেশী। আমাদের জীবনের এই রহস্যের অর্থ হইতেছে এই যে, আমরা যাহা হইয়াছি তাহা একমেবা-দ্বিতীয়ং সত্তার কেবল একটা ক্ষণিক নামরূপ মাত্র নহে, পরন্তু বলিতে পারা যায় যে, আমরা ভাগবত অদ্বৈত সত্তারই এক একটি বিশিষ্ট সত্তা ও চেতনা। অহং হইতেছে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের অধ্যাত্ম ব্যষ্টিসত্তার ভ্রান্তি-জনক ছায়া ও প্রতিরূপ, কিন্তু সেই ব্যষ্টিসত্তা হইতেছে এমন একটি সত্য অথবা তাহার মধ্যে এমন একটি সত্য রহিয়াছে যাহা অজ্ঞানের ঊর্ধ্বেও বর্তমান থাকে; আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষোত্তমের পরম প্রকৃতির মধ্যে চিরকাল বাস করে, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতার শিক্ষার গভীর ব্যাপকতা এইখানেই যে, ইহা যেমন একদিকে বিশ্বভাবাপন্ন নির্ব্যক্তিকতার সত্য স্বীকার করে—অহংএর নির্বাণ করিয়া আমরা ইহার মধ্যেই প্রবেশ করি, ব্রহ্ম-নির্বাণ, বস্তুত ইহা ভিন্ন মুক্তি নাই, অন্তত পূর্ণতম মুক্তি নাই—তেমনিই অন্য দিকে ইহা উচ্চতম উপলব্ধির অঙ্গরূপে আমাদের ব্যক্তিত্বের স্থায়ী অধ্যাত্ম সত্যকেও স্বীকার করে। এই প্রাকৃত সত্তাটি নহে পরন্তু আমাদের মধ্যে সেই ভাগবত কেন্দ্রীয় সত্তাটিই হইতেছে সনাতন জীব। ঈশ্বর, বাসুদেব, যিনি সব—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, তিনিই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ স্বীকার করেন নীচের প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য; যে পরমা প্রকৃতি হইতেছে পরম পুরুষের আদ্যা অধ্যাত্ম প্রকৃতি তাহাই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহার মধ্যে জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে জীব হইতেছে পুরুষোত্তমের আদ্য ভাগবত অধ্যাত্ম সত্তারই অংশ, জীবন্ত শাশ্বতের একটি জীবন্ত শক্তি। সে নিম্নতন প্রকৃতির কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী রূপ নহে পরন্তু পরমতমের পরমা প্রকৃতিরই শাশ্বত অংশ, ভাগবত সত্তার একটি শাশ্বত চৈতন্যময় রশ্মি, এবং সেই পরম প্রকৃতির ন্যায়ই তুল্যরূপে চিরস্থায়ী। তাহা হইলে আমাদের বিমুক্ত চৈতন্যের উচ্চতম সিদ্ধি ও স্থিতির একটা দিক অবশ্যই হইবে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে জীবের সত্য

স্থানটি গ্রহণ করা, সেখানে পরম পুরুষের মহিমার মধ্যে বাস করা এবং সেখানে শাশ্বত অধ্যাত্ম ঐক্যের আনন্দ লাভ করা।

আমাদের সত্তার এই যে রহস্য ইহার মূলে রহিয়াছে পুরুষোত্তমের সত্তার এইরূপই এক পরম রহস্য উত্তমম্ রহস্যম্। পরব্রহ্মের শুদ্ধ নির্ব্যক্তিকতাই উচ্চতম নিগূঢ় তত্ত্ব নহে। উচ্চতম তত্ত্ব হইতেছে এই অত্যাশ্চর্য রহস্য যে, পরম পুরুষ এবং প্রতীয়মান বিরাট নির্ব্যক্তিক সত্তা—এই দুইই এক, সর্বভূতের এক অক্ষর বিশ্বাতীত আত্মা এবং সেই পুরুষ যিনি এখানে বিশ্বের মূলেই নিজেকে অনন্ত ও বহুল ব্যক্তিরূপে প্রকট করিতেছেন, সর্বত্র কর্ম করিতেছেন—আত্মা ও পুরুষ আমাদের চবমতম, অন্তরতম, গভীরতম অনুভূতিতে একই অপরিমেয় সত্তারূপে প্রতিভাত, তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, নিজের সান্নিধ্যে লইতেছেন, নিরাকারের শূন্য গর্ভে নহে, পরন্তু তাঁহার ও আমাদের সচেতন জীবনের সকল ধারায় আমাদিগকে প্রত্যক্ষতমভাবে, গভীরতমভাবে, অত্যাশ্চর্যভাবে তাঁহার নিজের সমগ্রতার মধ্যে লইতেছেন। এই উচ্চতম অনুভূতি এবং দেখিবার এই উদারতম ধারা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের, আমাদের জ্ঞানের, সংকল্পেব, হৃদ্‌গত প্রেম ও ভক্তির গভীব, মর্মস্পর্শী, সীমাহীন সার্থকতা প্রকট করিয়া দেয়—কিন্তু যদি আমরা নির্ব্যক্তিকের উপরেই সম্পূর্ণ ঝোঁক দিই তাহা হইলে এই সার্থকতা লুপ্ত হয় অথবা তাহা হ্রাস পায়, কারণ ঐ ঝোঁক যে-সব বৃত্তি ও শক্তি হইতেছে আমাদের গভীরতম প্রকৃতির অংশ, যে-সব আবেগ ও দীপ্তি হইতেছে আমাদের আত্ম-অনুভূতির নিবিড়তম, মুখ্যতম তন্ত্রীসকলের সহিত জড়িত সে-সবকে অবদমিত বা ক্ষীণ করিয়া দেয় অথবা তাহাদের প্রগাঢ়তম বিকাশ হইতে দেয় না। শুধু জ্ঞানের কঠোরতা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত ও সমুন্নত হৃদ্‌গত প্রেম ও অভীপ্সারও স্থান আছে, অসীম স্থান আছে—সে জ্ঞান আরও নিগূঢ়ভাবে স্বচ্ছ, আরও প্রশান্ত আবেগে পূর্ণ। আমাদের হৃদয়-চৈতন্য, মানস-চৈতন্য, সকল চৈতন্যের নিরন্তর সম্মিলিত অন্তরঙ্গতার দ্বারাই, সততং মচ্চিত্তঃ, আমরা শাশ্বত পুরুষের সহিত আমাদের একত্বের উদারতম, গভীরতম, পূর্ণতম উপলব্ধি লাভ করি। সকল সত্তায় ঘনিষ্ঠতম একত্ব, বিশ্বভাবের মধ্যে এমন কি বিশ্বাতীতভাবের শিখরেও তাহা দিব্য প্রেমাবেগে গভীরভাবে ব্যক্তিগত, মানবাত্মাকে এখানে সমুচ্চতমে পৌঁছিবার এই পথই দেখান হইয়াছে; অধ্যাত্ম সত্তারূপে যে সিদ্ধি ও দিব্য চৈতন্য লাভ তাহার প্রকৃতির নির্দেশ, এই পথেই সে তাহার অধিকারী হইবে। বুদ্ধি ও সংকল্প সমগ্র সত্তাকে সমগ্র সত্তার যিনি ভাগবত আত্মা ও ঈশ্বর তাঁহার অভিমুখ করিয়া দিবে, বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য। হৃদয় আর সব-আবেগকেই তাঁহার সহিত ঐক্যের আনন্দে

পরিণত করিবে, সর্বভূতে অবস্থিত তাঁহার প্রতি প্রেমে পরিণত করিবে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন ইন্দ্রিয় সর্বত্র তাঁহাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, অনুভব করিবে। জীবন হইবে জীবের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই জীবন। সংকল্পে, জ্ঞানে, কর্মেন্দ্রিয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, প্রাণে, শরীরে সকল ক্রিয়াই উৎসারিত হইবে একমাত্র তাঁহারই শক্তি হইতে, একমাত্র তাঁহারই প্রবর্তনা হইতে। এই পন্থা গভীরভাবেই নির্ব্যক্তিক কারণ বিশ্বভাবাপন্ন এবং বিশ্বাতীত সত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার পক্ষে অহংয়ের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া যায়। অথচ ইহা হইতেছে নিবিড়ভাবেই ব্যক্তিগত কারণ ইহা সালোক্য ও একাত্মতার পরমতম আবেগ ও শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়। মনের যুক্তি অনুসারে নির্বিশেষ লয়ই আত্ম-নির্বাণের একমাত্র যথাসংগত পরিণতি হইতে পারে, কিন্তু উহাই উত্তম রহস্যের চরম কথা নহে।

অর্জুন যে ভগবৎ-নিয়োজিত কর্মে উদ্‌যোগী হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেটি আসিয়াছিল তাঁহার অহংভাব হইতে, অহঙ্কারং আশ্রিত্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক অহংয়ের ধারণা ও প্রেরণা সকল, পাপ ও তাহার ব্যক্তিগত ফলভোগে প্রাণ-প্রকৃতির ভীতি, ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখের প্রতি হৃদয়ের বিমুখতা, অহংমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পুণ্য ও ন্যায়ের দোহাই দিয়া সমর্থন করিতে মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির আত্মপ্রবঞ্চনাময় চেষ্টা, ভগবানের কর্মধারাসমূহ মানুষের ধারা হইতে বিভিন্ন মনে হয় বলিয়া এবং উহারা তাহার স্নায়ুমণ্ডলী, তাহার হৃদয়, তাহার বুদ্ধির উপর ভীষণ ও অপ্রীতিকর জিনিসসকলের দুর্বহ ভার আনিয়া দেয় বলিয়া সে-সবের প্রতি আমাদের প্রকৃতির বিরাগ—এই সকলের মিশ্রণ, বিশৃঙ্খলা ও জটিল ভ্রান্তি অর্জুনের ঐ অহঙ্কারের পিছনে ছিল। এখন অর্জুনের নিকট এক উচ্চতর সত্য, কর্মের এক মহত্তর ধারা প্রকট করা হইল, এখনও যদি সে তাহার অহংভাবকেই ধরিয়া থাকে, যুদ্ধ না করিবার বৃথা ও অসম্ভব সংকল্পেই রত থাকে—তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক পরিণাম পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক অশুভ হইবে। কারণ এই সংকল্প বৃথা, এই বৈরাগ্য নিষ্ফল, যেহেতু এইটির উদ্ভব হইয়াছে সাময়িক শক্তিহীনতা হইতে, ইহা তাহার অন্তরতম চরিত্রের বীরত্ব হইতে প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিচ্যুতি, ইহা তাহার প্রকৃতির সত্য সংকল্প ও ধারা নহে। এখন যদি সে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তথাপি সেই প্রকৃতির দ্বারাই সে আবার অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে যখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার অভাবেও যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহার বিরতির ফলে তাহার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরাজয় ঘটিতেছে, যে ব্রত সাধন করিতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে প্রধান কর্মীর অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহা দুর্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, অহংমন্য অধর্ম ও অন্যায়ের সমর্থকগণের বিদ্বেষ-

পূর্ণ ও কুণ্ঠাহীন শক্তি দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেছে। আব এইভাবে ফিরিলে তাহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্যই থাকিবে না। অহংকৃত মনেব ধাবণা ও অনুভবসমূহের বিশৃঙ্খলাই তাহাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়াছিল; প্রকৃতি ঐ অহংকৃত মনেরই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা ও অনুভবগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে তাহার যুদ্ধে অসম্মতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু যে-ভাবেই হউক না কেন, অবিরত এইরূপ অহংয়ের বশে থাকার অর্থ হইবে আরও খারাপ, আরও সাংঘাতিক অধ্যাত্ম প্রত্যাখ্যান, বিনষ্টি; কারণ তিনি তাঁহার নীচির প্রকৃতির অজ্ঞানে এতদিন তাঁহাব সত্তার যে সত্য অনুসরণ করিয়াছেন এখন তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর সত্য হইতে নিশ্চিত স্খলন হইবে। তাঁহাকে এক উচ্চতর চৈতন্যে, এক নূতন আত্ম-অনুভূতিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে অহংমন্য কর্মের পরিবর্তে দিব্য কর্মের সম্ভাবনা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার সম্মুখে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত, ভাবগত, ইন্দ্রিয়গত ও প্রাণগত জীবনের পরিবর্তে এক দিব্য ও অধ্যাত্ম জীবনের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আর তাঁহাকে একটি শক্তিমান অন্ধ যন্ত্র হইতে হইবে না, পরন্তু সচেতন পুরুষ হইতে হইবে, ভগবানের জ্ঞানদীপ্ত শক্তি ও আধার হইতে হইবে।

কারণ আমাদের মধ্যে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে : আমাদের মানবতার যাহা উচ্চতম শিখর সেখানেও এই পরিণতি ও সমুত্তরণ আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত রহিয়াছে। মানুষের যে সাধারণ মন ও জীবন তাহা হইতেছে অর্ধ-সজ্ঞান এবং প্রধানত অজ্ঞান অভিবিকাশ, তাহার মধ্যে লুক্কায়িত কোন বস্তুর আংশিক অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেখানে তাহার চেতনার অন্তরালে এক গুপ্ত দেবতা রহিয়াছেন, তিনি এমন একটি প্রক্রিয়ার গাঢ় আবরণেব পিছনে নিশ্চলভাবে অবস্থিত যাহা সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের নহে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সে দেখে এই জগতে সে চিন্তা করিতেছে, সংকল্প করিতেছে, সুখ দুঃখ বোধ করিতেছে, কর্ম করিতেছে, আর সে সহ-জাত সংস্কারের বশে অথবা বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ধরিয়া লয় যে, সে হইতেছে একটি স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ জীব, তাহার আছে চিন্তায়, সংকল্পে, অনুভবে ও কর্মে স্বাধীনতা—অন্তত এইভাব লইয়াই সে জীবনযাপন করে। সে তাহার পাপ ও ভ্রান্তি ও দুঃখের বোঝা নিজেই বহিয়া চলে এবং সে তাহার জ্ঞান ও পুণ্যের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব নিজেরই বলিয়া গ্রহণ করে; সে তাহার সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক অহংকে তৃপ্ত করিবার অধিকার দাবি করে এবং আত্মম্ভ-রিতার বশে মনে করে যে নিজের শক্তিতেই সে তাহার ভাগ্য গড়িয়া তুলিবে এবং জগৎকে নিজের কাজে লাগাইবে। তাহার নিজের এই অহংবোধের ভিতর দিয়াই প্রকৃতি তাহার মধ্যে কাজ করে এবং তাহার নিজ ধারণা অনুসরণ

করিয়াই প্রকৃতি তাহাকে পরিচালিত করে, কিন্তু প্রকৃতির নিজের মধ্যে যে মহত্তর ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, সকল সময়ে প্রকৃতি তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ করে। মানুষের আত্ম-দৃষ্টির এই যে ভ্রান্তি ইহা হইতেছে তাহার অধিকাংশ ভ্রান্তিরই ন্যায় একটি সত্যের বিকৃতি, এই বিকৃতি হইতে এক সমগ্র পর্যায়ের প্রতিমান (Values) সৃষ্টি হয়, সেগুলি ভ্রান্ত হইলেও কার্যকরী। যাহা তাহার আত্মার পক্ষে সত্য সেইটিকে সে তাহার অহংরূপ ব্যক্তিত্বের সত্য বলিয়া মনে করে এবং তাহার মিথ্যা প্রয়োগ করে, তাহাকে মিথ্যা রূপ প্রদান করে, তাহা হইতে বহু অজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অজ্ঞানটি হইতেছে তাহার বহিশ্চৈতন্যের এই ত্রুটি যে, তাহার যে বাহ্য যন্ত্রবৎ অংশটুকু প্রকৃতিরই একটি কৌশল তাহার সহিত, এবং এই বাহ্য প্রক্রিয়াসকল আত্মায় যেরূপ প্রতিফলিত হয় এবং তাহারা আত্মাকে যতটুকু প্রতিফলিত করে আত্মার কেবল ততটুকুর সহিত সে নিজেকে এক করিয়া দেখে। ভিতরে যে মহত্তর আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্তা তাহার সকল মন, প্রাণ, সৃষ্টি ও কর্মকে এক অনাগত সিদ্ধির আশা ও প্রচ্ছন্ন সার্থকতা প্রদান করিতেছে তাহার সন্ধান সে পায় না। এখানে বিশ্ব-প্রকৃতি বিশ্বের অধীশ্বর পুরুষের শক্তি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ প্রকৃতির ধর্ম অনুযায়ী গঠন করিতেছে, তাহার কর্ম নিরূপিত করিয়া দিতেছে, মানুষকেও তাহার মানবতার সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী গঠন করিতেছে, তাহার কর্ম নিরূপিত হইতেছে,—সে ধর্ম হইতেছে প্রাণ ও দেহে আবদ্ধ অজ্ঞান মনোময় সত্তার ধর্ম—আবার প্রত্যেক ব্যষ্টি-গত মানুষকেও তাহার বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম অনুযায়ী এবং তাহার নিজ মূল স্বভাবের বিভিন্ন বৈচিত্র্য অনুযায়ী গঠন করিতেছে এবং তাহার ব্যষ্টিগত কর্ম নিরূপিত করিয়া দিতেছে। এই বিশ্ব-প্রকৃতিই শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়াসকল এবং আমাদের প্রাণিক ও স্নায়বীয় অংশসমূহের সহজাত প্রক্রিয়া-সকল গড়িয়া তোলে, পরিচালিত করে, আর সেখানে যে আমরা তাহার অধীন তাহা খুবই সুস্পষ্ট। আর আমাদের ইন্দ্রিয়ানুগ-মন, সংকল্প ও বুদ্ধির যে-ক্রিয়া বর্তমানে ঐরূপই যন্ত্রবৎ তাহাকেও সে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং পরিচালিত করিতেছে। কেবল প্রভেদ এই যে, পশুতে মনের ক্রিয়া-সকল হইতেছে সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির যন্ত্রবৎ অনুসরণ, কিন্তু মানুষের এই বিশেষত্ব —তাহার আধারে যে সচেতন বিকাশ হইতেছে তাহাতে তাহার অন্তরাত্মার অধিকতর সক্রিয় সহযোগ রহিয়াছে, এবং তাহার ফলে তাহার বাহ্য মনে কতকটা স্বাধীনতার অনুভূতি এবং তাহার যান্ত্রিক প্রকৃতির উপর ক্রমবর্ধমান প্রভুত্বের বোধ উৎপন্ন হয়—সে-বোধ তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য, কিন্তু সেটি হইতেছে অধিকাংশই একটি ভ্রান্ত বোধ। আর ইহা বিশেষভাবে ভ্রান্তিজনক এই জন্য যে. ইহা তাহার বন্ধনরূপ কঠোর সত্যের প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়া

রাখে এবং তাহার স্বাধীনতা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা তাহাকে সত্য স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের সন্ধান করিতে দেয় না। কারণ মানুষের যে স্বাধীনতা এবং তাহার প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব, তাহাকে বাস্তব সত্য বলা যায় না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না যতক্ষণ না সে তাহার অন্তরস্থ ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় এবং তাহার অহং হইতে ভিন্ন তাহার যে নিজ প্রকৃত সত্তা ও আত্মা রহিয়াছে তাহাকে লাভ করে, আত্মবান। সেইটিকেই প্রকৃতি মন, প্রাণ ও দেহে প্রকট করিবার প্রয়াস করিতেছে, সেইটিই তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, সেইটিই আমাদের অন্তরস্থ চৈত্যপুরুষের বাহ্য নিয়তি ও ক্রমবিকাশ গঠন করিয়া দেয়। অতএব যখন সে তাহার প্রকৃত আত্মা ও সত্তাকে লাভ করে কেবল তখনই তাহার প্রকৃতি ভগবানের সচেতন যন্ত্র এবং জ্ঞানদীপ্ত শক্তি হইতে পারে।

যখন আমরা আমাদের অন্তরতম সত্তার মধ্যে প্রবেশ করি তখন আমরা অবগত হই যে, আমাদের মধ্যে এবং সকলেরই মধ্যে রহিয়াছে এক আত্মা ও ভগবান, সকল প্রকৃতি তাহারই কাজ করে, তাহাকেই প্রকট করে, আমরা নিজেরাও হইতেছি এই আত্মারই আত্মা, এই সত্তারই সত্তা, আমাদের শরীর তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ প্রতিমা, আমাদের জীবন তাহার জীবন-ছন্দের একটি গতি, আমাদের মন তাহারই চৈতন্যের একটি কোষ, আমাদের ইন্দ্রিয় সকল তাহারই যন্ত্র, আমাদের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি-সকল তাহারই আত্ম-আনন্দের অন্বেষণ, আমাদের কর্ম তাহারই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, যতক্ষণ আমরা অজ্ঞান ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা হইতেছে কেবল এটা ছায়া, একটা ইংগিত বা আভাস, কিন্তু যখন আমরা তাহাকে এবং নিজদিগকে জানিতে পারি তখন তাহা হয় তাহারই অমর স্বাধীনতার অংশ ও উপযোগী যন্ত্র। আমাদের প্রভুত্ব-সকল হইতেছে তাহারই কর্ম-রত শক্তির প্রতিচ্ছায়া, আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান তাহারই আংশিক জ্যোতি, আমাদের আত্মার উচ্চতম ও প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি বিশ্বের ঈশ্বর ও প্রাণ-স্বরূপ, সর্বভূতে অবস্থিত সেই পরমাত্মারই ইচ্ছাশক্তির অবতীর্ণ অংশ ও প্রতিভূ। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে অজ্ঞানের অবস্থায় আমাদের সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্মে এই নিম্নতন প্রকৃতির মায়া দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন।* আর অজ্ঞানের অন্ধকারেই হউক অথবা জ্ঞানের জ্যোতিতেই হউক আমরা আমাদের মধ্যে অবস্থিত এবং জগতের মধ্যে অবস্থিত সেই ঈশ্বরের জন্যই জীবন ধারণ করি। এই জ্ঞানে এবং এই সত্যে সচেতন ভাবে বাস করা—ইহাই হইতেছে অহং হইতে মুক্তি এবং মায়ার গণ্ডী ভাঙিয়া বাহির হওয়া। অন্য সকল শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হইতেছে কেবল এই "ধর্মের"ই

*ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

আয়োজন, এবং সকল যোগসাধনা হইতেছে কেবল একটি উপায় যাহা দ্বারা আমরা আমাদের সত্তার ঈশ্বরের সহিত, আমাদের সত্তার অন্তর্পুরুষ ও আত্মার সহিত প্রথমে কোনরূপ মিলনে উপনীত হই এবং শেষে পূর্ণ জ্যোতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সহিত সমগ্রভাবেই যুক্ত হই। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হইতেছে আমাদের প্রকৃতির সকল বিভ্রান্তি, সকল সমস্যায় সকল প্রকৃতির অন্তর্বাসী এই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হওয়া, আমাদের সমগ্র সত্তা লইয়া, প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় লইয়া, আমাদের সকল উৎসর্গীকৃত জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও কর্ম লইয়া, সর্ব্বভাবেন, আমাদের সচেতন আত্মার এবং আমাদের করণভূতা প্রকৃতির সকল ধারায় তাঁহার অভিমুখ হওয়া। আর যখন আমরা সকল সময়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ইহা করিতে পারি তখন ভাগবত জ্যোতি ও প্রেম ও শক্তি আমাদিগকে অধিকার করিয়া লয়, আত্মা ও করণ উভয়কেই পূর্ণ করিয়া দেয়, আমাদের অন্তর্পুরুষ ও আমাদের জীবন যে-সকল সংশয়, সমস্যা, ভ্রান্তি ও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে-সবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে নির্বিঘ্নে লইয়া যায়, আমাদের অবিনাশী ও শাশ্বত পদের পরম শান্তি ও অধ্যাত্ম মুক্তির মধ্যে লইয়া যায় পরাং শান্তিম্, স্থানম্ শাশ্বতম্।

কারণ গীতা নিজ যোগের সকল নিয়ম ও ধর্ম এবং গভীরতম মর্ম দিবার পর, অধ্যাত্ম জ্ঞানের রূপান্তরকারী জ্যোতির দ্বারা মানুষের মনের নিকট যে-সকল প্রথম রহস্য প্রকট হয় তাহাদের ঊর্ধ্বে একটি আরও গভীরতর গুহ্যতর সত্য আছে ইহা বলিবার পর সহসা বলিয়া উঠিল, আরও একটি পরম বাক্য, পরমম্ বচঃ এবং সর্বগুহ্যতম সত্য এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে। এই গুহ্য হইতেও গুহ্য সত্যটি গুরু অর্জুনকে তাহার পরম শ্রেয়ের জন্য ব্যক্ত করিবেন, কারণ সে হইতেছে নির্বাচিত ও প্রিয়, ইষ্টোঽসি মে। কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে, ভগবান তাঁহার নির্বাচিত যে-মহাত্মার নিকট নিজের শরীরকেই প্রকট করেন কেবল তাঁহাকেই এই রহস্য ব্যক্ত করা যায়, কারণ কেবল তিনিই হৃদয়ে, মনে ও প্রাণে ভগবানের এত নিকটবর্তী যে তিনি তাঁহার সকল সত্তায় ইহাতে যথার্থভাবে সাড়া দিতে পারেন এবং ইহাকে বাস্তব জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারেন। গীতার শেষ কথা, যে পরম বাক্যে শ্রেষ্ঠতম রহস্যটি প্রকাশ করিয়া গীতার শিক্ষা সমাপ্ত করা হইয়াছে, তাহা দুইটিমাত্র সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, সরল শ্লোকে কথিত হইয়াছে এবং তাহাদের আর কোন টীকা বা ব্যাখ্যা করা হয় নাই যেন তাহারা আপনা হইতেই মনের গভীরে প্রবেশ করে এবং অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে নিজেদের অর্থের পূর্ণতা প্রকট করে। কারণ দৃশ্যত এত সামান্য ও সহজ এই কথাগুলি যে অসীম অর্থগৌরবে নিত্য পূর্ণ তাহা কেবলমাত্র এই আভ্যন্তরীণ সদা-প্রসারমান অনুভূতির দ্বারাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। আর এই কথাগুলি উচ্চারিত

হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা অনুভব করি যে, এইটির জন্যই শিষ্যের অন্তরাত্মাকে এতক্ষণ ধরিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল, আর বাকী যাহা কিছু তাহা ছিল কেবল উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করিবার সাধনা ও শিক্ষা। ঈশ্বরের সেই গুহ্য হইতেও গুহ্য বাণীটি হইতেছে এই, "আমাতে মন দাও, আমার ভক্ত হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমাকে পাইবে, তোমার নিকট ইহা আমার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।" *

গীতা বরাবর যোগের একটি মহৎ এবং সুনির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী, একটি উদার ও সুস্পষ্ট দার্শনিক মত দিতে চাহিয়াছে, স্বভাব ও স্বধর্মের উপর জোর দিয়াছে, সাত্ত্বিক ধর্ম কেমন করিয়া আত্ম-অতিক্রমণের দ্বারা নিজেকে ছাড়াইয়া এই উচ্চতম গুণেরও সীমার ঊর্ধ্বে সমুন্নীত এবং পরম উদার অমৃতময় জীবনের মুক্ত অধ্যাত্ম ধর্মে লইয়া যায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে, সিদ্ধিলাভের বহু নিয়ম, সাধন, বিধি ও বিধান দিয়াছে, আর এখন সহসা যেন নিজেরই সেই কাঠামোটিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবাত্মাকে কহিল, "সকল ধর্ম পরিত্যাগ কর, কেবল ভগবানের নিকট, তোমার ঊর্ধ্বে, তোমার চতুষ্পার্শ্বে, তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ কর, তোমার পক্ষে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, ঐটিই হইতেছে সত্যতম, মহত্তম পন্থা, ঐটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তি।" জগতের অধীশ্বর কুরুক্ষেত্রের দিব্য সারথিরূপে দিব্য গুরুরূপে মানুষের নিকট ভগবান ও পুরুষ ও আত্মা সম্বন্ধে মহান সত্যসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন, বহুল বৈচিত্র্যময় জগতের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, ভগবানের সহিত মানুষের মন, প্রাণ, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যে সর্বজয়ী সাধনার দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অধ্যাত্ম আত্ম-সংযম ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া মরজীবন হইতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতে পারে, তাহার সীমাবদ্ধ মানসিক জীবন হইতে অনন্ত অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে উঠিতে পারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর এখন মানুষের মধ্যে, সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবান রূপে তিনি তাহাকে বলিলেন. "পরিশেষে এই সব ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আত্ম-সংযমের কোন প্রয়োজন হইবে না, নিয়ম ও ধর্মের সর্ববিধ অনুসরণ, সর্ববিধ গণ্ডীকে প্রতিবন্ধক ও ভার বলিয়া অবশেষে বর্জন করিতে পারিবে যদি তুমি আমার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে পার,

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৫-৬৬

তোমার মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবানের উপরেই নির্ভর করিতে পার। তোমার সমগ্র মনকে আমার দিকে ফিরাও, ইহাকে আমার চিন্তায় এবং আমার সান্নিধ্যের অনুভূতিতে পূর্ণ করিয়া তোল। তোমার সমগ্র হৃদয়কে আমার দিকে ফিরাও, তুমি যে-কোন কর্মই কর না কেন সবকে আমার প্রীতি যজ্ঞ ও নিবেদনে পরিণত কর। তাহা করা হইলে তোমার জীবন ও অন্তরাত্মা ও কর্ম লইয়া আমাকে আমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে দাও, তোমার মন, হৃদয়, প্রাণ ও কার্যাবলী লইয়া আমি যাহাই করি না কেন তাহাতে তুমি ব্যথিত বা বিভ্রান্ত হইও না যদিও তাহা মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ ইচ্ছা ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিজের উপর যে-সব নীতি ও ধর্ম আরোপ করে সে-সবের অনুযায়ী নহে বলিয়াই মনে হয়। আমার ধারাসকল হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের ধারা, তাহা সব জিনিস জানে এবং সব জিনিসের এমন যোগাযোগ করে যেন পরিণামফলটি হয় সর্বাঙ্গসুন্দর, কারণ তাহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন পূর্ণতার বহুল সূত্রগুলিকে শোধন করিতেছে, একত্র বয়ন করিতেছে। তোমার সহিত এখানে তোমার যুদ্ধরথে অবস্থিত আমিই তোমার ভিতরে ও বাহিরে জগতের অধীশ্বররূপে প্রকট হইয়াছি, আমি পুনরায় তোমাকে অমোঘ আশ্বাস, অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি তোমাকে সকল দুঃখ, সকল অশুভের ভিতর দিয়া আমার নিকটেই লইয়া আসিব। যত বাধা বা বিভ্রান্তিই আসুক না কেন, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও যে, আমি তোমাকে বিশ্বসত্তার মধ্যে এক পরিপূর্ণ দিব্য-জীবনে এবং বিশ্বাতীত পুরুষের মধ্যে এক অমৃতময় প্রতিষ্ঠায় লইয়া যাইতেছি।

সকল গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যা যে গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে, যাহা বিভিন্ন শিক্ষায় প্রতিফলিত হয় এবং অন্তর্পুরুষের অভিজ্ঞতায় সমর্থিত হয়, গীতার পক্ষে সেইটি হইতেছে আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত অধ্যাত্ম সত্তার তত্ত্ব, মন ও বাহ্য প্রকৃতি হইতেছে কেবল তাহার প্রকাশ বা রূপ। এইটি হইতেছে পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধের তত্ত্ব, যে অন্তর্যামী ভগবান হইতেছেন সকল জগতের অধীশ্বর এবং জগতের রূপ ও গতিসমূহের মধ্যে আমাদের নিকট অদৃশ্য রহিয়াছেন তাঁহার তত্ত্ব। বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ নানাভাবে এই সকল সত্যই শিক্ষা দিয়াছে, গীতার প্রথম অধ্যায়গুলিতে ইহাদেরই সমন্বয় করা হইয়াছে। আর তাহাদের সকল বাহ্যদৃষ্ট বিভিন্নতার মধ্যে তাহারা হইতেছে একই সত্য, আর যোগের সকল বিভিন্ন পন্থা হইতেছে অধ্যাত্ম অনুশীলনের বিভিন্ন সাধনা, তাহাদের দ্বারা আমাদের চঞ্চল মন ও অন্ধ প্রাণ প্রশান্ত হয়, এই বহুমুখী অদ্বিতীয় একের দিকে ফিরিতে পারে, এবং আত্মা ও ভগবানের নিগূঢ় সত্য আমাদের নিকট এতই বাস্তব ও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে যে আমরা হয় তাহাদের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারি, অথবা

অনন্তের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি, তখন আর মনের অজ্ঞান আদৌ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।

গীতা যে গুহ্যতর তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছে সেইটি হইতেছে দিব্য পুরুষোত্তমের গভীর সামঞ্জস্যকারী সত্য, তিনি একই সঙ্গে আত্মা এবং পুরুষ, পরব্রহ্ম এবং একমাত্র, অন্তরতম, রহস্যময়, অনির্বচনীয় ভগবান। উহা চিন্তাকে আনিয়া দেয় চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য বিশালতর ও গভীরতর ভিত্তি এবং অধ্যাত্ম অনুভূতিকে আনিয়া দেয় এক মহত্তর যোগ, তাহা পূর্ণতর ভাবে সমন্বয়কারী ও ব্যাপক। এই গভীরতর রহস্যটি হইতেছে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি ও জীবের নিগূঢ় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, জীব হইতেছে সেই শাশ্বত এবং এই ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়ত্র ভগবানের অংশ এবং তাঁহার অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম সত্তায় এবং মূলত এক। অধ্যাত্ম অনুভূতির গোড়ায় ইহসংসার ও বিশ্বাতীত সত্যের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তাহাতে এই গভীরতর জ্ঞানটি ধরা পড়ে না, কারণ যিনি বিশ্বের অতীত সত্তা তিনিই আবার বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, সর্বভূতের আত্মা, তিনি তাঁহার প্রকৃতিতে যে-সকল বস্তু অভিব্যক্ত করিয়াছেন সে-সবের তিনিই আদি তিনিই পরম অর্থ। তিনি তাঁহার বিভূতিসকলের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন, তিনি সেই কালপুরুষ যাঁহার বশে জগতের সকল ক্রিয়া চলিতেছে, তিনি সকল জ্ঞানের সূর্য, জীবাত্মার প্রেমিক ও প্রিয় এবং সকল কর্ম ও যজ্ঞের অধীশ্বর। এই গভীরতর, সত্যতর, গুহ্যতর রহস্যের অন্তরতম অনুভবের ফল হইতেছে গীতার সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র কর্ম, সমগ্র ভক্তির যোগ। ইহা হইতেছে একই সঙ্গে অধ্যাত্ম বিশ্বভাবের এবং মুক্ত ও সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, ইহা হইতেছে ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে সংযুক্ত হওয়ার এবং তাঁহার মধ্যে সমগ্রভাবে বাস করার উপলব্ধি—তাহাই জীবের অমৃতত্বের আশ্রয় আবার সেই সঙ্গেই জগতে এবং শরীরে আমাদের মুক্ত কর্মের আধার ও শক্তি।

আর এখন বলা হইল পরম বাক্যটি, সর্বাপেক্ষা গুহ্য, গুহ্যতমম্—তাহা এই যে, পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন সকল ধর্ম হইতে মুক্ত এক অসীম অনন্ত, আর যদিও তিনি নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জগৎ পরিচালনা করেন এবং মানুষকে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়, রাগ, দ্বেষ ও উদাসীনতা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক ও বৈরাগ্য—এই সব ধর্মের ভিতর দিয়া, তাহার দেহগত, প্রাণগত, বুদ্ধিগত, হৃদয়গত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রীতি, নীতি ও আদর্শের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন এই সবেরই বহু ঊর্ধ্বে, আর আমরাও যদি ধর্মসকলের উপর নির্ভরতা বর্জন করিয়া এই মুক্ত ও শাশ্বত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ

করিতে পারি, এবং যাহাতে আমরা পূর্ণতম ভাবে, অনন্যভাবে তাঁহার দিকে নিজদিগকে উন্মুক্ত রাখি শুধু সেই বিষয়ে যত্নবান হই এবং আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের উপর নির্ভর করি, ভয়শূন্য ও শোকশূন্য হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই পথনির্দেশ মানিয়া চলি, তাহা হইলে সেইটিই হইবে সত্যতম, মহত্তম মুক্তি এবং তাহাই লইয়া আসিবে আমাদের সত্তার ও প্রকৃতির পূর্ণতম ও অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি। যাহারা ভগবানের নির্বাচিত তাহাদিগকে এই পথই দেখান হয়, কেবল তাহাদিগকে যাহারা তাঁহার প্রিয়তম, কারণ তাহারাই হইতেছে তাঁহার নিকটতম এবং তাহারাই তাঁহার সহিত এক হইতে সর্বাপেক্ষা সমর্থ এবং তাঁহারই ন্যায় প্রকৃতির উচ্চতম শক্তি ও ক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে সম্মত ও সম্মিলিত হইয়া জীব-চৈতন্যে বিশ্ব-প্রসারী এবং অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাতীত হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ।

কারণ অধ্যাত্ম অভিবিকাশে এমন এক সময় আসে যখন আমরা জ্ঞাত হই যে, আমাদের মধ্যে ও চতুর্দিকে যে মহত্তর সত্তা বিরাজ করিতেছে তাহারই নীরব ও নিগূঢ় প্রেরণার ফলে আমাদের মনে ও প্রাণে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, আমাদের সকল চেষ্টা ও কর্ম হইতেছে তাহাই। আমাদের উপলব্ধি হয় যে, আমাদের সকল যোগ, আমাদের অভীপ্সা ও প্রয়াস হইতেছে অপূর্ণ বা সঙ্কীর্ণ কারণ সে সবই মনের সংস্কার, দাবি, বদ্ধ ধারণা, পক্ষপাতিত্ব দ্বারা এবং বৃহত্তর সত্যের ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ অর্থের দ্বারা বিকৃত হয়, অন্তত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা ও প্রয়াস হইতেছে মহত্তম জিনিসের কেবল মানসিক প্রতিরূপ মাত্র, সে সমুদয় অধিকতর পূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে, মুক্তভাবে, উদারভাবে বিশ্বগত ও শাশ্বত ইচ্ছার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যে সম্পাদিত হইবে কেবল যদি আমরা পরমতম ও পূর্ণতম শক্তি ও প্রজ্ঞার হস্তে নিজদিগকে নির্বিরোধে অর্পণ করিয়া দিতে পারি। সেই শক্তি আমাদের হইতে পৃথক নহে, তাহা হইতেছে অন্য সকলের আত্মার সহিত এক আমাদের নিজেদেরই আত্মা এবং সেই সঙ্গেই তাহা বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বগত পুরুষ। আমাদের সত্তা, আমাদের কর্ম এই মহত্তম সত্তার মধ্যে গৃহীত হইলে তখন আর তাহা এখন যেমন মনে হইতেছে এইরূপ মানসিক ভেদে ব্যষ্টিগতভাবে আমাদের নিজেদের থাকিবে না। তাহা হইবে এক অনন্তের, এক অন্তরঙ্গ অনির্বচনীয় ভাগবত সত্তার বিরাট ক্রিয়া; তাহা হইবে আমাদের মধ্যে এই গভীর বিশ্বগত আত্মা এবং এই বিশ্বাতীত পুরুষের নিত্য স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ ও অভিব্যক্তি। গীতার শিক্ষা হইতেছে এই যে, উহা সমগ্রভাবে হইতে পারে কেবল যদি কোন কিছু অবশেষ না রাখিয়া আত্ম-সমর্পণ করা হয়; আমাদের যোগ, আমাদের জীবন, আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার অবস্থা সবকেই এই জাগ্রত অনন্তের দ্বারা অবাধে নির্ধারিত হইতে

হইবে, এই ধর্ম বা ঐ ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মের দিকে আমাদের মনের আগ্রহের দ্বারা যেন তাহা পূর্ব হইতেই নির্ধারিত না হয়। তখন যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের যোগ গ্রহণ করিবেন, আমাদিগকে আমাদের পরমতম সিদ্ধিতে তুলিয়া লইবেন, তাহা কোন বাহ্য বা মানসিক আদর্শ বা সংকীর্ণ বিধির সিদ্ধি নহে, পরন্তু তাহা বিশাল ও ব্যাপক, মনের নিকট অপরিমেয়। সে-সিদ্ধি এক সর্বদর্শী প্রজ্ঞা দ্বারা সমগ্র সত্যের অনুসরণে বিকশিত হইবে, প্রথমে অবশ্য তাহা হইবে আমাদের মানবীয় স্বভাবেরই সত্য, কিন্তু পরে এক মহত্তর জিনিসের সত্য, তাহাতে আমাদের স্বভাব রূপান্তরিত হইবে—সেই মহত্তর সত্য হইতেছে এক অপরিমেয়, অমর, মুক্ত ও সর্বরূপান্তরসাধক সত্তা ও শক্তি, তাহা ভাগবত ও অনন্ত প্রকৃতির জ্যোতি ও দীপ্তি।

সেই রূপান্তরের উপাদানরূপে সব কিছুকেই অর্পণ করিয়া দিতে হইবে। এক সর্বদর্শী চৈতন্য আমাদের জ্ঞানকেও লইবে, আমাদের অজ্ঞানকেও লইবে, আমাদের সত্যকেও লইবে, আমাদের ভ্রান্তিকেও লইবে, তাহাদের অসম্পূর্ণ রূপগুলি পরিহার করিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার অনন্ত জ্যোতিতে রূপান্তরিত করিয়া লইবে। এক সর্বজয়ী শক্তি আমাদের পাপ পুণ্য, আমাদের সৎ অসৎ, আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতা গ্রহণ করিবে, তাহাদের জটিল রূপগুলি পরিহার করিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার লোকোত্তর শুচিতা ও সার্বভৌম শুভ ও অব্যর্থ শক্তিতে রূপান্তরিত করিবে। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আমাদের দ্বন্দ্বসঙ্কুল হর্ষ ও ব্যথা গ্রহণ করিবে, তাহাদের অসঙ্গতি ও অপূর্ণ ছন্দসকল পরিহার করিবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত অকল্পনীয় আনন্দে রূপান্তরিত করিবে। সমস্ত যোগ মিলিয়া যাহা কিছু করিতে পারে সে-সমুদয় এবং তাহা অপেক্ষাও অধিক সম্পাদিত হইবে, কিন্তু কোন মানবীয় গুরু, সাধু বা জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদিগকে যাহা দিতে পারে তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর দৃষ্টিসম্পন্ন ধারায়, এক মহত্তর জ্ঞান ও সত্যের আলোকে তাহা সম্পাদিত হইবে। এই পরমতম যোগ আমাদিগকে যে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম অবস্থায় লইয়া যাইবে তাহা এখানকার সব কিছুরই ঊর্ধ্বে হইবে অথচ এখানকার এবং অন্য জগৎসকলের সকল জিনিসই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু সবেরই হইবে অধ্যাত্ম রূপান্তর, কোন বাধা থাকিবে না, কোন বন্ধন থাকিবে না, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। ভগবানের অনন্ত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ নিজ স্থির নীরবতায় এবং উজ্জ্বল সীমাহীন ক্রিয়ায় সেখানে থাকিবে, সেইটিই হইবে তাহার মূলগত, ভিত্তিগত, সর্বগত উপাদান, রূপায়ণ ও স্বরূপ। অনন্তের সেই রূপায়ণের মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইয়া প্রকাশ্য-ভাবে বাস করিবেন, আর তাঁহার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকিবেন না,

এবং তাঁহার যখন যেমন ইচ্ছা হইবে তিনি আমাদের মধ্যে অনন্তের যে-কোন আকার গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ সংকল্প ও অবিনশ্বর আনন্দ অনুসারে জ্ঞান, চিন্তা, প্রেম, অধ্যাত্ম আনন্দ, শক্তি ও কর্মের জ্যোতির্ময় রূপসমূহ সৃষ্টি করিবেন। আর মুক্ত আত্মা ও অবিকৃত প্রকৃতির উপর কোন বাধা বন্ধনের সৃষ্টি হইবে না, কোনও একটা নিম্নতন রূপায়ণে তাহা চির-বন্ধ হইয়া পড়িবে না। কারণ সমগ্র ক্রিয়াটি আত্মার শক্তিতে দিব্য স্বাধীনতায় সম্পাদিত হইবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। পরম আত্মায়, পরম ধামে বিচ্যুতি-হীন নিবাসই হইবে সেই অধ্যাত্ম অবস্থার ভিত্তি এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। সিদ্ধিপ্রদ শক্তি হইবে বিশ্বসত্তা এবং সকল জীবের সহিত এমন অন্তরঙ্গ জ্ঞানময় একত্ব যাহা ভেদাত্মক মনের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে অথচ সকল সত্য প্রভেদকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইবে। এই পূর্ণাঙ্গ মুক্তির ফল হইবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং এখানে ভগবানের সহিত এবং ভগবান যাহা কিছু হইয়াছেন সে-সবের সহিত সনাতন জীবের একত্ব ও সুসংগতি। আমাদের মানব-জীবনের যেসকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অর্জুনের সমস্যা হইতেছে যাহাদের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, সে-সমুদয়ই সৃষ্ট হইয়াছে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের ভেদাত্মক ব্যক্তিত্বের দ্বারা। এই যোগ মানুষের আত্মাকে ভগবানের সহিত এবং বিশ্ব-জীবনের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করে, আমাদের কর্ম হয় ভগবানের কর্ম, তাঁহারই জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা গঠিত ও প্ররোচিত, আমাদের জীবন হয় ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির সুসংগতি—সেই জন্যই ইহা হইতেছে ঐ সকল সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসনের প্রকৃত পন্থা।

সমগ্র যোগটি প্রকাশ করা হইল, শিক্ষার পরম বাক্যটি কথিত হইল এবং ভগবৎ-নির্বাচিত মানব অর্জুন পুনরায় দিব্য কর্মটিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে আর তাঁহার অহংভাবপূর্ণ মন লইয়া নহে পরন্তু শ্রেষ্ঠতম আত্মজ্ঞান লইয়া। ভগবানের বিভূতি এখন মানবজীবনের মধ্যেই দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সচেতন আত্মা মুক্তপুরুষের কর্মের জন্য প্রস্তুত হইল, মুক্তস্য কর্ম্ম। মনের মোহ বিনষ্ট হইল, নিজ আত্মা ও নিজ সত্য সম্বন্ধে জীবের যে স্মৃতি আমাদের জীবনের ভ্রান্তিকর দৃশ্য ও রূপসকলের দ্বারা এযাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ফিরিয়া আসিল এবং সেই স্মৃতিই হইল তাঁহার সাধারণ চৈতন্য, সকল সংশয় ও বিভ্রান্তি বিদূরিত হইল, এখন তিনি ভগবদ্ আজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, আমাদের এবং আমাদের সত্তার ঈশ্বর, দেশ ও কালে প্রকট বিশ্ব-পুরুষ তাঁহাকে যে-কোন কর্মে নিযুক্ত করুন, তাঁহার উপর যে-কোন কর্মের ভার অর্পণ করুন তিনি এখন নিষ্ঠার সহিত ভগবানের জন্য জগতের জন্য সেই কর্ম করিতে অগ্রসর হইতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গীতা-শিক্ষার সারমর্ম

তাহা হইলে গীতার বাণীটি কি, ইহা যখন লিখিত হইয়াছিল তাহার পর বহু দীর্ঘ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, মানুষের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার বিপুল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, আজিকার মানবীয় মনের পক্ষে ইহার ব্যবহারিক মূল্য কি? মানুষের মন সর্বদাই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত কবিতেছে, আর ঐ সকল পরিবর্তনের ফল হইতেছে এই যে, প্রাক্তন চিন্তাধাবাসকল অচল হইয়া পড়িতেছে, অথবা যখন তাহারা সংরক্ষিত হইতেছে তখনও তাহারা প্রসারিত, সংশোধিত হইতেছে এবং সূক্ষ্মভাবেই হউক আব প্রকাশ্যভাবেই হউক তাহাদের মূলের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। কোন প্রাচীন শিক্ষা স্বভাবত এইরূপ পরিবর্তনের কতখানি উপযোগী তাহাতেই তাহাব জীবনীশক্তির পরিচয়, কারণ তাহার অর্থ হয় এই যে, তাহার চিন্তার বাহ্যরূপে যতই অপূর্ণতা বা অনুপযোগিতা থাকুক না কেন, সারবস্তুর যে-সত্য, জীবন্ত দৃষ্টির ও উপলব্ধির যে-সত্য তাহার ভিত্তিস্বরূপ ছিল তাহা এখনও অক্ষত রহিয়াছে, স্থায়ী উপযোগিতা ও সার্থকতা বজায় রাখিয়াছে। গীতা-গ্রন্থখানি আশ্চর্যভাবে টিকিয়া আছে, ইহা যখন প্রথমে মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল অথবা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রায় তখনকার ন্যাযই ইহা এখনও তেমনিই অম্লান রহিয়াছে, ইহার প্রকৃত সার বস্তুতে তেমনিই নূতন রহিয়াছে, কারণ সকল সময়েই অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা ইহাকে নূতন করিয়া পাওয়া যায়। ভারতে যে-সকল মহান শাস্ত্র ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত, গীতা এখনও তাহাদের মধ্যেই গণ্য হয় এবং প্রায় সকল ধর্মমত ও পথই ইহাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও গীতার শিক্ষাকে পরম মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে। ইহার প্রভাব যে শুধু দর্শন ও বিদ্যার অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব সাক্ষাৎ ও জীবন্ত, একটা জাতির, একটা সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে ইহার ভাবগুলি প্রবল গঠনশক্তিরূপে বাস্তবিক কার্য করিতেছে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্প্রতি এমন পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য যাহা কিছু অধ্যাত্ম সত্য প্রয়োজন সে-সবই গীতার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই কথাটি বর্ণে-বর্ণে গ্রহণ করিলে গীতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসকেই প্রশ্রয়

দেওয়া হয়। তত্রাচ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মূল সূত্রগুলির অধিকাংশই উহার মধ্যে রহিয়াছে, আর পরবর্তী অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আবিষ্কারের সকল অভিবিকাশের পরও আমরা উদার অনুপ্রেরণা ও পথ-নির্দেশের জন্য গীতাকেই অবলম্বন করিতে পারি। তাহা হইলে গীতার শিক্ষার, গীতার সত্যের এই যে প্রাণশক্তি ইহা কোথা হইতে আসিল?

গীতার দর্শন ও যোগের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের পূর্ণতম ও সমগ্রতম উপলব্ধির সহিত মানবীয় জীবন ও কর্মের বাহ্য বাস্তবতার সামঞ্জস্য সাধন, এমন কি এক প্রকার ঐক্য সাধন—এই পরিকল্পনা লইয়াই গীতার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ। এই দুইয়ের মধ্যে সাধারণত একটা আপোষ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনই চরম এবং সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে না। আধ্যাত্মিকতাকে নৈতিক রূপও সাধারণত দেওয়া হয় এবং সদাচারের নীতি হিসাবে ইহার মূল্য আছে; কিন্তু উহা হইতেছে একটা মানসিক সমাধান, উহাতে আত্মার সমগ্র সত্যের সহিত জীবনের সমগ্র সত্যের পূর্ণ ব্যবহারিক সামঞ্জস্য হয় না, আর উহাতে যত সমস্যার সমাধান হয় তত নূতন সমস্যারও উদ্ভব হয়। বস্তুত এইরূপ একটি সমাধান লইয়াই গীতার আরম্ভ; যে দ্বন্দ্ব হইতে উত্থিত একটি সমস্যা লইয়া গীতা-শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার এক দিকে রহিয়াছে কর্মীর ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজপুত্র, যোদ্ধা ও নেতার ধর্ম, এক যুগসন্ধির প্রধান নায়কের ধর্ম, বাহ্য জগতের বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ধর্মের শক্তিসকলের সহিত অন্যায় অধর্মের শক্তিসকলের সংগ্রামে প্রধান নায়কের ধর্ম, তিনি বাধা দিবেন, যুদ্ধ করিবেন, ভীষণ বাহ্য সংগ্রাম ও বিরাট হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়াও জগতে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন—তাঁহার প্রতি মানবজাতির ভাগ্যনির্ণয়ের এই মহান্ আহ্বান, আর অন্য দিকে রহিয়াছে নৈতিক বোধ, তাহা এই পন্থা ও কর্মকে পাপ বলিয়া নিন্দা করিতেছে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভরূপ মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে এবং যুদ্ধ ও হিংসা হইতে নিবৃত্তিকেই একমাত্র পন্থা ও প্রকৃত নৈতিক ও ন্যায়সংগত আচরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন নৈতিকতা অধ্যাত্ম আচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধিস্বরূপ অহিংসার উপর, অনিষ্ট না করা এবং হত্যা না করার উপরই জোর দেয়। যদি যুদ্ধ করিতেই হয় তাহা হইলে অধ্যাত্ম স্তরেই যুদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইবে কোন রকমের অপ্রতিরোধ বা অসহযোগের দ্বারা, আর যদি ইহার দ্বারা বাহ্য ক্ষেত্রে ফল না পাওয়া যায়, যদি অন্যায়ের শক্তি জয়লাভই করে তাহা হইলেও ব্যক্তিবিশেষ নিজের ধর্ম বজায় রাখিতে পারিবে এবং নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা উচ্চতম আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতার দাবি যদি

আরও চরমে উঠে, সামাজিক কর্তব্য এবং অলঙ্ঘ্য নৈতিক আদর্শের এই দ্বন্দ্বকে ছাড়াইয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহা বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে, জীবন ও তাহার কর্মের আদর্শ ও নীতিসকলকে দূরে রাখিয়া অন্য এক স্বর্গীয় অথবা বিশ্বাতীত অবস্থার দিকে নির্দেশ করিতে পারে, কেবল সেইখানেই মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর বিভ্রান্তিকর অসারতা ও মিথ্যার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ অধ্যাত্ম-জীবন সম্ভব হয়। গীতা ইহাদের প্রত্যেকটিকেই যথাস্থানে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ উহা সামাজিক কর্তব্য পালনের উপর জোর দিয়াছে, যে-মানুষকে সার্বজনীন কর্মে যোগদান করিতে হইবে তাহার পক্ষে ধর্ম অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছে, উচ্চতম অধ্যাত্ম-নৈতিক আদর্শের অঙ্গ-স্বরূপ অহিংসাকে স্বীকার করিয়াছে এবং অধ্যাত্ম-মুক্তির পন্থা-স্বরূপ সন্ন্যাসের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। অথচ গীতা নিঃসঙ্কোচে এই সকল পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে; বিপুল সাহসের সহিত সমস্ত জীবনকেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি বলিয়া তাহার সহিত আত্মার সামঞ্জস্য করিয়াছে, এবং অনন্তের সহিত যোগে, পরমতম আত্মার সহিত সামঞ্জস্যে, সিদ্ধতম ভগবানের অভিব্যক্তিরূপে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনযাপন করা যায় তাহার সহিত পরিপূর্ণ মানবীয় কর্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছে।

মানবজীবনের সকল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে আমাদের সত্তার বহুলাঙ্গতা হইতে, ইহার মূল তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা হইতে, আর যে অন্তরতম শক্তি ইহার রূপসকল নির্ধারণ করিতেছে, উহার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার গুহ্যতা হইতে। যদি আমাদের সত্তা হইত একই উপাদানে গঠিত, শুধুই জড়গত প্রাণ বা শুধুই মন বা শুধুই আত্মা, এমন কি যদি ইহাদের একটিরই মধ্যে অন্যগুলি সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানত নিহিত থাকিত অথবা আমাদের অবচেতন বা অতিচেতন অংশে সম্পূর্ণ সুপ্ত থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে কিছুতে আদৌ বিভ্রান্ত হইতে হইত না; জড় ও প্রাণের ধর্মই একান্ত প্রবল হইত অথবা মনের ধর্ম তাহার নিজ শুদ্ধ ও বিরোধশূন্য সত্তার নিকট সুস্পষ্ট হইত অথবা অধ্যাত্ম ধর্ম আত্মার নিকট স্ব-প্রতিষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ হইত। পশুরা কোন সমস্যার খবর রাখে না, শুদ্ধ মনের জগতের কোন মনোময় দেবতা কোন সমস্যাকেই আমল দিবে না অথবা বিশুদ্ধ মানসিক নীতির দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিবে কিংবা বুদ্ধিগত সুসঙ্গতি পাইলেই তৃপ্ত হইবে। শুদ্ধ আত্মা এ-সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে থাকিবে, অনন্তের মধ্যে আত্ম-তুষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু মানুষের জীবন হইতেছে তিন জিনিসের মিশ্রণ, উহা একই সঙ্গে ভৌতিক-প্রাণময়, মনোময় এবং আধ্যাত্মিক এক রহস্যপূর্ণ জিনিস, আর মানুষ জানে না যে, এই সকল

জিনিসের মধ্যে সত্যিকারের সম্বন্ধ কি, তাহার জীবনের এবং তাহার প্রকৃতির প্রকৃত সত্য কোন্‌টি, তাহার ভাগ্যের আকর্ষণ কোন্ দিকে, তাহার সিদ্ধির ক্ষেত্র কোথায়।

জড় এবং প্রাণ হইতেছে তাহার বাস্তব ভিত্তি, ঐটি লইয়াই সে আরম্ভ করে, ঐটির উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে যদি আদৌ এই পৃথিবীতে এবং এই শরীরের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে উহার প্রয়োজন মিটাইতেই হইবে, উহার বিধান পালন করিতে হইবে। জড় ও প্রাণের ধর্ম হইতেছে উদ্বর্তনের নীতি, দ্বন্দ্বের নীতি, বাসনা ও পরিগ্রহের নীতি, শরীর, প্রাণ ও অহংয়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও তৃপ্তির নীতি। যত যুক্তি, যত নৈতিক আদর্শবাদ এবং চরম আধ্যাত্মিকতা মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলির পক্ষে সম্ভব সে-সব দিয়াও আমাদের ভিত্তিস্বরূপ প্রাণ ও দেহের সত্য ও দাবিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, মানবজাতি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় যে উহাদের লক্ষ্যসকল অনুসরণ করিতে, উহাদের প্রয়োজন সকল মিটাইতে চায়, অথবা উহাদের গুরুতর সমস্যাগুলিকে মানবীয় ভবিষ্যতের, মানবীয় আকিঞ্চন ও প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ও বৈধ অংশ করিতে চায় তাহা নিবাবণ করা যায় না। এমন কি যে-সব আধ্যাত্মিক ও আদর্শবাদমূলক সমাধান আর সব কিছুরই সমাধান করে, কেবল আমাদের বাস্তব মানবজীবনের আসন্ন প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির কোন সমাধান করিতে পারে না মানুষের বুদ্ধি সে-সব সমাধানে তৃপ্তি না পাইয়া প্রায়ই তাহাদের প্রতি বিমুখ হয়, একান্তভাবে প্রাণ ও দেহের জীবনকেই গ্রহণ করে এবং যুক্তি অথবা সহজাত প্রেরণার অনুসরণে তাহারই যতদূর সম্ভব সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুব্যবস্থিত পরিতৃপ্তি চায়। জীবনকে বরণ করিতে হইবে অথবা বুদ্ধি-অনুগত প্রাণ ও জড়দেহের সিদ্ধি-শক্তিলাভ করিতে হইবে—এইরূপ মতবাদই মানবজাতির সাধারণ-সম্মত ধর্ম হইয়া পড়ে, আর অন্য যাহা কিছু সে-সবই মিথ্যা আড়ম্বর বলিয়া অথবা একান্ত অপ্রধান বস্তু বলিয়া, সামান্য ও আপেক্ষিক ভাবে উপযোগী গৌণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু জড়দেহ ও প্রাণের দাবি যতই তীব্র হউক এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা যতই বড় হউক তাহারাই মানুষের সব নহে, আর ইহাও সে পুরাপুরি মানিয়া লইতে পারে না যে, মন কেবল প্রাণ ও দেহের ভৃত্য মাত্র, তাহাকে যে নিজস্ব শুদ্ধ ভোগ কিছু দেওয়া হয় সেটা কেবল তাহার কাজের পুরস্কার স্বরূপ, অথবা ভাবিতে পারে না যে, মন কেবল প্রাণ-শক্তির প্রসারণ বা স্ফুরণ মাত্র, দৈহিক জীবনের তৃপ্তি সাধন করিবার পর উহা কেবল একটা আদর্শ-বিলাস মাত্র। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্তরঙ্গভাবে মনই হইতেছে মানুষ, আর এই মন যত বিকশিত হয় তত সে নিজের ধর্মানুযায়ী

তৃপ্তি ও আত্ম-বিকাশের জন্য দেহ ও প্রাণকে একটা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চায়—সে যন্ত্র অপরিহার্য অথচ প্রবল বাধা-স্বরূপ, নতুবা কোন সমস্যাই থাকিত না। মানুষের মন কেবলই প্রাণগত ও দেহগত বুদ্ধি নহে, তাহা হইতেছে যুক্তিশীল, রসাশ্রয়ী, নৈতিক, আত্মিক, ভাবাবেগময় ও কর্মময় বুদ্ধি, এই সকল প্রবৃত্তির প্রতি ক্ষেত্রেই ইহার ঊর্ধ্বতম ও বলবত্তম প্রকৃতি হইতেছে তাহাদের এমন কোনরূপ চরম বিকাশের জন্য তীব্র প্রয়াস করা যাহাকে প্রাণের কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা যায় না, যাহাকে এখানে রূপ দিয়া সম্পূর্ণভাবে সত্য করিয়া তোলা যায় না। মনের এই যে চরম আদর্শ আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধ প্রোজ্জ্বল বা জ্বলন্ত আদর্শ-রূপেই থাকিয়া যায়, মন সেটিকে অন্তরের মধ্যে বেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়াস করিবার তাগিদ অন্তরের মধ্যে অনিবার্য করিতে পারে, এমন কি আংশিকভাবে সেটিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু জীবনের সকল বাস্তব অংশকে তাহার অনুযায়ী হইতে বাধ্য করিতে পারে না। এইরূপ একটি চরম আদর্শ হইতেছে বুদ্ধিগত সত্য ও যুক্তির অলঙ্ঘ্য নীতি, আমাদের তর্কবুদ্ধি ইহারই সন্ধান করে; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে ন্যায় ও আচরণের অলঙ্ঘ্য নীতি, এইটি হইতেছে নৈতিক বোধের লক্ষ্য; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে প্রেম, সহানুভূতি, করুণা, ঐক্যের অলঙ্ঘ্য নীতি, এইটি হইতেছে আমাদের হৃদয় ও অন্তঃপুরুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অলঙ্ঘ্য নীতি, রসগ্রাহী সত্তা ইহাতেই স্পন্দিত হয়; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে আভ্যন্তরীণ আত্ম-সংযম এবং জীবন-জয়ের অলঙ্ঘ্য নীতি, কর্মময়ী ইচ্ছা-শক্তি ইহার জন্য প্রয়াস করে; এই সবই এক সঙ্গে রহিয়াছে, আমাদের প্রাণগত ও দেহগত মন যে স্বাধিকার, ভোগ ও নির্বিঘ্ন দৈহিক জীবনযাত্রাকেই চরম আদর্শ, অলঙ্ঘ্য নীতি বলিয়া ধরিয়া থাকে, পূর্বোক্ত আদর্শগুলি ইহার মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠার দাবি করিতেছে। মানুষের বুদ্ধি ইহাদের কোন একটিকেও পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিতে পারে না, সবগুলিকে ত দূরের কথা, সেই হেতু উহা প্রতি ক্ষেত্রে নানা আদর্শ ও ধর্ম খাড়া করে, সত্য ও যুক্তির আদর্শ, ন্যায় ও সদাচারের আদর্শ, আনন্দ ও সৌন্দর্যের আদর্শ, প্রেম, সহানুভূতি ও ঐক্যের আদর্শ, আত্মজয় ও সংযমের আদর্শ, আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার ও প্রাণিক দক্ষতা ও ভোগের আদর্শ—এবং সেই সব দিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। চরম সমুজ্জ্বল আদর্শগুলি বহু ঊর্ধ্বে আমাদের সামর্থ্যের অতীত থাকিয়া যায়, ক্বচিৎ কেহ যথাসাধ্য তাহাদের নিকটবর্তী হয়; জনসাধারণ কোন অপেক্ষাকৃত কম গৌরবময় প্রতিমান, কোন গতানুগতিক সুসাধ্য ও সীমাবদ্ধ নীতিই অনুসরণ করে। মানবজীবন মোটের উপর আদর্শটির আকর্ষণ অনুভব করে,

অথচ উহাকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রাণের আছে তাহার নিজস্ব একটি অস্পষ্ট অনন্ত সত্তা, তাহারই শক্তিতে সে সকল প্রতিষ্ঠিত মানসিক বা নৈতিক বিধি-বিধানকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে ক্ষয় করিয়া দেয়, বা ভাঙিগয়া দেয়। আর এইরূপই হইতে বাধ্য, কারণ মন ও প্রাণ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিসদৃশ তত্ত্ব হইয়াও পরস্পরের সংস্পর্শে আসিযা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে অথবা প্রাণের যে সমগ্র সত্য মন তাহার প্রকৃত সূত্রের সন্ধান জানে না। সে সূত্রের সন্ধান করিতে হইবে মহত্তর কোন বস্তুর মধ্যে, মানুষের মন ও নৈতিকতার ঊর্ধ্বে কোন অজ্ঞাত তত্ত্বের মধ্যে।

এইরূপ কোন একটি ঊর্ধ্বতন তত্ত্ব সম্বন্ধে মনের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আছে, মন তাহার বিভিন্ন চরম আদর্শসকলের অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায়ই ইহার সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। সে এমন এক অবস্থা, এক শক্তি, এক প্রভাবের আভাস পায় যাহা তাহার সন্নিকট, তাহার অন্তরস্থিত ও অন্তরতম, অথচ তাহা অপেক্ষা অমিতভাবে মহত্তর এবং বিশেষভাবে তাহা হইতে দূরবর্তী ও তাহার ঊর্ধ্বে স্থিত; সে এমন একটি জিনিস দেখিতে পায় যাহা তাহার নিজের পূর্ণতম আদর্শসকল অপেক্ষাও অধিকতর সারভূত, অধিকতর পূর্ণ, অন্তরতম, অনন্ত, অদ্বিতীয়, এবং সেইটিকেই আমরা ভগবান, আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করি। তখন মন এইটিকে জানিতে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে, ইহাকে স্পর্শ করিতে এবং সমগ্রভাবে ধরিতে প্রয়াস করে, ইহার সন্নিকটবর্তী হইতে অথবা ইহাই হইয়া উঠিতে প্রয়াস করে, সেই আশ্চর্যময় বস্তুর সহিত কোনরূপ ঐক্যে উপস্থিত হইতে অথবা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলীন করিতে প্রয়াস করে। সমস্যা হইতেছে এই যে, মনের চরম আদর্শগুলি অপেক্ষাও এই আত্মা নিজ বিশুদ্ধ সত্তায় জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিসকল হইতে অধিকতর দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়; মন তাহাকে নিজের ভাবে প্রকট করিতে পারে না, জীবন ও কর্মের মধ্যে প্রকট করা ত দূরের কথা। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, চরম অধ্যাত্মবাদীগণ মানসিক সত্তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, শারীরিক সত্তাকে ধিক্কৃত করেন, এবং প্রাণ ও মন লইয়া আমরা যাহা কিছু হইয়াছি সে-সবকে লয় করিয়া বিনিময়ে যে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা লাভ করা যায়, নির্বাণ লাভ করা যায়, তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। এই সব গোঁড়া অধ্যাত্মবাদীর নিকট অধ্যাত্ম সাধনার আর সব কিছু হইতেছে মনকে প্রস্তুত করা অথবা একটা আপোষ করা, প্রাণ ও মনকে যতদূর সম্ভব অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা। আর কার্যত যে সমস্যাটি মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিব্রত করে সেটি হইতেছে তাহার প্রাণ-সত্তার বিভিন্ন দাবি, তাহার জীবন ও আচরণ ও কর্মের সমস্যা, সেইজন্য ঐরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিবার সাধনায় প্রধান লক্ষ্য হয় হৃদয়বৃত্তির

দ্বারা সমর্থিত নৈতিক মনকে অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা—অথবা উহা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শুচিতা আনিয়া নৈতিক মনকে ও হৃদয়কে তাহাদের নিজ নিজ চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে, ন্যায় ও সত্য আচরণের নৈতিক আদর্শকে অথবা প্রেম ও সহানুভূতি ও ঐক্যের হৃদ্‌গত আদর্শকে জীবন যে মর্যাদা দেয় তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর মর্যাদা আনিয়া দেয়। এই গুলিকে এক উচ্চতম অভিব্যক্তি দেওয়া যায়, তাহাদের এক প্রশস্ততম জ্ঞানময় ভিত্তি পাওয়া যায় যখন বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ইহাদের অন্তরতম সত্যরূপে আত্মার চরম একত্বকে স্বীকার করিয়া লয়, এবং সেইজন্য সকল জীবের মূলগত একত্বকে স্বীকার করিয়া লয়। এই রকমেব আধ্যাত্মিকতাকে মানুষের সাধারণ মনের দাবির সহিত কোনরূপে যুক্ত করা হয়, তাহা হিতকর সামাজিক কর্তব্য এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রচলিত বিধিবিধানকে স্বীকার করিয়া লয়, বিশিষ্ট মতবাদ ও অনুষ্ঠান ও রূপকের সাহায্যে তাহাকে জনপ্রিয় করা হয়; এইরূপ আধ্যাত্মিকতা এই ভাবেই জগতের মহত্তর ধর্মগুলির বাহ্য তত্ত্ব হইয়াছে। এই সকল ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ হয়, এক উচ্চতর জ্যোতির আভাস আনিয়া দেয়, এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক বা অর্ধ-আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতিচ্ছায়া লইয়া আইসে, কিন্তু তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধিপ্রদ হয় না, শেষ পর্যন্ত কোনরূপ একটা আপোষেই পরিণত হয়, এবং সেইরূপ আপোষ করিতে গিয়া জীবনের নিকট পরাজিত হয়। জীবনের সমস্যাগুলি থাকিয়াই যায়, এমন কি তীব্রতম রূপ লইয়া পুনঃ-পুনঃ আবির্ভূত হয়—কুরুক্ষেত্রের ঘোর সমস্যা ইহারই একটি দৃষ্টান্ত। আদর্শবাদী বুদ্ধি এবং নৈতিক মন সকল সময়েই আশা করে এই সমস্ত সমস্যা দূর করিয়া দিবে, তাহাদের নিজ অভীপ্সা হইতে উদ্ভূত কোন শুভ কৌশল আবিষ্কার করিবে এবং তাহাদের নির্বন্ধাতিশয়তার দ্বারা তাহাকে কার্যে পরিণত করিবে, তাহাই জীবনের এই নিম্নতন অশুভ দিকটাকে বিনষ্ট করিয়া দিবে; কিন্তু এইটি থাকিয়াই যায়, বিদূরিত হয় না। অন্যপক্ষে অধ্যাত্মভাবাপন্ন বুদ্ধি ধর্মের ভিতর দিয়া পরকালে এক পরম সুখময় জীবনের আশা দেয় বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে পার্থিব জীবনের অক্ষমতা সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত হইয়া, জীব পৃথিবীতে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, এখানে তাহার স্থান নহে এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ঘোষণা করে যে, বস্তুত পক্ষে এখানে এই দেহের জীবনে বা মর-মানবের সমষ্টিগত জীবনে নহে, পরন্তু ইহজগতের ঊর্ধ্বে কোন অমর লোকেই স্বর্গ বা নির্বাণ রহিয়াছে, কেবল সেইখানেই প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যাইতে পারে।

এইখানে গীতা ভগবান সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর ও জগৎ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যের এক নূতন পরিকল্পনা আনিয়া দিয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ

হইতে পরবর্তী দার্শনিক চিন্তা যে-সত্যের বিকাশ করিয়াছিল গীতা তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে, নূতন রূপ দিয়াছে, এবং তাহার আলোকে জীবন ও কর্মের সমস্যার সমাধান করিতে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা যে সমাধান উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে আধুনিক মানবের সম্মুখে সমস্যাটি যে-ভাবে উঠে তাহার সমগ্র মীমাংসা হয় না; গীতার শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মনের জন্য কথিত হইয়াছিল, অতএব সমষ্টিগত প্রগতির জন্য আধুনিক মনের যে প্রবল দাবি গীতায় তাহার কোন সমাধান করা হয় নাই; এখন এক মহত্তর বুদ্ধিগত ও নৈতিক আদর্শকে এবং সম্ভব হইলে এক জীবন্ত অধ্যাত্ম আদর্শকে সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য আধুনিক মানব-মন যে আন্দোলন করিতেছে গীতা তাহাতে কোন সাড়া দেয় নাই। গীতার আবেদন হইতেছে ব্যক্তির প্রতি, পূর্ণ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে এমন ব্যক্তির প্রতি, পরন্তু মানবজাতির অবশিষ্ট অংশের জন্য গীতার ব্যবস্থা—ক্রমিক প্রগতি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমবর্ধমান বুদ্ধির আলোক ও নৈতিক প্রেরণা লইয়া এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ স্বভাবের অনুসরণ করিলে ইহা সুসঙ্গতভাবে সিদ্ধ হইবে। গীতার বাণী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সমাধানকেও স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যখন আংশিকভাবে গ্রহণও করা হইয়াছে তখনও তাহা করা হইয়াছে তাহাদের ঊর্ধ্বে যে উচ্চতর ও অধিকতর সমগ্র রহস্য রহিয়াছে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য—সেই গূঢ় সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা এখনও খুব কম লোকেই অর্জন করিয়াছে।

যে-বুদ্ধি প্রাণ ও দেহের জীবন অনুসরণ করিতে চায় তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, সত্য বটে সকল জীবনই হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্ব-শক্তির প্রকাশ, তাহা আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, ভগবানের একটি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু বস্তুত তাহার মধ্যে আত্মার ও ভগবানের প্রকাশ হইতেছে আবরণকারী মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, আর শুধুই নীচের জীবন অনুসরণ করার অর্থ হইতেছে বিপথে বিচরণ করা এবং আমাদের প্রকৃতির তমোময় অজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া, পরন্তু তাহাতে জীবনের সত্যিকারের সত্যকে এবং পরিপূর্ণ ধর্মকে আবিষ্কার করা হয় না। জীবনের স্পৃহা, ক্ষমতার স্পৃহা, বাসনার পরিতৃপ্তি, কেবল তেজ ও বিক্রমকেই গৌরব দেওয়া, অহংএর উপাসনা করা এবং ইহার দুর্বার স্বেচ্ছাচারী অর্জন-প্রবৃত্তি ও অক্লান্ত অহংমুখী বুদ্ধির উপাসনা করা—ইহা হইতেছে অসুরের ধর্ম, ইহা মানুষকে মহতী বিনষ্টির দিকেই লইয়া যায়। প্রাণ ও দেহের বশ মানবকে নিজের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন শাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে, ধর্মগত, সমাজগত, আদর্শগত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এইভাবে সে বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম উপভোগ করিয়া

তাহার নীচের প্রকৃতিকে সংস্কৃত ও সংযত করিতে পারিবে, এবং তাহাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের এক উচ্চতর ধর্মের সহিত নিখুঁতভাবে সুসংগত করিতে পারিবে।

যে-বুদ্ধি যুক্তিগত নীতিগত ও সামাজিক আদর্শের অনুসরণেই ব্যাপৃত, যে-বুদ্ধি প্রচলিত ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠানের দ্বারা অথবা বিমুক্ত বুদ্ধি যে-সব সমাধান দেয় সেই সবের দ্বারাই পরমার্থ লাভ করিতে চায় তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে—এইটি যে এক অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, ধর্মকে পালন করিতে হইবে এবং যথাযথভাবে উহা পালিত হইলে উহা আন্তর সত্তাকে সমুন্নত করিতে পারে এবং অধ্যাত্ম জীবনকে প্রস্তুত করিতে ও সাহায্য করিতে পারে, তথাপি এইটিই জীবনের সমগ্র ও চরম সত্য নহে। মানবীয় আত্মাকে উহা ছাড়াইয়া মানবের অধ্যাত্ম ও অমৃতময় প্রকৃতির এক পূর্ণতর ধর্মের মধ্যে উঠিতে হইবে। আর ইহা সাধিত হইতে পারে কেবল যদি আমরা নিম্নতন মনের অজ্ঞান সৃষ্টি-সকলকে এবং অহমাত্মক মিথ্যা ব্যক্তিত্বকে দমিত করি, বর্জন করি, বুদ্ধি ও সংকল্পের ক্রিয়াকে নির্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করি, সর্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া বাস করি, অহংয়ের সকল গন্ডীকে ভাঙিয়া নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। মনকে ত্রিগুণাত্মিকা নীচের প্রকৃতির সীমাবদ্ধকারী প্রভাবের অধীনে চলিতে হয়, সে তাহার আদর্শসকল তমোগুণ কিংবা রজোগুণ অথবা উচ্চতম অবস্থায় সত্ত্বগুণের অনুসরণে গঠন করে, কিন্তু মানবাত্মার ভবিতব্য হইতেছে এক দিব্য সিদ্ধি ও মুক্তি এবং তাহা কেবল আমাদের ঊর্ধ্বতম আত্মার স্বাধীনতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কেবল ইহার বিশাল নির্ব্যক্তিকতা ও সর্বব্যাপকতার ভিতর দিয়া মনের ঊর্ধ্বে যাইয়া অপরিমেয়, সর্বধর্মের অতীত ভগবান ও পরম অনন্তের সমগ্র জ্যোতির মধ্যেই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

অনন্তের যে-সব চরম-পন্থী উপাসক নির্ব্যক্তিকতাকে চূড়ান্ত সীমায় লইয়া যায়, জীবন ও কর্মকে নির্মূল করিবার জন্য অসহিষ্ণু আবেগ পোষণ করে, অনির্বচনীয় পরমাত্মার শুদ্ধ নীরবতায় সকল ব্যষ্টিগত সত্তার লয় করার প্রয়াসকেই একমাত্র চরম লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে তাহাদের প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, অবশ্য এইটিও হইতেছে একটি পন্থা এবং অনন্তের মধ্যে প্রবেশের দ্বার, কিন্তু এইটি হইতেছে সর্বাপেক্ষা দুরূহ, উপদেশ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা জগতের সম্মুখে নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ ধরা বিপজ্জনক, এই পন্থা মহৎ হইলেও এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, এই জ্ঞান সত্য হইলেও এইটি সমগ্র সত্য নহে। পরম সদ্বস্তু, সর্বচৈতন্যময় আত্মা, ভগবান, অনন্ত কেবল দূরবর্তী ও অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম সত্তা নহেন, তিনি এইখানে

এই বিশ্বমাঝেই বিরাজিত রহিয়াছেন মানুষের মধ্যে, দেবতার মধ্যে, সকল জীবের মধ্যে, যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে তিনি যুগপৎ প্রকট ও অপ্রকট। তাঁহাকে শুধু কোন অক্ষর নীরবতার মধ্যেই নহে পরন্তু জগতের মধ্যে, জগতের সকল জীবের মধ্যে, সকল আত্মা ও সকল প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিয়া, বুদ্ধি, হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণের সকল ক্রিয়াকে উন্নীত করিয়া, তাঁহার সহিত সর্বাঙ্গীন ও সর্বোচ্চ যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ একই সঙ্গে আত্মা ও ভগবানের আন্তর রহস্যের এবং নিজ সক্রিয় মানবজীবনের বাহ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ভগবত্তুল্য হইয়া, ভগবানের সাধর্ম্যলাভ করিয়া সে যে পরম অধ্যাত্ম চৈতন্যের অনন্ত প্রসারতা উপভোগ করিতে পারে তাহা যেমন প্রেম ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তেমনিই সমানভাবে কর্মের ভিতর দিয়া লব্ধ হয়। এইভাবে অমৃত ও মুক্ত হইয়া সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্মে রত থাকিতে পারে এবং ইহাকে পরম ও সর্বতোমুখী দিব্য কর্মে পরিণত করিতে পারে—বস্তুত সেইটিই হইতেছে ইহলোকে সকল কর্ম, জীবনযাত্রা ও আত্মত্যাগের, সংসারের সকল প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

এই উচ্চতম বাণী প্রথমত হইতেছে তাঁহাদের জন্য যাঁহাদের ইহা অনুসরণ করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁহারা মহাত্মা, ভগবদ্-জ্ঞানী, ভগবদ্-কর্মী, ভগবদ্-প্রেমী, যাঁহারা ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানের জন্য জীবনধারণ করিতে এবং জগতে সানন্দে তাঁহার জন্য কর্ম করিতে পারেন—সে-কর্ম মানব-মনের অশান্ত অন্ধকার এবং অহংএর মিথ্যা বন্ধন-সকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত দিব্য কর্ম। সেই সঙ্গেই গীতা বলিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে সকল মানুষই, মানুষের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধম ও পাপী তাহারাও এই যোগের পথে প্রবেশ করিতে পারে; এইখানেই আমরা একটি উদারতর আশ্বাসের ইঙ্গিত পাই, সেটিকে আমরা সমষ্টিগত সিদ্ধির আশ্বাস বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি—কারণ যদি মানবের আশা থাকে তবে মানব-জাতিরই বা আশা থাকিবে না কেন? আর আত্মসমর্পণ যদি যথার্থ হয় এবং অন্তর্যামী ভগবানের উপর যদি একান্ত অহংশূন্য বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে এই পথে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সুনিশ্চিত পরিবর্তনটি প্রয়োজন, অধ্যাত্মের উপর অটল বিশ্বাস চাই, ভগবানের মধ্যে বাস করিবার, আত্মায় তাঁহার সহিত এক হইবার এবং প্রকৃতিতে (এখানেও আমরা তাঁহার সত্তার অংশ, মমৈবাংশঃ) তাঁহার মহত্তর অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত এক হইবার, আমাদের সত্তার সকল স্তরে ভগবান কর্তৃক অধিকৃত এবং ভগবত্তুল্য হইবার আন্তরিক ও অব্যভি-চারী সঙ্কল্প চাই।

গীতা তাহার মতটির বিকাশ করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব,

বিশ্বলীলার অর্থ, মুক্ত পুরুষের চরম গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিয়াছে—এই সব প্রশ্ন লইয়া অন্তহীন বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। এই প্রবন্ধমালায় সে-সব প্রশ্নের আলোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা নাই, এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে গীতার সারশিক্ষার অনুসন্ধান করা এবং সেইটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা, আর মানবজাতির সনাতন অধ্যাত্ম চিন্তাধারায় ও জীবন্ত সাধনায় গীতার অবদান কি সেইটি দেখাইয়া দেওয়া। গীতার দৃষ্টিভঙ্গী, গীতার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মতভেদ কোনখানে, কোনখানে আমরা গীতার মতে সায় দিতে পারি না, এমন কি পরবর্তী অনুভূতি উপলব্ধির জোরে কোনখানে আমরা গীতার দার্শনিক মত বা গীতার যোগকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারি—সে-সবের আলোচনারও এখানে প্রয়োজন নাই। চির-সন্ধানী চির-আবিষ্কারক মানবকে তাহার বর্তমান পরিক্রমণে এবং তাহাব আত্মার জ্যোতির্ময় শিখরে তাহার জীবনকে উন্নীত করিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দূরূহতর ঊর্ধ্ব অভিযানে পথ দেখাইবার জন্য গীতা এখনও যে জীবন্ত বাণী বহন কবিয়া আনিতেছে সেইটি বিবৃত করিয়াই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যথেষ্ট হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গীতার বাণী

গীতার বাণীটি, গীতার দিব্যগুরুর কথাটি আমরা এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে পারি—"কর্মের রহস্য এবং সমস্ত জীবন ও জগতের রহস্য একই। জগৎ প্রকৃতির কেবল একটা যন্ত্রমাত্র নহে, এমন একটা নিয়মের চক্র নহে যাহার মধ্যে জীব ক্ষণিকের জন্য অথবা যুগ যুগান্তের জন্য বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা হইতেছে অধ্যাত্মের নিরন্তর অভিব্যক্তি। জীবন শুধু জীবনের জন্যই নহে, পরন্তু ভগবানের জন্য, আর মানুষের জীবাত্মা হইতেছে ভগবানেরই সনাতন অংশ। কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্ম-সন্ধান, আত্ম-পূর্তি, আত্ম-সংসিদ্ধি; বর্তমান মুহূর্তে বা ভবিষ্যতে কর্মের যে বাহ্য ও দৃশ্য ফল শুধু তাহার জন্যই কর্ম নহে। সকল জিনিসেরই একটি আভ্যন্তরীণ ধর্ম আছে, অর্থ আছে—তাহা অধ্যাত্ম সত্তার পরমা প্রকৃতি ও ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়েরই উপর নির্ভর করে; কর্মের প্রকৃত সত্য রহিয়াছে সেইখানে, মন ও কর্মের বাহ্যরূপে সেটি কেবল গৌণভাবে, অপূর্ণভাবে এবং অজ্ঞানের দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া প্রতিফলিত হইতে পারে। অতএব কর্মের পরম নির্দোষ উদারতম নীতি হইতেছে তোমার নিজের সত্তার উচ্চতম ও অন্তরতম সত্যটি আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যেই জীবনযাপন করা, পরন্তু কোন বাহ্যিক আদর্শ বা ধর্ম অনুসরণ করা নহে। যতক্ষণ না তাহা হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল জীবন, সকল কর্ম ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থাকিবে, একটা দুরূহতা, একটা দ্বন্দ্ব, একটা সমস্যাস্বরূপ হইয়া থাকিবে। কেবল মাত্র তোমার প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করিয়া এবং তাহার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবনযাপন করিয়াই সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইতে পারে, দুরূহতা ও দ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত হইতে পারে এবং তোমার কর্মাবলী আবিষ্কৃত আত্ম ও অধ্যাত্ম সত্তার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া প্রকৃত দিব্য কর্মে পরিণত হইতে পারে। অতএব তোমার আত্মাকে জান; তোমার প্রকৃত আত্মাকে ভগবান বলিয়া এবং অন্য সকলের আত্মার সহিত এক বলিয়া জান; তোমার ব্যষ্টিগত সত্তাকে, অন্তঃপুরুষকে ভগবানের অংশ বলিয়া জান। আর যাহা জান সেই জ্ঞানে জীবনযাপন কর; আত্মায় জীবনযাপন কর, তোমার পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে জীবনযাপন কর, ভগবানের সহিত যুক্ত ও ভগবত্তুল্য হও। প্রথমে তোমার সকল কর্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিয়া দাও তাঁহাকে যিনি তোমার অভ্যন্তরে

াত্তম ও একমেব সত্তা, যিনি জগতের মধ্যেও সর্বোত্তম ও একমেব সত্তা; শেষে তুমি যাহা কিছু এবং তুমি যাহা কিছু কর সে-সবকেই তাঁহার হস্তে র্পণ করিয়া দাও যেন পরম ও বিশ্বপুরুষ তোমার ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার কর্ম সম্পন্ন করেন। তোমার সমস্যার এই সমাধানই আমি দিতেছি এবং তুমি দেখিবে যে ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন সমাধানই নাই"।

যে মূলগত বিরোধ লইয়া ভারতের সকল শিক্ষার ন্যায় গীতারও আরম্ভ সেই সম্বন্ধে গীতার মতটি এখানে বিবৃত করা আবশ্যক। এই যে সত্য আত্মার সন্ধান লাভ, আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ইহা সহজ জিনিস নহে; আর এই জ্ঞান যদিও বা মনের দ্বারা দেখা যায়, ইহাকে আমাদের চৈতন্যের উপাদানে পরিণত করা, আমাদের কর্মের সমগ্র ভিত্তি করাও সহজ নহে। সকল কর্মই নির্ধারিত হয় আমাদের সত্তার কার্যকরী অবস্থা দ্বারা, আর আমাদের সত্তার কার্যকরী অবস্থা নির্ধারিত হয় আমাদের নিত্য আত্মদর্শী সংকল্প ও সক্রিয় চৈতন্যের অবস্থা দ্বারা এবং তাহার কর্মশীলতার ভিত্তি দ্বারা। আমরা নিজেরা কি, জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধসমূহের অর্থ কি তাহা আমরা আমাদের সমগ্র সক্রিয় চৈতন্য লইয়া যে-ভাবে দেখি ও বিশ্বাস করি, আমাদের শ্রদ্ধা যেরূপ হয় তাহাই আমাদের স্বরূপ গঠিত করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষের চৈতন্য হইতেছে দ্বিবিধ এবং জগতের দ্বিবিধ সত্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে; এক হইতেছে আভ্যন্তরীণ সত্তার সত্য এবং অপরটি হইতেছে বাহ্য দৃশ্যের সত্য। এই উভয় সত্যের যেটির মধ্যে মানুষ বাস করে তদনুসারে সে হয় মানবীয় অজ্ঞানের মধ্যে অধিবাসী মনোময় সত্তা অথবা দিব্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম সত্তা।

বাহ্যত দেখিলে মনে হয় যে, জগতের সত্য হইতেছে কেবল মাত্র তাহাই যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, উহা সেই শক্তি যাহা সত্তার সমগ্র ধারা ও যন্ত্ররূপে কার্য করে, আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার জীব যে বাহ্য জগতে বাস করে তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়রূপে মন এবং ইন্দ্রিয়গণকেও সৃষ্টি করে। এই বাহ্য দৃশ্যে মানুষ তাহার আত্মা, তাহার মন, তাহার প্রাণ, তাহার শরীর লইয়া মনে হয় যেন প্রকৃতিরই সৃষ্টি, শরীর, প্রাণ এবং মনের ভেদের দ্বারা, বিশেষত তাহার অহংবোধের দ্বারা সে অন্যান্য মানব হইতে ভিন্ন—এই অহংবোধ হইতেছে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, মানুষের জন্য প্রকৃতি এইটি গঠন করিয়া দিয়াছে যেন সে এই সব প্রবল পার্থক্য ও বিভেদের চেতনাকে দৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার মনোময় সত্তা এবং ইহার কর্ম, তাহার প্রাণ ও শরীরের ক্রিয়া এ-সবই যে তাহার নিজ প্রকৃতির ধর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়, ইহার বাহিরে যাইতে পারে না, অন্যভাবে কার্য করিতে

পারে না তাহা খুবই সুস্পষ্ট। অবশ্য সে মনে করে যে, তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার, তাহার অহংয়ের ইচ্ছার কতকটা স্বাধীনতা আছেই; কিন্তু বস্তুত ঐ স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ কিছুই নহে, কারণ তাহার অহং হইতেছে কেবল একটা অনুভূতি যাহার বশে সে প্রকৃতি তাহাকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছে সেইটির সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল মন, প্রাণ ও দেহ রচনা করিয়াছে তাহাদের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে। তাহার অহংটিও প্রকৃতির কর্মধারা হইতে উৎপন্ন, আর তাহার অহংয়ের স্বরূপ যেমন, অহংয়ের ইচ্ছার স্বরূপও সেই প্রকার হইবে এবং তদনুযায়ী সে কর্ম করিতে বাধ্য, অন্য কিছু সে করিতে পারে না।

তাহা হইলে মানুষের নিজ সম্বন্ধে এইটি হইতেছে সাধারণ চেতনা, তাহার আপন সত্তা সম্বন্ধে এইটিই হইতেছে তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, সে প্রকৃতির সৃষ্ট একটি জীব, সে পৃথক অহং, অপরের সহিত এবং জগতের সহিত সে যে-কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিজের যে-কোন বিকাশ সাধন করে, তাহার যে-কোন সংকল্প, বাসনা, মানসিক পরিকল্পনা প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব এবং তাহাব জীবনে প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য বা ধারা তাহার অনুগত সে-সবকে সে চরিতার্থ করে।

তবে মানুষের চৈতন্যের মধ্যে এমন একটা জিনিস রহিয়াছে যাহা এই সূত্রের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়ে না; জগতের অন্য এক তত্ত্বের উপর, এক আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের উপর তাহার শ্রদ্ধা আসে, তাহার অন্তরাত্মার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই শ্রদ্ধাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই আভ্যন্তরীণ তত্ত্বে জগতের সত্য আর প্রকৃতি নহে, আত্মা—প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষই অধিকতর সত্য। প্রকৃতি নিজেই আত্মাব শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রকৃতি হইতেছে পুরুষের শক্তি। আত্মা, পুরুষ, সর্বভূতের মধ্যে এক অদ্বিতীয় সত্তাই হইতেছে জগতের ঈশ্বর, জগৎ তাহারই কেবল আংশিক অভিব্যক্তি। সেই পুরুষই হইতেছে প্রকৃতির এবং তাহার কর্মের ধারক এবং অনুমন্তা, পুরুষের অনুমতির কল্যাণেই প্রকৃতির নিয়ম হয় অলঙ্ঘনীয়, তাহার শক্তি ও শক্তির ধারাসকল হয় কার্যকরী। প্রকৃতির অন্তঃস্থিত সেই পুরুষই হইতেছে জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃতিকে আলোকিত করেন এবং আমাদের মধ্যে তাহাকে সচেতন করেন, তাঁহারই অনুস্যূত ও অতিচেতন ইচ্ছা প্রকৃতির কর্মাবলীকে অনুপ্রাণিত করে, চালিত করে। মানুষের অন্তরাত্মা এই ভাগবত সত্তার অংশ এবং উহারই স্বভাবযুক্ত। আমাদের প্রকৃতি হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি, তাহারই অনুমতি অনুযায়ী কর্ম করে, নিজ গতি ও রূপ ও পরিবর্তনসকলের ভিতর দিয়া অন্তরাত্মার নিগূঢ় আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনা ও জীবন-সঙ্কল্পকে স্থূলে প্রকট করে।

আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আত্মা আমাদের বুদ্ধির নিকট লুক্কায়িত কারণ সে-বুদ্ধি আভ্যন্তরীণ বস্তুসকল সম্বন্ধে অজ্ঞান, দেহ প্রাণ মনকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করে, আমাদের এই সকল বাহ্য যন্ত্রেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মানুষের সক্রিয় সত্তা নিজ প্রাকৃত যন্ত্রসকলের সহিত একাত্মবুদ্ধি প্রত্যাহার করিতে পারে এবং নিজ আভ্যন্তরীণ সদ্‌বস্তুকে দেখিতে পায়, তাহার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া জীবনযাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহার নিকট সবই পরিবর্তিত হইয়া যায়, জীবন ও জগৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দেয়, কর্মও এক অন্য অর্থ ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন আমাদের সত্তা আর প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র অহংময় সৃষ্টি থাকে না পরন্তু এক ভাগবত অবিনাশী অধ্যাত্ম শক্তির বৃহত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের চেতনা আর সীমাবদ্ধ ও পদে-পদে বাধাপ্রাপ্ত মনোময় ও প্রাণময় জীবের চেতনা থাকে না, পরন্তু তাহা অনন্ত ভাগবত অধ্যাত্ম চেতনা হইয়া উঠে। আর আমাদেব সংকল্প ও কর্মও আর এই সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপ ও ইহার অহংয়ের থাকে না, পরন্তু তাহা হইয়া উঠে ভাগবত ও অধ্যাত্ম সংকল্প ও কর্ম, মানবরূপের ভিতর দিয়া অবাধে ক্রিয়মাণ বিশ্বাত্মক পরম সর্বময় অধ্যাত্ম সত্তার সংকল্প ও শক্তি।

মানবরূপী ভগবান অবতার দিব্যগুরুর বাণী—"এই মহান পরিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য আমি প্রকৃত অধিকারীদিগকে আহ্বান করিতেছি, আর সেই সকল লোকই অধিকারী যাহারা প্রাকৃত যন্ত্রসকলের অজ্ঞান হইতে তাহাদেব সংকল্পকে সরাইয়া লইতে পারে, অন্তঃপুরুষের গভীরতম অনুভবের দিকে, আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের দিকে, ভগবানের সহিত তাহার সংস্পর্শের দিকে, ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিবার তাহাদের শক্তির দিকে তাহার সংকল্পকে ফিরাইতে পারে। অবশ্য মানবীয় বুদ্ধির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ করা কঠিন, কারণ তাহা সর্বদা নিজের অজ্ঞানজাত ধোঁয়াটে রচনা ও অর্ধ আলোকে আসক্ত এবং মানবীয় মন, প্রাণ, শরীরের অন্ধতব অভ্যাসসকলে আসক্ত; কিন্তু একবার গ্রহণ করিতে পারিলে এইটিই হইতেছে মহান সুনিশ্চিত শ্রেয়স্কর পন্থা, কারণ এইটি হইতেছে মানুষের সত্তার প্রকৃত সত্যের সহিত এক এবং তাহার অন্তরতম ও পরমতম প্রকৃতির যথার্থ নিজস্ব প্রেরণা।

"কিন্তু এই পরিবর্তনটি হইতেছে অতিশয় মহান, এক বিরাট রূপান্তর, তোমার সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও ধর্মান্তর ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। তোমার সত্তা, তোমার প্রকৃতি, তোমার জীবন সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে ঊর্ধ্বতমের নিকটে, ঊর্ধ্বতম ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে নহে; কারণ সব কিছুকেই রাখিতে হইবে কেবল ঊর্ধ্বতমের জন্য, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবানের মধ্যে তাহা যে-ভাবে

আছে, ভগবানেরই একটি রূপ হিসাবে, ভগবানেরই নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এক নূতন সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে, আপন ও পর সম্বন্ধে, জগৎ ও ভগবান সম্বন্ধে, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞানের দিকে, একত্বের জ্ঞানের দিকে; বিশ্বাত্মক ভাগবত সত্তার জ্ঞানের দিকে তোমার মনকে সম্পূর্ণভাবে ফিরাইতে হইবে, নিবিষ্ট করিতে হইবে, প্রথমে সে-জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই গৃহীত হইবে, পরন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে হইতে হইবে আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, আত্মার চৈতন্য ও স্থায়ী অবস্থা এবং তাহার ক্রিয়াবলীর আধার।

"এমন সঙ্কল্প প্রয়োজন যাহাতে এই নূতন জ্ঞান, দৃষ্টি, চেতনাই হয় কর্মের হেতু এবং একমাত্র হেতু। আর উহা যে কর্মের হেতু হইবে তাহা যেন কুণ্ঠিত, গণ্ডীবদ্ধ কর্ম না হয়, স্বাভাবিক প্রয়োজনের কয়েকটি মাত্র প্রক্রিয়া না হয় অথবা যে কয়েকটি ক্রিয়া আনুষ্ঠানিক সিদ্ধিলাভের সহায় বলিয়া মনে হয়, ধর্মভাবের অনুকূল বা ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উপযোগী মনে হয় কেবল সেইগুলিই নহে, পরন্তু মানব-জীবনের সকল কর্মকেই সমতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভগবদর্থে ও সর্বভূতের হিতার্থে সম্পাদন করিতে হইবে। হৃদয়কে পরমতমের দিকে অনন্য আস্পৃহায়, ভগবানের অনন্য প্রেমে, অনন্য ভগবদ্ভক্তিতে সমুন্নীত করিতে হইবে। সেই সঙ্গেই চাই প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্রসারণ যাহা সর্বভূতের মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করিবে। মানুষ এখন যেমন রহিয়াছে তাহার সেই অভ্যাসগত সাধারণ প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া এক পরম ও দিব্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। এক কথায় চাই এমন যোগসাধনা যাহা হইবে একই সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের যোগ, পূর্ণ সঙ্কল্প ও কর্মের যোগ, পূর্ণ প্রেম, উপাসনা ও ভক্তির যোগ এবং সকল অংশ, অবস্থা, শক্তি ও গতি সহ সমগ্র সত্তার পূর্ণ অধ্যাত্ম সিদ্ধির যোগ।

"এই যে-জ্ঞানকে বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে, অন্তরাত্মার শ্রদ্ধার দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে, এবং মন, হৃদয় ও প্রাণে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহা হইতেছে পরম পুরুষ ও পরমাত্মাকে তাঁহার ঐক্যে এবং তাঁহার সমগ্রতায় জানা। ইহা হইতেছে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে জানা যিনি শাশ্বত, যিনি কাল, দেশ, নাম, রূপ ও প্রপঞ্চের অতীত, যিনি নিজের ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিক উভয় পদেরই বহু ঊর্ধ্বে অথচ যাহা হইতে এই সব কিছু প্রবর্তিত হইয়াছে—এই সব যাঁহাকে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি ও তাহার অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রকট করিতেছে। ইহা হইতেছে তাঁহাকে নির্ব্যক্তিক শাশ্বত অক্ষর সত্তা বলিয়া জানা, এই শান্ত ও সীমাহীন বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করি, ইহা অনন্ত, সম এবং সর্বদা একই ভাবে অবস্থিত, এই সব নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে, এইসব বহুল ব্যক্তিক সত্তা, অধ্যাত্ম সত্তা প্রাকৃত

সত্তার মধ্যে, এই অনিত্য ও আপাতদৃশ্য জগতের বহু রূপ, শক্তি ও ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছে চির অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয়। সেই সঙ্গেই আবার এই জ্ঞান হইতেছে তাঁহাকে ক্ষর পুরুষ বলিয়া জানা, মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিত্য পরিবর্তনশীল, তিনি প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, প্রত্যেক রূপে নিজেকে রূপায়িত করিতেছেন, তাঁহার শক্তির প্রত্যেক ক্রম, প্রত্যেক মাত্রা এবং প্রত্যেক ক্রিয়া অনুযায়ী নিজকে পরিবর্তিত করিতেছেন, তিনি যাহা কিছু আছে সে-সব অপেক্ষা চিরকাল অনন্তগুণে অধিক হইয়াও নিজেই সেই সব হইতেছেন, মানুষের মধ্যে, জন্তুর মধ্যে, বস্তুর মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনি বিষয়ী ও বিষয়, অন্তরাত্মা, মন, প্রাণ, ও দেহ, তিনিই প্রত্যেক সত্ত্ব, প্রত্যেক শক্তি এবং প্রত্যেক জীব।

"সত্যের কোন একটিমাত্র দিকের উপরই ঝোঁক দিলে তুমি এই যোগ অভ্যাস করিতে পারিবে না। যে-ভগবানকে তুমি লাভ করিতে চাও, যে-আত্মাকে তুমি আবিষ্কার করিতে চাও, তোমার জীবাত্মা যে পরমপুরুষের অংশ তিনি একই সঙ্গে এই সব কিছু হইয়াছেন; এক পরম ঐক্যে এই সবকে যুগপৎ জানিতে হইবে, একই সঙ্গে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সকল অবস্থায়, সকল বস্তুর মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। তিনি যদি কেবল প্রকৃতিস্থ ক্ষর পুরুষই হইতেন তাহা হইলে থাকিত শুধু চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী সংভূতি (becoming), যদি তুমি তোমার শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে ঐ একটি দিকেই নিবদ্ধ কর তাহা হইলে তুমি কখনই তোমার ব্যক্তি-রূপ ও ইহার চির-পরিবর্তনশীল আকারসকলের ঊর্ধ্বে যাইতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিষ্ঠায় তুমি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির আবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তুমি শুধুই কালস্রোতে চৈতন্যের ক্ষণপরম্পরা (Soul moments) নহ। তোমার মধ্যে এক নির্ব্যক্তিক আত্মা রহিয়াছে, তাহা তোমার পরিবর্তনশীল ব্যক্তিরূপের প্রবাহকে আধাররূপে ধরিয়া রহিয়াছে এবং সেইটি হইতেছে ভগবানের বিশাল নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত অভিন্ন। আর এখানে তোমার সত্তার সর্বদা এই যে দুইটি দিক, ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিক, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ইহাদের ঊর্ধ্বে চির বিশ্বাতীত সত্তায় তুমি হইতেছ অপরিমেয় শাশ্বত ও বিশ্বাতীত।

"আবার ইহাই যদি সত্য হয় যে, একমাত্র শাশ্বত নির্ব্যক্তিক সত্তাই আছে, তাহা কোন কর্ম করে না, সৃষ্টিও করে না, তাহা হইলে জগৎ ও তোমার জীবাত্মা হয় মিথ্যা মায়া, তাহাদের কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। আর এই একমাত্র অদ্বৈতভাবেই যদি তুমি তোমার শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে জীবন ও কর্ম পরিত্যাগ করা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে ভগবান বাস্তব সত্য, জগতের মধ্যে

তুমিও বাস্তব সত্য; জগৎ ও তুমি সেই পরমতমের সত্য ও বাস্তব শক্তি ও অভিব্যক্তি। অতএব জীবন ও কর্মকে গ্রহণ কর, উহাদিগকে বর্জন করিও না। তোমার নির্ব্যক্তিক মূল সত্তায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া, তোমার যে অধ্যাত্ম ব্যষ্টি সত্তা ভগবানের সনাতন অংশ তাহাকে প্রেম ও ভক্তিতে ভগবানের দিকে, তাহারই নিজ অনন্তের দিকে অভিমুখী করিয়া তোমার প্রাকৃত সত্তাকে ভগবৎকর্মের নিমিত্ত করিয়া দাও, ভগবানের একটি যন্ত্র, একটি শক্তি করিয়া দাও—প্রাকৃত সত্তার সৃষ্টিই হইয়াছে সেই জন্য। বস্তুত পক্ষে উহা সকল সময়েই ঐরূপ যন্ত্র, কিন্তু উহা যন্ত্র অজ্ঞানে ও অসম্পূর্ণভাবে, নীচের প্রকৃতির অধীনে, এই অবস্থায় তোমার অহংয়ের দ্বারা ভাগবতভাব বিকৃত হইয়া যায়। উহাকে অহংভাবের বিকৃতি হইতে মুক্ত করিয়া সজ্ঞানে ও পূর্ণভাবে ভগবানের পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিরই একটি শক্তি করিয়া দাও, তাঁহার ইচ্ছার, তাঁহার কর্মের একটি যন্ত্র করিয়া দাও। এইভাবে তুমি তোমার নিজেরই সত্তার সমগ্র সত্যে বাস করিবে এবং তুমি পূর্ণ ভগবদ্‌মিলন লাভ করিবে, সমগ্র ও অনবদ্য যোগ লাভ করিবে।

"পরমতম হইতেছেন পুরুষোত্তম, তিনি সকল অভিব্যক্তির ঊর্ধ্বে শাশ্বত সত্তা, তিনি অনন্ত—দেশ কাল নিমিত্তের কিংবা তাঁহার নিজ অসংখ্য গুণ, অসংখ্য লক্ষণের কোন একটির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার সহিত তাঁহার পরম শাশ্বত সত্তার কোনও সম্বন্ধ নাই, সেই সত্তায় তিনি জগৎ ও প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন, এই সব জীব হইতে পৃথক। তিনি পরম অনির্বচনীয় ব্রহ্ম, তিনি নির্ব্যক্তিক আত্মা, তিনি সকল ব্যক্তিগত সত্তা। ইহ জগতে আত্মা, প্রাণ ও জড় সত্তা; অন্তঃপুরুষ, প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যাবলী—এ-সবই হইতেছে তাঁহার অনন্ত ও শাশ্বত সত্তার বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া। তিনি বিশ্বাতীত পরমাত্মা, সব কিছু তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, সবই হইতেছে তাঁহার রূপ, তাঁহার আত্ম-বিভূতি। এক আত্মা রূপে তিনি ইহজগতে সর্বব্যাপী; মানব, পশু, স্থাবর, জঙ্গম, প্রকৃতির প্রত্যেক শক্তি—সব কিছুর মধ্যেই তিনি সমান ও নির্ব্যক্তিক ভাবে অধিষ্ঠিত। তিনি পরম পুরুষ, সকল পুরুষ হইতেছে সেই একই পুরুষের অনির্বাণ শিখা। সকল প্রাণী তাহাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিসত্তায় সেই এক পুরুষেরই সনাতন অংশ। তিনি সর্বভূতের চিরন্তন প্রভু, জগৎ ও জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। সকল কর্মের তিনিই সর্বশক্তিমান উৎস, নিজের কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, সকল কর্ম, সকল প্রয়াস, সকল যজ্ঞ তাঁহারই নিকট যাইতেছে। তিনি সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তিনিই এই সব হইয়াছেন, অথচ তিনি এই সবেরই ঊর্ধ্বে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বাতীত

ভগবান; অবতাররূপে তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হন; নিজ শক্তি দ্বারা তিনি বিভূতিতে প্রকট হইয়াছেন; সকল মানুষের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন দেবতা। মানুষ যেসকল দেবতার পূজা করে, সে-সবই হইতেছে সেই এক ভগবানের বিভিন্ন নাম ও রূপ ও মনোময় শরীর।

"পরমতম তাঁহার অধ্যাত্ম মূলতত্ত্ব হইতে জগৎকে নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে প্রকট করিয়াছেন এবং নিজেকেও নানাভাবে জগতের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। সব জিনিস হইতেছে তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই রূপ, আর তাঁহার শক্তি ও রূপের অন্ত নাই, কারণ তিনি নিজে অনন্ত। সর্বব্যাপী ও সর্বাধার নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তারূপে তিনি এই অনন্ত কালেব অভি-ব্যক্তিকে এবং বিশ্বকে সমভাবে ধরিয়া রহিয়াছেন, অনুপ্রাণিত করিতেছেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনা বা রূপের প্রতি তাঁহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি নাই, কেহ তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। এই শুদ্ধ ও সম আত্মন্ কর্ম করে না, পরন্তু নিরপেক্ষভাবে বস্তুসকলের ক্রিয়াকে ধরিয়া থাকে। তথাপি পরমতমই বিশ্বপুরুষ ও কালপুরুষরূপে নিজ বহুমুখী সৃজনীশক্তির ভিতর দিয়া জগতের সকল ক্রিয়া পরিচালন ও নির্ধারণ করিতেছেন, বিশ্বপুরুষের সেই শক্তিকেই আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করি। তিনি সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন আবার নিজ সৃষ্ট বস্তু-সকল ধ্বংস করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়েও অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যেমন বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে তেমনই ব্যষ্টির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত সত্তারূপে প্রকৃতির শক্তি দ্বারা উদ্ভব করিতেছেন, তাঁহার রহস্যের কোন ধারা প্রকৃতির গুণ ও কর্মে প্রকট করিতেছেন, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীবকে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠন করিতেছেন, সকল কর্মের সূচনা করিতেছেন, সকল কর্মকে ধরিয়া রহিয়াছেন। পরমতমই হইতেছেন এইরূপে জগতের বিশ্বাতীত আদি উৎপত্তিস্থল, সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে তিনিই বস্তু ও জীবসকলের মধ্যে নিত্য প্রকট হইতেছেন—তাই দেখিতে পাই জগতের স্বরূপ এমন অনন্ত বৈচিত্র্যময়।

"সকল সময়েই ভগবানের এই তিনটি শাশ্বত স্থিতি রহিয়াছে—অক্ষর, ক্ষর ও পুরুষোত্তম। সর্বভূতের ভিত্তি ও আধাররূপে সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক শাশ্বত অক্ষর স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা। প্রকৃতির দ্বারা সর্বভূতরূপে প্রকট সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক প্রকৃতি-স্থ ক্ষরপুরুষ। আর একই সঙ্গে যিনি এই অক্ষর ও ক্ষর উভয়ই হইতে পারেন এমন এই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তম সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছেন—তিনি শুদ্ধ নীরব আত্মা হইতে পারেন আবার সেই সঙ্গেই বিশ্বের বিবর্তনের সক্রিয় আত্মা ও প্রাণ হইতে পারেন, কারণ তিনি ক্ষরেরও অতীত, অক্ষরেরও অতীত, আবার ক্ষর অক্ষর

উভয়েরই অতীত। আমাদের মধ্যে যে জীবাত্মা রহিয়াছে তাহা এই আত্মারই একটি সত্তা, এই পরমপুরুষেরই একটি চেতন শক্তি। তিনি তাঁহার গভীরতম সত্তায় অন্তঃস্থ ভগবানকে সমগ্রতায় বহন করিতেছেন, আবার প্রকৃতিতে বিশ্বগত ভাগবত সত্তার মধ্যে বাস করিতেছেন—এই সত্তা কোন সাময়িক সৃষ্টি নহে, ইহা শাশ্বত আত্মার মধ্যে শাশ্বত অনন্তের মধ্যে চিরকাল কর্ম করিতেছে, বিহার করিতেছে।

"আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এই যে চৈতন্যময় জীব ইহা আত্মার উল্লিখিত তিনটি স্থিতির যে-কোন একটিকে অবলম্বন করিতে পারে। মানুষ এখানে প্রকৃতির ক্ষরভাবের মধ্যে এবং কেবল তাহাতেই বাস করিতে পারে, নিজের প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান, তাহার মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞান—সে জানে শুধুই প্রকৃতিকে, সে দেখে প্রকৃতি একটা যন্ত্রবৎ কার্য-কারিণী ও সৃজনকারিণী শক্তি এবং সে নিজেকে এবং অন্যান্য সকলকে প্রকৃতিরই সৃষ্ট বস্তু বলিয়া দেখে, তাহারা প্রকৃতির জগতেরই ভিন্ন-ভিন্ন অহং। এখন সে এইরূপ স্থূল দৃষ্টি লইয়াই জীবনযাপন করিতেছে, আর যতক্ষণ এইরূপই চলিবে, যতক্ষণ না সে তাহার বহির্মুখী চৈতন্যকে অতিক্রম করিবে এবং তাহার ভিতরে কি রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ তাহার সকল চিন্তা, সকল বিজ্ঞান হইবে কেবল পর্দার উপর বিকীর্ণ আলোর ছায়া মাত্র। এই অজ্ঞান সম্ভব হইয়াছে, এমন কি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, কারণ তাহার অন্তরস্থ ভগবান নিজ শক্তির আবরণের দ্বারা নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যোগমায়াসমাবৃত। তাঁহার মহত্ত্বের বাস্তবতা আমাদের অগোচর থাকিয়া যায় কারণ তিনি তাঁহার আংশিক অভিব্যক্তিতে নিজেকে নিজের সৃষ্টি ও প্রতিকৃতিসমূহের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া দিয়াছেন, এবং সৃষ্ট মনকে নিজের প্রকৃতির মায়াময় ক্রিয়াসকলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর ইহা সম্ভব হইয়াছে আরও এই জন্য যে, যে সত্য শাশ্বত অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতেছে বস্তুসকলের নিগূঢ় সত্তা তাহা তাহাদের বাহ্য রূপের মধ্যে প্রতীয়মান নহে। বহির্মুখী হইয়া আমরা যে প্রকৃতিকে দেখিতে পাই, যে প্রকৃতি আমাদের মনে, দেহে ও ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা হইতেছে একটি নীচের শক্তি, অন্য বস্তু হইতে উদ্ভূত—যাদুকরের মত সে আত্মার নানা রূপ সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মাকে তাহার রূপসকলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে, সত্যকে লুকাইয়া রাখিয়া লোককে শুধু মুখোসটি দেখাইতেছে—সে-শক্তি দিতে পারে কেবল যাহা অপকৃষ্ট ও মন্দীভূত, পরন্তু ভাগবত অভিব্যক্তির পূর্ণ শক্তি ও মহিমা ও উল্লাস ও মাধুর্য তাহার সামর্থ্যের বাহিরে। আমাদের মধ্যে এই প্রকৃতি হইতেছে অহংয়ের মায়া, দ্বন্দ্বের জট, অজ্ঞান ও গুণত্রয়ের জাল। আর যতদিন মানুষের অন্তঃপুরুষ মন, প্রাণ ও দেহের সত্তায়

বাস করিবে, তাহার আত্মায় নহে, ততদিন সে ভগবানকে দেখিতে পারিবে না, সে নিজে ও এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে যাহা তাহা সে দেখিতে পারিবে না, এই মায়াকেও জয় করিতে পারিবে না। পরন্তু এই মায়ার সৃষ্ট বস্তু ও রূপসকলকে লইয়াই যতদূর যাহা পারে করিতে হইবে।

"এই যে আলো প্রকৃত পক্ষে অন্ধকার ইহা হইতে জাগিয়া উঠিয়া শাশ্বত ও অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার জ্যোতির্ময় সত্যের মধ্যে বাস করা সম্ভব হইতে পারে, যদি মানুষ তাহার প্রকৃতির যে নীচের খেলার মধ্যে এখন বাস করিতেছে ইহা হইতে সে প্রতিনিবৃত্ত হয়। মানুষ আর তখন তাহার ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ কারার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না এই যে ক্ষুদ্র "আমি" চিন্তা করিতেছে, কর্ম করিতেছে, অনুভব করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে, স্বল্পের জন্য কতই প্রয়াস করিতেছে, নিজেকে আর কেবল এই "আমি" বলিয়াই দেখে না। সে শুদ্ধ আত্মার বিশাল ও মুক্ত নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়; সে ব্রহ্ম হয় সর্বভূতের যে এক আত্মা তাহার সহিত সে নিজেকে এক বলিয়াই জানিতে পারে। তার আর অহংজ্ঞান থাকে না, দ্বন্দ্বের দ্বারা আর সে ব্যথিত হয় না, দুঃখের বেদনা বা সুখের চাঞ্চল্য আর সে অনুভব করে না, আর কামনার বেগে সে আকর্ষিত হয় না, পাপের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় না, পুণ্যের দ্বারাও সীমাবদ্ধ হয় না। আর যদিই বা এই সব জিনিসের আভাস বর্তমান থাকে, সে দেখে, সে জানে যে সে-সব হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া, সে নিজে যে-সত্যের মধ্যে বাস করিতেছে ঐ সবকে আর তাহার অংগ বলিয়া অনুভব করে না। প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে এবং তাহার যন্ত্রবৎ রূপসকল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা হইতেছে নীরব, নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত। শান্ত, প্রকৃতির কার্যাবলীর দ্বারা অস্পৃষ্ট, সে সে-সবকে পূর্ণ সমতার সহিত দেখে, এবং নিজকে সে-সব জিনিস হইতে পৃথক বলিয়া জানে। এই অধ্যাত্ম স্থিতি লইয়া আসে এক নিথর শান্তি ও মুক্তি, ওজস্বান দিব্য জীবন নহে, পূর্ণ ও সমগ্র সিদ্ধি নহে; ইহা অনেক উচ্চ অবস্থা, তথাপি ইহা সমগ্র ভাগবত-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান নহে।

"পূর্ণতম পূর্ণতা আসিতে পারে কেবল পরমতম ও সমগ্র ভাগবতে বাস করিয়া। তখন মানুষের অন্তঃপুরুষ যে-ভগবানের সে একটি অংশ তাঁহার সহিত যুক্ত হয়; তখন সে আত্মায় ও অন্তরে সকল জীবের সহিত এক হয়, ভগবানে এবং প্রকৃতিতেও তাহাদেব সহিত একত্ব উপলব্ধি করে। তখন সে আর শুধুই মুক্ত নহে, সে পূর্ণ, পরম আনন্দে নিমজ্জিত, চরম সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত। তখনও সে আত্মাকে দেখে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা নীরবে সব বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রকৃতিকেও একটা যান্ত্রিক শক্তি বলিয়া দেখে না, যন্ত্রবৎ গুণত্রয়ের দ্বারাই সব কিছু করিতেছে বলিয়া

দেখে না, পরন্তু আত্মার শক্তি বলিয়া, আত্ম-প্রকাশশীল ভগবানের শক্তি বলিয়া দেখে। সে দেখিতে পায় যে, এই নীচের প্রকৃতি আত্মার কর্মের আভ্যন্তরীণ সত্য নহে; এক উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাগবত প্রকৃতি সম্বন্ধে সে সজ্ঞান হয়, এখন যাহা কিছু মনে, প্রাণে ও দেহে বিকলাঙ্গ রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মূল ও মহত্তর সত্য রহিয়াছে ঐ ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে, সে-সত্য এখনও পূর্ণ ভাবে প্রকট হয় নাই। নীচের মানস প্রকৃতি হইতে এই পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া সে সমস্ত অহং হইতে মুক্তি লাভ করে। সে নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারে, তাহার মূল সত্তায় সে সর্বভূতের সহিত এক এবং তাহার সক্রিয় প্রকৃতিতে সে ভগবানেরই একটি শক্তি, বিশ্বাতীত অনন্তেরই এক সনাতন অংশ। সে ভগবানের মধ্যে সব কিছুকে দেখে এবং সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখে; সে দেখে বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। সে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়, প্রিয় ও অপ্রিয় হইতে, আশা ও নিরাশা হইতে, পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত হয়। এখন হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি ও বোধের সম্মুখে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্মধারা বলিয়া প্রতিভাত হয়। সে বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বশক্তিরই একটি শিখা ও অংশরূপে জীবনযাপন করে, কর্ম করে, সে পরম ভাগবত আনন্দে, অধ্যাত্ম আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার কর্ম হয় দিব্য কর্ম এবং তাহার পদ হয় উচ্চতম অধ্যাত্ম পদ।

"ইহাই সমাধান, ইহাই মুক্তি, ইহাই হইতেছে পরমোৎকর্ষ, যাহারা অন্তরের মধ্যে দিব্য বাণী শ্রবণ করিতে পারে এবং এই শ্রদ্ধা ও জ্ঞানলাভে সমর্থ তাহাদিগকে আমি ইহা প্রদান করি। কিন্তু এই সমুচ্চ অবস্থায় উঠিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, মূলীভূত প্রয়াস হইতেছে তোমার নিম্নতর প্রকৃতির যাহা কিছু সে-সব হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া এবং নিজেকে সঙ্কল্প ও বুদ্ধির একাগ্রতা দ্বারা সঙ্কল্প বা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে, মন, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও দেহের ঊর্ধ্বে যাহা রহিয়াছে, তাহাতে স্থির নিবদ্ধ হওয়া। আর সর্ব প্রথমেই তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার নিজের শাশ্বত ও অক্ষর আত্মাকে—তাহা নির্ব্যক্তিক এবং সর্বভূতের মধ্যে এক। যতক্ষণ তুমি অহংয়ের মধ্যে, মানসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাস করিবে, তোমাকে অন্তহীন ভাবে একই চক্রে ঘুরিতে হইবে, তুমি প্রকৃত মুক্তির পথ পাইবে না। তোমার সঙ্কল্পকে ভিতর দিকে হৃদয় ও হৃদয়ের কামনাসকলের অতীতে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ-সকলের অতীতে ফিরাও; উহাকে ঊর্ধ্ব দিকে মন এবং মনের সংস্কার ও আসক্তিসকলের অতীতে, মনের সঙ্কীর্ণ ইচ্ছা ও চিন্তা ও প্রেরণার অতীতে উত্তোলন কর। তোমার মধ্যে এমন একটা কিছুতে উপনীত হও যাহা শাশ্বত, চির-অপরিবর্তনীয়, শান্ত, অচঞ্চল, সর্বত্র সমভাবাপন্ন, সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনার প্রতি পক্ষপাতশূন্য, কোন কর্ম তাহাকে ক্ষুন্ন করিতে পারে না,

প্রকৃতির কোন রূপায়ণে তাহার কোন ইতর বিশেষ হয় না। সেইটিই হও, শাশ্বত আত্মা হও, ব্রহ্ম হও, ব্রহ্মভূতঃ। যদি তুমি স্থায়ী অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তাহা হইতে পার তাহা হইলে তুমি এক নিশ্চিত ভিত্তি পাইবে, তোমার মন-সৃষ্ট ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া, অহং হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, শান্তি ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুতির আর কোন আশংকাই থাকিবে না।

"এইভাবে তোমার সত্তাকে নির্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ তুমি তোমার অহংয়ের প্রতি এবং অহংএর সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে সে-সবের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। কামনা এবং যে-সবল রিপুর আবেগ কামনা হইতে উদ্ভূত হয়—এইগুলিই হইতেছে অহংয়ের প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি। কামনাই তোমাকে "আমি" "আমার" করিয়া ঘুরাইয়া মারে, দৃঢ়ানুবন্ধ অহংভাবের ভিতর দিয়া তোমাকে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, রাগ ও দ্বেষ, আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখ—এই সব দ্বন্দ্বের অধীন করিয়া রাখে, তোমাকে তুচ্ছ ভালবাসা ও ঘৃণার বশ করে, সাফল্য ও প্রিয় জিনিসে তোমাকে আসক্ত করে, অসাফল্য ও অপ্রিয় জিনিসে তোমাকে দুঃখ ও ব্যথার অধীন করে। কামনা সকল সময়েই মনে ভ্রান্তি আনিয়া দেয়, সংকল্পে সংকীর্ণতা আনিয়া দেয়, সকল জিনিসকে অহংভাবের বশে বিকৃত করিয়া দেখায়, জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন ও বিফল করে। কামনা ও তাহার আনুষঙ্গিক আসক্তি ও উগ্রতা হইতেছে পাপ ও ভ্রান্তির প্রথম সুদৃঢ় মূল। যতক্ষণ তুমি কামনা পোষণ করিবে ততক্ষণ নিষ্কলুষ শান্তির নিশ্চয়তা নাই, জ্যোতির স্থিরতা নাই, স্থির বিশুদ্ধ জ্ঞান নাই। ততক্ষণ শুদ্ধ সত্তা নাই—কারণ কামনা হইতেছে আত্মার বিকৃতি—এবং শুদ্ধ চিন্তা, কর্ম ও অনুভবের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যে-কোন রূপ ধরিয়াই কামনাকে থাকিতে দেওয়া হউক, অতি বড় জ্ঞানীদেরও তাহা হইতে সতত বিপদের কারণ, যে-কোন মুহূর্তে তাহা মনকে সুদৃঢ়তম ও নিশ্চিততম লব্ধ ভূমি হইতে সূক্ষ্মভাবে কিংবা উগ্রভাবে বিচ্যুত করিতে পারে। কামনা হইতেছে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির প্রধান শত্রু।

"অতএব কামনাকে বধ কর; বাহ্যত জিনিসসকলকে অধিকার করিবার ও ভোগ করিবার আসক্তি বর্জন কর। যাহা কিছু তোমার কাছে বাহ্যস্পর্শ বা প্রলোভনরূপে আসিতেছে, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আসিতেছে সে-সমুদয় হইতে নিজেকে পৃথক কর। ষড়রিপুর সকল বেগকে সহ্য করিতে ও বর্জন করিতে অভ্যাস কর, যখন তাহারা তোমার আধারে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে তখনও তোমার আভ্যন্তরীণ আত্মায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকা অভ্যাস কর, যতক্ষণ না তাহারা আর তোমার প্রকৃতির কোন অংশকেই ক্ষুব্ধ করিতে

না পারে। ঠিক সেই ভাবেই সুখ-দুঃখের প্রবল আক্রমণ সহ্য কর, এমন কি তাহাদের সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতমাত্র স্পর্শকেও সরাইয়া দাও। রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ কর, অনুরক্তি বা ঘৃণা বিনষ্ট কর, সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণা নির্মূল কর। তোমার সমস্ত প্রকৃতিতে এই সব জিনিসের প্রতি এবং সকল কাম্য বস্তুর প্রতি থাকুক শুধু শান্ত উপেক্ষা। নির্ব্যক্তিক আত্মার নীরব ও শান্ত দৃষ্টি লইয়া সে-সবকে দেখ।

"ইহার ফল হইবে সেই পূর্ণতম সমতা এবং অবিকম্প শান্তির শক্তি যাহা বিশ্বাত্মা তাহার সৃষ্টির সম্মুখে, সর্বদা প্রকৃতির বিচিত্র কার্যাবলীর সম্মুখে অটুট রাখে। সমদৃষ্টি লইয়া দেখ; সফলতা ও বিফলতা, মান ও অপমান, মানুষের প্রশংসা ও প্রেম এবং তাহাদের ঘৃণা ও নির্যাতন, যে-কোন ঘটনা অপরকে সুখ আনিয়া দেয় এবং যে-কোন ঘটনা অপরকে দুঃখ আনিয়া দেয়—সে-সমুদয়কে সমতাপূর্ণ মন ও হৃদয়ের সহিত গ্রহণ কর। সাধু ও অসাধু, জ্ঞানী ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, উচ্চতম মনুষ্য ও ক্ষুদ্রতম জীব—সকলকে সমান দৃষ্টি লইয়া দেখ। তোমার সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধই থাকুক, বন্ধু ও মিত্র, মধ্যস্থ ও উদাসীন, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, প্রেমিক ও দ্বেষ্টা—সমান ভাব লইয়া সকলের সম্মুখীন হও। এই সব জিনিস অহংকে স্পর্শ করে, কিন্তু তোমাকে হইতে হইবে অহংশূন্য। এই সব হইতেছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, কিন্তু তোমাকে সব কিছুকেই নির্ব্যক্তিক আত্মার গভীর ভাব লইয়া দেখিতে হইবে। এই সব হইতেছে সাময়িক ও ব্যক্তিগত ভেদ বৈষম্য, এই সব তুমি লক্ষ্য করিবে, কিন্তু এ-সবের দ্বারা তোমার প্রভাবিত হওয়া চলিবে না; কারণ তোমাকে মন দিতে হইবে এই সব ভেদবৈষম্যের উপরে নহে—পরন্তু সবের মধ্যে যাহা সমান সব কিছু হইতেছে যে এক আত্মা, প্রত্যেকের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন সেই দিকেই তোমার মন দিতে হইবে। সর্বত্র দেখিতে হইবে প্রকৃতির এক ক্রিয়া, তাহা হইতেছে সকল মানুষ, বস্তু, শক্তি ও ঘটনায় ভগবানেরই সমান ইচ্ছার অভিব্যক্তি, দেখিতে হইবে যে, বিশ্ব-ব্যাপী কর্মধারার সকল প্রয়াসে, সকল ফলে, সকল পরিণতিতে একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে।

"তখনও তোমার মধ্যে কর্ম চলিবে, কারণ প্রকৃতি সকল সময়ই কাজ করিতেছে; কিন্তু তোমাকে শিখিতে হইবে এবং অনুভব করিতে হইবে যে তোমার আত্মা ঐ কর্মের কর্তা নহে। শুধু দেখিয়া যাও, অবিচলিত থাকিয়া প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহার গুণত্রয়ের খেলা, এবং তাহাদের ভোজবাজি শুধু দেখিতে থাক। অবিচলিতভাবে নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ; তোমার চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখ এবং দেখ যে অপরের মধ্যে সেই একই ক্রিয়া চলিতেছে। লক্ষ্য কর যে, তোমার বা তাহাদের কাজের ফল তুমি বা

তাহারা যাহা ইচ্ছা কর প্রায়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইতেছে; সে-ফল নির্ধারিত হইতেছে তোমার ইচ্ছার দ্বারা নহে, তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা নহে, পরন্তু এক মহত্তর শক্তির দ্বারা—এই বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই শক্তিই সংকল্প করিতেছে, কর্ম করিতেছে। ইহাও লক্ষ্য কর যে, তোমার কর্মের মধ্যে যে সংকল্প রহিয়াছে সেটাও তোমার নহে, পরন্তু প্রকৃতির। ঐ সংকল্প হইতেছে তোমার অহংয়ের সংকল্প, তোমার প্রকৃতিতে কোন গুণের প্রাধান্য রহিয়াছে তদনুসারে উহা নির্ধারিত হয়—প্রকৃতিই অতীতে ঐ গুণের বৃদ্ধি করিয়াছে অথবা বর্তমানে সেইটিকে সম্মুখে আনিয়াছে। উহা তোমার প্রাকৃত ব্যক্তিরূপের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে—কিন্তু প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট ঐ রূপ তোমার স্বরূপ নহে। এই বাহ্য রূপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমার আভ্যন্তরীণ নীরব আত্মার দিকে এস; তুমি দেখিতে পাইবে তুমি পুরুষ, তুমি নিষ্ক্রিয়, পরন্তু প্রকৃতিই সর্বদা নিজ গুণাবলী অনুসারে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতায় নিজেকে নিবিষ্ট কর, নিজেকে আর কর্তা বলিয়া দেখিও না। প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে নিজের মধ্যে সমাসীন থাক, গুণত্রয়ের বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া হইতে বিমুক্ত থাক। নির্ব্যক্তিক আত্মার শুদ্ধ সত্তায় নিশ্চিতভাবে বাস কর, তোমার আধারে মরজীবনের যে তরঙ্গভঙ্গ চলে তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইও না।

"যদি তুমি ইহা করিতে পার, তাহা হইলে নিজেকে এক মহান বিমুক্তির মধ্যে, এক বিশাল স্বাধীনতা ও এক গভীর শান্তির মধ্যে উন্নীত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে এবং অমৃতত্ব লাভ করিবে, নিজের আদিঅন্তহীন স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে লাভ করিবে, মন, প্রাণ ও দেহের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় অবিচলিত থাকিবে, রিপুর আবেগ, পাপ, যন্ত্রণা ও দুঃখ আর তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তখন তুমি তোমার সুখ ও কামনার জন্য কোন মরণশীল বা বাহ্য বা পার্থিব বস্তুর উপর নির্ভর করিবে না, পরন্তু এক শান্ত ও শাশ্বত আত্মায় আপনাতে আপনি পূর্ণ আনন্দ চিরকালের জন্য লাভ করিবে। তখন আর তুমি একটি মনোময় জীব থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অপরিমেয় আত্মা, তুমি হইবে ব্রহ্ম। আর মন হইতে সমস্ত চিন্তাবীজ এবং সমস্ত বাসনা-মূল দূর করিয়া দিয়া প্রয়াণকালে শুদ্ধ শাশ্বত সত্তায় চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া তুমি পুনর্জন্ম বর্জন করিয়া এই নীরব আত্মার শাশ্বততায় প্রবেশ করিতে পার, তোমার চৈতন্যকে অনন্ত কৈবল্যাত্মক সত্তার মহান ভাবে উত্তোলিত করিতে পার।

* * * * * *

"তবে এইটিই যোগসাধনার সমগ্র তত্ত্ব নহে, আর এই পরিণতি, এইভাবে

মহাপ্রয়াণ, যদিও ইহা মহান পরিণতি, মহান পন্থা—আমি তোমার নিকট ইহা প্রস্তাব করিতেছি না। কারণ আমি হইতেছি তোমার মধ্যে চিরন্তন কর্মী এবং আমি তোমার কাছে কর্ম চাই। তোমার প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ায় তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে সায় দিবে, নিজের আত্মায় তুমি এই ক্রিয়া হইতে পৃথক থাকিবে, উদাসীন ও অনাসক্ত থাকিবে—তোমার কাছে আমি ইহা চাহি না, আমি চাই পরিপূর্ণ ও দিব্য কর্ম, সে-কর্ম ভগবানের যন্ত্ররূপে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে করা হইবে, তোমার মধ্যে এবং অপরের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য সেই কর্ম করা হইবে, জগতের কল্যাণের জন্য সেই কর্ম করা হইবে। আমি তোমাকে এই কর্ম করিতে বলি প্রথমে অবশ্য পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে সংসিদ্ধিলাভের একটি উপায় হিসাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা হইবে ঐ সংসিদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কর্ম হইতেছে ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের অঙ্গ, তাঁহার মহত্তর রহস্যময় সত্যের অঙ্গ, পূর্ণ ভাগবত জীবনের অঙ্গ; সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পরও কর্ম করা যায় এবং করা উচিত। আমি তোমার কাছ হইতে চাই জীবন্মুক্তের কর্ম, সিদ্ধ মহাপুরুষের কর্ম। ইতি-পূর্বে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে আরও কিছু যোগ করিতে হইবে—কারণ সেটি হইতেছে কেবল প্রাথমিক জ্ঞানযোগ। ভগবদ্-উপলব্ধিতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার মধ্যেও কর্মযোগের স্থান আছে; কর্মই জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। করণ পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানে ও ভগবদ্-জ্ঞানে যে কর্ম করা যায়, জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়া এবং ভগবানের মধ্যে জগৎকে দেখিয়া যে-কর্ম করা যায়—তাহা একপ্রকার জ্ঞানই, তাহা জ্যোতির ক্রিয়া, তাহা অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির অপরিহার্য উপায় এবং অন্তরঙ্গ অংশস্বরূপ।

"অতএব এক সমুচ্চ নির্ব্যক্তিকতার উপলব্ধির সহিত এখন এই জ্ঞানটিও যোগ করিয়া দাও যে. যে-পরমতমকে আমরা শুদ্ধ নীরব আত্মারূপে পাই, তাহাকেই আবার এক বিরাট ওজস্বান পুরুষরূপে পাইতে পারি—তাহা হইতেই সকল কর্মের উৎপত্তি, তিনিই সর্বলোকমহেশ্বর, তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। এই যে প্রকৃতিকে একটি স্বয়ং-চালিত যন্ত্র বলিয়া দেখা যায়, ইহার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক অন্তর্বাসী ভাগবত ইচ্ছাশক্তি, তাহাই প্রকৃতিকে চালাইতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য-সকলকে রূপ দিতেছে। কিন্তু তুমি ঐ ভাগবত ইচ্ছাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে বা জানিতে পারিবে না যতক্ষণ তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ কোষের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছ, অহং ও অহংয়ের বাসনা কামনায় অন্ধ ও বন্দী হইয়া রহিয়াছ। কারণ তুমি কেবল তখনই উহাতে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারিবে যখন তুমি জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্যক্তিকভাব লাভ করিবে, চৈতন্যের প্রসারের দ্বারা সব জিনিসকে আত্মা ও ভগবানের মধ্যে দেখিবে, এবং আত্মা

ও ভগবানকে সব জিনিসের মধ্যে দেখিবে। এখানে সব কিছুর উদ্ভব হইতেছে আত্মার শক্তি হইতে; ভগবান সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, প্রত্যেক জীবের হৃদ্‌দেশে তিনি বাস করিতেছেন, তাই সকলে আপন-আপন কর্ম করিতে পারিতেছে। জগতের সৃষ্টিকর্তা নিজের সৃষ্টির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন; কর্মের যিনি অধীশ্বর, তিনি নিজ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না; ভাগবত ইচ্ছাশক্তি নিজ ক্রিয়ায় এবং নিজ ক্রিয়ার ফলে আসক্ত হয় না; কারণ তাহা সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর এবং সর্বানন্দ। তথাপি ভগবান তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে নিজ সৃষ্টির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; তিনি অবতার রূপে নীচে নামিয়া আসিতেছেন; এখানে তোমার মধ্যে তিনি রহিয়াছেন; তিনি ভিতর হইতে সকল জিনিসকে তাহাদের প্রকৃতির ধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আর তোমাকেও তাঁহার মধ্যে কর্ম করিতে হইবে দিব্য প্রকৃতির ধারা ও ক্রম অনুসারে, সকল সংকীর্ণতা ও আসক্তি ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া। সকলের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য কর্ম কর, জগতের প্রগতিকে ঠিক রাখিবার জন্য কর্ম কর, লোকসকলকে তাহাদের লক্ষ্যের দিকে চলিতে সাহায্য কর, পথ দেখাও। তোমাকে যে কর্ম করিতে বলা হইতেছে তাহা মুক্ত যোগীর কর্ম; উহা হইতেছে ভগবদ্‌-অনুপ্রাণিত শক্তির স্বতঃস্ফুরণ; উহা সমতাযুক্ত মন লইয়া করা হয়, উহা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম।

"এই মুক্ত, সমভাবাপন্ন, দিব্য কর্মধারার প্রথম ধাপ হইতেছে তোমার মধ্য হইতে ফল ও প্রতিদানের প্রতি সকল রকম আসক্তি বর্জন করা, কাজটি করিতে হইবে বলিয়াই কাজটি করা। কারণ তোমাকে গভীর ভাবেই অনুভব করিতে হইবে যে, ফলে অধিকার একমাত্র জগদীশ্বরের, তোমার তাহাতে কোন অধিকার নাই। তোমার সকল শ্রম উৎসর্গ করিয়া দাও, যে-ভগবান নিজেকে এই বিশ্বলীলায় প্রকট করিতেছেন, নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহারই হস্তে সব ফলাফল ছাড়িয়া দাও। তোমার কর্মের ফল কি হইবে তাহা একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। আর তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, সফলতাই হউক আর বিফলতাই হউক, তিনি সেইটিকে বিশ্বমাঝে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় করিয়া লইবেন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নিমিত্তস্বরূপ প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়া—এইটিই হইতেছে কর্মযোগের প্রথম বিধি। কোনও ফল দাবি করিও না, যে-ফলই তোমাকে দেওয়া হউক তাহাই স্বীকার করিয়া লও সমতার সহিত, শান্ত সন্তোষের সহিত; কৃতকার্য হও বা অকৃতকার্য হও, সম্পদ আসুক বা বিপদ আসুক, নির্ভীক, অবিক্ষুব্ধ, অবিকম্প হইয়া দিব্য কর্মের কঠিন পথে অগ্রসর হও।

"এই মার্গে এইটি হইতেছে কেবল মাত্র প্রথম ধাপ। কারণ শুধু ফলে অনাসক্ত হইলেই চলিবে না, তোমাকে কর্মেও অনাসক্ত হইতে হইবে। তোমার

কাজকে তোমার বলিয়া ভাবা বর্জন কর; তুমি যেমন তোমার কর্মে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছ, তেমনিই কর্মটিকেও সকল যজ্ঞ ও কর্মের অধীশ্বর ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। জান যে তোমার প্রকৃতিই তোমার কর্ম নির্ধারণ করে; এখনই তোমার স্বভাবের গতি কোন দিকে হইবে প্রকৃতিই তাহা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রকৃতির কার্যনির্বাহিকা শক্তির ধারায় তোমার আত্মার বিকাশ কোন রূপ গ্রহণ করিবে তাহা নির্ধারণ করে। ভগবদ্‌মুখী পথে চলিতে তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আনিয়া তোমার মনে গোলমালের সৃষ্টি করিও না। তোমার প্রকৃতির অনুযায়ী যে-কর্ম তাহাই স্বীকার করিয়া লও। তুমি যাহা কিছু কর, তাহা অতি মহান ও অসাধারণই হউক অথবা দৈনন্দিন কোন ক্ষুদ্রতম কর্মই হউক, তোমার মনের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার শরীরের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, সব বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ প্রয়াস, প্রত্যেক চিন্তা, সংকল্প ও অনুভব, প্রত্যেক পদক্ষেপ, গতি ও বিরতি— সবকেই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ কর।

"তাহার পর জান যে, তুমি হইতেছ শাশ্বত পুরুষেরই অংশ, তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমার প্রকৃতির শক্তিসকলের কোন অস্তিত্ব নাই, তাঁহার আংশিক আত্ম-অভিব্যক্তি ভিন্ন সে-সব আর কিছুই নহে। তোমার প্রকৃতির ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানের প্রকাশই ক্রমশ উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতেছে। ভগবানের পরম সৃজনীশক্তি তোমার স্বভাবকে গড়িয়া দিতেছে, তোমার স্বভাবের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে। অতএব তুমি কর্তা এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন কর; একমাত্র ভগবানকেই কর্মের কর্তা বলিয়া দেখিতে শিক্ষা কর। তোমার প্রাকৃত সত্তা হউক একটি নিমিত্ত, একটি যন্ত্র, শক্তির ক্রিয়ার একটি আধার স্বরূপ, অভিব্যক্তির একটি উপকরণ। তোমার সংকল্প তাঁহাকে অর্পণ করিয়া দাও, তাঁহার শাশ্বত সংকল্পের সহিত এক করিয়া দাও; তোমার আত্মার নীরবতায় তোমার সকল কর্ম তোমার প্রকৃতির সর্বাতীত প্রভুকে সমর্পণ কর। ইহা বস্তুত করা যায় না অথবা পূর্ণভাবে করা যায় না যতক্ষণ তোমার একটুকু অহংভাব থাকে, এতটুকু মানসিক দাবি বা প্রাণিক লালসা থাকে। লেশমাত্র অহংয়ের জন্য যে-কর্ম করা যায়, যে-কর্মে কামনা বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিন্দুমাত্র থাকে তাহা পূর্ণ যজ্ঞস্বরূপ হয় না। আবার কোথাও এতটুকু অসমতা থাকিলে অথবা অজ্ঞান রাগ বা দ্বেষের ছাপ থাকিলেও এই মহান জিনিসটি যথাযথভাবে, প্রকৃষ্টভাবে সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু যেখানে সকল কর্ম, ফল, বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি পূর্ণতম সমতার ভাব আছে, কামনা বা অহংয়ের নিকটে নহে পরন্তু পরমতমের নিকট আত্ম-সমর্পণ আছে, সেখানে ভগবদ্‌ ইচ্ছা তোমার রূপান্তরিত প্রকৃতির শুদ্ধ ও নির্বিঘ্ন সত্তার সকল কর্ম নির্ধারণ করিয়া দেয়, ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা

থাকে না, এবং ভগবদ্-শক্তি নিম্ন হইতে কোন বাধা না পাইয়া, কোনরূপ প্রতিক্রিয়ায় ব্যাহত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া দেয়। ভাগবত ইচ্ছা নিখুঁত প্রাধান্যে তোমার ভিতর দিয়া তোমার প্রত্যেক কর্ম গড়িয়া দিবে—কর্মযোগের এইটিই হইতেছে পরমতম সিদ্ধি। এইটি হইলে তোমার প্রকৃতি এই বিশ্বমাঝে পরমতমের সহিত পূর্ণ ও নিত্য যোগে নিজ পথে চলিতে পারিবে, উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্তাকে প্রকট করিতে পারিবে, ঈশ্বরের অনুবর্তী হইতে পারিবে।

"এই যে দিব্য কর্মের পথ, ইহা জীবন ও কর্মের বাহ্য ত্যাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মুক্তি এবং মহত্তর পন্থা। বাহ্য ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে কখনই সম্ভব নহে, আর উহা যতটা সম্ভব ততটা করাও আত্মার মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য নহে; তাহা ছাড়া ইহা হইতেছে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত, কারণ ইহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ ঘটায়। যাঁহারা উত্তম, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যে আদর্শ দেখান, অবশিষ্ট মানুষ তাহাই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব, যখন কর্ম হইতেছে দেহধারী জীবের স্বভাব, যখন কর্ম হইতেছে চিরন্তন কর্মী ভগবানেরই ইচ্ছা, যাঁহারা মহাত্মা, মহৎবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে এই দৃষ্টান্তই দেখান। তাঁহাদিগকে হইতে হইবে বিশ্ব-কর্মী, কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে—তাঁহাদিগকে হইতে হইবে স্বাধীন, সানন্দ, নিষ্কাম ভগবদ্‌কর্মী, আত্মায় ও প্রকৃতিতে সকল প্রকার বন্ধন হইতে চির-মুক্ত।

* * * * * *

"মন চায় জ্ঞান, সঙ্কল্প চায় কর্ম—কিন্তু ইহারাই সব নহে; তোমার মধ্যে রহিয়াছে হৃদয় এবং তাহা চাহে আনন্দ। এখানেও হৃদয়ের শক্তি ও দীপ্তিতে, তাহার আনন্দ আকাঙ্ক্ষায় আত্মাকে তৃপ্ত করিতে হইলে তোমার প্রকৃতিকে ঘুরাইয়া, রূপান্তরিত করিয়া ভগবানের সহিত যোগের সজ্ঞান আনন্দে উত্তোলিত করিতে হইবে। নির্ব্যক্তিক আত্মার যে জ্ঞান তাহার নিজস্ব আনন্দ আছে। নির্ব্যক্তিকতার একটা আনন্দ আছে, শুদ্ধ আত্মার ঐক্যরসের একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সমগ্র জ্ঞান লইয়া আসে একটা মহত্তর ত্রিবৃত্ত আনন্দ। ইহা বিশ্বাতীত আনন্দের দ্বার খুলিয়া দেয়; ইহা বিশ্বগত নির্ব্যক্তিকতার অপরিসীম আনন্দের ভিতর লইয়া যায়; আর এই বহু-বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যে উল্লাস রহিয়াছে তাহার সন্ধান আনিয়া দেয়—কারণ প্রকৃতির মধ্যেও শাশ্বতের আনন্দ রহিয়াছে। এখানে ভগবানের অংশ যে জীব তাহার পক্ষে এই আনন্দের স্বরূপ হয় তাহার মূল উৎস ভগবানে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ, তাহার নিজ উচ্চতম সত্তায় আনন্দ, তাহার জীবনের যিনি অধীশ্বর তাঁহাতে

আনন্দ। ভগবানের প্রতি একাগ্র প্রেম ও ভক্তি জগতের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়, জগতের মধ্যে সকল রূপ, সকল শক্তি, সকল জীবের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়; সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখা যায়, পাওয়া যায়, ভালবাসা যায়, সেবা করা যায়, সকলের মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞান ও কর্মের উপর এই অনন্ত ত্রিবৃত্ত আনন্দের মুকুট পরাইয়া দাও; এই প্রেমকে স্বীকার কর, এই উপাসনা শিক্ষা কর; কর্ম ও জ্ঞানের সহিত ইহাকে সত্তায় এক করিয়া দাও। পূর্ণতম পূর্ণতার উহাই হইতেছে শিখর স্বরূপ।

"এই প্রেমযোগ তোমাকে আধ্যাত্মিক বিশালতা, ঐক্য ও মুক্তিলাভের উচ্চতম শক্তি আনিয়া দিবে। কিন্তু এই প্রেম ভগবদ্‌জ্ঞানের সহিত এক হওয়া চাই। একরকম ভক্তি আছে তাহা দুঃখ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে চায় সান্ত্বনার জন্য, সাহায্যের জন্য, উদ্ধারের জন্য; একরকম ভক্তি আছে তাহা ভগবানকে চায়—ভোগ্য বস্তুর জন্য, বিপদ হইতে নিরাপত্তার জন্য, বাসনা-কামনার তৃপ্তির জন্য; এক প্রকার ভক্তি আছে তাহা অজ্ঞানের মধ্য হইতেই ভগবানকে চায়—আলোক ও জ্ঞানের জন্য। আর যতক্ষণ মানুষ এইরূপ সব ভক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন তাহাদের উচ্চতম ও উদারতম ভগবদ্‌মুখী ভাবের মধ্যেও গুণত্রয়ের খেলা চলিতে পারে। কিন্তু যখন ভগবদ্‌প্রেমিক হন আবার ভগবদ্‌জ্ঞানী, তখনই প্রেমিক প্রেমপাত্রের সহিত এক হইয়া যান, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—কারণ তিনি হন পরমতমের নির্বাচিত, ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রেম তোমার মধ্যে বিকাশ কর; হৃদয় অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়া এবং উহার নিম্নতন স্বভাবের ক্ষুদ্রতা হইতে উত্তোলিত হইয়া তোমার নিকট ভগবানের অপরিমেয় সত্তার রহস্যসকল অতি অন্তরঙ্গভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, তোমার মধ্যে তাঁহার দিব্য শক্তির পূর্ণ স্পর্শ, প্রবাহ ও মহিমা আনিয়া দিবে এবং তোমার জন্য অনন্ত উল্লাসের নিগূঢ় উৎস খুলিয়া দিবে। পূর্ণতম প্রেমই হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞানের চাবি।

"আবার এই সমগ্র ভগবদ্ প্রেমের দাবি হইতেছে তোমার মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে সমগ্র কর্ম করা। সাধারণ মনুষ্য কর্ম করে কোন পাপময় বা পুণ্যময় বাসনার অনুসরণ করিয়া অথবা কোন নীচ বা উচ্চ প্রাণিক উত্তেজনায় চালিত হইয়া অথবা কোন সাধারণ বা সমুচ্চ মানসিক মতের অনুবর্তী হইয়া, অথবা কোন মিশ্রিত মন ও প্রাণের প্রেরণা অনুসরণ করিয়া। কিন্তু তোমাকে যে কাজ করিতে হইবে তাহা হওয়া চাই মুক্ত ও নিষ্কাম; কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কোন বন্ধন চাপাইয়া দেয় না। যখন পূর্ণতম সমতা ও অবিচল শান্তিতে কর্ম করা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে দিব্য আবেগ

থাকে না, তখন তাহা হয় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বাধ্যতা, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, পরে তাহাই দিব্য যজ্ঞে পরিণত হয়; ইহারই উচ্চতম স্তবে ইহা হয় কর্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত একত্বের শান্ত ও প্রসন্ন অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রেমের ভিতর দিয়া একত্ব ইহা অপেক্ষাও বড়; সেই প্রাথমিক আবেগহীন শান্তির পরিবর্তে ইহা লইয়া আসে প্রবল ও গভীর উল্লাস—তাহা অহমাত্মক কামনার ক্ষুদ্র উদ্দীপনা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে অনন্ত আনন্দের সাগর। ইহা তোমার কর্মের মধ্যে লইয়া আসিবে প্রিয়তমের সান্নিধ্যের মর্মস্পর্শী অনুভূতি এবং শুদ্ধ ও দিব্য হৃদয়াবেগ। তোমার মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য শ্রম করিবার আনন্দ নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে। প্রেমই হইতেছে কর্মের মুকুট, এবং জ্ঞানের মুকুট।

"এই যে প্রেম জ্ঞানের সহিত এক, এই যে প্রেম তোমার কর্মেরও সারতত্ত্ব হইতে পারে—ইহার সার্থক শক্তিতেই তোমার সমর্পণ হইবে সমগ্র, তোমার সিদ্ধি হইবে পূর্ণতম। সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম জীবনের জন্য চাই ভগবানের সহিত জীবের পূর্ণ মিলন। অতএব সর্বতোভাবে ভগবানের অভিমুখী হও; তোমার প্রকৃতিকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে তাঁহার সহিত এক করিয়া দাও। সম্পূর্ণভাবে তাঁহার দিকে ফের, কোনরূপ কুণ্ঠা না করিয়া তাঁহারই হস্তে তোমার মনকে, তোমার হৃদয়কে, তোমাব সংকল্পকে তুলিয়া দাও, তোমার সমস্ত চেতনা, এমন কি তোমার ইন্দ্রিয় ও দেহ পর্যন্ত তাঁহার হস্তে তুলিয়া দাও। তিনি পূর্ণতম শক্তির সহিত তোমার চৈতন্যকে তাঁহার দিব্য চৈতন্যের আধার রূপে গড়িয়া তুলুন। তোমার হৃদয় হইয়া উঠুক ভগবানেরই দীপ্ত বা প্রেমময় হৃদয়। তোমার সংকল্প হউক ভগবানেরই সংকল্পের অভ্রান্ত ক্রিয়া। এমন কি তোমার ইন্দ্রিয় ও শরীরও হইয়া উঠুক ভগবানেরই উল্লাসময় ইন্দ্রিয় ও শরীর। তোমার যাহা কিছু আছে সব লইয়া তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ কর; প্রত্যেক চিন্তা ও অনুভবে তাঁহাকে স্মরণ কর, প্রত্যেক প্রেরণা ও কর্মে তাঁহাকে স্মরণ কর। লাগিয়া থাক, যতক্ষণ না এই সবই সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হয়, যতক্ষণ না তিনি যেমন তোমার অন্তরতম হৃদয়-মন্দিরে তেমনই তুচ্ছতম ও বাহ্যতম জিনিসেও নিজেকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবকিছুকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া দেন।

* * * * * *

"এই ত্রয়ী পন্থাই হইতেছে সাধন যাহা দ্বারা তুমি তোমার নিম্ন প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পার। সেইটিই হইতেছে গুপ্ত অতিচেতন প্রকৃতি যেখানে জীব—অনন্ত ভগবানের

অংশস্বরূপ এবং তাঁহারই সমধর্মী জীব—নিজ সত্যের মধ্যে বাস করে, আর বাহ্য মায়ার মধ্যে নহে। এই যে সিদ্ধি, এই ঐক্য—পরম বিশ্বাতীত স্তরে ইহার নিজ ধামে ইহা উপভোগ করা যায়; কিন্তু এখানে, এই মানবশরীর এবং জড়জগতেও তুমি ইহা লাভ করিতে পার এবং করা উচিত। তাহার জন্য কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে যে তুমি তোমার আভ্যন্তরীণ আত্মায় শান্ত, নিষ্ক্রিয়, গুণাতীত হইয়াছ এবং বাহ্য আধারে গুণসকলের যন্ত্রবৎ ক্রিয়া চলিলেও তুমি উদাসীন রহিয়াছ। কারণ শুধু অন্তরাত্মাকে নহে, বাহিরের সক্রিয় প্রকৃতিকেও ভগবানকে দিতে হইবে, ভাগবত করিতে হইবে। তোমার সকল সত্তা লইয়া তোমাকে পুরুষোত্তমের সাধর্ম্য লাভ করিতে হইবে; সব কিছুকেই রূপান্তরিত হইয়া আমার ভাব লাভ করিতে হইবে, মদ্‌ভাবমাগতাঃ। চাই পূর্ণতম আত্ম-সমর্পণ। তোমার প্রকৃতির সকল বিচিত্র ভাবে, এবং সকল জীবন্ত ধারায় আমার শরণ লও; কারণ একমাত্র ইহার দ্বারাই তুমি এই মহান রূপান্তর ও পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

"যোগের এই যে সমুচ্চ পরিণতি, ইহাই কর্ম-সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে. এমন কি ঐ সমস্যার মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিবে। মানুষের কর্ম হইতেছে বাধা ও সমস্যায় পূর্ণ, এমন গহন অরণ্যের মত যেখানে কোনরকমে কয়েকটা পথ কাটা হইয়াছে কিন্তু সে-পথ ধরিয়া অরণ্য অতিক্রম করা যায় না; কিন্তু এই সব বাধা ও জটিলতার উৎপত্তি হইতেছে কেবল এই একটি জিনিস হইতে যে মানুষ তাহার মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির অজ্ঞানের মধ্যে বন্দী হইয়া রহিয়াছে। সে প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারাই অবশে চালিত হয় অথচ একটা দায়িত্বজ্ঞান তাহাকে পীড়িত করে—কারণ তাহার মধ্যে একটা বোধ রহিয়াছে যে, সে আত্মা, তাহার পক্ষে প্রকৃতির প্রভু ও নিয়ন্তা হওয়া উচিত, কিন্তু বর্তমানে সে বস্তুত তাহা নহে অথবা খুব সামান্যই। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাহার জীবনের সকল বিধান, তাহার সকল ধর্ম অসম্পূর্ণ ও সাময়িক হইতে বাধ্য, বড়জোর সে-সব হইতে পারে কেবল আংশিকভাবে ঠিক ও সত্য। মানুষের ত্রুটি ও অপূর্ণতাসকল কেবল তখনই দূর হইবে যখন সে নিজেকে জানিবে, যে-জগতের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হইতেছে সেই জগতের প্রকৃত স্বরূপটি জানিবে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়,—যখন সে সেই শাশ্বতকে জানিবে যাহা হইতে সে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহার মধ্যে, যাহাকে ধরিয়া সে বিদ্যমান আছে। যখন সে একবার সত্য চৈতন্য ও জ্ঞান লাভ করিবে তখন আর কোন সমস্যাই থাকিবে না; কারণ তখন সে নিজের মধ্য হইতে স্বাধীনভাবে কর্ম করিবে এবং তাহার আত্মা ও তাহার উচ্চতম প্রকৃতির সত্য অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনযাপন করিবে। এই জ্ঞানের সম্যক পূর্ণতায় এবং উচ্চতম উচ্চতায় বস্তুত সে আর

কর্ম করে না পরন্তু ভগবানই কর্ম করেন, তাহার মুক্ত প্রজ্ঞা, শক্তি ও পূর্ণতায় তাহার মধ্যে এবং তাহার ভিতর দিয়া একমাত্র শাশ্বত ও অনন্ত ঈশ্বরই কর্ম করেন।

"মানুষ তাহার প্রাকৃত সত্তায় হইতেছে প্রকৃতি-সৃষ্ট সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব। প্রকৃতির যে গুণ যখন তাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, তাহার জীবন ও কর্মের ধারা হয় সেই গুণ অনুযায়ী। তাহার তামসিক জড়ানুগত ইন্দ্রিয়ানুগত মন জড়তা, ভয় ও অজ্ঞানের অধীন, তাহা হয় আংশিকভাবে পারিপার্শ্বিকের চাপ মানিয়া চলে, আংশিকভাবে কামনার আকস্মিক আবেগে চালিত হয় অথবা মূঢ় গতানুগতিক বুদ্ধি অনুযায়ী অভ্যস্ত কর্মধারার আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজসিক মন কামনার অধীন, যে-জগতে সে বাস করিতেছে তাহার সহিত সে সংগ্রাম করে, সর্বদা নূতন জিনিস অধিকার করিতে চেষ্টা করে, নেতৃত্ব করিতে, যুদ্ধ করিতে, সৃষ্টি করিতে, ধ্বংস করিতে, সঞ্চয় করিতে যত্নবান হয়। সকল সময়েই সে সফলতা ও বিফলতার মধ্যে, সুখ ও দুঃখের মধ্যে, উল্লাস ও হতাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাহ্যত সে যে-কোন নীতিই অনুসরণ করুক না কেন, বস্তুত সে সর্বত্র নিম্নতন সত্তা ও অহংয়ের নীতিই অনুসরণ করে, আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতির অশান্ত, অক্লান্ত, আত্মগ্রাসী এবং সর্বগ্রাসী মনকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি কতকটা এই অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে, বুঝে যে কামনা ও অহংয়ের নীতি অপেক্ষা একটা উচ্চতর নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং নিজেকে সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনুগত করে, ধর্মের অনুসরণ করে। মানুষের সাধারণ মন এই পর্যন্তই উঠিতে পারে—মন ও সঙ্কল্পকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটা আদর্শ বা কার্যকরী বিধান দাঁড় করান এবং জীবনে ও কর্মে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠার সহিত তাহা অনুসরণ করা। এই সাত্ত্বিক মনকে তাহার উচ্চতম স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, সেখানে সে অহংভাবের মিশ্রণকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিবে, ধর্মকে ধর্মের জন্যই নির্ব্যক্তিক সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ-রূপে পালন করিবে, এটা করা কর্তব্য এইরূপ জ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিবে।

"তবে প্রকৃতির এইসব ক্রিয়ার যাহা প্রকৃত সত্য তাহা বাহ্য মানসিক সত্য মাত্র নহে, তাহা বেশীর ভাগই হইতেছে আভ্যন্তরীণ সত্য। তাহা এই যে, মানুষ হইতেছে দেহধারী আত্মা, ভৌতিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, সেখানে সে এক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—সে ধারা তাহার সত্তার আভ্যন্তরীণ ধারায় দ্বারাই নির্ধারিত হয়; তাহার আত্মার যাহা স্বরূপ তাহাই তাহার মন ও প্রাণের স্বরূপ গড়িয়া দেয়, তাহার স্বভাব

গড়িয়া দেয়। প্রত্যেক মানুষেরই একটি স্বধর্ম আছে, সেইটি তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে। যে কর্ম মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় সেইটিই তাহার প্রকৃত ধর্ম। সেইটি অনুসরণ করাই তাহার আত্মবিকাশের সত্য পন্থা, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই আসিবে বিশৃঙ্খলা, গতিরোধ, ভ্রান্তি। তাহার পক্ষে সেই সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য নীতি বা আদর্শ শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকে সর্বদা তাহার স্বধর্মের অনুসরণ করিতে সাহায্য করে।

"তবে এই সব কর্ম তাহাদের শ্রেষ্ঠ স্বরূপেও হইতেছে মনের অজ্ঞানের অধীন, গুণত্রয়ের খেলার অধীন। কেবল যখন মানুষ নিজ আত্মার সন্ধান পায় তখনই সে এই অজ্ঞানকে এবং গুণত্রয়ের বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, নিজ চৈতন্য হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে। ইহা সত্য যে, যখন তুমি নিজ আত্মার সন্ধান পাইয়াছ এবং আত্মার মধ্যেই বাস করিতেছ তখনও তোমার প্রকৃতি তাহার পুরাতন ধারা অনুসরণ করিয়াই চলিতে পারে এবং কিছুকাল নিম্নতন গুণসকলের বশেই কর্ম করিতে পারে। কিন্তু তখন তুমি পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ঐ কর্ম লক্ষ্য করিতে পারিবে এবং তোমার জীবনের যিনি প্রভু তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উহা অর্পণ করিতে পারিবে। অতএব তোমার স্বধর্মের ধারা অনুসরণ কর, তোমার স্বভাব যে কর্ম চায় তাহাই কর, তাহা যাহাই হউক না কেন। বর্জন কর সকল অহমাত্মক প্রেরণা, সকল স্বার্থপর আরম্ভ, সকল কামনার বিধান যতক্ষণ না তুমি তোমার সমস্ত জীবনকে সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে পাব।

"আর যখন তুমি একবার তাহা ঐকান্তিকভাবে করিতে পারিবে, তখনই নিঃশেষে তোমার সকল কর্মের আরম্ভ তোমার মধ্যে যে পরম ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার সময় হইবে। তখন তুমি কর্তব্যাকর্তব্যের সকল বিধি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ধর্ম হইতে মুক্ত হইবে। তোমার অন্তরস্থিত ভগবদ্‌শক্তি ও ভগবদ্‌সান্নিধ্য তোমাকে পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে এবং পুণ্য সম্বন্ধে মানুষের বিচারের অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিবে। কারণ তুমি তখন অধ্যাত্ম সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণতম ও স্বতঃস্ফূর্ত ঋতম্ ও পবিত্রতার মধ্যে বাস করিবে, কর্ম করিবে। তুমি নহ, পরন্তু ভগবানই তখন তোমার মধ্য দিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তোমার অধস্তন ব্যক্তিগত সুখ ও কামনা-তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু জগদ্ধিতায় এবং তোমার দিব্য কল্যাণের জন্য এবং সকলেরই দৃষ্ট বা অ-দৃষ্ট কল্যাণের জন্য। জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া তুমি জগতে এবং কালের কর্মধারায় ভগবানের রূপ দর্শন করিবে, তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবে। ভগবানের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন তোমার প্রকৃতি যন্ত্ররূপে

তাহা গ্রহণ করিবে এবং বিনা প্রশ্নে তাহা সম্পন্ন করিবে, কারণ ঊর্ধ্ব হইতে এবং তোমার ভিতর হইতে তোমার প্রত্যেকটি কর্ম-প্রেরণার সহিত আসিবে একটা অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান এবং ভাগবত প্রজ্ঞা ও তাহার সার্থকতাতে সজ্ঞান সম্মতি। যুদ্ধটি হইবে তাঁহার, বিজয়ও তাঁহার, সাম্রাজ্যও তাঁহার।

"ইহসংসারে এই দেহে ইহাই হইবে তোমার পরম সিদ্ধি, আর এই নশ্বরজগতের ঊর্ধ্বে তুমি লাভ করিবে পবম শাশ্বত অতিচেতনা এবং চিরকালের জন্য ভগবানের পরম ধামে বাস করিবে। পুনঃ-পুনঃ জন্মমৃত্যুর বাধা আর তোমার থাকিবে না; কারণ ইহজীবনে ভগবানের অভিব্যক্তি তুমি সম্পন্ন করিবে, আর তোমার আত্মা মন ও শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও এই-খানেই আত্মার চিরন্তন অসীমতার মধ্যে বাস করিবে।

"তাহা হইলে এইটিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধনা—তোমার সকল সত্তা ও প্রকৃতির পূর্ণ সমর্পণ, যে-ভগবান তোমার নিজেরই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তাঁহার জন্য সর্বধর্ম পরিত্যাগ, পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির দিকে তোমার সকল অঙ্গ ও অংশের অনন্য অভীপ্সা। একবার যদি তুমি এইটি করিতে পার, প্রথমেই হউক বা অনেক দূর গিয়াই হউক, তাহা হইলে তোমার বাহ্য প্রকৃতিতে অতীতে বা বর্তমানে যাহাই থাকুক না কেন, তোমার পথ নির্বিঘ্ন, তোমার পূর্ণসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরম ভগবান তোমার ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বয়ং তোমার যোগসাধনাকে গ্রহণ করিবেন এবং তোমারই স্বভাবের ধারা অনুসরণ করিয়া দ্রুত চরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইবেন। তাহার পর তোমার জীবনের ধারা, তোমার কর্মের রূপ যাহাই হউক না কেন, তুমি সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, কর্ম করিবে, বিচরণ করিবে এবং তোমার সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গতিতে ভাগবত শক্তিই তোমার মধ্য দিয়া কাজ করিবে। এইটিই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ এইটি হইতেছে উচ্চতম গুহ্য সত্য ও পরম রহস্য, অথচ ইহা হইতেছে একটি আভ্যন্তরীণ সাধনা যাহা সকলেই অনুসরণ করিতে পারে। তোমার বাস্তব অধ্যাত্ম সত্তার এইটিই হইতেছে গভীরতম অন্তরতম সত্য।"

সমাপ্ত